শব্দশাস্ত্রের ইতিহাস

সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ
ও
শব্দকোষের ইতিবৃত্ত

শ্রীকালীজীবন দেবশর্মা (চক্রবর্তী)

প্রকাশক

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার
গোলপার্ক, কলকাতা ৭০০ ০২৯

প্রথম সংস্করণ
জানুয়ারি ১৯৯৫

মূল্য ঃ দুইশত টাকা

ISBN 81-85843-65-1

মুদ্রক
প্রদীপ কুমার হাজরা
সেবামুদ্রণ
৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

'শব্দশাস্ত্রের ইতিহাস' গ্রন্থটি শ্রীকালীজীবন দেবশর্মার দীর্ঘ গবেষণা ও পরিশ্রমের ফল। ব্যাকরণ বিষয়টি মহাসমুদ্র। সেই মহাসমুদ্র মন্থন করে ব্যাকরণের সামগ্রিক পরিচয় একখণ্ডের একটি গ্রন্থে তুলে ধরা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। শ্রীকালীজীবন দেবশর্মা সেই দুরূহ কাজটিই করতে চেষ্টা করেছেন। প্রধানতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। এছাড়া পালি ও প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ এবং সে-সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতেরা যে-গবেষণা করেছেন তা-ও তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন। অজস্র তত্ত্ব ও তথ্যে গ্রন্থটি পরিপূর্ণ। সাধারণ পাঠক তো বটেই, অনেক পণ্ডিতও সেগুলি থেকে অনেক নতুন জিনিস জানতে পারবেন। বাংলা ভাষায় এই ধরনের বই বিরল।

এই অমূল্য গ্রন্থটি সুধীজনের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা ধন্য।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

১৯.১২.১৯৯৪

অনুপাসিতবৃদ্ধানাং বিদ্যা নাতিপ্রসীদতি।
—ভর্তৃহরি (বাক্যপদীয় ২/৪৯৩)

একদা যাঁহার চরণপ্রান্তে আমার
ব্যাকরণ-বিদ্যায় 'হাতেখড়ি' হইয়াছিল—
সেই পূজনীয় পিতৃদেব ঁকালীনাথ
বেদতীর্থ সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয়ের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে...

—দেবশর্মা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীশিবঃ শরণং মম

প্রাক্‌কথন

ছোটবেলায় বাবার টোলে—ইহার নাম ছিল 'সাঙ্গবেদচতুষ্পাঠী'—কলাপ ব্যাকরণের পাঠ গ্রহণের সময় তাঁহার মুখে এই ব্যাকরণের উৎপত্তিবিষয়ক 'মোদকং দেহি....' ইত্যাদি গল্প শুনিয়া মুগ্ধ হই। তখন হইতে এইসব বিভিন্ন ব্যাকরণের গল্প শুনিবার আগ্রহ আমাকে অনুপ্রাণিত করে বা 'পাইয়া বসে'—যাহার ক্রম পরিণতি এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থ।

বিশ্বসভ্যতার মুক্তাঙ্গনে প্রাচীন ভারতের যে কয়টি অবদান আজিও নিজ নিজ বিভাগে অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকৃত, সংস্কৃত ব্যাকরণ তাহাদের মধ্যে একটি। পাশ্চাত্য মনীষী হুইট্‌নি সাহেব ইহাকে ভারতীয় বিজ্ঞান-চেতনার সর্বাধিক প্রশংসনীয় সৃষ্টি বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার মতে ঃ

> The grammar remains nearly, if not altogether, the most admirable product of the scientific spirit in India, ranking with the best products of that spirit that the world has seen. —W. D. Whitney, 'The Study of Hindu grammar and the Study of Sanskrit,' The Indian Antiquary, Feb., 1885.

সংস্কৃত বৈয়াকরণদের মধ্যমণি, যাঁহাকে বৈয়াকরণ-বিধাতা বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না, সেই পাণিনি আড়াই হাজার বছর আগে যে ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, আজিও শিক্ষাজগতে তাহাই এই জাতীয় রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বা চরমোৎকর্ষরূপে পরিগৃহীত। ইহাকে অতিক্রম করা তো দূরের কথা, ইহার সমকক্ষ কোনো ব্যাকরণও অন্য কোনো ভাষায় অদ্যাপি কেহ রচনা করিতে পারেন নাই। 'মহাভাষ্য' বলিতে যে একমাত্র নির্দিষ্ট গ্রন্থ বুঝায়, তাহাও এই পাণিনি ব্যাকরণেরই ব্যাখ্যা। এই মহাভাষ্য, ব্যাকরণ-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

কালক্রমে এই ব্যাকরণকে অবলম্বন করিয়া শব্দবিদ্যার নানা ধারায় ঘরে-বাইরে ছোট-বড় যে অজস্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা এবং গুণগরিমাও পরম বিস্ময়কর। ইহার প্রভাব আসমুদ্র-হিমাচল ভারতভূমিকে প্লাবিত করিয়া বহির্ভারতেও বিস্তার লাভ করিয়াছে।

এতৎসত্ত্বেও কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে ব্যাকরণ একটি অপ্রিয় শাস্ত্র। বোধ হয় এই কারণেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবশ্যপাঠ্য বিষয়ের গণ্ডির বাহিরে ব্যাকরণের কোনো আকর্ষণীয় প্রতিষ্ঠা

নাই। সাহিত্যরসিক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯২৯) বাংলা ব্যাকরণের এ
পুস্তক রচনা করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন 'ব্যাকরণ বিভীষিকা' (কলিকাতা, ১৯১১)
যদিও ইহাকে ঠিক ঠিক শিক্ষামূলক গ্রন্থ বলা চলে না। ইংরেজ পণ্ডিত স্যর মনিয়
উইলিয়মস্ (১৮১৯-৯৯) ইউরোপীয় গণমানসের ব্যাকরণ-বিমুখতার পরিপ্রেক্ষিতে
ব্যাকরণকে 'necessary evil' বলিয়াছেন ঃ

> Europeans are apt to look on a grammar of any kind as a necessary evil, only to be tolerated because indispensable to the attainment of a desired end beyond. With us the grammar of a language is, in most cases, a mere passage to its literature, a dreary region to be traversed as soon as possible.
>
> —Indian Wisdom, 2nd edn., p. 176.

কবি-সাহিত্যিকগণও ব্যাকরণের প্রতি কোনো কালেই তেমন সুপ্রসন্ন ছিলেন না, 'নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ'র অনুমোদন সত্ত্বেও। 'অঙ্কুশ'—এখানে অবশ্যই ব্যাকরণের শাসন। কারণ ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত বাণীরূপের ক্ষেত্রে ব্যাকরণের বিধান বা গণ্ডি অনেক সময় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হইয়া দাঁড়ায়। অথচ সেই গণ্ডি অতিক্রমণের সাহসিক স্থলগুলিই আবার 'আর্ষপ্রয়োগে'র সসম্ভ্রম মর্যাদাও লাভ করে। ব্যাকরণ অমান্য করিবার অপরাধে কিন্তু ঋষির আসন-চ্যুতি ঘটে না। আবার ছন্দঃ ও ব্যাকরণের বিরোধে ছন্দেরই জয় ঘোষণার বিধান রহিয়াছে। অর্থাৎ ছন্দের অনুরোধে ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ প্রয়োগও গ্রাহ্য।

এই যুগে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'পুরস্কার' কবিতায়—

আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ
ধূলি-ভরা দুটি লইয়া চরণ
চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ
পবিত্র পদপঙ্কে।—

ইত্যাদিক্রমে চারি স্তবকে বৈয়াকরণের যে ভীষণ অথচ করুণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে কবি-মানসের ব্যাকরণ-বিমুখতাই প্রতিফলিত হইয়াছে। ছাত্রের আতঙ্কস্বরূপ বৈয়াকরণের এমন 'অগ্নিশর্মা' 'প্রখরমূর্তি' অন্য কোনো সাহিত্যে আছে কি না জানি না। সংস্কৃত কবির উদ্ভট কবিতায় অবশ্য অপশব্দগুলিকে বৈয়াকরণরূপী কিরাতের নিকটবর্তী মৃগকুলের মতো সন্ত্রস্ত বলা হইয়াছে। ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিঙ্ (১৮১২-৮৯)-রচিত 'A Grammarian's Funeral' শীর্ষক সুদীর্ঘ (প্রায় দেড়শত পঙ্ক্তি) কবিতায় কিন্তু পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যতিক্রম দেখা যায়।

এ-হেন ব্যাকরণেরও একটি সুগুপ্ত হৃদয় আছে, সাহিত্য আছে, আর আছে প্রসার-প্রতিপত্তির ইতিহাস। সেই সবের খবর বড় একটা কেহ রাখে না, রাখিতে চাহে না, এমন কি—তেমন তেমন কিছু একটা থাকিতে পারে বলিয়া মনেও করে না ; আপাত নীরস বাহিরের শুধু চেহারাটা দেখিয়াই তাহারা কারণে-অকারণে ইহার প্রতি এমন বিরূপ হইয়া উঠে যে, সারাজীবনে সেই বিরূপতার অহেতুক ঘোর আর কাটিতে চাহে না। এই দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া, এই গ্রন্থে সেই অপ্রিয় শাস্ত্রের কিছু ঐতিহাসিক পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি, কাহিনীগুলিও বাদ দিই নাই।

কোনো শাস্ত্রই গল্প-উপন্যাসের মতো সরল-সরস নয়, ব্যাকরণ তো নয়ই। যে 'শাস্' ধাতু হইতে 'শাস্ত্র' শব্দের জন্ম, তাহার অর্থই শাসন করা। তাই শাস্ত্র-মাত্রেই একটা শাসনের ভাব থাকিতে বাধ্য—যাহা যথেষ্ট সুখকর নয়। ব্যাকরণের অন্বর্থ বা সার্থক নাম 'শব্দানুশাসন' দিয়া ('অথ শব্দানুশাসনম্') মহাভাষ্যের সূচনা। অষ্টাধ্যায়ীর কাশিকা-বৃত্তিতে উদাহৃত হইয়াছে 'কষ্টং ব্যাকরণম্' (৭/২/২২), 'দারুণাধ্যাপকঃ। ঘোরাধ্যাপকঃ' (৮/১/৬৭)। তবে, প্রশিক্ষণের গুণে নীরস বিষয়ও সরসতা লাভ করে। সেই ক্ষেত্রে ইহার ইতিহাস ও আনুষঙ্গিক উপাখ্যান প্রভৃতির ভূমিকা মোটেই অবহেলার বস্তু নয়। শাস্ত্রের তুলনায় তাহার ইতিহাস অধিক চিত্তাকর্ষক, যেমন ইতিহাসের তুলনায় কাহিনী।

প্রায় প্রতিটি ব্যাকরণেরই ন্যূনাধিক এমন কিছু কাহিনী বা গল্প আছে, যাহা সকলেরই ভাল লাগিবার কথা। এইগুলি বহুলাংশে ব্যাকরণের উৎপত্তিমূলক হইলেও সর্বক্ষেত্রে ইতিহাসসম্মত নয়। তবে যে-জনশ্রুতির অবলম্বনে তাহারা পল্লবিত, তাহাকে একেবারেই অমূলক বলা উচিত হইবে না, কারণ, প্রাচীনেরা বলিতেন 'নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ'। প্রথম-শিক্ষার্থীর ব্যাকরণ-ভীতি দূর করা-ই হয়তো গল্পগুলির একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল।

ব্যাকরণ-চিন্তা হইতে আরম্ভ করিয়া পাণিনি-পূর্ব, পাণিনীয় এবং পাণিনি-পরবর্তী সংস্কৃত ব্যাকরণধারার বর্ণনা, এই যুগের বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত 'ব্যাকরণকৌমুদী' পর্যন্ত আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। পাণিনীয় ব্যাকরণের তিন প্রধান প্রবক্তা—(১) সূত্রকার পাণিনি, (২) বার্ত্তিককার কাত্যায়ন এবং (৩) ভাষ্যকার পতঞ্জলি। এই তিন মুনির সমন্বিত অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাকরণকে 'ত্রিমুনিব্যাকরণ' বলা হইত। পরে মুখ্যতঃ ইহারই ভিত্তিতে রচিত অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন দ্বাদশ ব্যাকরণের ইতিহাস যথাসম্ভব বিস্তৃত আকারে লিখিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় ইহাই এই গ্রন্থের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরে আরও কতকগুলি অপ্রসিদ্ধ বা স্বল্প-প্রচলিত ব্যাকরণের প্রসঙ্গ অল্প-বিস্তর আলোচিত হইয়াছে। ক্রমে দেশী-বিদেশী আধুনিক পণ্ডিতদের ব্যাকরণ-চর্চার খবর, পালি ও প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণকথা, সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দকোষের ইতিবৃত্ত এবং তাহাতেও আধুনিক পণ্ডিতদের অবদান ইত্যাদির অবতারণা করিয়াছি।

ব্যাকরণের মতো শব্দাভিধানেরও এক বিরাট কার্যকরী ভূমিকা শব্দজ্ঞানের ব্যাপারে বর্তমান। সে-ও শব্দবিদ্যার এক বিশিষ্ট অংশীদার। এই সবের সমন্বয়েই ভারতীয় শব্দশাস্ত্র—যাহা অন্তিমে শব্দতত্ত্বের সন্ধানে স্ফোটবাদের পথে যাত্রা করিয়া শব্দব্রহ্মে পৌঁছিয়া পরব্রহ্মে আত্মস্থ হইবার প্রেরণা বহন করিতেছে। 'শব্দব্রহ্মাণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।'

শব্দজ্ঞানের নিয়ামকরূপেই কেবল ব্যাকরণবিদ্যার সৃষ্টি হইলেও পরে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে অন্য ভাষার নিয়মাবলী বুঝাইতে, এমন কি অন্য বিদ্যার (যেমন সঙ্গীতের) নিয়ম-শৃঙ্খলার নির্দেশ করিতেও 'ব্যাকরণ' নামটির নির্বিশেষ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক সাহিত্যে ব্যাকরণ-ক্রিয়ার (বি-আ + কৃ....) প্রথম প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—নামে ও রূপে পরমাত্মার বিবর্তন বুঝাইতে ('নামরূপে ব্যাকরবাণি....' ইত্যাদি)। আগে নাম বা শব্দ, পরে তদর্থক বস্তু, যাহা নামের বাস্তব রূপায়ণ। আগে পদ, পরে সেই পদের অর্থরূপ বস্তু বা পদার্থ। লক্ষণীয়, আমরা 'পদার্থ' বলিতে কোনো বস্তুকেই বুঝিয়া থাকি। এই ভাবনা সেই দর্শনেরই ফলশ্রুতি—যে-দৃষ্টিতে ঈশ্বরই পরম বৈয়াকরণ—যিনি এই বিশ্বসংসারকে

ব্যাকৃত (বি-আ + কৃ + ক্ত) বা প্রকাশিত করিয়াছেন—'যেনেদং ব্যাকৃতং সর্বং বৈয়াকরণঃ পরঃ।' এই সঙ্গে মনিয়র উইলিয়মস্-কথিত 'necessary evil'-এ তুলনা করিলে উভয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও পরিণতি সহজেই ধরা যাইবে। তবে ভারতী মনীষা যে সেই সুদূর অতীতেও ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে আশাতীত বস্তুধর্মিতার স্বাক্ষর রাখিয়াছিল, তাহার সর্বাতিশায়ী প্রমাণ পাণিনির সূত্রাবলী। লৌকিক ও বৈদিক শব্দানুশাসনঘটিত অজস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঘনীভূত সমন্বয়ী রূপ এই ব্যাকরণ তা বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত।

আধুনিক যুগেও ব্যাকরণ-রচনা-বিষয়ে বাস্তব সমীক্ষার সন্ধান পাওয়া যায় ১৬.৪.১৮৯৯ তারিখে কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) ব্যাকরণ-সঙ্কলন সম্পর্কে বলিতে গিয়া চারি প্রকারের ব্যাকরণের উল্লেখ করেন—(১) ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণ, (২) সার্বভৌম ব্যাকরণ, (৩) চাষা-ভুসা ও অন্তঃপুরমহলের ব্যাকরণ এবং (৪) খাস্ সংস্কৃত ব্যাকরণ। এই সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন ঃ

> ব্যাকরণ যদি একখানি গড়িয়া তুলিতে হয়, একদিকে সার্বভৌমিক ব্যাকরণ আর একদিকে দেশীয় চাষা-ভুসা এবং অন্তঃপুরমহলের ব্যাকরণ, সংক্ষেপে বঙ্গীয় প্রাকৃত ব্যাকরণ, আর এক দিকে খাস্ সংস্কৃত ব্যাকরণ,—এই তিন ব্যাকরণের ত্রিবেণীসঙ্গমকে আদর্শ করিয়া একখানি সুপাঠ্য এবং সমীচীন ব্যাকরণ গড়িয়া তোলা হইলে ভাল হয়। ছাত্রদিগের প্রাণবধকারী একটা যা তা' ব্যাকরণ হওয়া অপেক্ষা ব্যাকরণ না হওয়া ভাল। [সভাপতির অভিভাষণ সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩০৬]

এখানে মনে রাখা দরকার, ইহারও ৫৩ বৎসর আগে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় শিক্ষা সংসদের নিকট কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য বিষয়ের সংস্কার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহাতে ছাত্রদের মাতৃভাষায় রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে সুনির্বাচিত সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যপাঠের সুপারিশ ছিল এবং পরে সিদ্ধান্ত কৌমুদী (পাণিনীয় ব্যাকরণের ভট্টোজি দীক্ষিত-কৃত প্রক্রিয়াবদ্ধ রূপ) পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল। বলা বাহুল্য, পরে তিনি নিজেই এই কার্যে অগ্রসর হন এবং বাঙ্‌লা ভাষায় প্রথমে 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' (কলিকাতা, ১৮৫১) এবং পরে চারি ভাগে 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' (১৮৫৩-৬২) রচনা ও প্রকাশ করিয়া এদেশে সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেন। বাঙ্‌লা গদ্যে প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। সেই বই আমরা দেখি নাই।

সংস্কৃত ভাষা শিখানোটাই আসলে দীর্ঘকালীন প্রধান সমস্যা—যাহার সমাধানের গুরুভার এবং তজ্জনিত সমস্ত দায়িত্বই কার্যতঃ একমাত্র ব্যাকরণ শাস্ত্রকেই বহন করিতে হয়। পাণিনির ব্যাকরণ মুখ্যতঃ লৌকিক সংস্কৃতের জন্য রচিত হইলেও ইহা এমনই উচ্চ গ্রামে বাঁধা যে, কালক্রমে ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে তাহা অনুপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষাগুলির ক্রমিক অভ্যুদয় এবং সংস্কৃতের ক্রমসঙ্কোচন—পাণিনির অনুপযোগিতাকে বড় বেশী প্রকট করিয়া তোলে। ফলে সহজ-সরল ব্যাকরণের আবশ্যকতায় যুগোপযোগী নূতন নূতন ব্যাকরণের জন্ম। এমনকি,

পাণিনির গ্রন্থও, শেষ পর্যন্ত, এই নবীকরণের হাত এড়াইতে পারে নাই। তাঁহার সূত্রগুলিকে অটুট রাখিয়া বিষয়ানুসারে সাজাইবার যে চেষ্টা চলিতে থাকে তাহারই শেষ পরিণতি ভট্টোজির 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী'। পাণিনির পর অদ্যাবধি সংস্কৃত ব্যাকরণের যে ইতিহাস, তাহা মুখ্যতঃ কত সহজে এবং কত অল্প সময়ে বিদ্যার্থীকে সংস্কৃতে পণ্ডিত করা যায়, সেই প্রচেষ্টারই ইতিহাস। এই ক্ষেত্রেও অবশ্য পাণিনির কৃতিই প্রধান ভিত্তির কাজ করিয়াছে। বস্তুতঃ পাণিনির প্রভাবমুক্ত একখানি ব্যাকরণও আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই এবং তাহা বোধ হয় আদৌ সম্ভবপর নয়।

মাতৃভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার সুবিধাজনক ব্যবস্থা এই দেশে অনেক আগেই প্রচলিত হইলেও অন্য ভাষায় প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনার কৃতিত্ব কিন্তু বিদেশীয়দের। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণই এই বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক এবং তাঁহাদের প্রায় সকলেই ছিলেন ভারতাগত খ্রীষ্টান মিশনারি। তাঁহাদের অনেক আগে বহির্ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং বিদেশী ভাষায় এই দেশের পুঁথিপত্রের অজস্র অনুবাদ হইতে থাকে। অধুনা-আবিষ্কৃত সেইসব গ্রন্থাবলীর মধ্যে ব্যাকরণ গ্রন্থাদির অনুবাদ থাকিলেও অন্য ভাষায় সংস্কৃত শিক্ষার পুস্তক বড় পাওয়া যায় নাই।

এইসব কথা প্রাকৃত এবং পালি ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধেও প্রায় সমভাবে প্রযোজ্য। শব্দকোষের বেলাতেও তাহাই। ভারত হইতে বিতাড়িত বৌদ্ধধর্ম সীমান্তদেশগুলিতে আশ্রয় লইলে সেইসব দেশে পালিভাষা শিক্ষার জন্য অধিকতর সক্রিয়তা দেখা দেয়। এই ভাষার ব্যাকরণধারার দুই বিশিষ্ট গ্রন্থ 'মোগ্গল্লান ব্যাকরণ' ও 'সদ্দনীতি' যথাক্রমে সিংহলে ও ব্রহ্মদেশে রচিত। দুইটিরই জন্মকাল খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী। ভারতে রচিত পালি ব্যাকরণ 'কচ্চায়নে'র উপরেও ঐ দুই দেশে বহু টীকা-টিপ্পনী রচিত হইয়াছে। স্থানীয় ভাষায় অন্ততঃ পালিভাষার ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা খুব বিরল নয়।

'অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রম্'। তাহার ইতিহাসও অনন্তপার। গুরুজনের উপদেশ—প্রাচীন ভারতীয় কোনো বিদ্যার গবেষণাতেই যথেষ্ট উপাদানের অভাব হয় না। শব্দশাস্ত্রের ইতিহাস খুঁজিতে গিয়া সেই গুরুবাক্যের সত্যতা আশাতিরিক্ত প্রমাণিত হইয়াছে। উপাদান-প্রাচুর্যের সদ্ব্যবহার করাও বড় সহজ নয়। পরিবেষণে মুন্সিয়ানা আবশ্যক, বিশেষতঃ এই জাতীয় অপ্রিয় বিষয়ের ; কঠিনকে সহজ, নীরসকে সরস, কর্কশকে কোমল করা দরকার। এই কাজ অবশ্যই সাহিত্যিকের। এই গ্রন্থের রচনা-শৈলী সেই আদর্শিক স্তরে পৌঁছিয়াছে—এমন দাবী করিবার স্পর্ধা আমাদের নাই। তজ্জন্য ভাবীকালের কোনো যোগ্যতর ব্যক্তির উদ্দেশে সাদর আহ্বান জানাইয়া আমরা সাধ্যমতো অগ্রসর হইলাম।

ভারতীয় অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে বাক্ তথা শব্দের স্থান অতি উচ্চে। কেবল ভারতেরই নয়, সারা বিশ্বের দার্শনিক চিন্তায়ই ইহার প্রভাব অপরিসীম। ভারতীয় দর্শনের নানা বিভাগে শব্দতত্ত্ব, শব্দশক্তি, শব্দব্রহ্ম ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাদ-বিচার-বিবেচনা করা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। শব্দশাস্ত্র ব্যাকরণ, সেই সুবাদে কাচ কুড়াইতে গিয়া কাঞ্চন প্রাপ্তির ন্যায়, শব্দের বহিরঙ্গের চর্চায় প্রবৃত্ত হইয়া শব্দতত্ত্বের অন্তর্লোকে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। শব্দার্থঘটিত স্ফোটবাদ মূলতঃ ব্যাকরণবিদ্যারই অবদান। পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীতে (৬/১/১২৩) আচার্য স্ফোটায়নের উল্লেখ করিলেও মহাভাষ্যেই সর্বপ্রথম স্ফোটের স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খ্রীঃ ৬ষ্ঠ/৭ম শতাব্দীয় আচার্য ভর্তৃহরি

স্ফোটকে শব্দব্রহ্মে উন্নীত করিয়া প্রকারান্তরে শব্দাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'বাক্যপদীয়'—ব্যাকরণদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। পরে এই বিভাগে বিচারবহুল অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এখনও হইতেছে। যোগদর্শন, আলঙ্কারিকগণ এবং তান্ত্রিকগণ (নাদবাদী) স্ফোট স্বীকার করিলেও নৈয়ায়িকগণ, মীমাংসা ও বৈশেষিক দর্শন এবং শঙ্করাচার্য ইহার বিরুদ্ধবাদী। বিষয়টি বিতর্কিত, এখনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় নাই। এই যুগের দার্শনিকশিরোমণি ব্রজেন্দ্রনাথ শীল স্ফোট বলিতে Idea বুঝিয়াছেন।

শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থপ্রবৃত্তি, কারক, সমাস প্রভৃতির অবলম্বনেও নৈয়ায়িকগণ চুল-চেরা যুক্তির প্রয়োগে প্রভূত বাদ-বিচারের অবতারণা করিয়া বহু বাদ-গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। ইহার দ্বারা অনেক স্থলে অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। কাতন্ত্রপরিশিষ্টের অন্যতম টীকাকার শঙ্কর শর্মা ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্রকে যথাক্রমে ইক্ষু এবং ইক্ষুপেষক যন্ত্রের সহিত তুলিত করিয়া রসিকগণকে তর্কপ্রয়োগে ব্যাকরণের অর্থ (রস) অধিগত করিতে বলিয়াছেন। ব্রহ্মদেশে খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীতে থের মহাবিজিতাবী কর্তৃক রচিত 'বাচকোপদেস' পুস্তকে ন্যায়শাস্ত্রীয় পরিপ্রেক্ষায় পালি ব্যাকরণের বিষয়গুলি বিবেচিত হইয়াছে। অনেক সম্ভাবনাময় প্রতিভা আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইয়া কিছু উল্লেখযোগ্য টীকা-টিপ্পনী রচনায় পর্যবসিত হইয়াছে। মুখ্যতঃ তাত্ত্বিক আলোচনায় এবং সিদ্ধান্তের খণ্ডন-মণ্ডনে গ্রন্থাদি রচনার দ্বারা একাধিক পণ্ডিতবংশ পুরুষানুক্রমে এক ধরনের বিচার-মল্লতায় উৎসাহ দেখাইয়াছেন।

এইসব বহুবিতর্কিত এবং সমালোচিত তত্ত্ব পরিহারপূর্বক তথ্যভিত্তিক স্থির সিদ্ধান্তগুলিকে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহাদের সঙ্গগুণে আমাদের কিছু সাহসিক মন্তব্যও হয়তো বা বিদ্বজ্জনের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে (যেমন 'কীটোঽপি সুমনঃ সঙ্গাৎ আরোহতি সতাং শিরঃ') ; সেই ক্ষেত্রে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ও সহানুভূতি-ই হইবে আমাদের ঐ সাহসিকতার বড় পুরস্কার।

দীর্ঘ ১৫ বৎসরের চেষ্টায় রচিত এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা এখন হইতে প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে সমাপ্ত হইলে, অন্যত্র প্রথমে 'ব্যাকরণ-কথা' এবং পরে 'ব্যাকরণ-সাহিত্যের ইতিহাস' নামে প্রকাশনার ব্যর্থ চেষ্টার পর এখন তাহাই 'শব্দশাস্ত্রের ইতিহাস' নামে, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর শ্রদ্ধেয় সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজের সৌজন্যে এই প্রতিষ্ঠান-কর্তৃক প্রকাশিত হইল। ঐ অস্থিরতা ও প্রলম্বিত অনিশ্চয়তার মধ্যে সামান্য কিছু সংযোজন ব্যতীত বিগত দুই দশকের ব্যাকরণ-চর্চার ইতিহাস প্রায় অনাহৃত রহিয়া গিয়াছে। এই ন্যূনতা এবং কিছু উদ্ধৃতির উৎস-নির্দেশে ত্রুটির জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকল গুণিজনের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে আলঙ্কারিক আচার্য আনন্দবর্ধনের আনন্দবর্ধক সেই বাক্যটি স্মরণ করিয়া, আসুন, আমরাও আনন্দ লাভ করি, যাহাতে বলা হইয়াছে : 'প্রথমে হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণা ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ববিদ্যানাম্।'—ধ্বন্যালোক (১ম উদ্দ্যোত)।

শ্রীকালীজীবন দেবশর্মা

মিলনী, ডানকুনি, হুগলী
১৯৯৪

শব্দশাস্ত্রের ইতিহাস

ব্যাকরণ-চিন্তা

ভাষার সহিত ব্যাকরণের সম্পর্ক

ভাষাবিজ্ঞানীর মতে ঃ বর্তমানে প্রাপ্ত বৈদিকভাষা—একদা-প্রচলিত কথ্য ভাষারই সাহিত্যিক রূপ। সেই ভাষা যখন কালক্রমে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল, তখন সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে তাহা সংস্কৃতে পরিণত হয়; সর্বসাধারণের ভাষারূপে জন্ম লইতেছিল পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ। ইহাদেরও বর্তমানে প্রাপ্ত নমুনা সাহিত্যাশ্রিত। বৈদিক ও সংস্কৃতে প্রভেদ ব্যাকরণগত, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রভেদ ধ্বনিগত। বৈদিক ভাষার শব্দাবলী অবিকৃতভাবে সংস্কৃতে গ্রহণ করা হইলেও কালবশে বহু শব্দের ব্যবহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

'জৈন ধর্মসম্প্রদায়ের দ্বারা প্রাকৃত, বৌদ্ধদের দ্বারা পালি এবং হিন্দুদের দ্বারা (ধর্মীয় আচরণ-ক্ষেত্রে) সংস্কৃত টিকিয়া আছে। সংস্কৃতের অপ্রতিহত প্রভাবে একদা জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় উহার আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয় (এবং ক্রমে নিজ নিজ সম্প্রদায়ে স্বতন্ত্র সংস্কৃত ব্যাকরণও গড়িয়া তোলে)।

'প্রথমে সংস্কৃত পালিতে এবং পরে পালি প্রাকৃতে রূপান্তরিত হয়। অবশ্য সন্দেহ[১] আছে যে আদৌ এই পরিবর্তন সংস্কৃত হইতেই শুরু হইয়াছিল কি না। অপভ্রংশ হইতে ক্রমে আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম হইলেও বর্তমানে কিন্তু তাহারা সংস্কৃত শব্দকে ভাঙ্গিয়া সরলীকরণের প্রাকৃত রীতি বর্জন করিয়া অবিকল সংস্কৃত শব্দকেই গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে।'

প্রকৃতির দান ভাষা। আপামর জনগণই সেই প্রকৃতি। ভাষা প্রকৃতি-সম্ভবা। ব্যবহারের খাতে ভাষার স্রোত প্রবাহিত। 'প্রয়োগ এব ভগবান্'। কাজেই কোনও ভাষার উৎপত্তি, বিবৃদ্ধি ও পরিণতিতে পণ্ডিতী জোর-জবরদস্তি খাটে না এবং সেই সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া তাহাতে চির-স্থির থাকাও চলে না।

আগে ভাষা, পরে ব্যাকরণ—ইহা আমাদের একরূপ বদ্ধমূল ধারণা প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি আপাতসত্য, স্থূল সিদ্ধান্ত। মানুষের মুখের কথা কতকগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ম-কানুন ভিন্ন কখনও ভাষার পর্যায়ে পৌঁছিতে পারে না। মানুষ স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতে যে সব শব্দ উচ্চারণ করে সেগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট অর্থপ্রকাশের অনুকূল একটা সাধারণ ধারাবাহিক শৃঙ্খলা না থাকিলে সেই শব্দজাল অপরের নিকট প্রায়শঃ নিরর্থক হইয়া উঠে। মানুষের আদিম অবস্থায় এই প্রাথমিক বাক্‌চেষ্টাকে অধ্যাপক তারাপুরেওয়ালা 'sound-jumble stage' বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ঃ '...mere sounds do not make language, nor,... the "names" by themselves unless they are put in connection (express or implied) with other names.'[২] অর্থাৎ ভাষা পরস্পর-সংযোগবিহীন কতকগুলি শব্দের 'জগা-খিচুড়ি' নয়।+ খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ/৭ম শতাব্দীয় বৈয়াকরণ দার্শনিক ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়ের (১।৮৬) টীকায় ইহাকে 'অলব্ধক্রমা বাক্' বলা হইয়াছে—'নালব্ধক্রময়া বাচা কশ্চিদর্থোঽভিধীয়তে'।—অর্থাৎ ক্রমরহিত (অবিন্যস্ত) বাণীর দ্বারা কোনো অর্থবোধ হয় না। বাণীর এই ক্রম—ব্যাকরণের সাহায্যেই সঞ্জাত হইয়া থাকে। মোট কথা, একটা নির্দিষ্ট দেশ-কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বাচন-ক্রিয়া যখন এক সুনির্দিষ্ট রীতি-পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত হইয়া পরস্পরের নিকট অনায়াস-বোধ্য হইয়া উঠে, তখনই উহাকে ভাষা বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, ঐ সুনির্দিষ্ট রীতি-পদ্ধতিই আসলে ব্যাকরণ*। অভিপ্রায় প্রকাশের সহজতম উপায় বা কৌশল যে বাচন, ব্যাকরণ সেই উপায়ের উপায় বা কৌশলের কৌশল। এই সত্যেরই যেন নিগূঢ়

আভাস পাওয়া যায় প্রাচীন উপনিষদ্‌বাক্যে, যেখানে ব্যাকরণকে বলা হইয়াছে : 'বেদানাং বেদঃ'৩ (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৭।১।৪)।

ভাষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই ব্যাকরণ। মানুষের ভাব-চিন্তার উপর ব্যাকরণের কোনো হাত নাই। ধ্বনি বা শব্দোচ্চারণেও তাহার স্বাধীনতা অব্যাহত। কিন্তু সেই ধ্বনি যখন বর্ণাত্মক হইয়া ভাষার স্তরে পৌঁছিতে চায়, তখন তাহাকে ব্যাকরণের দ্বারস্থ হইতে হয়। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৯-১৯১১) উক্তি প্রণিধানযোগ্য। 'বাংলাভাষার সংস্কার' নামক নিবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন :

> ...ভাষার এই যে দানাবাঁধার কথা বলিতেছি, সাহিত্যের এই যে গৌরবের সূচনা করিতেছি, ইহা প্রধানতঃ ব্যাকরণের গুণেই হইয়া থাকে। ব্যাকরণের বিধানবশে ভাষার একটা স্থির মূর্তি প্রকাশ পায়। ভাষা তখন অসংযত থাকিতে পারে না ; সংযমের আর নিয়মের শাসনে প্রামাণিকতা লাভ করে, এবং তাহার ফলে লেখকদের ও ভাষকদের মনের ভিতর একটা একতা স্থাপিত হয় এবং তাহাতে ভাষার প্রসারবৃদ্ধির সুযোগ হয়।

ভাষার সৌন্দর্যবিধান যদি সাহিত্যের কর্ম হয়, উহার স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব ব্যাকরণের। তাই বৈয়াকরণ ভাষার চিকিৎসক, সাহিত্যিক ভাষার রূপকার। নদীর দুই তীরের বন্ধনের মতো ভাষার বেলায় ব্যাকরণের শাসন। শাসিত কথন বা ভাষণই ভাষা। সাধারণ মানুষ তাহার অজ্ঞাতসারেই কথাবার্তায় এই শাসন বা নিয়ম মানিয়া চলে। শব্দের অর্থশক্তির ন্যায় আমরা ইহাকে ভাষার ব্যাকরণ-শক্তি বলিতে পারি। পাশ্চাত্ত্য মনীষী ম্যাক্সমূলার সাহেব ব্যাকরণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ইহাকে 'The blood and soul of language' বলিয়াছেন। ইহা ব্যাকরণের সংশ্লেষণী (synthetic) নির্বিশেষ চরিত্র, যেমন ইংরেজী গ্রামার।

ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তিগত বা প্রকৃতিঘটিত বিশেষ চরিত্রটি কিন্তু বিশ্লেষণাত্মক (analytic)। এই দৃষ্টিতে তাহার যে অন্যদিকের সত্যটি প্রতিভাত হয় তাহা এই—মানুষ যখন মনোভাব প্রকাশের জন্য কথা বলে তখন সেই কথাকে সে বর্ণ—পদ—বাক্য ইত্যাদিক্রমে খণ্ডিত

করিয়া বা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া প্রকাশ করে, না ভাঙ্গিয়া প্রকাশ করিতে পা
না। এই ভাঙ্গিয়া খণ্ড করাকে বা বিশেষ আকার দেওয়াকেই তো ব্যুৎপাদ
অর্থে ব্যাকরণ বলা হয়। কাজেই ব্যাকরণ ভিন্ন ভাষার প্রকাশই সম্ভ
হইতে পারে না। ব্যাকরণের সহিত ভাষার এই প্রকাশ-বা জন্ম-গ
সম্পর্ক লক্ষ্য করিয়াই মহাভাষ্যে (৬।৩।৫৯) পতঞ্জলি বলিয়াছেন-
'একৈক বর্ণবর্তিনী বাক্' এবং 'কৃতবর্ণানুপূর্বিকংপদম্' (৪।১।৮২)।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্বোক্ত ব্যাকরণ-শক্তি বা নিয়মশৃঙ্খ
কোথা হইতে আসে বা ইহার কর্তা কে? ইহার অতি সহজ উত্তর-
কোন ভাষা যেমন কোন ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় জন্মলাভ করে ন
তেমন উহার আনুষঙ্গিক ব্যাকরণও কোন একক কর্তৃত্ব-প্রসূত নয়
ইহার মূলে ব্যক্তিসাপেক্ষ কোন সচেতন কর্তৃত্ব নাই। যুগ যুগ ধরি
নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া বিবর্তিত হইতে হইতে ভাষার সহি
তাহার ব্যাকরণও প্রয়োজনের উপযোগী পরিণতি লাভ করে। তা
ভাষার যাহা ইতিহাস, সেই ভাষার ব্যাকরণের ইতিহাসও মূলতঃ তাহাই
কতকটা সহজাত সংস্কারের মতো আমরা সেই ঐতিহাসিক ধারা
আনুগত্য করিয়া থাকি।

তবে বৈয়াকরণ কে? তিনি কি করেন? তিনি ভাষাগত
নিয়মশৃঙ্খলার সন্ধান দেন মাত্র। বৈয়াকরণ ব্যাকরণ সৃষ্টি করেন ন
আবিষ্কার করেন। তিনি ইহাকে দর্শন করিয়া সূত্রাকারে গ্রথিত করে
এবং প্রয়োজনবোধে তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যাও দেন। এই কারণে তি
ব্যাকরণের সূত্রকার বা বৃত্তিকার (ব্যাখ্যাতা) মাত্র, ব্যাকরণকার নহেন
তাই পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণদিগকে তাঁহাদের দ্বারা গ্রথিত ব্যাকরণে
উপজ্ঞাতা, প্রবক্তা, দ্রষ্টা, স্মর্তা ইত্যাদি বলা হইয়াছে, কিন্তু ব্যাকর
কর্তা বলা হয় নাই। অন্যান্য শাস্ত্রের গ্রথিতাদেরও সেই সব শাস্ত্রে
কর্তা না বলিয়া স্মর্তা বা বক্তা বলাই বিধেয়। এই প্রসঙ্গে 'অদ্বৈতব্রহ্ম
সিদ্ধি' গ্রন্থের রচয়িতা সদানন্দের উক্তি স্মরণীয়। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

> 'গৌতমাদিমুনীনাং তত্তচ্ছাস্ত্রস্মারকত্বমেব শ্রূয়তে, ন তু বুদ্ধি
> পূর্বককর্তৃত্বম্। তদুক্তং "ব্রহ্মাদ্যা ঋষিপর্যন্তাঃ স্মারকা ন
> কারকা" ইতি।'

অর্থাৎ গৌতমাদি মুনিদের নিজ নিজ শাস্ত্রের স্মারকত্বই শ্রুত হয়, বুদ্ধিপূর্বক কর্তৃত্ব নয়। তাই বলা হইয়াছে, 'ব্রহ্মাদি ঋষিগণ পর্যন্ত স্মারক, কারক নহেন।'[৪] মোট কথা, শাস্ত্রীয় সত্য পূর্ব হইতেই বর্তমান থাকে, কেহ তাহা সৃষ্টি করে না ; মুনি-ঋষিগণ তাহা মনন ও দর্শনের দ্বারা আয়ত্ত করিয়া অন্য সকলের নিকট উপস্থাপিত করেন মাত্র। তবে সাধারণতঃ ভাবপ্রকাশের সুবিধার জন্য 'ব্যাকরণকার' বা 'শাস্ত্রকার' প্রভৃতির প্রয়োগ করা হইলেও, সেই সব স্থলে ঐ সব শাস্ত্রের গ্রন্থনা-ই বুঝিতে হইবে, যেমন বহু ফুলের সমন্বয়ে মালা গাঁথা।

প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণের যে অন্তরঙ্গ রূপ তাহা বৈয়াকরণ কর্তৃক গ্রথিত বা বিধিবদ্ধ হইলে, তাহার তুলনায়, বেশ কিছুকাল পরের সেই ভাষাকেই অগ্রবর্তী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ জীবন্ত ভাষা দীর্ঘকাল এক বিন্দুতে স্থির থাকে না। এই ক্ষেত্রেই পূর্বোক্ত 'আগে ভাষা পরে তাহার ব্যাকরণ' কথার সার্থকতা। এখানে 'ব্যাকরণ' অর্থে গ্রথিত ব্যাকরণ বা সেই জাতীয় কোন গ্রন্থ বুঝিতে হইবে। এই ব্যাকরণ ভাষার পশ্চাতে ধাবমান। ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি একদা-লক্ষিত ব্যাকরণ-পদ্ধতির সংশোধন বা পরিবর্তন না করা হয়, তবে অগ্রগামী ভাষার সহিত পশ্চাদ্‌বর্তী ব্যাকরণের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এই বিরোধের আশঙ্কায় প্রতি দশ বৎসরে একবার করিয়া ফরাসী এবং জার্মান ভাষার ব্যাকরণ সংশোধনের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। বলা বাহুল্য অধিকাংশ ভাষার ক্ষেত্রেই ব্যাকরণের এই প্রতিসংস্কার যথাসময়ে ঘটিয়া উঠে না, বরং তাহার পরিবর্তে দেখা দেয় অন্য কোনো নূতন ব্যাকরণ। এদিকে সমাজের একদল রক্ষণশীল ব্যক্তি পূর্বব্যাকরণের দোহাই দিয়া পরিবর্তন-বিরোধী হইয়া উঠে। ফলে প্রাচীনে-নবীনে নানা বৈষম্যের সৃষ্টি হয় ; নানা আঞ্চলিক পার্থক্যও সময় সময় প্রকট হইয়া উঠে। যাস্কের নিরুক্তে (২।২) ইহার প্রমাণ আছে। সেখানে 'কম্বোজ-আর্য' এবং 'প্রাচ্য-উদীচ্য'—এই অঞ্চল-ভেদে একই ভাষার ব্যাবহারিক পার্থক্য উদাহৃত হইয়াছে। বলা হইয়াছে ঃ '...প্রকৃতয় এবৈকেষু ভাষ্যন্তে। বিকৃতয় একেষু।' ভাষার এই প্রকৃতি-বিকৃতির নির্দেশক অবশ্যই ব্যাকরণ। পরে আবার 'দণ্ড' শব্দের প্রকৃতিগত পার্থক্যের বর্ণনায়

ঔপমন্যবের মতান্তর দেখাইয়া বলা হইয়াছে, এক মতে দদ্ এবং অ
মতে দম্ ধাতু হইতে দণ্ড শব্দের উৎপত্তি। ইহা অবশ্য বৈয়াকরণি
মতবিরোধ। পাণিনির ৩।১।৯০ নং সূত্রানুসারে পূর্বদেশে 'কৃষ্যতি' এ:
অন্যত্র 'কুষ্যতে' পদের ব্যবহার শুদ্ধ।[৪ক] তাছাড়া কথ্য এ:
লেখ্যভাষার মধ্যেও পার্থক্য থাকে। এই সব পার্থক্যের ভিত্তিতে না
আঞ্চলিক বা সঙ্কীর্ণ-ক্ষেত্রগত ব্যাকরণের রচনাও অসম্ভব নয়, যাহাদে
সমন্বয়ে পরে এক সর্বাতিশায়ী ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের গ্রন্থনাও সম্ভ
যেমনটি হইয়াছে পাণিনির দ্বারা।

সংস্কৃত ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য

পূর্বে আমরা ব্যাপক অর্থে 'ব্যাকরণ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছি
ইহার সহিত ইংরেজী গ্রামারের তুলনা চলিতে পারে। সংস্কৃতে
ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—বিশ্লেষণ বা বিশেষ আকৃতি দান
'ব্যাকৃতি', 'ব্যাকার' প্রভৃতি শব্দ ইহার সমগোত্রীয়। বি – আ + :
ধাতুর উত্তর করণে ল্যুট্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন 'ব্যাকরণ' শব্দের অ
দাঁড়ায় বিশ্লেষণের 'হাতিয়ার' বা শাস্ত্র। কিসের বিশ্লেষণ? শব্দের
উদ্দেশ্য? শব্দের সাধুত্ব নির্ণয়। যে সকল শব্দ ব্যাকরণের নিয়মে
নিজেদের উপাদানগত প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির পরিচয় দিতে সমর্থ, তাহারা
সাধু, অন্যেরা অসাধু। তাই 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে (১।১৪২) ভর্তৃহরি
উক্তি : 'সাধুত্বজ্ঞানবিষয়া সৈষা ব্যাকরণস্মৃতিঃ।' শাস্ত্রীয় শাসনের পরি
প্রেক্ষিতে ব্যাকরণের অন্য নাম 'শব্দানুশাসন'। খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে
পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্য আরম্ভ করিয়াছেন 'অথ শব্দানুশাসনম্
বলিয়া। অনেকের মতে ইহা পাণিনিব্যাকরণের ১ম সূত্র ছিল,[৫] আবা
কাহারও মতে ব্যাড়ি-রচিত 'সংগ্রহে'র প্রারম্ভে ইহার উল্লেখ ছিল।

সংস্কৃত ব্যাকরণের এই স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়
ইহার সহিত ইংরেজী গ্রামারের তুলনা করিলে, শেষেরটির প্রয়োগ
ক্ষেত্রই ব্যাপকতর বলিয়া প্রতিভাত হইবে। বিষয়টিকে মহামহোপাধ্যা
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উক্তির দ্বারা বিশদ করা গেল। তিনি 'অভিধান' নামক
নিবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন :

এই স্থলে বলিয়া রাখি, আমাদের ব্যাকরণ ও ইংরেজী Grammar এক জিনিস নয়। Grammar is the art of speaking and writing a language correctly. সংস্কৃত ব্যাকরণের মানে কিন্তু আর কিছু। ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেন ব্যাকরণম্।—অর্থাৎ শব্দটি শুদ্ধ করা পর্যন্তই ব্যাকরণের সীমা। ইংরেজীতে গ্রামারের মধ্যে উচ্চারণ পড়ে। উচ্চারণের জন্য সংস্কৃতে স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে—তাহার নাম শিক্ষা। গ্রামারে Etymology থাকে, ইহারই সংস্কৃত নাম ব্যাকরণ। ইংরেজীতে গ্রামারের Syntax থাকে—সংস্কৃতে Syntax-এর মোটা মোটা গোটাকতক কথা, যাহা নহিলে ব্যাকরণ চলে না, তাহাই ব্যাকরণে থাকে, বাকীটা বাদার্থশাস্ত্রে গিয়া পড়ে। ইংরেজী গ্রামারে ছন্দের উপর একটা অধ্যায় থাকে, সংস্কৃতে ছন্দঃশাস্ত্র স্বতন্ত্র। গ্রামারে figure of speech থাকে, সংস্কৃতে অলঙ্কার শাস্ত্র স্বতন্ত্র। সুতরাং গ্রামারকে শব্দশাস্ত্র বলা যাইতে পারে, সংস্কৃত ব্যাকরণ শুধু পদের আকার লইয়া।৬

ইংরেজী গ্রামারে সম্মিলিত বিষয়গুলির প্রত্যেকটির অবলম্বনে সংস্কৃতে এক একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রই গড়িয়া উঠিয়াছে—যাহা একক ভাবে ইংরেজী গ্রামারের অনুরূপ বিষয়ের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপক এবং উন্নত। ইহাদের প্রায় সব কয়টিই বৈদিক ষড়ঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের কৃপায় আরও কতকগুলি বিষয় আগাইয়া আসিয়াছে, যেমন Semantics (শব্দার্থতত্ত্ব), Phonology (ধ্বনিতত্ত্ব, ইহা শিক্ষা বেদাঙ্গের বিষয়), Morphology (রূপতত্ত্ব), Orthography (বানান), Chrestomathy (আদর্শ রচনার নমুনাসংগ্রহ) প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে Morphology-র সহিত সংস্কৃত ব্যাকরণের বেশি সাদৃশ্য, কারণ উহাতে পদের গঠন-প্রণালীর বর্ণনা থাকে।

মৌলিকতায় একমাত্র গ্রীক ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত তুলিত হইবার যোগ্য। আরবী ও হিব্রুভাষার ব্যাকরণ অনেকাংশে এই গ্রীক ব্যাকরণের নিকট ঋণী। ইংরেজী গ্রামারও তাহাই। ম্যাক্সমূলার তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে (১৮৫৯) এই বিষয়ে গ্রীক ও

হিন্দুদের কৃতিত্বের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনায় লিখিয়াছেন ঃ

> The Greeks and the Hindus started from opposite points. The Greeks began with philosophy, and endeavoured to transfer their philosophical terminology to the facts of language. The Hindus began with collecting the facts of language, and their generalisations never went beyond the external forms of speech. Thus the Hindus excel in accuracy, the Greeks in grasp. The grammar of the former has ended in a colossal pedantry ;[৭] that of the latter still invigorates the mind of every rising generation throughout the civilised world.

এই সম্বন্ধে প্রায় একশত বৎসরের পরবর্তী আর একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের অভিমত ঃ

> Unlike the linguistic investigations of the Indians, which were mainly analytic, those of the Greeks were very largely speculative and philosophical in character.— Louis H. Gray ('Foundations of Language,' 1950, pp. 422-23).

এই গ্রন্থেরই অন্যত্র (পৃঃ ২৩) তিনি দুই রকমের গ্রামারের কথা লিখিয়াছেন ঃ

> Study of Language may be either synchronic or diachronic. Synchronic grammar deals with a language at a given period in its development ; diachronic grammar traces the evolution of a language throughout its history.

ইহাদের সহিত আবার তৃতীয় আর এক ধরনের বিভিন্ন-ভাষার তুলনামূলক গ্রামার (comparative grammar) যোগ করা যায়! সে যাহাই হউক, প্রথম দুইটিকে অল্প কথায় সাময়িক এবং ঐতিহাসিক গ্রামার বলিতে পারি। একটিতে কোন ভাষার প্রচলিত অবস্থার এবং

অপরটিতে ভাষার দীর্ঘকালের ক্রমবিবর্তনের বর্ণনা থাকে। বলা বাহুল্য, ইহা মুখ্যতঃ ভাষাবিজ্ঞানমূলক। ইংরেজী গ্রামার প্রথমটির উৎকৃষ্ট উদাহরণ হইলেও তাহাকে দ্বিতীয় ধরনের গ্রামার বলা যায় না। সংস্কৃত ব্যাকরণে বিশেষতঃ পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলি-লক্ষিত ত্রিমুনি-ব্যাকরণে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র পাওয়া যায়। যাস্কের নিরুক্তেও ইহার কথঞ্চিৎ আভাস মিলে। 'কিঞ্চিৎ' ও 'কথঞ্চিৎ' বলার কারণ এই যে, এই ব্যাপারে তাঁহাদের কোন সচেতন ব্যাপক চেষ্টা ছিল বলিয়া মনে হয় না। শব্দের বিভিন্ন অর্থ এবং যুগভেদে সেই অর্থের পরিবর্তন লইয়া তাঁহারা যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়াছিলেন, শব্দের রূপগত পরিবর্তনের বিষয়ে সেই রূপ প্রায় কিছুই করেন নাই। বিভিন্ন শব্দ ভাষা-দেহে বিভিন্ন সময়ে কোন্ কোন্ ভিন্নরূপে বর্তমান ছিল, কি কারণে কিভাবে এবং কোন্ ধারায় বা খাতে রূপগত সেই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, এবং লোকব্যবহারে প্রাপ্ত শব্দরাশির কোন্ দিকেই বা পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষণীয় হইয়া উঠিতেছিল এবং সেই ক্ষেত্রে অন্য ভাষার কোনো প্রভাব ছিল কি না এবং থাকিলে তাহা কিভাবে কাজ করিয়াছিল, পূর্বোক্ত অর্থপরিবর্তনের মূলেই বা অন্য কোনো ভাষার সদৃশ শব্দের প্রভাব ছিল কিনা—ইত্যাদি বিষয়ে ভারতীয় বৈয়াকরণগণ কোনো উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, এইগুলি শাব্দিক বিবর্তনের কয়েকটি দিক্ মাত্র। যে ব্যাকরণে ভাষার এই ধরনের বিবর্তন পর্যালোচনাপূর্বক উহার বর্তমান অবস্থার বর্ণনা ও তৎসহ উহার ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য প্রবণতার দিকেও ইঙ্গিত থাকে—অর্থাৎ যাহাতে ভাষার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রৈকালিক গতিপ্রকৃতির কথা থাকে, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ। পৃথিবীর কোনো ভাষার এই জাতীয় সর্বাবয়ব-শোভন কোনো ব্যাকরণ একাধারে রচিত হইয়াছে কিনা আমাদের জানা নাই।

এই বিবর্তনমূলক শাব্দীভাবনায় ভারতীয় প্রাচীন বৈয়াকরণদের যে দীনতার কথা বলা হইল, তাহার মূলে রহিয়াছে বৈদিক ও সংস্কৃত শব্দের রূপগত চিরস্থায়িত্বের সংস্কার। শিষ্ট বা সাধু শব্দের বাহ্যিক আকৃতিকে শাশ্বত বলিয়া ধরিয়া লওয়ায়, ইহার বৈলক্ষণ্যকে তাঁহারা

অপশব্দ[৮] ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতেই পারেন নাই। অপশব্দকে ম্লেচ্ছ[৯] বলিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। শব্দের ঐ তথাকথিত বিশুদ্ধ রূপটিকে চিরস্থায়ী ধরিয়াই তাঁহারা উহার উপাদানগত প্রকৃতি-প্রত্যয়ের কল্পনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং যেসব স্থলে ঐ ব্যুৎপত্তি-কল্পনা যথেষ্ট বিবেচিত হয় নাই, সেই সব স্থলে 'উণাদয়োঽব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকানি,'[১০] 'নিপাতনাৎ সিদ্ধম্,'[১১] 'পৃষোদরাদিত্বাৎ'[১২] প্রভৃতি কৌশলের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (২।১০) লিঙ্গ-বচন-কাল এবং কারকের 'অন্যথা' প্রয়োগকেও অপশব্দ বলা হইয়াছে।[১৩] 'অন্যথা' অর্থে এখানে ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ বুঝিতে হইবে। মহাভাষ্যেই অপশব্দভীতি সর্বাধিক প্রকটিত।[১৩ক] বাক্যপদীয়ের (১।১৫৬) ব্যাখ্যায় ভর্তৃহরি বলেন ঃ 'শ্রূয়তে হি পুরাকল্পে স্বশরীরজ্যোতিষাম্মনুষ্যাণাং যথৈবানৃতাদিভিরসঙ্কীর্ণা বাগাসীদেবং সর্বৈরপভ্রংশৈঃ।' –অর্থাৎ এইরূপ শুনা যায় যে, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণদের ভাষা যেমন সর্বপ্রকারের অপবিত্রতা হইতে, তেমন অপভ্রংশাদি হইতেও মুক্ত ছিল।

এই অবস্থায় প্রাচীন ভারতের রক্ষণশীল বৈয়াকরণদের নিকট শাব্দিক বিবর্তন ও তুলনামূলক ভাষা-তথা ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের কল্পনা আকাশ-কুসুমের মতোই অবাস্তব ছিল। অধ্যাপক তারাপুরেওয়ালা তাঁহার 'Elements of the Science of Language' (3rd edn. Cal. 1962) গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, তুলনামূলক ব্যাকরণতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচুর সুযোগ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও পাণিনি ও অন্য সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ তাহার সদ্‌ব্যবহারে পরাঙ্মুখ ছিলেন।[১৪]

কুমারিলভট্ট (খ্রীঃ ৭ম/৮ম শতক) অবশ্য স্পষ্টতঃই স্বীকার করিয়াছেন যে আর্যগণও ম্লেচ্ছ ভাষা হইতে কতক কতক শব্দ আবশ্যক-পরিবর্তনাদি সহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১৫] এইরূপ উদার দৃষ্টি বিরল। বাক্যপদীয়ের (১।১৫৫) টীকায় উদ্ধৃত 'শব্দপ্রকৃতিরপভ্রংশঃ' উক্তিটি এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। সেখানে ইহাকে সংগ্রহকার ব্যাড়ির মত বলা হইয়াছে।

ব্যাকরণ-রচনার ক্রমোন্নতি

মহাভাষ্যকারের পূর্বে কৌটিল্য, তৎপূর্বে কাত্যায়ন ও পাণিনি। ইঁহাদের শেষোক্ত জন তাঁহার সময়ে প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতেই আরোহ প্রণালীতে (Inductive method) স্বীয় ব্যাকরণ রচনা করিতে বসিয়া কতকগুলি বিকল্পস্থলে জনকয়েক পূর্বসূরীর মত উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন। এইসব স্থলে সন্ধিকার্য, দ্বিত্ব, স্বর ও গুণ প্রভৃতি বিষয়ে পূর্বাচার্যদের সহিত তাঁহার মতভেদ। এই উপলক্ষ্যে তিনি যে দশজন প্রাচীন আচার্যের নাম করিয়াছেন তাঁহাদের রচিত মূল ব্যাকরণ গ্রন্থাদি বর্তমানে না পাওয়া গেলেও পরবর্তী গ্রন্থাদিতে তাঁহাদের কৃতিত্বের যে আভাস পাওয়া যায় তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহারাও পূর্বোক্ত শাব্দী ভাবনায় তেমন উৎসাহী ছিলেন না। শাকটায়ন ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী গার্গ্য এই বিষয়ে কতকটা সচেতন থাকিলেও থাকিতে পারেন, যদিও তাঁহাদের গ্রন্থাদির বেশির ভাগই পাণিনির প্রভাবে অবলুপ্ত। সামপ্রাতিশাখ্য 'ঋক্তন্ত্র' এবং কতকগুলি উণাদি সূত্র এখনও শাকটায়নের নামে টিকিয়া আছে।

উণাদি সূত্রপাঠ—উণ্-আদি প্রত্যয়ান্ত বায়ু প্রভৃতি কতকগুলি রূঢ় শব্দের তালিকামাত্র। এইসব শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মের অধীনে আনা সম্ভব হয় নাই বলিয়াই ইহাদিগকে 'অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক' বলা হয়। 'নিরুক্ত' নামে যাস্ক-প্রণীত যে গ্রন্থ বর্তমান, তাহা প্রকৃত পক্ষে 'নিঘণ্টু' নামক এক অতিশয় প্রাচীন বৈদিক শব্দকোষের ব্যাখ্যা। বর্তমানে না পাওয়া গেলেও, তৎপূর্বে আরও একাধিক নিঘণ্টু, এমনকি নিরুক্তেরও অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে এমনও বোধ হয় যে, পাণিনির পূর্ববর্তী অধিকাংশ ব্যাকরণই ছিল অনেকাংশে শব্দতালিকার আশ্রয়ে রচিত। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত হইতে সংগৃহীত হইয়া একটা মোটামুটি সাধারণ শব্দকোষ-জাতীয় বস্তু বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল—যাহার ব্যাখ্যা হইতে ক্রমে নিরুক্ত ও ব্যাকরণের উৎপত্তি। শব্দের ব্যুৎপত্তি-মূলক বা ব্যুৎপত্তি-প্রধান ব্যাখ্যা হইতে ব্যাকরণের এবং শব্দের অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কিরূপে সেই অর্থে পৌঁছানো যায় তাহার ভাবনা

হইতে নিরুক্তের ক্রমবিকাশ। প্রয়োজন-বোধে ঐ তালিকার বৈদিক ও সংস্কৃত শব্দসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া লওয়া খুব কঠিন ব্যাপার ছিল না। আহৃত শব্দসমূহের বৈদিক ও লৌকিক ভেদের উপর নির্ভর করিত উক্ত ব্যাখ্যার বৈদিক ও লৌকিক প্রসিদ্ধি। বর্তমানে প্রাপ্ত নিঘণ্টুতে লৌকিক শব্দের সংখ্যা অবশ্য খুবই কম। সে যাহাই হউক, শব্দাভিধান-চর্চা (Lexicography) এবং ব্যাকরণ-চর্চা প্রথমেই দুই পৃথক্ খাত অবলম্বন করে নাই, শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং নিরুক্তি পাশাপাশি সম্পাদিত বা উপদিষ্ট হইত। মহাভাষ্যের একাধিক স্থলে এই ব্যবস্থার সমর্থন-সূচক উদাহরণ আছে, যেমন (পস্পশাহ্নিকে) ঃ

> অথৈতস্মিন্ শব্দোপদেশে সতি কিং শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ কর্তব্যঃ। গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তী শকুনির্মৃগো ব্রাহ্মণ ইত্যেবমাদয়ঃ শব্দাঃ পঠিতব্যাঃ। নেত্যাহ। অনভ্যুপায় এষ শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ।

ইহার পরেই এই প্রতিপদপাঠের অবলম্বনে শব্দজ্ঞানলাভের অসুবিধা দেখাইতে যে কিংবদন্তী উদাহৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, দেবগুরু বৃহস্পতি এই উপায়ে দিব্য সহস্র বর্ষের চেষ্টাতেও দেবরাজ ইন্দ্রকে শব্দবিদ্যার শিক্ষাদান সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই ঃ

> বৃহস্পতিশ্চ প্রবক্তা, ইন্দ্রশ্চাধ্যেতা, দিব্যং বর্ষসহস্রমধ্যয়নকালো ন চান্তং জগাম। কিং পুনরদ্যত্বে।

প্রতিপদপাঠের প্রাচীন রীতির অনুসরণকারী ছাত্রকে বলা হইত 'প্রাতিকণ্ঠিক' (প্রতিকণ্ঠ হইতে, দ্রঃ পা. সূত্র ৪।৪।৪০)। লক্ষ্য (= শব্দ) এবং লক্ষণ (= সূত্র) অধ্যয়নে রত ছাত্রদিগকে বলা হইত যথাক্রমে লাক্ষ্যিক এবং লাক্ষণিক (মহাভাষ্য ৪।২।৬০)। এই সবের নির্গলিতার্থ এই যে, এক একটি করিয়া পদ লইয়া 'গৌঃ, অশ্বঃ, পুরুষঃ, হস্তী, শকুনিঃ, মৃগঃ, ব্রাহ্মণঃ' ইত্যাদি ক্রমে প্রতিপদপাঠের যে রীতি, তাহা শব্দজ্ঞানলাভের পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়, কারণ এই উপায়ে বৃহস্পতির মতো প্রবক্তা ইন্দ্রের মতো ছাত্র পাইয়াও দিব্য সহস্র বর্ষের চেষ্টাতেও যখন তাঁহাকে শব্দোপদেশদান শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তখন এই যুগে আমাদের মতো স্বল্পায়ুঃ মানবের

পক্ষে সেই উপায় অবলম্বন করার কথাই উঠিতে পারে না। মহাভাষ্যকার আরও বলিয়াছেন ঃ 'ন হি পাণিনিনা শব্দাঃ প্রোক্তাঃ। কিং তর্হি। সূত্রম্।' অর্থাৎ পাণিনি কর্তৃক শব্দাবলী কথিত হয় নাই, হইয়াছে (তৎপরিবর্তে) সূত্র। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা হয় যে পাণিনিই হয়তো সর্বপ্রথম অবিমিশ্র সূত্রাত্মক ব্যাকরণ রচনা করেন ; তৎপূর্বে ব্যাকরণে সূত্রপাঠ এবং প্রতিপদপাঠ উভয়েরই মিশ্রণ বা সমাবেশ ছিল। অষ্টাধ্যায়ীর ৩।২।২৩ নং সূত্রে পাণিনি শব্দকার, সূত্রকার, পদকার প্রভৃতির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন। এখানে পদকার অর্থে পদপাঠকার। শাকল্য, গার্গ্য এবং আত্রেয় যথাক্রমে ঋক্, সাম ও তৈত্তিরীয় সংহিতার পদপাঠ প্রস্তুত করেন। বাজসনেয়ি-সংহিতার পদপাঠ-রচয়িতা বররুচি কাত্যায়ন অবশ্য পাণিনির পরবর্তী। অনেকের মতে এইসব পদপাঠ হইতেই ব্যাকরণবিদ্যার সূচনা।

এই ধারায় ব্যাকরণ-চর্চার যে ক্রমোন্নতি তাহার যাবতীয় সুফলের সমন্বয়ে পাণিনির ব্যাকরণ রচিত। অদ্বিতীয় প্রতিভার চির-নূতন এই অবদানে উত্তরাধিকারসূত্রে আগত পূর্বতন বৈশিষ্ট্যের কিছু বাহ্যিক চিহ্নও লক্ষণীয় হইয়া আছে, যেমন ঃ (১) একাধারে বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের (২) পদাশ্রয়ী ব্যাকরণচর্চা এবং (৩) ভাষা-শিক্ষার অনুপযোগী বিষয়-বিন্যাস।[১৬] ইহাদের প্রথম ও তৃতীয়টি পরে আর কোনো[১৭] ব্যাকরণে অনুসৃত হয় নাই। ব্যাকরণ অর্থে মুখ্যতঃ পদের বিশ্লেষণ বুঝাইলেও, অবরোহ প্রণালীতে (deductive method) ইহার দ্বারা ভাষাকে বাক্যে, বাক্যকে পদে এবং পদকে বর্ণে বিভাগ বুঝাইতেও বাধা নাই। আধুনিক ভাষাসমূহের ব্যাকরণ মোটামুটি এই প্রণালীতেই আরম্ভ করা হইলেও বাক্যগঠন তথা ভাষা শিক্ষা দেওয়াই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাচীন ব্যাকরণ-ঘটিত পদের প্রাধান্য, আধুনিক ব্যাকরণে বাক্যে স্থানান্তরিত। বর্ণমালা পাঠের মধ্য দিয়া যে বাল্য শিক্ষার সূচনা তাহাও ক্রমে বর্ণ, অক্ষর (syllable)—পদ হইয়া পরিশেষে বাক্যে আসিয়া পৌঁছে। ব্যাকরণ-দর্শনে আসিয়া স্ফোটতত্ত্বের সমীক্ষাতেও আমরা ক্রমান্বয়ে বর্ণ-, পদ- এবং বাক্য-স্ফোটের সাক্ষাৎ লাভ করি।

ব্যাকরণের প্রয়োজন ও পরিণাম

বাক্যের যে বিস্তৃত আলোচনা অন্য শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়, পাণিনি-তন্ত্রে তাহা একেবারেই অনুপস্থিত। পরবর্তী বৈয়াকরণগণ কিন্তু এই বিষয়ে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাকরণে বাক্যগঠনের অনুকূল বিষয়-বিন্যাসই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রণালী অপরিহার্য। পাণিনির ব্যাকরণ-রচনার উদ্দেশ্য সংস্কৃতভাষা শিক্ষা দেওয়া নয়,[১৮] তাহা রক্ষা করা। ভাষার প্রধান উপাদান যে শব্দ বা পদ তাহার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য বিধান-রচনাই ছিল অন্ততঃ প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যাকরণের প্রধান উদ্দেশ্য[১৯]—যাহা পাণিনির সময় পর্যন্ত এবং তাহার কিছু পরেও অব্যাহত ছিল। মহাভাষ্যে উদ্ধৃত কাত্যায়নের দুইটি বার্ত্তিক এইরূপ ঃ (১) 'লক্ষ্যলক্ষণে ব্যাকরণম্' এবং (২) 'রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্।' প্রথমটির অর্থ—লক্ষ্য ও লক্ষণ লইয়া ব্যাকরণ। লক্ষ্য = শব্দ, লক্ষণ = সূত্র (Aphorism)। শব্দ ও তদ্বিষয়ক যে সূত্র, এই দুই-এর সমবায়ে ব্যাকরণ-রচনা। ইহারই আদর্শে পরে আরও যেসব বচনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের মধ্যে আছে—'লক্ষ্যমূলং হি লক্ষণম্', 'লক্ষ্যপর-তন্ত্রত্বাল্লক্ষণস্য'—কৈয়ট (ভাষ্যপ্রদীপ ৫।১।৮০), 'প্রয়োগ-শরণা বৈয়াকরণাঃ' প্রভৃতি। এই সব স্থলেই লক্ষণকে লক্ষ্যের বা ব্যাকরণকে প্রয়োগের অনুবর্তী বা অধীন বলা হইয়াছে।

পূর্বোক্ত দ্বিতীয় বার্ত্তিকটির আদর্শে একটি শ্লোক প্রচলিত আছে ঃ

> বেদরক্ষা তদূহশ্চ ভেদসন্দেহবারণম্।
> ফলং ব্যাকরণস্যাহুঃ শব্দজ্ঞানঞ্চ লাঘবম্।।

বার্ত্তিকের 'আগম' এই শ্লোকে অনুপস্থিত, শ্লোকের 'শব্দজ্ঞান' বার্ত্তিকে অনুল্লিখিত। সে যাহাই হউক, ইহা হইতে ব্যাকরণের প্রয়োজন বা উপযোগিতা অধিকতর বিস্তৃতভাবে জানা গেল। মহাভাষ্যে এই প্রসঙ্গে সব মিলাইয়া ১৮টি প্রয়োজনের উল্লেখ করা হইয়াছে।[২০] পূর্বোক্ত 'রক্ষা' = 'বেদরক্ষা', 'ঊহ' = 'অনন্বিত বিভক্তি-লিঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া অন্বয়যোগ্য বিভক্ত্যাদির কল্পনা' (-বিশ্বকোষ), 'আগম' = আর্ষ অনুশাসন,

যেমন—'ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ' (-মহাভাষ্য) অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে কারণ বা প্রয়োজনের অনুসন্ধান না করিয়াই (অথবা কারণরহিত) ধর্মমূলক সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিতে এবং জানিতে হইবে।—এই আগমের প্রয়োজনে অর্থাৎ আগম-বাক্যরূপ আদেশ পালনের জন্য ব্যাকরণ অধ্যেয়, 'লঘু' = সংক্ষিপ্ত এবং গূঢ়ার্থ সূত্ররচনার দ্বারা অনন্ত শব্দবিদ্যাকে অল্পায়াস-সাধ্য করা,[২১] 'অসন্দেহ' = 'ভেদসন্দেহবারণ' এবং 'শব্দজ্ঞান' = শব্দের শুদ্ধ্যশুদ্ধিজ্ঞান বা ব্যুৎপত্তিজ্ঞান অর্থাৎ শুদ্ধ বা সাধু শব্দের জ্ঞান।

'বেদরক্ষা' অর্থাৎ বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যের বিশুদ্ধি রক্ষা। ইহাকে 'বেদপরিপালন'ও বলা হইত। আর্য জাতির প্রসার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে স্থানীয় অবৈদিক তথা অনার্যগোষ্ঠীসমূহের প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হয়। ইহাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অবশ্যম্ভাবী প্রভাব এড়াইবার জন্য বেদের রক্ষাকবচ রূপে ষড়্‌বেদাঙ্গের সূচনা—যাহাদের অন্যতমরূপে ব্যাকরণের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভাষা হইতে ম্লেচ্ছ বা অপশব্দগুলিকে চিহ্নিত করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করাই ছিল ব্যাকরণের কাজ। ঋগ্‌বেদে (১০।৭১।২) চালনীর দ্বারা ছাতু ছাঁকিয়া পরিষ্কার করার মতো ভাষাকেও পরিষ্কার করিবার কথা আছে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাকরণের অন্বর্থ বা সার্থক নাম হয় 'শব্দানুশাসন'। ব্যাকরণের নিকষ পাথরে যে শব্দের বিশুদ্ধি পরীক্ষিত, তাহাই সংস্কৃত বা ব্যুৎপন্ন শব্দ। বিমিশ্র শব্দমণ্ডলীতে সে-ই কুলীন বা পাঙ্‌ক্তেয়। এই অবস্থারই নামান্তর শব্দকৌলীন্য।

কেবল 'পদ' শব্দও স্থলবিশেষে ব্যাকরণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত।[২২] 'বাক্য' বলিতে বুঝাইত মীমাংসাশাস্ত্র। তাই 'পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞ' ব্যক্তিই কেবল শাস্ত্রের বক্তা বা ব্যাখ্যাতা হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইতেন। প্রমাণ = ন্যায়। ব্যাকরণ, মীমাংসা ও ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান সম্বল করিয়া অন্য যে কোনো সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করা ছিল সহজসাধ্য।

পূর্বমীমাংসায় জৈমিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম বাক্যের সুষ্ঠু বর্ণনা দেন ঃ 'অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষং চেদ্ বিভাগে স্যাৎ' (২।১।৪৬)।

ইহার শাবরভাষ্য এবং ভাট্টদীপিকা টীকা পর্যালোচনা করিয়া বলা যায়, বিভিন্ন পদের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ থাকিলেও তাহাদের সমন্বয়ে যখন একটি প্রয়োজনীয় বিশেষ অর্থ উৎপন্ন হয়, তখন সেই সমবেত পদসমূহকেই বাক্য বলা উচিত। এক কথায় অর্থই বাক্যের নিয়ন্তা বা নিয়ামক। কাত্যায়নকৃত শ্রৌতসূত্রের প্রথমে পরিভাষাধ্যায়ের 'তেষাং বাক্যং নিরাকাঙ্ক্ষম্' (৪৬) সূত্রটির কর্কভাষ্যে বড় সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে ঃ 'যাবতি পদসমূহে উচ্চরিতে পদান্তরাকাঙ্ক্ষা ন ভবতি তাবদেকং বাক্যং নৈরুৎসুক্যাৎ'।—অর্থাৎ এক একটি করিয়া পদসমূহ উচ্চরিত (বা উচ্চারিত) হওয়ার পর যখন আর অন্য পদ উচ্চারণের ইচ্ছা থাকে না, তখনকার সেই পর্যন্ত উচ্চারিত পদসমূহই একটি বাক্য। এখানে অর্থের কথা প্রকাশ্যে বলা না হইলেও উহার সমাপ্তিতেই যে অন্য পদ উচ্চারণের ইচ্ছা রহিত হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। অর্থশাস্ত্রে পরিষ্কারই বলা হইয়াছে ঃ 'পদসমূহো বাক্যমর্থপরিসমাপ্তৌ' (২।১০)।

ব্যাকরণে এই অর্থের দিক্টা গৌণ,[২৩] মুখ্য সেখানে পদের ব্যুৎপত্তি বা গঠন-বিচারণা। তাই বৈয়াকরণগণ প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থপ্রধান বাক্যের বিবেচনা অন্য শাস্ত্রের বিষয়ীভূত বলিয়াই সম্ভবতঃ অপ্রয়োজনবোধে এ দিকে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। পদের অনুধ্যানেই তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে। শৌনকীয় 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে পদের প্রাধান্যজ্ঞাপক এই শ্লোকটির সাক্ষাৎ পাই ঃ

অর্থাৎ পদং স্বাভিধেয়ং পদাদ্ বাক্যার্থনির্ণয়ঃ।
পদসঙ্ঘাতজং বাক্যং বর্ণসঙ্ঘাতজং পদম্।। ২।১১৭

শ্লোকোক্ত 'অর্থাৎ পদম্' কথাটি, প্রাচীন ঐন্দ্র ব্যাকরণের 'অর্থঃ পদম্' সূত্রের স্মারক। 'কুট্টনীমতে' (১২) বৈয়াকরণকে বলা হইয়াছে 'পদবেদী' ('পদবেদিষু যত্র ধাতুবাদিত্বম্')। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে (৩৬।৪৯) যে 'সসূত্রবৃত্ত্যর্থপদং...' ইত্যাদি বর্ণনা আছে, তদন্তর্গত 'অর্থপদ' শব্দটি টীকাকারের মতে পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিকবোধক ঃ 'অর্থপদং সূত্রার্থ-বোধক-পদবদ্ বার্ত্তিকম্' (-'রামায়ণতিলক' টীকা)।[২৪]

পাণিনি বাক্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নাই। বৈয়াকরণদের মধ্যে বার্ত্তিককার কাত্যায়নই বোধহয় প্রথমে বাক্যের ব্যাখ্যা দিলেন (যাহা

পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাকরণগন্ধী) ঃ (১) 'আখ্যাতং সাব্যয়কারকবিশেষণং বাক্যম্' এবং 'একতিঙ্' (পা. ২।১।১-৯, ১০)। আখ্যাত মানে ক্রিয়াপদ। দ্বিতীয়টির মহাভাষ্যোক্ত উদাহরণ 'ব্রূহি ব্রূহি'। এখানে 'এক' মানে অভিন্ন (Identical)। পদের পাণিনিকৃত ব্যাখ্যা ঃ 'সুপ্‌তিঙন্তং পদম্' (১।৪।১৪)। এইসবের পরিপ্রেক্ষিতে অমর সিংহ লিখিলেন ঃ 'তিঙ্‌সুবন্তচয়ো বাক্যং ক্রিয়া বা কারকান্বিতা' (অমরকোষ ১।৬।২)। ভর্তৃহরি ন্যায়বাদীদের আটরকম বাক্যের কথা লিখিয়াছেন ঃ

আখ্যাতশব্দঃ সঙ্ঘাতো জাতিঃ সঙ্ঘাতবর্তিনী।
একোঽনবয়বঃ শব্দঃ ক্রমো বুদ্ধ্যনুসংহৃতিঃ।।
পদমাদ্যং পৃথক্ সর্বপদং সাকাঙ্ক্ষমিত্যপি।
বাক্যং প্রতি মতির্ভিন্না বহুধা ন্যায়বাদিনাম্।।

—বাক্যপদীয় ২।১–২

(১) আখ্যাতশব্দ, (২) সঙ্ঘাত (পদসমষ্টি), (৩) সঙ্ঘাতবর্তিনী জাতি (a class pertaining to a combination), (৪) এক অনবয়ব শব্দ (a sentence is one without any parts), (৫) ক্রম (a kind of order or succession), (৬) বুদ্ধ্যনুসংহৃতি (an intellectual assimilation), (৭) পদমাদ্যম্—আদ্যপদ (the first inflected word) এবং (৮) সাকাঙ্ক্ষ সর্বপদ। আখ্যাতপক্ষে ক্রিয়া বাক্যার্থ, সঙ্ঘাতপক্ষে এবং ক্রমপক্ষে সংসর্গ বাক্যার্থ (-পুণ্যরাজ)। এক অনবয়ব শব্দ বলিতে স্ফোটবাদীদের 'নিরংশ বাক্য' বুঝিতে হইবে।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাক্যজ্ঞানই মুখ্য। তাই ব্যাকরণ ক্রমে যত বেশি সংস্কৃত শিক্ষার দিকে ঝুঁকিতে লাগিল, বাক্যের বিবিধ আঙ্গিকের বা উপাদানগত বৈচিত্র্যের প্রতি বৈয়াকরণিক অভিজ্ঞতা তত বেশি কেন্দ্রীভূত হইতে থাকিল। তাই পাণিনির পরে অদ্যাবধি যত সংস্কৃত[২৪ক] ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে, তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য—সহজতম উপায়ে সমগ্র ব্যাকরণ-প্রক্রিয়াকে বক্তার অভিপ্রায়-প্রকাশের উপযোগী বাক্যগঠনের সহায়ক করিয়া তোলা। ব্যাকরণের বিশ্লেষণী রীতি-পদ্ধতির এই সংশ্লেষণী ধারার অনুধাবন, সংস্কৃত ব্যাকরণ-চিন্তার

ইতিহাসে এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ভাষা-রক্ষায় যাহার সূচনা ভাষা-শিক্ষায় তাহার পরিসমাপ্তি। পদের সুপ্রাচীন প্রাধান্য বাকে স্থানান্তরিত। কেবল তাহাই নয়, দার্শনিক দৃষ্টির অনুগ্রহে, বর্ণ ও পদের নশ্বরতা প্রতিপাদনের পর বাক্যার্থের মহিমাশ্রয়ী বাক্যস্ফোটের কল্পনায় পৌঁছিয়া এবং ইহার সাধনায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যাকরণের মোক্ষলাভ ঃ

বাক্যস্ফোটোঽতিনিষ্কর্ষেতিষ্ঠতীতি মতস্থিতিঃ।। ২৫

—বৈয়াকরণভূষণ ৫৯

---

১ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে এই সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। তাঁহাদেরই একজনের মতে ঃ 'From the Vedic language are descended the popular dialects called Prakrit.' —Macdonell ('A Sans. Gr. for Students')

২ 'Elements of the Science of Language', 3rd edn., Calcutta, 1962 (p 44 এবং Introduction, p. 8) by Irach Jehangir Sorabji Taraporewala (1888-1956).

\+ তুলনীয়—'Language is social, not individual ; ...it starts with the sentence, not with the word ; it is the expression of thought ; '—A. H. Sayce, Preface to The Principles of Comparative Philology. London, 1874.

* রামমোহন রায় তাঁহার 'Bengalee Grammar in the English Language' (Cal. 1826)-এর প্রথমে কী সুন্দর ভাবেই না এই কথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ 'Grammar (ব্যাকরণ) explains the principles on which conventional sounds or marks are composed and arranged to express thoughts.'

৩ ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য ঃ 'বেদানাং ভারতপঞ্চমানাং বেদং ব্যাকরণমিত্যর্থঃ ব্যাকরণেন হি পদাদিবিভাগশ ঋগ্‌বেদাদয়ো জ্ঞায়ন্তে'—ছা. উ. (৭।১।২) ভাষ্য। 'সারসিদ্ধান্ত কৌমুদী'র শেষে বরদরাজ লিখিয়াছেন ঃ 'বেদবেদপ্রবেশায় সার-সিদ্ধান্তকৌমুদী'। এখানে 'বেদবেদ' = ব্যাকরণ।

৪ মহাভাগবতপুরাণেও অনুরূপ উক্তি আছে (বেদপক্ষে) ঃ

স্বয়ম্ভুরেষ ভগবান্ বেদোগীতঃ সনাতনঃ।
শিবাদ্যা ঋষিপর্যন্তাঃ স্মর্তারোঽস্য ন কারকাঃ।।

৪ক '...ব্যাকরণভেদেন উপায়া অনিয়তাঃ।'—নাগেশ ভট্ট। উপায়ে মতভেদ থাকিলেও উপেয়তে ভেদ হয় না। প্রাক্‌পাণিনীয় আচার্য নেদ্ ধাতু থেকে 'নেদিষ্ট' শব্দের সিদ্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু পাণিনিমতে 'অন্তিক' শব্দ থেকে নেদ আদেশপূর্বক নেদিষ্ট শব্দ সিদ্ধ। পাণিনির মতে হন্ ধাতুর উত্তর যৎপ্রত্যয় করিয়া 'বধ্য', অন্যমতে 'বধমর্হতি' অর্থে বধ শব্দের পর তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে বধ্য হয়। আসলে, পদটি সত্য, কিন্তু ঐ শব্দে পৌঁছিবার ব্যাকরণগত পথ বা উপায়গুলি কাল্পনিক।

৫ মনুস্মৃতির (১।১) ব্যাখ্যাতা মেধাতিথি : 'তথা হি ভগবান্ পাণিনিরনুদ্দেশ প্রয়োজনম্ "অথশব্দানুশাসনম্" ইতি সূত্রসন্দর্ভমারভতে'। 'ভাষাবৃত্তি'র টীকাকার সৃষ্টিধরাচার্যের উক্তি : 'ব্যাকরণশাস্ত্রমারভমাণো ভগবান্ পাণিনিমুনিঃ প্রয়োজননামনী ব্যাচিখ্যাসুঃ প্রতিজানীতে—অথশব্দানুশাসনমিতি।'—ভাষাবৃত্ত্যর্থবিবৃতির প্রথমে। দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩) তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীভাষ্যে ইহাকে পাণিনির প্রথম সূত্র বলিয়াছেন :

> ইদং সূত্রং পাণিনীয়মেব। প্রাচীনলিখিত-পুস্তকেষু আদাবিদমেবাস্তি। দৃশ্যন্তে চ সর্বেষ্বার্ষেষু গ্রন্থেষ্বাদৌ প্রতিজ্ঞাসূত্রাণীদৃশানি।

তবে মহাভাষ্যকারের 'মঙ্গলার্থং বৃদ্ধিশব্দমাদিতঃ প্রযুঙ্‌ক্তে' এই বাক্যের উপর ভিত্তি করিয়া কৈয়টাচার্য কিন্তু 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রকেই অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম সূত্র বলিয়াছেন।

৬ 'হরপ্রসাদ রচনাবলী', ২য় সম্ভার, পৃঃ ২৩১

৭ ব্যাকরণ-দর্শনে শব্দাদ্বৈতবাদী ভর্তৃহরির শব্দব্রহ্মবাদ বা স্ফোটবাদের কথা স্মরণ করিয়া আমরা অধ্যাপকের এই অভিমত মানিয়া লইতে পারি না। ভট্টোজি দীক্ষিতের মতে ভর্তৃহরি যে শব্দবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসঙ্গতঃ (শব্দপক্ষে) অদ্বৈত ব্রহ্মের বিবর্তনাদির ব্যুৎপাদন দেখাইয়াছেন তাহা সামান্য কড়ি খুঁজিতে গিয়া অমূল্য রত্ন প্রাপ্তিবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ('...বরাটিকান্বেষণায় প্রবৃত্তশ্চিন্তামণিং লব্ধবানিতি...'—শব্দকৌস্তুভ)। প্রভাকরের 'বৃহতী'র টীকা 'পঞ্চিকা'তে শালিকনাথ :

> এক এবায়ং শব্দো বহুধা প্রকৃতিপ্রত্যয়-বিভাগেন বিকল্প্য অবিদ্যমানভেদ এবারোপিতভেদঃ লোকে বেদে চ প্রতীয়ত ইতি ব্রহ্মবিদো বেদবিদো বৈয়াকরণা মন্যন্তে। —পৃঃ ৩৬০।

কাজেই হিন্দুব্যাকরণ অতিমাত্রায় অসার পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনে নিঃশেষিত হইয়াছে—অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের এই অভিযোগ সত্য নয়।

৮ 'কালদুষ্টা এবাপশব্দাঃ'—ভাগবৃত্তি

৯ 'ম্লেচ্ছো হবা এষ যদপশব্দঃ'—মহাভাষ্য

১০ ইহা কাত্যায়নের একটি বার্তিক। মহাভাষ্যের একাধিক স্থলে (৩।৪।৭৭, ৭।১।২,...) ইহার উল্লেখ আছে। মহাভাষ্যপ্রদীপে (৪।১।৭) বলা হইয়াছে : 'উণাদিষু নাবশ্যং ব্যুৎপত্তিনিমিত্তং কার্যং ভবতি।'

১১ 'যল্লক্ষণেনানুৎপন্নং তৎ সর্বং নিপাতনাৎ সিদ্ধম্'—এই উক্তিটি মহাভাষ্যকারের নামে প্রচলিত থাকিলেও বর্তমান মহাভাষ্যে ইহা দৃষ্ট হয় না। 'কাশিকা'বৃত্তিতে আছে : 'যদিহলক্ষণেনানুপপন্নং তৎ সর্বং নিপাতনাৎ সিদ্ধম্' (৫।১।৫৯)। মহাভাষ্যে (১।১।২৭):'অবাধকান্যেব হি নিপাতনানি ভবন্তি।'

১২ পাণিনিসূত্রঃ'পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টম্' (৬।৩।১০৯)।

১৩ 'লিঙ্গ-বচন-কাল-কারকাণামন্যথা প্রয়োগোঽপশব্দঃ'' —কৌটিল্য

১৩ক 'যো হি শব্দান্ জানাত্যপশব্দানপ্যসৌ জানাতি। যথৈব শব্দজ্ঞানে ধর্ম এবমপশব্দজ্ঞানেঽপ্যধর্মঃ। অথবা ভূয়ানধর্মঃ প্রাপ্নোতি। ভূয়াংসোঽপশব্দা অল্পীয়াংসঃ শব্দাঃ। একৈকস্য শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ।...আচারে নিয়মঃ। আচারে পুনঋষির্নিয়মং বেদয়তে।...যর্বাণস্তর্বাণো নামর্ষয়ো বভূবুঃ। ...তে তত্রভবন্তো যদ্বানস্তদ্বান ইতি

প্রযোক্তব্যে যর্বাণস্তর্বাণ ইতি প্রযুঞ্জতে যাজ্ঞে পুনঃ কর্মণি নাপভাষন্তে।'—মহাভ (পস্‌পশা)। এখানে সাধারণভাবে অশুদ্ধ (অপভ্রংশ) এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠা শুদ্ধভাষার ব্যবহার প্রমাণিত।

১৪ 'With all his great genius and his deep and intuitive grasp of t fundamentals of linguistic science, it seems a pity that Panini did r care to study more closely the speech of other people, like t Iranians and the Greeks, who spoke kindred languages. Pan: himself was a native of North-Western India (Taxila) and so he mı have come into contact with Iranians and Greeks. What is mc surprising is that when Iranians and Greeks had established their n over portions of India and when the political and cultural empire India had penetrated far beyond the limits of India, even then Sanskrit grammarian thought of investigating any foreign languaş "Not only did the Greeks look down upon the Indians as barbarian: the Indians in their turn would have as little as possible to do wi the Greeks" (Holger Pedersen, "Linguistic Studies in the Nineteer Century", p. 17). This spirit of racial pride and arrogant exclusivene was the main reason why in spite of their splendid linguistic acum our Sanskrit grammarians missed the opportunity of founding t science of Comparative Grammar'—pp. 427-28.

১৫ আর্য্যাশ্চ ম্লেচ্ছভাষাভ্যঃ কল্পয়ন্তঃ স্বকং পদম্।
পদান্তরাক্ষরোপেতং কল্পয়ন্তি কদাচন।।
ন্যূনাক্ষরং কদাচিচ্চ প্রক্ষিপন্ত্যধিকাক্ষরম্।—তন্ত্রবার্ত্তিক ১।১।৫

১৬ অষ্টাধ্যায়ীতে অনুসৃত বর্ণমালাও স্বাভাবিক বা প্রচলিত ধরনের ন প্রত্যাহারসূত্রাশ্রিত হইয়া ইহা এক কৃত্রিম ক্রম ধারণ করিয়াছে। এই প্রত্যাহ গ্রহণের দরুন অনেক সূত্র অত্যন্ত দুর্বোধ হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধি-কারক-সম প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা অষ্টাধ্যায়ীর বিভিন্নাংশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। এই: বিষয়ের কোন ধারাবাহিক ক্রম অনুসৃত বা অবলম্বিত হয় নাই। উদাহরণস্বর বলা যায়, সন্ধিপ্রকরণ ব্যাকরণের গোড়ার দিকে না দিয়া তাহা একরূপ গ্রন্থশে ৮ম অধ্যায়ে টানিয়া আনা হইয়াছে। বৃত্তি, ব্যাখ্যা, বিশেষতঃ অভিজ্ঞ অধ্যাপবে সাহায্য ভিন্ন এই ব্যাকরণ প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে অপ্রবেশ্য।

১৭ একমাত্র ভোজদেবের 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' ব্যাকরণে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ও ব্যাকরণে বৈদিকাংশ যোজিত হইলেও সেখানে ইহার প্রয়োজনাপেক্ষা প্রদর্শনে আগ্রহটাই যেন বড় হইয়া উঠিয়াছে। কাতন্ত্রের বৈদিকাংশ একেবারে আধুনিককালের যোজনা।

১৮ '...the work (অষ্টাধ্যায়ী) was not put together as a manual f foreigners, but written for scholars and teachers, thorough acquainted with the language.'—B. Faddegon ('Studies on Panin Grammar'). যাহাদের মাতৃভাষা সংস্কৃত নয়, তাহাদের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানে প্রাথমিক পাঠ গ্রহণের জন্য পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ রচিত হয় নাই।

১৯ 'The, to us, illogical order and impracticability of learning Sanskrit by the use of the grammar (অষ্টাধ্যায়ী) are explained, if we remember that the book was to be learned by heart by those who were already accustomed to use Sanskrit in conversation, and had not to learn how to speak it, but to know what forms were correct, what vulgar.'

—A. B. Keith

২০ মহাভাষ্যে উল্লিখিত (ব্যাকরণের) ১৮টি প্রয়োজন : ১। বেদরক্ষা, ২। উহ, ৩। আগম, ৪। লাঘব, ৫। অসন্দেহ, ৬। অম্লেচ্ছতাসম্পত্তি, ৭। স্বর-বর্ণদোষরাহিত্য, ৮। সার্থক বেদজ্ঞান, ৯। সুশব্দ ও অপশব্দের ধর্মাধর্মজ্ঞান, ১০। 'প্রত্যভিবাদে নাম্নি প্লুতজ্ঞানম্', ১১। বিধ্যাদিবাক্যঘটক-বিভক্তিপদার্থাদিজ্ঞান, ১২। পদাক্ষরাদিবিভাগজ্ঞান, ১৩। চতুর্বিধপদজাতকালব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকবিভক্তিস্থানভেদজ্ঞান, ১৪। বাগ্‌বিস্তারসম্পত্তি, ১৫। 'অসাধুশব্দেভ্যো বিবিচ্য সুশব্দজ্ঞানম্', ১৬। অপশব্দপ্রয়োগজন্যপ্রত্যবায়পরিহারকপ্রায়শ্চিত্তাভাব, ১৭। 'নামকরণেষু বিহিত নামস্বরূপজ্ঞানম্', ১৮। 'সর্ববিভক্ত্যন্তানাং সম্যগুচ্চারণম্'। কৈয়ট তাঁহার টীকায় 'আগম'কে 'প্রবর্তক' বলিয়াছেন, পুরাপুরি প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

২১ ঋষয়োঽপ্যুপদেশস্য নান্তং যান্তি পৃথক্‌ত্বশঃ।
লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ।।—শাবর ভাষ্য ২।১।৭
মহাভাষ্যে : 'কিঞ্চিৎ সামান্য-বিশেষবল্লক্ষণং প্রবর্ত্যং যেনাল্পেন যত্নেন মহতোমহতঃ শব্দৌঘান্ প্রতিপদ্যেরন্। কিং পুনস্তৎ। উপসর্গাপবাদৌ।...সামান্যেনোৎসর্গঃ কর্তব্যঃ। ...তস্য বিশেষেণাপবাদঃ।'

২২ অষ্টাধ্যায়ীতে (১।১।৬৮, ৮।৩।৮৬) 'শব্দ' সংজ্ঞা ব্যাকরণ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে, শব্দের সহিত ব্যাকরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করিয়া। পাণিনির ৪।৪। ৩৪ নং সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে 'শব্দং (ব্যাকরণং) করোতি শাব্দিকঃ (বৈয়াকরণঃ)'।

২৩ পাণিনির মতে, কিরূপে একটি শব্দ তাহার বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে সেই সম্বন্ধে ব্যাকরণের তেমন কিছু করণীয় নাই, কারণ শব্দার্থ শিষ্টগণের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'প্রধান প্রত্যয়ার্থবচনমর্থস্যান্যপ্রমাণত্বাৎ' (১।২। ৫৬) সূত্র ও ইহার কাশিকাবৃত্তি পর্যালোচনার যোগ্য। মহাভাষ্যে (১।১।৯) বলা হইয়াছে : 'অর্থস্যাসম্ভবাৎ। ইহ ব্যাকরণেঽর্থে কার্যস্যাসম্ভবঃ।' ইহার প্রথমাংশ অবশ্য কাত্যায়নের বার্ত্তিক। 'স্বাভাবিকমর্থাভিধানম্'—মহাভাষ্য ২।১।১।

২৪ 'অর্থপদ'শব্দের অর্থ 'বার্ত্তিক' না করিয়া 'মহাভাষ্য' করিলেই বোধ হয় ভাল হয়। মহাভাষ্যকারের উদ্দেশে 'পদকারে'র উল্লেখ খুব বিরল নয়। স্কন্দস্বামী নিরুক্ত টীকাতে (১।৩) পদকারের নামে মহাভাষ্যের (৫।২।২৮) পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। সেইরূপ উবট ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের (১৩।১৯) টীকায় পদকারের নামে মহাভাষ্যের (১।১।৯) উদ্ধৃতি দিয়াছেন। কাশিকা-ন্যাসে (৩।২।২১) এবং ক্ষীরস্বামীর 'অমরকোষোদ্‌ঘাটন'টীকায় (৩।১।৩৫) পদকারের নামে যে উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, তাহা অবশ্য বর্তমান মহাভাষ্যে দৃষ্ট হয় না। ভামহের 'কাব্যালঙ্কারে' (৪।২২) সূত্রকারের সঙ্গে পদকারের উল্লেখ আছে। সাংখ্যকারিকার যুক্তিদীপিকাটীকায় (?) নাকি পদকারের নামে এক বার্ত্তিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। দুর্ঘটবৃত্তিতে (৮।৪।১১)

এবং তন্ত্রপ্রদীপে (৭।৪।১) 'অনুপদকারে'র এবং কাশিকাবৃত্তিতে (৭।২।৫
'পদশেষকারে'র মত উদ্ধৃত হইয়াছে। মহাভাষ্যের পুরুষোত্তমদেব-রচিত ‍
ভাষ্যব্যাখ্যাপ্রপঞ্চেও (?) নাকি পদশেষকারের মতোক্তি ছিল। 'অনুপদ' ‍
'পদশেষ' সম্ভবতঃ একই গ্রন্থ এবং মহাভাষ্যের পরে রচিত। 'শিশুপালবধে'র (
১১২) 'অনুৎসূত্রপদন্যাসাঃ...' ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্গত 'পদ' শব্দের ব্যাখ
বল্লভদেব ইহাকে শেষাহি-বিরচিত ভাষ্য ('পদং শেষাহি বিরচিতং ভাষ্য:
বলিয়াছেন।

২৪ক ভাষার 'সংস্কৃত' নামটি খুব পুরাতন নয়। পাণিনির ব্যাকরণে ইহাকে 'বৈদি
ভাষার পাশাপাশি 'লৌকিক' ভাষা বলা হইয়াছে। পাণিনীয় শিক্ষাতে ইহার সং
নামের উল্লেখ থাকিলেও তাহার প্রাচীনতা সন্দেহাতীত নয়। মহাভারতে
'স্বরব্যঞ্জনয়োঃ কৃৎস্না লোকবেদাশ্রয়েব বাক্' (১।২।৩৯) এবং 'ব্রাহ্মী বাক্' (
৮১।১৩)। অমরকোষেও সংস্কৃতের উল্লেখ না করিয়া লিখিত হইয়াছে ঃ 'ব্রাহ্মী
ভারতী ভাষা গীর্বাগ্ বাণী সরস্বতী' (১।৫।১)। অনুগীতায় (৪৩।২৩)
'স্বরব্যঞ্জনসংস্কারা ভারতী শব্দলক্ষণা।' ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (২২।৩
ভারতীবৃত্তিকে 'বাক্‌প্রধানা পুরুষপ্রযোজ্যা স্ত্রীবর্জিতা সংস্কৃতবাক্যযুক্তা' ব
হইয়াছে। ভাষা বুঝাইতে রামায়ণে সংস্কৃতের উল্লেখই বোধ হয় প্রাচীনতম
'ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্' (৩।১১।৫৬) এবং 'সংস্কৃতা বা
(৫।৩০।১৭-৮)। ভোজের 'শৃঙ্গারপ্রকাশে' সংস্কৃতকে 'শ্রৌত' (= মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ
'আর্ষ' (= স্মৃতি ও পুরাণ) এবং 'লৌকিক' (= কাব্য ও শাস্ত্র) এই তিন ভাগে ভ
করা হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষাগুলির অভ্যুত্থানের পর উহাদের সঙ্গে পার্থ
নির্দেশের প্রয়োজনেই খ্রীষ্টীয় শতকের প্রারম্ভ-বরাবর ভাষানির্দেশক সংস্কৃ
নামটির প্রচলন হইয়া যায়। একদিকে প্রাকৃত (= প্র + অকৃত) এবং অপর দি
সংস্কৃত (= সম্ + কৃত) অর্থাৎ ব্যাকরণের সাহায্যে যাহার সংস্কার সাধন ক
হইয়াছে ; 'সংস্কৃতং ত্বাহিতোৎকর্ষে কৃত্রিমে নির্মলীকৃতে' (নানার্থার্ণবসংক্ষে
১৮৮৭) ; কুমারসম্ভবে (৭।৯০) ঃ 'সংস্কারপূত বাঙ্ময়'। শ্রীহর্ষের নৈষধচরি
(১০।৩৪) এই ভাষাকেই 'সংস্কৃত্রিমা' আখ্যা দিয়া, দময়ন্তীর স্বয়ম্বরসভায় না
দিগ্‌দেশাগত রাজগণ নিজ নিজ ভাষায় কথা না বলিয়া এই ভাষাতেই পারস্পরি
কথোপকথন নির্বাহ করেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা প্রমাণিত (
সংস্কৃতই ছিল ভারতের 'lingua franca'। (সংস্কৃত) ভাষা কালক্রমে পূর্বো
লৌকিকতা হারাইয়া ব্যাকরণাশ্রয়ী হইয়া পড়ে এবং সেই লৌকিক আসনটি দখ
করে আঞ্চলিক পালি ও প্রাকৃত ভাষাগুলি ঃ 'প্রকৃত্যা স্বভাবেন সিদ্ধমি
প্রাকৃতম্।' বলা বাহুল্য, এই ভাষাগুলিকে প্রাচীনগণ ভাল চোখে দেখিতেন ন
রামায়ণকার অশোকবনে ক্লিষ্টা সীতার বর্ণনায় তাঁহার সহিত তুলনা করি
সংস্কারহীনা বাক্-এর অবতারণা করিয়াছেন ঃ 'সংস্কারেণ যথা হীনাং বাচমর্থান্ত
গতাম্' (৫।১৫।৩৯)।

২৫ এই মতে অর্থাৎ ব্যাকরণ-দর্শনের মতে ব্যাকরণের বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ কৃত্রি
এবং অসত্য। ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে সর্পবোধের ন্যায়, বৈয়াকরণগণও প্রথ
ভ্রমবশতঃই বাক্য ও পদের বিভাগ কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু পরে ভ্রম দূরীভূ

হইলে যেমন রজ্জুর বোধ জন্মে, ঠিক তেমনই বৈয়াকরণগণও ঐ বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির অসারতা ক্রমে বুঝিতে পারিয়া উহার পশ্চাতে এক ও নিত্য সত্যস্বরূপ শব্দতত্ত্ব বা স্ফোটের সন্ধান লাভ করেন ('অসত্যে বর্ত্মনি স্থিত্বা পুনঃ সত্যং সমীহতে'—ভর্তৃহরি)। এই 'স্ফোট' যখন পরম ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়, তখন এই সত্যলাভের সিদ্ধি চরমে পৌছে। এই দৃষ্টিতে ব্যাকরণের প্রক্রিয়া-বিভাগাদি সবই ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে মাত্র সত্য, পারমার্থিক ক্ষেত্রে মিথ্যা। নৈয়ায়িকগণ এবং মীমাংসকগণ স্ফোটবাদ মানেন না। বৈশেষিক দর্শনে স্ফোট অস্বীকৃত। কুমারিল এবং প্রভাকর স্ফোট স্বীকার করেন নাই। যোগদর্শন (৩।১৭) স্ফোট মানে। ভাগবতপুরাণে (১২।৬।৩৭-৪৫) স্ফোটের বিশদ উল্লেখ আছে। ভরতমিশ্র 'স্ফোটসিদ্ধি' গ্রন্থের প্রারম্ভে ঔদুম্বরায়ণকে স্ফোটতত্ত্বের প্রতিপাদক বলিয়াছেন। নিরুক্তের (১।২) 'ইন্দ্রিয়নিত্যং বচনমৌদুম্বরায়ণঃ' এই বর্ণনাতে ভরতোক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। ঔদুম্বরায়ণের মতে বচন ইন্দ্রিয়-নিত্য অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। উচ্চারিত শব্দ ধ্বংস হইলেও যে আসল শব্দ (স্ফোট) তাহার অন্তরালে থাকে তাহা নিত্য এবং অপরিবর্তনীয়। নাদ অভিব্যঞ্জক, স্ফোট অভিব্যঙ্গ্য। স্ফোট আট রকমের : (১) বর্ণস্ফোট, (২) পদস্ফোট, (৩) বাক্যস্ফোট, (৪) অখণ্ডপদস্ফোট, (৫) অখণ্ডবাক্যস্ফোট, (৬) বর্ণজাতিস্ফোট, (৭) পদজাতিস্ফোট এবং (৮) বাক্যজাতিস্ফোট। ইহাদের মধ্যে বাক্যস্ফোটই মুখ্য : 'তত্র বাক্যস্ফোটোমুখ্যঃ, তস্যৈব লোকে অর্থবোধকত্বাৎ'—নাগেশভট্ট ('পরমলঘুমঞ্জুষা' গ্রন্থের প্রারম্ভে)। ধ্বনি-ব্যঙ্গ্য স্ফোট হইতে অর্থের অভিব্যক্তি। স্ফুটত্যর্থোঽস্মাদিতি স্ফোটঃ। বাচকতা স্ফোটৈকনিষ্ঠা। যোগদর্শনে : 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ' (১।২৭)। আচার্য শঙ্কর স্ফোটবাদ অপেক্ষা উপবর্ষের বর্ণবাদকে অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য বলিয়াছেন : 'বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষঃ। স্ফোটবাদিনস্তু দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ।'—(১। ৩।২৮ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য)। বৈয়াকরণভূষণে : 'নিষ্কর্ষে তু ব্রহ্মৈব স্ফোটঃ' (৭৪)। (এই প্রসঙ্গে পরিশিষ্টে স্ফোট শব্দ দ্রষ্টব্য।)

পাণিনির পূর্ববর্তী ব্যাকরণ

ষড়্‌বেদাঙ্গ-প্রসঙ্গ

সমস্ত শাস্ত্রই বেদমূলক, বিশেষতঃ ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ। এই শ্রুতি-স্মৃতির অনুরোধে অথবা বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক প্রেরণায় মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বেদের প্রাচীনতম অংশে ব্যাকরণের মূল অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ইহার ফলস্বরূপ তিনি ঋগ্‌বেদের দ্ব্যর্থবোধক ও রহস্যঘন ভাষায় প্রকাশিত ব্যাকরণ-সম্পর্কিত (?) কতকগুলি ঋক্ (১।১৬৪।৪৫, ৪।৫৮।৩, ৮।৬৯।১২, ১০।৭১।২, ১০।৭১।৪) ভিন্ন আর বিশেষ কিছুর সন্ধান পান নাই। এইসব ঋকের যে ব্যাখ্যা তিনি ব্যাকরণ-পক্ষে প্রদান করিয়াছেন, তাহাও সর্ববাদিসম্মত নয়। অধিকাংশ স্থলেই (কষ্ট?) কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এদিকে, বৈদিকভাষার গঠন-পারিপাট্য, সাবলীলতা, বাক্‌পদ্ধতির উৎকর্ষ প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, এই ভাষার পশ্চাতে এক উন্নত ব্যাকরণ-বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে কার্যকর ছিল। অথচ বেদে ইহার কোনো প্রত্যক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহা হইতে মনে হয়, বেদ-গ্রন্থনার অব্যবহিত পূর্বে, এমন কি গ্রন্থনার প্রাথমিক স্তরেও এই ব্যাকরণ বৈদিকভাষায় অন্তরঙ্গ বা অন্তর্লীন অবস্থায় ছিল, তখনও ইহা বহিরঙ্গরূপে ব্যাপক পদ্ধতির আকারে দেখা দেয় নাই বা বিধিবদ্ধ হয় নাই। ক্রমে বৈদিক সাহিত্য-রচনার পরিমাণ ও প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রভাব হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য ও বিশুদ্ধি রক্ষার প্রয়োজনে পূর্বোক্ত রহস্যঘনতার বা ইঙ্গিতময়তার আবরণ উন্মোচন করিয়া ব্যাকরণশাস্ত্রের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে। বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণাদি অর্বাচীন অংশে ব্যাকরণ-সম্বন্ধে যে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার আভাস এবং ব্যাকরণ-ঘটিত সংজ্ঞা ও অন্যবিধ উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইতে এমন অনুমান করা চলে যে, তখন

বেদাঙ্গ ব্যাকরণ জন্মলাভ করিয়া থাকিবে। প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান এবং লেখ্য ও কথ্য ভাষার পার্থক্যবোধের পথ ধরিয়া এই ব্যাকরণ বিদ্যার অগ্রসর হওয়ার কথা।

পতঞ্জলি ব্যাকরণকে ষড়ঙ্গের প্রধান অঙ্গ বলিয়াছেন ঃ 'প্রধানঞ্চ ষটস্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্।' প্রধানে কৃতযত্ন হইলে অন্যান্য অঙ্গবিদ্যা সহজেই আয়ত্ত বা ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা। ভর্তৃহরির মতে ব্যাকরণ বেদের প্রথম অঙ্গ ঃ 'প্রথমং ছন্দসামঙ্গং প্রাহুর্ব্যাকরণং বুধাঃ'—বাক্যপদীয় ১।১১। ষড়ঙ্গের অন্য পাঁচটি ঃ শিক্ষা, কল্প, ছন্দঃ, নিরুক্ত এবং জ্যোতিষ। বেদাঙ্গবাচক 'ষড়ঙ্গে'র প্রাচীনতম উল্লেখ বোধ হয় সামবেদের ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে (৪।৭)। মুণ্ডকোপনিষদে (১।১।৫) পৃথক্ ভাবে ষড়ঙ্গের প্রত্যেকটির নাম করা হইয়াছে। অথর্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণেও (১।১।২৪, ২৭,...) ষড়ঙ্গের পৃথক্ উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে ব্যাকরণ-বিষয়ক বিবিধ সংজ্ঞাশব্দেরও একটা ধারাবাহিক বর্ণনা বর্তমান। সায়ণাচার্যের মতে শতপথব্রাহ্মণে (১১।৫।৬।৮) উল্লিখিত 'অনুশাসনানি' ষড়ঙ্গবাচক। বিবিধ আরণ্যকে এবং উপনিষদে এইসব ব্যাকরণসংক্রান্ত উপাদানের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

বৈদিক ষড়ঙ্গ বেদের কোন্ কোন্ অঙ্গের দ্যোতক তাহার বর্ণনা পাওয়া যায় পাণিনীয় শিক্ষাতে ঃ

> ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
> জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।।
> শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখংব্যাকরণংস্মৃতম্।
> তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।। ৪১-২

অর্থাৎ ছন্দঃ বেদের পদদ্বয়, কল্প বেদের দুই হাত, জ্যোতিষ ইহার চক্ষুঃ, নিরুক্ত কর্ণ, শিক্ষা নাসিকা এবং ব্যাকরণ মুখস্বরূপ। ইহাদের প্রত্যেকটির প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই বেদের এই অঙ্গবিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে। বৈদিক যুগের ঋষিগণ আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির গতি-বিধি বা অবস্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের কালাকাল নির্ধারণ করিতেন। এই কার্যের সর্বপ্রধান যন্ত্র ছিল চক্ষুঃ, জ্যোতিঃ যাহার স্বরূপ। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞান বা জ্যোতিষবেদাঙ্গকে চক্ষুর

সহিত তুলিত করা খুবই সমীচীন হইয়াছে। যজ্ঞকাল স্থিরীকৃত হইলে বেদপুরুষের যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিতে পদদ্বয়ের যে উপযোগিতা, বেদাধ্যয়নেও প্রথমে ছন্দোজ্ঞানের আবশ্যকতা সেইরূপ। কল্প[১] বেদাঙ্গ যজ্ঞে মন্ত্রের যথাযথ বিনিয়োগের উদ্দেশ দেয়। তাই ইহা যজ্ঞানুষ্ঠানের সহিত জড়িত। এই পরিপ্রেক্ষায় কল্পকে প্রধান কর্মেন্দ্রিয় হস্তদ্বয়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বাকী তিন অঙ্গের অর্থাৎ নাসিকা, মুখ ও কর্ণের উপযোগিতা যথাক্রমে বিশুদ্ধ উচ্চারণে, বাক্যকথনে এবং তচ্ছ্রবণজনিত অর্থজ্ঞানে। এই তিন কার্যই যথাক্রমে শিক্ষা,[২] ব্যাকরণ ও নিরুক্তের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই কারণে শব্দবিদ্যার ক্ষেত্রে এই তিন বেদাঙ্গের পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য।

হেমাদ্রির 'ব্রতখণ্ডে' ষড়ঙ্গের নিম্নলিখিতরূপ দেবতানির্দেশ করা হইয়াছে ঃ

শিক্ষা প্রজাপতির্জ্ঞেয়া কল্পো ব্রহ্মা প্রকীর্তিতঃ।
সরস্বতী ব্যাকরণং নিরুক্তং বরুণঃ প্রভুঃ।।
ছন্দো বিষ্ণুস্তথৈবাগ্নির্জ্যোতিষং ভগবান্ রবিঃ।

এ ক্ষেত্রেও ষড়ঙ্গের প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সহিত তাহাদের দেবগণের স্বরূপগত ও চরিত্রগত বিশেষত্বের সামঞ্জস্য লক্ষণীয়।

নিতান্ত বাস্তব প্রয়োজনের দিক্ দিয়া এই ছয় অঙ্গকে প্রধান তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় ঃ (১) শিক্ষা ও ছন্দঃ—যাহা বেদাধ্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয়, (২) ব্যাকরণ ও নিরুক্ত—বেদার্থজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় এবং (৩) জ্যোতিষ ও কল্প—বেদবিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয়। বৈদিক জ্ঞানকে বা বেদকে যজ্ঞাদিকর্মে রূপায়িত করাতেই ইহাদের কার্মিক বা আনুষ্ঠানিক সার্থকতা—যাহার প্রস্তুতিপর্বে বেদাধ্যয়ন এবং বেদার্থবোধ অপরিহার্য। তাই ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদাধ্যয়ন ও তাহার অর্থাবধারণ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট। ষড়ঙ্গ এই কার্যের সহায়ক বা উপকারক ঃ 'উপকারকতয়াপ্যঙ্গত্বম্'—শব্দকৌস্তুভ।

যাস্কের নিরুক্তে (১।২০) ঋষিদিগকে বেদাঙ্গের প্রবক্তা বলা হইয়াছে। ইঁহারা ছিলেন 'অসাক্ষাৎকৃতধর্মা ঋষি'। সংক্ষেপে শ্রুতর্ষি। যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে মন্ত্রের সন্ধান পান নাই কিন্তু সাক্ষাৎকৃতধর্মা (অর্থাৎ

সাক্ষাৎভাবে মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমন) ঋষিদের নিকট হইতে উপদেশরূপে শুনিয়া মন্ত্রের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহারাই শ্রুতর্ষি। আশ্চর্যের বিষয়, অন্য সব বেদাঙ্গেরই তথাকথিত প্রাচীন গ্রন্থ আছে, নাই কেবল বেদাঙ্গ ব্যাকরণের। এইসব বেদাঙ্গগ্রন্থের প্রারম্ভে কিন্তু এক এক জন প্রবক্তার নাম পাওয়া যায়, যেমন বশিষ্ঠ-শিক্ষার প্রারম্ভে: 'অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি বশিষ্ঠস্য মতং যথা।' জ্যোতিষ বেদাঙ্গের প্রথমে: 'কালজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি লগধস্য মহাত্মনঃ' ইত্যাদি। ঋষিগণ যাহা আবিষ্কার করিতেন বা যে রীতি-পদ্ধতির সন্ধান দিতেন, তাহা শিষ্যপরম্পরায় প্রচারিত হইয়া সময় সময় শিক্ষার্থীদের দ্বারা গ্রথিত হইত। পাণিনীয় শিক্ষাও এইভাবেই গ্রথিত। বেদাঙ্গ ব্যাকরণের এইরূপ বোনো পুঁথি পাওয়া গেলে হয়তো দেখা যাইত তাহার অগ্রভাগেও লেখা আছে 'ব্যাকরণং প্রবক্ষ্যামি অমুকস্য মতং যথা'—এই ধরনের কিছু। কিন্তু সেই সম্ভাবনা বোধহয় চিরতরেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বেদাঙ্গ ব্যাকরণের কোনো নমুনা দূরে থাক্, উহার পরবর্তী এবং পাণিনির পূর্ববর্তী অপর কোনো ব্যাকরণগ্রন্থই এই যুগে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পাণিনির জঠরানলে যেন সবই জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই বৈদিক সাহিত্যের নানাক্ষেত্রে ব্যাকরণের যেসব উপাদান ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে, তাহাদের জন্ম-নাড়ী নির্ণয় করা এখন আর সম্ভবপর নয়। একদিকে জলবিন্দুর ন্যায় এইসব ব্যাকরণ-কণিকা এবং অন্যদিকে পাণিনীয় ব্যাকরণ ধারার অগাধ জলরাশি। এই দুই-এর মধ্যবর্তী যোগসূত্র নির্ণয় করা কি একেবারেই অসম্ভব?

প্রাতিশাখ্য

এই অবস্থার সুযোগে কেহ কেহ বৈদিক প্রাতিশাখ্যকে বেদাঙ্গ ব্যাকরণ বলিতে ইচ্ছুক। 'প্রতিশাখ' (প্রতিশাখা) হইতে প্রাতিশাখ্য।[৩] মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে ভ্বাদ্যন্তর্গত 'শাখৃ' ধাতু প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে: 'শাখায়াং শাখায়াং প্রতিশাখম্। প্রতিশাখং ভবমিতি প্রাতিশাখ্যম্।।' ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, একদা বেদের প্রত্যেক শাখাতেই (অন্ততঃ) একখানি করিয়া প্রাতিশাখ্য ছিল। মহাভাষ্যে পতঞ্জলি চারি বেদে মোট শাখার সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন ১১৩০। তদনুসারে সহস্রাধিক

প্রাতিশাখ্য থাকার কথা। কিন্তু বর্তমানে প্রতি শ'য়ে একখানি প্রাতিশাখ্যও সুলভ নয়। এ যাবৎ যেসব প্রাতিশাখ্য পাওয়া গিয়াছে তাহাদের নামমাত্র পরিচয় এইরূপ ঃ (১) ঋগ্বেদের শাকল শাখায় শৌনকরচিত ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য বা ঋকপ্রাতিশাখ্য, (২) তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য অথবা কৃষ্ণযজুঃ প্রাতিশাখ্য—ইহা ঔখেয় শাখার গ্রন্থ, ষড়ানন কার্ত্তিকে ইহার কর্তৃত্ব আরোপিত ; (৩) বররুচি কাত্যায়ন প্রণীত বাজসনেয়ি প্রাতিশাখ্য বা শুক্লযজুঃ প্রাতিশাখ্য, (৪) অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখার গ্রন্থ অথর্বপ্রাতিশাখ্য, (৫) অথর্ববেদের শৌনক শাখায় শৌনকরচিত চতুরধ্যায়িকা, (৬) সামবেদের কৌথুমীশাখায় শাকটায়ন-(মতান্তরে ঔদব্রজি[৪]-) রচিত ঋক্‌তন্ত্র, (৭) শৌরিসূনু-রচিত লঘু ঋক্‌-তন্ত্র সংগ্রহ, (৮) পুষ্পর্ষিকৃত পুষ্পসূত্র বা সামপ্রাতিশাখ্য, (৯) ঔদব্রজি-(মতান্তরে গার্গ্য-) রচিত সামতন্ত্র, (১০) মৈত্রায়ণীয় প্রাতিশাখ্য, (১১) গৌতমপ্রাতিশাখ্য, (১২) আশ্বলায়নপ্রাতিশাখ্য, (১৩) চারায়ণীয় প্রাতিশাখ্য এবং (১৪) সত্যমুগ্রিপ্রাতিশাখ্য। ইহাদের শেষ পাঁচখানি দুষ্প্রাপ্য।

বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদীর 'প্রৌঢ়মনোরমা' টীকার উপর রচিত 'রত্নপ্রভা' টিপ্পনীতে (সংজ্ঞাপ্রকরণে) সভাপতি শর্মোপাধ্যায় প্রাতিশাখ্যের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহাকে বৈদিক ব্যাকরণ বলিয়াছেন ঃ

> ...প্রতিশাখমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ প্রাতিশাখ্যম্...। বেদতরোঃ শাখাশ্চতস্র ঋগ্বেদাদয়ঃ। তত্রত্য শব্দানাং স্বরবর্ণসংহিতাধ্যয়ন-ক্রম-মন্ত্র-লক্ষণাদি-রূপকো গ্রন্থবিশেষঃ শৌনকাদিপ্রণীতঃ প্রাতি-শাখ্যমিত্যুচ্যতে বৈদিক-ব্যাকরণমিতি। তচ্চ প্রতিবেদং ভিন্নম্।[৫]

শাখাভেদে বৈদিকশব্দসমূহের স্বর-বর্ণ-সংহিতা (সন্ধি), অধ্যয়নক্রম ও মন্ত্রলক্ষণাদিবিষয়ক গ্রন্থ এই প্রাতিশাখ্য। কিন্তু ব্যাকরণের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য যে বিশ্লেষণ বা পদবিভাজন তাহা কিন্তু প্রাতিশাখ্যে অনুপস্থিত। অথচ বৈদিক ঋষিগণ যে সে বিষয়ে সম্যক্ অবহিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যে আছে। বেদের সংহিতাভাগে 'ব্যাকরণ' শব্দের প্রত্যক্ষ উল্লেখ না থাকিলেও তন্মূলক 'ব্যাকুরু', 'ব্যাকরবাণি', 'ব্যাকরোৎ' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রচুর উল্লেখ বর্তমান। তৈত্তিরীয়সংহিতায় (৬।৪।৭) দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক বাগ্‌বিভাজনের কথা পরিষ্কার বর্ণিত

রহিয়াছে। কাজেই প্রাতিশাখ্যকে পূর্ববর্ণিত বেদাঙ্গব্যাকরণ বলা চলে না, যদিও ব্যাকরণের ব্যাপক বিষয়-বৈচিত্র্যের কোন কোন অংশের সহিত ইহার বিষয়গত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রথমে এই সাদৃশ্যও হয়তো খুব প্রকট ছিল না। পরে ব্যাকরণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাতিশাখ্যেও অনুরূপ ক্ষেত্রে সবিশেষ উন্নতি ঘটানো হয় এবং পরিণামে কোনোটি বড় বেশি ব্যাকরণ-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, যেমন অথর্ববেদ-প্রাতিশাখ্য। সমভাবাপন্ন একাধিক প্রাতিশাখ্যকে কাটিয়া ছাঁটিয়া এক গ্রন্থে পরিণত করার চেষ্টা হইতেই ক্রমে বহু প্রাতিশাখ্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এইসব সূত্র ধরিয়া প্রাতিশাখ্যের উৎসসন্ধানে অগ্রসর হইলে বুঝা যায়, বৈদিক ষড়ঙ্গের উৎপত্তির মূলে যেসব কারণ অনুমিত হয়, প্রাতিশাখ্যসৃষ্টির গোড়ার কথাও প্রায় তেমন। দেশ-কাল-গোষ্ঠী-ভেদে বৈদিক সংহিতাসমূহের যে পাঠভেদ ও অন্যান্য পার্থক্য দেখা দেয়, বলিতে গেলে তাহারই ফলে ক্রমে পূর্বোক্ত বিবিধ বৈদিক শাখার উদ্ভব। ষড়ঙ্গের উৎপত্তিকালে বেদের এত বেশি শাখা-বিভাগ ছিল না। তাই ষড়ঙ্গে বৈদিকস্বরাদির বিষয়ে যেসব বিধিনিষেধ সূত্রিত হইয়াছিল তাহা ছিল অতি সাধারণ এবং সেই কারণে পরবর্তী কালে উদ্ভূত বিভিন্ন শাখার আনুষঙ্গিক বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। এই অবস্থাতে বিভিন্ন শাখার ঐ জাতীয় অসাধারণ (uncommon) বৈশিষ্ট্যগুলিকে পৃথক্‌ভাবে বিধিবদ্ধ করিতে গিয়াই প্রাতিশাখ্যের সৃষ্টি করা হয়। ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গের সাধারণ বিধানের বাহিরেই প্রাতিশাখ্যের বিশেষ বিধিসমূহের সার্থকতা। শিক্ষা বেদাঙ্গের সহিত প্রাতিশাখ্যের খুব সাদৃশ্য থাকিলেও প্রথমটি সর্ববেদ-সাধারণ এবং দ্বিতীয়টি বেদের বিভিন্ন শাখার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মধুসূদন সরস্বতীর মতে প্রাতিশাখ্য শিক্ষাবেদাঙ্গেরই ভিন্নরূপ ঃ

> তত্র সর্ববেদ সাধারণশিক্ষা...প্রতিবেদ-শাখায়াং চ ভিন্নরূপা প্রাতিশাখ্যসংজ্ঞিতা...।

বাজসনেয়ি প্রাতিশাখ্যের ভাষ্যকার অনন্ত ভট্টের প্রাসঙ্গিক অভিমত ঃ

> যদুদাহরণং ব্যাকরণসাধ্যং ন ভবতি তত্র প্রাতিশাখ্যলক্ষণমুচিতম্।

তাঁহার মতে শিক্ষা ও ব্যাকরণ এই উভয় শাস্ত্রের বিষয়বস্তু প্রাতিশাখ্যে আচরিত হওয়ায় অন্যশাস্ত্রাপেক্ষা ইহার বৃদ্ধত্ব ঃ

> বৃদ্ধমিদং শাস্ত্রমন্যশাস্ত্রাপেক্ষয়া, যতঃ শিক্ষাবিহিতং ব্যাকরণবিহিতং চোভয়মস্মিন শাস্ত্রেঽভিধীয়তে ।৬

বৈদিক সংহিতাপাঠের সহিত যে যে স্থলে পদপাঠ ও ক্রমপাঠের বিশেষ, সেই সব বিশেষ স্থলের স্বর-সংস্কারাদির বিধান নির্দেশ করাই প্রাতিশাখ্যের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। যেখানে সংহিতা ও পদের অথবা সংহিতা ও ক্রমের (Repetitive Text) মধ্যে কোন বিসংবাদ নাই, সেখানকার স্বরসংস্কারাদি সাধারণ ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধীন। তাই বাজসনেয়ি প্রাতিশাখ্যের অন্য ভাষ্যকার উবট লিখিয়াছেন ঃ

> যত্র পুনঃ পদকারস্য চার্ষসংহিতায়াশ্চ সমানবাক্যত্বং তত্র লক্ষণং ন ঘটতে, ব্যাকরণস্য বিষয়ঃ (৩।৫৮)।

বস্তুতঃ বেদের পূর্বকথিত ত্রিবিধ পাঠ বা সমাম্নায়কে কেন্দ্র করিয়া শাখাভেদে বিধিবদ্ধ এই সব প্রাতিশাখ্য। ঐ ত্রিবিধ পাঠের অন্তর্লীন বৈষম্যের নির্দেশ, বিশেষতঃ কি উপায়ে স্বরঘটিত পরিবর্তনাদির দ্বারা পদপাঠ সংহিতাপাঠে পরিণত হয় তাহার নির্দেশ দিতে গিয়া আনুষঙ্গিকভাবেই প্রাতিশাখ্যে সন্ধি, স্বর, সমাস প্রভৃতি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করিতে হইয়াছে—যদ্দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ব্যাকরণের সহিত ইহার সম্বন্ধ স্থাপিত। বৈদিক স্তোত্রাদির স্বরবিজ্ঞানের আলোচনাই কোনো প্রাতিশাখ্যের প্রধান অংশ অধিকার করিয়া বর্তমান। ধাতুপ্রত্যয়ের কথা ধরিলে, প্রাতিশাখ্য হইতে নিরুক্তবেদাঙ্গ অধিকতর পরিণত।

প্রাতিশাখ্যের নামান্তর 'পার্ষদ'। বৈদিক চরণসমূহে গ্রথিত গ্রন্থই পার্ষদ। বেদের কোনো একটি বিশেষ শাখা-সম্বন্ধীয় বিদ্যালয়কে 'চরণ' বলা হইত ('চরণশব্দঃ শাখানিমিত্তকঃ, পুরুষেষু বর্ততে'—কাশিকা ২।৪।৩)। নিরুক্তে (১।১৭) বলা হইয়াছে ঃ 'পদপ্রকৃতীনি সর্বচরণানাং পার্ষদানি।' (পরিশিষ্টে 'পার্ষদ' এবং 'প্রাতিশাখ্য' শব্দ দ্রষ্টব্য।) তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের (২৪।৫) মাহিষেয় ভাষ্যে পাণিনীয় গণপাঠ-পঠিত (৪।২।৬২) 'ছন্দোভাষা'র অর্থ করা হইয়াছে 'প্রাতিশাখ্য', ঋক্প্রাতিশাখ্যের বর্গদ্বয়বৃত্তিতে বিষ্ণুমিত্র অর্থ করিয়াছেন 'বৈদিকভাষা'।

অষ্ট ব্যাকরণ

যাস্ক ও পাণিনি সংস্কৃতের দুইটি প্রাচীন ধারার খবর দিয়াছেন। ইহাদের একটি প্রাচ্য বা পূর্বদেশীয় এবং অপরটি উদীচ্য বা উত্তরদেশীয়। পাণিনি 'প্রাচাম্' এবং 'উদীচাম্' বলিয়া এই দুই ধারার বৈয়াকরণদের চিহ্নিত করিয়াছেন। এককালে এই দুই ধারায় ৮/৯ খানি ব্যাকরণ খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে আরও উন্নত ধরনের ব্যাকরণ রচিত হইলেও পূর্বেকার সেই অষ্ট-বা নব-ব্যাকরণের ঐতিহ্য বৈয়াকরণসমাজে দীর্ঘকাল অনুসৃত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণে (ব্রাহ্মপর্ব, ১ম অধ্যায়) যে অষ্ট ব্যাকরণের বর্ণনা আছে তাহাদের সব কয়খানিই দেবতাদের রচনা, বা তাঁহাদের নামে প্রচারিতঃ

প্রথমং প্রোচ্যতে ব্রাহ্মং দ্বিতীয়মৈন্দ্র মেব চ।।
যাম্যং প্রোক্তং ততো রৌদ্রং বায়ব্যং বারুণং তথা।
সাবিত্রং চ তথা প্রোক্তমষ্টমং বৈষ্ণবং তথা।।
১।১।৫৯-৬০

অর্থাৎ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, রুদ্র, বায়ু, বরুণ, সবিতা এবং বিষ্ণু যথাক্রমে অষ্ট-ব্যাকরণের উপদেষ্টা। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে (৩৬।৫০) হনুমান্‌কে 'নব-ব্যাকরণ-বেত্তা' বলা হইয়াছে। নব-ব্যাকরণের নামাঙ্কিত যে শ্লোকটি প্রায়শঃ উদ্ধৃত হইতে দেখা যায় তাহা এই ঃ

ঐন্দ্রং চান্দ্রং কাশকৃৎস্নং কৌমারং শাকটায়নম্।
সারস্বতং চাপিশলং শাকলং পাণিনীয়কম্।।

এইসব ব্যাকরণও রচয়িতাদের নামানুসারেই আখ্যাত, যদিও পাণিনীয় ব্যাকরণের আর একটি প্রসিদ্ধ নাম অষ্টাধ্যায়ী। নিরুক্ত-বৃত্তিতে (১।১৩) দুর্গাচার্য লিখিয়াছেন—'ব্যাকরণমষ্টপ্রভেদম্' এবং 'ব্যাকরণমষ্টধা' (১।২০)। খ্রীঃ ১২শ শতকে জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্রের (হৈম) ব্যাকরণ রচনার সময় তাঁহার কাজের সুবিধার্থ কাশ্মীর হইতে তাঁহাকে অষ্টব্যাকরণ আনাইয়া দেওয়ার কথা আছে। এইসব ব্যাকরণের নাম অবশ্য জানা যায় নাই। হৈম ব্যাকরণের প্রধান অধ্যাপকের পদে মনোনীত কাকল (কর্কাচার্য) ছিলেন অষ্টব্যাকরণবেত্তা। খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীতে বৈয়াকরণ বোপদেব তাঁহার 'কবিকল্পদ্রুমে'র প্রারম্ভে যে

আটজন আদি শাব্দিকের নাম করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অবশ্য প্রাচীন ইন্দ্র হইতে শুরু করিয়া অর্বাচীন অমর (সিংহ), চন্দ্র (চন্দ্রগোমী?) এবং জৈনেন্দ্র (= জিনেন্দ্র = খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীয় দেবনন্দী) পর্যন্ত আছেন ঃ

ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃকাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ।।

'অঙ্কাভিধান' নামক এক ক্ষুদ্র কোশে 'অষ্ট' (৮ সংখ্যার)-বাচক বিভিন্ন শব্দের মধ্যে ব্যাকরণেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়, বসু-সিদ্ধি-যোগাঙ্গ প্রভৃতি শব্দের মতো 'ব্যাকরণ'শব্দেও ৮ সংখ্যা বুঝাইত। সেই শ্লোকটি এই ঃ

অষ্টৌ যোগাঙ্গবস্বীশমূর্তি দিগ্‌গজসিদ্ধয়ঃ।
ব্রহ্মশ্রুতিব্যাকরণ-দিক্‌পালাহিকুলাদ্রয়ঃ।।

শ্লোকান্তর্গত 'ব্যাকরণ' শব্দের টীকায় টীকাকার পজ্জ ৮ রকমের ব্যাকরণ নির্দেশ করিতে নিম্নের (প্রাচীন) শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন ঃ

পালাসমপিমাহেশং শৈবং যাবনিকং তথা।
পাণিন্যাখ্যঞ্চ কৌমারং কাত্যায়নমলৌকিকম্।।

অর্থাৎ পালাস, মাহেশ, শৈব, যাবনিক, পাণিনি, কৌমার, কাত্যায়ন ও অলৌকিক—এই ৮ ব্যাকরণ। এইসব হইতে মনে হয়, অষ্ট ব্যাকরণ বলিতে সর্বত্র সর্বদা সুনির্দিষ্ট আটখানি ব্যাকরণ বুঝাইত না। সংখ্যার ঐতিহ্য ঠিক [illegible] বিভিন্ন ব্যাকরণ 'অষ্ট-ব্যাকরণে'র [illegible]

বোপদেব-কথিত অষ্টাদিশাব্দিকের মধ্যে ইন্দ্র, আপিশলি, শাকটায়ন এবং সম্ভবতঃ কাশকৃৎস্নও পাণিনির পূর্ববর্তী। ভবিষ্যপুরাণোক্ত অষ্ট-ব্যাকরণের মধ্যে সাবিত্র ব্যাকরণ ছাড়া বাকী সাতখানির নামই খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্যের পুস্তকালয়স্থ সূচীপত্রে লিখিত ছিল। বিভিন্ন প্রাতিশাখ্যে, কাত্যায়নবার্ত্তিকে, মহাভাষ্যে এবং পাণিনির সূত্রাবলীতে বহু প্রাচীন বৈয়াকরণের নাম পাওয়া যায়। নিরুক্তেও কয়েকজনের নাম আছে। ইঁহাদের মধ্যে কাহারা পূর্বদেশীয় বা উত্তরদেশীয় এবং কাহারাই বা এই দুই প্রাচীন ব্যাকরণ-ধারার কোন্‌টির অনুগামী, তাহা নিঃসন্দেহে বলা অসম্ভব।

উদীচী বা উত্তরদেশ বলিতে বুঝাইত পঞ্চনদ বা পাঞ্জাব, গান্ধার এবং কাশ্মীর। এই অঞ্চলই ছিল বৈদিক তথা ভারতীয় আর্যসভ্যতার জন্মভূমি। ইহার সহিত তুলনায় পূর্বাঞ্চলকে ঐ সভ্যতার প্রচার-বা প্রসার-ক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। উত্তরদেশ শিক্ষক, পূর্বদেশ শিক্ষার্থী। এই কারণে এই দুই অঞ্চলের ব্যাকরণ-ধারায় উদ্ভূত গ্রন্থগুলির মধ্যে রচনাগত পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। পাণিনির পূর্ববর্তী কোন ব্যাকরণই বর্তমানে না পাওয়া গেলেও, তাহাদের উত্তরাধিকারীর অভাব ঘটে নাই। এই সবের মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন যে পাণিনি ও কাতন্ত্র (কৌমার), তাহাদের ভিতরকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবিধ পার্থক্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, তাহাদের মধ্যে পূর্বোক্ত রচনাগত পার্থক্য যথেষ্ট পরিমাণেই চোখে পড়ে—যাহা হইতে প্রতীয়মান হয়, এই দুই ব্যাকরণের রচনার মূলগত উদ্দেশ্যই ছিল পৃথক্। একের উদ্দেশ্য, শিষ্টসম্মত আদর্শ সংস্কৃত ভাষাকে সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং অপরের উদ্দেশ্য, সেই আদর্শ ভাষা যাহাতে সবাই সহজে শিখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। ইহার সহিত পূর্বকথিত আঞ্চলিক তথা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রয়োজন-সিদ্ধির চমৎকার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে পাণিনি- ও কাতন্ত্র-ব্যাকরণকে যথাক্রমে উদীচ্য ও প্রাচ্য ধারার প্রতিনিধিস্থানীয় ধরিয়া, ইহাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বনের জন্য অন্যান্য ব্যাকরণকে এই দুই ধারায় বিন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, পূর্বদেশীয় শিক্ষার্থীদের দল অর্থাৎ কাতন্ত্রের পক্ষই সংখ্যায় অনেক বেশি ভারী।

ঐন্দ্র ব্যাকরণ

প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে ইন্দ্রকে এই পূর্বীধারার প্রবর্তক বা প্রভাবক বলা যায়। তাঁহার ব্যাকরণকে বলা হয় ঐন্দ্র ব্যাকরণ। সেইরূপ ঐন্দ্র ব্যাকরণ-সম্প্রদায়। ইন্দ্রের গুরু বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির গুরু ব্রহ্মা। ইন্দ্রের ছাত্র ভরদ্বাজ। পূর্বোক্ত ঋক্-তন্ত্রের প্রারম্ভে এইরূপ গুরুপরম্পরা আছেঃ

ব্রহ্মা বৃহস্পতয়ে প্রোবাচ, বৃহস্পতিরিন্দ্রায়েন্দ্রোভরদ্বাজায়, ভরদ্বাজ ঋষিভ্য ঋষয়ো ব্রাহ্মণেভ্যস্তং খল্বিমমক্ষর সমাম্নায়মিতি।

ঐতরেয়ারণ্যকে (২।২।৪) ইন্দ্রকর্তৃক ভরদ্বাজকে ঘোষবৎ এবং উষ্মবর্ণসমূহের উপদেশ দানের কথা আছে। দেবরাজ ইন্দ্রই যে প্রথম বাগ্‌বিভঞ্জক বৈয়াকরণ তাহার প্রমাণ আছে তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৬।৪।৭)। সেখানে কথিত আছে ঃ

> বাগ্‌বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাঽবদত্তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্নিমাং নো বাচং ব্যাকুর্বিতি। সোঽব্রবীৎ। বরং বৃণৈ মহ্যং চৈবৈষ বায়বে চ সহ গৃহ্যাতা ইতি। তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ গৃহ্যতে। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে।

অর্থাৎ পূর্বে যখন বাক্ অব্যাকৃত ছিল, তখন দেবগণ ইন্দ্রকে তাঁহাদের সেই বাক্ (ভাষা) বিভাগ করিতে বলিলে তিনি দেবতাদের নিকট হইতে বায়ুর সহিত একপাত্রে সোমরস-গ্রহণরূপ প্রার্থিত বর লাভ করিয়া সেই বাক্‌কে মধ্য হইতে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই হেতু ইহাকে ব্যাকৃতা (= বি-আ + কৃ +ক্ত + স্ত্রিয়াং টাপ্) বাক্ বলা হয়। এই প্রসঙ্গে মৈত্রায়ণীসংহিতা (৪।৫৮), কপিষ্ঠল সংহিতা (৪২।৩) এবং কাঠকসংহিতাও (২৭।৩) দ্রষ্টব্য।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় ইন্দ্রকর্তৃক যে বাগ্‌বিভাজনের কথা আছে, তাহা হইতেই ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের সূচনা। তৎপূর্বে তিনি বৃহস্পতির নিকট শব্দবিদ্যা অধিগত করিতে বসিয়া গুরুশিষ্য উভয়েই কিরূপ 'নাস্তানাবুদ' হইয়াছিলেন, তাহা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ব্যাকরণের 'লঘু' বা 'লাঘব'-রূপ প্রয়োজনের বর্ণনা-প্রসঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ব্যাকরণ-সূত্রপদ্ধতির অভাবে ইন্দ্রকে এক একটি করিয়া পদের উপদেশ দিতে গিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি দিব্য সহস্রবৎসরের চেষ্টাতেও সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। দিব্য সহস্রবৎসর = মনুষ্যমানের ১০০০ x ৩৬৫ বৎসর।

ইন্দ্রের সহযোগী বায়ুর বায়ব্য ব্যাকরণের উল্লেখ ভবিষ্যপুরাণে দেখিয়াছি। বায়ুপুরাণেও (২।৪৪) বায়ুকে 'শব্দশাস্ত্রবিশারদ' বলা হইয়াছে। পুরাপুরি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, বাগিন্দ্রিয় বা বাগ্‌যন্ত্রই (vocal organ) বায়ুর (নাদবায়ুর) সহযোগে যে বর্ণাত্মক ধ্বনির সৃষ্টি করে তাহা হইতেই ক্রমে অক্ষর-পদ-বাক্যরূপ বাচনক্রিয়ার বিকাশ—এই সত্যেরই ভিত্তিতে ঐ ইন্দ্র-বায়ুর কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে কি?

ইন্দ্রের ব্যাকরণ ইন্দ্র-শিষ্য ভরদ্বাজের মারফৎ ঋষিদের নিকট প্রচারিত হইয়া ক্রমে ঐন্দ্র ব্যাকরণ-সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। ভরদ্বাজের নিজের কোনো ব্যাকরণ ছিল কিনা বুঝা যায় না। অন্যত্র এক ভারদ্বাজের উল্লেখ আছে (দ্রঃ নিরুক্ত ৩।১৭, ৬।৩০, অষ্টাধ্যায়ী ৭।২।৬৩, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ১৭।৩)। এই ভারদ্বাজ হয়তো ভরদ্বাজের বংশধর। মহাভাষ্যের একাধিকস্থলে 'ভারদ্বাজীয়াঃ পঠন্তি' বলিয়া এক বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ভারদ্বাজের এক শিক্ষা- গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

সোমদেব-রচিত কথাসরিৎসাগরে (২।৬, ৪।১৫), জয়দ্রথ-রচিত 'হরচরিতচিন্তামণি'তে (২৭।৫১-২, ২৭।৭৯) এবং ক্ষেমেন্দ্র-প্রণীত 'বৃহৎকথামঞ্জরী'তে (কথাপীঠলম্বক, ২য় গুচ্ছ) বর্ণিত আখ্যায়িকা হইতে জানা যায়, (খ্রীঃ পূর্ব ৪র্থ শতাব্দীয়) মগধের নন্দরাজমন্ত্রী বররুচি কাত্যায়ন ঐন্দ্র ব্যাকরণের ছাত্র ছিলেন। পাটলিপুত্রনগরের অধিবাসী বর্ষ উপাধ্যায় তপস্যার দ্বারা স্বামিকুমার কার্ত্তিকেয়কে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট এই ব্যাকরণ লাভ করেন এবং কাত্যায়নকে তাহা শিক্ষা দেন। এই কাত্যায়নই পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিককার এবং শুক্লযজুঃ প্রাতিশাখ্যের রচয়িতা। শুক্লযজুর্বেদের পদপাঠও নাকি তাঁহারই রচনা। পাণিনি কিন্তু কোথাও ঐন্দ্র ব্যাকরণের নাম করেন নাই।

ঐন্দ্র ব্যাকরণের প্রভাব, প্রাতিশাখ্যাদির মধ্য দিয়া ক্রমে কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণে আসিয়া পৌছিয়াছে। ঐন্দ্রের প্রথম সূত্র 'অথ বর্ণসমূহঃ', তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের প্রথম সূত্র 'অথ বর্ণসমাম্নায়ঃ' এবং কাতন্ত্রের প্রথম সূত্র 'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ'। এই সাদৃশ্য লক্ষণীয়। শুক্লযজুঃ প্রাতিশাখ্যের একটি সূত্র 'অর্থঃ পদম্' (৩।২)। সম্ভবতঃ ইহা লক্ষ্য করিয়া দুর্গাচার্য তাঁহার নিরুক্তবৃত্তিতে লিখিয়াছেন, 'অর্থঃ পদমৈন্দ্রাণাম্', অর্থাৎ ঐন্দ্র ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের সূত্র 'অর্থঃ পদম্'। কেহ কেহ ইহাকে মূল ঐন্দ্র ব্যাকরণের সূত্ররূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। প্রাতিশাখ্যের সহিত কাতন্ত্রের পূর্বোক্তরূপ সাদৃশ্য খুব বেশিই দেখানো যায়। তবে ঐন্দ্র ব্যাকরণের নামে প্রচারিত তুলনাযোগ্য উপাদানের পরিমাণ খুব কম। এই ব্যাকরণে যে 'অকারাদি হকারান্তা

বর্ণমালা' অনুসৃত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইন্দ্রের সময় অর্থবত্তা পদে আরোপিত, পাণিনির সময়ে প্রাতিপদিকে।

মাহেশ ব্যাকরণ

ঋক্‌তন্ত্রে এবং মহাভাষ্যে বর্ণমালাকে বলা হইয়াছে 'ব্রহ্মরাশি' অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বর্ণরাশি। প্রাচীনকালে ইহাকে 'বর্ণমাতৃকা' বা 'মাতৃকাপাঠ' বা 'মাতৃকাবিবেক' অথবা 'সিদ্ধমাতৃকা' বলা হইত। সেই চিরপ্রসিদ্ধ বর্ণমালার অথবা বর্ণসমাম্নায়ের পাঠক্রমে পরিবর্তনও ঘটানো হইত প্রত্যাহার-সূত্র রচনার উদ্দেশ্যে। পাণিনির পূর্বেই এই প্রথার উদ্ভব।

প্রত্যাহারের অর্থ সংক্ষেপ করা বা সরাইয়া লওয়া। অতি সংক্ষেপে বর্ণঘটিত সন্ধি প্রভৃতির কার্য দেখাইতে পাণিনিকে অইউণ্, ঋ৯ক্, এওঙ্, ঐঔচ্ প্রভৃতি ১৪টি প্রত্যাহার-সূত্রের সাহায্য নিতে হয়। ফলে এইসব সূত্র হইতে প্রাপ্ত 'প্রত্যাহার-সংজ্ঞা'গুলির দ্বারা অন্যান্য সূত্ররচনায় তিনি অপূর্ব লাঘব বা সংক্ষিপ্ততা ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছেন—যাহাকে পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা সবিস্ময়ে আখ্যা দিয়াছেন 'Algebraical brevity' অর্থাৎ বীজগণিত-সুলভ সংক্ষেপ। প্রত্যাহার-সংজ্ঞাকরণের কৌশল এই যে, প্রত্যাহার-সূত্রগুলির শেষবর্ণের (ইৎ বা অনুবন্ধের) পূর্বে, পূর্ববর্তী (সূত্রসমূহের শেষবর্ণ বাদে) যে-কোন বর্ণ বসাইলে উভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত বর্ণ (অনুবন্ধ বাদে, অনুবন্ধ উচ্চারণার্থ) পূর্ববর্ণের সহিত পাওয়া যায়, যেমন 'অণ্' এই প্রত্যাহার-সংজ্ঞাদ্বারা অ-ই-উ এই তিন বর্ণের গ্রহণ বুঝায়। সেইরূপ 'অক্' বলিলে বুঝায় অ-ই-উ-ঋ-৯ এই পাঁচটি বর্ণ। 'অচ্' = সমস্ত স্বরবর্ণ, হল্ = সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণ, অল্ = সমস্ত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ। ১৪টি প্রত্যাহার-সূত্রের দ্বারা সিদ্ধ ৪১টি প্রত্যাহার-সংজ্ঞা অষ্টাধ্যায়ীতে ব্যবহৃত হইয়াছে। অল্পের দ্বারা বহুর গ্রহণ ইহাদের ফলশ্রুতি।

অন্য রূপ প্রত্যাহারও আছে, যেমন 'সুপ্' এবং 'তিঙ্'। প্রথমটিতে ১মাদি সাত বিভক্তিতে তিন বচনে 'সু' হইতে আরম্ভ করিয়া 'সুপ্' পর্যন্ত ২১টি শব্দবিভক্তির আকার এবং দ্বিতীয়টিতে লট্, লোট্ প্রভৃতি

দশ 'ল'কারে, পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদে, তিন পুরুষ ও তিন বচনে 'তিপ্' হইতে 'মহিঙ্' পর্যন্ত ১৮০টি (= ১০ x ২ x ৩ x ৩) ধাতু-বিভক্তির আকার বুঝায়। শব্দের অন্তে সুপ্-এবং ধাতুর অন্তে তিঙ্-বিভক্তির যে-কোনো একটি যুক্ত হইয়া যে যে পদ হয়, তাহাদিগকে যথাক্রমে সুবন্ত (= সুপ্ অন্তে যাহার) এবং তিঙন্ত (= তিঙ্ অন্তে যাহার) পদ বলে। তাই পাণিনি সূত্র করিয়াছেন 'সুপ্তিঙন্তংপদম্'। এই স্থলে তৎপূর্ববর্তী আপিশলির সূত্র ছিল 'বিভক্ত্যন্তংপদম্' অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা ধাতুই পদ।

পূর্বোক্ত লাঘবের অনুরোধে বৈয়াকরণগণ সূত্ররচনায় সংক্ষেপের এত বেশী পক্ষপাতী ছিলেন যে, ইহাকে আশ্রয় করিয়া একটা প্রবাদবাক্য (আসলে ইহা ব্যাকরণের একটি পরিভাষা সূত্র) দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—'অর্ধমাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যন্তে বৈয়াকরণাঃ' অর্থাৎ সূত্ররচনাকালে উহাকে যতদূর-সম্ভব সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া বৈয়াকরণগণ যদি উহা হইতে একটি হসন্ত (বা হলন্ত) বর্ণও কমাইতে পারিতেন, তবে তাঁহারা পুত্রের জন্মোৎসবের সমান আনন্দ অনুভব করিতেন। সম্ভবতঃ এই কারণে অশ্বঘোষ বৈয়াকরণকে 'অক্ষরচিন্তক' বলিয়াছেন (দ্রঃ সৌন্দরনন্দ ১২।৯)।

পূর্বোক্ত ১৪টি প্রত্যাহার-সূত্র 'শিবসূত্র' অথবা 'মাহেশ্বর সূত্র' বলিয়াও প্রসিদ্ধ।[৭] মূলতঃ এই প্রসিদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াই স্বয়ং মহেশকর্তৃক উপদিষ্ট এক ব্যাকরণের কল্পনা করা হয়। 'মহেশাদাগতম্' এই অর্থে ইহার নামও নির্দিষ্ট হইয়াছে 'মাহেশ' বা 'বেদাঙ্গমাহেশ'। নামমাত্র-সার এই ব্যাকরণের বস্তুতঃ কোনো অস্তিত্ব ছিল কিনা সেই বিষয়ে একেবারে নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই। এই বিষয়ে খুব প্রাচীন এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাব রহিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যপুরাণোক্ত রৌদ্র ব্যাকরণের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানা যায় নাই।

শিবানুচর (?) নন্দিকেশ্বরের নামে প্রচারিত 'কাশিকা' নাম্নী মাত্র ২৭-শ্লোকাত্মিকা এক পুস্তিকায় চতুর্দশ প্রত্যাহার-সূত্রের এক দার্শনিক ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে। উপমন্যু নামে এক শিব-ভক্ত ইহার 'তত্ত্ব-

বিমর্শিনী' নামে এক টীকাও রচনা করিয়াছেন। কাশিকার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোক বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ

"নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারম্।
উদ্ধর্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্ বিমর্শে শিবসূত্রজালম্।।
অত্র সর্বত্র সূত্রেষু অন্ত্যবর্ণচতুর্দশম্।
ধাত্বর্থং সমুপাদিষ্টং পাণিন্যাদীষ্টসিদ্ধয়ে।।"

নটরাজ শিব তাঁহার নৃত্তের শেষে তপস্যারত সনকাদি সিদ্ধদিগের উদ্ধারের জন্য যে ১৪ বার ঢক্কা (ডমরু) নিনাদ করিয়াছিলেন, তাহা শব্দবিদ্যালাভার্থী পাণিনির নিকট ১৪টি প্রত্যাহারসূত্ররূপে প্রতিভাত হয় এবং উহাদের শেষ ণ্ ক্ চ্ প্রভৃতি ১৪টি বর্ণ (ইৎ বা অনুবন্ধ) পাণিনির ইচ্ছাপূরণের জন্য 'ধাত্বর্থং' সমুপাদিষ্ট হইয়াছিল। 'ধাত্বর্থং' পদের ব্যাখ্যায় তত্ত্ববিমর্শিনী ঃ

ধাত্বর্থং ধাতুমূলকশব্দশাস্ত্রপ্রবৃত্ত্যর্থমিত্যর্থঃ। তথাচোক্তমিন্দ্রেণ 'অন্ত্যবর্ণসমুদ্ভূতা ধাতবঃ পরিকীর্তিতাঃ'।

এখানে ঐন্দ্র ব্যাকরণের একটি শ্লোকাত্মক সূত্র পাওয়া যাইতেছে যাহার অর্থ ঃ 'ধাতুসমূহ অন্ত্যবর্ণসমুদ্ভূত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।' তাই, টীকাকারের মতে, ধাতুমূলক শব্দশাস্ত্ররচনায় প্রবৃত্তির জন্য প্রত্যাহার-সূত্রগুলির শেষ ১৪টি বর্ণ উপদিষ্ট হইয়াছিল।

অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের রচনা বলিয়া অনুমিত দুই/একটি শ্লোকে মাহেশ বা মহেশ্বরোপদিষ্ট ব্যাকরণের কথা আছে, যেমন ঃ

"সমুদ্রবদ্ ব্যাকরণং মহেশ্বরে তদর্ধকুম্ভোদ্ধরণং বৃহস্পতৌ।
তদ্ভাগভাগাচ্চ শতং পুরন্দরে কুশাগ্রবিন্দুৎপতিতং হি পাণিনৌ।।"

সারস্বত ব্যাকরণের ভাষ্যে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি প্রথমে কে কোথায় কি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। এই শ্লোকে সুপ্রাচীন ব্যাকরণ-গুলির মধ্যে তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে, মহেশ্বরের ব্যাকরণ সমুদ্রের মতো বিশাল, সেই ব্যাকরণ-সমুদ্রের অর্ধকলসী জলের সমান বৃহস্পতির ব্যাকরণ, ইহার ভাগের ভাগ শতভাগের সদৃশ ইন্দ্রের ব্যাকরণ এবং সেই ব্যাকরণের এক কুশাগ্রবিন্দু লইয়া পাণিনির ব্যাকরণ রচিত। আবার সপ্তশতী চণ্ডীর গোপালচক্রবর্তিরচিত টীকার প্রারম্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ

"যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
কিং তানি পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে।।
ন দৃষ্টমিতি বৈয়াসে শব্দে মা সংশয়ং কৃথাঃ।
অজ্ঞৈরজ্ঞাতমিত্যেবং রত্নং কিং ন হি বিদ্যতে।।"

মহাভারতের 'জ্ঞানদীপিকা' টীকার প্রারম্ভে টীকাকার দেববোধও এই শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে 'মাহেশাদ্' স্থলে 'মাহেন্দ্রাদ্' পাঠ দৃষ্ট হয়। শুনা যায়, মহাকবি কালিদাস একদা কাশীধামে উপস্থিত হইয়া সেখানে প্রতিষ্ঠিত মহর্ষি বেদব্যাসের শ্রীমূর্তিদর্শনে তাঁহার প্রকাণ্ড উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্লেষপূর্বক বলিয়াছিলেন যে আরও কত আর্ষ প্রয়োগ সেই উদরে ছিল বলা অসাধ্য, অর্থাৎ পাণিনিব্যাকরণ-বিরুদ্ধ বহু পদ ব্যাস-প্রণীত মহাভারতাদিতে সন্নিবিষ্ট হওয়ার পরেও, আরও কত যে ঐরূপ অশুদ্ধ পদ ব্যাসের পেটে ছিল বলা যায় না। এই উক্তির পরেই নাকি উদ্ধৃত শ্লোক দুইটি দৈববাণীরূপে শুনা যায়, অথবা পার্শ্ববর্তী কোনো চতুর-রসজ্ঞ পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ উহা রচনা করিয়া কবিকে শুনাইয়া দেন। উহার অর্থঃ ব্যাসদেব মাহেশরূপ ব্যাকরণসমুদ্র হইতে যেসব রত্নসদৃশ পদ উদ্ধার করিয়া স্বীয় গ্রন্থাদিতে সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, পাণিনির ব্যাকরণ-গোষ্পদে সেইসব কি করিয়া থাকিবে? সচরাচর দেখা যায় না বলিয়াই ব্যাস-ব্যবহৃত শব্দসমূহের সাধুত্ববিষয়ে সংশয় করা অনুচিত, কারণ অজ্ঞের নিকট অজ্ঞাত হইলেই কোন রত্নের অভাব প্রমাণিত হয় না।

পূর্বকথিত কথাসরিৎসাগরাদি গ্রন্থে এবং ভবিষ্যপুরাণে পাণিনিকে এক জড়বুদ্ধি শিক্ষার্থিরূপে দাঁড়া করাইয়া, তাঁহাকে ঐন্দ্র ব্যাকরণের ছাত্র কাত্যায়নাদি-কর্তৃক অবহেলিত ও অবমানিত, পরে হিমালয়ে তপস্যাবলে মহাদেবের কৃপায় লব্ধবিদ্য এবং শেষে কাত্যায়নাদির সহিত ব্যাকরণ-বিচারে জয়ী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিচারের ফলে ঐন্দ্র ব্যাকরণ নষ্ট হয় এবং তৎপরিবর্তে পাণিনিলব্ধ শব্দবিদ্যার অভ্যুদয় ঘটে।

লক্ষণীয় এই যে, কোথাও মাহেশ ব্যাকরণের গ্রন্থীভূত অবস্থার তেমন স্পষ্ট কোনো আভাস পাওয়া যায় না। ত্রিমুনিব্যাকরণের কোথাও

এই বিষয়ের সামান্যতম উল্লেখও নাই। পাণিনীয় শিক্ষায় আছে ঃ 'শঙ্করঃ শাঙ্করীং প্রাদাদ্ দাক্ষীপুত্রায় ধীমতে।' এবং

যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাদ্।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ।।

ভবিষ্যপুরাণে ঃ

ইতিশ্রুত্বামহাদেবঃ সূত্রাণি প্রদদৌ মুদা।
সর্ববর্ণময়ান্যেব অইউণাদি শুভানি বৈ।। ২।৩১।১০

এইসব স্থলে মহাদেবের নিকট হইতে পাণিনির কেবল বর্ণবিষয়ক সাহায্য লাভের কথাই বলা হইয়াছে। কাশিকাপ্রণেতা নন্দিকেশ্বরের মূল বক্তব্যও তাহাই। তিনিও বর্ণাতিরিক্ত মহেশোপদিষ্ট কোন নিদর্শন উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই।[৮] আমাদের বিবেচনায়, এই সবই কিংবদন্তীমূলক এবং সেই কিংবদন্তীও খুব প্রাচীন নয়, অন্ততঃ মহাভাষ্যকার এই সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অনেক পরে অবশ্য পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী তথা ত্রিমুনিব্যাকরণকেই পূর্বোক্ত কারণে 'মাহেশ্বর' ব্যাকরণও বলা হইয়াছে ঃ

তদেতৎত্রিমুনিব্যাকরণং বেদাঙ্গং মাহেশ্বরমিত্যাখ্যায়তে।
—মধুসূদন সরস্বতী (প্রস্থানভেদ)

পদবিত্তম শাকল্য

উদীচ্য ধারার অতি প্রাচীন বেদাচার্য শাকল্য—বৈদিক ব্যাকরণে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ঋগ্‌বেদের পদপাঠ তাঁহারই রচনা। এইজন্য বায়ুপুরাণে (৬০।৬৩) তাঁহাকে 'পদবিত্তম' বলা হইয়াছে। তিনি ঋগ্‌বেদের শাকল-শাখারও প্রবর্তক। এই শাখারই প্রাতিশাখ্য—যাহা ঋগ্‌বেদপ্রাতিশাখ্য নামে শৌনকপ্রণীত বলিয়া কথিত, তাহার সহিতও শাকল্যের সংস্রব অবিসংবাদিত।

বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে তাঁহার যে 'বিদগ্ধ', 'স্থবির' এবং 'বৃদ্ধ' বিশেষণ দেখা যায়, সেই সবই একই ব্যক্তির উদ্দেশে প্রযুক্ত কি না সন্দেহজনক। তা'ছাড়া, বেদমিত্র এবং দেবমিত্র এই নাম দুইটি শাকল্যের সহিত একত্রে ব্যবহৃত হওয়ায় দুইজন শাকল্যের অস্তিত্ব

সূচিত হয়। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে (৪।৪) এক 'শাকল্যপিতা'র উল্লেখ আছে। সেখানে স্থবির শাকল্য (২।৮১) এবং বেদমিত্রের (১।২১) মতও উদ্ধৃত হইয়াছে। বিভিন্ন পুরাণে ইঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। সেই সব পর্যালোচনায় মনে হয়, শকলের পুত্র—বেদমিত্র শাকল্য বা স্থবির শাকল্য বা বৃদ্ধ শাকল্য এবং তাঁহার পুত্রই দেবমিত্র শাকল্য—যাঁহাকে বৈদিক সাহিত্যে বিদগ্ধ শাকল্য এবং পুরাণে পদবিত্তম বলা হইয়াছে। তদনুসারে ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের পূর্বোক্ত শাকল্য-পিতা, স্থবির শাকল্য ও বেদমিত্র একই ব্যক্তি।

পৌরাণিকমতে শাকল্য সত্যশ্রী'র শিষ্য হইলেও ভাগবতে (১২।৬। ৫৬-৭) বর্ণিত আছে যে, তিনি পিতা বেদমিত্রের নিকট প্রাপ্ত সংহিতাকে বিভক্ত করিয়া পাঁচজন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। ইঁহাদের নাম মুদ্‌গল, গোখল (বা গোখল্য), বাৎস্য, শালীয় (বা খালীয়) ও শিশির। ভাগবতে (১২।৬।৫৮) জাতূকর্ণ্যকেও তাঁহার শিষ্য বলা হইয়াছে। শৌনকীয় চরণব্যূহের টীকাকার মহিদাসের মতে শাকল্য তৎপ্রাপ্ত সংহিতাকে 'সংহিতা', 'পদ', 'ক্রম', 'জটা' ও 'দণ্ড'রূপ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া ঐ পঞ্চশিষ্যকে দান করেন। ঐ পাঁচ ভাগের প্রথম তিনটি অর্থাৎ সংহিতা, পদ ও ক্রম—বেদের প্রকৃতিপাঠ রূপে অভিহিত। বাকী দুইটি জটাদি অষ্ট বিকৃতিপাঠের[৯] অন্তর্গত। এই সমস্ত পাঠই মূলতঃ শাখাভেদে বেদকে অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করিবার জন্য পরিকল্পিত।

মহিদাসের ঐ ব্যাখ্যাগ্রহণে কিছু অসুবিধা আছে। বিভিন্ন পুরাণে এই স্থলের মূল অংশে যে বর্ণনা আছে তাহার সহজ অর্থে কিন্তু ঐরূপ অভিপ্রায় বুঝা যায় না। শাকল্যের সংহিতা তাঁহার পাঁচজন শিষ্যের মধ্য দিয়া পাঁচটি পৃথক্ শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে—ইহাই মূল বক্তব্য ('পঞ্চৈতে শাকলাঃ শিষ্যাঃ শাখাভেদপ্রবর্তকাঃ')। তা'ছাড়া বৈদিক শাখার পদপাঠাদি কোন প্রকৃতি- বা বিকৃতি-পাঠ মাত্রকে অবলম্বন করিয়া কোন শিষ্য সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না বা কোন শিষ্য-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতে পারে না।

শিবপুরাণের ধর্মসংহিতাভাগের ২য় অধ্যায়ে (২৫-৭) বর্ণিত আছে যে, শাকল্য নয়শত বর্ষকাল শিবের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট

গ্রন্থকর্তা ও সূত্রকর্তা হইবার বর লাভ করেন। স্কন্দপুরাণের প্রভাস-খণ্ডের অন্তর্গত প্রভাসক্ষেত্র-মাহাত্ম্যের ৭৪ অধ্যায়ে (১-১৩) শাকল্য-কর্তৃক শিবের আরাধনাপূর্বক তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করার এবং তৎপ্রভাবে তথাকার প্রাচীন শিবলিঙ্গের 'শাকল্যেশ্বর' নামে খ্যাত হইবার কথা আছে।

শতপথব্রাহ্মণের দুই স্থানে (১১।৪।৬।১–১১, ১৪।৩।৭।১–২৮) প্রথমে সংক্ষেপে এবং পরে বিস্তৃতভাবে জনকরাজার যজ্ঞে বিদগ্ধ শাকল্যের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নোত্তরমূলক ব্রহ্মবিচারের বর্ণনা দেখা যায়। এই বিচার-বিবাদের শেষে শাকল্য পরাজিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের শাপে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং দাহ করিবার জন্য শিষ্যগণকর্তৃক বস্ত্রবদ্ধ অবস্থায় নীয়মান তাঁহার দেহাস্থিও দস্যুগণকর্তৃক মূল্যবান্ বস্তুভ্রমে অপহৃত হয়।

শব্দাধিকারে শাকল্য পদকাররূপেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে তিনি এত বেশি প্রামাণিক ও সুখ্যাত ছিলেন যে, পরবর্তী গ্রন্থকারগণ 'পদকার' বলিতে এক বাক্যে শাকল্যের নাম করিয়াছেন। পদকারগণের মধ্যে ইহা তাঁহার অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

ব্যাকরণাত্মক রচনার প্রাচীনতম নিদর্শন এই পদপাঠ। কেবল বেদকে অবিকৃত রাখাই নয়, বেদের অর্থবোধে সহায়তা করাও পদপাঠের আর এক প্রধান কার্য। পদপাঠই বেদের আদিম ব্যাকরণমূলক ব্যাখ্যা। তাই ভট্টোজি দীক্ষিত শব্দকৌস্তুভে (১।১।৭) পদকারগণকে ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন: 'পদকারাস্তু ব্যাখ্যাতারঃ।' পরবর্তী সময়ে নিরুক্তে নির্বচনের যে উন্নততর রূপ দেখা যায়, তাহার প্রাগ্‌রূপ এই পদপাঠ। এই উদ্দেশ্য সাধনে নিতান্ত অপরিহার্যরূপেই পদকারগণকে যে ব্যাকরণজ্ঞানের পরিচয় দিতে হইয়াছিল, ব্যাকরণের ইতিহাস-চিন্তায় তাহার গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁহাদের এই জ্ঞানের গতি-প্রকৃতির পর্যালোচনার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে যে তাঁহাদের পূর্বেও ব্যাকরণ-বিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুপ্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল এবং তাহা পদকারগণের সময়ে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, বর্তমানের তুলনায় তাহাকে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর বলা

চলে না। পরন্তু এমনও বলা চলে যে, তখনকার ব্যাকরণচর্চা একটা যথোপযুক্ত উন্নত পর্যায়ে পৌঁছিবার ফলেই বৈদিক পদপাঠাদির রচনা সম্ভবপর হইয়াছিল; অর্থাৎ পদপাঠ উন্নত ব্যাকরণ-বিদ্যার অনুশীলনেরই পদশ্রুতি।

ঋষিগণ প্রথমে সন্ধি-স্বর-সমাসাদিসম্বলিত বৈদিকমন্ত্রাবলীই উচ্চারণ করিয়াছিলেন—যাহার জন্য তাঁহাদিগকে কোন কৃত্রিম বহিরঙ্গ ব্যাকরণের অনুশাসন মানিতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এই আদিম অবস্থার মন্ত্রগুলিকেই তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৬।৪।৭) 'অব্যাকৃতা বাক্' বলা হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য ইহাকে 'সমুদ্রাদিধ্বনিবদেকাত্মিকা' অর্থাৎ 'পদবাক্যাদিবিভাগরহিতা' বলিয়াছেন। এই অখণ্ড বা একাত্মক বৈদিক মন্ত্রগুলিকে বোধসৌকর্যের জন্য ক্রমে সংহিতা, পদ, ক্রম ইত্যাদিরূপে বিন্যস্ত করা হয়। বর্তমানে আমরা মূল বেদকে এই সংহিতারূপেই পাইতেছি। ইহাই বেদের সংহিতাপাঠ। সংহিত (সংযুক্ত) পদরাশিই সংহিতা। ইন্দ্রাদি প্রাচীন ঋষিগণ অখণ্ড বাঙ্ময় বেদকে সংহিতাদি খণ্ডরূপে ব্যাকৃত করার সূচনা করেন।

পদপাঠে পদকারগণ এই সংহিতাবদ্ধ পদগুলিকেই বিচ্ছিন্ন করিয়া বিন্যস্ত করেন। এই কার্যে ব্যাকরণ-ঘটিত স্বর ও সন্ধির বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। সংহিতা শব্দ মূলতঃ সন্ধি অর্থেই ব্যবহৃত। দুইটি বর্ণ বা অক্ষরের মিলনের নামই সন্ধি বা সংহিতা। ক্রমে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে সন্ধিবদ্ধ পদসমষ্টি তথা বাঙ্ময় বেদ বুঝাইতেও এই 'সংহিতা'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাই ঋগাদি-চতুর্বেদকে 'ঋগাদি চতুঃ সংহিতা' বলা হয়।

সংহিতার এই প্রাথমিক অর্থেই প্রাতিশাখ্যে ও নিরুক্তে পদকে সংহিতার মূল বা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। ঋক্প্রাতিশাখ্যে সূত্রিত হইয়াছে —'সংহিতা পদপ্রকৃতিঃ' (২।১) এবং নিরুক্তে (১।৬।১) 'পদ-প্রকৃতিঃ সংহিতা' অর্থাৎ পদ প্রকৃতি যাহার, তাহাই সংহিতা। আগে পদ এবং পরে একাধিক পদের মধ্যে সন্ধিগত মিলন—এই ক্রমকে অনুসরণ করিয়াই প্রাতিশাখ্যাদিতে ঐরূপ বলা হইয়াছে। তা'ছাড়া পদপাঠকে কি উপায়ে সংহিতাপাঠে পরিণত করা যায়, তাহার নিয়ম নির্দেশ করাই প্রাতিশাখ্যের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। তাই প্রাতিশাখ্যকারদের পক্ষে

ঐরূপ বলাই স্বাভাবিক। কিন্তু সংহিতা-শব্দের দ্বিতীয় ও ব্যাপকতর অর্থে বৈদিকসংহিতাকেই প্রকৃতি বা মূল ধরিয়া পদপাঠকেই উহার বিকৃতি বা বিকার বলা হয়। বৈদিক ঋষিরা মন্ত্রসমূহের দর্শন ও প্রকাশ অখণ্ডরূপেই করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিতে বৈদিক সংহিতা অপৌরুষেয় এবং ইহার পদপাঠই পৌরুষেয় বা কৃত্রিম। তাই মহাভাষ্যকার লিখিয়াছেন ঃ

> ন লক্ষণেন পদকারা অনুবর্ত্যাঃ পদকারৈর্নামলক্ষণমনুবর্ত্যম্। যথালক্ষণং পদং কর্তব্যম্।—মহাভাষ্য ৩।১।১০৯, ৬।১।২০৭, ৮।২।১৬।

অর্থাৎ ব্যাকরণ পদকারগণের অনুসরণ করিবে না, পদকারগণই ব্যাকরণের অনুসরণ করিবেন। ব্যাকরণের নিয়মানুসারেই পদপাঠ প্রস্তুত করিতে হইবে। পদপাঠে যে কেবল স্বর ও সন্ধিজ্ঞানেরই পরিচয় আছে এমন নয়, পরন্তু সমস্ত-পদের বিগ্রহ অর্থাৎ সমাস এবং তিঙন্ত ও সুবন্ত পদের উপসর্গ ও প্রত্যয়াদির পৃথক্করণসম্বন্ধেও পদকারদের পটুতা দেখা যায়। মোট কথা, শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়াদির বিশ্লেষণ-ভিত্তিক যে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন ব্যাকরণ-শাস্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাহার আভাস পদপাঠে পাওয়া যায়।

নিরুক্তে (৬।২৮) একবার মাত্র শাকল্যের উল্লেখ থাকিলেও উহার বিভিন্ন স্থলের পর্যালোচনায় মনে হয় যে নিরুক্তরচনায় শাকল্যের পদপাঠ হইতে প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

শাকল্যের নিকট, যাস্কের পরেই, যিনি প্রধান ঋণী—তিনি বৈয়াকরণ-শিরোমণি পাণিনি। শাকল্যের পদপাঠের ভাণ্ডার হইতে এই ঋণ ঋক্প্রাতিশাখ্যের পথে পাণিনিতন্ত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পাণিনি চারিটি সূত্রে (১।১।১৬, ৬।১।১২৭, ৮।৩।১৯, ৮।৪।৫১) স্পষ্টতঃ শাকল্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার 'ঋত্যকঃ' (৬।১।১২৮) সূত্রে শাকল্যের নাম না করা হইলেও, ইহাতে তাঁহার মতেরই নির্দেশ রহিয়াছে। এইসব সূত্রে শাকল্যের যেসব মতের উদ্দেশ আছে, সে সবই সন্ধিবিষয়ক। সবই ঋক্প্রাতিশাখ্যে বর্তমান। বলা বাহুল্য, এই প্রাতিশাখ্য হইতেই পাণিনি সর্বাধিক গ্রহণ করিয়াছেন। পদপাঠকে সংহিতায় পরিণত করিতে শাকল্য-প্রদর্শিত নিয়মগুলিই পরে শৌনকের

সম্পাদনায় বর্তমান ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের (বা শাকলপ্রাতিশাখ্যের) রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মোট কথা, পদকারগণ পদপাঠরচনায় যে ব্যাকরণ-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, প্রাতিশাখ্যে তাহারই প্রতিফলন ঘটিয়াছে।

অন্যান্য প্রাচীন বৈয়াকরণ

পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীতে যে দশজন পূর্বাচার্যের নাম করিয়াছেন, শাকল্য বাদে তাঁহাদের বাকী নয় জন ঃ আপিশলি (পাণিনিসূত্র ৬।১। ৯২), সেনক (ঐ ৫।৪।১১২), কাশ্যপ (১।২।২৫), শাকটায়ন (৩। ৪।১১১, ৮।৩।১৮, ৮।৪।৫০), ভারদ্বাজ (৭।২।৬৩), স্ফোটায়ন (৬।১।১২৩), চাক্রবর্মণ (৬।১।১৩০), গালব (৬।৩।৬১, ৭।১। ১৭৪, ৭।৩।৯৯, ৮।৪।৬৭) এবং গার্গ্য (৭।৩।৯৯, ৮।৩।২০, ৮। ৪।৬৭)। ইঁহাদের রচিত ব্যাকরণ-বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রায় কিছুই এখন আর পাওয়া যায় না। পরবর্তী গ্রন্থাদিতে ইঁহাদের নামে প্রচলিত কিছু উদ্ধৃতি-জাতীয় উপাদানের মধ্যেই কেবল ইঁহারা টিকিয়া আছেন।

এইসব আচার্যদের মধ্যে আপিশলিকে পাণিনির অব্যবহিত পূর্ববর্তী বলিয়া অনুমান করা হয়। অপিশলের অপত্য আপিশলি। জৈন শাকটায়নের অমোঘা বৃত্তিতে উদাহৃত 'অষ্টকা আপিশলপাণিনীয়াঃ' হইতে জানা যায়, পাণিনির ব্যাকরণের ন্যায় আপিশলির ব্যাকরণও আট অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। এই ব্যাকরণ এবং ইহার ছাত্র বুঝাইতে 'আপিশল' শব্দ ব্যবহৃত হইত। তাঁহার নামে এক শিক্ষাগ্রন্থ এখনও বর্তমান আছে। 'অক্ষরতন্ত্র' নামে প্রাপ্ত আর এক গ্রন্থও বোধহয় তাঁহার রচনা। তিনি এক গণপাঠও প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন (দ্রঃ মহাভাষ্য-প্রদীপ ১।১।৩৩)। পাণিনির 'বাসুপ্যাপিশলেঃ' (৬।১।৯২) সূত্র হইতে জানা যায়, আপিশলি সুপ্‌ প্রত্যাহার ব্যবহার করিয়াছিলেন। 'সময়াদীনাং কর্মপ্রবচনীয়ত্বম্'[১০] এবং 'অস্'ধাতুর সংক্ষিপ্ত রূপ 'স্'-এর ব্যবহার[১১] তাঁহার ব্যাকরণে দৃষ্ট হইত। এই ধাতুরূপের গুণ-বৃদ্ধি 'অ'- এবং 'আ'-কে তিনি আগম বলিয়া জানিতেন।

ভারদ্বাজ আরও প্রাচীন। তাঁহার নামে এক শিক্ষা এখনও টিকিয়া আছে। তাঁহাকে ভরদ্বাজের অপত্য (পা. ৪।১।৯২) বলিয়া গ্রহণ করা চলে। অষ্টাধ্যায়ীর অন্যত্র (৪।২।১৪৫) দেশবাচক ভারদ্বাজ শব্দের

উল্লেখ হইতে প্রমাণিত হয়, ভারদ্বাজের বংশধরগণের আবাস-ভূমিকেও 'ভারদ্বাজ' বলা হইত।

শাকটায়ন ছিলেন পূর্বকথিত নয় জনের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিভাধর বৈয়াকরণ। শব্দ বিদ্যায় তাঁহার এবং তাঁহার পিতা ও পিতামহের অবদান একাধারে গ্রথিত হইয়া যে চারি অধ্যায়ের ব্যাকরণ তাঁহার (শাকটায়নের) নামে প্রচলিত ছিল, তাহাকেও 'ত্রিমুনিব্যাকরণ' বলা হইত। শাকটায়ন-রচিত ঋক্‌তন্ত্রের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার কোন কোন সূত্রের সহিত অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রঘটিত কিছু কিছু মিল দেখা যায়। পাণিনির 'ব্যোর্লঘুপ্রযত্নতরঃ শাকটায়নস্য' (৮।৩।১৮) সূত্র হইতে জানা যায়, শাকটায়নের বর্ণমালায় (প্রত্যাহারে?) বকারের পর যকার পঠিত হইত। অষ্টাধ্যায়ীর কাশিকাবৃত্তির উদাহরণ 'অনুশাকটায়নং বৈয়াকরণাঃ' এবং 'উপশাকটায়নং বৈয়াকরণাঃ' (১।৪।৮৬-৭)-র অর্থ 'শাকটায়নমপেক্ষ্যান্যে বৈয়াকরণা হীনাঃ' (-ন্যাস)—অর্থাৎ শাকটায়নের সহিত তুলনায় অন্য বৈয়াকরণগণ নিম্নস্তরের।

সমস্ত শব্দই ধাতু হইতে উৎপন্ন—ইহা শাকটায়নের একটি বিশেষ মত। এই মতের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অব্যুৎপন্ন শব্দাবলীর ব্যুৎপত্তি দেখাইতে[১২] সচেষ্ট হইয়া যে সূত্রসমূহ প্রণয়ন করেন, তাহা উণাদিসূত্রপাঠ নামে এখনও টিকিয়া আছে। তাঁহার আর একটি মত—উপসর্গগুলি অর্থের দ্যোতক হওয়াসত্ত্বেও অর্থের বাচক নয়, অর্থাৎ তাহারা অন্য ধাতু বা শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া নব নব অর্থের সৃষ্টি করিলেও তাহাদের নিজস্ব কোনো পৃথক্ অর্থ নাই। বৈয়াকরণ গার্গ্য শাকটায়নের প্রথম মতটি (শব্দের ধাতুজত্ব) সর্বাংশে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না,[১৩] দ্বিতীয় মতের ক্ষেত্রেও তাঁহার আপত্তি ছিল। যাস্কের নিরুক্তে (১।৩, ১।১২) এবং মহাভাষ্যে (৩।৩।১) এইসব কথা আছে। মহাভাষ্যকার 'পরোক্ষে লিট্' (৩।২।১১৫) সূত্রের 'পরোক্ষ' শব্দের অর্থ-বিবেচনা-প্রসঙ্গে, কেহ যে জাগ্রদ্ অবস্থাতেও বর্তমানকাল সম্বন্ধে অনবহিত থাকিতে পারে তাহার উদাহরণস্বরূপ বৈয়াকরণ শাকটায়নের জীবনী হইতে এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন ঃ একদা শাকটায়ন রথমার্গে (রাজপথে) আসীন হইয়াও (গভীর চিন্তায়

মগ্ন থাকার দরুন) তাঁহারই নিকট দিয়া চলমান শকটসমূহ দেখিতে পান নাই।

বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য (৩।৯-১০) হইতে জানা যায়, বিসর্গের পরবর্তী 'শ-ষ-স'র অবস্থান-সম্বন্ধে শাকল্যের সহিত শাকটায়নের কিঞ্চিৎ মতপার্থক্য ছিল। শাকটায়নের মতে বিসর্গ লুপ্ত হইয়া পরবর্তী বর্ণ দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়, শাকল্যের মতে তাহা হয় না, বিসর্গ বর্তমান থাকে। আজকাল এই বিষয়ে শাকল্য-মতের অনুসরণই অবশ্য বেশি চোখে পড়ে। উপসর্গ-সম্বন্ধে শাকটায়নের আর একটি মত বৃহদ্দেবতাগ্রন্থে (২।৯৫) এইভাবে বর্ণিত আছে :

আবিঃশ্রদন্তরিত্যেতানাচার্যঃ শাকটায়নঃ।
উপসর্গান্ ক্রিয়াযোগান্ মেনে তে তু ত্রয়োঽধিকাঃ।।

অর্থাৎ শাকটায়নের মতে 'আবিস্', 'শ্রৎ' এবং 'অন্তর্'—এই তিনটিও উপসর্গ এবং প্রচলিত ২০টি উপসর্গের অতিরিক্ত। কোথাও বা 'আবিঃ' স্থলে 'আচ্ছ' বা 'অছ' পাঠও দেখা যায়। শাকটায়নের মতের অনুসরণে সারস্বত ব্যাকরণে ঐ তিনটিকে প্রাদি উপসর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

বৈয়াকরণ গার্গ্য ছিলেন শাকটায়নের প্রবল প্রতিপক্ষ। উভয়ের মতবিরোধের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রাতিশাখ্যাদিতে গার্গ্যের স্বাধীন মতের পরিচয় পাওয়া যায়। এককভাবেও উপসর্গ অর্থের বাচক—এই গার্গ্যমতের সমর্থনে নিরুক্তকার যাস্ক বিংশতি উপসর্গের অর্থ প্রদান করিয়াছেন। গার্গ্য সামবেদের কৌথুমী শাখার পদপাঠ প্রস্তুত করেন। তাঁহার উপসর্গপ্রিয়তা অর্থাৎ উপসর্গের স্বতন্ত্র অর্থবত্তাসম্বন্ধে তাঁহার মতাদর্শ এই পদপাঠেও প্রকটিত। সেখানে তিনি পদ হইতে উপসর্গগুলিকে পৃথক্ করিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু শাকল্য অনুরূপ স্থলে তাহা করেন নাই। উভয়ের পদপাঠের মধ্যে আর একটি পার্থক্য এই যে, গার্গ্যের পদপাঠে পুনরুক্ত পদের লোপ হয় না, কিন্তু শাকল্যের পদপাঠে লোপ হয়।

গর্গের পুত্র গার্গি, গার্গির পুত্র গার্গ্য। বিষ্ণুপুরাণে (৪।১৯।২৩) এবং ভাগবতে (৯।২১।১৯) গর্গের পুত্র শিনি'কে গার্গ্যের পিতা বলা হইয়াছে এবং আরও বলা হইয়াছে যে গার্গ্যের জন্ম বিষয়ে ক্ষত্রিয়-

সংস্রব থাকাসত্ত্বেও তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হন। শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।৫।১।১) তথা বৃহদারণ্যকোপনিষদে (২।১।১) এক 'দৃপ্তবালাকি গার্গ্যে'র সন্ধান পাওয়া যায়। বলাকার পুত্র বলিয়া 'বালাকি'। তিনি বিদ্যাগর্বিত হইয়া রাজা অজাতশত্রুর পূর্বপক্ষরূপে তাঁহার সহিত ব্রহ্মবিচারে প্রবৃত্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত সুবিধা করিতে না পারিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইনিই শাকটায়নের প্রতিদ্বন্দ্বী বৈয়াকরণ গার্গ্য কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি আরও প্রাচীন।

চক্রবর্মার পুত্র চাক্রবর্মণ। উণাদিসূত্রপাঠেও (৩।১৪৪) চাক্রবর্মণের মতোল্লেখ আছে। বায়ুপুরাণে (৬৮।৩২) বলি'র পুত্ররূপে এক চক্রবর্মার উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি নাকি পূর্বজন্মে কর্ণ ছিলেন। আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৩।৬।৩৩) চক্রবর্মার পিতাকে 'বল' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শব্দকৌস্তুভে (১।১।২৭) ভট্টোজির উক্তি হইতে জানা যায়, চাক্রবর্মণের ব্যাকরণে 'দ্বয়' শব্দের সর্বনামত্ব (সকল বিভক্তিতেই) উপদিষ্ট হইয়াছিল। পাণিনির মতে (১।১।৩৩) কিন্তু 'দ্বয়'শব্দের কেবল প্রথমা বিভক্তির বহুবচনে সর্বনামের মতো কার্য হয় বিকল্পে (দ্বয়ে, দ্বয়াঃ)।

কাশিকার ব্যাখ্যা পদমঞ্জরীতে (৬।১।১২৩) স্ফোটায়নকে 'স্ফোটপ্রতিপাদনপরো বৈয়াকরণাচার্যঃ' বলা হইয়াছে। এই মতে 'স্ফোটোঽয়নং পরায়ণং যস্য স স্ফোটায়নঃ।' 'লঘুশব্দেন্দুশেখরে' নাগেশ ভট্ট লিখিয়াছেন ঃ

> স্ফোটোঽয়নং যস্য সঃ। স্ফোটপ্রতিপাদক ইত্যর্থঃ।...স্ফোটায়নোঽবঙঃ স্মর্তা...।

তৎপ্রবর্তিত স্ফোটবাদের ভিত্তিতে তিনি হয়তো কোন ব্যাকরণাত্মক গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। স্ফোটকে শব্দার্থের একীভূত বিগ্রহরূপে আবিষ্কার করিয়া ক্রমে বৈয়াকরণগণ ইহাকে শব্দব্রহ্মে তথা পরব্রহ্মে আনিয়া মিলাইয়াছেন। হেমচন্দ্রের 'অভিধানচিন্তামণি'তে এবং কেশবরচিত 'নানার্থার্ণবসংক্ষেপ' নামক অভিধানে স্ফোটায়নের 'কক্ষিবান্' নাম পাওয়া যায়।

গৃহপতি শৌনক

পূর্বোক্ত দশ বৈয়াকরণের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও বৈদিক ব্যাকরণসাহিত্যে শৌনক একটি উল্লেখযোগ্য নাম। শুনকের গোত্রাপত্য শৌনক। বৈদিক এবং পৌরাণিক সাহিত্যে 'স্বৈদায়ন' শৌনক, 'গৃৎসমদ' শৌনক, 'ইন্দ্রোতদৈবাপ' শৌনক প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বায়ুপুরাণের (৯২।৪) মতে গৃৎসমদের পুত্র শুনক এবং তৎপুত্র শৌনক। বিষ্ণুপুরাণে (৪।৭।৬) গৃৎসমদের পুত্রই শৌনক। কাত্যায়নরচিত 'সর্বানুক্রমণী'র ব্যাখ্যায় ষড়্‌গুরুশিষ্য, শৌনক-প্রণীত দশখানি গ্রন্থের নাম করিয়াছেনঃ (১) আর্ষানুক্রমণী, (২) ছন্দোঽনুক্রমণী, (৩) দেবতানুক্রমণী, (৪) অনুবাকানুক্রমণী, (৫) সূক্তানুক্রমণী, (৬) ঋগ্‌বিধান, (৭) পাদবিধান, (৮) বৃহদ্দেবতা, (৯) ঋগ্‌বেদপ্রাতিশাখ্য এবং (১০) স্মৃতিগ্রন্থ। অনুক্রমণী = ক্রমান্বয়ে লিখিত বিষয়ের সূচী বা বিবরণ। এই দশ গ্রন্থের মধ্যে 'বৃহদ্দেবতা'—ঋগ্‌বেদের দেবতাদের বিবরণাত্মক গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও ব্যাকরণশাস্ত্রীয় নানা বিষয়ে পূর্ণ। সেখানে ছয় রকমের সমাস (২।১০৫), সমস্ত উপসর্গ (২।৯৪-৫), নিপাতের বৈশিষ্ট্য (২।৮৯-৯০, ৯৩) এবং পদের রকমফের (২।১০৪) প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পাদবিধান (পদবিধান?)—ঋগ্‌বেদের শব্দসূচী। ইহা ছাড়া ঋগ্‌বেদের 'উপলেখসূত্র' (ইহা ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের সংক্ষিপ্ত রূপ), 'চরণব্যূহপরিশিষ্ট', 'পুরুষসূক্তভাষ্য' প্রভৃতি অন্য কতকগুলি গ্রন্থও শৌনকের নামে চলে। পাণিনির 'শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি' (৪।৩।১০৬) সূত্রের প্রসঙ্গে নাগেশ ভট্ট তাঁহার লঘুশব্দেন্দুশেখরে লিখিয়াছেন ঃ 'ছন্দসি কিম্? শৌনকীয়া শিক্ষা।' কোনো মতে শৌনক সূত্রদ্রষ্টা, মণ্ডলদ্রষ্টা, কল্পকৃৎ এবং শাখাপ্রবক্তাও। অথর্ববেদের শৌনক শাখার প্রাতিশাখ্য চতুরধ্যায়িকা। (১৪)

এইসব গ্রন্থের মধ্যে ঋগ্‌বেদপ্রাতিশাখ্যের গুরুত্ব বর্তমান প্রসঙ্গে সর্বাধিক। পদ-সমূহের চারি শ্রেণী-বিভাগ—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত সর্বপ্রথম ঋক্‌প্রাতিশাখ্যেই (১২।১৭) সুসম্বদ্ধভাবে পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রাতিশাখ্যে, নিরুক্তে, বৃহদ্দেবতায়, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে

এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এই চারি বিভাগের কথা প্রতিধ্বনিত পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন ভাষাতেও অনুরূপ শ্রেণীবিভাগ দে যায়। সম্ভবতঃ ভারতীয় মনীষাই ইহার প্রথম আবিষ্কারক। সংস্কৃ ব্যাকরণের ইতিহাসে ইহা অবশ্যই বড় গৌরবের কথা বৈদিকসাহিত্য হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দেখানো যায়, ক্রিয়া কালবিভাগ, শব্দের লিঙ্গবিভাগ, বচন-বিভাগ প্রভৃতিও ভারতেই প্রথ আবিষ্কৃত হয়।

ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে (১।১), বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্যে (৪।১২২), অথর্ববে প্রাতিশাখ্যে (১।২), চতুরধ্যায়িকায় (১।৮) এবং বৃহদ্দেবতায় (১।২৭ ২।১৩৬...) শৌনকের মতোল্লেখ বর্তমান। ইহার দ্বারা একাধি শৌনকের অস্তিত্ব সূচিত হয়। বায়ুপুরাণে (১।১২, ১৪, ২৩) পাও যায়, অধিসীম কৃষ্ণের রাজত্বকালে কুরুক্ষেত্রে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগ যে দীর্ঘ সত্রের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে সর্বশাস্ত্র বিশারদ গৃহপ শৌনক উপস্থিত ছিলেন। মহাভারতের আদিপর্বে ৪র্থ অধ্যায়ে প্রারম্ভেও এই যজ্ঞের কথা আছে। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের প্রাচীন ব্যাখ্যা বিষ্ণুমিত্র তাঁহার বৃত্তির সূচনায় শাস্ত্রাবতার-বিষয়ক এক প্রাচীন শ্লো উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, পূর্বোক্ত যজ্ঞে নৈমিষীয় শিষ্যগণ দীক্ষ গ্রহণের সময় গৃহপতি শৌনককে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের উপদেশ প্রাপ্ত হন। আশ্বলায়ন ছিলেন তাঁহার প্রি শিষ্য। কথিত আছে, এই শিষ্যের প্রতি স্নেহানুরাগবশতঃ শৌন স্বরচিত একখানি গ্রন্থ নষ্ট করিয়া ফেলেন। সে যাহাই হউক পুরুষানুক্রমে একাধিক শৌনকের হস্তক্ষেপ বা তাঁহাদের মতামতে প্রভাব ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে থাকা অসম্ভব ব্যাপার নয়। শৌনক গোত্রে জা প্রত্যেকেই শৌনক। ষড়্‌গুরুশিষ্য আচার্যপরম্পরায় যে পঞ্চপুরুষে উল্লেখ করিয়াছেন, তদনুসারে প্রথমে শৌনক, পরে আশ্বলায়ন এব তাঁহার পরে ক্রমান্বয়ে কাত্যায়ন, পতঞ্জলি ও ব্যাস। ব্যাকরণে পাণিনি যে স্থান, উচ্চারণ-বিজ্ঞানে শৌনকের স্থান প্রায় তদ্রূপ।

কয়েকজন প্রাচীন আচার্য

যাস্কের নিরুক্তে, বিভিন্ন প্রাতিশাখ্যে এবং বৃহদ্দেবতাদি গ্রন্থে যেসব প্রাচীন আচার্যের নাম পাওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যে বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন—আগস্ত্য (ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের বিষ্ণুমিত্রকৃত বর্গদ্বয়বৃত্তি, পা. ২।৪।৭০), আগ্নিবেশ্য (তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ৯।৪), আগ্নিবেশ্যায়ন (তৈ-প্রা-১৪।৩২), আগ্রায়ণ (নিরুক্ত ১।৯, ৬।১৩, ১০।৮), আত্রেয় (তৈ-প্রা-৫।৩১, ১৭।৮), আন্যতরেয় (ঋক্‌প্রা. ৩। ২২), আশ্বলায়ন (বৃহদ্দেবতা ৪।১৩৯), উখ্য (তৈ-প্রা-৮।২২, ১০। ২০, ১৬।২৩), উত্তমোত্তরীয় (তৈ-প্রা. ৮।২০), ঔদব্রজি (ঋক্‌তন্ত্র ২।৬।১০), ঔদুম্বরায়ণ (নিরুক্ত ১।১), ঔপমন্যব (নিরুক্ত ১।১, ২। ২, ৬, ১১, ৩।৮, ১১, ১৮, ১৯, ৫।৭, ৬।৩০, ১০।৮, বৃহদ্দেবতা ৭।৬৯), ঔপশবি (বাজসনেয়ি প্রা-৩।১৩১), ঔর্ণবাভ (নিরুক্ত ২।২৬, ৬।১৩, ৭।১৫, ১২।১, ১৯, বৃহদ্দেবতা ৭। ১২৫), কাণ্ডমায়ন (তৈ-প্রা-৯।১, ১৫।৭), কাণ্ব (বাজ-প্রা-১।১২৩, ১৪৯), কাত্থক্য (নিরুক্ত ৮।৫, ৬, ১০, ১৭, ৯।৪১, ৪২, বৃহদ্দেবতা ৩।১০০), কাত্যায়ন (বাজ-প্রা-৮।৫৩), কাশ্যপ (বাজ-প্রা- ৪।৫, নিরুক্ত ১২।৪০), কৌণ্ডিন্য (তৈ-প্রা-৫।৩৮, ১৮।৩, ১৯। ২), স্থবির-কৌণ্ডিন্য (তৈ-প্রা-১৭।৪), কৌৎস[১৪] (নিরুক্ত ১।১৫), কৌহলীপুত্র (তৈ-প্রা-১৭।২), ক্রৌষ্টুকি (নিরুক্ত ৮।২, বৃহদ্দেবতা ৪। ১৩৭, অথর্ববেদপরিশিষ্ট ৬৮।১।২), গার্গ্য (ঋ-প্রা-১।১৫, ৬।৩৬, ১১।১৭, ২৬, ১৩।৩১, নিরুক্ত ১।৩, ১২, ৩।১৩, বাজ-প্রা-৪। ১৬৭, বৃহদ্দেবতা ১।২৬), গালব (নিরুক্ত ৪।৩, বৃহদ্দেবতা ১।২৪, ৫।৩৯, ৬।৪৩, ৭।৩৮, শৈশিরীয় শিক্ষা ৫), গৌতম (তৈ-প্রা-৫। ৩৮, মহাভাষ্য ৬।২।৩৬), চর্মশিরাঃ (নিরুক্ত ৩।১৫), জাতূকর্ণ্য (বাজ-প্রা-৪।২৫, ১৬০, ৫।২২), তৈটীকি (নিরুক্ত ৪।৩, ৫।২৭), দাল্ভ্য (বাজ-প্রা-৪।১৬), নৈগি (ঋক্‌তন্ত্র ২।৬।৯, ৪।৩।২), পৌষ্করসাদি (তৈ-প্রা-৫।৩৭, ৩৮, ১৩।১৬, ১৪।২, ১৭।৬, কাত্যায়নবার্তিক ৮।৪।৪৮/৩), প্লাক্ষায়ণ (তৈ-প্রা-৯।৬, ১৪।১১, ১৭, ১৮।৫), প্লাক্ষি (তৈ-প্রা-৫।৩৮, ৯।৬, ১৪।১০, ১৭, ১৮। ৫), বাড়ভীকার (তৈ-প্রা-১৪।১৩), বাভ্রব্য (ঋ-প্রা-১১।৬৫).

বৃহস্পতি (ঋক্‌তন্ত্র ১।৪), ব্রহ্মা (ঋক্‌তন্ত্র ১।৪), ভাগুরি (বৃহদ্দেবতা ৩।১০০, ৫।৪০, ৬।৮৬, ১০৭), ভারদ্বাজ (তৈ-প্রা-১৭।৩, নিরুক্ত ৬।৩০), মধুক (বৃহদ্দেবতা ১।২৪), মাক্ষব্য (ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের বর্গদ্বয়বৃত্তি), মাচাকীয় (তৈ-প্রা-১০।২২), মাণ্ডূকেয় (ঋক্‌প্রা-বর্গ ১। ২, ৩।১৪), মাধ্যন্দিন (বাজ-প্রা-৮।২৯, মহাভাষ্য ৪।৩।৬০), মাধ্যন্দিনি (কাশিকাবৃত্তি ৭।১।৯৪), মৌদ্‌গল্য (নিরুক্ত ১১।৬), যাস্ক (ঋক্‌প্রা-১৭।৪২, বৃহদ্দেবতা ১।২৬, ২।১১১, ১৩২, ১৩৭, ৩। ৭৬, ১০০, ১১২, ৪।৪, ১৮, ৫।৮, ৪০, ৬।৮৭, ১০৭, ৭।৭, ৩৮, ৬৯, ৯৩, ১৫৩, ৮।১১, ৬৫), রথীতর (বৃহদ্দেবতা ১।২৬, ৩।৪০, ৭।১৪৫, ৪।৭৩, ঋক্‌প্রা-৯।২৩), লামকায়ন (বৃহদ্দেবতা ৩।৪৭), বাৎসপ্র (তৈ-প্রা-১০।২৩), বাজপ্যায়ন (কাত্যায়নবার্ত্তিক ১। ২।৬৪/৩৫), বার্ষ্যায়ণি (নিরুক্ত ১।২, মহাভাষ্য ১।৩।১, ৪।১। ১৫৫), বাল্মীকি (তৈ-প্রা-৫।৩৬, ৯।৪, ১৮।৬), বেদমিত্র (ঋ-প্রা- ১।৫১), বৈয়াঘ্রপদ্য (শব্দকৌস্তুভ ১।১।৮ আহ্নিক), ব্যাড়ি বা ব্যালি (ঋক্‌প্রা-৩।২৩, ২৮, ৬।৪৩, ১৩।৩১, ৩৭, কাত্যায়নবার্ত্তিক ১।২। ৬৪/৪৫), শাকটায়ন (নিরুক্ত ১।৩, ১২, ১৩, ঋক্‌প্রা-১।১৬, ১৩।৩৯, বাজ-প্রা-৩।৯, ৩।১২, ৮৭, ৪।৫, ১২৯, ১৯১, ঋক্‌তন্ত্র ১।১, বৃহদ্দেবতা ২।১, ৯৫, ৩।১৫৬, ৪।১৩৮, ৬।৪৩, ৭।৬৯, ৮।১১, ৯০, চতুরধ্যায়িকা ২।২৪), শাকপূণি (নিরুক্ত ২।৮, ৩।১১, ১৩, ১৯, ৪।৩, ১৫, ৫।৩, ১৩, ২৮, ৭।১৪, ২৩, ২৮, ৮।২, ৫, ৬, ১০, ১৪, ১৭, ১৮, ১২।১৯, ৪০, বৃহদ্দেবতা ৩।১৩০, ১৫৫, ৫।৮, ৩৯, ৬।৪৬, ৭।৭০, ৮।৯০), শাকপূণির পুত্র (নিরুক্ত ১৩।১১), শাকল্য (ঋক্‌প্রা-২।৪৪, ৩।১৩, ২২, ৪।১৩, ১৩।১২, ১৩।৩১, বাজ-প্রা-৩।১০, নিরুক্ত ৬।২৮), শাঙ্খমিত্রি (চতুরধ্যায়িকা ৩।৭৪), শাঙ্খায়ন (তৈ-প্রা-১৫।৭), শূরবীর (ঋ-প্রা-বর্গ ১।৩), শৈত্যায়ন (তৈ-প্রা-৫।৪০, ১৭।১, ৭, ১৮।২), শৌনক (ঋ-প্রা-বর্গ ১।১, বাজ-প্রা-৪।১২২,অথর্ববেদপ্রা-১।২, চতুর- ধ্যায়িকা ১।৮, বৃহদ্দেবতা ১।২৭, ২।১৩৬, ৪।১৮, ৫।৩৭, ৩৯, ৪০, ৬।৬, ৯, ১০৭, ১১৬, ৭।৩৮, ১৫৩, ৮।১১, ৭৬, ৯৯, পা. ৪।৩।১০৬), সাংকৃত্য (তৈ-প্রা-৮।২১, ১০।২১, ১৬।১৬), স্থৌলাষ্ঠীবি (নিরুক্ত ৭।১৪, ১০।১), হারীত (তৈ-প্রা-১৪।১৮)।[১৫]

১ কল্প শব্দের অর্থ প্রয়োগ। কল্পসূত্রসমূহ—ঋগ্‌বেদে আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়ন কল্পসূত্র ; সামবেদের মশক, লাট্যায়ন ও দ্রাহ্যায়ণ কল্পসূত্র ; কৃষ্ণযজুর্বেদের মানব, বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব ও হিরণ্যকেশীর কল্পসূত্র ; শুক্লযজুর্বেদের কাত্যায়নকল্পসূত্র, অথর্ববেদে কৌশিক ও বৈতান কল্পসূত্র। শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্র কল্পসূত্রের অন্তর্গত। আর আছে ধর্মসূত্র। শূল্বসূত্রও কল্পসাহিত্যের অন্তর্গত। সামবেদের নিদানসূত্র বৈদিক ছন্দোবিষয়ক।

২ নবশিক্ষা : প্রথমং ব্যাসশিক্ষা তু লক্ষ্মীশিক্ষা দ্বিতীয়কম্।
ভারদ্বাজী তৃতীয়া তু শিক্ষারণ্যং তুরীয়কম্।।
পঞ্চমী শম্ভুশিক্ষা চ ষষ্ঠং চাপিশলং তথা।
সপ্তমী পাণিনেঃ শিক্ষা অষ্টমী কৌহলেস্তথা।।
বাসিষ্ঠশিক্ষা নবমী নবশিক্ষাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।

৩ প্রতিশাখ + য (ঞ্য) পা. ৪।৩।৫৯ = প্রাতিশাখ্য। পাণিনীয় গণপাঠের পরিমুখাদিগণে (৪।৩।৫৮) 'প্রতিশাখ' শব্দ বর্তমান।

৪ ভট্টোজি দীক্ষিতের মতে ঔদব্রজি ঋকৃতন্ত্রের প্রণেতা—'তথা ঋক্‌তন্ত্রব্যাকরণস্য ছান্দোগ্যলক্ষণস্য প্রণেতা ঔদব্রজিরপি...' ইত্যাদি (শব্দকৌস্তুভ ১।১।৮)।

৫ এই উক্তি সর্বাংশে সুষ্ঠু নয়। ইতিহাস বলে, কেবল প্রতি বেদেই নয়, বেদের প্রত্যেক শাখাতেই একখানি করিয়া প্রাতিশাখ্য ছিল। প্রাতিশাখ্য নামের মধ্যেই এই সত্য সূচিত। তবে সেইগুলি কালক্রমে কাটছাঁট হইয়া কমিতে কমিতে বর্তমানে বেদপ্রতি প্রায় এক-একখানিতে আসিয়া পর্যবসিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই পরিপ্রেক্ষিতেই শর্মোপাধ্যায় বেদতরুর ঋগ্‌বেদাদি চারি শাখায় এক-এক প্রাতিশাখ্যের অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন।

৬ বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্যের 'বৃদ্ধংবৃদ্ধিঃ' সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৭ 'ইতি মাহেশ্বরাণিসূত্রাণ্যণাদিসংজ্ঞার্থকানি'—ভট্টোজি দীক্ষিত (বৈয়াকরণ সি-কৌমুদীর প্রারম্ভে)।

৮ যে মহেশস্বামীর নামে অকারাদি হকারান্ত বর্ণমালা প্রচলিত থাকার কথা আমরা পরে উল্লেখ করিব (দ্রঃ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ব্যাকরণ) তিনিও স্বয়ং মহেশ্বর ভিন্ন আর কেহ নহেন। তাই কথাসরিৎসাগরাদি গ্রন্থে তৎপুত্র কার্তিকেয়কে 'স্বামিকুমার' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 'প্রয়োগরত্নমালা' নিবন্ধের অন্তর্গত 'মহেশের কৃত কলাপের ক্রম' এবং তাহার পাদটীকাও দ্রষ্টব্য। পাণিনির পূর্বেও যে প্রত্যাহারের ব্যবহার ছিল তাহার নিদর্শন আছে।

৯ জটা মালা শিখা রেখা ধ্বজো দণ্ডো রথো ঘনঃ।
অষ্টৌ বিকৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ ক্রমপূর্বা মনীষিভিঃ।। —ব্যাড়ি রচিত 'বিকৃতিবল্লী' হইতে

১০ কাতন্ত্র-ব্যাকরণের (চতুষ্টয় ২২৮) টীকায় দুর্গগুপ্তসিংহ লিখিয়াছেন : 'আপিশলীয় ব্যাকরণে সময়াদীনাং কর্মপ্রবচনীয়ত্বং দৃষ্টমিতিমতম্।' ইহা হইতে এইরূপও অনুমিত হয় যে, বাক্যটির অন্তর্গত 'সময়াদীনাং কর্মপ্রবচনীয়ত্বম্' অংশটি সম্ভবতঃ আপশলির ব্যাকরণের একটি সূত্র। ইহার অর্থ 'সময়া, নিকষা, হা, ধিক্, অন্তরা, অন্তরেণ' শব্দসমূহের কর্মপ্রবচনীয়ত্ব স্বীকার্য। সময়া = নিকষা ('সময়া-নিকষা-শব্দৌ সমীপবচনৌ'—দুর্গগুপ্তটীকা।

১১ পা. ১।৩।২২ সূত্রের ন্যাসে জিনেন্দ্রবুদ্ধি :
সকারমাত্রমস্তিং ধাতুমাপিশলিরাচার্যঃ প্রতিজানীতে। তথা হি ন ে
পাণিনেরিবাসভূবীতি গণপাঠঃ। কিং তর্হি। স ভূবীতি স পঠতি। আগ
গুণবৃদ্ধী আতিষ্ঠত ইতি। সত্বাগমৌ গুণবৃদ্ধী আতিষ্ঠতে। এবং হি
প্রতিজানীত ইত্যর্থঃ।

১২ অব্যুৎপন্ন = অসংবিজ্ঞাত (যাস্ক) = প্রকল্প্যক্রিয় (দুর্গাচার্য)।
'উণাদয়ো ব্যুৎপন্না ইতি শাকটায়নাদিমতম্'—নাগেশ (মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত ৩।
১৩৩)। 'এবং চ কৃবাপেতি উণাদিসূত্রাণি শাকটায়নস্যেতি সূচিতম্'—ঐ ৩।৩।
পরে বররুচি কাত্যায়ন এই উণাদিসূত্রাবলীকে প্রতিসংস্কৃত করিয়া বর্তমান র
দান করেন।

১৩ 'সর্বমাখ্যাতজং নাম নেতি গার্গ্যশ্চ শাব্দিকাঃ।' নিরুক্তে (১।১২)—'ন সর্বাণী
গার্গ্যো বৈয়াকরণানাং চৈকে...।'

১৪ পতঞ্জলির মতে (এক) কৌৎস পাণিনির ছাত্র (মহাভাষ্য ৩।২।১০৮)। চা
অধ্যায়ে বিভক্ত (অথর্ববেদীয়) তাঁহার এক ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে।

১৫ মারাঠী পণ্ডিত কাশীনাথ বাসুদেব অভ্যঙ্কর তৎপিতা বাসুদেব শাস্ত্রিকর্তৃক মারা
ভাষায় অনূদিত মহাভাষ্যের প্রস্তাবনা-খণ্ডে (পৃঃ ১২২) প্রাচীন বৈয়াকরণদে
বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিতে লিখিয়াছেন :

নামান্যাখ্যাতজানীতি প্রক্রান্তে শাকটায়নঃ।
ন তথেতি প্রাহ গার্গ্য ইন্দ্রেণার্থঃ পদং স্মৃতম্।।
অন্ত্যবর্ণসমুদ্ভূতা ধাতবশ্চ প্রকীর্তিতাঃ।
কি দ্বি কল্পং তৃবাদীনাং ত্ত্বায়াঃ প্রোবাচ কাশ্যপঃ।।
ঋত এব থলোঽনিট্ত্বং ভারদ্বাজোঽব্রবীত্তথা।
পুংবদ্ভাষিতপুংস্কং চ তৃতীয়াদিষু গালবঃ।।
প্রগৃহ্যসংজ্ঞাং সংবুদ্ধৌ শাকল্যো লৌকিকেষ্বিতৌ।
হ্রস্বং প্রকৃতিভাবং চাসবর্ণেঽচ্যাক্তবানিকঃ।।
ইতাবিকারস্যাচষ্টে ঈকারং চাক্রবর্মণঃ।
গিরেরিকারস্যাকারং তথৈব প্রাহ সেনকঃ।।
গোরোকারস্যাবঙং তু প্রাহ স্ফোটায়নস্তথা।
বৃদ্ধের্বিকল্পং সুব্ ধাতৌ প্রোবাচাপিশলির্মুনিঃ।।
সমূহেঽর্থে তথা ধেনো রনঞঃ কংচ তদ্ধিতম্।
নাম্না পুষ্করণং তস্য শব্দশাস্ত্রং প্রকীর্তিতম্।।
বৈয়াঘ্রপদ্যং দশকং পাণিনীয়ং ত্বকালকম্।
কাশকৃৎস্নং ত্রিকং প্রোক্তং তথা চ গুরুলাঘবম্।।
দ্রব্যাভিধানিকব্যাড়ের্দশ ধুষ্করণং স্মৃতম্।
অনেক শেষং দৈবং স্যাচ্চান্দ্রং চাসংজ্ঞকং স্মৃতম্।।
করোতেরাদিকর্তৃত্বে দীর্ঘত্বং শাস্তি শৌনকিঃ।
দ্বিত্বং পৌষ্করসাদিস্তু চয়ঃ প্রাহ পরে শরি।।
বষ্টিভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।
আপং চৈব হলন্তানাং যথা বাচা নিশা দিশা।।
চারায়ণশ্ছত্রুযোগাৎ পুচ্ছকৃচ্ছ্রে পুরোঃ কৃতাৎ।
মাধ্যন্দিনিশ্চোশনসঃ সংবুদ্ধৌ চ ত্রিরূপতাম্।। ১-১২।।

এই সব বৈশিষ্ট্যের কম-বেশি পর্যালোচনা এই গ্রন্থে পরে করা হইয়াছে।

সূত্রকার পাণিনি

পাণিনির ব্যাকরণ বিদ্বজ্জগতের এক পরমাশ্চর্য কৃতি।[১] ইহার দ্বারা তিনি ব্যাকরণক্ষেত্রে এক চিরস্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন বলা চলে। একদিকে প্রাচীন এবং অন্যদিকে নবীন—এই দুই বৈয়াকরণ-মণ্ডলীর মধ্যস্থ মানদণ্ডরূপে তিনি প্রাচীনদের করিয়াছেন নিষ্প্রভ এবং নবীনদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন এক অলঙ্ঘ্য শাসন-ব্যবস্থা। বস্তুতঃ তাঁহার ব্যাকরণের পর, ইহার প্রভাবমুক্ত আর কোনো মৌলিক ব্যাকরণই অদ্যাপি রচিত হয় নাই—হওয়া বোধ হয় সম্ভবও নয়।

প্রায় ৪০০০ সূত্রে[২] নিবদ্ধ এবং আট অধ্যায়ে বিভক্ত এই ব্যাকরণের নাম 'অষ্টক' বা 'অষ্টাধ্যায়ী'। প্রতি অধ্যায়ে চারি পাদ। প্রতি পাদে একাদিক্রমে সূত্রসংখ্যা।[৩] ইহার বার্ত্তিক রচনা করেন বররুচি কাত্যায়ন এবং ভাষ্য পতঞ্জলি। এই তিনজনের কৃতিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সূত্র-বার্ত্তিক-ভাষ্যসমন্বিত সমগ্র ব্যাকরণকে 'ত্রিমুনিব্যাকরণ' বলা হয়। ইহার পূর্বে আর এক ব্যাকরণও এই আখ্যা লাভ করিয়াছিল। তাহা ছিল শকটি-শাকটি-শাকটায়নপ্রোক্ত ব্যাকরণ—যাহার কথা পূর্ব নিবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে।

বর্তমান ত্রিমুনিব্যাকরণের প্রথম মুনি সূত্রকার পাণিনি। তাঁহার বাড়ী ছিল শলাতুর নামক গ্রামে। এই জন্য তিনি 'শালাতুরীয়' নামেও অভিহিত। সেই শলাতুরের বর্তমান নাম দাঁড়াইয়াছে লাহুর (Lahur বা Lahor ; Lahore নয়)। পাকিস্তানের অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার জেলায় ওহিন্দ্-এর প্রায় ৪ মাইল পূর্বোত্তরে ইহার অবস্থান। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রেলওয়ের (N. W. Rly.) জাহাঙ্গিরা ষ্টেশন হইতে এই লাহুর প্রায় ১২ মাইল। মর্দান এবং ওহিন্দের মধ্যে যে বাস সার্ভিস আছে, তাহা এই লাহুর হইয়া যায়। পাণিনির সময়ে ইহা গান্ধার (কান্দাহার) অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইউয়েনসাং শলাতুরে পাণিনির মর্মরমূর্তি স্থাপিত ছিল বলিয়া শুনিয়াছিলেন। শলাতুর + ছণ = শালাতুরীয় (পা. ৪।৩।৯৪)।

Hiuen Tsang

'পাণিনি' নামের ক্রম-বিকাশ ঃ 'পণঃ→পণিন্→পাণিনঃ→ পাণিনিঃ'। পাণিনি গোত্রেরও প্রচলন আছে। তাঁহার প্রকৃত নাম আহ্নিক, পিতার নাম শলঙ্ক, পিতামহের নাম দেবল, মাতা দাক্ষী, মাতামহ দক্ষ, মাতুলের নাম দাক্ষি এবং মাতুলপুত্র দাক্ষায়ণ (ব্যাড়ি)। পিতা ও মাতার নামানুসারে পাণিনিকে শালঙ্কি, দাক্ষেয় এবং দাক্ষীপুত্রও বলা হয়। এক মতে[৫] ছন্দঃসূত্রকার পিঙ্গলাচার্য ছিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পাণিনীয় শিক্ষা নাকি তাঁহারই রচনা।[৬] 'জাম্ববতী বিজয়' বা 'জাম্ববতীহরণ' বা 'পাতালবিজয়' নামে এক কাব্যও পাণিনির নামে প্রচলিত ছিল।[৭]

পাণিনির আবির্ভাব কাল লইয়া বহু বাদপ্রতিবাদ হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত অল্পসংখ্যক পণ্ডিতই এই বিষয়ে একমত হইতে পারিয়াছেন। সে যাহাই হউক, খুব সম্ভব খ্রীঃ পূর্ব ৫ম ও ৪র্থ শতাব্দীর সন্ধিস্থলে তিনি বর্তমান ছিলেন। অষ্টাধ্যায়ীর একটি সূত্র ঃ 'মস্করমস্করিণৌ বেণুপরিব্রাজকয়োঃ' (৬।১।১৫৪)। ভাষ্যকার পতঞ্জলির ব্যাখ্যানুসারে সূত্রোক্ত 'মস্করী'-ই যে বুদ্ধদেবের (খ্রীঃ পূঃ ৫৬৬–৪৮৬) সমকালীন আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মক্‌খরী বা মক্‌খলী গোসাল তাহাতে সন্দেহ নাই। মস্করী পদেরই প্রাকৃত রূপ মক্‌খলী বা মক্‌খরী।[৮] খ্রীঃ পূঃ ৫১২ অব্দে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। কাজেই পাণিনি কোনোমতেই মস্করীর পূর্ববর্তী হইতে পারেন না এবং খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর নন্দরাজ-মন্ত্রী বররুচি কাত্যায়ন অষ্টাধ্যায়ীর বার্ত্তিক-প্রণেতা বলিয়া তাঁহার পরবর্তীও হইতে পারেন না। ম্যাকডোনেল এবং উইন্টারনিজ্ সাহেব পাণিনিকে খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীয়ই বলিয়াছেন।

খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারসিক আধিপত্য চলিয়াছিল। ইহার ফলে ঐ অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির দুর্দশা ঘটিবার খুবই সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই কারণে সেখানকার প্রতিভাধর পণ্ডিতদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে গ্রন্থাদি রচনা ও তজ্জনিত মর্যাদা লাভের আশায় পূর্বভারতের প্রবলপরাক্রান্ত এবং বিদ্যোৎসাহী মগধ-রাজাদের আশ্রয় গ্রহণও খুব অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে এই রূপ ঘটনার আভাস বিভিন্ন আখ্যান-গ্রন্থেও বর্তমান। কনৌজের

রাজা মহেন্দ্রপালের (৮৯০-৯১০ খ্রীঃ) সভাপণ্ডিত কবি রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে ইহার পক্ষে এক চমৎকার জনশ্রুতি উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন ঃ

'শ্রূয়তে চ পাটলিপুত্রে শাস্ত্রকার-পরীক্ষা। অত্রোপবর্ষবর্ষাবিহ পাণিনি-পিঙ্গলাবিহ ব্যাড়িঃ। বররুচিপতঞ্জলী ইহ পরীক্ষিতাঃ খ্যাতিমুপজগ্মুঃ।'

অর্থাৎ পাটলিপুত্রে যে শাস্ত্রকার-পরীক্ষার কথা শুনা যায়, তদনুসারে সেখানে উপবর্ষ, বর্ষ, পাণিনি, পিঙ্গল, ব্যাড়ি, বররুচি এবং পতঞ্জলি পরীক্ষিত হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, হর্যঙ্ক কুলের রাজা উদায়িন্ বা উদয়াশ্ব বা উদয়ভদ্রের রাজ্যকালে খ্রীঃ পূঃ ৪৫৭ অব্দ নাগাদ কুসুমপুর বা পাটলিপুত্রনগরের প্রতিষ্ঠা।[৯]

উপরি-বর্ণিত চরিত্রাবলীকে কেন্দ্র করিয়া নানা সময়ে ছোট-বড় নানা কথা ও কাহিনী প্রচারিত হইয়াছিল—যাহার কিছু কিছু পরে আখ্যান-গ্রন্থাদিতে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে এখনও প্রাচীনদের নিকট এমন দুই/একটি কথা শুনা যায়, যাহা অন্যত্র গ্রথিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আমরা এই ব্যাকরণকথার স্থানে স্থানে সেই সকলের সমন্বয়ে কাহিনীর আকারে কিছু কিছু পরিবেষণের চেষ্টা করিয়াছি।

বাল্যশিক্ষা সমাপ্তির পর উন্নততর বিদ্যালাভের জন্য পাণিনি তক্ষশিলায় আসেন। ইহা ছিল তখনকার দিনে ভারতের অতিপ্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্র। প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত পণ্ডিতদের অনেকেই এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। শলাতুর হইতে ইহার দূরত্বও খুব বেশী নয়। বাল্যকাল হইতেই পাণিনির খুব বড় বৈয়াকরণ হইবার ইচ্ছা। কিন্তু শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাঁহাকে বিদেশী যবনের অত্যাচারের ভয়ে তক্ষশিলা ছাড়িয়া পূর্বভারতের মগধে চলিয়া আসিতে হয়।[১০] সেখানে একজন হস্তরেখাবিদ্‌কে হাত দেখাইয়া তিনি বড় বৈয়াকরণ হইতে পারিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার নিকট নেতিবাচক উত্তর পান এবং কোন্ রেখা থাকিলে বৈয়াকরণ হওয়া যায় তাহা জানিয়া লইয়া ছুরি দিয়া নিজের হাতে সেইরূপ রেখা কাটিয়া সবাইকে দেখাইতে থাকেন। ইহার পর তিনি পাটলিপুত্রে বর্ষ উপাধ্যায়ের টোলে গিয়া উপস্থিত হন।

শঙ্করস্বামীর দুই পুত্র বর্ষ এবং উপবর্ষ। ছোট ভাই উপবর্ষ অল্পবয়সেই পণ্ডিত হন এবং পূর্ব ও উত্তর মীমাংসার ব্যাখ্যা রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। বর্ষ লেখাপড়া না শিখিয়া অধিক বয়সেও মূর্খ বলিয়া নানাভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইতে শেষে স্বামিকুমার কার্ত্তিকের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট শর্তসাপেক্ষ সর্ববিদ্যালাভ করেন। শর্ত ছিল, প্রথমে সকৃদ্‌গ্রাহী (অর্থাৎ একবার মাত্র শুনিয়াই যিনি মনে রাখিতে পারেন) ছাত্রের নিকট তাঁহার লব্ধ বিদ্যা প্রকাশ করিতে হইবে।

এদিকে শিবকর্তৃক পার্বতীর নিকট কথিত সপ্তবিদ্যাধর-চরিত গোপনে শোনার অপরাধে শিবানুচর পুষ্পদন্ত এবং তাঁহার সঙ্গী মাল্যবান্ পার্বতীর শাপে মানবজন্ম গ্রহণ করেন। পুষ্পদন্ত বৎস-রাজধানী কৌশাম্বীতে[১১] কাত্যায়ন গোত্রে সোমদত্ত নামক বিপ্রের ঔরসে বসুদত্তার গর্ভে জন্মিয়া বররুচি কাত্যায়ন নামে পরিচিত হন এবং মাল্যবান্‌ও ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্বক সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন (শালিবাহন) বংশীয় রাজার মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। তাঁহার নাম ছিল গুণাঢ্য।

বররুচি ছিলেন পূর্বোক্ত ধরানের শ্রুতিধর। শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হন এবং সেই সময়েই তাঁহার ঐ ধীশক্তি প্রকাশ পায়। বেতসী বা বীতসী নগরীর অধিবাসী দেবস্বামী এবং করম্ভ (বা করম্ভক) নামক দুই সহোদর ভ্রাতার যথাক্রমে ইন্দ্রদত্ত ও ব্যাড়ি নামে এক এক পুত্র জন্মে। ইঁহারা যথাক্রমে তিনবার ও দুইবার শুনিয়াই শ্রুত বিষয় মনে রাখিতে পারিতেন। ইঁহাদেরও বাল্যে পিতৃবিয়োগ হইলে বিদ্যালাভের জন্য ইঁহারা কার্ত্তিকের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট এইরূপ স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন : 'নন্দরাজের পাটলিপুত্র নগরে গিয়া সেখানকার বর্ষ নামক বিপ্রের নিকট অভীষ্ট বিদ্যা লাভ কর।' সেই অনুসারে ইঁহারা যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারেন যে, বর্ষ উপাধ্যায় সকৃদ্‌গ্রাহী ছাত্র না পাওয়া পর্যন্ত শিক্ষাদান আরম্ভই করিবেন না। তখন ইঁহারা ঐরূপ ছাত্রের সন্ধানে বাহির হইয়া কৌশাম্বীতে আসিয়া ভাগ্যক্রমে বররুচির সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহাকে লইয়া বর্ষসমীপে উপস্থিত হইয়া ক্রমে অভীষ্ট বিদ্যা লাভ করেন। ইহার পর তাঁহাদের বিদ্যাখ্যাতি

চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বিদ্যার্থীরা আসিয়া বর্ষপণ্ডিতের টোলে ভর্তি হইতে থাকে।

এই কালে পাণিনিও সেখানে উপস্থিত হইলে, মূর্খতাহেতু তিনি বর্ষশিষ্যদের নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া সেখান হইতে বিতাড়িত হন। সম্ভবতঃ তিনি কিছু বিদ্যা জাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাত্যায়ন প্রভৃতি বর্ষশিষ্যগণ ছিলেন ঐন্দ্র ব্যাকরণের ছাত্র। এই ব্যাকরণের সহিত পাণিনির পরিচয় ছিল না, অধিকন্তু তাঁহার সাধারণ ব্যাকরণ জ্ঞানও তখন অপরিপুষ্ট ছিল।

নিজের বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে মোহভঙ্গ হইলে পাণিনি এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া একেবারে স্বয়ং শিবের কৃপা লাভের জন্য কেদারতীর্থে উপস্থিত হইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ২৮শ দিনে মহেশ্বর[১২] সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন ঃ 'বর লও।' পাণিনি স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে চন্দ্রমৌলি শঙ্কর এমন ভাবে চৌদ্দ বার ডমরু বাজাইলেন যে, ফলে যুগপৎ দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।—

পাণিনি যখন শিবের আরাধনায় গমন করেন তখন সনকাদি ঋষিগণও বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে সুদীর্ঘ তপস্যায় রত ছিলেন। মহেশ্বর এই সব ঋষিকে এবং পাণিনিকে যুগপৎ অভীষ্ট সিদ্ধিদানে কৃতার্থ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ঐ ডমরু ধ্বনি করিয়াছিলেন। উহাতে ব্যাকরণার্থী পাণিনির এবং তত্ত্বার্থী সনকাদির মনোরথ পূর্ণ হইল। পাণিনি ঐ ১৪ বার ডমরুবাদন হইতে মহাদেবের কৃপায় 'অইউণ্' ইত্যাদি ১৪টি প্রত্যাহার সূত্রের সন্ধান পাইলেন এবং তাহার ভিত্তিতে ব্যাকরণ রচনায় মনোযোগী হইয়া 'কুশযুক্ত পবিত্রহস্তে বিশুদ্ধ মুক্তস্থানে পূর্বমুখী হইয়া উপবেশনপূর্বক মহাপ্রযত্নে'[১৩] সেই কার্য সমাধা করিলেন। দিব্য ব্যাকরণে বলীয়ান্ হইয়া তিনি বররুচি কাত্যায়নকে বিচারে আহ্বান করিলে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ সপ্তাহব্যাপী বাদানুবাদ চলার পর ৮ম দিবসে স্বয়ং মহাদেবের কৃপায় তিনি (পাণিনি) জয়লাভ করেন। ফলে ঐন্দ্র ব্যাকরণ নষ্ট হয় এবং কাত্যায়নাদি বর্ষ-শিষ্যগণ হতমান হইয়া মূর্খতা প্রাপ্ত হন।[১৪] পরিশেষে কাত্যায়নও শঙ্করের আরাধনা করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিলে, তিনি

'অশেষ-বিশেষে' তাঁহার নিকট পাণিনির ব্যাকরণ প্রকাশ করেন এবং তিনি (কাত্যায়ন) তাঁহার অর্থাৎ মহাদেবের ইচ্ছানুসারেই এই ব্যাকরণের বার্ত্তিক রচনাপূর্বক ইহাকে পূর্ণতর করিয়া তোলেন। স্বয়ং বর্ষও কার্ত্তিকের নিকট হইতে এবং ব্যাড়ি ও ইন্দ্রদত্ত বর্ষের নিকট হইতে পাণিনির ব্যাকরণ জ্ঞাত হন।

এদিকে পাণিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার সূত্রের পরিপুরকরূপে আবার কাত্যায়ন-কর্তৃকই বার্ত্তিক রচিত হইয়াছে, তখন তিনি ক্রোধে একরূপ আত্মহারা হইয়া কাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া 'তোমার শরীর নিপাত যাক্' বলিয়া মারাত্মক অভিশাপ দেন। কাত্যায়নের তখন বৃদ্ধাবস্থা। নন্দরাজের মন্ত্রিপদ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি বদরিকাশ্রমে যোগাবলম্বনে শেষ দিনের অপেক্ষায় ছিলেন। পাণিনির অভিসম্পাত কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র তিনিও তাঁহাকে পাল্টা অভিশাপ দিয়া বলিলেন ঃ 'ভগবৎ প্রসাদেই বার্ত্তিকসমূহ রচিত হইয়াছে, ইহা না জানিয়া আপনি বৃথা ক্রোধবশতঃ আমাকে অভিশাপ দেওয়ায় আপনারও মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইবে।'[১৫] ফলে তৎক্ষণাৎ সিংহ-কর্তৃক পাণিনি নিহত হইলেন[১৬] এবং কাত্যায়নও দেহরক্ষা করিলেন। ত্রয়োদশী তিথিতে এই দুই বৈয়াকরণের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া পরবর্তীকালে এই তিথিতে ব্যাকরণ-চর্চা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। পাণিনির শিষ্য ব্যাঘ্রভূতি[১৭] এবং কাত্যায়নের শিষ্য শোভূতি (বা শ্রীভূতি) একযোগে সবার্ত্তিক অষ্টাধ্যায়ীর প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

কাত্যায়নের বার্ত্তিকে তিনবার পাণিনির উল্লেখ করা হইয়াছে (৬।১।১/১৫, ৭।১।২/৫ এবং ৮।৪।৬৮/৪)। প্রথম দুইবার কেবল পাণিনি এবং তৃতীয়বার ভগবান্ পাণিনি ('ভগবতঃ পাণিনেঃ সিদ্ধম্') বলিয়া তিনি বার্ত্তিক রচনা শেষ করিয়াছেন। মহাভাষ্যে এই তিন স্থলেই 'ভগবান্ পাণিনিরাচার্যঃ' বলা হইয়াছে এবং অন্যত্র তাঁহাকে 'মাঙ্গলিক আচার্যঃ' (মহাভাষ্য ১।১।৩ আহ্নিক), 'অনল্পমতিরাচার্যঃ' (ঐ ১।৪।৫১), 'বৃত্তজ্ঞ আচার্যঃ' (ঐ ১।৩।৯), 'সুবৃৎ' (ঐ১।২।৩২) প্রভৃতি আখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। কাশিকা-ব্যাখ্যা 'পদমঞ্জরী'তে (৪।১।৯৩) হরদত্ত মিশ্র পাণিনিকে 'শব্দবিদাং মূর্ধাভিষিক্তঃ' বলিয়াছেন। কাত্যায়নের

দৃষ্টিতে যে অষ্টাধ্যায়ী 'সাধ্বনুশাসনশাস্ত্র' (১।১।৪৪/১৪), পতঞ্জলির নিকট তাহা 'মহৎশাস্ত্রৌঘ' (মহাভাষ্য ১।১।১) এবং 'মহৎসুবিহিত' (ঐ৪।২।৬৬)। তিনি পাণিনির সূত্রগুলিকে পবিত্র বেদের সহিত তুলিত করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই ঃ 'ছন্দোবৎসূত্রাণি ভবন্তি' (১। ১।১/১।১।৩ আহ্নিক)। তাঁহার মতে কোনো সূত্র তো দূরের কথা, ইহার একটি বর্ণও অনর্থক হইবার শক্তি ধারণ করে না ঃ 'তত্রাশক্যং বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভবিতুম্। কিংপুনরিয়তা সূত্রেণ' (১।১।১)। পাণিনির ও তাঁহার বৃতির মহিমা এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মহাভাষ্যের সর্বত্র ছড়ানো রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় এমন একটি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহার অর্থ—(ভাল-মন্দ বিচারের) সামর্থ্য লইয়াও এই শাস্ত্রে এমন কিছু দেখিতেছি না যাহাকে অনর্থক বলা যায় ঃ 'সামর্থ্যযোগান্ন হি কিঞ্চিদস্মিন্ পশ্যামি শাস্ত্রে যদনর্থকং স্যাৎ' (৬।১।৭৭)। এই 'সামর্থ্য-যোগ' অবশ্য শাস্ত্রকার পাণিনির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইতে পারে।

অষ্টাধ্যায়ীর পাণিনিকৃত কোনও বৃত্তি পাওয়া যায় নাই। মহাভাষ্যে (২।১।১, ২।২।৪) উল্লিখিত 'বৃত্তিসূত্র' হইতে অনুমিত হয়, এই জাতীয় কোনো গ্রন্থ নিশ্চয়ই ছিল, যাহা কোনও কারণে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতে (২।১।১) বলা হইয়াছে ঃ 'বৃত্তিযুক্তং সূত্রং বৃত্তিসূত্রমিত্যর্থঃ।' পাণিনির অধ্যাপনা হইতেও এইরূপ কোন বৃত্তির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়। পাণিনির নামে যে গণপাঠ, ধাতুপাঠ এবং লিঙ্গানুশাসন প্রচলিত তাহাদের মৌলিকতা সন্দেহাতীত নয়। একটি শ্লোকে অবশ্য বলা হইয়াছে ঃ

"অষ্টকং গণপাঠশ্চ ধাতুপাঠস্তথৈব চ। লিঙ্গানুশাসনং শিক্ষা পাণিনীয়া অমী ক্রমাৎ।। "

বার্ত্তিককার কাত্যায়ন

বৃত্তি হইতে 'বার্ত্তিক' শব্দের উৎপত্তি। বৃত্তি মানে ব্যাখ্যা। বার্ত্তিকের অর্থ—ব্যাখ্যামূলক পরিপূরক সূত্রবিশেষ। মূলসূত্রে 'উক্ত, অনুক্ত ও দুরুক্ত' বিষয়ের চিন্তন বা ব্যক্তকরণই বার্ত্তিকের কাজ। ত্রিমুনির দ্বিতীয়

মুনি বররুচি কাত্যায়ন (যিনি সাধারণতঃ কাত্যায়ন নামেই সমধিক পরিচিত বা কথিত) অষ্টাধ্যায়ীর কিঞ্চিদধিক ১২০০ সূত্রের উপর পাঁচ হাজারেরও বেশি বার্ত্তিক রচনা করেন। এই জন্য তাঁহাকে বার্ত্তিককার এবং বাক্যকারও বলা হয়। মহাভাষ্যের 'দীপিকা' টীকায় ভর্তৃহরি বার্ত্তিককে 'ভাষ্যসূত্র' বলিয়াছেন এবং বাক্যপদীয়ের টীকায় বলিয়াছেন 'অনুতন্ত্র'। সায়ণাচার্য 'মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে (১।১) বার্ত্তিক অর্থে (?) 'অনুস্মৃতি' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। মহাভাষ্যে (৩।২।১১৮) কাত্যায়নকে স্পষ্টতঃই 'বার্ত্তিককার' বলা হইয়াছে।

বার্ত্তিকের কোন আলাদা গ্রন্থ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই, ব্যাখ্যা তো দূরের কথা। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ব্যাখ্যা ও সমালোচনা প্রসঙ্গে যে সব বার্ত্তিক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাই এক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বন। সেখানে দেখা যায়, কাত্যায়ন পাণিনির অধিকাংশ সূত্রের উপরই কোনো বার্ত্তিক রচনা করেন নাই, আবার কোনো সূত্রের (যেমন ১।২।৬৪ নং সূত্রের) ৫৯টি বার্ত্তিক প্রণয়ন করিয়াছেন। মহাভাষ্যের উদ্ধৃতির বাহিরে কোনও বার্ত্তিক ছিল না, অথবা মহাভাষ্যে সমস্ত বার্ত্তিকই উদ্ধৃত হইয়াছে এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। শ্লোকে রচিত কতকগুলি বার্ত্তিক পাওয়া যায়। এইগুলিকে শ্লোকবার্ত্তিক বলে। মহাভাষ্যে (১।১।১) উল্লিখিত 'ভ্রাজা নাম শ্লোকাঃ' অর্থাৎ ভ্রাজশ্লোকাবলী কাত্যায়ন-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি। মহাভাষ্যে ইহাদের ছিটেফোঁটা নমুনার সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে উদ্ধৃত 'যস্তু প্রযুংক্তে কুশলো বিশেষে...' ইত্যাদি শ্লোকটি ভ্রাজাখ্য শ্লোক। কাত্যায়নের নামে বিভিন্ন শাস্ত্রে একাধিক গ্রন্থ প্রচলিত থাকিলেও সবই একজনের রচনা বলিয়া মনে হয় না। এই নামে একাধিক গ্রন্থকার থাকার সম্ভাবনা। কলাপ ব্যাকরণের বৃত্তিকার দুর্গসিংহের মতে কলাপের কৃদংশের রচয়িতা কাত্যায়ন। ইনি নিশ্চয়ই বররুচি কাত্যায়ন নহেন, কারণ কলাপ-রচনার ৩০০/৩৫০ বৎসর পূর্বে তাঁহার আবির্ভাব।

বৈয়াকরণদের মতে : 'কতস্যাপত্যং কাত্যস্তস্যাপত্যং কাত্যায়নঃ।'[১৮] অর্থাৎ কত→কাত্য→কাত্যায়ন। মহাভাষ্যে (৩।২।৩) : 'ভগবান্ কাত্যঃ।' পুরুষোত্তমদেব-রচিত ত্রিকাণ্ডশেষে কাত্যায়নকে কাত্য,

কাত্যায়ন, পুনর্বসু, মেধাজিৎ এবং বররুচি বলা হইয়াছে। ভাষাবৃত্তিতে (৪।৩।৩৪): 'পুনর্বসুর্বররুচিঃ।' তাঁহার 'সকৃদ্‌গ্রাহিতা'র সহিত মেধাজিৎ নামের যোগ থাকিতে পারে। মহাভাষ্যকারের মতে তিনি দক্ষিণভারতীয়। একাধিক বার্ত্তিকে 'যথা লোকে বেদেচ' না বলিয়া 'যথালৌকিক-বৈদিকেষু' বলার জন্য তাঁহাকে কটাক্ষ করিয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন— 'প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ' (মহাভাষ্য ১।১।১) অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যরা তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহার পছন্দ করেন।[১৯] স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ডে (১৩০।৭১) কাত্যায়নকে যাজ্ঞবল্ক্যের পুত্র এবং বররুচিকে কাত্যায়নের পুত্র বলা হইয়াছে। বার্ত্তিককারের 'যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধস্তুল্যকালত্বাৎ' উক্তি হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আখ্যান-বর্ণিত পাণিনি-কাত্যায়নের সাক্ষাতের মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে কিনা বলা দুঃসাধ্য। ইতিহাসের বিচারে ইহা একপ্রকার সুনিশ্চিত যে, পাণিনি ও কাত্যায়ন যথাক্রমে খ্রীঃ পূর্ব ৫ম শতকের শেষার্ধে এবং ৪র্থ শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ হইতে ৩৫০-এর মধ্যে উভয়ের অভ্যুদয়কাল। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থ (৪২৭) মতে পাণিনি মহাপদ্মনন্দের সখা।

বার্ত্তিকের তিনজন ব্যাখ্যাতার নাম পাওয়া যায়—(১) হেলারাজ, (২) রাঘবসূরি এবং (৩) রাজরুদ্র। বাক্যপদীয়ের ৩য় কাণ্ডের টীকায় হেলারাজ লিখিয়াছেন যে তিনি বার্ত্তিকপাঠের 'বার্ত্তিকোন্মেষ' নামে এক টীকা রচনা করেন। রাঘবের টীকার নাম 'অর্থপ্রকাশিকা'। রাজরুদ্র কাশিকাবৃত্তিতে উদ্ধৃত শ্লোকবার্ত্তিকসমূহের ব্যাখ্যাতা। বার্ত্তিকে পাণিনিব্যতীত আরও তিনজন বৈয়াকরণের নাম আছে : (১) বাজপ্যায়ন (১।২।৬৪/৩৫), (২) ব্যাড়ি (১।২।৬৪/৪৫) এবং (৩) পৌষ্করসাদি (৮।৪।৪৮/৩)।

ভাষ্যকার পতঞ্জলি

ত্রিমুনির তৃতীয় মুনি পতঞ্জলি সবার্ত্তিক অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্য রচনা করেন। তিনি ছিলেন সুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা মগধরাজ পুষ্যমিত্রের (খ্রীঃ

পৃঃ ১৮৫—১৪৯) পুরোহিত। ইহা তিনি নিজেই ভাষ্য-মধ্যে (৩।২। ১২৩) স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সেখানে পুষ্যমিত্রকে 'পুষ্পমিত্র' বলা হইয়াছে। কার্যারম্ভ হইয়াছে অথচ শেষ হয় নাই এই অর্থে বর্তমান কালে লটের প্রয়োগ দেখাইতে পতঞ্জলি 'ইহ পুষ্পমিত্রং যাজয়ামঃ' এই উদাহরণ দিয়াছেন।[২০] মহাভাষ্যে (১।১।৬৮) 'পুষ্পমিত্রসভা। চন্দ্রগুপ্তসভা'র উল্লেখও লক্ষণীয়। এই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যচন্দ্রগুপ্ত। গোনর্দদেশীয় (অযোধ্যার ফয়জাবাদ বিভাগের গোণ্ডা জেলা?) এবং গোণিকাদেবীর পুত্র বলিয়া পতঞ্জলিকে 'গোনর্দীয়' এবং 'গোণিকাপুত্র'[২১] বলা হয়। কায়, বাক্ এবং চিত্তের মল অপনোদনের জন্য তিনি যথাক্রমে আয়ুর্বেদে চরকসংহিতার বার্ত্তিক, ব্যাকরণে অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্য এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রে যোগসূত্র প্রণয়ন করেন।[২২]

কাত্যায়ন-রচিত বার্ত্তিকসমূহের তাৎপর্য-বিচারমুখে সূত্রার্থের বিশদীকরণ এবং ন্যূনার্থের পরিপূরণ—ভাষ্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সম্বন্ধে (হরদত্ত মিশ্রের পদমঞ্জরীতে উদ্ধৃত) একটি শ্লোকে বলা হয় ঃ

যদ্বিস্মৃতমদৃষ্টং বা সূত্রকারেণ তৎস্ফুটম্।
বাক্যকারো ব্রবীত্যেবং তেনাদৃষ্টং চ ভাষ্যকৃৎ ।।

অর্থাৎ সূত্রকার যাহা দেখান নাই বা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, বার্ত্তিককার তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন ; আবার বার্ত্তিককার যাহা দেখান নাই, ভাষ্যকার তাহা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন।

ভাবের গাম্ভীর্যে, বিচারের সূক্ষ্মতায়, সিদ্ধান্তের দৃঢ়তায় এবং রচনা-শৈলীর স্বচ্ছতায়—মহাভাষ্যের মতো এমন সর্বতোভদ্র গ্রন্থ—যাহাকে মহাগ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কেবল ব্যাকরণেই বা কেন, প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের অন্য কোনো বিভাগেও আর রচিত হয় নাই। এই গুণ-গরিমাবশতঃ ইহাকে 'মহাভাষ্য' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আবার 'মহাভাষ্য' বলিলে যে একমাত্র ব্যাকরণ-মহাভাষ্যকেই বুঝায়, ইহা অবশ্য চির-অপ্রিয় ব্যাকরণশাস্ত্রের পক্ষে খুবই গৌরবের কথা। কথিত আছে ঃ 'মহাভাষ্যং বা পাঠনীয়ং মহারাজ্যং বা পালনীয়ম্।'—অর্থাৎ মহাভাষ্যের অধ্যাপনা এবং মহারাজ্যের পরিচালনা সমান গুরুত্বপূর্ণ। মগধের শিশুনাগবংশীয় রাজাদের আমল হইতে শুরু করিয়া নন্দ,

মৌর্য এবং সুঙ্গবংশের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের কয়েকশত বর্ষব্যাপী ব্যাকরণচর্চার ফলশ্রুতি এই মহাভাষ্যে বিধৃত হইয়া আছে।

পতঞ্জলিকে শেষ নাগের অবতার কল্পনা করিয়া মহাভাষ্যকে 'ফণিভাষ্য'ও বলা হয়। ইহার অপর নাম চূর্ণী (বা চূর্ণি)।[২৩] খ্রীঃ ৬ষ্ঠ/৭ম শতাব্দীয় ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় (২।৪।৮০-৯০) হইতে জানা যায়, ব্যাড়ি-রচিত 'সংগ্রহ' নামক লুপ্তপ্রায় ব্যাকরণবিষয়ক বিশাল গ্রন্থের সারসংগ্রহপূর্বক পতঞ্জলি এই মহাভাষ্য রচনা করেন।

সমগ্র মহাভাষ্যে মোট ৮৫টি আহ্নিক। এক দিনে যতটা পড়ানো হইত বা রচিত হইত তাহাই এক একটি আহ্নিকরূপে চিহ্নিত। অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ভাষ্য, পস্‌পশাদি ৯টি আহ্নিকে বিভক্ত বলিয়া ইহাকে 'নবাহ্নিকভাষ্য'ও বলা হয়। পস্‌পশা = সূক্ষ্মনিরীক্ষণ। মহাভাষ্যের প্রস্তাবনা-আহ্নিকের নাম পস্‌পশাহ্নিক। কথিত আছে ঃ

> শাস্ত্রেষ্বাদ্যং ব্যাকরণং মুখ্যংতত্রাপি পাণিনেঃ।
> রম্যং তত্র মহাভাষ্যং রম্যা তত্রাপি পস্‌পশা।।

অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে ব্যাকরণের স্থান প্রথমে, সেই ব্যাকরণে মুখ্যস্থান পাণিনিব্যাকরণের, সেই ব্যাকরণে রম্য গ্রন্থ মহাভাষ্য—তাহাতে আবার রম্যা পস্‌পশা (আহ্নিক)।

সমগ্র ভাষ্যে অষ্টাধ্যায়ীর অর্ধেকেরও কম (মোট১৭১৩টি) সূত্র আচরিত হইয়াছে। এই কার্যে পতঞ্জলি নিজেও কয়েকটি বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন—যাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে 'ইষ্টি'। নাগেশ ভট্টের মতে এই ইষ্টিরচনার দ্বারা ব্যাখ্যার জন্যই অন্যান্য শাস্ত্রের ভাষ্য হইতে পার্থক্যহেতু পাতঞ্জল মহাভাষ্যের মহত্ত্ব।[২৪] কাত্যায়নের বার্ত্তিক ব্যতীত সৌনাগ প্রভৃতি অন্য ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের কিছু কিছু বার্ত্তিক বা মতও মহাভাষ্যে প্রসঙ্গতঃ আলোচিত হইয়াছে। কাত্যায়নের যেসব বার্ত্তিক মহাভাষ্যে ধৃতহইয়াছে তন্মধ্যে কিঞ্চিদধিক সাতশত সূত্রের বার্ত্তিক ব্যাখ্যামূলক, পাঁচশতাধিক সূত্রের বার্ত্তিক সংস্কারমূলক এবং কয়েকটি (প্রায় ৮টি) সূত্র কাত্যায়নের মতে অনাবশ্যক[২৫] বলিয়া প্রতিভাত হইবার

যোগ্য। কাত্যায়ন যেসব সূত্রের উপর বার্ত্তিক রচনা করেন নাই (?
এমন চারিশতাধিক সূত্রের উপরও ভাষ্য বর্তমান। ভাষ্যকারের বিবেচনা:
১৬টি সূত্র অনাবশ্যক, মাত্র ৩৬টি সূত্রের ক্ষেত্রে তিনি সূত্রকারকে
বার্ত্তিককারের আক্রমণ বা বিরূপ সমালোচনা হইতে রক্ষা করিতে সচে
হইয়াছেন।[২৬] কোনো বিরোধ বা সমস্যার ক্ষেত্রে তিনমুনির মধ্যে পূ
ব্যক্তি অপেক্ষা পর ব্যক্তির মতামত অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য
'যথোত্তরং হি মুনিত্রয়স্য প্রামাণ্যম্' (মহাভাষ্যপ্রদীপ ১।১।২৯) অথব
'যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্' (মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত ৩।১।৮৭)।

কাত্যায়নের বার্ত্তিক-এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্য-রচনার উদ্দেশ্য লইয়
এদেশে ও বিদেশে অনেক আলোচনা হইয়াছে। সেই সবের সার
নিষ্কর্ষস্বরূপ বলা যায়, কাত্যায়ন বার্ত্তিক রচনা করিয়া অষ্টাধ্যায়ীর
সূত্রাবলীর পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিপূরণের ব্যবস্থা দিয়া যে উদ্দেশ
সাধনে যত্নপর হইয়াছিলেন, সূত্রসমূহকে অপরিবর্তিত রাখিয়া বা তাহাদের
বার্ত্তিকাদি রচনা না করিয়া কেবল যথোপযুক্ত ব্যাখ্যার দ্বারাই সেই
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, ইহা প্রদর্শন করাই পতঞ্জলির ভাষ্য-রচনার
নিগূঢ় উদ্দেশ্য।[২৭] কাত্যায়ন প্রচলিত ভাষার অনুযায়ী ব্যাকরণের
প্রতিসংস্কারের পক্ষপাতী, আর পতঞ্জলি ব্যাকরণকে অপরিবর্তিত রাখিয়
(কারণ তাঁহার মতে 'ছন্দোবৎ সূত্রাণি ভবন্তি') বিশেষ ব্যাখ্যার দ্বার
তাহাকে প্রচলিত ভাষার সহিত সুসমঞ্জস দেখাইতে ইচ্ছুক, কারণ–
'ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্নহিসন্দেহাদলক্ষণম্'—অর্থাৎ কোনো সূত্রের
ব্যাখ্যা হইতেই উহার বিশেষ প্রতিপত্তি বুঝিতে হইবে, (অন্যথা) কেবল
সন্দেহবশে উহাকে অনুপযুক্ত সূত্র বলিয়া পরিত্যাগ করা অনুচিত
পরবর্তীকালে কুমারিল ভট্টের উক্তিতেও ইহার সমর্থন মিলে ঃ

সূত্রেষ্বেব হি তৎসর্বং যদ্‌বৃত্তৌ যচ্চবার্ত্তিকে।
সূত্রং যোনিরিহার্থানাং সর্বং সূত্রে প্রতিষ্ঠিতম্।।

—তন্ত্রবার্ত্তিক ২।৩

তাই রক্ষণশীল পাণিনি-পন্থী বৈয়াকরণদের মতে কোনো প্রয়োগ যদি
পাণিনিসূত্র-বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ পাণিনির সূত্রকে শত চেষ্টাতেও এমন
ভাবে ব্যাখ্যা করা না যায় যাহাতে সেই প্রয়োগকে সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ

করা চলে, তবে তাহা (সেই প্রয়োগ) যত বড় গ্রন্থকারেরই হউক না কেন, অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত ও পরিত্যক্ত হইবে। বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদীর রচয়িতা ভট্টোজি দীক্ষিত এই বিষয়ে খুব কঠোরতা দেখাইয়াছেন।

মহাভাষ্যেই আমরা সর্বপ্রথম সংগ্রহ-কার দাক্ষায়ণের কথা পাই, আর জানিতে পারি চারিটি সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণধারার কথা ঃ 'আপিশল-পাণিনীয়-ব্যাড়ীয়-গৌতমীয়াঃ' (৬।২।৩৬)। এই উক্তির আচার্য-পরম্পরা, ঐতিহাসিক বিচারে কালানুক্রমিক বলিয়া প্রতিভাত। এই ব্যাড়ি-ই পাণিনির (মামাতো ভাই?) মাতামহ গোত্রের দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি। বৈয়াকরণ গৌতমের বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (৫।৩৮) গৌতমের উল্লেখ আছে। আপিশলির নাম তো পাণিনিই করিয়া গিয়াছেন। এইসব ব্যতীত আরও কয়েকজন নূতন শাব্দিক এবং কয়েকটি ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ মহাভাষ্যে আছে, যেমন ঃ কাশকৃৎস্নি (৪।১।১৪, ৪।১।৯৩, ৪।৩।১৫৫), সৌনাগ (২।২।১৮, ৩।২।৫৬...), সৌর্যভগবৎ বা সৌর্যভগবান্ (৮।২।১০৬), বাড়ব (৮।২।১০৬), কুণরবাড়ব (৩।২।১৪, ৭।৩।১), ক্রোষ্ট্রীয় (১।১।৩) এবং বার্ষ্যায়ণি (১।৩।১, ৪।১।১৫৫)।

বেদব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রে (১।৪।২২) কাশকৃৎস্ন উল্লিখিত হইয়াছেন। পরবর্তী বৈয়াকরণদের মধ্যেও অনেকেই কাশকৃৎস্নকেই শাব্দিক বা বৈয়াকরণরূপে গ্রহণ করিলেও, মহাভাষ্যকার কিন্তু 'কাশকৃৎস্ন'কে ব্যাকরণরূপে গ্রহণ করিয়া পরোক্ষভাবে 'কাশকৃৎস্নি'কে ইহার রচয়িতা সাব্যস্ত করিয়াছেন (১।১।১ম আহ্নিকের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। পাণিনির 'ইঞশ্চ' (৪।২।১১২) সূত্রানুসারে 'আপিশলি' বা 'কাশকৃৎস্নি' শব্দের উত্তর অণ্‌প্রত্যয়যোগে তাঁহাদের রচিত ব্যাকরণগ্রন্থের বাচক 'আপিশল' বা 'কাশকৃৎস্ন' পদ পাওয়া যায়। মহাভাষ্যের অন্যত্র (৪।১।১৪...) স্পষ্টতঃই কাশকৃৎস্নি-প্রোক্ত মীমাংসাকে 'কাশকৃৎস্নী' বলা হইয়াছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কাশকৃৎস্নি-প্রোক্ত ব্যাকরণকে 'কাশকৃৎস্নম্' বলিতে বাধা নাই। পাণিনির ৪।২।১১৪ সংখ্যক সূত্রানুসারে কাশকৃৎস্ন বা কাশকৃৎস্নির (ব্যাকরণ) গ্রন্থকে 'কাশকৃৎস্নীয়' বলিতে হয়।[২৮] তাই জৈন

শাকটায়নের (৩।২।১৬১) সূত্রের অমোঘা বৃত্তিতে উদাহৃত হইয়াছে 'ত্রিকংকাশকৃৎস্নীয়ম্', অর্থাৎ কাশকৃৎস্ন বা কাশকৃৎস্নি-প্রোক্ত কাশকৃৎস্নীয় ব্যাকরণ তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। আমরা মহাভাষ্যের প্রমাণের ভিত্তিতে কাশকৃৎস্নিকেই কাশকৃৎস্ন ব্যাকরণের রচয়িতা হিসাবে গ্রহণ করিয়া, কাশিকাবৃত্তির 'ত্রিকাঃ কাশকৃৎস্নাঃ' (৪।২।৬৫) এবং 'ত্রিকংকাশকৃৎস্নম্' (৫।১।৫৮) প্রভৃতি উদাহরণের জোরে ইহাকে তিন অধ্যায়-বিশিষ্ট বলিতে পারি। কাশিকার 'কাশকৃৎস্নং গুরুলাঘবম্' (৪।৩।১১৫) এবং 'আপিশল্যপজ্ঞং গুরুলাঘবম্' (৬।২।১৪) ইত্যাদি বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয় যে এই দুই ব্যাকরণে 'গুরুলঘু ব্যবস্থা' অর্থাৎ প্রতিপদপাঠ এবং সূত্রব্যবস্থা দুই-ই অবলম্বিত হইয়াছিল। প্রতিপদপাঠ অর্থাৎ শব্দের 'সিদ্ধরূপ' প্রদর্শন। পরে ইহার অবলম্বনে 'রূপাবলী' নামক পৃথক্ পুস্তক সঙ্কলিত হয়।

পদমঞ্জরীতে সুনাগাচার্যের শিষ্যদিগকে 'সৌনাগ' বলা হইয়াছে। কৈয়টের মতে সুনাগ কাত্যায়নের পরবর্তী এবং সুনাগের বার্ত্তিক কাত্যায়নের বার্ত্তিকাপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত ছিল ঃ

> কাত্যায়নাভিপ্রায়মেব প্রদর্শয়িতুং সৌনাগৈরতিবিস্তরেণ
> পঠিতমিত্যর্থঃ (২।২।১৮)।

ইহা অবশ্য মহাভাষ্যে লিখিত 'এতদেব চ সৌনাগৈর্বিস্তরতরকেণ পঠিতম্' (২।২।১৮)-এরই ব্যাখ্যা। মহাভাষ্যের অনেক স্থলে 'অত্যল্পমিদমুচ্যতে' বলার পরে কাত্যায়নের বার্ত্তিক অপেক্ষা বিস্তৃততর সৌনাগ-বার্ত্তিক উদ্ধৃত হইয়াছে। ৪।৩।১১৫ সূত্রের ভাষ্যপ্রদীপে 'পাণিনীয়লক্ষণে দোষোদ্ভাবনমেতৎ' বলায় জানা যায়, ঐ সূত্রের সৌনাগ বার্ত্তিকে পাণিনীয় সূত্রের দোষদর্শনপ্রচেষ্টা ছিল। কাশিকাবৃত্তিতে (৭।২।১৭) সৌনাগ মত উদ্ধৃত হইয়াছে। মহাভাষ্যপ্রদীপ-মতে (৮।২।১০৬) সৌর্যভগবান্ ছিলেন সৌর্যনামক নগরের বাসিন্দা। নিরুক্তে (১।২) বার্ষ্যায়ণিদৃষ্ট ৬টি ভাববিকারের কথা আছে। মহাভাষ্যে এবং বৃহদ্দেবতা-গ্রন্থেও তাহারই প্রতিধ্বনি বর্তমান।[২৯] ভাবের সেই ছয়টি বিকার এইরূপ—জন্ম, অস্তিত্ব, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় এবং বিনাশ।

কথিত আছে, একদা শেষ-শয্যাশায়ী ভগবান্ নারায়ণের ভার অসহ্য হওয়ায়, শেষনাগ তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন, শিবনৃত্য দর্শনে অত্যধিক আনন্দিত হওয়ার জন্য তাঁহার শরীরের ওজন ঐ রূপ বাড়িয়া গিয়াছিল। তখন শেষনাগও সেই নৃত্য দর্শনের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে, বিষ্ণু এই বিষয়ে মহাদেবের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে বলেন ঃ 'তুমি কাত্যায়ন-প্রণীত বার্ত্তিকসমূহের গুণাগুণ-বিচারপূর্বক পাণিনি-ব্যাকরণের ভাষ্য রচনার জন্য আদিষ্ট হইয়াছ। সেই উদ্দেশ্যে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া তুমি চিদম্বরমে শিবনৃত্য দেখিতে পাইবে।'

সেই সময়ে পৃথিবীর গোনর্দদেশে গোণিকানাম্নী জনৈকা মুনিকন্যা পুত্রকামনায় কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। শেষনাগ তাঁহাকেই মাতৃত্বে বরণ করিতে মনঃস্থ করিয়া তৎপ্রস্তুত সূর্যার্ঘ্যের মধ্যে সূক্ষ্মদেহে প্রবেশ-পূর্বক সেই অর্ঘ্যাঞ্জলির সহিত পতিত হইয়াই তাপসমূর্তি ধারণ করিলেন। গোণিকাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া নাম দিলেন পতঞ্জলি ('যৎ পতন্নভবদঞ্জলিতোঽসৌ তৎ পতঞ্জলিরিতি')। 'স্মরণ করিলেই আসিব' বলিয়া জননীকে প্রবোধ দিয়া তিনি শিবের আরাধনায় দক্ষিণ-সাগরের তীরে চলিয়া গেলেন।

তীব্র তপস্যায় মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া পতঞ্জলি তাঁহার নিকট হইতে যে দুইটি বর লাভ করিলেন তাহার ফলে (১) শিবনৃত্য দর্শনের যোগ্যতা এবং (২) সবার্ত্তিক অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যরচনার ক্ষমতা তাঁহার করায়ত্ত হইল। তদনুসারে তিনি প্রথমে চিদম্বরমে উপস্থিত হইয়া বিশ্বকর্ম-নির্মিত স্বর্ণময়ী সভায় অভীপ্সিত নৃত্য দর্শনের পর মহাভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রচনা সম্পূর্ণ হইলে সহস্র ছাত্র ইহার পাঠ লইতে তাঁহার অনুগামী হইলেন। তিনি তাঁহাদের অভিলাষ পূরণ করিতে মনঃস্থির করিয়া একটা বিশাল যবনিকা খাটাইয়া তাহার এক পার্শ্বে তাঁহাদিগকে বসিতে বলিলেন এবংঅপর পার্শ্বে স্বয়ং আত্মগোপন করিয়া অবস্থানপূর্বক ভাষ্যপাঠনায় রত হইলেন। তৎপূর্বে তিনি এই বলিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, কেহ যদি পর্দা সরাইয়া তাঁহাকে দেখেন তবে কিন্তু মহা অনর্থপাত ঘটিবে।

TO BE NOTED TO BE NOTED

স্বয়ং ভাষ্যকারের মুখে সেই ভাষ্যের পাঠনা এক পরম বিস্ময়কর ঘটনা। স্বরের মাধুর্যে, ব্যাখ্যার চমৎকারিত্বে, ভাবের গাম্ভীর্যে এবং ভাষার প্রাঞ্জলতায় একযোগে যেন অপার্থিব বাগ্‌বৈভবের সৃষ্টি হইল। ছাত্রদের মনে হইতে লাগিল যেন ভাষ্যকার যুগপৎ প্রত্যেকেরই দিকে মুখ রাখিয়া সমপ্রযত্নে পড়াইতেছেন। ইহাতে অতীব বিস্মিত হইয়া তাহারা ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য যেই মাত্র সেই যবনিকা উত্তোলন করিলেন অমনি গুরুবাক্যলঙ্ঘনের অপরাধে সহস্রফণায় বিমণ্ডিত নাগরাজের রোষানলে সকলেই ভস্মীভূত হইলেন।

ভাগ্যক্রমে তাহাদের একজন তখন সেখানে ছিলেন না, জলমোচনের জন্য অন্যত্র গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারে ভীত হইয়া করযোড়ে তাঁহার বাহিরে যাওয়ার এবং সেই কারণে রক্ষা পাওয়ার কথা জানাইলে, পতঞ্জলি তাঁহাকে পাঠ সমাপ্তির পূর্বেই স্থানত্যাগের অপরাধে 'রাক্ষস হও' বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। পরে তাঁহার কাতর প্রার্থনায় একটু শান্ত হইয়া বলিলেন ঃ 'পচ্‌ধাতুর নিষ্ঠায় কি রূপ হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া যাহার নিকট হইতে "পক্ব" এই উত্তর পাইবে, তাহাকে তুমি আমার ভাষ্য অধ্যয়ন করাইলে এই শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। আমার প্রসাদে তখন সমগ্র ভাষ্য তোমার মুখে স্ফুরিত হইবে।' এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়া গোনর্দদেশে জননী গোণিকার নিকট আসিলেন এবং যোগসূত্র ও চরকসংহিতার বার্ত্তিক রচনা করিয়া জননীর দেহত্যাগের পর নিজেও স্বর্গত হইলেন।

এদিকে পতঞ্জলির শাপগ্রস্ত সেই শিষ্য রাক্ষস হইয়া রাজপথের নিকটবর্তী এক বটবৃক্ষে আশ্রয় লইল এবং পথচারীদিগকে একে একে পূর্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সদুত্তর না পাইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়া উদরপূরণ করিতে লাগিল। পচ্‌ধাতুর নিষ্ঠায় পক্ব (বা পক্ববান্) না বলিয়া সবাই বলিত 'পাচিত'। এইভাবে বহু বৎসর অতীত হইলে উজ্জয়িনী হইতে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক ব্রাহ্মণপথিক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন শাপমোচনের পূর্বাভাস বুঝিতে পারিয়া সেই রাক্ষস তখন আনন্দে বৃক্ষ

হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইল এবং তাঁহার সমস্ত খবর লইল। চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন ঃ 'আমি ভাষ্য অধ্যয়নের সঙ্কল্প লইয়াই আপনার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কারণ আমি শুনিয়াছিলাম, পতঞ্জলির একজন শিষ্য তাঁহার রোষাগ্নি হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।'

রাক্ষস তখনই চন্দ্রগুপ্তকে লইয়া সেই বটের ছায়ায় বসিল এবং অবিচ্ছিন্ন ধারায় চারি মাসের চেষ্টায় তাহাকে সমগ্র ভাষ্য শুনাইয়া স্বীয় কর্তব্য সমাধা করিল। গুরুকৃপায় শাপমুক্তির পর তাহার স্বর্গগমনে আর বাধা রহিল না। এদিকে চন্দ্রগুপ্ত ভাষ্যশ্রবণের সময় সংগৃহীত বটপত্রে তাহা নখে লিখিয়া রাখিতেছিলেন। এইবার সেই সব বটপাতা চাদরে বাঁধিয়া হৃষ্টমনে স্বগৃহে যাত্রা করিলেন। পথে একটি সুজলা নদী পড়িল। শ্রান্তক্লান্ত চন্দ্রগুপ্ত নদীর তীরে এক বৃক্ষতলে আসিয়া বসিলেন এবং অঞ্জলি ভরিয়া নদীর জল পান করিয়া সেই বটপাতার পুঁটুলীতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। সেই সময় এক গোবৎস সেখানে খাদ্য মনে করিয়া সেই পুঁটুলীতে কামড় দিতেই চন্দ্রগুপ্ত জাগিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ গোগ্রাস হইতে সেই পত্রগুলি উদ্ধার করিলেন। পথে একটি শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীরত্নও তাঁহার লাভ হইল। এইসব লইয়া তিনি সত্বর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বটপত্র হইতে ভাষ্য উদ্ধারপূর্বক পাকা করিয়া লিখিয়া লইলেন। গরুর দন্তাঘাতে কয়েকটি পাতার কিছু কিছু লেখা নষ্ট হওয়ায় তাহার পাঠোদ্ধারে অসমর্থ হইয়া সেইসব স্থলে কুণ্ডলী দিয়া রাখিলেন। সমগ্র মহাভাষ্যে এইরূপ কুণ্ডলীর সংখ্যা ছিল সাত। এইগুলির উদ্ধার ও ব্যাখ্যা লইয়া পরবর্তী সময়ে অনেক জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে এবং স্বতন্ত্র পুস্তকাদিও (যেমন 'কুণ্ডলী ব্যাকরণ') রচিত হইয়াছে। শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে (২।৯৬)—'ফণিভাষিত ভাষ্য-ফক্কিকা বিষমা কুণ্ডলনামবাপিতা' লক্ষণীয়। শুনা যায় ভাষাবৃত্তির রচয়িতা পুরুষোত্তমদেব ভাষ্যকুণ্ডলীর শর্তসাপেক্ষ 'প্রাণপণা' ব্যাখ্যা রচনা করিতে বসিয়া কোনরূপ বিচ্যুতিহেতু সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন। সে যাহাই হউক, চন্দ্রগুপ্ত ভাষ্যগ্রন্থের আরও কয়েকটি পুঁথি প্রস্তুত করিয়া প্রচারের জন্য পণ্ডিতসভায় দান করেন এবং পরিণামে সেই শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাতপুত্র ভর্তৃহরিকে ভাষ্য শিক্ষা দিয়া পরলোকগত হন।

এইরূপও শুনা যায়, পতঞ্জলি গোবিন্দপাদ বা গোবিন্দযোগী নামে (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত) প্রায় সহস্র বৎসর জীবিত থাকিয়া শ্রীমৎশঙ্করাচার্যকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। নর্মদা-তীরবর্তী এক গুহার মধ্যে সমাধিমগ্ন অবস্থায় তাঁহার এই সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত হয়।[৩০]

কল্হণের 'রাজতরঙ্গিণী' (১।১৭৬, ৪।৪৮৮) এবং ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়' (২।৪৮৪-৯০) হইতে জানা যায়, ক্রমে সংক্ষেপ-প্রিয় এবং অল্পবিদ্য বৈয়াকরণদের প্রাদুর্ভাবের ফলে সংগ্রহ নামক গ্রন্থের (পঠন-পাঠন বন্ধ হইয়া) অবলুপ্তি ঘটিলে, তৎস্থলে পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যের অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু মহাভাষ্যের মতো এমন অপূর্ব গ্রন্থও 'অকৃতবুদ্ধি' ব্যক্তিদের বোধগম্য না হওয়ায়, বৈজি-সৌভব-হর্যক্ষ প্রভৃতি শুষ্ক তার্কিকদের হস্তে পড়িয়া নানাভাবে বিকৃত ও বিপর্যস্ত হয় এবং পতঞ্জলির শিষ্যদের অধিকারভ্রষ্ট হইয়া দাক্ষিণাত্যে (চিত্রকূট পর্বতে?) গ্রন্থমাত্রে পর্যবসিত হইয়া রক্ষিত থাকে। একমতে রাবণ নামক জনৈক বিদগ্ধ ব্যক্তি সেখানে ইহাকে নিজে লিখিয়া রক্ষা করিতেছিলেন। পরে সেখান হইতে ব্রাহ্মণবেশী এক রাক্ষস ইহাকে আনিয়া চন্দ্রাচার্য প্রভৃতি পণ্ডিতদিগকে প্রদান করে এবং তাঁহারা কাশ্মীর-রাজের[৩১] পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথমে কাশ্মীরে এবং পরে অন্যত্র এই গ্রন্থের সুষ্ঠু প্রচারের ব্যবস্থা করেন, আবার নিজেরাও ইহার ভিত্তিতে ব্যাকরণ গ্রন্থাদি রচনা করেন। এইসব গ্রন্থ অধ্যয়নপূর্বক ভর্তৃহরির গুরু বসুরাত আবার স্বীয় ব্যাকরণগ্রন্থের রচনায় প্রবৃত্ত হন। গুরুনির্দিষ্ট ভাষ্যের অবলম্বনে উহার ন্যায়-বীজাদি রক্ষার্থ ভর্তৃহরিও তিন কাণ্ডে বিভক্ত বাক্যপদীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এইসব নানা ছোট-বড় কাহিনী হইতে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, মহাভাষ্যরচনার কিছুকাল পরে কোনও অনিবার্য কারণে ইহার পঠন-পাঠন প্রায় বন্ধ হইয়া যায় এবং দীর্ঘকাল (প্রায় কয়েকশত বৎসর) এই অবস্থা চলার পর খুব সম্ভব ভর্তৃহরির সময় ইহার পুনরভ্যুদয় ঘটে। দেশে বৌদ্ধ-জৈন প্রভৃতি নাস্তিক ধর্মসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবই বোধ হয় সেই অনিবার্য কারণ।

মহাভাষ্যের সিদ্ধান্তগুলি দুইভাগে বিভক্ত : (১) একদেশী এবং (২) সিদ্ধান্ত। এমন অনেক স্থল আছে যেখানে এই বিষয়ে সহসা সন্দেহে পড়িতে হয়, অর্থাৎ যাহা শেষ বা স্থির সিদ্ধান্ত নয়, তাহাকেই হঠাৎ সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়। এই একদেশী এবং সিদ্ধান্তভাষ্যের নির্ণয়ে নাগেশ ভট্ট এক উপায় বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে, যাহা পতঞ্জলি নিজে বলেন তাহাই সিদ্ধান্তভাষ্য, এবং বার্ত্তিকসমূহের প্রকাশার্থ যাহা কথিত হয় তাহাই একদেশী ভাষ্য। টীকাকারদের সাহায্য লইয়াও এই দুই-এর পার্থক্য-নির্ণয় এক দুরূহ ব্যাপার।

এই মহাগ্রন্থের বহু টীকা-টিপ্পনী এযাবৎ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কাশ্মীরী পণ্ডিত কৈয়ট-প্রণীত 'প্রদীপ' অর্থাৎ মহাভাষ্যপ্রদীপ বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত টীকা। তাঁহার আগে ভর্তৃহরির 'দীপিকা' টীকা কিছু প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সেই টীকার পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই।

কৈয়ট ছিলেন পণ্ডিত বংশের সন্তান। তাঁহার ভ্রাতৃগণ—মম্মট, উব্বট (বা উবট) প্রভৃতি সকলেই পণ্ডিত এবং গ্রন্থকারও। জৈয়ট (বা বজ্রট) ছিলেন ইঁহাদের পিতা। খ্রীঃ ১০ম/১১শ শতকে ইঁহারা বর্তমান ছিলেন। জার্মান পণ্ডিত Dr. G. Buehler-প্রদত্ত রিপোর্ট[৩২] হইতে জানা যায়, তিনি কাশ্মীরীদের নিকট কৈয়টের সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা শুনেন—কাহারও মতে মামপুর (Mampur) এবং মতান্তরে যেছগাম (Yechgam) ছিল কৈয়টের বাসস্থান। এই দুই-ই কাশ্মীরী উপত্যকায় অবস্থিত ছোট সহর বিশেষ। কৈয়ট অতি দরিদ্র ছিলেন। মহাভাষ্য সহ ব্যাকরণের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই ছিল তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান। এই শাস্ত্রে তিনি এতদূর অভ্যস্ত ছিলেন যে, মহাভাষ্যের কোনো পুঁথি ব্যতীতই তিনি ছাত্রদের নিকট সমগ্র ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন এবং ইহার যেসব স্থল বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া বররুচি (?) কুণ্ডলী চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সব স্থলেও তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। একদা কৃষ্ণম্ ভট্ট নামক এক পণ্ডিত দক্ষিণ ভারত হইতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া দেখেন যে, তিনি বসিয়া বসিয়া হাতে অন্য কাজ করিতেছেন এবং মুখে মুখে ছাত্রদিগকে মহাভাষ্যের দুরূহতম অংশ শিক্ষা দিতেছেন। তিনি কৈয়টের দারিদ্র্য লক্ষ্য করিয়া এবং জীবিকা-

নির্বাহের জন্য তাঁহাকে কায়িক পরিশ্রম করিতে দেখিয়া অতি দুঃখিত মনে তৎক্ষণাৎ কাশ্মীররাজের নিকট গিয়া তাঁহার নিকট হইতে কৈয়টের জন্য একখানি গ্রাম—ও উহার সহিত কিছু শস্যদান মঞ্জুর করিয়া এক শাসন (দানপত্র) আদায় করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঐ অবস্থাতেও কৈয়টকর্তৃক সেই রাজ-দান প্রত্যাখ্যাত হয়। পরে কৈয়ট কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে বাহির হন এবং কাশীতে আসিয়া সেখানে এক পণ্ডিতসভায় পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সভাপতির অনুরোধে মহাভাষ্যের 'প্রদীপ' টীকা রচনা করেন। এই টীকা (১।১।৭৫) হইতে জানা যায়, পাণিনির ১।১।৭৫ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি বৃত্তিকার কুণির মত গ্রহণ করিয়াছিলেন ('ভাষ্যকারস্তু কুণিদর্শনমশিশ্রিয়ৎ')। খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত নাগেশ ভট্ট কৈয়টের টীকার উপর আবার উদ্দ্যোত নামে যে টীকা রচনা করেন তাহা 'মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত' নামে বিখ্যাত। মহাভাষ্যপ্রদীপের আর এক টীকা 'ভাষ্যপ্রদীপবিবরণ' ঈশ্বরানন্দের রচনা। অন্য টীকাকারগণের মধ্যে আছেন—চিন্তামণি, নাগনাথ, রামানন্দ সরস্বতী, অন্নম্ ভট্ট, নারায়ণ শাস্ত্রী, মলয় যজ্বা, রামসেবক, প্রবর্তকোপাধ্যায়, আদেন্ন, সর্বেশ্বর, সোমযাজী, হরিরাম এবং আরও অনেকে।

দাক্ষায়ণের সংগ্রহ

বাক্যপদীয়ে (২।৪৮৭) মহাভাষ্যকে 'সংগ্রহপ্রতিকঞ্চুক' বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ 'সংগ্রহ-সংক্ষেপভূত' (-পুণ্যরাজ টীকা) অর্থাৎ সংগ্রহের সংক্ষিপ্তসার স্বরূপ।৩৩ এই 'সংগ্রহ' একদা ব্যাকরণক্ষেত্রে এক বিশাল সংগ্রহ-পুস্তকরূপে বিরাজিত ছিল। 'সংগ্রহস্তু সমাহৃতিঃ।' দাক্ষায়ণ ছিলেন ইহার শেষ সঙ্কলক বা প্রতিসংস্কর্তা। তৎপূর্বে ব্যাড়ি নামক জনৈক প্রাচীন আচার্য ইহার সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন পাণিনিরও পূর্ববর্তী। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে পাঁচবার (৩।২৩, ২৮, ৬।৪৩, ১৩।৩১, ৩৭) তাঁহার উল্লেখ আছে। কাশিকান্যাস (২।৪।২১, ৬।২। ১৪) হইতে জানা যায়, তিনি লট্, লোট্ ইত্যাদি দশ 'ল'কার বুঝাইতে দশ 'হয্' ব্যবহার করিয়াছিলেন।

সংগ্রহে দাক্ষায়ণের কৃতিত্বের কথা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিই বোধ হয় সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন ঃ 'শোভনা খলু দাক্ষায়ণস্য সংগ্রহস্য কৃতিঃ। শোভনা খলু দাক্ষায়ণেন সংগ্রহস্য কৃতিরিতি' (২।৩।৩৬)। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে (৩৬।৪৯) সংগ্রহের উল্লেখ আছে। কাত্যায়নের বার্ত্তিকে ব্যাড়ির নাম আছে, কিন্তু সংগ্রহের উল্লেখ নাই। পতঞ্জলি দাক্ষায়ণকে সংগ্রহকার বলিয়া সপ্রশংস ঘোষণা করিলেও পরবর্তী বৈয়াকরণগণ কিন্তু ব্যাড়িকেই সংগ্রহের রচয়িতা বলিয়াছেন, কেহই দাক্ষায়ণের নাম করেন নাই। আবার মহাভাষ্যেরই একস্থলে (৬।২।৩৬) যে বলা হইয়াছে—'আপিশল-পাণিনীয়-ব্যাড়ীয়-গৌতমীয়াঃ'—ইহার আচার্যপরম্পরা যদি কালানুক্রমিক হয়, তবে এই স্থলে ব্যাড়ি শব্দে দাক্ষায়ণ-ব্যাড়িকেই বুঝিতে হইবে, কারণ প্রাচীন ব্যাড়ি পাণিনির পূর্ববর্তী।

বাক্যপদীয়ের (২।৪৮৪) টীকায় পুণ্যরাজ পাণিনীয় ব্যাকরণে 'বাড্যুপরচিত' সংগ্রহের কথা লিখিয়া একটু পরেই (২।৪৮৬) মহাভাষ্যও যে পতঞ্জলি-কর্তৃক 'উপরচিত' তাহা লিখিয়াছেন। ইহার দ্বারা প্রাচীন ব্যাড়িরচিত সংগ্রহের অবলম্বনে বা আধারে দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি কর্তৃক প্রণীত সংগ্রহের ন্যায়, পতঞ্জলির মহাভাষ্যও দাক্ষায়ণ ব্যাড়ির সংগ্রহের অবলম্বনে রচিত, এইরূপ অভিপ্রায়ই ধ্বনিত হইয়াছে। 'পাণিনীয় ব্যাকরণে' অর্থাৎ তৎসম্প্রদায়ে বা তন্মতানুসরণে।

পুরুষোত্তমদেবের ভাষাবৃত্তি (৬।১।৭৭) হইতে জানা যায়, 'ইকাংযণ্‌ভির্ব্যবধানম্‌' সূত্রটি ব্যাড়ি ও গালবের ব্যাকরণে বিদ্যমান ছিল এবং তদনুসারে নদ্যত্র এবং নদীয়ত্র, ত্র্যম্বক ও ত্রিয়ম্বক, ভ্বাদি ও ভূবাদি পদসমূহ সিদ্ধ হইত। কিন্তু পাণিনি এই নিয়ম বাতিল করিয়া দেন, যদিও তিনি পূর্বাচার্যদের 'ভূবাদয়োধাতবঃ' (১।৩।১) সূত্রটি অটুট ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের (১।২।১) মহাবৃত্তিতে 'ইকো যণ্‌ভির্ব্যবধানমেকেষামিতি সংগ্রহঃ' বলিয়া সংগ্রহের যে 'ইকো যণ্‌ভির্ব্যবধানমেকেষাম্‌' সূত্রটির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত ব্যাড়ি ও গালবের নামে (পুরুষোত্তমদেব-কর্তৃক) প্রচারিত 'ইকাংযণ্‌ভির্ব্যবধানম্‌' সূত্রেরই দাক্ষায়ণব্যাড়িকৃত পরিবর্ধিত রূপ। দাক্ষায়ণ-সম্পাদিত সংগ্রহের অভ্যুদয়ের ফলে প্রাচীন ব্যাড়ির সংগ্রহ

ক্রমে অচল হইয়া যায়, কিন্তু প্রাচীন 'ব্যাড়ি'-নামটি স্বীয় ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া পরবর্তী সংগ্রহকার দাক্ষায়ণে যুক্ত বা আরোপিত হইয়া টিকিয়া থাকে। এই কারণেই পরবর্তী সময়ে 'দাক্ষায়ণ'-নামের সন্ধান বড় একটা পাওয়া যায় না, অথচ সেইস্থলে 'ব্যাড়ি'-নামের কত ছড়াছড়ি! মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের কৃষ্ণচরিতে ব্যাড়ির বিবিধ গুণের অন্যতমরূপে পাণিনিতন্ত্রের 'ব্যাখ্যাপটু'ত্বও উল্লিখিত ঃ

> রসাচার্যঃ কবির্ব্যাড়িঃ শব্দব্রহ্মৈকবাঙ্‌মুনিঃ। দাক্ষীপুত্রবচো ব্যাখ্যাপটুর্মীমাংসকাগ্রণীঃ।। ১৬।।

এই ব্যাড়ি যে দাক্ষায়ণব্যাড়ি তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিকে এবং পাণিনির ৪।১।১ ও ৬।১।৯১ সূত্রের ভাষ্যে আরও কয়েকবার দাক্ষায়ণ ও সংগ্রহের উল্লেখ আছে। তদানুষঙ্গিক আলোচনা হইতে জানা যায়, শব্দ নিত্য কি কার্য, সেই বিষয়ের পর্যালোচনাও সংগ্রহে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং কার্যত্বের বিরুদ্ধে মতাধিক্যহেতু শব্দের নিত্যতার পক্ষেই সিদ্ধান্ত সূচিত হইয়াছিল। শব্দ জাতিবাচক না দ্রব্যবাচক, আকৃতি না ব্যক্তি—সেই বিষয়ে একটা প্রবল মতবিরোধ প্রাচীন বৈয়াকরণদের মধ্যে পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। কাত্যায়নের মতে বাজপ্যায়ন ছিলেন আকৃতিবাদী এবং ব্যাড়ি দ্রব্যবাদী। পাণিনি ছিলেন জাতি-দ্রব্য উভয়পদার্থবাদী। পরে এই দুই-এর সহিত ক্রমে লিঙ্গ, সংখ্যা এবং কারক যুক্ত হওয়ায় শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত পাঁচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাত্যায়ন ছিলেন জাতি-দ্রব্য-লিঙ্গ-পদার্থবাদী, বৈয়াকরণ বৈয়াঘ্রপদ্য[৩৪] চতুষ্কবাদী এবং পতঞ্জলি পঞ্চকবাদী।

চান্দ্রব্যাকরণের (৪।১।৬২) বৃত্তিতে সংগ্রহকে 'পঞ্চক' অর্থাৎ পাঁচ অধ্যায়বিশিষ্ট বলা হইয়াছে। ভর্তৃহরিই সংগ্রহের শেষ বড় সংবাদদাতা। মহাভাষ্যের দীপিকা টীকায় তিনি লিখিয়াছেন, সংগ্রহ ছিল পাণিনীয় ব্যাকরণের একদেশস্বরূপ এবং ইহার ঐকতন্ত্রিক আনুগত্য এবং ব্যাড়ির প্রামাণ্যের সংস্তবহেতু ইহারই অনুকরণে কাত্যায়নও তাঁহার বার্ত্তিকপাঠের প্রথমে 'সিদ্ধ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন।[৩৫] সংগ্রহে আলোচিত বিষয়ের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ হাজার। বাক্যপদীয়ের (২।৪৮৪) টীকায় পুণ্যরাজ এবং মহাভাষ্যের 'প্রদীপোদ্দ্যোত' টীকায় নাগেশ

ব্যাড়িরচিত সংগ্রহকে যথাক্রমে 'গ্রন্থলক্ষপরিমাণনিবন্ধন' এবং 'লক্ষশ্লোক-সংখ্যগ্রন্থ' বলিয়াছেন। গদ্যপদ্যাত্মক এই গ্রন্থের পরিমাণ ছিল লক্ষশ্লোকের সমান অর্থাৎ এক-একটি করিয়া গণিলে সংগ্রহের মোট অক্ষরসংখ্যা দাঁড়াইত ৩২,০০,০০০। ৩২ অক্ষরাত্মক অনুষ্টুপ্‌ছন্দে গ্রথিত শ্লোকসংখ্যার পরিমাপে কোনও গদ্যাত্মক বা গদ্য-পদ্যাত্মক গ্রন্থের পরিমাণ নির্ধারণের ইহা এক প্রাচীন রীতি। পরবর্তী ব্যাকরণ-সাহিত্যে বিশেষতঃ মহাভাষ্যে ও বাক্যপদীয়ে সংগ্রহের বহু শ্লোক বা গদ্যাংশ অবিকল বা আংশিক পরিবর্তিত আকারে উদ্ধৃত হইয়াছে। সংগ্রহসূত্রের অধ্যয়নকারী ছাত্রকে বলা হইত 'সাংগ্রহসূত্রিক' (মহাভাষ্য ৪।২।৬০)। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, সংগ্রহে সূত্রাবলীরও অসদ্ভাব ছিল না। আমরা অবশ্য পূর্বেই ইহার একটি সূত্রের উল্লেখ করিয়াছি।

কাশিকার 'সসংগ্রহং ব্যাকরণমধীয়তে' (৬।৩।৭৯), ভাসের 'যজ্ঞফল' নাটকে 'সসূত্রার্থসংগ্রহং ব্যাকরণম্', চরকসংহিতার সূত্রস্থানে (অধ্যায় ২৯।৪) '...ত্রিবিধস্যায়ুর্বেদসূত্রস্য সসংগ্রহব্যাকরণস্য ...প্রবক্তারঃ', মহাভাষ্যের (৪।২।৬০) '...সবার্ত্তিকঃ সসংগ্রহঃ' এবং বাণভট্টের হর্ষচরিতে (৩য় উচ্ছ্বাস) 'সুকৃত সংগ্রহাভ্যাস গুরবো লব্ধসাধুশব্দা লোক ইব ব্যাকরণেঽপি...' প্রভৃতি বর্ণনা ও উক্তি হইতে অনুমিত হয়, ব্যাকরণ-শিক্ষার সাহায্যকারী পুস্তক বা Guide Book-হিসাবেই সংগ্রহের সমধিক উপযোগিতা ছিল। তাই প্রায়শঃ 'সসংগ্রহং ব্যাকরণম্' বলা হইয়াছে। রামায়ণেও (৭।৩৬।৪৯) তাই : 'সসূত্রবৃত্ত্যর্থপদংমহার্থং সসংগ্রহং...।' মূলতঃ সংগ্রহ ছিল এক বিরাট সঙ্কলন-গ্রন্থ। শাব্দিক পূর্বাচার্যদের যাবতীয় বিশিষ্ট মতামত এবং সেই সবের সমালোচনা, বিশেষতঃ ব্যাকরণের দার্শনিক আলোচনা ইহাতে উপনিবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে, ব্যাকরণের প্রাচীন ইতিহাসের প্রচুর তথ্যোপাদানও যে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। সংগ্রহের বিলোপ, ব্যাকরণের ইতিহাসক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি—যাহার সামান্য অংশই 'সংগ্রহপ্রতিকঞ্চুক' মহাভাষ্যের দ্বারা পূরণ হইয়াছে। সংগ্রহের বিশালতাই ইহার অবলুপ্তির প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়।

দক্ষ-দাক্ষি-দাক্ষায়ণ এই নামত্রয়, তদানুষঙ্গিক দাক্ষী ও দাক্ষেয় নামদ্বয়সহ, সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষতঃ ব্যাকরণ বিভাগে বড় বেশি প্রভাব বিস্তার করিয়া বিরাজিত। ইহার প্রধান কারণ অবশ্য এই নামাবলীর সহিত বৈয়াকরণ পাণিনির জন্মগত সংস্রব। তিনি এই গোষ্ঠীরই দৌহিত্র-সন্তান। বংশের মূলপুরুষ দক্ষ, তৎপুত্র দাক্ষি, কন্যা দাক্ষী এবং দাক্ষীর পুত্র দাক্ষেয় পাণিনি। এই দক্ষকুল নানা বিষয়ে প্রসিদ্ধ ছিল এবং সেই প্রসিদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। তাই খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ/৭ম শতাব্দীয় কাশিকাবৃত্তিতে দক্ষসংক্রান্ত নানা উদাহরণ দৃষ্ট হয়, যেমন—'দাক্ষঃ সঙ্ঘঃ' (৪।৩।১২৭), 'দাক্ষিগ্রামঃ' (৬।২।৮৪), 'দাক্ষিপলদ, দাক্ষিনগর, দাক্ষিহ্রদ, দাক্ষিকর্ষ, দাক্ষিঘোষ, দাক্ষিকট, দাক্ষিকূট, দাক্ষিশিল্পী' প্রভৃতি (৪।২।১৪২, ৬।২।৮৬)। কাশিকার 'কুমারীদাক্ষাঃ' (৬।২।৬৯) উদাহরণ হইতে প্রতীয়মান হয়, দক্ষের টোলে বা বিদ্যালয়ে co-education-এর ব্যবস্থা ছিল এবং কুমারীদের সান্নিধ্যলাভের লোভে সেখানে ছাত্রগণ আসিয়া (অধিক সংখ্যায়) ভর্তি হইত।[৩৬] পাণিনির ৪।২।৫৩ সূত্রের রাজন্যাদিগণে দাক্ষি-র উল্লেখ আছে।

দক্ষগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিতেন। কাশিকার বিভিন্ন উদাহরণ হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায়। তাঁহারা গান্ধারের কোনও স্থলের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দাক্ষেয় পাণিনির জন্মস্থান 'শলাতুর'-এর অবস্থানও এই অঞ্চলেই— কাবুল ও সিন্ধুনদের সঙ্গমস্থলের কয়েকমাইল উত্তরে। কাজেই তাঁহার মাতুলবংশীয়দের বাসস্থান বর্তমান কাবুল উপত্যকার নিম্নদেশের কোনও অঞ্চলে থাকার সম্ভাবনা।

দক্ষের পুত্র দাক্ষি এবং তৎপুত্র দাক্ষায়ণ[৩৭] এইরূপ সম্বন্ধ-পরম্পরায় দাক্ষায়ণকে পাণিনির মাতুলপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে তাঁহাকে পাণিনির কনীয়ান্ সমসাময়িক বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হয়, নতুবা ভ্রাতৃস্থানীয় পাণিনির ব্যাকরণানুসারে তৎকর্তৃক সংগ্রহের সংস্কার সাধন একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে, কারণ এই ব্যাপারে উভয়ের গ্রন্থরচনার মধ্যে একটা যথোপযুক্ত কালিক ব্যবধান থাকা দরকার। জ্যেষ্ঠ

ভগিনীর পৌত্রকেও অনেক সময়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রের সমবয়সী হইতে দেখা যায়। তদনুসারে দাক্ষায়ণকে বয়সের দিক্ দিয়া পাণিনির পুত্রস্থানীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা নাই।

স্বক্ষেত্রে অষ্টাধ্যায়ী

অষ্টাধ্যায়ী একাধারে বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের ব্যাকরণ। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে, উভয় ভাষার পার্থক্য-স্থলেই প্রায়শঃ বৈদিক ব্যাকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার কারণ, বৈদিক ব্যাকরণ রচনা পাণিনির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না ; লৌকিক সংস্কৃতের ব্যাকরণ নির্দেশ করিতে গিয়া নিতান্ত প্রাসঙ্গিক বা আনুষঙ্গিক বরং কতকটা আকস্মিকভাবেই তাঁহাকে এইদিকেও দৃষ্টি দিতে হইয়াছিল। তাই বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর স্বরপ্রকরণের শেষে ভট্টোজিকে বলিতে হয় ঃ 'ইত্থং বৈদিক-শব্দানাং দিঙ্মাত্রমিহদর্শিতম্।' অষ্টাধ্যায়ীর মোট সূত্রসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৫টি সূত্র বৈদিকশব্দ সংক্রান্ত। স্বরপ্রক্রিয়া-বিষয়ক ৩২৯টি + বৈদিকপ্রক্রিয়া বিষয়ক ২৭৪টি = ৬০৩টি সূত্রে বৈদিক ব্যাকরণ উপলক্ষিত।[৩৮]

ত্রিমুনির কেহই ভাষার নাম হিসাবে 'সংস্কৃত' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা 'লোক', 'লৌকিক' এবং 'ভাষা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বৈদিকভাষাকে বলিয়াছেন 'বেদ, বৈদিক, ছন্দঃ, ছান্দস, মন্ত্র, নিগম'। ভাষার বৈদিক ও লৌকিক এই দুই বিভাগ ব্যতীত অন্য কোনো দিকের নির্দেশ তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে অর্থাৎ সূত্র-বার্ত্তিক-ভাষ্যে নাই। মহাভাষ্যে ম্লেচ্ছভাষা এবং ম্লেচ্ছশব্দের ভ্রষ্ট উচ্চারণের কথা আছে। কেবল পাণিনীয় শিক্ষাতেই ভাষার প্রাকৃত এবং সংস্কৃত নাম দুইটির প্রথম সন্ধান পাই। সে যাহাই হউক, ত্রিমুনির সময়ে সংস্কৃত ভাষা যে সমাজের অন্ততঃ একশ্রেণীর কথ্যভাষা ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।[৩৯] মহাভাষ্যকার এই শ্রেণীর লোকদিগকে আর্যাবর্তবাসী 'শিষ্ট' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (৬।৩।১০৯)। আচার এবং নিবাসই ছিল ইহাদের শিষ্টত্বের নিয়ামক বা নির্ধারক। পূর্বে কালকবন (রাজমহলের পাহাড়), পশ্চিমে আদর্শ (আরাবল্লীপর্বত),

উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে পারিযাত্র (বিন্ধ্যপর্বতের পশ্চিমাংশ)—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী আর্যাবর্তে বাস করিয়া যে ব্রাহ্মণগণ নির্লোভ, বিনাকারণে সদাচারী, ছয় মাস বা এক বৎসরের জীবিকা-নির্বাহের উপযোগী ধান্য সঞ্চয়কারী এবং অন্য কিছুর সাহায্য-ব্যতীতই যে-কোন বিদ্যায় পারদর্শী—তাঁহারাই ছিলেন পতঞ্জলির মতে শিষ্ট।[৪০] তাঁহারা দৈবানুগ্রহবশতঃই হউক বা স্বভাবতঃই হউক, ঐ ভাষায় অভ্যস্ত ছিলেন অর্থাৎ কিনা অষ্টাধ্যায়ী অধ্যয়ন না করিয়াও তদ্‌বিহিত শব্দাদির যথাযথ প্রয়োগ করিতেন।

এই শিষ্টদের ব্যবহৃত শব্দরাশির স্বরূপ এবং ব্যুৎপত্তি জানিবার উপায় নির্ধারণের জন্যই অষ্টাধ্যায়ীর অবতারণা। তাই পতঞ্জলি ঐ আলোচনা শেষে বলিয়াছেন ঃ 'শিষ্টপরিজ্ঞানার্থাষ্টাধ্যায়ী' (৬।৩।১০৯)। এই পরিজ্ঞানের ব্যাপারে পাণিনি আর্যাবর্তের উত্তর-ও পূর্ব-অঞ্চলের শিষ্ট ভাষার যে পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা তিনি 'উদীচাম্' এবং 'প্রাচাম্' এই দুই বিভাগের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী ভূভাগে অর্থাৎ আর্যাবর্তের মধ্যে পবিত্রতর বলিয়া পরিগণিত 'মধ্যদেশে' বসবাসকারী শিষ্টদের ব্যবহৃত ভাষাকেই তিনি যে আদর্শ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভাষাতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায়, মধ্যদেশীয়[৪১] শিষ্টদের এই আদর্শ-ভাষা ছিল বৈদিক মন্ত্রযুগের পরবর্তী ব্রাহ্মণযুগের লক্ষণাক্রান্ত। ব্রাহ্মণযুগের শেষ অবস্থায়[৪২] আবির্ভূত হইয়া পাণিনি ঐ যুগের ভাষাকেই অষ্টাধ্যায়ীর মধ্য দিয়া সর্বোত্তম ভাষারূপে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। অষ্টাধ্যায়ীর বিধিগুলি যে ঐ ভাবার ক্ষেত্রেই সর্বাধিক প্রযোজ্য, বিশেষ পরিসংখ্যানের দ্বারা তাহা জানিতে পারা গিয়াছে।

কার্যকারণ-সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পাণিনির এই মহতী কৃতির কারণরূপে যে বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা সর্বাগ্রে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহা হইতেছে, বৈদিক ঐতিহ্যবিরোধী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিপ্লবাত্মক অভ্যুদয়। বৈদিক ব্রাহ্মণযুগের শেষে, পৌরাণিক হিন্দুযুগের প্রারম্ভমুখে, সুদীর্ঘকালের বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির কঠোরতার পরিপন্থী সরল-স্বাভাবিক এবং গণমুখী ঐসব মতবাদ জনগণেরই মুখের

ভাষাকে আশ্রয় করিয়া প্রচারিত হইতে থাকায় সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে প্রকাশোম্মুখ প্রাকৃতভাষার স্রোতে যে প্রবল গতিবেগের সঞ্চার হয়, তাহার ফলে ক্রমে পূর্বোক্ত শিষ্ট ভাষা কেবল সঙ্কুচিতই নয়, পরন্তু নানাভাবে বিকৃত ও বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতে থাকে। এই ঘোর বিপর্যয়ের মুখে শিষ্ট ভাষার অবিমিশ্র রূপটিকে ধরিয়া চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্যই পাণিনির ব্যাকরণের সৃষ্টি। কথায় বলে ঃ 'যত মুস্কিল তত আসান।' পাণিনির পূর্বে বেদ-বিরোধী এতবড় বিপদ্ বা বিদ্রোহ আর দেখা দেয় নাই, তাই ভাষারক্ষার তাগিদে পূর্বে এত বড় শব্দানুশাসনও আর রচিত হয় নাই। অষ্টাধ্যায়ীর ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার অন্য সমস্ত ব্যাকরণের অবলুপ্তিই ইহার প্রমাণ। এই ব্যাকরণের সমগ্রতার এবং ব্যাপকতার প্রশংসায় পতঞ্জলিকে বলিতে হয় ঃ 'সর্ববেদপারিষদং হীদং শাস্ত্রং তত্র নৈকঃ পন্থাঃ শক্য আস্থাতুম' (মহাভাষ্য ৬।৩।১৪)। অর্থাৎ সর্ববেদসাধারণ বলিয়া অষ্টাধ্যায়ীতে প্রাতিশাখ্যের মতো বৈদিক শাখাশ্রয়ী বিশেষ বিধি নির্দেশ করা সম্ভবপর হয় নাই। এই সুবিহিত শাস্ত্রের প্রবক্তা পাণিনি, কাত্যায়ন-পতঞ্জলির নিকট 'ভগবান্' বলিয়া প্রতিভাত।

কৃৎস্ন বা পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ বুঝাইতে বৈয়াকরণদের মধ্যে 'সম্প্রদায়-নিষ্পত্তি' বলিয়া একটা বিশেষ কথার প্রচলন আছে। ইহার তাৎপর্য, কোনো ব্যাকরণের আনুষঙ্গিক সমস্ত বিভাগে গ্রন্থাদির সংরচন। ব্যাকরণের সূত্রপাঠকে কেন্দ্র করিয়া ইহার পার্শ্বচর বিষয়গুলি এইরূপ—ধাতুপাঠ, গণপাঠ, উণাদিসূত্রপাঠ, বার্ত্তিকপাঠ, লিঙ্গানুশাসন, পরিভাষাপাঠ, এবং শিক্ষা। এককথায় ইহাদিগকে মূল ব্যাকরণের খিলপাঠ বা পরিশিষ্ট-পাঠ বলা হয়। ইহাদের কয়েকটির অবলম্বনে একটি প্রাচীন শ্লোক প্রচলিত আছে ঃ

> ধাতুসূত্রগণোণাদিবাক্যলিঙ্গানুশাসনম্।
> বর্ততে যস্য জিহ্বাগ্রে স বৈয়াকরণাগ্রণীঃ।।

একমাত্র পাণিনীয় সম্প্রদায়েই পূর্বোক্ত প্রত্যেক বিভাগে অপেক্ষাকৃত মৌলিক গ্রন্থের সমাবেশ দেখা যায়। ইহাদের ক্রমনির্দেশক 'অষ্টকং গণপাঠশ্চ...' ইত্যাদি শ্লোকটি পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

অনেকের মতে পাণিনির কঠোর ব্যাকরণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াই সংস্কৃত ভাষা ক্রমে স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। ভাষাবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এই মত ত্রুটিহীন নয়। কারণ, ব্যাকরণ কখনো কোনো গতিশীল ভাষাকে অর্থাৎ তাহার স্বাভাবিক প্রাণশক্তিকে অবরুদ্ধ করিতে বা আবদ্ধ রাখিতে পারে না, স্থলবিশেষে উহাকে কথঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে মাত্র। মনে রাখিতে হইবে, ব্যাকরণ ভাষাকে শৃঙ্খলিত করে না, সুশৃঙ্খল করে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের অর্থাৎ শিষ্টদের ভাষা হিসাবে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া স্তম্ভিত হওয়াতেই ঐ ভাষার এইরূপ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা সম্ভবপর হইয়াছিল। ভাষা যত সুস্থির, উহার ব্যাকরণ তত পরিণত। মৃত ব্যক্তির জীবনী রচনার মতো ভাষার অন্তিমদশাতেই কেবল উহার পূর্ণাঙ্গ বা সুসম্পূর্ণ ব্যাকরণ রচিত হইতে পারে। এই অবস্থায় ভাষার অস্তিত্ব উহার ব্যাকরণের উপর নির্ভর করে বলিয়া ব্যাকরণই হয় ভাষা শিক্ষার একমাত্র উপায়। ব্যাকরণ তখন ভাষাকে অনুসরণ করে না, বরং ভাষাই তখন ব্যাকরণের আনুগত্য করিতে থাকে। ইহা ঐ ভাষার মৃত্যুরই লক্ষণ, যাহার ফলশ্রুতি—পরবর্তী দুই হাজার বৎসরের সংস্কৃত শিক্ষোপযোগী ব্যাকরণরচনার ইতিহাস।

---

১ 'This grammar...is one of the greatest monuments of human intelligence. It describes, with the minutest detail, every inflection, derivation, and composition, and every syntactic usage of its author's speech. No other language, to this day, has been so perfectly described.'

—L. Bloomfield ('Language', p.11)

'...This grammar describes the entire Sanskrit language in all the details of its structure, with completeness which has never been equalled elsewhere. It is at once the shortest and fullest grammar in the world.'

—A. A. Macdonell ('A Sanskrit grammar for students', Introduction, p.XI)

'ইঙ্গিতেন চেষ্টিতেন নিমিষিতেন মহতা বা সূত্রনিবন্ধনেনাচার্যাণামভিপ্রায়ো লক্ষ্যতে'—মহাভাষ্য (৮।২।৩)।

২ অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রপাঠ মোটামুটি সুস্থির থাকিলেও মোট সূত্রসংখ্যার হিসাবে মতপার্থক্য আছে। ইহার মূলে রহিয়াছে যোগবিভাগ (এক সূত্রের একাধিক অংশে বিভাজন) এবং সূত্রপাঠে বার্ত্তিকের অনুপ্রবেশ। এই সবের সহিত ১৪টি প্রত্যাহার-সূত্র লইয়া বিভিন্ন মতে মোট সূত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯৯৩, ৩৯৯৫, ৩৯৯৬ এবং ৩৯৯৭। শ্রীনিবাসযজ্বা-রচিত 'স্বরসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা'-মতে এই সংখ্যা ৩৯৯৫—'চতুঃসহস্রীসূত্রাণাং পঞ্চসূত্রী বিবর্জিতা। অষ্টাধ্যায়ী পাণিনীয়া সূত্রৈর্মাহেশ্বরৈঃ সহ।।' ১৫।। আবার এইরূপও শুনা যায় ঃ 'ত্রীণিসূত্রসহস্রাণি তথা নবশতানি চ। ষণ্ণবতিঞ্চ সূত্রাণাং পাণিনিঃ কৃতবান্ স্বয়ম্।।' এই মতে মোট সূত্রসংখ্যা ৩৯৯৬। ভট্টোজির সিদ্ধান্তকৌমুদীধৃত সূত্রপাঠে এই সংখ্যা ৩৯৯৭। কাশিকাবৃত্তিতেও তাহাই। সেখানকার সূত্রপাঠে পরিবর্তনাদি সম্বন্ধে জার্মান পণ্ডিত কীল্‌হর্ন্ সাহেবের উক্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

> The text of the Astadhyayi as given in the Kasika differs in the case of 58 rules from the text known to Katyayana and Patanjali. Ten of these 58 rules are altogether fresh additions, nine are a result of separating (by Yoga-Vibhaga) the original 8 sutras into 17. In 19 cases new words have been inserted into the original sutras, while in the rest there are other changes in the wordings etc. of the sutras.

কেহ বলেন, নিরুক্ত, নিঘণ্টু প্রভৃতির ন্যায় অষ্টাধ্যায়ীরও লঘু এবং বৃহৎ দুই পাঠ ছিল। কাশিকাবৃত্তি বৃহৎপাঠের উপর, এবং বার্ত্তিক ও মহাভাষ্য লঘুপাঠের উপর রচিত হয়। অপর জার্মান পণ্ডিত Bohtlingk-এর মতেও মোট সূত্রসংখ্যা ৩৯৮৩ + ১৪ = ৩৯৯৭।

৩ 'অধ্যায়সংখ্যা প্রথমাৎ পাদসংখ্যা দ্বিতীয়তঃ। তৃতীয়াদঙ্কতো গ্রাহ্যা সূত্রসংখ্যেতি নির্ণয়ঃ।।'—তারানাথ তর্কবাচস্পতি

৪ '...পণোঽস্যাস্তীতি পণী, তস্যাপত্যং পাণিনঃ, পাণিনস্যাপত্যং পণিনোযুবা পাণিনিঃ'—পদমঞ্জরী (৪।২।৬৪)।

৫ 'তথা চ সূত্রাতে ভগবতা পিঙ্গলেন পাণিন্যনুজেন...'—ষড়্গুরুশিষ্য (কাত্যায়ন প্রণীত ঋক্‌সর্বানুক্রমণীর 'বেদার্থদীপিকা' বৃত্তি)।

৬ 'জ্যেষ্ঠভ্রাতৃভিবিহিতে ব্যাকরণেঽনুজস্তত্র ভগবান্ পিঙ্গলাচার্যস্তন্মতমনুভাব্য শিক্ষাং বক্তুং প্রতিজানীতে'—শিক্ষাপ্রকাশ (পাণিনীয় শিক্ষার টীকা)।

৭ বর্তমানে না পাওয়া গেলেও এই কাব্য যথার্থই পাণিনিকৃত কিনা তাহা লইয়া দেশী-বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। মহাভাষ্যে (১।৪।৫০) পাণিনিকে কবি বলা হইয়াছে। মহাভাষ্যের (৪।৩।১০১) 'বাররুচং কাব্যম্' উদাহরণ হইতে জানা যায়, বররুচি কাত্যায়নও কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দীর মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের কৃষ্ণচরিতের বর্ণনা হইতেও জানা যায়, কাত্যায়ন কেবল পাণিনীয় ব্যাকরণের বার্ত্তিকই রচনা করেন নাই, পরন্তু পাণিনির অনুকরণে কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যের নাম ছিল 'স্বর্গারোহণ'।

৮ বৌদ্ধ সাহিত্যে সংযুক্তনিকায় (৩।২১০), মজ্‌ঝিমনিকায় (Vol.II, pp.1-22), দীঘনিকায় (১।৫৩), অঙ্গুত্তরনিকায় (৩।২৬৮) প্রভৃতি স্থলে মক্‌খলীর প্রসঙ্গ আছে। পতঞ্জলি মস্করী পরিব্রাজক সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ 'মাকৃত কর্মাণি মাকৃত

কর্মাণি শান্তির্ব শ্রেয়সীত্যাহাতো মস্করী পরিব্রাজকঃ।' ইনি নিয়তিবাদী ছিলেন। ৪।৪।৬০ সূত্রে পাণিনি-উল্লিখিত 'দৈষ্টিক' (মতি)ও এই মক্খলী গোসালের প্রবর্তিত মতেরই ইঙ্গিত বহন করে। পাণিনির 'কুমারঃ শ্রমণাদিভিঃ' (২।১।৭০) সূত্রের 'শ্রমণ' শব্দও লক্ষণীয়। অবশ্য শতপথ ব্রাহ্মণেও (১৪।৭।১।২২) শ্রমণ শব্দ আছে। জৈনসাহিত্যে মক্খলী গোসালকে গোসাল (বা গোশাল) মঙ্খলিপুত্র বলা হইয়াছে। দিব্যাবদান নামক এক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে ইঁহাকে 'মস্করীগোশালিপুত্র' বলা হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে (১৭৭ অধ্যায়) পৌরুষের বিরুদ্ধবাদী এবং দৈববাদী 'মঙ্খি'র নাম আছে। অষ্টাধ্যায়ীতে বৌদ্ধ সংস্রবসূচক 'চীবর' (৩।১।২০), 'নিকায়' (৬।২।৯৪) এবং 'নির্বাণ' (৮।২।৫০) শব্দের উল্লেখও দেখা যায়।

৯ মতান্তরে বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পাটলিপুত্র নগরের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার প্রপৌত্র উদায়ী রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

১০ 'The fall of Taxila into the hands of the Persians seems to have dealt a death blow to the Vedic Sutra-activities, and the transference of the intellectual capital of India from Taxila to Pataliputra gave an impetus to the Sutra-activity of another sort....Taxila lost its high position as the centre of learning, compelling eminent scholars like Panini, Varsa and Upavarsa to seek the eastern region as a field of work.'—H. P. Sastri ('Magadhan Literature', Cal. 1923)

১১ এলাহাবাদ-এর ৩০ মাইল পশ্চিমে, যমুনার দক্ষিণতীরে বর্তমান 'কোসম' (Kosam) প্রাচীন কৌশাম্বী বলিয়া অনুমিত।

১২ ইউয়েনসাং-এর Siyuki গ্রন্থে (pp. 114-15) বর্ণিত ঘটনার 'ঈশ্বরদেব' এখানে (মহেশ্বর) শিবের সহিত তুলনীয়।

১৩ 'প্রমাণভূত আচার্যো দর্ভপবিত্রপাণিঃ শুচাববকাশে প্রাঙ্‌মুখ উপবিশ্য মহতা প্রযত্নেন সূত্রাণি প্রণয়তিস্ম।'—মহাভাষ্য (১।১।১) ; কাশিকাবিবরণপঞ্জিকাতে (১।১।১) ঃ 'সমাধিগতজ্ঞানাতিশয়ো হ্যাচার্যঃ পরহিতপ্রতিপন্নঃ সমাহিতচেতাঃ শিষ্যাণাং কৃতরক্ষা-সংবিধানো মঙ্গলপূর্বকং মহতা প্রযত্নেন সূত্রাণি প্রণীতবান্।'

১৪ 'তেন প্রণষ্টমৈন্দ্রং তদস্মদ্ ব্যাকরণং ভুবি। জিতাঃ পাণিনিনা সর্বে মূর্খীভূতাবয়ং পুনঃ।।'—কথাসরিৎসাগর (৪।২৫)।

১৫ 'ভবান্‌জানন্ ভগবৎপ্রসাদবিবর্তভূতান্যপি বার্ত্তিকানি। মহ্যংযতঃ
শাপমদান্ মদেন ততো বিশীর্যেত তবাপি মূর্ধা।।'—পতঞ্জলিচরিত (১।৫৯)

১৬ পঞ্চতন্ত্রের মিত্রসংপ্রাপ্তি নামক দ্বিতীয় তন্ত্রে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ

> সিংহো ব্যাকরণস্য কর্তুরহরৎ প্রাণান্ প্রিয়ান্ পাণিনে-
> র্মীমাংসাকৃতমুন্মমাথ সহসা হস্তী মুনিং জৈমিনিম্।
> ছন্দোজ্ঞাননিধিং জঘান মকরো বেলাতটে পিঙ্গলং
> হ্যজ্ঞানাবৃতচেতসামতিরুষাং কোঽর্থস্তিরশ্চাংগুণৈঃ।। ২।২৮

অর্থাৎ সিংহ ব্যাকরণকর্তা পাণিনির প্রিয় প্রাণ হরণ করিয়াছিল, হস্তী সহসা মীমাংসাকৃৎ মুনি জৈমিনিকে হত্যা (শুঁড়ের দ্বারা উপরে তুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া

পদতলে মর্দন) করিয়াছিল, মকর সমুদ্রকূলে ছন্দোজ্ঞানী পিঙ্গলকে নিহত করিয়াছিল, (কাজেই) অজ্ঞানাবৃতচিত্ত অতি ক্রুদ্ধ পশুদের নিকট গুণাবলীর মূল্য কি?

১৭ ব্যাঘ্রভূতির নামে কতকগুলি শ্লোকবার্তিক বা কারিকা পাওয়া যায়। কাশিকাবৃত্তিতে (৭।২।১০) উদ্ধৃত অনিট্‌কারিকাসমূহ ব্যাঘ্রভূতির রচনা বলা হইয়াছে। মহাভাষ্যে (২।৪।৩৬, ৩।৩।১, ৭।১।৯৪...) ব্যাঘ্রভূতির শ্লোকবার্তিক উদ্ধৃত আছে।

১৮ অভিধান চিন্তামণির (৩।৫১৬) টীকা।

১৯ কাব্যমীমাংসায় রাজশেখর : 'তত্র দয়িতসুব্‌বৃত্তয়ো বিদর্ভাঃ। বহুলসমাসবৃত্তয়ো গৌড়াঃ। প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ। কৃৎপ্রয়োগরুচয় উদীচ্যাঃ। অভীষ্টতিঙ্‌বৃত্তয়ঃ সর্বেঽপিসন্তঃ।'

২০ কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে অগ্নিমিত্রের পিতা এবং বসুমিত্রের পিতামহ পুষ্পমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বর্ণিত আছে। বসুমিত্রের পর্যবেক্ষণাধীন ঐ যজ্ঞাশ্ব সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরে যবনগণকর্তৃক ধৃত হয়। ৩।২।১১১ সূত্রের মহাভাষ্যে পতঞ্জলি সাকেত (অযোধ্যা) আক্রমণকারী যবনদের কথা বলিয়াছেন।

২১ এই নাম দুইটি পতঞ্জলি-নির্দেশক কিনা সেই বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে, যদিও নাগেশের মতে দুইটিতেই পতঞ্জলিকে বুঝায় (উদ্দ্যোত ১।৪।৫১, ১।২।১০১)। কৈয়ট, হেমচন্দ্র এবং ভট্টোজিও এই রূপই বলিয়াছেন। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে গোনর্দীয় ও গোণিকাপুত্র নামে অন্য দুই পৃথক্ ও প্রামাণিক আচার্য উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। মহাভাষ্যেও ইঁহাদের নাম আছে।

২২ 'কায়বাগ্‌বুদ্ধিবিষয়া যে মলাঃ সমবস্থিতাঃ। চিকিৎসালক্ষণাধ্যাত্মশাস্ত্রৈস্তেষাং বিশুদ্ধয়ঃ।।'—বাক্যপদীয় (১।১৪৮)। স্বপ্নবাসবদত্তার টীকায় শিবরাম : 'যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন। যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি।।'

২৩ সাংখ্যকারিকার যুক্তিদীপিকা টীকায় এবং স্কন্দস্বামীর নিরুক্ত (৩।১৩) ব্যাখ্যায় চূর্ণিকারের নামে মহাভাষ্যের (১।৪।২১ ও ১।১।৫৭) বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ইন্দুরাজ উদ্‌ভটালঙ্কারের টীকায় চূর্ণী নামেই মহাভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

২৪ 'ব্যাখ্যাতৃত্বেঽপ্যসোষ্ট্যাদিকথনেনান্যাখ্যাতৃত্বাদিতর ভাষ্যবৈলক্ষণ্যেন মহত্ত্বম্'—উদ্দ্যোত। বাক্যপদীয়ের (২।৪৮৫) টীকাকার পুণ্যরাজের মতে : 'সর্বন্যায়বীজহেতুত্বাদেব মহচ্ছব্দেন বিশিষ্য মহাভাষ্যমিত্যুচ্যতে।'

২৫ এইসব সিদ্ধান্ত সূক্ষ্মবিচার-সাপেক্ষ বলিয়া সর্বথা অপরিবর্তনীয় নয়। এইসব ক্ষেত্রে মতান্তরের সম্ভাবনা খুব বেশি। আশ্চর্যের বিষয়, পতঞ্জলিই আবার পাণিনির সূত্রাবলীকে 'ছন্দোবৎ' বলিয়া ইহাদের একটি বর্ণও যে অনর্থক নয় এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

২৬ '...the Mahabhasya...written not so much to explain Panini as to defend such of his Aphorisms as had been criticized by Katyayana.'—M. M. Williams ('Indian Wisdom', 2nd edn., p. 177).

২৭ কাশিকাবৃত্তির প্রারম্ভিক শ্লোকের অন্তর্গত 'ভাষ্যে' পদের ব্যাখ্যায় জিনেন্দ্রবুদ্ধি ইহাকে স্পষ্টতঃই কাত্যায়নপ্রণীত বাক্যসমূহের পতঞ্জলিপ্রণীত বিবরণ বলিয়াছেন : 'ভাষ্যং কাত্যায়নপ্রণীতানাং বাক্যানাং বিবরণং পতঞ্জলিপ্রণীতম্।' বাক্যপদীয়ের (২।৪৮৪) ব্যাখ্যায় পুণ্যরাজও বলিয়াছেন : 'বার্ত্তিকব্যাখ্যানপুরঃসরং মহাভাষ্যনিবন্ধনম্ ।'

২৮ ভর্তৃহরির 'তদর্হমিতিনারব্ধং সূত্রং ব্যাকরণান্তরে' ইত্যাদির ব্যাখ্যায় হেলারাজ : '...আপিশলীয়ে কাশকৃৎস্নীয়ে চ।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতেও কাশকৃৎস্নিই বৈয়াকরণ—তিনি কাশকৃৎস্নের পুত্র ('Magadhan Literature')। মোট কথা (ব্যাকরণ) গ্রন্থ নির্দেশক আপিশল ও আপিশলীয় এবং কাশকৃৎস্ন ও কাশকৃৎস্নীয় পদগুলি সবই গ্রহণীয়।

২৯ 'ষড়্ভাববিকারা ভবন্তীতি বার্ষ্যায়ণিঃ। জায়তেঽস্তি বিপরিণমতে বর্ধতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি।'—নিরুক্ত ১।২।। 'জন্মাস্তিত্বং পরিণামোবৃদ্ধির্হানং বিনাশনম্'—বৃহদ্দেবতা ২।১২১।। মহাভাষ্যে (১।৩।১) নিরুক্ত হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩০ এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ রচিত 'আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ' গ্রন্থ (২য় সংস্করণ, পৃঃ ৫৫-৬) দ্রষ্টব্য।

৩১ কাশ্মীররাজ অভিমন্যুর সময় চন্দ্রাচার্য-কর্তৃক কাশ্মীরে মহাভাষ্যের যে প্রচলন হয়, পরবর্তীকালে তাহা ব্যাহত ('বিচ্ছিন্ন') হওয়ায় কাশ্মীররাজ জয়াপীড় (৭৫৫-৮৬)। ভারতের নানাস্থান হইতে পণ্ডিতদিগকে আনিয়া সেখানে মহাভাষ্যের পঠনপাঠনের পুনঃপ্রবর্তন করান (—রাজতরঙ্গিণী ১।১৭৬, ৪। ৪৮৮)। এই কার্যে তাঁহার সহায়ক ছিলেন যে ক্ষীর নামক শাব্দিক তিনি অবশ্য ক্ষীরস্বামীর পূর্ববর্তী।

৩২ 'Detailed Report of a Tour in Search of Sanskrit Manuscripts, made in Kasmir, Rajputana, and Central India' by Dr. G. Buehler, 1877.

৩৩ 'এতেন সংগ্রহানুসারেণ ভগবতা পতঞ্জলিনা সংগ্রহসংক্ষেপভূতমেব প্রায়শো ভাষ্যমুপনিবদ্ধমিত্যুক্তং বেদিতব্যম্'—বাক্যপদীয়ের (২।৪৮৭) পুণ্যরাজকৃত টীকা।

৩৪ ইঁহার ব্যাকরণ (বৈয়াঘ্রপদীয়) দশ অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল (কাশিকা : 'দশকা বৈয়াঘ্রপদীয়াঃ' ৪।২।৬৫ এবং 'দশকং বৈয়াঘ্রপদীয়ম্' ৫।১।৫৮)। পাণিনির ৪।১। ১০৫ সূত্রানুসারে ব্যাঘ্রপাৎ শব্দের উত্তর যঞ্ প্রত্যয়যোগে বৈয়াঘ্রপদ্য শব্দের উৎপত্তি হয়। কাশিকার (৭।১।৯৪) টীকা পদমঞ্জরীতে : 'ব্যাঘ্রপাদপত্যানাং মধ্যে বরিষ্ঠো বৈয়াঘ্রপদ্য আচার্যঃ।' ১।১।৫৭ সূত্রের ভাষ্যে বৈয়াঘ্রপদ্য শব্দ দৃষ্ট হয়। বৈদিক ব্রাহ্মণসাহিত্যে (শতপথব্রাহ্মণ ১০।৬।১।৭-৮, জৈমিনীয় উপনিষদ্-ব্রাহ্মণে ৩।৭।৩।২, ৪।৯।১।১, শাঙ্খায়ন আরণ্যকে ৯।৭) 'বৈয়াঘ্রপদ্য' নাম পাওয়া যায়। কাশিকাতে (৮।২।১) উদ্ধৃত 'শুষ্কিকা শুষ্কজঙ্ঘা চ...' কারিকাটি, ভট্টোজি দীক্ষিতের মতে (শব্দকৌস্তুভ ১।১।৫৯), বৈয়াঘ্রপদ্য-বার্ত্তিক।

৩৫ সিদ্ধ, সিদ্ধি, বৃদ্ধি প্রভৃতি শব্দ মঙ্গলসূচক। শাস্ত্ররচনার সময় তাহার আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে এইসব শব্দপ্রয়োগ করিয়া মঙ্গলাচরণের প্রথা আছে। অষ্টাধ্যায়ীর

প্রথম সূত্র 'বৃদ্ধিরাদৈচ্'-এর বৃদ্ধিশব্দ মঙ্গলার্থেও প্রযুক্ত। শিব (৪।৪।১৪৩) এবং উদয় (৮।৪।৬৭) শব্দপ্রয়োগের দ্বারা অষ্টাধ্যায়ীর মধ্যে এবং অন্তে মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে পাণিনির বৃদ্ধিশব্দপ্রিয়তা এবং ঐন্দ্র ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ে 'সিদ্ধি' শব্দপ্রিয়তা লক্ষণীয়। পাণিনি তাঁহার সূত্রপাঠে ১০বার 'বৃদ্ধি' এবং ৫ বার 'সিদ্ধ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সিদ্ধিশব্দ একবারও নয়। কাত্যায়ন-বার্ত্তিকে ৫৪ বার বৃদ্ধিশব্দ এবং ৩৬৩ বার সিদ্ধশব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। একমতে ঐন্দ্র ব্যাকরণের প্রথম সূত্র ছিল 'সিদ্ধিরনুক্তানাং রূঢ়েঃ'। কাতন্ত্র-ব্যাকরণের আদিতে এবং অন্তে যথাক্রমে 'সিদ্ধ' এবং 'বৃদ্ধি' শব্দ প্রযুক্ত।

৩৬ মহাভাষ্যের (১।১।৭৩) 'ওদনপাণিনীয়াঃ' উদাহরণ হইতে প্রতীয়মান হয়, আহারের লোভে অনেক ছাত্র পাণিনির টোলে আসিয়া ভর্তি হইত। সেইরূপ 'ঘৃতরৌঢ়ীয়াঃ' (মহাভাষ্য ১।১।৭৩) এবং 'কম্বলচারায়ণীয়াঃ' (কাশিকা ৬।২।৬৯) উদাহরণ সূচিত করে যে রৌঢ়ি এবং চারায়ণ আচার্য নিজ নিজ ছাত্রদিগকে যথাক্রমে ঘৃত এবং কম্বল দান করিতেন। কাশিকাতেঃ 'ঘৃতপ্রধানঃ রৌঢ়িঃ ঘৃতরৌঢ়িঃ। তস্যছাত্রা ঘৃতরৌঢ়ীয়াঃ'—(১।১।৭৩)। কাশিকার (৬।২।৩৬) 'আপিশলপাণিনীয়াঃ। পাণিনীয়রৌঢ়ীয়াঃ। রৌঢ়ীয়কাশকৃৎস্নাঃ' ইত্যাদি বর্ণনা হইতে সাহচর্যবশতঃ রৌঢ়িকেও বৈয়াকরণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কৈয়টের মতে (ভাব্যপ্রদীপ ৪।১।৭৯) পাণিনির 'ক্রৌড্যাদিভ্যশ্চ' (৪।১।৮০) সূত্রের স্থানে পূর্বাচার্যসম্মত পাঠ ছিল 'রৌঢ্যাদিভ্যশ্চ'। পাঃ ৪।১।৯৯ সূত্রানুসারে 'চর' শব্দের উত্তর ফক্ প্রত্যয় করিয়া চারায়ণ শব্দ পাওয়া যায়। ইনি কৃষ্ণযজুর্বেদের চারায়ণীয় শাখার প্রবর্তক। চারায়ণীয় শিক্ষা এবং চারায়ণীয় প্রাতিশাখ্যও আছে। লাহোর দয়ানন্দ বৈদিক কলেজ হইতে 'চারায়ণীয় মন্ত্রার্ষাধ্যায়' প্রকাশিত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (৫।৫) এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (১।১।১২, ১।৪।১৪, ১।৫।২২) চারায়ণের মত উদ্ধৃত। লৌগাক্ষি-গৃহ্যসূত্রের (৫।১) টীকায় দেবপাল এক চারায়ণি-সূত্র উদ্ধার করিয়া তাহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

৩৭ 'দক্ষস্যাপত্যং দাক্ষিঃ' (কাশিকা ৪।১।৯৫)। 'দাক্ষিঃ পিতা। দাক্ষায়ণঃ পুত্রঃ' (ঐ ২।৪।৬০)।

৩৮ 'The Sutra of that grammarian contains hundreds of rules dealing with Vedic forms ; but these are of the nature of exceptions to the main body of his rules, which are meant to describe the Sanskrit language.'
—Macdonell ('A History of Sans. Literature', 1900)

৩৯ 'Sanskrit was certainly not a popular language, but the language spoken in wide circles of educated people, and understood in still wider circles.' —Winternitz ('A History of Indian Literature')

৪০ বৌধায়ন-ধর্মসূত্রে (১।১।২।১০ বা ১।১।২০৫), বশিষ্ঠধর্মসূত্রে (১।৪-৯) এবং আপস্তম্বধর্মসূত্রে (১।৪।১২।৮,২।১১।২৯।১৪) অনুরূপ বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

৪১ '...the grammarian (Panini) lays down rules for the Bhasa of the middle land, and notes deviations among the people of the north and the east respectively'—A. B. Keith ('Panini and the Veda', Indian

Culture, Vol.2, No.4, April—1936). মনুসংহিতায় (২।২১) মধ্যদেশের চতুঃসীমা—'হিমবদ্‌ বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্‌ বিনশনাদপি। প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ।।'—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত, পশ্চিমে বিনশন এবং পূর্বে প্রয়াগ—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী স্থানই মধ্যদেশ। কামসূত্রে (২।৫।২১): 'মধ্যদেশ্যা আর্যপ্রায়াঃ শুচ্যুপচারাঃ।' কাব্যমীমাংসায় রাজশেখর : 'যো মধ্যে মধ্যদেশং নিবসতি স কবিঃ সর্বভাষানিষণ্ণঃ।।'—(উদ্ধৃতি)।

৪২ পাণিনি ২।৩।৬০, ৪।২।৬৬, ৪।৩।১০৫, ৫।১।৬২ সূত্রে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের উল্লেখ করিলেও অরণ্যবাসী বুঝাইতে আরণ্যক শব্দ এবং নিকটে বসা অর্থে উপনিষদ্‌ শব্দ (১।৪।৭৯)-ব্যবহার দেখাইয়াছেন, সাহিত্য বুঝাইতে নয়। তখনও এই দুই শব্দ ঐ জাতীয় গ্রন্থ বা সাহিত্য বুঝাইতে ব্যাপকতা লাভ করে নাই।

কাতন্ত্র-কথা

(কলাপ ব্যাকরণ—খ্রীঃ ১ম/২য় শতক)

বর্তমানে প্রচলিত সংস্কৃত ব্যাকরণগুলির মধ্যে গুণগরিমায় পাণিনির গ্রন্থ অতুলনীয় হইলেও লৌকিক প্রয়োজনে কাতন্ত্রের অবদান সর্বাধিক। ইহার কারণ, এই ব্যাকরণের অবাধ সরলতা এবং সাধারণ কার্যোপযোগিতা। মূল গ্রন্থের আয়তনও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। প্রাচীনতা অথচ বৈদিক সংস্রবের অভাব, ইহার আকর্ষণ বৃদ্ধির অন্য হেতু। ইহার উৎপত্তি এবং গতি-প্রকৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সেই সুদূর অতীতকাল হইতে ভারতীয় ব্যাকরণ-বিদ্যার যে অকৃত্রিম ও সহজশিক্ষোপযোগী গণমুখী ধারা প্রবাহিত ছিল, তাহারই শেষ প্রতিনিধি এই কাতন্ত্র-ব্যাকরণ। স্বাভাবিক সারল্যের সুযোগে নানা সংযোজন এবং প্রক্ষেপণাদির দ্বারা কালে কালে বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার কাঠামোতে এমন বিচিত্র পরিবর্তন ঘটানো হইয়াছে যে, ফলে ইহার মৌলিক রূপটি যে কি ছিল, অথবা কোন্‌টি ইহার অপেক্ষাকৃত স্বল্প-মিশ্র রূপ, তাহা এখন নিশ্চয় করিয়া বলা অসাধ্য। সূত্রসমূহের বিন্যাসক্রমেও পার্থক্য দেখা যায়। তা'ছাড়া বঙ্গদেশে, দক্ষিণভারতে, কাশ্মীরে এবং তিব্বতে প্রচারিত এই ব্যাকরণের সূত্রসংখ্যাও একরূপ নয়। এই সব কারণে, ক্রমে এই ব্যাকরণের দুইটি শাখা-সম্প্রদায় স্থানভেদে বিলক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে—একটি কাশ্মীরের বাররুচ সম্প্রদায় এবং অপরটি বঙ্গীয় দৌর্গ সম্প্রদায়। সূত্রাংশের এই আঞ্চলিক বৈসাদৃশ্য এবং তদাশ্রয়ী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়—অন্য কোনও ব্যাকরণের ক্ষেত্রে ঘটিতে দেখা যায় নাই।

কাতন্ত্রের এই পরিণাম চিন্তা করিয়া ইহার মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে বুঝা যায়, ইহার রহস্যময় কর্তৃত্বও এই ব্যাপারে কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। সুদৃঢ় এক-কর্তৃত্বের অভাব এই ব্যাকরণের চরম দুর্বল স্থল। কুমার কার্ত্তিকেয়, ঋষি কলাপী, বররুচি কাত্যায়ন এবং আচার্য শর্ববর্মা ইহার গ্রন্থনার সহিত জড়িত থাকায় বা তাহার অংশভাক্ হওয়ায় এবং সর্বোপরি তাহাতে দেবত্ব আরোপিত হওয়ায়, ইহার উৎপত্তি-প্রসঙ্গটি

দুর্ভেদ্য রহস্যজালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন কর্তৃত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার বিভিন্ন নামও প্রচলিত হইয়া গিয়াছে—কাতন্ত্র, কলাপ, কালাপ (বা কালাপক) এবং কৌমার (বা কুমার) ব্যাকরণ। এমতাবস্থায় ইহার সৃষ্টিনির্ণয়ে যথাসম্ভব যুক্তিযুক্ত অনুমানেরও কতক আশ্রয় না লইয়া উপায় নাই।

সাম্প্রতিক রূপ-বৈলক্ষণ্যের কথা ছাড়িয়া দিলে, এই ব্যাকরণধারার সূচনাকাল যে অতি প্রাচীন, এমন কি পাণিনিরও পূর্ববর্তী, তাহার সুদৃঢ় প্রমাণ রহিয়াছে। ইহার সহিত ষড়ানন কার্ত্তিকের বা কুমারের সংস্রব-প্রচারের উৎস—খ্রীঃ ১ম শতকে রচিত গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' নামক গ্রন্থ। তাহার আগে এই সম্পর্কে আর কোনও দৈব ঘটনার কথা শুনা যায় না। অবশ্য, সেই আগেকার এই ব্যাকরণধারার রূপ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞানের কোনও সম্ভাবনা এখন আর নাই বলিলেই চলে। তবে সেই ধারার একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-রূপই যে ক্রমান্বয়ে নানা স্তরে প্রয়োজনীয় উপাদান আহরণ করিতে করিতে বর্তমান বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে তাহার সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব নাই।

বাক্যের ক্ষুদ্রতম উপাদান যে বর্ণ, তাহা হইতে শুরু করিয়া ক্রমে অক্ষর (syllable), শব্দ, পদ (= বিভক্তিযুক্ত শব্দ) ইত্যাদির সমবায়ে বাক্যে পৌঁছিবার যে সংশ্লেষণাত্মক (synthetic) গঠনপদ্ধতি বা প্রক্রিয়া, তাহাই এই ব্যাকরণধারার চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। ইহা পাণিনীয় বিশ্লেষণী (analytic) রীতির বিপরীত। 'ব্যাকরণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই বিশ্লেষণ (analysis)—ব্যাকৃতি বা ব্যাকার (= বি-আ-কৃ + ...) ঘটানো। শব্দের মূলীভূত প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশপূর্বক উহার সাধুত্ব নির্ণয় করাতেই এই পদ্ধতির চরম ও পরম সার্থকতা। ইহার মহৎ উদ্দেশ্য, অসাধু শব্দের ছোঁয়াচ হইতে সাধু শব্দকে বাঁচানো। অকুলীনের পংক্তি হইতে কুলীনকে তুলিয়া আনা। এই শব্দকৌলীন্যের নিয়ামক বলিয়াই ব্যাকরণের অপর অন্বর্থ নাম 'শব্দানুশাসন।' ব্যাকরণ[১] বা শব্দানুশাসন[২] সার্থকনামা শাস্ত্র, অর্থাৎ ইহার কার্যানুরূপ নাম। বলা বাহুল্য, 'শাস্ত্র' শব্দটিও এইরূপ অন্বর্থনামা—যাহার দ্বারা শাসন করা হয় এই অর্থে। ঐ নামের সার্থকতা বা কার্যকারিতা পাণিনি-তন্ত্রে যেমন, কাতন্ত্রে তেমন নয়। শাসিত বা শাসন-শুদ্ধ শব্দ লইয়া কাতন্ত্রের কারবার।

শব্দের প্রাথমিক তথা প্রত্যক্ষ উপাদান যে বর্ণমালা তাহাতেই কাতন্ত্রের সূচনা। বর্ণ-শিক্ষার 'বাল্যশিক্ষা' জাতীয় কোনও পুস্তকের আধারে বর্ণসমাম্নায়ের বৈশিষ্ট্যসূচক ছন্দোবদ্ধ অতি সরল সূত্ররচনার দ্বারা কাতন্ত্রের গোড়াপত্তন। পরে বৈদিক প্রাতিশাখ্য[৩] বা অন্য কোনও প্রাচীন ব্যাকরণের আদর্শে শব্দবিদ্যার জটিল বিষয়গুলির অনুপ্রবেশ। গ্রন্থবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ইহার প্রারম্ভিক বর্ণভাগকে আক্ষরিক দিক্ দিয়া (অর্থাৎ 'কা কি কী কু কৃ ...' ইত্যাদি হইতে) ভারমুক্ত করিয়া লওয়া হয়। বর্ণ-পরিচয়ের এই ধরণের প্রাথমিক পুস্তক-পুস্তিকা সুপ্রাচীন কাল হইতেই আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে, যেমন 'আদর্শ-লিপি' পুস্তিকা।

ইউয়েন সাং (যুআন চোআঙ্) এবং ই্‌ৎসিং (উভয়েই খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীয় চীনা পরিব্রাজক) ভারতে আসিয়া এই বর্ণমালার পরিচয় লাভের পর যে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়। ইউয়েন সাং বর্ণমালার প্রারম্ভিক গ্রন্থকে বলিয়াছেন 'সিদ্ধবস্তু', ই্‌ৎসিং বলিয়াছেন 'সিদ্ধিরস্তু'। ইহাকে 'সিদ্ধমাতৃকা' বা 'মাতৃকা-বিবেক'ও বলা হইত। 'সিদ্ধমাতৃকা' একদা কাশ্মীর, বারাণসী এবং কনৌজ অঞ্চলের বর্ণমালা বলিয়া পরিচিত ছিল (দ্রঃ Sachau—'Alberuni's India', Vol.I, p.173)। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার বলেন, শিশুপাঠ্য এই পুস্তকের নাম ছিল প্রাথমিক 'সিদ্ধান্ত' এবং ইহার আরম্ভ হইত 'সিদ্ধিরস্তু' দিয়া। এই প্রসঙ্গে হিতোপদেশীয় প্রথম গ্রন্থ 'মিত্রলাভে'র 'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু' ইত্যাদি সূচনা-শ্লোকটি মনে পড়ে। অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত সরহপাদের (খ্রীঃ ১১শ/১২শ শতক) দোহাতে আছে—'সিদ্ধিরত্থু মই পঢ়মে পঢ়ি অউ' অর্থাৎ সিদ্ধিরস্তু আমি প্রথমে পড়িয়াছিলাম। চীনে সংস্কৃত বর্ণমালাকে বলে 'সিদ্ধম্ চঙ্গ্' (Siddham Chang)। কাহারও মতে ই্‌ৎসিং 'সিদ্ধ'গ্রন্থ্ বা 'সিদ্ধ চঙ্গ্' দ্বারা কাতন্ত্র-ব্যাকরণকেই বুঝাইয়াছেন। 'সিদ্ধান্ত' বা 'সিদ্ধিরস্তু'র অনুসরণে ৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে 'সিদ্ধকোষ' এবং 'সিদ্ধপিটক' গ্রন্থ রচিত হয়। সে যাহাই হউক, বর্ণমালা-পুস্তকের প্রারম্ভিক সিদ্ধ বা সিদ্ধি শব্দের সহিত কাতন্ত্র-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র 'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ'র সিদ্ধশব্দের প্রয়োগ-সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বর্তমান সময়েও মাড়োয়ারী পাঠশালায় যে 'সীধীপাঠী' বা 'সিঁধীপাটী' পড়ানো হয়, তাহা কাতন্ত্রেরই প্রারম্ভিক ভাগের বিকৃত রূপ। মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে এই সূত্রগুলিকে বলা হয় 'সিধা'

বা 'সীধা'। ইহাকে একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া লওয়ারই রীতি। ইহার আবৃত্তি সহযোগেই শিশুদের শিক্ষারম্ভ। সূত্রগুলির উচ্চারণ-ঘটিত দেশীরূপ দাঁড়াইয়াছে এইরকম—'সিদ্ধোবর্ণসমাম্নায়ঃ'—'সীধোয়রণা সমামুনায়া', 'তত্র চতুর্দশাদৌ স্বরাঃ'—'চত্রে চত্রে দীসাদৌ সণ্বেরা' অথবা 'চক্রু চক্রু দাসাঃ দউ সবারাঃ' ইত্যাদি।

খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীয় মালবরাজ ভোজদেবের অব্যবহিত পরবর্তী উত্তরাধিকারী উদয়াদিত্য ও নরবর্মার নামে যে শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অঙ্কিত 'সর্পবন্ধ' বা 'বর্ণনাগকৃপাণিকা'তে ব্যাকরণের বর্ণমালা ও ধাতুসমূহের যে বর্ণনা আছে, তাহা সর্বতোভাবে কাতন্ত্রসম্মত। এই সবই লৌকিক ক্ষেত্রে এই ব্যাকরণের দূরপ্রসারী প্রভাবের দৃষ্টান্ত। এই উপলক্ষ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> সাধারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের জন্য ছোট ছোট ব্যাকরণ ছিল এবং সে ব্যাকরণ সিদ্ধ উদাহরণ দিয়া শেখান হইত ; সূত্রের সঙ্গে তাহাদের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। কৌমার ব্যাকরণ এইরূপ উদাহরণ দিয়া শিখান হইত। সর্ববর্মা সেই উদাহরণগুলি লইয়া, কতকগুলি সূত্র করিয়া কাতন্ত্র ব্যাকরণ ছয়মাসের মধ্যে সাতবাহন রাজাকে শিখাইবার জন্য প্রস্তুত করেন। তাহাতে সাধারণ লোকের কার্য্য চলিত। ক্ষত্রিয়গণ, ব্যবসাদারেরা ও অন্য অন্য ভদ্র লোকের কাজ এইরূপ ব্যাকরণ দিয়াই চলিত। গরুড় পুরাণে ব্যাকরণের উপর যে দুইটি অধ্যায় আছে তাহা দেখিলে এই কথাটি বেশ বুঝা যায়। বৌদ্ধেরা প্রথম যখন খাঁটি সংস্কৃতে বই লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন এইরূপ ব্যাকরণ দিয়াই কাজ চালাইতেন।[৪]

কেবল গরুড়পুরাণেই (পূর্বখণ্ড, ২০৯–১০ অধ্যায়) নয়, অগ্নিপুরাণেও ১১টি অধ্যায়ে (৩৪৯–৫৯) বর্ণিত ব্যাকরণের উদাহরণ-মূলকতা এবং উহার বিষয়গুলির 'সন্ধিসিদ্ধরূপ', 'সুব্‌বিভক্তিসিদ্ধরূপ', 'স্ত্রীলিঙ্গসিদ্ধরূপ' ইত্যাদি সিদ্ধরূপান্ত নামকরণ লক্ষণীয়।

বাল্যশিক্ষার উপযোগী, বর্ণাশ্রয়ী এবং আংশিক ব্যাকরণ-পর্যায়ে উন্নীত, প্রচলিত কোনও পুস্তকের আধারে, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অপর কোনও প্রাচীন ব্যাকরণের উপাদান সংযোজনার দ্বারা শর্ববর্মা ('সর্ববর্মা' বানানও দৃষ্ট হয়) কাতন্ত্র-ব্যাকরণ রচনা করেন। এই কার্য করিতে গিয়া

তিনি যে রচনার সরলতা এবং সাধারণ কার্যোপযোগিতার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কাশ্মীরী পণ্ডিত শশিদেব তাঁহার 'ব্যাখ্যানপ্রক্রিয়া' গ্রন্থে কাতন্ত্ররচনার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয় ঃ

ছান্দসাঃ স্বল্পমতয়ঃ শাস্ত্রান্তরে রতাশ্চ যে।
ঈশ্বরা ব্যাধিনিরতাস্তথালস্যযুতাশ্চ যে।।
বণিক্ শস্যাদিসংসক্তা লোকযাত্রাদিষুস্থিতাঃ।
তেষাং ক্ষিপ্রপ্রবোধার্থং কাতন্ত্রং রচিতং পুরা।।

অর্থাৎ ছন্দোব্যবসায়ী (পদ্যাদিরচনাকারী), অল্পবুদ্ধি, অন্যশাস্ত্রাবলম্বী, রাজা বা জমিদার, ব্যাধিগ্রস্ত, অলস, কৃষিবাণিজ্যসংশ্লিষ্ট এবং কার্যব্যপদেশে বিভিন্নলোকের সংস্পর্শে আসিতে হয় এমন ব্যক্তিদের শীঘ্র সংস্কৃত শিক্ষার জন্য পুরাকালে কাতন্ত্র-ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। 'কাতন্ত্র' নামটিও এক দিক্ দিয়া উক্ত বৈশিষ্ট্যের সূচক। সাধারণভাবে সীমিত শিক্ষার প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ অল্পসূত্রাত্মক বলিয়া এই নাম। 'ঈষৎ তন্ত্রং কাতন্ত্রম্'। 'তন্ত্র' অর্থে সূত্র। তন্ত্র শব্দের পূর্বে স্বল্পার্থবাচক ঈষৎ শব্দের স্থানে, এই ব্যাকরণের ২।৫।২৫ সংখ্যক সূত্রানুসারে 'কু'র বদলে 'কা' আদেশ হওয়ায় 'কুতন্ত্র' না হইয়া 'কাতন্ত্র' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। কাজেই 'কাতন্ত্র' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—অল্পসূত্র।

'কাতন্ত্র' শব্দ লইয়া এই ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ে প্রচুর আলোচনা হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, 'কাতন্ত্র' নামে (বৈদ্যক শাস্ত্রীয়?) আর এক গ্রন্থও ছিল—যাহার রচয়িতার নাম জয়দেব। ইনি গীতগোবিন্দের প্রণেতা জয়দেব অপেক্ষা প্রাচীন। 'কাতন্ত্রপরিশিষ্টে'র টীকাকার গোপীনাথ তর্কাচার্যের উক্তি[৫] হইতে প্রমাণিত হয়, ইনি খ্রীঃ ৪র্থ/৫ম শতাব্দীয় চন্দ্রগোমীরও পূর্ববর্তী। চন্দ্রগোমী ঈষৎতন্ত্রঘটিত কাতন্ত্র শব্দকে ব্যাকরণার্থে রূঢ় বলিয়াছেন এবং ইহাদ্বারা যে জয়দেবাদির কাতন্ত্র বুঝায় না তাহাও বলিয়াছেন। 'ব্যাখ্যাসারে' হরিরামও প্রায় এই রূপই বলিয়াছেন।[৬] তাঁহার মতে পাণিনির ব্যাকরণের তুলনায় এই ব্যাকরণের সূত্রসংখ্যা অল্প বলিয়া ইহাকে কাতন্ত্র-ব্যাকরণ বলা হইয়া থাকে। শূদ্রক রচিত 'পদ্মপ্রাভৃতকভাণে' (৪।১) 'কাতন্ত্রিক' পদের বিদ্রূপাত্মক উল্লেখ পাওয়া যায়।

শর্ববর্মা তাঁহার ব্যাকরণের কি নাম দিয়াছিলেন বা আদৌ কোনও নাম দিয়াছিলেন কিনা জানা না গেলেও, খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীতে ইহা যে কাতন্ত্র নামে অভিহিত হইত, তাহার প্রমাণ পূর্বোক্ত গোপীনাথের উদ্ধৃতি। চন্দ্রগোমীর পূর্বে (?) বররুচিও তাঁহার 'চৈত্রকূটী' বৃত্তিতে কাতন্ত্রের নাম করিয়াছেন ঃ 'কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং সার্ববর্মিকম্।' বররুচির এই উক্তি বৃত্তিকার দুর্গসিংহও স্বীয় বৃত্তির প্রারম্ভে উপন্যস্ত করিয়াছেন। এদিকে আখ্যাতের 'ভবতেরঃ' (১০৩) সূত্রের পঞ্জিকায় ত্রিলোচন দাস 'বৃদ্ধকাতন্ত্র' নামে এক প্রাচীন ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন ঃ

> কিঞ্চ বৃদ্ধকাতন্ত্রৈরুক্তং চেদং শাকটায়নোঽপি পূর্বপক্ষে স্থিতঃ প্রাহ ভূব্যথোরদিতি সূত্রে কেচিদ্ ভবতিব্যথোরদিতি নির্দেশ-মিচ্ছন্তি...।

এই কথায় জানা যায়, শর্ববর্মার কাতন্ত্রের পূর্বেও কাতন্ত্র নামক ব্যাকরণ ছিল এবং শার্ববর্মিক কাতন্ত্রের অভ্যুদয়ের পর সেই পুরাতন কাতন্ত্র ও তাহার সম্প্রদায় 'বৃদ্ধকাতন্ত্র' নামে কথিত হইত। 'ভবতিব্যথোরৎ' সেই বৃদ্ধকাতন্ত্রের সূত্র—যাহার স্থলবর্তী শাকটায়নের সূত্র ছিল 'ভূব্যথোরৎ' এবং শর্ববর্মার সূত্র 'ভবতেরঃ'। বলা বাহুল্য, তিনি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী হইতে এই সূত্রটি (পা. ৭।৪।৭৩) গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। ভাবকর্মে শাকটায়নের মতে যেখানে 'বভূবে' পদ নিষ্পন্ন হয়, সেখানে কাতন্ত্রমতে দাঁড়ায় 'বুভূবে' পদ। অষ্টাধ্যায়ীর কাশিকাবৃত্তিতে (৭।৪।৭৩) কাতন্ত্রের মত গৃহীত হইলেও ভট্টোজি দীক্ষিতাদি কিন্তু শাকটায়নমতের সমর্থক। আবার আখ্যাতের 'ভৃজঃ স্বরাৎ স্বরে দ্বিঃ' (৪১৪) সূত্রটিকে বৃত্তিকার দুর্গসিংহ যে 'আদ্যব্যাকরণমতমেতৎ' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন, সেই 'আদ্যব্যাকরণ'ও সম্ভবতঃ ঐ বৃদ্ধকাতন্ত্রই। [আখ্যাত = কাতন্ত্রের আখ্যাতপ্রকরণ।]

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে কলাপীর বৈয়াকরণত্ব স্পষ্টীকৃত না হইলেও পরবর্তী ব্যাকরণ-গ্রন্থাদিতে তাহা ক্রমেই স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। 'কালাপ' এবং 'কালাপক' শব্দ, তৎকৃত ব্যাকরণ এবং তদ্‌ঘটিত ব্যাকরণ-সম্প্রদায় বুঝাইতে ব্যবহৃত দেখা যায়। পাতঞ্জল মহাভাষ্যেই ইহার প্রমাণ বর্তমান। 'সূত্রাচ্চ কোপধাৎ' এই পাণিনিসূত্রের (৪।২।৬৫) ভাষ্যে লিখিত আছে ঃ

সংখ্যা প্রকৃতেরিতি বক্তব্যম্। ইহ মাভূৎ—মাহাবার্ত্তিকঃ... কালাপকঃ।

এই প্রসঙ্গে কাশিকাবৃত্তি ঃ

মহাবার্ত্তিকং সূত্রমধীতে মাহাবার্ত্তিকঃ। কালাপকমধীতে কালাপকঃ। কোপধাদিতি কিং চতুষ্টয়মধীতে চাতুষ্টয়ঃ (৪।২।৬৫)।

সূত্রবাচক এবং কোপধ (= ক উপধাযুক্ত) হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যাপ্রকৃতি বা সংখ্যাত্মক না হওয়ায়, মহাবার্ত্তিকসূত্র এবং কালাপকসূত্রের অধ্যয়নকারী বুঝাইতে, এই দুই শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয়যোগে 'মাহাবার্ত্তিক' এবং 'কালাপক' পদ দুইটি সাধিত হয়। সংখ্যাপ্রকৃতি নয় বলিয়া ইহাদের স্থলে অণ্প্রত্যয়ের লোপ হইবে না, যেমন লোপ হয় 'অষ্টক', 'দশক' এবং 'ত্রিক' শব্দের ক্ষেত্রে ; এই তিনটি যথাক্রমে পাণিনির, বৈয়াঘ্রপদ্যের এবং কাশকৃৎস্নির সূত্রগ্রন্থ বুঝায়। ইহাদের বেলায় অণ্ করিয়া আষ্টক, দাশক এবং ত্রৈক পদ হইবে না। আবার কোপধ না হওয়ায় 'চতুষ্টয়' শব্দের পর অণ্ করিয়া উহার ছাত্র অর্থে 'চাতুষ্টয়' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'চতুষ্টয়মধীতে বেদ বা চাতুষ্টয়ঃ'—চান্দ্রবৃত্তি (৩।১।৪২)। এই ভাবে উক্ত 'কালাপক' শব্দের সূত্রগ্রন্থত্ব এবং আনুষঙ্গিক অন্য উদাহরণগুলি ব্যাকরণের সূত্রগ্রন্থ হওয়ায় সাহচর্যবশতঃ কালাপক এবং চতুষ্টয় শব্দের ব্যাকরণগ্রন্থত্ব প্রতিপন্ন হয়। মহাভাষ্যে উদাহৃত 'মহাবার্ত্তিকসূত্র' দ্বারা, পাণিনীয় সূত্রাবলীর উপর কাত্যায়নরচিত বার্ত্তিকপাঠ, এবং কাশিকা-ধৃত 'চতুষ্টয়' শব্দদ্বারা কাতন্ত্র-ব্যাকরণ সূচিত। শ্রীজীব গোস্বামীর হরিনামামৃত ব্যাকরণে 'উপজ্ঞাতম্' (৭।৫৬২) সূত্রের বৃত্তিতেও উদাহৃত হইয়াছে ঃ 'পাণিনিনোপজ্ঞাতং প্রথমকৃতং পাণিনীয়ম্। কালাপং ব্যাকরণম্।' ইহার বালতোষণী টীকায় বিশদভাবে বলা হইয়াছে যে, কলাপি-কর্তৃক উপজ্ঞাত অর্থাৎ প্রথমকৃত ব্যাকরণই কালাপ।[৭] ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এস্. চন্দ্রশেখর শাস্ত্রীগল-সম্পাদিত এবং ত্রিচিনোপলি হইতে প্রকাশিত বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত-কৌমুদীতে এই প্রসঙ্গে দেখা যায়ঃ 'কলাপকমধীতে কালাপকঃ।' সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর অন্য কোন সংস্করণে ইহার সন্ধান পাই নাই। এই অনুসারে অবশ্য আলোচ্য সূত্র গ্রন্থের নাম দাঁড়ায় 'কলাপক'।

আমাদের বিবেচনায় কলাপীর ঐ 'কালাপক', বা 'কালাপ' বা 'কলাপক' ব্যাকরণই 'আদ্যব্যাকরণ' 'বৃদ্ধকাতন্ত্র'—যাহার শার্ব্বর্মিক

সংস্করণ আধুনিক কাতন্ত্র। চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত থাকায় ইহার আর একটি নাম 'চতুষ্টয়'। প্রাচীনের বৈশিষ্ট্য নবীনে অনুকৃত হওয়ায় ক্রমে প্রাচীনের নামকয়টিও নবীনে প্রযুক্ত হইতে থাকে ; অধিকন্তু 'কৌমার' আখ্যাটি ইহাদের সহিত মিলিত হয়—যাহা প্রাচীন কাতন্ত্রে সম্ভবতঃ একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। পরিবর্তনের মধ্যে—কালক্রমে বঙ্গীয় দৌর্গ সম্প্রদায়ে কালাপ বা কালাপকের স্থলে সংক্ষিপ্ত-সরল 'কলাপ' নামটির উদ্ভব ঘটে। বঙ্গদেশের বাহিরে কলাপ নামের প্রচলন বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু কলাপক নামের ব্যবহার চোখে পড়ে। দশপাদী উণাদিবৃত্তিতে (৩৫) লিখিত আছে : 'বৃহত্তন্ত্রাৎ কলাঃ (আ) পিবতীতি কলাপকঃ শাস্ত্রম্।' জৈন বৈয়াকরণ হেমচন্দ্র (খ্রীঃ ১২শ শতক) তাঁহার উণাদিবৃত্তিতে (৩৩) প্রায় একই কথা লিখিয়াছেন : 'বৃহত্তন্ত্রাৎ কলা আপিবন্তীতি কলাপকাঃ শাস্ত্রাণি।' এই দুই স্থলে অন্য ব্যাকরণ হইতে যে কলা বা অংশবিশেষের পান অর্থাৎ গ্রহণ সূচিত হইয়াছে, তাহা অমূলক নয়। খ্রীঃ ১৩শ শতকে প্রভাচন্দ্রসূরীর 'প্রভাবকচরিতে'ও ব্যাকরণ অর্থে কলাপক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় :

> 'সংক্ষিপ্তশ্চ প্রবৃত্তোঽয়ং সময়েঽস্মিন্ কলাপকঃ। লক্ষণং তত্র
> নিষ্পত্তিঃ শব্দানাং নাস্তি তাদৃশী।। হেমচন্দ্রসূরিপ্রবন্ধ।

এখানে কলাপকের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে সংক্ষিপ্ততা, তৎপ্রতি কটাক্ষপাত আছে।

দৌর্গ সম্প্রদায়ে কলাপ নামের উৎস-স্বরূপ এই শ্লোকটির প্রচলন দেখা যায় : 'শঙ্করস্য মুখাদ্ বাণীং শ্রুত্বা চৈব ষড়াননঃ। লিলেখ শিখিনঃ পুচ্ছে কলাপ ইতি কথ্যতে।।' অর্থাৎ শঙ্করের নির্দেশে ষড়ানন (কার্তিক) নিজ বাহন শিখীর পুচ্ছে (এই ব্যাকরণ?) লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে কলাপ বলা হয়। শিখিপুচ্ছের নামান্তর কলাপ। কলাপ-বিশিষ্ট বলিয়া শিখীর (ময়ূরের) নাম কলাপী। কাজেই 'কলাপিপুচ্ছে লিখিতত্বাৎ কলাপ ইতি নাম'—এই অন্বাখ্যান। শ্লোকটির উৎপত্তিস্থল অজ্ঞাত। 'কথাসরিৎসাগর' প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে যে কাহিনী পাওয়া যায় তাহাতে কার্তিক ব্যতীত দেবদেব শঙ্করের সহিত এই ব্যাকরণের কোন সংস্রবের উল্লেখ নাই। সেখানে কাতন্ত্রের নাম আছে, আর আছে, কলাপের (শিখিপুচ্ছের) নামানুসারে 'কালাপক' নামের উল্লেখ, 'কলাপ' নামের নয়। শিখিপুচ্ছে 'লিখনে'র কথাও নাই।

বনমালি-দ্বিজ রচিত 'কলাপব্যাকরণোৎপত্তিপ্রস্তাব' নামক এক অমুদ্রিত পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, শর্ববর্মা, রাজা সাতবাহনের মূর্খতা নিবৃত্তির জন্য প্রথমে মহাদেবেরই আরাধনা করেন এবং পরে তাঁহারই আদেশে শিখিবাহন কার্ত্তিকের উপাসনা করিয়া তদীয় বাহনের পুচ্ছপালক হইতে ব্যাকরণ সংগ্রহপূর্বক তাহাদ্বারা রাজাকে অল্প সময়ের মধ্যেই 'ব্যাকরণাভিজ্ঞ' করিয়া তোলেন। বনমালীর পুস্তকের পাণ্ডুলিপি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রিমহাশয় দেখিয়া তদনুসারে 'Notices of Sanskrit Manuscripts' (Second Series, Vol.III, Calcutta-1907)-এ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে আছে যে, মোট ১৫০টি শ্লোকে রচিত এই পুস্তক পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত ; পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা মহকুমার মেহার পোস্ট অফিসের এলাকাধীন উপলতা গ্রামের অধিবাসী জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশের নিকট বঙ্গাক্ষরে লিখিত এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ছিল। ইহা ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। উক্ত প্রস্তাবের প্রথম শ্লোক ঃ

কলাপাখ্যং মহাশাস্ত্রং বিস্তৃতং সর্ববর্মণা।
কুতঃ কথং কৃতং তেন প্রস্তাবমতিসুন্দরম্।।

'কলাপাবতার' সম্ভবতঃ এই জাতীয় আর এক পুস্তক। বৌদ্ধ সাহিত্যে অমোঘাঙ্কুশ-প্রণীত এই গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত 'শঙ্করস্য মুখাদ্‌বাণীং...' ইত্যাদি শ্লোকটি সম্ভবতঃ এই জাতীয় কোন উৎস হইতে মুখে মুখে চালু হইয়া থাকিবে।

বনমালীর গ্রন্থ প্রাচীন বলিয়া গণ্য না হইলেও ইহার উপাদান অন্য কোনও প্রাচীন গ্রন্থ হইতে হয়তো বা সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। তবে খ্রীঃ ১২শ শতকেও যে বঙ্গদেশে 'কলাপ' শব্দে ব্যাকরণ বুঝাইত তাহার প্রমাণ আছে। ১১৭৩।৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত শরণদেবের 'দুর্ঘটবৃত্তি'তে (৭।১।১২) 'কলাপবৃত্তি' হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। ইহারও আগে ১১৫৯ খ্রীঃ রচিত 'টীকাসর্বস্বে' (২।৪।১৫৫) সর্বানন্দ 'কলাপাঃ' পদ ব্যবহার করিয়াছেন, এই সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের উদ্দেশে। খ্রীঃ ১৩শ শতকের গ্রন্থ মেদিনীকোশে কলাপের নানা অর্থের মধ্যে ব্যাকরণও অন্তর্ভুক্ত। খ্রীঃ ১৫শ শতকের রচনা অমর-টীকা 'পদচন্দ্রিকা'তেও কলাপের পণ্ডিতগণের উদ্দেশে 'কলাপাঃ' ব্যবহৃত। পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর (খ্রীঃ ১৫শ/১৬শ শতক) এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য (খ্রীঃ ১৬শ শতক) যথাক্রমে 'কলাপদীপিকা' এবং 'কলাপ-

তত্ত্বার্ণব' রচনা করিয়া কলাপ শব্দে কাতন্ত্র-ব্যাকরণ বুঝাইয়াছেন। দৌর্গ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট পণ্ডিত সুষেণ বিদ্যাভূষণ-(খ্রীঃ ১৬শ/১৭শ শতক) স্বীয় 'কলাপচন্দ্র' টীকায় কলাপ এবং কালাপ উভয় শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। কালাপ অর্থে কলাপব্যাকরণাভিজ্ঞ। ভট্টিকাব্যের 'জয়মঙ্গলা' টীকায় (খ্রীঃ ১৭শ শতক) এই ব্যাকরণ-সম্প্রদায় বুঝাইতে 'কালাপিকাঃ' প্রযুক্ত হইয়াছে (৩।৯)। এই শতকেরই প্রথম ভাগে 'চর্করীতরহস্য'কৃৎ কবিকণ্ঠহার, বৃত্তিকার দুর্গসিংহকে 'কলাপতন্ত্রবিদুর' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। এই শতাব্দীর প্রথমপাদে রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে (১।১৬।৩০) কলাপের নাম করা হইয়াছে ; দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী নিমাইপণ্ডিতকে (১৪৮৫ —১৫৩৩ খ্রীঃ) অবজ্ঞাভরে বলিয়াছিলেন ঃ

ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের আলাপ।।

বিখ্যাত কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর তাঁহার 'জগৎমঙ্গল' কাব্যে (১৬৪৫ খ্রীঃ) লিখিয়াছেন ঃ 'জানল অলপ কালাপ-আলাপনে' (৭২)। আধুনিক যুগে তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮১২-৮৫) বাচস্পত্য অভিধানে ব্যাকরণ-বোধক কলাপ শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয়যোগে কালাপ শব্দের সাধন দেখাইয়াছেন কলাপের ছাত্র বা বেত্তা অর্থে। মারাঠী পণ্ডিত বামন শিবরাম আপ্তে (১৮৫৮-৯২) এবং Sir M. Monier Williams (১৮১৯-৯৯) খ্রীঃ) তাঁহাদের স্ব স্ব (সংস্কৃত-ইংরেজী) অভিধানে কালাপ শব্দের ঐ অর্থ নির্দেশ করিয়াও কালাপক অর্থে কাতন্ত্র-ব্যাকরণ এবং কলাপিপ্রোক্ত বেদগ্রন্থ ও তদনুবর্তী সম্প্রদায়ও বুঝিয়াছেন।

এই সব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়, কাতন্ত্রের কলাপ নামের সহিত ইহার সম্প্রদায়বাচক কালাপ শব্দের প্রচলন বঙ্গদেশে পূর্ণমাত্রায়ই ঘটিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয়, কাতন্ত্রের অন্যান্য নামের মতো 'কলাপ' নামটি কিন্তু বহির্বঙ্গে তেমন স্বীকৃতি লাভ করে নাই। খ্রীঃ ১৪শ শতকে মহাপণ্ডিত সায়ণাচার্য 'মাধবীয় ধাতুবৃত্তি'তে কাতন্ত্র (২।৭৯, ৩। ২৪, ৬।১৪০), কালাপ (২।৮৫) এবং কৌমার (১।৫৩৫, ৭২২, ৩।৩৬, ১০।৭৬) ব্যাকরণের মতোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কলাপের নাম করেন নাই। ঐতরেয়ারণ্যকের ভাষ্যে (২।২।৪।১) তিনি স্পষ্টতঃই

সসূত্র কৌমার ব্যাকরণের নাম করিয়াছেন।[৮] মোটকথা, কাতন্ত্রের 'কলাপ' নামটি বাঙ্গালীর দেওয়া। বাঙ্গলার প্রতিভা অন্য অনেক কিছুর মতো কাতন্ত্র-ব্যাকরণকেও এই নূতন নামে বরণ করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে।

(২)

"শ্রীতত্ত্বনিধি" নামক বৈষ্ণব গ্রন্থের নামে প্রচারিত[৯] একটি শ্লোকে যে ৯ খানা ব্যাকরণের নাম আছে, ঐ কৌমার ব্যাকরণ তাহাদের অন্যতম ঃ

ঐন্দ্রং চান্দ্রং কাশকৃৎস্নং কৌমারং শাকটায়নম্।
সারস্বতং চাপিশলং শাকল্যং পাণিনীয়কম্।।

পূর্বোক্ত কলাপচন্দ্র টীকায় বলা হইয়াছে 'কুমারব্যাকরণ'। কেহ কেহ 'কুমারাণামিদং কৌমারম্' এইরূপ নিরুক্তির দ্বারা কুমার (বালক)-দের শিক্ষার জন্য রচিত অর্থে কৌমার ব্যাকরণ বলিয়া থাকেন। এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক না হইলেও, কার্ত্তিকেয়বাচক 'কুমার' শব্দের সহিত এই নামের সম্বন্ধ প্রবলতর ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'স্বামিকুমার' এবং 'কুমারমূর্তি' নামও পাওয়া যায়। খ্রীঃ ১১শ শতকের (অভিনব) কালিদাস-রচিত 'নানার্থশব্দরত্ন' কোশের 'তরলা' টীকার প্রারম্ভে নিচুল কবি যোগীন্দ্র 'তদুক্তং রহস্যে' বলিয়া যে সব প্রাচীন শ্লোক বা শ্লোকাংশের উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহাতে কৌমার ব্যাকরণের কেবল বৈশিষ্ট্যই নয়, প্রাচীনতাও সূচিত হয় ঃ

স্বতন্ত্রধাতুতদ্দ্বন্দ্বসঙ্গতাসঙ্গতাত্মিকা।
প্রকৃতিস্তত্র বিজ্ঞেয়া ন কৌমারে ত্বয়ং বিধিঃ।।
শক্তিঃ শম্ভুঃ কুমারশ্চাপীন্দ্রঃ সূর্যো নিশাকরঃ।
শ্রীশক্তিশম্ভুসূচিত সুবিভক্ত্যাকলনসিদ্ধপদযোগাৎ।
চক্রে কুমারমূর্তির্ব্যাকরণং সর্ববেদসরসার্থম্।। ইত্যাদি।

সবিশেষ লক্ষণীয় যে, যেই শক্তিশম্ভুসূচিত (ব্যাকরণসিদ্ধ) পদসমূহের সমবায়ে কুমারমূর্তি স্বীয় ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন, সেই শক্তি, শম্ভু, ইন্দ্র, সূর্য এবং নিশাকর (চন্দ্র)-এর সঙ্গে এক পংক্তিতে 'কুমার'ও সম-মর্যাদায় উল্লিখিত। তা'ছাড়া, প্রথম শ্লোকের শেষে 'ন কৌমারে ত্বয়ং বিধিঃ' এবং সর্বশেষ 'সর্ববেদসরসার্থম্' উক্তি, যাহা কৌমার

ব্যাকরণের আরও বৈশিষ্ট্যের জ্ঞাপক, তাহা কাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অঙ্কাভিধানের 'অষ্টৌ যোগাঙ্গবস্বীশমূর্তিদিগ্‌গজসিদ্ধয়ঃ। ব্রহ্মশ্রুতিব্যাকরণ-দিক্‌পালা হি কুলাদ্রয়ঃ।।' শ্লোকান্তর্গত 'অষ্ট' (= '৮' সংখ্যার) বাচক যোগাঙ্গ, বসু ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দের অন্যতম 'ব্যাকরণ' শব্দের টীকায় টীকাকার পজ্জ, ৮ রকমের ব্যাকরণ নির্দেশ করিতে যে প্রাচীন শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতেও কৌমার ব্যাকরণের নাম আছে ঃ

পালাসমপি মাহেশং শৈবং যাবনিকং তথা।
পাণিন্যাখ্যঞ্চ কৌমারং কাত্যায়নমলৌকিকম্।।

মধ্য-এশিয়ায় আবিষ্কৃত কুমারলাত-রচিত ব্যাকরণের ভগ্নাংশ হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভনাগাত তিনি তাঁহার ব্যাকরণে বৌদ্ধ সংস্কৃতে ব্যবহৃত পাণিনি-বিরুদ্ধ বহু প্রচলিত শব্দকে সাধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবতঃ ক্রমে পৌরাণিক হিন্দু ঐতিহ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিবেন এবং এই (সূচনা-) সংস্রব হইতেই কৌমার কাতন্ত্রের 'বৌদ্ধ' অপবাদ—যাহা হইতে ইহা পরেও সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। বৌদ্ধশাস্ত্রকার এই আর্য কুমারলাত খুব সম্ভব খ্রীষ্টীয় ২য় শতকের লোক, তক্ষশিলায় জন্ম, অল্প বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের আচার্য, দেশত্যাগে অনিচ্ছুক হওয়ায় তাঁহাকে বন্দী করিয়া মধ্য-এশিয়ার খো-ফান্‌-তো (= খাবান্দ?) রাজ্যে আনা হয় এবং সেখানে তিনি সারাজীবন শাস্ত্রচর্চায় কাটান।

শর্ববর্মার কাতন্ত্র-রচনায় কুমার-ঘটিত দৈব সাহায্যের কথা সম্ভবতঃ গুণাঢ্য-রচিত অধুনালুপ্ত 'বৃহৎকথা' গ্রন্থে প্রথমে লিখিত হয়। এই গুণাঢ্য শর্ববর্মার সমকালীন এবং একাধিক ভাষায় পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী শর্ববর্মার প্রতি অভিমানবশতঃ তিনি পৈশাচী প্রাকৃতে ঐ বৃহৎকথা-কাব্য রচনা করেন। শুনা যায়, রাজা সাতবাহন (ইঁহারই অন্যতম সভাপণ্ডিত ছিলেন গুণাঢ্য) প্রথমে এই কাব্যের সমাদর না করায় ক্ষুব্ধ গুণাঢ্য নিজেই ইহার অংশবিশেষ নষ্ট করিয়া ফেলেন। পরে রাজার আগ্রহে ইহার কিয়দংশ রক্ষা পাইলেও তাহা চিরস্থায়ী হয় নাই। তবে মুখ্যতঃ ঐ ভগ্নাংশেরই অবলম্বনে পরবর্তীকালে রচিত একাধিক গ্রন্থ অদ্যাপি বর্তমান আছে, যেমন ক্ষেমেন্দ্র-প্রণীত 'বৃহৎকথামঞ্জরী', সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' এবং জয়দ্রথ-রচিত

হরচরিতচিন্তামণি'। আশ্চর্যের বিষয়, এই তিন গ্রন্থই প্রায় একই সময়ে (খ্রীঃ ১১শ শতক), একই কাশ্মীরাঞ্চলে পদ্যে রচিত। তা'ছাড়া ইহাদের মধ্যে তথ্যগত এমন কি ভাষাগত সাদৃশ্যও প্রচুর। ব্যাকরণপক্ষে পাণিনি এবং শর্ববর্মার সম্বন্ধে অনেক কথা এই গ্রন্থগুলিতে শুনিতে পাওয়া যায়। মূল বক্তব্য অবশ্য সর্বত্রই এক। সংশ্লিষ্ট ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ে উহার সত্যাসত্য-বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবতারণার পরিবর্তে বরং নানা ভাবে উহার সমর্থনই করা হইয়াছে। কাতন্ত্রপক্ষীয় ঘটনা মোটামুটি এইরূপ ঃ বসন্তকালে একদা রাজা সাতবাহন (ব্যাকরণ সাহিত্যে 'শালিবাহন') মহিষীদের সঙ্গে জলকেলির সময় জনৈকা বিদুষী রাজ্ঞীর প্রতি এত বেশী জলসেচন করিতে থাকেন যে, রাণী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সংস্কৃতে বলিয়া উঠেন 'মোদকং দেহি' (বা 'মোদকৈস্তাড়য়' বা 'মোদকৈর্মাংক্ষিপ') অর্থাৎ 'আমার দিকে আর জল দিও না।' রাজা কিন্তু 'মোদক' শব্দের 'মা + উদক' এই সন্ধিগত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ প্রচুর মোদক (মিষ্টদ্রব্য 'মোয়া') সেখানে আনিয়া হাজির করান। ইহাতে রাণী তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া ভর্ৎসনাপূর্বক ভুল বুঝাইয়া দিলে, তিনি যার পর নাই লজ্জিত হইয়া নিতান্ত ক্ষুণ্নমনে মৌনাবলম্বন করেন। রাজকার্য ব্যাহত হয়। ক্রমে এই সংবাদ মন্ত্রী শর্ববর্মা এবং গুণাঢ্যের নিকট পৌঁছিলে তাঁহারা অবস্থা বুঝিয়া যতদূর সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে রাজাকে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর হইলে, ইহা লইয়া উভয় পণ্ডিতের মধ্যে একটা অশোভন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। গুণাঢ্য চিরাচরিত ১২ বৎসরের[১০] পরিবর্তে ৬ বৎসরে রাজাকে ব্যাকরণ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার সামর্থ্য জ্ঞাপন করিলে, শর্ববর্মা সে স্থলে মাত্র ৬ মাসে এই কার্য সমাধা করিতে পারিবেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। ইহাতে গুণাঢ্য ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন—যদি শর্ববর্মা এই রূপ অসাধ্যসাধনে সমর্থ হন তবে তিনি (গুণাঢ্য) সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশী ভাষা ত্যাগ করিবেন। এদিকে শর্ববর্মাও স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে না পারিলে ১২ বৎসর ধরিয়া গুণাঢ্যের পাদুকা বহন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ইহার পরে তিনি কঠোর তপস্যায় স্বামিকুমার কার্ত্তিকের সন্তোষবিধানপূর্বক তাঁহার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তিনি তাঁহাকে ব্যাকরণের 'সিদ্ধোবর্ণসমাম্নায়ঃ' সূত্রটি বলা মাত্র শর্ববর্মা

মনুষ্যসুলভ চপলতাবশতঃ পরবর্তী সূত্রটি বলিয়া ফেলেন। তাহা শুনিয়া দেবকুমার বলেন যে, যদি শর্ববর্মা ঐ রূপ না করিতেন তবে তাঁহাকে তিনি এমন এক ব্যাকরণ দান করিতেন যাহা গুণে পাণিনির ব্যাকরণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইত, কিন্তু তাহা না হওয়ায় এখন এই ব্যাকরণ স্বল্পসূত্রতা-হেতু কাতন্ত্র নামে এবং তাঁহার বাহনের কলাপ (নাম) হইতে কালাপক নামেও অভিহিত হইবে ঃ

অধুনা স্বল্পসূত্রত্বাৎ কাতন্ত্রাখ্যং ভবিষ্যতি।
মদ্‌বাহনকলাপস্য নাম্না কালাপকং তথা।।—কথাসরিৎসাগর ৭।১৩

এইরূপে দেবানুগৃহীত শর্ববর্মা সাতবাহনকে দেবদত্ত সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা দিয়া পূর্বনির্দিষ্ট কালের মধ্যেই তাঁহার মূর্খতা দূর করেন। প্রতিদানে রাজা তাঁহাকে নর্মদা-তীরবর্তী ভৃগুকচ্ছ নামক স্থানের স্বত্বাধিকারী করিয়া দেন। এদিকে গুণাঢ্যও নিজ প্রতিশ্রুতি মতো পূর্বোক্ত তিন ভাষা বর্জন করিয়া বনবাসী হন এবং পিশাচ ভাষায় বৃহৎকথা রচনা করেন। কথাসরিৎসাগরের ৬ষ্ঠ-৭ম তরঙ্গে, হরচরিতচিন্তামণির 'শব্দশাস্ত্রাবতার' নামক ২৭শ প্রকাশের ১২০-৩৯ শ্লোকে এবং বৃহৎকথামঞ্জরীর 'কথাপীঠ' নামক ১ম লম্বকের ৩য় গুচ্ছে, ঐ এক আখ্যায়িকাই সামান্য হের-ফের করিয়া বলা হইয়াছে। ইহার সহিত পূর্বোক্ত বনমালী দ্বিজের বক্তব্যের পার্থক্য লক্ষণীয়।

কাতন্ত্রের ১ম সূত্রের 'কলাপচন্দ্র' টীকায় সুষেণ বিদ্যাভূষণ অতি সংক্ষেপে উপর্যুক্ত কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন যে শ্লোকে, সেই 'রাজা কশ্চিন্মহিষ্যা...' ইত্যাদি প্রারম্ভিক শ্লোকটি[১১] অপর কোনও গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বলিয়া মনে হয়। এই শ্লোকে সাতবাহনের পরিবর্তে 'শালিবাহন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। জৈন সম্প্রদায়ে খ্রীঃ ১৪শ শতকে রচিত মেরুতুঙ্গাচার্যের 'প্রবন্ধচিন্তামণি'তে এবং রাজশেখর সূরির 'প্রবন্ধকোশে' উভয়ত্রই 'সাতবাহনপ্রবন্ধে' রাজা সাতবাহনের কথা আছে, কিন্তু শর্ববর্মাদির উল্লেখ নাই। প্রবন্ধকোশের মতে রাজা রাণীকর্তৃক উপহসিত হইয়া স্বয়ং সরস্বতীর উপাসনার দ্বারা কৃতবিদ্য হন। এই গ্রন্থে তিনি গাথা-রচয়িতা হাল রূপে বর্ণিত ; 'সারস্বত ব্যাকরণাদিশাস্ত্রশতানি' তথা 'শাতবাহনকশাস্ত্র'ও নাকি তাঁহার রচনা। ভারতবর্ষের 'দক্ষিণাখণ্ডে' মহারাষ্ট্রদেশান্তর্গত প্রতিষ্ঠান নামক পত্তনে[১২] তাঁহার রাজধানী ছিল। এই সবই রাজশেখরের বর্ণনা হইতে গৃহীত। জার্মান পণ্ডিত J. G.

Buchler (1837-98) প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথির খোঁজে কাশ্মীরে গিয়া সেখানে সাতবাহনের মূর্খতাবিষয়ক পূর্বোক্ত কাহিনীর প্রচলন লক্ষ্য করিয়াছিলেন।[১৩] এই সব প্রমাণের জোরে শার্ববর্মিক কাতন্ত্রের সহিত রাজা সাতবাহনের সংস্রব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে, এই ব্যাকরণের ইতিহাসে কতকটা নির্দিষ্ট সময়ের নিকটবর্তী হওয়া যায়, কারণ দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন-বংশীয় রাজাদের শাসন, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা।

সাতবাহন কাহারও ব্যক্তি-নাম নয়। আসলে ইহা দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রজাতীয় রাজগণের কুলবাচক বংশ-নাম। এই বংশের ঠিক কতজন রাজা কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ এখনও কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই। পুরাণ-মতে প্রায় ৩০ জন রাজা ৪৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। এই বিষয়েও অবশ্য সমস্ত পুরাণ একমত নয়। রাজাদের সংখ্যা, ক্রম এবং রাজ্যকাল সম্বন্ধে বায়ু-, বিষ্ণু-, ভাগবত- এবং মৎস্য-পুরাণে বিভিন্নতা দেখা যায়। ঐ ৪৬০ বৎসরের মিল দেখাইতে গিয়া কেহ খ্রীঃ পূর্ব ২৩০ হইতে খ্রীষ্টীয় ২৩০ অব্দ পর্যন্ত তাঁহাদের রাজ্যকাল অনুমান করিয়াছেন। কাহারও মতে এই হিসাব খ্রীঃ পূঃ ২৩৫ হইতে ২২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কেহ কেহ আবার নৃপতিগণকে 'মূল সাতবাহন-বংশীয়' এবং 'তৎসংশ্লিষ্ট' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া খ্রীঃ পূর্ব ১ম শতকের মধ্যভাগ হইতে খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ৩০০ বৎসর, মূল সাতবাহন রাজাদের শাসনকাল নির্দেশ করিয়াছেন। এই অবস্থায় আচার্য শর্ববর্মা কাতন্ত্র-ব্যাকরণের সাহায্যে এই বংশের কোন্ রাজাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

পণ্ডিত রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর (১৮৩৭-১৯২৫) তাঁহার 'Early History of the Dekkan' (1884) গ্রন্থে, সাতবাহন-বংশীয় ১ম পুলুমায়ি'র রাজত্বকালে শর্ববর্মাদির ঘটনা ঘটে বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ২য় শতকের ২য় পাদে তাঁহার রাজ্যকাল নির্দিষ্ট হইয়াছে। গ্রীক্ ভৌগোলিক টলেমি, অন্ধ্ররাজ্যের উত্তরভাগের রাজধানী 'পৈথান'-এ রাজত্বকারী শ্রীপুলুমায়ি-র কথা বলিয়াছেন। এই পৈথানই পূর্বোক্ত 'প্রতিষ্ঠান' নামক পত্তন বা প্রতিষ্ঠানপুর। ইহা বর্তমান মহারাষ্ট্র প্রদেশের ঔরঙ্গাবাদ জেলায় গোদাবরী নদীর উত্তরতীরে অবস্থিত।

১৬৩ খ্রীষ্টাব্দে টলেমির মৃত্যু হয়। কাজেই তাঁহার পুলুমায়ি যে ঐ সময়ের পূর্ববর্তী তাহা নিঃসন্দেহ। এই পুলুমায়ির পিতা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি, শকদিগকে পরাজিত করিয়া উত্তরমহারাষ্ট্র, কোঙ্কন, সৌরাষ্ট্র এবং নর্মদাতীরবর্তী অঞ্চল অধিকার করেন। এই নদীর তীরে অবস্থিত ভৃগুকচ্ছের আধিপত্যই যে শর্ববর্মাকে দেওয়া হইয়াছিল তাহা কথাসরিৎসাগরের ৬ষ্ঠ তরঙ্গের শেষ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ভৃগুকচ্ছের অপভ্রংশ ভরুকচ্ছ। বর্তমান গুজরাট প্রদেশে নর্মদা নদীর মোহানায় অবস্থিত 'Broach'-ই সেই প্রাচীন ভরুকচ্ছ বা ভৃগুকচ্ছ। শর্ববর্মাকে ভৃগুকচ্ছদানের ঐ কাহিনীর মূলে কিছুমাত্র সত্যতা থাকিলে ঐ ঘটনা যে সাতকর্ণির নর্মদা-অঞ্চল অধিকারের পূর্বে ঘটিতে পারে না তাহা নিঃসন্দেহ। তাঁহার রাজ্যকাল লইয়া তিনটি মত (খ্রীঃ ৭২-৯৫, ৮০-১০৪, ১০৬-৩০) থাকিলেও আলেকজাণ্ডার কানিংহাম (১৮১৪-৯৩) তাঁহাকেই 'শালিবাহন শকাব্দে'র প্রবর্তক সাব্যস্ত করিয়া ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বের বর্তমানতা নির্দিষ্ট করিয়াছেন।[১৪]

'গাথাসপ্তশতী'র সঙ্কলয়িতা হাল-ই আখ্যায়িকা-বর্ণিত সাতবাহন বলিয়া সাধারণতঃ কথিত হইয়া থাকেন। ইহা একটি প্রবল মত। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হাল-প্রসঙ্গ অনুধাবন করিলে এই মতের পরম্পরাগত সমর্থন মিলে। সপ্তশতীর শেষ পুষ্পিকাতে লিখিত আছেঃ

> ইতি শ্রীমৎ কুন্তলজনপদেশ্বর প্রতিষ্ঠানপত্তনাধীশ-শতকর্ণোপনামক দ্বিপকর্ণাত্মজ-মলয়বত্যুপদেশপণ্ডিতীভূত-ত্যক্তভাষাত্রয়স্বীকৃতপৈশাচিক পণ্ডিতরাজ গুণাঢ্য-নির্মিত ভস্মীভবদ্ বৃহৎকথাবশিষ্ট সপ্তমাংশা-বলোকন প্রাকৃতাদি-বাক্‌পঞ্চকপ্রীত-কবিবৎসলহালাদ্যুপনামক শ্রীসাতবাহন-নরেন্দ্রনির্মিতা...সপ্তশতীয়মবসানমগাৎ।

এই বাক্যটির মৌলিকতা সন্দেহাতীত নয়। ইহার অনেকাংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। নতুবা ইহাকে প্রামাণিক ধরিলে, এই হালের সময়েই যে শর্ববর্মার কাতন্ত্র রচিত হইয়াছিল তাহা একপ্রকার সুনিশ্চিত হইয়া পড়ে। পুষ্পিকার বর্ণনা-মতে এই রাজা হাল সাতবাহন ছিলেন কুন্তলের রাজা প্রতিষ্ঠানপুরাধীশ শতকর্ণ (সাতকর্ণি) দ্বিপকর্ণের পুত্র, যিনি (রাণী) মলয়বতীর উপদেশে পণ্ডিত হন এবং গুণাঢ্য-রচিত বৃহৎকথার ভস্মাবশিষ্ট সপ্তমাংশ অবলোকন করিয়া এবং প্রাকৃতাদি ভাষাপঞ্চকের প্রতি প্রীতিযুক্ত ও কবিবৎসল ছিলেন।

'হাল' সম্ভবতঃ 'সাত' (বা 'শাত') শব্দের অপভ্রংশ। কথাসরিৎ-সাগরে এবং বৃহৎকথামঞ্জরীতে কথিত আছে যে, সাতবাহনের পিতা দীপকর্ণি (দীপকর্ণ) মহাদেবের অনুগ্রহে 'সাত' নামক গুহ্যকের নিকট হইতে বালক সাতবাহনকে লাভ করেন বলিয়া উহার সাতবাহন নাম হয়। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে সাতবাহন, শালিবাহন, সালবাহন, সাতাহন, সালাহন, শালাহন, হাল প্রভৃতি নামের ব্যবহার পাওয়া যায়। অমরকোষের (২।৮।২) টীকায় ক্ষীরস্বামী হালকে শালিবাহন বলিয়াছেন ঃ 'হালঃ স্যাচ্ছালিবাহনঃ।' খ্রীঃ ১২শ শতকে রচিত 'অভিধানচিন্তামণি'তে (৩।৩৭৫) 'হালঃ স্যাৎ সাতবাহনঃ।' ইহার স্বোপজ্ঞ টীকায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ

হলত্যরাতিহৃদয়ং হালঃ...সাতং দত্তসুখং বাহনমস্য সাতবাহনঃ, সালবাহনোঽপি।

প্রাকৃত পৈঙ্গলের 'পিঙ্গলার্থপ্রদীপ' টীকায় (১৬০০ খ্রীঃ) টীকাকার লক্ষ্মীনাথ ভট্টের উক্তি ঃ

সংস্কৃতে ত্বাদ্যকবির্বাল্মীকিঃ। প্রাকৃতে শালিবাহনঃ। ভাষাকাব্যে পিঙ্গলঃ।

অর্থাৎ সংস্কৃতে বাল্মীকি, প্রাকৃতে শালিবাহন এবং দেশী ভাষায় পিঙ্গল আদ্য কবি। বলা বাহুল্য এখানে শালিবাহন = হাল (কবি)। বাণভট্ট হর্ষচরিতে, রাজশেখর কাব্যমীমাংসায় এবং অন্যান্য অনেক প্রাচীন লেখক শালিবাহন (হাল বা শলোহাল) রচিত 'গাথাসপ্তশতী'র প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত আর্যাচ্ছন্দের সাত শত শৃঙ্গার বিষয়ক উৎকৃষ্ট গাথার সঙ্কলন-বিশেষ। বিভিন্ন প্রাকৃত কবিদের গ্রন্থাদি হইতে এইগুলি হালকর্তৃক সংগৃহীত। তাঁহার নিজের রচিত কতকগুলি গাথাও ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

উজ্জয়িনীতে সংস্কৃত চর্চার মতো প্রতিষ্ঠানপুরেও রাজপোষকতায় একদা প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্যের যে প্রভূত চর্চা হইয়াছিল, সপ্তশতীর সঙ্কলনে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। অন্ধ্ররাজাদের[১৫] সমর্থনে এই রাজ্যের প্রজাদের প্রাকৃত ভাষানুরাগ ক্রমে প্রবাদে পরিণত হয়। খ্রীঃ ১১শ শতকে ভোজরাজ তাঁহার 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ

কে নাসন্নাঢ্যরাজস্য রাজ্যে প্রাকৃতভাষিণঃ।
কালে শ্রীসাহসাঙ্কস্য কে ন সংস্কৃতভাষিণঃ।।

অর্থাৎ আঢ্যরাজের (শালিবাহনের) রাজ্যে কাহারা প্রাকৃতভাষী ছিলেন না (বা) সাহসাঙ্কের (রাজা বিক্রমাদিত্যের) কালে কাহারাই বা সংস্কৃতে কথা বলিতেন না? এই অবস্থায় অর্থাৎ শালিবাহনের রাজ্যে প্রাকৃত-ভাষার প্রতি অত্যধিক অনুরাগের ফলে সংস্কৃত ভাষা-চর্চার অবনতি ঘটা অস্বাভাবিক নয় ; 'মোদক' শব্দের সন্ধিজ্ঞানের অভাবঘটিত আখ্যায়িকা সেই অবস্থাই সূচিত করে।

গাথাসপ্তশতীর পূর্বোক্ত পুষ্পিকামতে প্রতিষ্ঠান সহ সমগ্র কুন্তলজনপদ ব্যাপী সাতবাহনের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কুন্তলই বর্তমান কর্ণাটক। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে কামগিরি (?) হইতে দ্বারকা পর্যন্ত কুন্তল দেশের সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে। দ্বারকা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত থাকিলেই অবশ্য হালের পক্ষে শর্ববর্মাকে ভৃগুকচ্ছ দান করা সম্ভবপর হয়। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (১২শ অধ্যায়ের উপান্তে) কুন্তল শব্দ, 'শাতকর্ণিশাতবাহনে'র বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। এই সব হইতে হালের তথা শর্ববর্মার ঐতিহাসিক নির্দেশনা একরূপ সুস্থির হইলেও তাঁহাদের জীবৎকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় নাই। পৌরাণিক মতে হালের রাজ্যকালের পরিমাণ মাত্র পাঁচ বৎসর। তদনুসারে কেহ ২০-৪, কেহবা ৭৮-৮৩ খ্রীষ্টাব্দ তাঁহার রাজত্বকাল অনুমান করিয়াছেন।[১৬] পূর্বাপর বিবেচনায়, আচার্য শর্ববর্মাকে খ্রীঃ ১ম/২য় শতাব্দীয় সাব্যস্ত করাই সমীচীন মনে হয়।

(৩)

শর্ববর্মা খুব সম্ভব কালাপশাখাভুক্ত যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। নর্মদার নিম্নাববাহিকা-অঞ্চলে বর্তমান গুজরাট প্রদেশে, এই শাখাধ্যায়ীদের বাসস্থান ছিল। যজুর্বেদের কালাপাদি অন্যান্য শাখা ক্রমে অবলুপ্ত হইয়া যে প্রধান দুইটি শাখায় স্থিরতা লাভ করে; তাহা হইল কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখা এবং শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয় শাখা। মধ্যভারতে, বিশেষতঃ নর্মদার দক্ষিণ উপকূল-অঞ্চলে তৈত্তিরীয় শাখাবলম্বীদের প্রধান বাসভূমি ছিল বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। এই শাখার প্রাতিশাখ্য—যাহা 'কৃষ্ণযজুঃ প্রাতিশাখ্য' বা 'তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্য' বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার সহিত সার্ববর্মিক কাতন্ত্রের রচনাগত অসামান্য সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই প্রাতিশাখ্যের রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। স্বামিকুমার বা

কার্ত্তিকেয় ইহার প্রণেতা—এইরূপ কিংবদন্তী। এই সব প্রাতিশাখ্যের মূলে আবার প্রাচীনতম ঐন্দ্র ব্যাকরণের প্রভাব অনুমিত হইয়া থাকে।[১৭] পাণিনির অভ্যুদয়ে ঐন্দ্র তথা প্রাচীন কাতন্ত্র নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলে, কিঞ্চিদধিক চারিশত বৎসরের ব্যবধানে শর্ববর্মার কাতন্ত্রের অবলম্বনে, উহার পুনরুজ্জীবনের সূচনা দেখা দেয়। এই সময়ে আস্তিকামতের প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপ নাস্তিক বৌদ্ধ (ও জৈন?) সম্প্রদায় এই ব্যাকরণের প্রধান আশ্রয়স্থল হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ফলে ভারত হইতে বিতাড়িত বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে এই ব্যাকরণের কিছু পুঁথিপত্রও ভারতের সীমান্ত দেশগুলিতে নীত হয়। এই কারণেই নেপালে, তিব্বতে এবং কাশ্মীরে কাতন্ত্রের সমধিক প্রচলন দেখা যায়। সিংহলে এবং ব্রহ্মদেশেও ইহার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সেখানে পালিভাষায় ইহার অনুবাদও করা হইয়াছিল খ্রীঃ ১৫শ শতকের পূর্বে।[১৮] কচ্চায়নের পালি ব্যাকরণও মুখ্যতঃ কাতন্ত্রের আদর্শে রচিত। বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে কাতন্ত্রের সমধিক প্রচার, ঐ বৌদ্ধ প্রভাবেরই ফল। মধ্য-এশিয়ার খুদাই অঞ্চলে (বর্তমান পূর্ব চীনের খোটান) কাতন্ত্রের খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১৯] আশ্চর্যের বিষয়, ইহার লিপি নাকি বাঙ্গালা বর্ণমালার অনুরূপ। ইন্দোনেসিয়ায় (বলিদ্বীপে) কাতন্ত্রের প্রভাব গোচরীভূত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য 'Sanskrit in Indonesia' by J. Gonda, 1952, pp.105-06)।

প্রথম দিকে সমাজের সাধারণ স্তরে কাতন্ত্রের পঠন-পাঠন দীর্ঘকাল নিবদ্ধ থাকে। সম্প্রদায়-নির্বিশেষে জনগণ ইহার ব্যবহার করিতেন। উচ্চস্তরে বিশেষতঃ পণ্ডিত সমাজে পাণিনির ব্যবহার ছিল। কাতন্ত্রের দ্বারা ব্যাকরণের প্রাথমিক জ্ঞানলাভের পর, প্রয়োজন হইলে উচ্চতর ক্ষেত্রে পাণিনির দ্বারস্থ হওয়া একরূপ প্রথা-সিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেও সেক্ষেত্রে অবৈদিক বা বেদবিরোধী বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের ছাত্রগণ ধর্মীয় বাধার সম্মুখীন হইতে থাকেন, কারণ পাণিনির তন্ত্রে একাধারে লৌকিক ও বৈদিক সংস্কৃতের ব্যাকরণ গ্রথিত। ব্যাকরণের উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐ বৈদিক বাধা দূর করিবার প্রচেষ্টা হইতেই বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ে কতকগুলি স্বতন্ত্র ব্যাকরণ রচিত হয়, যেমন বৌদ্ধ চন্দ্রগোমীর চান্দ্র ব্যাকরণ (খ্রীঃ ৫ম শতক), জৈন দেবনন্দীর জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ (খ্রীঃ ৫ম শতক), জৈন শাকটায়ন বা পাল্যকীর্তির শব্দানুশাসন

(খ্রীঃ ৯ম শতক) এবং জৈন হেমচন্দ্রের 'সিদ্ধহেমশব্দানুশাসন' (খ্রীঃ ১২'শ শতক)। কাতন্ত্রের সংক্ষিপ্ততা বা অপূর্ণতা এবং পাণিনির কাঠিন্য এবং বৈদিকাংশ পরিহার করিয়া ছাত্রদিগকে অন্যনিরপেক্ষ সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়াই এই সব সাম্প্রদায়িক ব্যাকরণ রচনার সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য।

এই সব ব্যাকরণের রচনা সত্ত্বেও কিন্তু কাতন্ত্রের পূর্বসমাদর অক্ষুণ্ন থাকে, কারণ সরলতা-গুণে কাতন্ত্রকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে নাই। খ্রীঃ ৭ম শতকে ভারতভ্রমণে আসিয়া ইউয়েন সাং কাতন্ত্রের এই অবস্থাই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহার চারিশত বৎসর পরে খ্রীঃ ১১শ শতকে ভারতপর্যটক অলবীরূণীও তখনকার প্রচলিত অন্যান্য ব্যাকরণের মধ্যে কাতন্ত্রের বিশেষ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার টীকা-টিপ্পনীকারদের মধ্যেও অনেক জৈন-বৌদ্ধ পণ্ডিতের সন্ধান মিলে। বিখ্যাত টীকাকার দুর্গ(গুপ্ত)সিংহ ছিলেন বৌদ্ধ, 'কাতন্ত্ররূপমালা'র প্রণেতা ভাবসেন ত্রৈবিদ্য ছিলেন জৈন। উদাহরণ-মাধ্যমে কাতন্ত্রের সন্ধিপ্রকরণের বর্ণনামূলক এক জৈন স্তোত্রেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহার নাম 'কলাপব্যাকরণসন্ধিগর্ভিত স্তব'। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সর্বসাধারণের অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই ব্যাকরণ একরূপ অপরিহার্যই ছিল—বলা চলে। আজিও এই অবস্থার একেবারে বিলোপ ঘটে নাই।

(৪)

পাণিনীয় ব্যাকরণের সহিত কাতন্ত্রের একটা বিরোধী ভাব সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। অসম হইলেও এই বিরোধের মূল সুদূরপ্রসারী। অসম বলার কারণ, কোনও দিক্ দিয়াই বিশাল পাণিনিতন্ত্রের সহিত ক্ষুদ্র কাতন্ত্রের তুলনা হয় না, যেমন তুলনা হয় না অসীম-অগাধ সমুদ্রের সহিত ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর। তবে সাগরজলের লবণাক্ততার সঙ্গে পাণিনির দুর্বোধ্যতার সাদৃশ্যকল্পনায়, কাতন্ত্রের সরলতাকে নদীর সুপেয় জলের সহিত তুলনা করা চলে। এই সারল্যই কাতন্ত্রের শক্তি, ইহা দ্বারাই সকলে আকৃষ্ট। এই গুণেই ইহাকে ভালবাসিয়া অনেক প্রতিভাবান্ পণ্ডিত আমরণ ইহার সেবা করিয়া গিয়াছেন। পূর্বোক্ত অসম যুদ্ধে পশ্চাৎপদ না হইয়া ইঁহারা সময় সময়

আশাতিরিক্ত বীরত্বেরও পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ণাঙ্গ অষ্টাধ্যায়ীর সহিত এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ক্ষুদ্র কাতন্ত্রের কলেবর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়া পরিশিষ্টাদিসহ বর্তমান বৃহদাকার লাভ করিয়াছে। এমন কি, জনৈক আধুনিক পণ্ডিত পাণিনির অনুকরণে ইহার বৈদিক প্রক্রিয়া যোজনা করিয়া সাম্প্রদায়িক শেষ কৃত্য সমাধা করিয়াছেন। সেই কথা যথাস্থানে বলা যাইবে।

পাণিনির সহিত কাতন্ত্রের বিরোধ মূলতঃ দুই ব্যাকরণধারার বিরোধ। উভয়ের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য এবং গতিপ্রকৃতি সবই আলাদা। পাণিনির অভ্যুদয়ের প্রাক্‌কালে তাঁহার সহিত ঐন্দ্র ব্যাকরণের ছাত্র বররুচি কাত্যায়নের (দৌর্গ সম্প্রদায়ে কাতন্ত্রের তথাকথিত কৃৎপ্রকরণের কর্তৃত্ব এই কাত্যায়নে আরোপিত!) ঘোরতর ব্যাকরণ-বিচার—যাহাকে ব্যাকরণ যুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—এবং তাহাতে কাত্যায়ন তথা ঐন্দ্র ব্যাকরণের পরাজয়ের যে বর্ণনা আখ্যান-গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা এই দুই ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের মূলগত বিরোধই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ঐ পরাভবের পরিণাম বড় শোচনীয় হইয়াছিল। কাত্যায়নের কথায় ঃ

তেন প্রণষ্টমৈন্দ্রং তদস্মদ্ ব্যাকরণং ভুবি।
জিতাঃ পাণিনিনা সর্বে মূর্খীভূতা বয়ংপুনঃ।। —বৃহৎকথামঞ্জরী।

হরচরিতচিন্তামণিতেও প্রায় একই কথা বলা হইয়াছে ঃ

ঐন্দ্রং ব্যাকরণং নষ্টং সমগ্রং চাভবদ্‌ভুবি।
ততো বররুচির্দুঃখং বিদ্যাবিরহিতো দধে।। ২৭।৭৯।

অর্থাৎ পাণিনির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঐন্দ্র ব্যাকরণ নষ্ট বা দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় কাত্যায়ন প্রভৃতি ঐ ব্যাকরণের ছাত্রগণ মূর্খ বা হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলে কাত্যায়নকে ঐন্দ্র-চর্চা পরিত্যাগ করিয়া পাণিনিব্যাকরণের বার্ত্তিকরচনায় নিরত দেখি। বলা বাহুল্য, এই জয়-পরাজয় উচ্চ পণ্ডিত সমাজের বিষয় হইলেও, সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রেও ইহার প্রভাব আসিয়া পৌঁছে এবং ফলে ঐন্দ্রপদ্ধতির স্বাভাবিক গতি বেশ কিছুকালের জন্য স্তম্ভিত বা কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়ে। শর্ববর্মার কাতন্ত্রে এই পদ্ধতির পুনর্জাগরণ ঘটিলে আগেকার সেই পাণিনীয় প্রতিরোধও আবার নূতন করিয়া দেখা দেয়। তাই স্বামিকুমার শর্ববর্মাকে 'পাণিনীয়োপমর্দক' শাস্ত্রপ্রদানে আগ্রহী ছিলেন,

যদিও শর্ববর্মারই নির্বুদ্ধিতায় (বা অক্ষমতায়?) তাঁহার সেই আগ্রহ কার্যকরী হইতে পারে নাই ঃ

অথাব্রবীৎ স দেবো মাং নাবদিষ্যঃ স্বয়ং যদি।
অভবিষ্যদিদং শাস্ত্রং পাণিনীয়োপমর্দকম্।। —কথাসরিৎসাগর ৭।১২

প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারে পাণিনি শিবানুগৃহীত ছিলেন। পরাজিত কাত্যায়নকেও শেষে শিবের আরাধনা করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতে হয়। পাণিনি-তন্ত্রে অনুসৃত বর্ণমালা-ঘটিত প্রত্যাহার-সূত্রগুলিকে বলা হয় 'শিবসূত্র'। এমতাবস্থায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অষ্টাধ্যায়ীর প্রামাণিকতার অনুকরণে শার্ববর্মিক কাতন্ত্রেরও প্রামাণ্য প্রতিপাদনের জন্য তাহাতে শঙ্কর তথা কার্ত্তিকের সংস্রব আরোপ কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। তা'ছাড়া অস্বাভাবিক কিছু ঘটিলে লোকে স্বভাবতঃই তাহাতে অলৌকিক দেবত্ব যোজনা করিয়া থাকে। মাত্র ছয় মাসের মধ্যে রাজা সাতবাহনের সংস্কৃতে পণ্ডিত হওয়ার কথা সত্য হইলে উহা একেবারেই সামান্য ঘটনা ছিল না। তাই দ্বাদশবর্ষাধিগম্য ব্যাকরণকে অত অল্প সময়ে অধিগত করার সংবাদ জনমনে যে কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার মনস্তাত্ত্বিক পর্যবসান হইয়াছিল উহার মূলে কোনও দৈবানুগ্রহের কল্পনার দ্বারা। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে টীকাকার দুর্গসিংহ সগর্বে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

তত্রভগবৎকুমারসূত্রানন্তরং তদাজ্ঞয়ৈব শ্রীসর্ববর্মণাপ্রণীতং সূত্রং কথমনর্থকং ভবতীতি (১।১।২)।

অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ কুমার কার্ত্তিকের সূত্রের পর তাঁহারই আজ্ঞায় শ্রীসর্ববর্মার প্রণীত সূত্র কদাপি অনর্থক হইতে পারে না। টীকাকারের এই ঘোষণা যেন পাণিনিসূত্রের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ভাষ্যকার পতঞ্জলির (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক) উক্তিরই প্রতিধ্বনি। তিনি একাধিক স্থলে এই বিষয়ে বলিয়াছেন—'ছন্দোবৎ সূত্রাণি ভবন্তি।...প্রমাণভূত আচার্যো দর্ভপবিত্রপাণিঃ শুচাববকাশে প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য মহতা প্রযত্নেন সূত্রাণি প্রণয়তি স্ম। তত্রাশক্যং বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভবিতুম্। কিং পুনরিয়তা সূত্রেণ' (পা. ১।১।১ সূত্রভাষ্য) এবং 'সামর্থ্য যোগান্নহি কিঞ্চিদত্র পশ্যামি শাস্ত্রে যদনর্থকং স্যাৎ' (ঐ ৬।১।৭৭) অর্থাৎ পাণিনির সূত্রাবলী বেদবৎ গ্রাহ্য, কারণ প্রামাণিক আচার্য পাণিনি কুশযুক্ত পবিত্র হস্তে বিশুদ্ধ মুক্ত স্থানে পূর্বমুখী হইয়া বসিয়া মহাপ্রযত্নে সূত্রাবলী রচনা

করিয়াছিলেন ; তাই সূত্র কেন, উহার একটি বর্ণও অনর্থক হইতে পারে না। এই কার্যে তাঁহার (তর্কাতীত) সামর্থ্যহেতু এই ব্যাকরণশাস্ত্রে এমন কিছুই দেখি না যাহাকে অনর্থক বলা চলে।

(৫)

প্রারম্ভিক অবস্থায় কাতন্ত্রের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ চারিভাবে বিন্যস্ত ছিল বলিয়া ইহাকে 'চতুষ্টয়' আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। এই চতুষ্টয়-বিভাগ কাতন্ত্রের একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। চতুর্ শব্দের উত্তর (পরে) অবয়বার্থে তয়ট্ (তয়প্) প্রত্যয় যোগ করিয়া চতুষ্টয় পদটি সাধিত হইয়াছে। যাহার চারিটি অবয়ব তাহাই চতুষ্টয়। কাতন্ত্রের প্রকরণাত্মক চারি অবয়ব, তাই কাতন্ত্রও চতুষ্টয়। চতুষ্টয়ের ছাত্র চাতুষ্টয়।

কাতন্ত্রিক অল্প-সূত্রত্বের সহিত এই চাতুষ্টয়ী সংক্ষিপ্ততার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। সংক্ষিপ্ত বলার কারণ এই যে, চতুষ্টয় শব্দে, ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাস বাদে, কেবল সন্ধি, নাম (শব্দ), কারক ও আখ্যাত (ধাতু) এই চারিটিই মূলতঃ উপলক্ষিত। বৃদ্ধকাতন্ত্রেও এই বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া অনুমিত। ইহার কারণ, 'অভিধানগম্যা হি কৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ' অথবা 'অভিধানলক্ষণা হি কৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ'-ন্যায়বশতঃ প্রথমে এই ব্যাকরণে কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাসের উপদেশ ছিল না বলিয়াই 'ঈষৎ' বা অল্প সূত্রের সমাবেশহেতু ইহার 'কাতন্ত্র' নামের উদ্ভব। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের (১১৮৪) বৃত্তিভাগে বোপদেব উক্ত ন্যায়ের ব্যাখ্যাসূচক এই কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

কৃত্তদ্ধিতসমাসানামভিধানং নিয়ামকম্।
লক্ষণন্ত্বনভিজ্ঞানাং তদভিজ্ঞানসূচকম্।।

অর্থাৎ চিরাচরিত শব্দব্যবহার বা শিষ্ট প্রয়োগই কৃৎ, তদ্ধিত এবং সমাসের নিয়ামক, তাই এতদ্বিষয়ক সূত্ররচনার উদ্দেশ্য, ঐ শিষ্টপ্রযুক্ত শব্দসমূহকে অজ্ঞব্যক্তির গোচরীভূত করা। 'অভিধানং শব্দো লক্ষণং নিয়ামকং যেষাং তে অভিধানলক্ষণাঃ'—অর্থাৎ শিষ্টপ্রযুক্ত শব্দই এখানে সূত্রবৎ কৃৎ, তদ্ধিতাদির নিয়ামক।

শার্ববর্মিক কাতন্ত্রের চতুষ্টয় লইয়া কিন্তু মতপার্থক্য আছে। ইহার কারণ, প্রচলিত কাতন্ত্রের কোন্ পর্যন্ত শর্ববর্মার রচনা, বিশেষতঃ ইহার কৃদংশ তাঁহার রচনা কিনা সেই বিষয়ে গভীর সন্দেহ। এক মতে তিনি

বৃদ্ধকাতন্ত্রের অনুকরণে, যতদূর সম্ভব অল্প সময়ে রাজা সাতবাহনকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য সন্ধি, নাম, কারক ও আখ্যাত সমন্বিত চতুষ্টয় ব্যাকরণ রচনা করেন এবং প্রসঙ্গতঃ উদাহরণাদি প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে কৃৎ, তদ্ধিত এবং সমাসের উপদেশ দেন। গরুড়পুরাণে (পূর্বখণ্ডে, ২০৯-১০ অধ্যায়) বর্ণিত ব্যাকরণ কতকটা এই রূপ। ইহাতে অন্য ব্যাকরণের প্রভাব থাকিলেও কাতন্ত্রের প্রভাবই সর্বাধিক। ২০৯ অধ্যায়ের বিষয় 'নাম' ও 'আখ্যাত'। কতকগুলি কাতন্ত্রিক সূত্রকেই যেন শ্লোকবদ্ধ করিয়া ঐ দুই বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কৃৎ প্রত্যয়ের কথা বলা হইয়াছে পরিশেষে একটি মাত্র শ্লোকে। পরবর্তী অধ্যায়ে কেবল উদাহরণের মাধ্যমে সন্ধি, সমাস ও তদ্ধিতের অবতারণা। ইহাতে লিঙ্গানুশাসন এবং সর্বনামের উদাহরণও বর্তমান। এই সব উদাহরণের প্রায় সবই কাতন্ত্রব্যাকরণের দুর্গসিংহের বৃত্তিতে পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রিমহাশয় এই পৌরাণিক ব্যাকরণের পরিপ্রেক্ষিতে কাতন্ত্র আদৌ কত ক্ষুদ্র ছিল তাহা অনুমান করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহার কৃৎ ও তদ্ধিতাংশ পরে সংযোজিত হয়। গুপ্তবংশের (আনুমানিক ২৭৫-৫৭০ খ্রীঃ) রাজত্বের প্রারম্ভে গরুড়পুরাণ রচিত হইয়া থাকিলে ইহা যে শার্ববর্মিক কাতন্ত্রের পরবর্তী তাহা নিঃসন্দেহ। শর্ববর্মার পরে এবং বৃত্তিকার (৪র্থ/৫ম খ্রীঃ শতাব্দীয়) বররুচির পূর্বেই ইহাতে তৎকালীন অন্য ব্যাকরণ হইতে ক্রমে সমাস, তদ্ধিত ও কৃৎ প্রবেশ করে। তখন হইতে পূর্বোক্ত চতুষ্টয়-প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহের ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের সূচনা হয়। ফলে, কেবল সন্ধি, নাম, কারক ও আখ্যাতের চতুষ্টয়-সংজ্ঞা পরিবর্তিত হইয়া তৎস্থলে সন্ধি, কারক-সমাস-তদ্ধিত যুক্ত নাম, আখ্যাত এবং কৃৎ এই চারিপ্রকরণ চতুষ্টয় বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। কাশ্মীর-দেশীয় কাতন্ত্র-সম্প্রদায়ে এই চারিপ্রকরণই চতুষ্টয়-সংজ্ঞক বলিয়া গৃহীত এবং এই চতুষ্টয়াত্মক ব্যাকরণই শর্ববর্মার রচনা বলিয়াও স্বীকৃত।

এই মতের ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী বা বিরুদ্ধাচারী বৃত্তিকার দুর্গসিংহ। তাঁহার মতে কাতন্ত্রের নাম, কারক, সমাস ও তদ্ধিত লইয়া শার্ববর্মিক চতুষ্টয়। তাই দৌর্গগণ বলেন ঃ

> শব্দানাং সাধনং যত্র কারকাণাং চ নির্ণয়ঃ।
> সমাসস্তদ্ধিতো যত্র স চতুষ্টয় উচ্যতে।।

ইহাকে বলা হয় 'নামি চতুষ্টয়'।[২০] ইহার মোট ছয় পাদের প্রথম তিন পাদকে একক রূপে গণ্য করিয়া চতুষ্টয়ের এক চতুর্থাংশ বা এক পাদ ধরা হয় এবং কারক, সমাস ও তদ্ধিতকে ধরা হয় ক্রমান্বয়ে ইহার বাকী তিন পাদ বা অবয়ব ঃ

বিভক্তিসখিযুষ্মদ্ভিঃ[২১] পাদমেকং ত্রিভিঃ সহ।
কারকঞ্চ সমাসশ্চ তদ্ধিতশ্চ চতুষ্টয়ঃ।।

কৃদভাগের শর্ববর্মার কর্তৃত্ব স্বীকার না করায়, চতুষ্টয় প্রাপনে এই কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সন্ধিপ্রকরণের পরে এবং আখ্যাতের পূর্বে চতুষ্টয়ের এই উপস্থাপনার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া সুষেণ বিদ্যাভূষণ চতুষ্টয়ের 'কলাপচন্দ্র' টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন ঃ

প্রথমং তাবৎ সূচীকটাহন্যায়েন সন্ধিপ্রকরণে বর্ণকার্যমুক্ত্বা পদকার্যে কর্তব্যে আখ্যাতাৎ প্রাক্ চতুষ্টয়প্রকরণমুচ্যতে। তত্রেয়ং যুক্তিঃ। বাক্যং হি ক্রিয়াপ্রধানং, ক্রিয়ায়া বিশেষ্যত্বাৎ কারকঞ্চ বিশেষণং, ততশ্চ 'নাগৃহীতবিশেষণা বুদ্ধির্বিশেষ্যে চোপজায়তে', বিশেষণজ্ঞানমন্তরেণ বিশেষ্যজ্ঞানং ন ভবতীত্যতস্তৎ প্রতিপাদকং চতুষ্টয়প্রকরণমেব প্রাগুচ্যতে ইতি সঙ্গতিঃ।

সন্ধির কলাপচন্দ্রের প্রথমেও বলা হইয়াছে ঃ

সূচীকটাহন্যায়েন পূর্বং সন্ধির্নিগদ্যতে।
ততশ্চতুষ্টয়ঃ পশ্চাদাখ্যাতমিতি সঙ্গতিঃ।।
সন্ধ্যাদিক্রমমাদায় যৎ কলাপং বিনির্মিতম্।
মোদকং দেহি দেবেতি বচনং তন্নিদর্শনম্।।

অর্থাৎ 'সূচীকটাহন্যায়ে'র অনুসরণে প্রধান কার্যের পূর্বে অপ্রধানের সম্পাদনার মতো কাতন্ত্রের প্রথমে সন্ধিপ্রকরণে বর্ণকার্য প্রদর্শনের পর পদকার্যের উপদেশ দিতে গিয়া সূত্রকার আখ্যাতের পূর্বে চতুষ্টয় প্রকরণের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। বাক্যে ক্রিয়ার প্রাধান্যহেতু ক্রিয়ার বিশেষ্যত্ব এবং কারকের বিশেষণত্ব বশতঃ আখ্যাতের পূর্বে কারক-প্রতিপাদক চতুষ্টয়ের উপস্থাপনা, কারণ বিশেষণের জ্ঞান বিনা বিশেষ্যের জ্ঞান হইতে পারে না। মোট কথা, আলোচ্য বিষয়গুলির ক্রমবর্ধমান স্বাভাবিক গুরুত্বের সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই প্রথমে বর্ণমূলক সন্ধি, পরে নাম (শব্দরূপ)-কারক-সমাস-তদ্ধিতান্ত চতুষ্টয় এবং শেষে ক্রিয়া-বিষয়ক আখ্যাতপ্রকরণ উপদিষ্ট হইয়াছে। ভাবসেন ত্রিবিদ্য (ত্রৈবিদ্য?) স্বীয়

'কাতন্ত্ররূপমালা'র তদ্ধিতান্ত ভাগের শেষে সন্ধি, নাম (শব্দরূপ), সমাস ও তদ্ধিতকে শর্ববর্মোক্ত নামঘটিত 'চতুষ্ক' বলিয়াছেন ঃ

সন্ধির্নাম সমাসশ্চ তদ্ধিতশ্চেতি নামতঃ।
চতুষ্কমিতি তৎপ্রোক্তমিত্যেতৎ শর্ববর্মণা।।

বৃত্তিকার দুর্গসিংহ কাতন্ত্রিক কৃৎপ্রকরণের কেবল শার্ববর্মিকিত্ব অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, কাত্যায়নে উহার কর্তৃত্বের আরোপও করিয়াছেন ঃ

বৃক্ষাদিবদমীরূঢ়াঃ কৃতিনা ন কৃতাঃ কৃতঃ।
কাত্যায়নেন তে সৃষ্টা বিবুদ্ধিপ্রতিবুদ্ধয়ে।।

অর্থাৎ ঐ পাচক, কারক প্রভৃতি কৃদন্ত শব্দসমূহ বৃক্ষাদি শব্দের মতো রূঢ় (প্রসিদ্ধ) বলিয়া শর্ববর্মাচার্য কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তিনির্দেশক সূত্রসমূহ প্রণয়ন করেন নাই ; কাত্যায়ন অল্পমতি ছাত্রদের জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে সেইসব সূত্র রচনা করিয়াছেন। পরবর্তী টীকাকারগণ বিনা দ্বিধায় বৃত্তিকারের মতানুবর্তী হইয়া কৃদংশের ভিন্ন-কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই ভিন্ন-কর্তৃত্ব প্রতিপাদনের জন্য দুর্গসিংহকে কৃৎপ্রকরণের প্রারম্ভিক 'সিদ্ধি' শব্দের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া লিখিতে হইয়াছে ঃ 'সিদ্ধিগ্রহণং ভিন্নকর্তৃকত্বান্মঙ্গলার্থম্।' এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষতঃ দৌর্গ সিদ্ধান্তের সমর্থনে এই সম্প্রদায়ে নিম্নোক্ত ধরনের শ্লোকের উদ্ভব ঃ

আদৌ সিদ্ধপদার্পণাদথপদস্যোচ্চারণান্মধ্যতশ্চান্তে বৃদ্ধিপদস্য মঙ্গলতয়া শাস্ত্রং সমাপ্তিং গতম্। ইত্যাচার্যতিতিক্ষণং বিকলিতং পশ্চাৎ কৃতঃ কৈঃ কৃতা এতজ্জ্ঞাপয়িতুং স্বশিষ্যনিবহং দুর্গোঽবদৎ পদ্যকম্।।

'পদ্যকম্' অর্থাৎ পূর্বোক্ত 'বৃক্ষাদিবদমীরূঢ়াঃ' ইত্যাদি শ্লোক। 'মঙ্গলাদীনি মঙ্গলমধ্যানি মঙ্গলান্তানি হি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে'—এই মহাভাষ্যোক্ত শিষ্টাচার বশতঃ সন্ধিপ্রকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া আখ্যাতপ্রকরণ পর্যন্ত কাতন্ত্রের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে যথাক্রমে মাঙ্গলিক 'সিদ্ধ' (সন্ধির ১ম সূত্রের প্রথমে), 'অথ' (আখ্যাতের ১ম সূত্রের প্রথমে) এবং 'বৃদ্ধি' (আখ্যাতের শেষ সূত্রের শেষে) শব্দের প্রয়োগ করিয়া শর্ববর্মা তাঁহার ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়াছেন। এমতাবস্থায় আবার কৃৎপ্রকরণেরও আদ্যন্তে 'সিদ্ধি' ও 'বৃদ্ধি' শব্দের প্রয়োগদ্বারা ইহার ভিন্ন-কর্তৃত্ব সূচিত

হওয়ায়, কে ইহার প্রণেতা তাহা শিষ্যসমাজে প্রচারের উদ্দেশ্যে দুর্গসিংহ 'বৃক্ষাদি...' শ্লোকটি রচনা করেন।

এখন, আলোচ্য কৃৎপ্রকরণের দুর্গসিংহ-কথিত (বা -প্রচারিত) কর্তা এই কাত্যায়ন নামক বৈয়াকরণটি কে? সমগ্র ব্যাকরণ-সাহিত্যের ইতিহাসে এই নামে যিনি দেদীপ্যমান তিনি বররুচি কাত্যায়ন, পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিককার এবং খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীয়। পালি বৈয়াকরণ কচ্চায়ন ভিন্ন অপর কোনো বৈয়াকরণ কাত্যায়নের পরিচয় আমাদের জানা নাই। দ্বিতীয় বররুচি (ইনি 'কাত্যায়ন' নহেন), কাতন্ত্রের 'চৈত্রকূটী' বৃত্তির রচয়িতা এবং খ্রীঃ ৪র্থ/৫ম শতাব্দীয়। তিনি স্বীয় বৃত্তির প্রারম্ভে 'কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং সার্ববর্মিকম্' বলিয়া শুরু করিয়া সন্ধি হইতে কৃৎপর্যন্ত সমগ্র কাতন্ত্রের ব্যাখ্যা রচনার দ্বারা কৃদংশেরও সার্ববর্মিকত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; স্থল-বিশেষে কৃৎসূত্রের দোষপ্রদর্শনেও তিনি ত্রুটি করেন নাই। এই বৃত্তির সহিত দুর্গসিংহের সম্যক পরিচয় ছিল ; তিনি ইহার অনেক উপাদান স্বীয় বৃত্তিতে গ্রহণ করিয়াও এবং ইহাতে (অর্থাৎ চৈত্রকূটীতে) কৃৎপ্রকরণের শার্ববর্মিকত্বে সন্দেহের লেশমাত্র প্রকাশ না থাকা সত্ত্বেও কেন যে কাত্যায়নকে কৃৎপ্রকরণের রচয়িতা বলিয়া প্রচার করিলেন তাহা এক রহস্যাবৃত ব্যাপার। তিনি নিজে বা তাঁহার অনুগামীরা কেহই এই সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আলোকপাত করিয়া যান নাই। শ্রদ্ধেয় গুরুপদ হালদার এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া তাঁহার 'ব্যাকরণ-দর্শনের ইতিহাসে' (প্রাক্‌কথন, পৃঃ ৭৪) যে প্রণিধানযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা এই রূপ :

> চৈত্রকূটীতে সূত্রসম্বন্ধীয় যে সকল কটাক্ষ সৌজন্যবশতঃ প্রচ্ছন্ন ছিল, কাতন্ত্রবিভ্রমে সে সমুদায় শশিদেবকর্ত্তৃক উপবৃংহিত হয়। ইহাতে কৃৎসূত্রের সহিত চতুষ্টয়াদি সূত্রের বিরোধ আসঙ্গত্য এবং অসামঞ্জস্য (reductio ad absurdum) লইয়া গ্রন্থকার তীব্র সমালোচনা করেন। তাহার ফলে কাতন্ত্রের পঠনপাঠন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় কৃৎসূত্রের ভিন্নকর্ত্তৃকত্ব ঘোষণা করা ব্যতীত গত্যন্তর না দেখিয়া দুর্গসিংহ কাত্যায়নমুনিকে এবং কাশ্মীরদেশীয় কালাপক পণ্ডিত যোগরাজ[২২] মহর্ষি শাকটায়নকে কৃৎসূত্রকার বলেন। সন্ধি হইতে কৃৎপর্য্যন্ত সমগ্র সূত্ররাশির এককর্ত্তৃকত্ব ধরিয়া কাতন্ত্রবিভ্রমে যে

> যে সূত্রের উপর শশিদেবের শ্লেষাত্মক তীব্র কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই সেই সূত্রের ব্যাখ্যায় পরবর্ত্তী কৌমারগণ তদুত্তরে লিখিতে আরম্ভ করেন—'অথ কৃল্লক্ষণনিরপেক্ষমিদং সূত্রম্' (দৌর্গটীকা—চ ১৮৮, কৃৎ ৫৬), 'কৃতমনপেক্ষ্য সর্ব্ব-বর্ম্মণা বিরচিতমিদমিতি ন দুষ্যতি...' (ঐ আ. ১৭০, কৃৎ ৫৯), 'ন হি শর্ব্ববর্ম্মণো বচনং হি তৎ' (ঐ চ ৩২৬, কৃৎ ৪৩৯), 'ঘসি গ্রহণেনাখ্যাতিকপ্রকরণং নিয়ম্যতে, ন কৃৎপ্রকরণম্, ভিন্ন-কর্ত্তৃকত্বাৎ' (বিল্বটীকা-আ. ৩৮৯), 'শর্ব্ববর্ম্মণা কৃল্লক্ষণং ন কৃতম্' (টীকা ও পঞ্জী আ. ১২৫, কৃৎ ৩৮৬, ৪০৭), ইত্যাদি।

মোটকথা, কোন কোন কৃৎসূত্রের সহিত অন্যান্য প্রকরণের সূত্রঘটিত বিরোধ পরিহারের জন্যই দুর্গসিংহ কৃৎপ্রকরণের কর্তৃকত্ব কাত্যায়নে আরোপ করিয়াছেন। অথচ এই ঐতিহ্যবিরোধী মিথ্যা প্রচার করিতে গিয়া সাধ্যমত কৌশলের আশ্রয় লইয়াও তিনি সর্বথা শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই, অন্ততঃ এক স্থানে নিজ পরিকল্পনা-বিরোধী সত্য কথাটি বলিয়া ফেলিয়াছেন। স্থলটি পূর্বোক্ত হালদার মহাশয় কর্তৃকই লক্ষিত ঃ

> ...কৃৎসূত্রে ভিন্ন কর্ত্তৃত্ব ঘোষণা বৃত্তিকার দুর্গসিংহের মুখে কখনই সুশোভন নহে, কারণ চতুষ্টয়ের 'তুমর্থাচ্চ ভাববাচিনঃ' (২৩৪) সূত্রের বৃত্তিতে বররুচি-শশিদেবাদির ন্যায় তিনিও সর্ব্ববর্ম্মাকে কৃৎসূত্রকার বলিয়াছেন। তথায় লিখিত আছে—'তুমা সমানার্থভাববাচিপ্রত্যয়ান্তাল্লিঙ্গাচ্চতুর্থী ভবতি। ''ভাববাচিনশ্চে''তি বক্ষ্যতি।' 'ভাববাচিনশ্চ' অর্থাৎ ৩১৫ সংখ্যক কৃৎসূত্র। এখানে 'বক্ষ্যতি' ক্রিয়ার কর্ত্তা 'তুমর্থাচ্চ ভাববাচিনঃ' সূত্রপ্রণেতা সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য।—ঐ পৃঃ ৭৬

কাত্যায়ন ও শর্ববর্মার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কমপক্ষে প্রায় চারিশত বৎসরের। কাজেই কাত্যায়নের ৪০০ বৎসর পরে রচিত শার্ববর্মিক কাতন্ত্রের পরিপূরক কৃৎপ্রকরণ যে কাত্যায়ন-প্রণীত হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াই হয়তো 'কাত্যায়নেন বর-রুচিনা তে কৃতঃ কৃতাঃ সৃষ্টাঃ' (দুর্গটীকা) এবং 'কাত্যায়নেন বররুচিনা' (পঞ্জী) ইত্যাদির অনুসরণে 'কলাপতত্ত্বার্ণব'কার রঘুনন্দন লিখিয়াছেন ঃ

> ননু কাত্যায়নমুনেরয়ং গ্রন্থস্তৎ কথং বররুচিনা কৃতমিতি। সত্যং কাত্যায়নো মুনির্বররুচিশরীরং পরিগৃহ্য শাস্ত্রমিদং প্রাণৈষীদিতি কিংবদন্তী।

হরিরাম শর্মাও তাঁহার 'কৃদ্‌ব্যাখ্যাসারে'র প্রারম্ভে লিখিয়াছেন ঃ

> কতস্যাপত্যং কাত্যস্তস্য প্রশস্তাপত্যং কাত্যায়নো মুনির্বররুচি-শরীরং পরিগৃহ্য শাস্ত্রমিদং কৃতবানিতি লোকশ্রুতিঃ।

ইহাকে 'গোঁজামিল' বলিলে বোধ হয় অন্যায্য হইবে না। এক দিকে দুর্গসিংহ-বাক্যের মর্যাদারক্ষা, অপর দিকে তাহাতে সময়ের অলঙ্ঘ্য বাধা—এই দুই-এর সামঞ্জস্য করিতে, রঘুনন্দনের ব্যবস্থায়, কাত্যায়নকে মরিয়া (৭০০ বৎসর পরে) বররুচি-রূপে জন্মিতে হইল, কাতন্ত্রব্যাকরণের (কেবল বৃত্তিই নয়) কৃৎপ্রকরণ রচনার জন্যও! এই বররুচি প্রকৃত পক্ষে শর্ববর্মার তিন শত বৎসর পরে কৃৎসহ সমগ্র কাতন্ত্রের যে চৈত্রকূটী বৃত্তি রচনা করেন তাহার বহুস্থানে কাত্যায়নের বার্ত্তিকপাঠ হইতে বার্ত্তিক উদ্ধৃত করিয়া কৃৎপ্রকরণের বহু সূত্রের এবং অন্যান্য প্রকরণেরও একাধিক সূত্রের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং কৃৎপ্রকরণের প্রণেতা হইলে তাঁহার পক্ষে ঐরূপ করা অস্বাভাবিক ; পরন্তু কাত্যায়ন উহার রচয়িতা হইলে উহাতে তাঁহারই বার্ত্তিক উল্লেখপূর্বক সমালোচনা চলিতে পারে এমন ত্রুটি রাখিয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষেও অসম্ভব। [কাত্যায়ন (= বররুচি কাত্যায়ন) এবং বররুচি যথাক্রমে খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ এবং খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীয়।]

বৃহৎ কথাকে উপজীব্য করিয়া রচিত কথাসরিৎসাগরাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কাত্যায়ন বর্ষ নামক গুরুর নিকট প্রথমে ঐন্দ্র ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে শিবানুগৃহীত পাণিনির সহিত ব্যাকরণ-বিচারে তিনি মহাদেবেরই প্রতিকূলতায় পরাজিত হইয়া ঐন্দ্র ব্যাকরণ বিস্মৃত হন এবং পাণিনির ব্যাকরণের পরিপূরক বার্ত্তিকপাঠ রচনা করেন। তৎপূর্বে, ঐন্দ্র ব্যাকরণের কোনও গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন কিনা সেই সম্বন্ধে ঐ সব আখ্যায়িকা একেবারেই নীরব। কেবল গরুড়পুরাণে কুমার কার্ত্তি-কেয়-কর্তৃক কাত্যায়নের নিকট কথিত ব্যাকরণের শেষে পাওয়া যায় ঃ

> সুপ্‌তিঙন্তং সিদ্ধরূপং নামমাত্রেণ দর্শিতম্।
> কাত্যায়নঃ কুমারাত্তু শ্রুত্বা বিস্তরমব্রবীৎ।। ২১০।৩১

কেবল ইহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিত বলা যায় না যে, কাত্যায়ন কোনও অপাণিনীয় ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কাজেই তৎপ্রণীত সেইরূপ কোনও গ্রন্থ হইতে কৃদংশটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরে শার্ববর্মিক কাতন্ত্রের শেষে যোজনা করা হইয়াছে—এমন অনুমানও

নিতান্তই কল্পনা-বিলাসমাত্র। বার্ত্তিকরচনার পূর্বে তিনি যে শুক্লযজুঃ-প্রাতিশাখ্য (বা বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য) রচনা করিয়াছিলেন তাহার সহিত অবশ্য আলোচ্য কৃৎপ্রকরণজাতীয় রচনার কোন সম্পর্ক নাই। এই অবস্থায়, কৃৎপ্রকরণের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে কোনও স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর নয়। সম্ভবতঃ শর্ববর্মা নিজেই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারে ইহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং পরে প্রক্ষেপণাদির দ্বারা ইহার কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তাই ইহার কোন কোন স্থলে পূর্ব প্রকরণ সমূহের সূত্রাবলীর সঙ্গে অসঙ্গতি বা অন্যবিধ দোষ দৃষ্ট হয়। আবার কাহারও মতে শর্ববর্মা আখ্যাতান্তক কাতন্ত্ররচনার বেশ কিছুকাল পরে কৃৎপ্রকরণ প্রস্তুত করেন বলিয়াই স্থলবিশেষে ঐ রূপ বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। হালদারমহাশয় এই মতের পক্ষপাতী।

বেশী পুরাতন কালের কথা নয়, এখন হইতে কয়েক শত বৎসর আগেও মুখ্যতঃ যে তিনটি কারণে ত্রুটিহীন ('নির্ভেজাল') সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সহজ ছিল না, তাহাদের প্রথমটি ঐতিহাসিক সময়জ্ঞানের অভাব, দ্বিতীয়টি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বা উপাদানের অভাব এবং তৃতীয়টি সাম্প্রদায়িক আনুগত্য বা গোঁড়ামি। বলা বাহুল্য এই তৃতীয় বা শেষেরটিই সর্বাধিক মারাত্মক। ধর্মীয় ক্ষেত্রের ন্যায় শাস্ত্রীয় ক্ষেত্রেও এই সম্প্রদায়প্রীতি চিরকাল ঐতিহাসিক সত্যকে মসীলিপ্ত করিয়া আসিয়াছে। অনেক প্রতিভাবান বুদ্ধিমান পণ্ডিতও সাম্প্রদায়িক অনুরোধে অনেক সময়ে কেবল যে সত্যকে চাপিয়া গিয়াছেন তাহাই নয়, পরম্পরাগত মিথ্যাকেও জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, যেমন পূর্বোক্ত রঘুনন্দনের সিদ্ধান্তে হরিরামের সমর্থন। বৌদ্ধ পণ্ডিত সুভূতিচন্দ্র কালাপক বিধায় (?) দুর্গসিংহের মতানুসরণে অমরকোষের 'কামধেনু' টীকায় আলোচ্য কৃৎখণ্ডকে কাত্যায়ন-প্রণীত বলিয়াছেন : 'পদরুজ বিশস্পৃশোচাংঘঞ' ইতি কাতন্ত্রব্যাকরণে কাত্যায়নসূত্রম্। এই সূত্রটি কৃৎপ্রকরণের ৫ম পাদের ১ম সূত্র। ১১৭২ খ্রীঃ রচিত 'দুর্ঘটবৃত্তি'তে (৪।৩।৮৭, ৮।৪।১৩) শরণদেব সুভূতির উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বে (৩।১।২১) 'আত্মোদরকুক্ষিষু ভৃঞঃ খ চ'—ইতি কাতন্ত্রে বররুচিসূত্রম্—বলিয়া যে কৃৎসূত্রটির উল্লেখ করিয়াছেন তাহার বর্তমান রূপ দাঁড়াইয়াছে 'আত্মোদরকুক্ষিষু ভৃঞঃ খিঃ' (৩।২৯)। সুভূতি ও সর্বানন্দ উভয়েই বাঙ্গালী কালাপক পণ্ডিত

এবং খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীয়। কালক্রমে সূত্রের কোনও রূপ পরিবর্তন যে সেই ব্যাকরণের ঐতিহ্য তথা প্রামাণ্যের গৌরব বৃদ্ধি করে না তাহা সহজেই অনুমেয়। এক মাত্র পাণিনিতন্ত্র ব্যতীত অন্য খুব কম ব্যাকরণই এই ক্ষেত্রে অটুট গৌরবের অধিকারী এবং এই জন্যই পাণিনি চিরকালের 'প্রমাণভূত আচার্য' এবং তাঁহার 'ছন্দোবৎ সূত্রাণি ভবন্তি।'

(৬)

কাতন্ত্রব্যাকরণের উপর ঐন্দ্র ব্যাকরণ এবং প্রাতিশাখ্যাদির প্রভাবের কথা পূর্বে নামমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। ঐন্দ্র ব্যাকরণের ধারা অতি প্রাচীন, সম্ভবতঃ আদিম। ব্যাকরণের আদিতে বর্ণসমূহের উপস্থাপনার প্রাচীন রীতি এই ব্যাকরণ-ধারার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সম্প্রদায়ের নামাঙ্কিত কোনও স্বতন্ত্র গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। তাই এই ধারাগত বৈশিষ্ট্যগুলির কতটা কিভাবে কাতন্ত্রে অনুসৃত, তাহা বলা অসাধ্য। তিব্বতী ঐতিহ্যানুসারে বৌদ্ধদের ঐন্দ্র ব্যাকরণ অর্থাৎ ইন্দ্রগোমিরচিত ব্যাকরণের ভিত্তিতেই নাকি কাতন্ত্র রচিত হয়। এই ইন্দ্রগোমীর ব্যাকরণও বহু পূর্বেই লুপ্ত হইয়াছে। আবার কাহারও মতে ইহারই অনুকরণে রচিত 'সমন্তভদ্র' ব্যাকরণ হইতে প্রচুর উপাদান কাতন্ত্রে তথা দৌর্গ বৃত্তি-টীকায় প্রবেশ করিয়াছে। এই 'সমন্তভদ্র'ও এখন আর পাওয়া যায় না। তাই এইসব মত কত দূর সত্য তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখার উপায় নাই। তবে এই দুই ব্যাকরণও যে প্রাচীন ঐন্দ্র-প্রভাবমুক্ত ছিল না, এমন অনুমান করিতে বাধা নাই।

খ্রীঃ ৬ষ্ঠ/৭ম শতাব্দীয় ভট্টার হরিচন্দ্র তৎকৃত চরকব্যাখ্যায় 'অথ বর্ণসমূহঃ' সূত্রটি ঐন্দ্র ব্যাকরণের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানে বর্ণমালা প্রদর্শনের পূর্বে এই সূত্রাত্মক বাক্যটির নিঃসন্দেহে কল্পনা করা চলে। ইহার সহিত তুলনীয় তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের প্রথম সূত্র 'অথ বর্ণসমাম্নায়ঃ'। কাহারও মতে 'বর্ণা অক্ষরাণি'—ঐন্দ্র ব্যাকরণের আর এক সূত্র, প্রাপ্তিস্থল মহাভাষ্যের কৈয়ট-রচিত টীকা। মহাভাষ্যের প্রত্যাহারাহ্নিকের উপান্তে ৭।৮ প্রত্যাহার-সূত্রের প্রসঙ্গে উদ্ধৃত কাত্যায়নের শ্লোকবার্ত্তিকের অন্তর্গত 'বর্ণং বাহুঃ পূর্বসূত্রে' কথার ভাষ্যে পতঞ্জলির উক্তি ঃ 'অথবা পূর্বসূত্রে বর্ণস্যাক্ষরমিতি সংজ্ঞা ক্রিয়তে' (১।১।২ আহ্নিক)। ইহার 'প্রদীপ' টীকায় কৈয়ট লিখিলেন ঃ 'পূর্বসূত্রে। ব্যাকরণান্তরে বর্ণা অক্ষরাণীতি বচনাৎ।' প্রকৃত পক্ষে এখানে 'পূর্বসূত্র'

দ্বারা কাত্যায়ন-রচিত বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্যের 'বর্ণো বা' (৮।৪৫) সূত্রটি উপলক্ষিত। ইহার ভাষ্যে আবার উব্বট লিখিয়াছেন ঃ 'বর্ণসমুদায়ো বা বর্ণো বা অক্ষরং ভবতি।' কাজেই বার্ত্তিকোক্ত 'পূর্বসূত্র' যে বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য-সূত্র এবং তাহা যে বার্ত্তিকরচনার পূর্বেই রচিত ইহাতে সন্দেহ নাই। কাতন্ত্রের 'লোকোপচারাদ্‌গ্রহণসিদ্ধিঃ' (সন্ধি ২৩) সূত্রটি ঐন্দ্র ব্যাকরণের 'সিদ্ধিরনুক্তানাং রূঢ়েঃ' সূত্রের অনুকরণে রচিত বলিয়া অনুমিত। মহেশ্বর-রচিত 'শব্দভেদপ্রকাশে'র টীকায় (১৫৯৮ খ্রীঃ) টীকাকার জৈন বিমলমতি (বা জ্ঞানবিমলগণি) সূত্রটিকে ঐন্দ্র ব্যাকরণের প্রথম সূত্র বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে এই ঐন্দ্র প্রাচীনতম ঐন্দ্র ব্যাকরণ কি না সন্দেহস্থল।

কি সূত্ররচনায়, কি সংজ্ঞার ব্যবহারে প্রাতিশাখ্যসমূহের, বিশেষতঃ তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ি প্রাতিশাখ্য দুইটির সহিত কাতন্ত্রের তদ্‌গত প্রভূত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। প্রাতিশাখ্যগুলি অদ্যাপি বিদ্যমান থাকায় এই সমতা লক্ষ্য করা সহজ হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি স্থল ঃ

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে	কাতন্ত্রব্যাকরণে
'একারোঽয়ম্' (৯।১১)...	'এ অয়্' (১।২।৩৫)
'ঐকার আয়ম্' (৯।১৪)...	'ঐ আয়্' (১।২।৩৬)
'ওকারোঽবম্' (৯।১২)...	'ও অব্' (১।২।৩৭)
'ঔকার আবম্' (৯।১৫)...	'ঔ আব্' (১।২।৩৮)

বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্যে	কাতন্ত্রব্যাকরণে
'ব্যঞ্জনং কাদি'(১।৪৭)...	'কাদীনি ব্যঞ্জনানি' (১।১।৯)
'ছছয়োঃ শম্' (৩।৭, ১৩৪)...	'নোঽন্তশ্চছয়োঃ শকারমনুস্বারপূর্বম্' (১।৪।৫৩
	'বিসর্জনীয়শ্চেছে বা শম্' (১।৫।৬২)
'তথয়োঃ সম্' (৩।৮, ১৩৫)...	'তথয়োঃ সকারম্' (১।৪।৫৫) এবং
	'তে থে বা সম্' (১।৫।৬৪)
'শকারে চ' (৪।৯৭)...	'চং শে' (১।৪।৫১)
'অন্ত্যাদ্ বর্ণাৎ পূর্ব উপধা' (১।৩৫)...	'অন্ত্যাৎ পূর্ব উপধা' (২।১।১১)
'উবর্ণ ওকারম্' (৪।৫৫)...	'উবর্ণে ও' (১।২।২৬)
'পঞ্চমে পঞ্চমাম্' (৪।১২০)...	'পঞ্চমে পঞ্চমাংস্তৃতীয়ান্ন বা' (১।৪।৪৭)

[উভয়ত্রই ৯৯ (দীর্ঘ ৯)-কারের ব্যবহার স্বীকৃত, পাণিনির ব্যাকরণে অস্বীকৃত]

চতুরধ্যায়িকায় বা অথর্ববেদপ্রাতিশাখ্যে	
'বর্ণাদন্ত্যাৎ পূর্ব উপধা' (১।৯২)...	'অন্ত্যাৎ পূর্ব উপধা' (২।১।১১)

'অবর্ণস্যোবর্ণ একারঃ' (৩।৪৪)...	'অবর্ণ ইবর্ণে এ' (১।২।২৫)
'উবর্ণ ওকারঃ' (৩।৪৫)...	'উবর্ণে ও' (১।২।২৬)
'অরমৃবর্ণে' (৩। ৪৬)...	'ঋবর্ণে অর্' (১।২।২৭)
'একারৈকারয়োরৈকারঃ' (৩।৫০)...	'একারে ঐ ঐকারে চ' (১।২।২৯)
'ওকারৌকারয়োরৌকারঃ' (৩।৫১)...	'ওকারে ঔ ঔকারে চ' (১।২।৩০)

ঋক্প্রাতিশাখ্যে

'পঞ্চ তে পঞ্চবর্গাঃ' (১।৮)...	'তে বর্গাঃ পঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ' (১।১।১০)

এইরূপ সাদৃশ্য আরও অনেক দেখানো যাইতে পারে। ইহা হইতে অবশ্য এমন সিদ্ধান্ত করা ঠিক হইবে না যে, কাতন্ত্রকার সরাসরি প্রাতিশাখ্য হইতেই কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সহকারে স্বীয় ব্যাকরণের জন্য সূত্রগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মূলতঃ প্রাচীন ঐন্দ্র ব্যাকরণের সরল-স্বাভাবিক ধারাটি এই সব প্রাতিশাখ্য এবং কাতন্ত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বলিয়াই সর্বত্র এই সাদৃশ্য। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ভিন্ন অন্যত্র প্রায় কোথাও এই ধারা ব্যাহত হয় নাই। পরবর্তী পালি, প্রাকৃত এবং দেশজ ভাষার ব্যাকরণগুলিতেও এই ধারার অবাধ গতি। পাণিনি ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইহার অন্তর্গত বিশিষ্ট রত্নরাজিকে বিচিত্র ভঙ্গিমায় বিন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। ফলে পরবর্তীকালে শার্ববর্মিক কাতন্ত্রও যে ঐ সঞ্চিত রত্নাধার হইতে যথেষ্ট গ্রহণ করিয়াছিল তাহা সুপ্রমাণিত। এই গ্রহণ বলিতে অবশ্যই পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলি-লক্ষিত 'ত্রিমুনি'ব্যাকরণ হইতে গ্রহণ বুঝিতে হইবে।

বার্নেল সাহেবের (A.C.Burnell) মতে 'প্রাচাম্' পদযুক্ত পাণিনির ৩।৪।১৮, ৪।১।৪৩, ৪।১।১৬০, ৫।৩।৮০, ৫।৩।৯৪, ৫।৪। ১০১ এবং ৮।২।৮৬ সংখ্যক সূত্রগুলি ঐন্দ্র ব্যাকরণ হইতে গৃহীত। তাঁহার মতে প্রাচাম্ অর্থে প্রাক্‌কালীন, প্রাচ্য দেশীয় বৈয়াকরণ নয়। তিনি এই সাতটি সূত্রের 'প্রাচাম্'-পদ-রহিত সত্তা কাতন্ত্রেও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা, ঐন্দ্র ব্যাকরণে 'গণ' শৈলীর প্রয়োগ ছিল না, কিন্তু শার্ববর্মিক কাতন্ত্রে পাণিনিপ্রভাবাৎ কিছু কিছু সেই বস্তু প্রবেশ করিয়াছে। ইহার আখ্যাতান্ত ভাগে পাণিনীয় স্বস্রাদি (কাতন্ত্রে ২। ১।৬৯), গর্গাদি, যস্কাদি, বিদাদি (কাতন্ত্রে ২।৪।৬), কুঞ্জাদি (কা. ২। ৬।৩), বাহ্বাদি (কা. ২।৬।৬), গবাদি (কা. ২।৬।১১) এবং শরৎ প্রভৃতি (কা. ২।৬।৪১-২) গণ কয়টি সর্বথা অভিন্নরূপে স্বীকৃত।

কাতন্ত্রের সর্বাদিগণের পাঠক্রম, পাণিনির সর্বাদি হইতে ভিন্ন। পাণিনীয় গৌরাদি গণ কাতন্ত্রে 'নদাদি' নামে (২।৪।৫০) স্থান পাইয়াছে। পাণিনীয় নন্দ্যাদি, গ্রহাদি, পচাদি, গম্যাদি, ভিদাদি, ভীমাদি ও ন্যঙ্ক্বাদিগণ অপরিবর্তিত আকারে কাতন্ত্রের কৃদন্তভাগে যথাক্রমে ৪।২।৪৯, ৫০, ৪৮, ৪।৪।৬৮, ৪।৫।৮২, ৪।৬।৫১, ৫৭ সূত্রে দৃষ্ট হয়। কাতন্ত্রের অর্বাচীন ছন্দঃপ্রক্রিয়াতেও পাণিনীয় কেবলাদি, কদ্ম্রাদি, ছন্দোগাদি ও সোমাদি গণ বর্তমান।

তথাপি পাণিনির সহিত কাতন্ত্রের পার্থক্য মূলতঃ স্বাভাবিকতায় এবং সামান্যে। পাণিনির উদ্দেশ্য নানা কৌশলে সংস্কৃত ভাষা-বিজ্ঞান প্রদর্শন, আর কাতন্ত্রের উদ্দেশ্য যতদূর সম্ভব সহজ ভাবে ঐ ভাষা শিক্ষা দেওয়া। উভয়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এইখানে। তাই পাণিনি ভাষার বিশেষ বিশেষ স্থল বা ব্যতিক্রমগুলির উপর যত বেশী জোর দিয়াছেন, শর্ববর্মা তত বেশী চেষ্টা করিয়াছেন ভাষার মোটামুটি সাধারণরূপটির প্রদর্শনে। এই প্রসঙ্গে কাতন্ত্রপরিশিষ্টের (৬।১০) টীকায় গোপীনাথ-কর্তৃক এবং মুগ্ধবোধের (৯২০) টীকায় দুর্গাদাস-কর্তৃক 'তথা চ বর্ধমানঃ' বলিয়া উদ্ধৃত কারিকা দুইটি লক্ষণীয়ঃ

> ইহ লৌকিকবাক্যেষু ব্যভিচারোঽতিপুষ্কলঃ। বেদবাক্যেষ্ যদ্যস্তি নিয়মঃ কেন বার্যতে।। বিশেষঃ পাণিনেরিষ্টঃ সামান্যং সর্ববর্মণঃ। সামান্যমনুগৃহ্লাতি তত্রাচার্যপরম্পরা।।

তাই 'বিশেষ' এবং 'সামান্য' (অবিশেষ বা সাধারণ) লইয়া যথাক্রমে পাণিনি ও শর্ববর্মার কার্য। আচার্যপরম্পরায় কিন্তু ঐ সামান্য (= সাধারণ) ধারাটিই গৃহীত হইয়া প্রচলিত থাকে, যদিও সামান্য শাস্ত্র অপেক্ষা বিশেষ শাস্ত্র বলবান হইয়া দেখা দেয়, যেমন সামান্য বিধি অপেক্ষা বিশেষ বিধিই বলবান ঃ 'সামান্যশাস্ত্রতো নূনং বিশেষো বলবান্ ভবেৎ' (সারস্বত ব্যাকরণবচন)। কাতন্ত্রের ৩।১।৭৯ সূত্রের কলাপচন্দ্রে অন্বর্থসংজ্ঞক আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া সুষেণ বিদ্যাভূষণ পাণিনিতন্ত্রের প্রাধান্য হইতে শর্ববর্মার সম্প্রদায়গত পার্থক্য রক্ষার জন্যই যেন বলিয়াছেন ঃ

> পরস্মৈ পদ্যতে যস্মাৎ তৎ পরস্মৈপদং স্মৃতম্। আত্মনে পদ্যতে যস্মাৎ তদেবাত্রাত্মনে পদম্।। ইত্থমন্বর্থসংজ্ঞায়া বিধানেনৈব লভ্যতে। মতং হি পাণিনেরেব সম্মতং সর্ববর্মণঃ।। নৈবমন্বর্থ-

সংজ্ঞায়াঃ প্রায়োবৃত্তিরিহেষ্যতে। অতো ন পাণিনেঃ সূত্রং সম্মতং সর্ববর্মণঃ।।

অর্থাৎ কাতন্ত্রে পরার্থে পরস্মৈপদ এবং আত্মার্থে আত্মনেপদ এইরূপ অন্বর্থ বা সার্থক সংজ্ঞার ব্যবহার দেখিয়া এমন মনেকরা অসম্ভব নয় যে, সর্ববর্মা পাণিনির মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু তাহা নয় ('মৈবম্'), কারণ কাতন্ত্রে প্রায়শঃ অন্বর্থ সংজ্ঞারই ব্যবহার করা হইয়াছে, অতএব পাণিনির সূত্রে বা সূত্রগ্রহণে সর্ববর্মার সম্মতি নাই বা প্রয়োজন নাই।

কোনো কালের কোনো ব্যাকরণই নিজ বৈশিষ্ট্যরূপে আত্যন্তিক নিরপেক্ষতার গৌরব দাবী করিতে পারে না। প্রত্যেক শাস্ত্রই তৎ-সম্পর্কিত পূর্ব পূর্ব গ্রন্থাদির দ্বারা অর্থাৎ উহাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক মতামতের দ্বারা ন্যূনাধিক প্রভাবান্বিত হইতে বাধ্য। তাই কেবল কাতন্ত্রই নয়, কাতন্ত্রের দ্বারাও তৎ-পরবর্তী হৈম, মুগ্ধবোধ, হরিনামামৃত, প্রয়োগরত্নমালা প্রভৃতি ব্যাকরণও কম-বেশী প্রভাবান্বিত হইয়াছে। কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণই নয়, তামিল, কানাড়ি, পালি প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণে, এমন কি বাঙ্গালা ভাষার প্রাথমিক ব্যাকরণ তথা 'বাল্য শিক্ষা' জাতীয় গ্রন্থে কাতন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তামিল ও কানাড়ি ব্যাকরণের অনেক পরিভাষা ও সংজ্ঞা, প্রাতিশাখ্য ও কাতন্ত্রের সংজ্ঞাপরিভাষাদির অনুরূপ। বিষয়বস্তুর বিন্যাসও অনেকটা কাতন্ত্রের ন্যায়। তোল্‌কাপ্পিয়র-রচিত 'তোল্‌কাপ্পিয়ম্'* নামক তামিল ব্যাকরণ নাকি ঐন্দ্র পদ্ধতিতে রচিত। তোল্‌কাপ্পিয়মের প্রতিসংস্কৃত এবং পরিবর্ধিত রূপ সর্বাধিক জনপ্রিয় 'নন্নূল' ব্যাকরণও কাতন্ত্রিক রীতির খুব নিকটবর্তী এবং তোল্‌কাপ্পিয়মের তুলনায় অধিক সংস্কৃত শব্দবহুল। কেশীরাজ বা কেশব-রচিত কানাড়ি ব্যাকরণ 'শব্দমণিদর্পণ' এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। কাশ্মীরের আধুনিক ব্যাকরণও কাতন্ত্রের ভিত্তিতে রচিত। মারাঠী ভাষার ব্যাকরণ বাঙ্গালা ব্যাকরণ অপেক্ষা সংস্কৃত ব্যাকরণের অধিকতর নিকটবর্তী। মারাঠীতে শব্দের লিঙ্গনির্দেশ অবিকল সংস্কৃতের মতো।

বিভিন্ন ব্যাকরণে সংজ্ঞাসমূহের ব্যবহারে বা নির্বাচনে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও উহাদের ব্যাখ্যামূলক সূত্রাদির ক্ষেত্রে যে সাদৃশ্য

---

* অগস্ত্যের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম শিষ্য তোল্‌কাপ্যার (Tolkapyar)-রচিত তামিল ব্যাকরণ তোল্‌কাপ্যম্ (Tolkapyam)। অগস্ত্য নিজেও নানাবিষয়-সম্বলিত এক তামিল ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন যাহা এখন পাওয়া যায় না।

লক্ষিত হয়, তাহা পর্যালোচনা করিলেই নূতনের উপর পুরাতনের ঐ প্রভাব ধরা পড়ে। শব্দবিদ্যার প্রধানতম উপজীব্য যে 'শব্দ', তাহার কথাই ধরা যাউক। অসংজ্ঞক ব্যাকরণ চান্দ্রে যাহা 'শব্দ', তাহাই গোপথ ব্রাহ্মণে, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে, অগ্নিপুরাণে এবং সুপদ্ম ব্যাকরণে 'প্রাতিপদিক' সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত ; নিরুক্তে, বৃহদ্দেবতায়, প্রাতিশাখ্যসমূহে, হৈম ব্যাকরণে ও সংক্ষিপ্তসারে তাহাকে বলা হইয়াছে 'নাম' এবং কাতন্ত্রে ও প্রয়োগরত্নমালা ব্যাকরণে 'লিঙ্গ'। অর্থ প্রায় সর্বত্রই এক যেটুকু পার্থক্য—তাহা কেবল বর্ণনার ভাষায় এবং সেক্ষেত্রেও অন্য শাস্ত্রীয় ভাষার তুলনায় ব্যাকরণগুলির ভাষা প্রায় এক এবং অধিকতর সঙ্গত (to the point)। বৃহদ্দেবতায় 'নামে'র যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ব্যাকরণ-মূলক হইলেও সারল্যে, গভীরতায় ও ব্যাপকতায় অদ্বিতীয় ঃ

> শব্দেনোচ্চারিতেনেহ যেন দ্রব্যং প্রতীয়তে। তদক্ষরবিধৌ যুক্তং নামেত্যাহুর্মনীষিণঃ।। অষ্টৌ যত্র প্রযুজ্যন্তে নানার্থেষু বিভক্তয়ঃ। তন্নাম কবয়ঃ প্রাহুর্ভেদে বচনলিঙ্গয়োঃ।। ১।৪২-৩।।

অর্থাৎ দ্রব্যবাচক বর্ণাত্মক শব্দ (ধ্বনি)—যাহাতে বচন ও লিঙ্গভেদে নানা অর্থে প্রথমাদি আট বিভক্তি প্রয়োগ করা হয় তাহাই নাম। মীমাংসাদর্শনে (২।১।৩) বলা হইয়াছে—'যেষামুক্তৌ স্বে প্রয়োগে রূপোপলব্ধিস্তানি নামানি' অর্থাৎ যাহাদের উচ্চারণে ও প্রয়োগে (তদুদ্দিষ্ট) রূপের উপলব্ধি হয় তাহারাই নাম। এখানে পূর্বোক্ত দুই শ্লোকেরই মূলীভূত বক্তব্য যে উচ্চারণ ও প্রয়োগ, তাহা রূপোপলব্ধির ফলশ্রুতিসহ বর্তমান। নিরুক্তে (১।১০)—'সত্ত্বপ্রধানানি নামানি' এবং ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে (১২।১৮,২৫)—'তন্নাম যেনাভিদধাতি সত্ত্বম্' এবং 'সত্ত্বাভিধায়কং নাম'—নামের অস্তিত্বধর্মের বিজ্ঞাপনা ; যে শব্দ কোন কিছুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করায় তাহাই নাম ; আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ব্যাপকতা অসীম ; পূর্বোক্ত দ্রব্য-বাচকতাগুণই এখানে ব্যঞ্জিত। ভোজদেব 'শৃঙ্গার প্রকাশে' (১) লিখিলেন 'অনপেক্ষিত শব্দব্যুৎপত্তীনি সত্ত্বভূতার্থাভিধায়ীনি নামানি'—যাহাতে নামের শব্দ-প্রভবতা-এবং দ্রব্য-বাচকতা-ধর্ম বড় হইয়া উঠিয়াছে। শুদ্ধ ব্যাকরণ-সাহিত্যে নামের স্বরূপ-লক্ষণ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং জটিলতামুক্ত। পাণিনি অষ্টাধ্যায়ীর গোড়ায় (১।২।৪৫-৬) নামের জন্য ('প্রতিপদং গৃহ্নাতি...'

অর্থ) 'প্রাতিপদিক' সংজ্ঞা নির্বাচন করিয়া তাহার স্বরূপনির্দেশক সূত্র করিলেন ঃ 'অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্। কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ।' ইহা-দ্বারা কার্যতঃ চারিপ্রকার প্রাতিপদিক নির্দিষ্ট হইয়াছে ঃ মূলভূত, কৃদন্ত, তাদ্ধিতান্ত এবং সমাসজ। বার্ত্তিকে এই সংখ্যা বাড়াইয়া ৯ প্রকার করা হইল—গুণবচন, সর্বনাম, অব্যয়, তদ্ধিতান্ত, কৃদন্ত, সমাস, জাতি, সংখ্যা ও সংজ্ঞা (পা. ১।৪।১/৩৯-৪৪ বার্ত্তিক); ভোজদেব ইহাদিগকে সংহত করিয়া ৬ রকমে দাঁড়া করাইয়াছেন ঃ 'নামাব্যয়ানুকরণকৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ' (শৃ. প্রকাশ ১)। অগ্নিপুরাণে (৩৫১।২৩) পাণিনির অনুসরণে 'ধাতুপ্রত্যয়-হীনং যৎ স্যাৎ প্রাতিপদিকং হি তৎ' বলা হইলেও ইহাতে আর্থিক ভাবনা অনুক্ত। সেই তুলনায় গরুড়পুরাণের উক্তি ত্রুটিহীন ঃ 'অর্থবৎ প্রাতিপদিকং ধাতুপ্রত্যয়-বর্জিতম্' (২০৯।৩) এবং 'দ্বিবিধং প্রাতি-পদিকং নামধাতুস্তথৈব চ' (২০৯।১৭)। কাতন্ত্রে—'ধাতুবিভক্তিবর্জম-র্থবল্লিঙ্গম্' (২।১।১) ; ইহার মনোজ্ঞ ব্যাখ্যাস্বরূপই যেন 'প্রয়োগরত্নমালা' ব্যাকরণে সূত্রিত হইয়াছে ঃ 'শব্দোঽর্থবাঁল্লিঙ্গসংজ্ঞো বিভক্তিধাতুবর্জিতঃ' (১।১৬৮)। এখানে 'লিঙ্গ'ই নাম। 'অধাতুবিভক্তিবর্জমর্থবন্নাম'—এই হৈম ব্যাকরণের (১।১।২৭) সূত্রে কাতন্ত্রের প্রভাব স্পষ্ট। সুপদ্মব্যাকরণের 'অধাতুবিভক্ত্যর্থবৎ প্রাতিপদিকম্' (২।২।১) ও ইহার বৃত্তি—'ধাতু-বিভক্তিবর্জমর্থবচ্ছব্দরূপং (যৎ তৎ) প্রাতিপদিকম্'—স্থলে পাণিনি ও কাতন্ত্রের প্রভাব পড়িয়াছে। হরিনামামৃত ব্যাকরণে অনুরূপ সূত্র 'অধাতুবিষ্ণুভক্তিকমর্থবন্নাম' (১।১৪৯) ; এখানে 'বিষ্ণুভক্তি' অর্থে বিভক্তি ধরিয়া পাণিনি, কাতন্ত্র এবং হৈম-র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

শর্ববর্মা পাণিনির দুইটি সূত্রের (১।২।৪৫,৪৬) স্থলে একটি সূত্র (২।১।১) করিয়াছেন, কৃত্তদ্ধিতসমাসের লিঙ্গসংজ্ঞা-নির্দেশক কোনও পৃথক্ সূত্র করেন নাই। তবে 'ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তিঃ' ; তাই উক্ত সূত্রের দৌর্গবৃত্তির উদাহরণ ঘটিত ইঙ্গিত ধরিয়া ত্রিলোচন দাস 'কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা'য় লিখিলেন ঃ 'অন্বর্থসংজ্ঞা চেয়ং তথা চ লিঙ্গ্যতে চিহ্ন্যতেঽনেন একদেশেনার্থো গম্যতে ইতি লিঙ্গমবিস্পষ্টার্থপ্রতিপত্তি-হেতুরুচ্যতে।...তথা কৃত্তদ্ধিতসমাসানামপ্যর্থবত্ত্বাল্লিঙ্গসংজ্ঞাসিদ্ধেত্যুদাহরতি রাজপুরুষ ইত্যাদি।...অর্থবতাং শব্দানাং প্রয়োগে তদেকদেশানামপি লিঙ্গসংজ্ঞা প্রসজ্যেত' (২।১।১)। মোট কথা, 'অবিস্পষ্টার্থ' লিঙ্গসংজ্ঞার ঐকদেশিক অর্থবত্তার সহিত কৃত্তদ্ধিতসমাসান্তের আংশিক অর্থবত্তার

সমতা-হেতু উহাদেরও 'লিঙ্গসংজ্ঞা সিদ্ধা'। বলা বাহুল্য, উহাদের আংশিক অর্থবত্তার প্রয়োগ-সমবায় হইতেই 'সম্পূর্ণস্পষ্টার্থপ্রতিপাদক' বাক্যের উদ্ভব। লিঙ্গার্থ লইয়া এই সম্প্রদায়ে এই যে শ্লোকটি প্রচলিত আছে—'স্বার্থো দ্রব্যঞ্চ লিঙ্গঞ্চ সংখ্যা কর্মাদিরেব চ। অমী পঞ্চৈব লিঙ্গার্থাস্ত্রয়ঃ কেষাঞ্চিদগ্রিমাঃ।।'—তাহারই প্রতিধ্বনিস্বরূপ মুগ্ধবোধের টীকাকার রামচন্দ্র তর্কবাগীশের 'পদার্থনিরূপণ' পুস্তকে শ্রুত হয় ঃ 'জাতির্ব্যক্ত্যাকৃতী সংখ্যা তথা কর্মাদয়শ্চ ষট্। অমী পঞ্চৈব লিঙ্গার্থাঃ কেষাং তিস্রোহগ্রিমাশ্চ সঃ।।'

পাতঞ্জল মহাভাষ্যে এবং বার্ত্তিকপাঠে প্রাপ্ত বেশ কিছু সংজ্ঞার ব্যবহার কাতন্ত্রে দৃষ্ট হয়, যেমন—অদ্যতনী, কারিত, পরোক্ষা, বিকরণ, ভবিষ্যন্তী, শ্বস্তনী, সমানাক্ষর। আখ্যাতপ্রকরণে পাণিনির দশ 'ল'কারের পরিবর্তে বর্তমানা, পরোক্ষা প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রযুক্ত হইলেও লোট্ এবং বিধিলিঙ্-এর স্থানে যথাক্রমে 'পঞ্চমী' ও 'সপ্তমী'র ব্যবহারে কিন্তু পাণিনির প্রভাব পড়িয়াছে, কারণ পাণিনীয় দশ 'ল'কারের তালিকায় লোট্ এবং লিঙ্ যথাক্রমে পঞ্চম এবং সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ১৪শ অধ্যায়ে যে ব্যাকরণের উপদেশ আছে তাহাতে কাতন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উহাতে স্থানে স্থানে কাতন্ত্রের কয়েকটি সূত্রও অবিকল বিদ্যমান। নাট্যের 'অনুরূপ বাগ্' বিষয়ে যত্ন শিক্ষা দিতে গিয়া ব্যাকরণের প্রাথমিক জ্ঞানের অবতারণা করা হইয়াছে ঃ

> বাঙ্ময়ানীহ শাস্ত্রাণি বাঙ্নিষ্ঠানি তথৈব চ। তস্মাদ্ বাচঃ পরং নাস্তি বাগ্ হি সর্বস্য কারণম্।। নামাখ্যাতনিপাতৈরুপসর্গ-সমাসতদ্ধিতৈর্যুক্তঃ। সন্ধিবিভক্তিনিযুক্তো বিজ্ঞেয়ো বাচিকাভিনয়ঃ।। ...ব্যঞ্জনানি স্বরাশ্চৈব সন্ধয়শ্চ বিভক্তয়ঃ। নামাখ্যাতোপসর্গাশ্চ নিপাতাস্তদ্ধিতাস্তথা।।...অকারাদ্যাঃ স্বরা জ্ঞেয়া ঔকারান্তাশ্চতুর্দশ। হকারান্তানি কাদীনি ব্যঞ্জনানি বিদুর্বুধাঃ।।...দ্বৌ দ্বৌ বর্ণৌ তু বর্গাদৌ শষসাশ্চ ত্রয়োঽপরে। অঘোষা ঘোষবন্তস্তু ততোঽন্যে পরিকীর্তিতাঃ।।...য ইমে স্বরাশ্চতুর্দশনির্দিষ্টাস্তত্র বৈ দশ সমানাঃ। পূর্বোহ্রস্বস্তেষাং পরশ্চদীর্ঘো বিধাতব্যঃ।। এভির্ব্যঞ্জনযুক্তৈর্নামাখ্যা-তোপসর্গনিপাতৈঃ। তদ্ধিতসন্ধিবিভক্তিভিরধিষ্ঠিতঃ শব্দ ইত্যুক্তঃ।।
> ১৪।৩-২১।।

উপরের 'কাদীনি ব্যঞ্জনানি', 'দশ সমানাঃ' এবং 'পূর্বো হ্রস্বঃ'—যথাক্রমে কাতন্ত্রের সন্ধিপ্রকরণের ৯,৩ এবং ৫ নং সূত্র। 'পরশ্চ দীর্ঘঃ'ও ঐ প্রকরণের 'পরোদীর্ঘঃ' এই ৬ নং সূত্রকে মনে করাইয়া দেয়। তা'ছাড়া উল্লিখিত সংজ্ঞা এবং বর্ণনারীতিও কাতন্ত্রপ্রভাবিত। নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল লইয়া মতদ্বৈধ আছে। তদনুসারে খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় ২য় শতক পর্যন্ত চারিশত বৎসরের মধ্যবর্তী কোনও সময়ে ইহা প্রণীত হইয়াছিল। উপরিলক্ষিত প্রমাণের ভিত্তিতে খ্রীঃ ২য় শতাব্দী নাগাদ ইহার রচনাকাল অনুমান করা চলে অবশ্য যদি ঐ সব উপাদান শার্ববর্মিক কাতন্ত্র হইতেই কেবল গৃহীত হইয়াছে ধরিয়া লওয়া হয়।

(৭)

কাতন্ত্রের সূত্রসংখ্যা, বিন্যাসক্রম বা সূত্রপাঠ সর্বত্র এক রূপ নয়। Eggeling সাহেবের সংস্করণে (১৮৭৪) কৃদংশবাদে কাতন্ত্রের সূত্রসংখ্যা দেখানো হইয়াছে ৮৫৫, ঢাকা সংস্করণে (১৮৯৬) ৮৫৪ এবং শ্রীপাদকৃষ্ণ বেল্‌বল্‌করের মতে ৮৫৫। ইহার সহিত তমাদি সূত্র ৩৩, রাজাদি সূত্র ৬৬, রুচাদি সূত্র ৬৬ এবং কৃৎপ্রকরণের ৫৪৬ সূত্র যোগ করিয়া মোট সূত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৬৬।

কৃৎসহ সমগ্র কাতন্ত্রে মোট ২৫ পাদ—সন্ধিপ্রকরণে ৫, নামচতুষ্টয়ে ৬, আখ্যাতে[২৩] ৮, এবং কৃৎপ্রকরণে ৬। নিপাতপাদ, স্ত্রীপ্রত্যয়-পাদ এবং উণাদিপাদ—দৌর্গবৃত্তিযুক্ত কাতন্ত্রের সূত্রপাঠে নাই, কিন্তু কাশ্মীর দেশীয় সূত্রপাঠে আছে। সম্ভবতঃ ইহা লক্ষ্য করিয়াই বৃত্তিকার দুর্গসিংহ 'লোকোপচারাদ্‌গ্রহণসিদ্ধিঃ' (১।১।২৩) সূত্রের শরণাপন্ন হইয়া ইহার বৃত্তিভাগে লিখিয়াছেন—'লোকানামুপচারো ব্যবহারঃ। তস্মাদনুক্তস্যাপি গ্রহণস্য সিদ্ধির্বেদিতব্যেতি নিপাতাব্যয়োপসর্গকারককাল-সংখ্যালোপাদয়ঃ' অর্থাৎ এই ব্যাকরণে নিপাত, অব্যয়, উপসর্গ, কারক, কাল, সংখ্যা, লোপ প্রভৃতি যে সব বিষয়ের জন্য অতিরিক্ত সূত্র রচনা করা হয় নাই, সেই-সব লৌকিক ব্যবহার হইতে জানিতে হইবে। ইহা ছাড়া, 'যল্লক্ষণেনানুৎপন্নং তৎসর্বং নিপাতনাৎ সিদ্ধম্' (কৃৎ ১।২৯, ২।৪৫) এই ন্যায় তো আছেই।

কাতন্ত্রের এই অপূর্ণতা-জনিত ত্রুটি দূর করিয়া ইহাকে পাণিনি প্রভৃতি অন্য ব্যাকরণের সমকক্ষ করিবার জন্য দৌর্গ সম্প্রদায়ে বিভিন্ন

সময়ে যে প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছে, তাহার ফলে ইহার সূত্রসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শ্রীপতিদত্তরচিত 'কাতন্ত্রপরিশিষ্টে'র ৭৩০টি সূত্র, সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশকৃত 'কাতন্ত্রতদ্ধিতপরিশিষ্টে'র ৬২৬টি সূত্র এবং চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত 'কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ প্রক্রিয়া'র ৫২২টি সূত্র, পূর্বোল্লিখিত ১৫৬৬ সূত্রের সহিত যোগ করিলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪৪৪। ইহা ছাড়া দুর্গসিংহ-রচিত ২৬৭টি উণাদি সূত্র আছে ; কোথাও এই সংখ্যা বাড়িয়া ৩৯৯ পর্যন্ত উঠিতে দেখা যায়। আরও আছে—'অবর্ণকবর্গবিসর্জনীয়াঃ কণ্ঠ্যাঃ' ইত্যাদি শিক্ষাসূত্র ১০ (যে সংখ্যা কলাপের গুরুনাথ বিদ্যানিধিসংস্করণে দেখা যায় ১১), গুরুনাথ-সম্পাদিত ঐ সংস্করণে ১১৮ পরিভাষাসূত্র (কোথাও ইহাদের সংখ্যা ৭৮, কোথাও বা ৬৬) এবং 'বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্' ইত্যাদি ২৯টি বলাবলসূত্র। কাতন্ত্রের ধাতুপাঠ আর এক পৃথক্ পুস্তক। বলা বাহুল্য, এই সবের অনেক কিছুই শর্ববর্মার রচিত নয়। তাঁহার 'ঈষৎতন্ত্র' ব্যাকরণের এই ক্রমবর্ধিত পরিণতি ব্যাকরণ-সাহিত্যের ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় ঘটনা।

কাতন্ত্রের বিষয়বিন্যাস যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক অর্থাৎ ভাষাশিক্ষার অনুকূল হইলেও ইহার সূত্রবিন্যাস সর্বত্র তদনুরূপ সুষ্ঠু নয়। সমগ্র কাতন্ত্রে সন্ধিপ্রকরণ অপেক্ষাকৃত নিখুঁত এবং সর্বাধিক সরল। এত সরল যে, ব্যাখ্যার বিশেষ দরকার হয় না। ইহার তুলনায় 'নাম' ও 'আখ্যাত' এই দুই প্রকরণের সূত্রবিন্যাস দোষাশ্রিত। নাম-প্রকরণের (অর্থাৎ 'নাম্নিচতুষ্টয়ে'র) প্রথম তিন পাদ শেষ না করিয়া কাহারও পক্ষে 'রাম' শব্দের প্রথমার একবচনের 'রামঃ' রূপটি সাধন করা অসম্ভব, কারণ যে নিয়মের দ্বারা 'স্' বিসর্গে পরিণত হয়, সেই 'রেফসোর্বিসর্জনীয়ঃ' (চ. ২০৫) সূত্রটি উক্ত ৩য় পাদের প্রায় অন্তিমে শেষসূত্রের পূর্বসূত্ররূপে অবস্থিত। আখ্যাতের পদগুলি সুবিন্যস্ত নয়। কতকগুলি বিকরণ ক্রমান্বয়ে সজ্জিত করা উচিত ছিল। ণিজন্ত, সন্নন্ত, যঙন্ত, যঙ্লুগন্ত, নামধাতু, আত্মনেপদপ্রক্রিয়া, পরস্মৈপদপ্রক্রিয়া, ভাবকর্মপ্রক্রিয়া, কর্মকর্তৃপ্রক্রিয়া ও লকারার্থপ্রক্রিয়ার সূত্রগুলিকে সুষ্ঠুতর পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করা যাইত। কাশ্মীরী পণ্ডিত গোবর্ধন ভট্ট (মতান্তরে খ্রীঃ ১২শ শতকের লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম সভাপণ্ডিত) সূত্র-বিন্যাসের এই সব দোষ পরিহারের উদ্দেশ্যে সূত্রগুলিকে যথাসম্ভব সহজ

কালোপযোগী ধারায় বিন্যস্ত করিয়া 'কাতন্ত্র কৌমুদী' রচনা করেন। সুপরিকল্পিত তাঁহার এই পদ্ধতি। বর্তমান শতকের গোড়ায় শ্রীহট্ট কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিত বনমালী বেদান্ততীর্থ কাতন্ত্রিক সূত্রব্যবস্থার পূর্বোক্ত অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া, সিদ্ধান্তকৌমুদী, মুগ্ধবোধ এবং বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণকৌমুদীর আদর্শে সুবিধাজনক ভাবে সূত্রসজ্জার পরিবর্তন সাধনপূর্বক একটা খসড়া প্রস্তুত করেন, নাম দেন 'কাতন্ত্রকৌমুদী' ; কিন্তু পরে, গোবর্ধন ভট্টের গ্রন্থে বহুপূর্বেই অভিপ্রেত কার্য নিষ্পন্ন হইয়াছে জানিতে পারিয়া স্বীয় পরিকল্পনা রূপায়ণে আর অগ্রসর হন নাই। 'কাতন্ত্রকৌমুদী' নামে আরও দুইখানা পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ; একখানার রচয়িতা কৃপাল পণ্ডিত এবং অপরখানার গঙ্গেশ শর্মা। গঙ্গেশের গ্রন্থের এক টীকাও আছে।

কাতন্ত্রের তদ্ধিতাংশ প্রয়োজনের দিক্ দিয়া অতি সংক্ষিপ্ত। তাই 'কৃতি কালাপকা মূর্খাঃ' অপবাদের মতো 'কালাপাস্তদ্ধিতে মূঢ়াঃ' এই পরীবাদ প্রচলিত আছে। তদ্ধিতের সঙ্গে সমাসান্তবিধির আলোচনা অবৈজ্ঞানিক এবং জটিলতাবর্ধক। তদ্ধিতের সংক্ষিপ্ততা দূর করিতে টীকাকারগণ বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীপতি দত্ত সমগ্র কাতন্ত্রের উপর পরিশিষ্ট রচনায় প্রয়াসী হইয়াও তদ্ধিতাংশ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারেন নাই। ত্রিলোচন দাস কবীন্দ্র (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত বরিশাল বা বাখরগঞ্জ জেলার গৈলা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন) 'কাতন্ত্রোত্তর পরিশিষ্ট' রচনা করিয়া শ্রীপতির রচনাকে পূর্ণতা দান করেন। পরে অধুনা সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ 'কাতন্ত্রতদ্ধিতপরিশিষ্ট' রচনা করিয়াছেন।

পাণিনির ন্যায় শর্ববর্মাও স্বীয় ব্যাকরণে উণাদিপ্রত্যয়ের বিধিযোজনা করিয়া যান নাই। বৈদিকাংশ এবং পাণিনীয় প্রত্যাহারও পরিহার করিয়াছিলেন। পাণিনি-পরিত্যক্ত ৯৯ (দীর্ঘ ৯কার) তিনি গ্রহণ করিয়া চিরপ্রচলিত বর্ণমালার ঐতিহ্য রক্ষা করিয়াছেন। পাণিনির অনুবন্ধলোপ কাতন্ত্রে অনুপস্থিত। স্বর, ব্যঞ্জন, সমান প্রভৃতি পূর্বপ্রচলিত সংজ্ঞার ব্যবহার করায় বহু ব্যাখ্যাসূত্র রচনার দায়িত্ব এড়ানো সম্ভব হইয়াছে। এবং এক পাদে (প্রধানতঃ) এক একটি বিষয় আলোচিত হওয়ায় অনেক জটিলতা পরিহার করা গিয়াছে, অষ্টাধ্যায়ীর মতো কোনও পূর্ববর্তী সমাধানস্থলে পরবর্তী সূত্র নির্দেশের প্রয়োজন খুব প্রকট হইয়া উঠে নাই। বৈয়াকরণদের মধ্যে প্রথম শর্ববর্মাই 'আ'কে বৃদ্ধিসংজ্ঞাভুক্ত

দেখান নাই। তাঁহার সূত্রে বৃদ্ধি বলিতে আর্, ঐ এবং ঔ। পাণিনির নামে প্রচলিত অষ্টাধ্যায়ীর একাধিক খিল-পাঠের ন্যায় শর্ববর্মার নামে কাতন্ত্রের কোনও পরিশিষ্ট-গ্রন্থের প্রচলন দেখা যায় না, এক ধাতুপাঠ ছাড়া।

খ্রীঃ ১৯শ/২০শ শতাব্দীয় জার্মান পণ্ডিত লিবিশ (Bruno Liebich) এক শার্ববর্মিক ধাতুপাঠের সন্ধান দিয়াছেন। ইহাকে 'কলাপধাতুসূত্র' বলা হয়। লিবিশের সম্পাদনায় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে Breslau হইতে প্রকাশিত পাণিনীয় ধাতুপাঠের টীকা ক্ষীরতরঙ্গিণীর পরিশিষ্টরূপে এই ধাতুপাঠ ছাপা হইয়াছে। মঞ্জু ঘোষ খড়্গ তিব্বতী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। ইনি বঙ্গ-দেশীয়। খ্রীঃ ৮ম/৯ম শতাব্দী নাগাদ তিব্বতী লামাদের আহ্বানে, সংস্কৃতগ্রন্থাদির তিব্বতী ভাষায় অনুবাদের জন্য যে সব পণ্ডিত বঙ্গদেশ হইতে তিব্বতে গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন বোধ হয়। লিবিশ-প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, উক্ত ধাতুপাঠে সংস্কৃত ধাতুসমূহের তিব্বতী ভাষায় অর্থ দেওয়া আছে এবং ভ্বাদিগণে ২১৪টি ধাতু বিদ্যমান (পাণিনীয় ধাতুপাঠে ইহাদের সংখ্যা ১০৫০), চুরাদিগণেও ধাতুসংখ্যা পাণিনীয় ধাতুপাঠের তুলনায় কিছু কম দেখানো হইয়াছে, বৈদিক ধাতুসমূহ বাদ পড়িয়াছে কেবল একটি ছাড়া, সেইটি 'ঋ' ধাতু (৩। ১৪)। লিবিশ ইহাকে কাতন্ত্রের শর্ববর্মকৃত মূল ধাতুপাঠ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতদের প্রায় সকলেই এই মতের পক্ষপাতী। পাণিনীয় ধাতুপাঠস্থ ধাতুগুলির অর্থনির্দেশপূর্বক ভীমসেনাচার্য উহাদের উপরে যে 'প্রদীপ' বা 'প্রদীপকলিকা' বৃত্তি রচনা করেন—যাহা 'ধাতুপারায়ণ' নামেও বিখ্যাত—তাহারই অনুকরণে শর্ববর্মা এই ধাতুপাঠ রচনা করেন বলিয়া গুরুপদ হালদারের অভিমত। ইহার শার্ববর্মিক কর্তৃত্বের সমর্থনে কোনও পুঁথিতে এইরূপ শ্লোকও পাওয়া গিয়াছে ঃ

> ধাতুপাঠঃ কৃতো যেন কাতন্ত্রস্যার্থসিদ্ধয়ে।
> তস্মৈ স্বস্ত্যস্তু বিদুষে সততং সর্ববর্মণে।।

এই সব মতের ঘোর বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিত গজানন বালকৃষ্ণপলসুলে। তিনি তাঁহার 'The Sanskrit Dhatupathas : a critical study' (Poona, 1961) গ্রন্থে (পৃঃ ৩৮-৪১) বিশেষ দক্ষতার সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ইহা কোনো মতেই কাতন্ত্রের শর্ববর্মকৃত মূল বা আদি

ধাতুপাঠ হইতে পারে না ; কাতন্ত্রের সূত্রপাঠের সহিতই ইহার রচনাগত নানা অসামঞ্জস্য বর্তমান।

(৯) চান্দ্রধাতুপাঠই দুর্গসিংহকর্তৃক কাতন্ত্রের উপযোগী করিয়া প্রচারিত— এই রূপও শুনা যায়। বঙ্গদেশে ইহাই 'কাতন্ত্রগণমালা' নামে প্রচলিত। এই দৌর্গ ধাতুপাঠ এবং পূর্বোক্ত কলাপধাতুসূত্রের মধ্যে কিছু দৈহিক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য মূলতঃ ঐ অসামঞ্জস্য দূরীকরণের চেষ্টাসঞ্জাত। শর্ববর্মার নামে প্রচারিত পূর্বোক্ত ত্রুটিপূর্ণ ধাতুপাঠকেই দুর্গসিংহ প্রধানতঃ চান্দ্রধাতুপাঠের সাহায্যে প্রতিসংস্কৃত করিয়া বর্তমান প্রচলিত রূপদান করেন। ফলে ইহা দুর্গসিংহের নামেই প্রচারিত হইতে থাকে। ক্ষীরস্বামীর ক্ষীরতরঙ্গিণীতে (খ্রীঃ ১২শ শতক), দৈব'র 'পুরুষকার' টীকায় (খ্রীঃ ১৩শ/১৪শ শতক) এবং 'মাধবীয় ধাতুবৃত্তি'তে (খ্রীঃ ১৪শ শতক) এই প্রচারের প্রচুর নিদর্শন আছে। আশ্চর্যের বিষয়, ক্ষীরস্বামী একবারও কাতন্ত্রের নাম করেন নাই, পরন্তু শতাধিক বার দুর্গ এবং 'দৌর্গাঃ'র উল্লেখ করিয়াছেন এবং একবার 'দৌর্গং সূত্রম্' এইরূপও লিখিয়াছেন। স্থলবিশেষে তাঁহার উদ্ধৃতি (১।৪২১, ৬৯৫) হইতে প্রতীয়মান হয়, দুর্গসিংহ তাঁহার ধাতুপাঠের বিস্তৃত ব্যাখ্যাও রচনা করিয়াছিলেন। এই ধাতুপাঠে চান্দ্রের মতো সমস্ত বৈদিক ধাতুই রক্ষিত হইয়াছে। পার্থক্যের মধ্যে, ইহাতে ধাতুসমূহের অর্থপাঠে এবং চুরাদিগণীয় ধাতুবর্ণনায় চান্দ্রধাতুপাঠের সংক্ষিপ্ততা অনুসৃত হয় নাই। চন্দ্র-পরিত্যক্ত 'ঞি' অনুবন্ধও রক্ষিত হইয়াছে। কৃত্রিম সংজ্ঞার ব্যবহার করা হয় নাই। ডঃ পল্‌সুলে তাঁহার পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পৃঃ ৫৩) পাণিনীয় ধাতুপাঠের ক্রমোন্নয়নে তাহাতে দুর্গসিংহের নামে কাতন্ত্রিক ধাতুপাঠের বেশ কিছু ধাতুর অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করিয়াছেন। কাতন্ত্রের আশ্রয়স্থল বঙ্গদেশ হইতে বঙ্গীয় পণ্ডিত মৈত্রেয় রক্ষিত (ইনি পাণিনীয় ধাতুপাঠের 'ধাতুপ্রদীপ' ব্যাখ্যার রচয়িতা) মারফৎ এই সব ধাতু ক্ষীরস্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তৎকর্তৃক পাণিনীয় ধাতুপাঠে সংযোজিত হয়।[২৪]

কাতন্ত্রব্যাকরণের সূত্রগুলি প্রথমে শ্লোকবদ্ধরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এইরূপ অনুমানও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। এই অনুমান একেবারেই অমূলক নয়। কাতন্ত্রের সমাসপ্রকরণ এবং প্রায় সমগ্র তদ্ধিতাংশ আগাগোড়াই শ্লোকবদ্ধ। স্থলবিশেষে একটি পূর্ণ শ্লোকই একটি সূত্ররূপে পরিগণিত। প্রবাদ আছে যে 'শার্ববর্মিকং ত্রয়োদশশ্লোকি

তদ্ধিতম্'। ইহা সম্ভবতঃ এই ব্যাকরণের আদি তদ্ধিতাংশের পরিমাণ-সূচক। কালে উহাই বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। সে যাহাই হউক, নিম্নে তদ্ধিত প্রকরণের শ্লোকবদ্ধতার একটু নমুনা দেখা যাউকঃ

বাণপত্যে ণ্যাগর্গাদেঃ কুঞ্জাদেরায়নণ্ স্মৃতঃ।
স্ত্র্যাত্র্যাদেরেয়ণ্ ইণতঃ বাহ্বাদেশ্চ বিধীয়তে।।
তেনদীব্যতি সংসৃষ্টং তরতীকণ্ চরত্যপি।
পণ্যাচ্ছিল্পান্নিয়োগাচ্চ ক্রীতাদেরায়ুধাদপি।।
কার্যাববা বাবাদেশা বোকারৌকারয়োরপি।

এখানে প্রথম শ্লোকটি ৬টি সূত্রের সমষ্টি, দ্বিতীয় শ্লোকটি একাই একটি সূত্র এবং তৃতীয় শ্লোকার্ধটি আর একটি সূত্র! সমাসপ্রকরণের সূত্রগুলিরও পদ্যময়তা লক্ষণীয়ঃ

নাম্নাং সমাসো যুক্তার্থঃ তৎস্থালোপ্যা বিভক্তয়ঃ।
প্রকৃতিশ্চ স্বরান্তস্য ব্যঞ্জনান্তস্য যৎসুভোঃ।।
পদে তুল্যাধিকরণে বিজ্ঞেয়ঃ কর্মধারয়ঃ।
সংখ্যাপূর্বো দ্বিগুরিতি জ্ঞেয়ঃ, তৎপুরুষাবুভৌ।।
বিভক্তয়ো দ্বিতীয়াদ্যা নাম্না পরপদেন তু।
সমস্যন্তে সমাসো হি জ্ঞেয়স্তৎপুরুষঃ স চ।। ইত্যাদি

প্রথম শ্লোকে ৪টি সূত্র, দ্বিতীয় শ্লোকে ৩ এবং তৃতীয় শ্লোকটি পূরা একটি সূত্র। কৃৎপ্রকরণের সূত্রাংশে কিন্তু পদ্যের ভাব একেবারেই অনুপস্থিত। সেখানকার 'নির্বাণোঽবাতে' (কৃৎ ৬।১৩) = পাণিনির ৮। ২।৫০ নং সূত্র। পণ্ডিতপ্রবর ডঃ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই ব্যাকরণ প্রথমে শ্লোকবদ্ধই ছিল এবং পরে সেই শ্লোক ভাঙিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দ্বারা প্রায়শঃ গদ্যাত্মক সূত্রাবলী প্রস্তুত করা হইয়াছে। তিনি কাতন্ত্রের প্রথম দিকের কয়েকটি সূত্রকে নিম্নলিখিতরূপে শ্লোকবদ্ধ দেখাইয়াছেন ঃ

সিদ্ধোবর্ণসমাম্নায় আদৌ চতুর্দশ স্বরাঃ।
দশসমানাস্তেষাং দ্বৌদ্বাবন্যোঽন্যস্য সবর্ণৌ।।
পূর্বো হ্রস্বঃ পরো দীর্ঘঃ স্বরোঽবর্ণবর্জোনামী।
সন্ধ্যক্ষরমেকারাদি কাদীনি ব্যঞ্জনানি তে।।
বর্গাঃ পঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ................। ইত্যাদি।

চিচ্ছুভট্টের লঘুবৃত্তিতে কিন্তু এই শেষের সূত্রটিকে শ্লোকাত্মক রূপেই পাওয়া যায়ঃ'তে বর্গাঃ পঞ্চপঞ্চশঃ।' কাতন্ত্রের এই শ্লোকাত্মকতা লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ বচন চালু হইয়া থাকিবে—'ক হরিঃ শেতে, কা চ নিকৃষ্টা, কিং রমণীয়ম্? বদ কাতন্ত্রে ঈদৃক্ সূত্রম্'—ইত্যাকার তিনটি প্রশ্নের ক্রমিক উত্তরবিশিষ্ট কাতন্ত্রসূত্রটি হইল ঃ 'শে ষে সে বা বা পররূপম্' (১।৬৭)। এই সূত্রটির আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতও চিন্তনীয়।

(৮)

শর্ববর্মা স্বয়ং কাতন্ত্রের কোনো বৃত্তি বা ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। ইহার বাররুচ এবং দৌর্গ বৃত্তির প্রারম্ভিক নমস্কার-শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধ 'কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং সার্ববর্মিকম্'-এর অর্থ নির্দেশ করিতে গিয়া টীকাকারগণ যে তার্কিক জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহাদের কেহই শর্ববর্ম-রচিত কোনও ব্যাখ্যাগ্রন্থের সহিত পরিচিত তো ছিলেনই না, অধিকন্তু ঐ ধরনের কোনও গ্রন্থ আদৌ ছিল কি না সেই বিষয়েও তাঁহারা নিঃসন্দেহ ছিলেন না। টীকাকার দুর্গসিংহ 'সার্ববর্মিকম্'-এর ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ 'সর্ববর্মণা কৃতং সার্ববর্মিকমিতি। কাতন্ত্রস্য সর্ববর্ম-কৃতব্যাখ্যানং প্রবক্ষ্যামি।' কাতন্ত্রের Eggeling-কৃত সংস্করণে এই স্থলে 'সর্ববর্মবিহিতং ব্যাখ্যানং প্রবক্ষ্যামি' পাঠ দৃষ্ট হয় (Notes, p.465)। ইহার ব্যাখ্যায় পঞ্জী-কার ত্রিলোচন দাস বলেন ঃ 'কিন্তু সর্ববর্মকৃতসূত্রসম্বন্ধাদ্ ব্যাখ্যানমপি সার্ববর্মিকমিত্যুচ্যতে।' অর্থাৎ টীকা-কারের 'সর্ববর্মকৃতব্যাখ্যানং'-এর অর্থ বুঝিতে হইবে 'সর্ববর্মকৃত-সূত্রসম্বন্ধীয় ব্যাখ্যান', যাহা বড়জোর শর্ববর্ম-সম্মত, কিন্তু শর্ববর্ম-রচিত নয়। একজনের রচিত ব্যাখ্যা অপরে ঘটা করিয়া বলিয়া গেলে তদ্দ্বারা কোন নূতন গ্রন্থ রচিত হইতে পারে না। সুষেণ বিদ্যাভূষণের মতও এইরূপই, তবে তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন ঃ 'অপরেত্বাদৌ সার্ববর্মিকং ব্যাখ্যানং পশ্চাদ্ বররুচিকৃতমিতি প্রতিপাদনার্থমাদিগ্রহণমিত্যাহুঃ' অর্থাৎ শ্লোকে 'আদি' শব্দ গ্রহণের দ্বারা প্রথমে শার্ববর্মিক (শর্ববর্ম-রচিত) এবং পরে বররুচিকৃত ব্যাখ্যাই সূচিত—এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। প্রাসঙ্গিক সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই ঃ

দেবদেবং প্রণম্যাদৌ সর্বজ্ঞং সর্বদর্শিনম্।
কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং সার্ববর্মিকম্।।

আসলে এইটি বররুচির রচনা ; তাঁহার 'চৈত্রকূটী' বৃত্তির নমস্কারশ্লোক। বৃত্তিকার দুর্গসিংহ স্বীয় বৃত্তির প্রারম্ভে ইহাকে অবিকল যোজনা করিয়া দিয়াছেন, যেন ইহা তাঁহারই রচনা!! বররুচি শর্ববর্মা হইতে ন্যূনপক্ষে তিনশত বৎসরের পরবর্তী। মধ্যবর্তী আর কাহারও রচনা—টীকাব্যাখ্যাদি কিছু এককালে হইয়া থাকিলেও এখন আর পাওয়া যায় না। এই অবস্থায়, শার্ববর্মিক ব্যাখ্যাদির সহিত বররুচির পরিচয়ের সম্ভাবনা তৎপরবর্তী ব্যাখ্যাতাদের অপেক্ষা অনেক বেশী। তথাপি মনে হয়, আলোচ্য 'ব্যাখ্যান'—শর্ববর্ম-রচিত (স্বোপজ্ঞ) বৃত্তি বা ব্যাখ্যা নয়। তবে সূত্রকার হিসাবে স্বীয় ব্যাকরণের উপদেশ করার সময় তিনি যে ব্যাখ্যা মুখে মুখে বলিয়াছিলেন তাহাই শিষ্যপরম্পরায় কতক লিখিত ও কতক অলিখিতভাবে প্রচলিত ছিল। বররুচি সেই শর্ববর্ম-বিহিত বা শর্ববর্ম-সম্মত ব্যাখ্যার অনুসরণেই বৃত্তিরচনায় ব্রতী হইয়া 'প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং সার্ববর্মিকম্' লিখিয়াছেন। টীকাকার কুলচন্দ্রও 'সার্ববর্মিকম্' অর্থে 'সর্ববর্মবিহিতম্'ই বুঝিয়াছেন।

বররুচির ঐ বৃত্তিই বোধ হয় কাতন্ত্রের প্রাচীনতম বৃত্তি। কৃৎপ্রকরণের (১।২০) টীকায় দুর্গসিংহলক্ষিত 'আদ্যা বৃত্তিকারাঃ...'-ই কলাপতত্ত্বার্ণবে 'বররুচিপ্রভৃতয়ঃ'। তত্ত্বার্ণবকার রঘুনন্দনের মতে যে এই বররুচিই কৃৎসূত্রকার, তাহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। এই স্থলেও তিনি সেই মতেরই অনুসরণে সূত্রকারের সহিত বৃত্তিকারের অভিন্নত্ব ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন ঃ 'বররুচিপ্রভৃতয়ো বররুচেরভিপ্রায়ং বর্ণয়ন্তি, স্বয়মেব সূত্রকৃতঃ যেনাভিপ্রায়েণ সূত্রং কৃতবন্তস্তেনাভিপ্রায়েণ বৃত্তাবপ্যুক্তবন্ত ইতি।' এই বররুচি যে পাণিনিতন্ত্রের বার্ত্তিককার হইতে ৭০০ বৎসরের পরবর্তী তাহা আগেই বলা হইয়াছে। Max Muller সাহেবের মতে 'প্রাকৃতপ্রকাশ' নামক প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ-প্রণেতা বররুচি আর বার্ত্তিক-প্রণেতা বররুচি এক ব্যক্তি। কিন্তু এই মত বর্তমানে ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত। প্রাকৃতপ্রকাশের কর্তা বররুচিই কাতন্ত্রের চৈত্রকূটী বৃত্তিরও প্রণেতা। ফরাসী বিদুষী Luigia Nitti Dolci ফরাসী ভাষায় রচিত তাঁহার 'Les Grammairiens Prakrits' (Paris 1938) নামক প্রাকৃত বৈয়াকরণদের ইতিহাসে অতিশয় দৃঢ়তার সহিত প্রমাণ করিয়াছেন যে, হাল-সঙ্কলিত পূর্বোক্ত গাথাসপ্তশতী ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য লইয়াই বররুচি 'প্রাকৃতপ্রকাশ' রচনা করেন। 'বাসবদত্তা'-

প্রণেতা খ্রীঃ ৫ম/৬ষ্ঠ শতাব্দীয় সুবন্ধু ছিলেন তাঁহার ভাগিনেয়। 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিধারী গুপ্তসম্রাট ২য় চন্দ্রগুপ্তের (৩৭৬-৪১৪ খ্রীঃ) নবরত্নের অন্যতম ছিলেন এই বররুচিই। অশৌচাষ্টক, বাররুচ জ্যোতিষ, বাররুচ কোশ, বাররুচ সংগ্রহ প্রভৃতির কৃতিত্ব তাঁহাতে আরোপিত।

বাররুচ সংগ্রহ—ব্যাকরণবিষয়ক ২৫টি শ্লোকে নিবদ্ধ এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা। ইহার আলোচ্য বিষয় কারক, সমাস, তদ্ধিত, তিঙ্ (ধাতু) ও কৃৎ। এই পুস্তক তাঁহার কঠিন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত শ্লোকরচনার দক্ষতা প্রকাশ করে। ব্যাকরণের পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় রচনার পরেই সম্ভবতঃ এই পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল এবং ইহা যে খুব জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয় তাহার প্রমাণ ইহার উপরে রচিত বহু টীকা-টিপ্পনী এবং মূল শ্লোকের উদ্ধৃতিবাহুল্য পরবর্তী গ্রন্থাদিতে। বেদ (বর্তমান কেরলের বেদনাদু) নামক জনপদের অধিবাসী নারায়ণ ভট্ট বাররুচ সংগ্রহের 'বাররুচার্থদীপনপরা দীপপ্রভা' টীকা রচনা করেন। ইহা ছাড়া, উক্ত সংগ্রহের 'প্রয়োগমুখ' এবং 'সম্বন্ধসিদ্ধি' নামে অপর দুই টীকাও আছে। 'প্রয়োগবিবেক'ও বোধ হয় আর এক টীকা। শুনা যায়, বররুচিও ছিলেন কেরলেরই অধিবাসী।

পূর্বোক্ত 'দেবদেবং প্রণম্যাদৌ...' ইত্যাদি শ্লোকের পর, চৈত্রকূটীর প্রারম্ভে আরও দুইটি শ্লোক দৃষ্ট হয় ঃ

> কুমারমারাধ্য মহেশ্বরাত্মজং কালাপতন্ত্রাখ্যমিদং চকার যঃ। অনেকশাস্ত্রপ্রতিবদ্ধবুদ্ধয়ে নমোঽস্তু তস্মৈ ভুবি সর্ববর্মণে।। যেন ব্যাকরণার্ণবং সুরজলং লোপাগমোর্ম্যাকুলং, ধাতুগ্রাহ-সমাস-নক্র-কুটিলং সর্বত্র দুর্গং মহৎ। আলোচ্য জগতো হিতায় লঘুতঃ শ্রীসর্ব-বর্মা কবিঃ, সিদ্ধোবর্ণ ইতীহ সূত্রমকরোৎ জ্ঞানায় তস্মৈ নমঃ।।

ইহাদের অর্থ সরল, নূতন তথ্যও কিছু নাই। এই বৃত্তিতে সূত্রসমূহের কেবল ব্যাখ্যাই করা হয় নাই, স্থলবিশেষে সূত্রাদির সমালোচনা এবং অনুক্ত বিষয়ের উল্লেখও করা হইয়াছে। এই জন্য বৃত্তিকার কাত্যায়নের বার্ত্তিকপাঠ হইতে বহু বার্ত্তিক গ্রহণ করিয়াছেন এবং নিজেও কতকগুলি বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যশোমান নামক কোনও পণ্ডিত ইহার সংশোধন করিয়াছিলেন। তিনি সুপ্রাচীন না-ও হইতে পারেন। ভট্টনারায়ণ ইহার 'প্রদীপিকা' টীকা রচনা করেন। ইনি বোধ হয় উপরি-কথিত নারায়ণ ভট্ট হইতে অভিন্ন। কারিকাবদ্ধ এক

লিঙ্গানুশাসনও বররুচির নামে পাওয়া যায়। ইহার কারিকাসংখ্যা ৮০। কীল্‌হর্ন্‌ সাহেবের উক্তি হইতে জানা যায়, বররুচি 'লিঙ্গবৃত্তি' (লিঙ্গবিবৃতি?) নামে আর এক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

বররুচির ঐ বৃত্তির ভিত্তিতে কাশ্মীরে কাতন্ত্রব্যাকরণের যে পৃথক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে তাহাকে বাররুচ সম্প্রদায় বলা হয়। কৃৎপ্রকরণের (১।২১) তত্ত্বার্ণব টীকায় এই সম্প্রদায়বাচক 'বাররুচাঃ' পদের উল্লেখ আছে। চিচ্ছু (ছুচ্ছু বা ছুছুক) ভট্টের লঘুবৃত্তি (বা চিচ্ছুবৃত্তি), উগ্রভূতির শিষ্যহিতন্যাস, জগদ্ধর ভট্টের বালবোধিনী, শিতিকণ্ঠ-রচিত ন্যাস, যশোভূতির লঘুবৃত্তি (বা শিষ্যহিতা বৃত্তি), কাশীরাজের কাতন্ত্রটীকা এবং রামপণ্ডিতবর-প্রণীত টীকা, এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। শশিদেব-কৃত কাতন্ত্রবিভ্রম এবং ব্যাখ্যানপ্রক্রিয়াকে ইহাদের সহিত যোগ করা যাইতে পারে। ভারতপর্যটক অলবীরূণীর বর্ণনায় শশিদেবাদির উল্লেখ আছে।

আফগানিস্থানের বর্তমান খিবা প্রদেশে ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অলবীরূণীর জন্ম। খ্রীঃ ১১শ শতকের প্রথমভাগে ভারতে আসিয়া ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তিনি স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তাঁহার মতে সেই সময়ে ভারতের প্রধান বিদ্যাকেন্দ্র ছিল কাশী এবং কাশ্মীর। এই প্রসঙ্গে তিনি সমসাময়িক মালবরাজ ভোজদেবের পণ্ডিতসভারও উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাবল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তখন বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিতেছিল। ভারতীয় শব্দবিদ্যার পরিচয় দিতে গিয়া তিনি নিম্নলিখিত ব্যাকরণগুলির নাম করিয়াছেন : (১) ঐন্দ্র—দেবরাজ ইন্দ্র ইহার প্রণেতা, (২) চান্দ্র—বৌদ্ধ চন্দ্র-রচিত, (৩) শাকট—রচয়িতার নামানুসারে এই নাম এবং এই নামানুসারেই তাঁহার সম্প্রদায়কে শাকটায়ন বলা হয়, (৪) পাণিনি—ব্যাকরণকারের নামানুসারে, (৫) কাতন্ত্র—সর্ববর্ম-রচিত, (৬) শশিদেববৃত্তি—শশিদেব-রচিত, (৭) দুর্গবৃত্তি—এবং (৮) শিষ্যহিতা বৃত্তি—উগ্রভূতি-রচিত। এই শেষোক্ত গ্রন্থের প্রচার সম্বন্ধে অলবীরূণী এক চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন :

উগ্রভূতি ছিলেন কাশ্মীর-রাজ জয়পালের পুত্র আনন্দপালের (খ্রীঃ ১০ম শতক) উপদেষ্টা এবং শিক্ষক। আনন্দপালের রাজত্বকালে উগ্রভূতি স্বরচিত ঐ ব্যাকরণগ্রন্থের প্রচারে যত্নবান্ হইলে, কাশ্মীরের

লোক রক্ষণশীলতার বশবর্তী হইয়া ঐ নূতন গ্রন্থের সমাদর করিতে বিরত থাকে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখের সহিত শিষ্য আনন্দপালের নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, রাজা গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার ইচ্ছা পূরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উগ্রভূতির গ্রন্থ পাঠকদের মধ্যে বিতরণের জন্য ২০০০০০ দিরহাম বা স্বর্ণমুদ্রা এবং সেই মূল্যের উপহারসামগ্রী প্রেরণের আদেশ দেন। ফলে কাশ্মীরবাসীরা সেই সব বস্তুর লোভে দলে দলে আসিয়া আলোচ্য গ্রন্থ লিখিয়া লইতে থাকে। এইভাবে রাজানুগ্রহে উক্ত গ্রন্থের বিপুল প্রচার সম্ভব হয়।

অলবীরূণী ইহাকে 'বৃত্তি' বলিলেও আসলে ইহা চিচ্ছুবৃত্তির উপর রচিত 'ন্যাস' গ্রন্থ। আর্যাচ্ছন্দের ৫০০ শ্লোকে নিবদ্ধ এই রচনা। তিব্বতেও এই ন্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। টীকাকার দুর্গসিংহ ৩।৪।৭১ সূত্রের টীকায় 'নৈয়াসিকাঃ' পদের উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যাস হইতে নৈয়াসিক, যেমন ন্যায় হইতে নৈয়ায়িক। 'ন্যস্যতে স্থাপ্যতে দৃঢ়ীক্রিয়তে অনেনেতি ন্যাসঃ।' মূল গ্রন্থের সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ়তাসহকারে স্থাপনার নাম ন্যাস। স্বমত স্থাপনের সহিত পরমত খণ্ডনের প্রয়াসও ইহাতে বিদ্যমান থাকে। পাণিনিসূত্রের কাশিকাবৃত্তির উপর জিনেন্দ্রবুদ্ধি-রচিত 'কাশিকাবিবরণ পঞ্জিকা'কে ন্যাসও বলা হয়। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের (খ্রীঃ ৫ম শতক) প্রণেতা দেবনন্দী স্বীয় ব্যাকরণের এবং পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর (?) ন্যাস রচনা করেন। অন্য-রচিত ন্যাসও আছে। এমতাবস্থায় দুর্গসিংহ কাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐ পদের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা বিচার্য। অল্‌বীরূণী কাতন্ত্রের উৎপত্তিবিষয়ক 'মোদকং দেহি' আখ্যায়িকারও উল্লেখ করিয়াছেন একটু ঘুরাইয়া। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং মহাদেবই সর্ববর্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কয়েকটি সূত্র প্রদান করেন, যেমন প্রদান করিয়াছিলেন Abul'aswad Addu'ali আরবী ভাষার জন্য।

শশিদেবের কাতন্ত্রবিভ্রম, কাতন্ত্রের কঠোর সমালোচনাত্মক অতি ক্ষুদ্র পুস্তক, মাত্র ২০টি শ্লোকে রচিত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাকরণ সম্প্রদায়ে ইহার অনুকরণে গ্রন্থ ও তাহার ব্যাখ্যা-টীকাদি রচিত হইয়াছে। হৈম সম্প্রদায়ে 'হৈম (তন্ত্র) বিভ্রমসূত্র' বা 'তন্ত্রবিভ্রম ব্যাকরণ'—এই জাতীয় গ্রন্থ। ইহার 'তত্ত্বপ্রকাশিকা'র রচয়িতা গুণচন্দ্র সূরি ছিলেন জৈন দেবচন্দ্র সূরির ছাত্র এবং খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীর।

কায়স্থ বৈয়াকরণ কক্কল বা কক্কল্ল-র অনুরোধে ইহা রচিত হয়। ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ধবলক্কপুরে মতিভদ্র গণির ছাত্র চারিত্রসিংহ গণি কাতন্ত্রবিভ্রমের যে অবচূরি রচনা করেন তাহা সারস্বত ব্যাকরণ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। কাতন্ত্র-সম্প্রদায়ে ইহার টীকা রচনা করেন জিনপ্রভ সূরি। তিনি ছিলেন লঘুখরতরগচ্ছের প্রবর্তক জিনসিংহ সূরির শিষ্য। দিল্লীতে যোগিনীপুরি কায়স্থ খেতলের অভ্যর্থনায় ১৩৫২ সংবতে (খ্রীঃ ১২৯৫/৯৬) এই টীকা রচিত হয়। ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত দ্ব্যাশ্রয়মহাকাব্য 'শ্রেণিকচরিত' তাঁহার অপর গ্রন্থ। বেলবলকরের মতে তিনি 'কাতন্ত্রপঞ্জিকা'রও এক টীকা রচনা করেন। কাতন্ত্রের বালবোধিনী বৃত্তির প্রণেতা জগদ্ধর ভট্ট খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীয়। পুত্র যশোধরের শিক্ষার জন্য তিনি ইহা প্রণয়ন করেন। তাঁহার আর এক গ্রন্থ 'অপশব্দনিরাকরণ'। তাঁহারই বংশধর (খ্রীঃ ১৫শ শতক) রাজানক শিতিকণ্ঠ বালবোধিনীর উপর এক ন্যাস (বালবোধিনীন্যাস) প্রণয়ন করেন। যশোভূতি-রচিত (শিষ্যহিতা) লঘুবৃত্তির তিব্বতী অনুবাদ আছে।

(৯)

কাতন্ত্রিক দৌর্গ সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ বৃত্তিকার দুর্গসিংহ অতিশয় প্রতাপান্বিত আচার্য ছিলেন। তিনি কেবল এই ব্যাকরণের বৃত্তিই রচনা করেন নাই, বস্তুতঃ 'ঢালিয়া সাজাইয়াছেন' এই ব্যাকরণকে বলা চলে। কাতন্ত্রের যে সূত্রপাঠের উপর তিনি বৃত্তি প্রণয়ন করেন তাহাও তৎকর্তৃক প্রতিসংস্কৃত। ইহার সূত্রগত নানা দিকের নানা দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া তিনি ইহাকে সূত্র-বৃত্তি-উদাহরণাদি সর্ববিষয়ে যতদূর সম্ভব সর্বতোভদ্র করিয়া তুলিতে চেষ্টিত হন এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে এই কার্যে আশ্চর্যজনক সফলতাও লাভ করেন। বহু প্রাচীন সূত্রের পরিহার, বার্ত্তিকাদি হইতে বহু নূতন সূত্রের সংযোজন এবং অনেক স্থলে সূত্রাংশের পরিবর্তনাদি ঘটাইয়া, বর্তমান (তদ্‌বৃত্তিধৃত) সূত্রপাঠ সঙ্কলন করিতে হইয়াছে। এই ব্যাপারে তিনি তৎকালীন ব্যাকরণসমুদ্রকে মন্থন করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রসূত ফলরাশিকে সম্প্রদায়ানুরোধে নিজস্ব করিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বস্তুতঃ বররুচির পরে, শার্ববর্মিক কাতন্ত্রের তাঁহার ন্যায় হিতৈষী আচার্য আর অভ্যুদিত হন নাই বলিলে কোনক্রমেই অত্যুক্তি হয় না, এমন কি এই ক্ষেত্রে তিনি বররুচিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাবের

ঘনঘটায় সূত্রকার শর্ববর্মার নামটিও যেন এক কালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাই এই ব্যাকরণকে কোথাও কোথাও 'দৌর্গ ব্যাকরণ' নামেও অভিহিত হইতে দেখা গিয়াছে। গাইকোয়াড় সংস্কৃত সিরীজ, বরোদা হইতে প্রকাশিত খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্যের পুস্তকালয়স্থ সূচীপত্রে কালাপ এবং কৌমার ব্যাকরণের সহিত দৌর্গ ব্যাকরণের নামও দৃষ্ট হয়। খ্রীঃ ১৪শ শতকে রচিত মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে একাধিক স্থলে 'দৌর্গাঃ' (২।২২...) পদে দৌর্গ সম্প্রদায় উপলক্ষিত হইয়াছে। ইহারও পূর্বে ক্ষীরস্বামী তাঁহার 'ক্ষীরতরঙ্গিণী' নাম্নী ধাতুবৃত্তিতে ঐ একই অর্থে 'দৌর্গাঃ' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রক্রিয়াকৌমুদীর 'প্রসাদ'-টীকায় (৩।২।২৬) কাতন্ত্রের 'ফলেমলরজঃ সুগ্রহেঃ' এবং 'দেববাতয়োরাপেঃ' (কৃৎ ৩।২৭,২৮) সূত্র দুইটিকে দুর্গোক্ত বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহার মূলে রহিয়াছে ঐ দৌর্গ ব্যাকরণের স্মৃতি। ভট্টোজিও এই প্রভাব হইতে মুক্ত নহেন, তাই সিদ্ধান্তকৌমুদীতে দৃষ্ট হয় ঃ

বিন্দতিশ্চান্দ্রদৌর্গাদেরিষ্টো ভাষ্যেঽপি দৃশ্যতে।
ব্যাঘ্রভূত্যাদয়স্ত্বেনং নেহ পেঠুরিতি স্থিতম্।।

দুর্গসিংহের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। খ্রীঃ ৭ম শতক হইতে ৯ম শতক পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যবর্তী কোনও সময়ে তাঁহার আবির্ভাব ধরা হয়। Deccan College—Post graduate and Research Institute, Poona হইতে ১৯৫২ খ্রীঃ প্রকাশিত গ্রন্থ 'Linganusasana of Durgasimha'-র মুখবন্ধে সম্পাদক দত্তাত্রেয় গঙ্গাধর কোপরকর বৃত্তিকার দুর্গসিংহকে খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্ধের (খ্রীঃ ৬২৫ নাগাদ) লোক বলিয়াছেন। কাতন্ত্রের 'ইন্‌যজাদেরুভয়ম্' (৩।৫।৪৫) সূত্রের বৃত্তিতে দুর্গসিংহ খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতকের ভারবির এবং হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৪৭ খ্রীঃ) সভাকবি 'ময়ূরকবি'র রচনা হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। অন্য দিকে বামন তাঁহার কাশিকাবৃত্তিতে (৭।৪।৯৩) ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ৩।৩।৩৫ সংখ্যক কাতন্ত্রসূত্রের দৌর্গবৃত্তি খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত। ঐস্থলে তিনি দুর্গকথিত 'অজী-জাগরৎ' রূপের শুদ্ধতা স্বীকার করেন নাই। ধাতুবৃত্তিকার সায়ণাচার্যও প্রাসঙ্গিক স্থলে অনুরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কাশিকাবৃত্তি ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। বামন ইহার অন্যতর প্রণেতা। আদি প্রণেতা জয়াদিত্য বৌদ্ধ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বামন খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীয় ; তিনি কাশিকাকে বৌদ্ধপ্রভাবমুক্ত করিয়া

প্রতিসংস্কৃত করেন। ইহা বিবেচনা করিয়া দুর্গসিংহের আবির্ভাবকালকে আরও কিছু সরাইয়া আনা যায়। কাহারও মতে নিরুক্ত-বৃত্তিকার দুর্গাচার্য এবং দুর্গসিংহ একই ব্যক্তি। নিরুক্তের (১।১৩) বৃত্তি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, দুর্গাচার্য কাতন্ত্রের সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। নিরুক্তের টীকাকার স্কন্দস্বামী পূর্বটীকাকার-রূপে 'বর্বরস্বামি-ভগবদ্দুর্গ প্রভৃতি'র নাম করিয়াছেন। স্কন্দস্বামীর শিষ্য বলিয়া কথিত হরিস্বামী শতপথব্রাহ্মণের যে ব্যাখ্যা রচনা করেন, তাহার প্রথম কাণ্ডের শেষে উহার রচনাকাল বলা হইয়াছে ৩৭৪০ কল্যব্দ অর্থাৎ ৬৩৯।৪০ খ্রীষ্টাব্দ। এতদনুসারে স্কন্দস্বামীকে খ্রীঃ ৬ষ্ঠ।৭ম শতাব্দীয় ধরিয়া দুর্গাচার্যকে তৎপূর্ববর্তী বলিতে হয়। আবার অমরকোষের প্রণেতা অমর সিংহই কাতন্ত্রবৃত্তিকৃদ্ দুর্গসিংহ এইরূপ কিংবদন্তীও ছিল। ইহার প্রমাণ, অমরকোষের টীকাকার শ্রীকণ্ঠের উক্তি। তাঁহার মতে রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম দুর্গসিংহ উক্ত কোষ রচনার পর 'অমর'—এই উপাধিতে ভূষিত হন ঃ

> দুর্গসিংহপ্রচারিতে নামলিঙ্গানুশাসনে।
> লভতে হ্যমরোপাধিং রাজেন্দ্রবিক্রমেণ সঃ।।
> বিদ্যাকীর্তিপ্রভাবেণামরত্বং লভতে নরঃ।
> স রত্নং নবরত্নানাং তদ্‌গুণেন সুশোভিতঃ।।

কবিকল্পদ্রুমের প্রারম্ভে বোপদেব ইন্দ্র-চন্দ্র-কাশকৃৎস্নাদি যে ৮ জন আদি শাব্দিকের নাম করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কিন্তু অমরের উল্লেখ আছে, শর্ববর্মার নাম নাই। অমরের নামে কোনও স্বতন্ত্র ব্যাকরণ বা তদ্‌বিষয়ক গ্রন্থের প্রচলন না থাকিলেও অবশ্য তাঁহার 'নামলিঙ্গানুশাসন' (= অমরকোষ)-ই তাঁহার শাব্দিকত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এই সব বিবেচনা করিয়া দুর্গসিংহকে খ্রীঃ ৭ম/৮ম শতাব্দীয় বলিয়া সাব্যস্ত করাই সমীচীন মনে হয়। ৮ম শতকের গোড়ার দিকেই তিনি গ্রন্থাদি রচনা করিয়া থাকিবেন।

'দুর্গসিংহ' নামটির মধ্যে একটা ছদ্মভাব আছে বলিয়া মনে হয়। নমস্কারপাদের কলাপচন্দ্রে সুষেণ বিদ্যাভূষণ 'দুর্গসিংহঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন ঃ 'দুর্গে বিষমে পদে সিংহ ইব দুর্গসিংহঃ।' এই নামানুসারেই তাঁহার বৃত্তির 'দৌর্গসিংহী' বিশেষণ। দুর্গাত্মসিংহ বা দুর্গাত্মসিক্ষ সম্ভবতঃ দুর্গসিংহের নামান্তর। উহা অপেক্ষা সহজতর

'দুর্গসিংহ' অভিধার প্রচলনই স্বাভাবিক।

কৃদন্ত সমগ্র কাতন্ত্রের উপরেই দৌর্গসিংহী বৃত্তি। ইহা অতি সরল এবং হৃদয়গ্রাহী। পাতঞ্জল মহাভাষ্যের প্রভাব ইহার স্থলে স্থলে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কাতন্ত্রের অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্রন্থও দুর্গসিংহেরই রচনা। ইহাদের মধ্যে আছে পাঁচপাদে (কোথাও ৬ পাদ) বিভক্ত উণাদিসূত্রপাঠ, পরিভাষাপাঠ এবং ধাতুপাঠ। এই সবেরও বৃত্তিভাগ তাঁহারই রচনা। উণাদিবৃত্তির নমস্কার শ্লোকে প্রণম্য শিবের 'ভূরিশব্দ-সন্তানকারণ' বিশেষণটি আলোচ্য বিষয়ের সহিত বড়ই সঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছে। পাণিনির 'উণাদয়ো বহুলম্' (৩।৩।১) সূত্রটিই যেন এখানে সার্থকভাবে ব্যঞ্জিত। 'অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রেকধিয়াবুভৌ। নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যো জড়বুদ্ধয়ঃ।।' এবং 'ময়ি স্থিতে বাদিনি দুর্গসিংহে নৈকাক্ষরংবক্তি মহেশ্বরোঽপি' ইত্যাদি গর্বোক্তি হইতে বুঝা যায় তিনি জীবদ্দশাতেই ব্যাকরণক্ষেত্রে কিরূপ দোর্দণ্ড প্রতাপ বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁহার এই গর্বগৌরব প্রবাদবাক্যরূপে সাহিত্যাশ্রয়ী হয়। চিরঞ্জীব-রচিত 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র দ্বিতীয় তরঙ্গে লিখিত আছে ঃ

> অথায়ান্তং বৈয়াকরণমালোক্যাহ সঃ
> 'আলাপ-কালাপক দুর্গসিংহো-
> যঃ কাশিকায়ামপি কাশিকেশঃ।
> শেষাবতারঃ শ্রুতপূর্বকীর্তিঃ
> স এষ বৈয়াকরণোঽভ্যুপৈতি।।'১৫।।

ইহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ...' ইত্যাদি রচনার তুলনা করিলে উভয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ধরা পড়িবে।

(১০)

দৌর্গ বৃত্তির অবলম্বনে গত সহস্রাধিক বৎসরে কাতন্ত্রের নানা টীকা-টিপ্পনী রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ দৌর্গ টীকা। ইহার রচয়িতা দুর্গগুপ্তসিংহ কিন্তু বৃত্তিকার দুর্গসিংহ নহেন, ভিন্ন ব্যক্তি। টীকাকার রৌদ্র। টীকার প্রারম্ভে তিনি বৃত্তিকার দুর্গসিংহকে 'ভগবান্ বৃত্তিকারঃ' বলিয়াছেন এবং তৎপূর্বেই সূচনায় বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া লিখিয়াছেন ঃ

> শিবমেকমজং বুদ্ধমর্হদগ্র্যং স্বয়ম্ভুবম্।
> কাতন্ত্রবৃত্তিটীকেয়ং নত্বা দুর্গেণ রচ্যতে।।

এই টীকা কৃদন্ত সমগ্র দৌর্গ বৃত্তির উপরেই রচিত। কোপরকর-সম্পাদিত দুর্গলিঙ্গানুশাসনের মূল এবং বৃত্তি উভয়ই এই টীকাকার দুর্গসিংহের রচনা। ইহা অবশ্য কোপরকরের মত ; বেলবলকরের মতে উভয়ই বৃত্তিকার দুর্গসিংহ-রচিত। আর্যাচ্ছন্দের ৮৭টি শ্লোকে নিবদ্ধ এবং ৭ প্রকরণে বিভক্ত এই গ্রন্থ। লোকপ্রসিদ্ধ যে সব শব্দের অর্থ হইতেই উহাদের লিঙ্গ নির্ণয় করা সহজ, সেই সব শব্দবাদে অন্যান্য শব্দের লিঙ্গনির্দেশ করাই এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য। তাই কাত্যায়নাদি-রচিত লিঙ্গানুশাসনসমূহের বর্তমানে, এই গ্রন্থরচনার প্রয়োজন বর্ণনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ঃ

> ননু কাত্যায়নাদিকৃতানি লিঙ্গানুশাসনানি সন্তি, কিমনেনেত্যুচ্যতে—
> 'স্ত্রীপুং নপুংসকানি স্বার্থৈঃ সিদ্ধানি লোকতো যানি। তানি ত্যক্ত্বার্যাভিঃ ক্রমশো বক্ষ্যেঽবশিষ্টানি।।'

কারিকাকৃৎ স্বয়ংই ইহার বৃত্তিকার এবং তিনি যে দুর্গসিংহ, দুর্গাত্মা, দুর্গ এবং দুর্গপ এই সব নামে অভিহিত ছিলেন, তাহা সর্বশেষে ব্যক্ত হইয়াছে ঃ

> দুর্গসিংহোঽথ দুর্গাত্মা দুর্গো দুর্গপ ইত্যপি।
> যস্য নামানি তেনৈব লিঙ্গবৃত্তিরিয়ং কৃতা।। ৮৭।।

কোপরকর বর্তমানে প্রচলিত লিঙ্গানুশাসনের উপাদান বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, খ্রীঃ ৯ম শতাব্দীয় জৈন শাকটায়ন বা পাল্যকীর্তির লিঙ্গানুশাসনের পরে দৌর্গ লিঙ্গানুশাসন রচিত হইয়াছিল।

দৌর্গ উণাদিবৃত্তি, ধাতুপাঠ এবং পরিভাষাপাঠের উপরেও টীকাকার দুর্গসিংহ কিছু লিখিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। খ্রীঃ ১৩শ শতকে বোপদেব কবিকল্পদ্রুমের টীকা 'কাব্যকামধেনু'তে স্পষ্টতঃই দুর্গগুপ্ত-রচিত দুর্গটীকার উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'দুর্গগুপ্তেন দুর্গটীকায়াং...।' এই স্থলে তিনি একই ভাবে ক্রমান্বয়ে ত্রিলোচন দাসকৃত 'কাতন্ত্রপঞ্জিকা', বর্ধমান মিশ্রের 'কাতন্ত্রবিস্তর' এবং হেমসূরির হৈম ব্যাকরণেরও নাম করিয়াছেন। এই ক্রম তাঁহাদের আবির্ভাবকালের পৌর্বাপর্য-নির্দেশক কিনা বলা কঠিন। অবশ্য সেইরূপ করা হইয়া থাকিলে, বর্তমানে প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে তাহা অভ্রান্ত বলিয়াই সাব্যস্ত হয়। বর্ধমান মিশ্র হেমচন্দ্রের (১০৮৮-১১৭২) বর্ষীয়ান্ সমসাময়িক। ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দে

বর্ধমানের অপর গ্রন্থ 'গণরত্নমহোদধি' প্রণীত হয়। তাঁহার পূর্ববর্তী হিসাবে ত্রিলোচনকে খ্রীঃ ১০ম/১১শ শতাব্দীয় ধরিয়া টীকাকার দুর্গসিংহকে খ্রীঃ ৯ম/১০ম শতাব্দীয় সাব্যস্ত করিতে তেমন কোনও বাধা দেখা যায় না। ক্ষীরস্বামীর অমরকোষ-টীকায়, ক্ষীরতরঙ্গিণীতে, সায়ণের মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে এবং দৈব-র পুরুষকার-টীকায় দুর্গ এবং গুপ্ত নামে যে সব উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, সেই সবের পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সব গ্রন্থের রচয়িতারা দৌর্গ লিঙ্গানুশাসন, ধাতুবৃত্তি এবং উণাদিশব্দবিষয়ক (?) কোষগ্রন্থের সহিতও পরিচিত ছিলেন। এদিকে কানাড়ী ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের রচয়িতা আর এক (তৃতীয়) দুর্গসিংহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইনি ছিলেন দাক্ষিণাত্যের চৌলুক্যরাজ ২য় জগদেকমল্লের (১১৩৯-৫০ খ্রীঃ) সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী। এই তিন দুর্গসিংহ এবং নিরুক্তবৃত্তিকার দুর্গাচার্য—এই চারিজনের সময়, সম্বন্ধ এবং রচিত গ্রন্থাদির ঠিক ঠিক নিরূপণ স্বতন্ত্র গবেষণা-সাপেক্ষ।

দৌর্গ বৃত্তির অন্তর্গত কঠিন পদসমূহের ('দুর্গসিংহোক্তকাতন্ত্রবৃত্তি-দুর্গপদানি...') ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য ত্রিলোচন দাস "কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা" রচনা করেন। ইহাকে সংক্ষেপে পঞ্জিকা বা পঞ্জী বলা হয়। 'পঞ্জিকা পদভঞ্জিকা'। এই ব্যাখ্যাও কৃৎপর্যন্ত সমগ্র কাতন্ত্রের উপর রচিত। কাতন্ত্রে দুই দুর্গসিংহের ন্যায় ত্রিলোচন দাসও দুই জন। দ্বিতীয় ত্রিলোচন কাতন্ত্রোত্তর পরিশিষ্টের প্রণেতা। প্রথম ত্রিলোচনের পিতা মেঘ দাস বঙ্গীয় কায়স্থ এবং দ্বিতীয়ের পিতা মাধব দাস কবিচন্দ্র বা কবীন্দ্র বঙ্গীয় বৈদ্যকুলজাত এবং পুত্র 'চর্করীতরহস্য'কৃৎ কবিকণ্ঠহার। ইঁহারা পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার গৈলা গ্রামের অধিবাসী। হালদারের মতে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কবিকণ্ঠহার এক বৈদ্যকুলপঞ্জী রচনা করেন। কাজেই খ্রীঃ ১৬শ শতকের মধ্যভাগে বা শেষার্ধে তৎপিতা ত্রিলোচনের আবির্ভাব ধরিয়া লইতে বাধা নাই। উভয় ত্রিলোচনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় পাঁচশত বৎসরের। রামচন্দ্র আর এক 'কাতন্ত্রবৃত্তি-পঞ্জিকা'র রচয়িতা। গুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত কাতন্ত্রব্যাকরণের (চ.১৪৯) কলাপচন্দ্রের (অর্থাৎ কবিরাজের) শেষে এক 'পঞ্জীপ্রদীপ' হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে।

টীকা-পঞ্জীর পরেই কাতন্ত্রে 'কবিরাজে'র নাম করিতে হয়। কবিরাজ অর্থাৎ 'কলাপচন্দ্র'কৃৎ আচার্য সুষেণ বিদ্যাভূষণ। আখ্যাতের কলাপচন্দ্রের

প্রারম্ভে তিনি নিজেই নিজেকে কবিরাজ বলিয়াছেন ঃ 'আচার্যকবিরাজেন ব্যাখ্যাখ্যাতস্য লিখ্যতে।' তবে কাতন্ত্রের 'কবিরাজ' বলিলে তৎকৃত ঐ গ্রন্থই বুঝায়। তিনি খ্রীঃ ১৬শ/১৭শ শতাব্দীয়। ত্রিলোচন দাসের পঞ্জিকায় 'প্রতিপক্ষদত্তদোষান্ধকারনিকর' দূরীকরণের জন্য তিনি কলাপচন্দ্র রচনা করেন। ইহাতে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় রহিয়াছে। এমন বিচারবহুল এবং বিরুদ্ধমত-নিরসনকারী গ্রন্থ এই ব্যাকরণসম্প্রদায়ে আর নাই বলা চলে। দুঃখের বিষয়, কবিরাজ অসম্পূর্ণ। আখ্যাতের দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত রচনার পর সুষেণ স্বর্গত হইলে তৎপুত্র বিশ্বেশ্বর আখ্যাতের ৩য় পাদ হইতে ৮ম পাদ পর্যন্ত কবিরাজ রচনা করেন। কিন্তু পুত্রের রচনা পিতৃরচনার মতো মনোজ্ঞ না হওয়ায় কালাপকগণ অবজ্ঞাবশতঃ ইহাকে 'বিল্বেশ্বর' নাম দিয়াছেন। কৃৎপ্রকরণের 'বিল্বেশ্বর'[২৫] নাই। তাঁহার তর্কাচার্য উপাধি দৃষ্ট হয়। পিতামহ মহীধর মিশ্র। কলাপচন্দ্রের কোনও কোনও পুঁথিতে ইহার 'কাতন্ত্রচন্দ্র' বা 'ব্যাখ্যাসার' নামও পাওয়া গিয়াছে।

'টীকা-পঞ্জী-কবিরাজ' এই ত্রয়ী-র স্থান ও অবদান দৌর্গ সম্প্রদায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাতন্ত্রব্যাকরণে সম্যগ্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া 'বিচারমল্ল' হইতে হইলে এই তিন গ্রন্থই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অধিগত করা অবশ্য দরকার। এই ক্ষেত্রে আর যে একটি গ্রন্থও নিতান্তই অপরিহার্য তাহা শ্রীপতি দত্ত-রচিত কাতন্ত্রপরিশিষ্ট। কিংবদন্তী এই যে, শ্রীপতি অধ্যয়নের জন্য দুর্গসিংহের নিকট উপস্থিত হইলে, অব্রাহ্মণ বলিয়া তৎকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন। এই প্রত্যাখ্যান তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে না। তিনি একলব্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মৃত্তিকাদ্বারা এক দুর্গসিংহমূর্তি নির্মাণ করিয়া গুরুজ্ঞানে উহার সমীপে নিজে নিজেই ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে থাকেন এবং এই ভাবেই ঐকান্তিক নিষ্ঠার জোরে তাঁহার অভীপ্সিত শিক্ষায় সিদ্ধিলাভ ঘটে। অতঃপর দুর্গসিংহের নিকট তিনি এই ঘটনা বর্ণনাপূর্বক কাতন্ত্রের পরিশিষ্ট রচনার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, দুর্গসিংহ সন্তুষ্ট হইয়া ঐ বিষয়ে তাঁহাকে অনুমতি দিয়া বলিয়া দেন যে, গ্রন্থে কোথাও তাঁহার নিন্দা করিলে কিন্তু শ্রীপতি ব্যাঘ্রকর্তৃক তৎক্ষণাৎ নিহত হইবেন। অদম্য শ্রীপতি কুশ-ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থানপূর্বক গ্রন্থরচনার সময় প্রসঙ্গক্রমে সমাসপাদের একস্থানে 'ইতি দুর্গমতং নিরস্তম্' লিখিয়া ফেলিতেই

তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রকবলিত হন। এই আখ্যানের মূলে কতখানি সত্যতা আছে বলা যায় না। গ্রন্থের অসম্পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া দুর্গসিংহের প্রবল ব্যক্তিত্বে ঈর্ষান্বিত কোনও ব্যক্তি এইরূপ শ্রুতিসুখকর গল্প রচনা করিয়া থাকিবেন।

শ্রীপতি কাতন্ত্রের সন্ধি, নাম, কারক, ষত্ব, ণত্ব, স্ত্রীত্ব ও সমাস প্রকরণের কিয়দংশ (দ্বন্দ্বসমাস) পর্যন্ত পরিশেষ বিধান করিয়া অকালে মৃত্যুপথযাত্রী হইলে তদ্ধিত ও আখ্যাতের পরিশিষ্টরচনা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং 'দত্ত' মূল নামেরই অংশমাত্র। সুপদ্ম ব্যাকরণের প্রণেতা পদ্মনাভদত্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। খ্রীঃ ১২শ শতকে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের রচয়িতা ক্রমদীশ্বরের পিতামহের নাম শ্রীপতি এবং তিনি বঙ্গদেশীয়ও, কিন্তু সেই কারণেই তাঁহাকে পরিশিষ্টকার শ্রীপতি হইতে হইবে এমন সম্ভাবনা নাই। তবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিপ্রায়ানুসারে ক্রমদীশ্বরের খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীয়ত্ব স্বীকৃত হইলে তাঁহার পিতামহকে অন্ততঃ টীকাকার দুর্গসিংহের কাছাকাছি আনিয়া ফেলা যায়। পরিশিষ্টে সন্ধিপ্রকরণের 'অহ্নোঽরাত্রা-দ্যনঘোষে' (৮০) সূত্রের বৃত্তিতে শাকটায়নীয় মত উদ্ধৃত হওয়ায় পরিশিষ্টকার যে খ্রীঃ ৯ম শতকের পূর্ববর্তী নহেন তাহা নিঃসন্দেহ, কারণ ঐ শতকেই জৈন শাকটায়ন তাঁহার ব্যাকরণ রচনা করেন। সন্ধি-প্রকরণের শেষ সূত্রের বৃত্তিভাগে শ্রীপতি ভাগবৃত্তি[২৬]-প্রণেতা বিমলমতির নাম করিয়াছেন। ইহা একটি বড় খবর। এই সূত্রেরই বৃত্তিশেষের শ্লোকদুইটিও স্মরণীয় ঃ

> লোপাগমাদেশবিপর্যয়া যে যে চার্থভেদেষু বিধের্বিশেষাঃ। ন লক্ষিতা লক্ষিতবিস্তরেণ তৎসংগ্রহোঽয়ং কৃতিনোপদিষ্টঃ।। সমীক্ষ্য তন্ত্রাণি ময়া মুনীনাং যদত্র ভাষ্যাদিবিরুদ্ধমুক্তম্। ন তদ্ বিমৃষ্যং কৃতিভির্মুনীনাং সাধারণী বাচি খলু প্রতিষ্ঠা।।

শ্রীপতির অসমাপ্ত কার্য সম্পূর্ণ করিতে অনেকেই চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই এই বিষয়ে কৃতিত্বের উৎকর্ষে তাঁহার স্থলবর্তী হইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পশুপতি আচার্যসিংহের পুত্র গোপীনাথ তর্কাচার্য পরিশিষ্টের অবশিষ্টাংশ রচনা করিয়া সমগ্র গ্রন্থের যে টীকা প্রণয়ন করেন তাহার নাম 'কাতন্ত্রপরিশিষ্টপ্রবোধ'। গোপীনাথের এই উত্তরপরিশিষ্ট বর্তমানে দুর্লভ। খ্রীঃ ১৬শ শতকে তাঁহার অভ্যুদয়।

পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরনিবাসী কবি জয়নারায়ণ সেন (খ্রীঃ ১৮শ শতক) স্বীয় 'চণ্ডীকাব্যে' লিখিয়াছেন ঃ

'বৈয়াকরণিয়া সবে, বিচার কর্কশ রবে, গোপীনাথ-পরিশিষ্ট লইয়া।।'

পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ত্রিলোচন দাস 'কাতন্ত্রোত্তরপরিশিষ্ট' নামে কাতন্ত্রের কেবল তদ্ধিত ও আখ্যাতের পরিশিষ্ট প্রস্তুত করেন এবং সমাসপ্রকরণের পরিশিষ্টেও কয়েকটি নূতন সূত্র যোজনা করিয়া দেন। ইদানীন্তন কালে সীতানাথ ভট্টাচার্য সিদ্ধান্তবাগীশ 'কাতন্ত্রতদ্ধিত-পরিশিষ্ট' রচনা করিয়াছেন। মূল কাতন্ত্রের অনুকরণে ইহার সূত্রগুলিও শ্লোকবদ্ধ। মুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার উক্তি ঃ

> প্রাচীন বৈয়াকরণগণের গ্রন্থসকল এবং আধুনিক প্রামাণিক শাব্দিকগণের মতসমূহ বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া ছাত্রগণের হিতের জন্য আচার্য্য সর্ব্ববর্ম্মার শাস্ত্রীয় মার্গ অনুসরণপূর্ব্বক এই তদ্ধিতপরিশিষ্ট নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিলাম।

এই গ্রন্থের দ্বারা 'কালাপাস্তদ্ধিতে মূঢ়াঃ' এই পরীবাদ দূরীকরণের চেষ্টা করা হইয়াছে। সীতানাথের পিতার নাম কালীকান্ত। পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার চাঁদসী গ্রামে ইঁহাদের নিবাস ছিল। সেখানে (?) ১৮৩৩ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৯১১/১২) এই গ্রন্থ রচিত হয়। সীতানাথ এই গ্রন্থের বৃত্তিকারও। তৎপুত্র কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য আবার ইহার 'মনোরমা' টীকাও রচনা করেন তাঁহার স্বর্গতা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নামানুসারে। সীতানাথ সমগ্র কাতন্ত্রের 'কাতন্ত্রসঞ্জীবনী' নামে আর এক টীকাও প্রণয়ন করেন। ইহাকে 'মূলপঞ্জিকা-কলাপচন্দ্রতাৎপর্যবিকাশিনী' বলা হইয়াছে।

শ্রীপতির গ্রন্থের উপর বিভিন্ন সময়ে নানা টীকা-টিপ্পনী রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রামচন্দ্রের 'তত্ত্ববোধিনী,' রামদাসের 'কাতন্ত্র-চন্দ্রিকা,' শিবরাম চক্রবর্তীর 'পরিশেষসিদ্ধান্তরত্নাকর', গঙ্গাধর আচার্যের (চট্টোপাধ্যায়) পুত্র রতিদেব সিদ্ধান্তবাগীশের টীকা ('কৃৎপরিশিষ্টরহস্য'?), শঙ্কর শর্মার 'কাতন্ত্রপরিশিষ্টপ্রবোধপ্রকাশিকা', গোবিন্দ পণ্ডিতের কাতন্ত্র-পরিশিষ্ট টীকা এবং পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর-কৃত 'বক্তব্যবিবেক' প্রভৃতির পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ সমগ্র ব্যাকরণের টীকারচনার ব্যপদেশে পরিশিষ্টেরও টীকা রচনা করিয়াছেন। রামচন্দ্রের 'তত্ত্ববোধিনী,' এই জাতীয় গ্রন্থ। ইহার পূর্ণনাম 'কলাপতন্ত্রতত্ত্ববোধিনী' বা 'কলাপতত্ত্ব-বোধিনী'। ইহা সন্ধি, কারক ও পরিশিষ্ট এই তিন খণ্ডে বিভক্ত।

সন্ধিখণ্ডে ত্রিলোচন দাসের সন্ধিবিষয়ক পঞ্জীর পরীক্ষণ। এই অংশে তিনি কবিরাজের সহিত একমত না হইয়া স্থলে স্থলে উহার বিরুদ্ধতাও করিয়াছেন। পরিশিষ্টাংশে গোপীনাথের টীকা অনুসৃত হইয়াছে। রামচন্দ্রের পিতার নাম হরিহর। টীকার পুষ্পিকায় টীকাকারের গ্রাম, কুল ইত্যাদির উল্লেখ লক্ষণীয় ঃ

ইতি শিবপুরতপাকীয়-উত্তরচাইব-গ্রাম নিবাসি কাঞ্জীরকুল সমুদ্ভব হরিহরাত্মজ-শ্রীরামচন্দ্র শর্মকৃতায়াং... (পাঠান্তর 'কাঞ্জীকুল সমুদ্ভব')। শাস্ত্রিমহাশয় রামচন্দ্রকে মৈথিল ব্রাহ্মণ অনুমান করিয়াছেন। কবিরাজের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করায় টীকা শেষে তিনি লিখিয়াছেন ঃ

পূর্বসূরিকৃতিং দৃষ্ট্বা যদত্র লিখিতং ময়া।
কবিরাজবিরুদ্ধং তদ্ বিচার্যং সুমনীষিভিঃ।।

রামদাস চক্রবর্তীর 'কাতন্ত্রচন্দ্রিকা'কে 'কাতন্ত্রপরিশিষ্ট-চন্দ্রিকা' -ও বলা হয়। শেষে লিখিত আছে ঃ

দুর্গটীকাং সমালোক্য কুলচন্দ্রাদিসংগ্রহান্।
রক্ষিত-ন্যাসকারাণাং জয়াদিত্যঞ্চ সঙ্গতিম্।।
জিনেন্দ্ররুদ্রদাসানাং সাগরস্য চ সংগ্রহান্।
আদায় ধীমতা সম্যক্ শ্রীরামদাসশর্মণা।
কাতন্ত্রপরিশিষ্টস্য নিবন্ধোঽয়ং কৃতো ময়া।।

'কাতন্ত্রচন্দ্রিকা' সম্ভবতঃ সমগ্র কাতন্ত্রের উপরেই রচিত। পরিশিষ্ট ভাগের চন্দ্রিকার নামই 'কাতন্ত্রপরিশিষ্টচন্দ্রিকা'। দৌর্গ বৃত্তি এবং 'পঞ্জী' এই টীকার প্রধান অবলম্বন। শ্লোকোক্ত 'সাগর' বোধ হয় পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর। রুদ্রদাসের কোনও গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কুলচন্দ্রের গ্রন্থ 'দুর্গবাক্যপ্রবোধ'। রক্ষিত = মৈত্রেয় রক্ষিত, যিনি 'কাশিকা বিবরণপঞ্জিকা'র টীকা 'তন্ত্রপ্রদীপ' এবং পাণিনীয় ধাতুপাঠের 'ধাতুপ্রদীপ' টীকা (১১শ/১২শ খ্রীঃ শতক) রচনা করেন। রামদাসের পিতা শিবানন্দ শর্মা দীর্ঘাঙ্গিকুলসম্ভূত। কাতন্ত্রের 'ব্যাখ্যাসার' টীকার রচয়িতাও রামদাস। তবে ইনিই পূর্বোক্ত রামদাস কিনা সন্দেহস্থল। উল্লিখিত শিবরাম চক্রবর্তীর টীকার নামান্তর 'পরিশেষসিদ্ধান্তরত্নাঙ্কুর'। তাঁহার পুত্র বলিয়া অনুমিত মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অমরকোষের 'সারসুন্দরী' টীকা রচনা করেন। শঙ্কর শর্মার টীকা যে গোপীনাথের টীকার উপর রচিত তাহা ইহার নামেই প্রতিভাত। ইহার

প্রারম্ভে ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্রকে যথাক্রমে ইক্ষু ও ইক্ষু-পেষক যন্ত্রের সহিত তুলিত করিয়া রসিকগণকে তর্কপ্রয়োগে ব্যাকরণের অর্থ (রস) অধিগত করিতেই যেন বলা হইয়াছে ঃ

কৈশ্চিদিক্ষুসমং জ্ঞাতং শাস্ত্রং ব্যাকরণাদিকম্।
তর্কং যন্ত্রসমং জ্ঞেয়ং তৈরবশ্যং রসার্থিভিঃ।।
যথা যন্ত্রং বিনেক্ষূণাং ন রসঃ প্রচ্যুতো ভবেৎ।
তথা তর্কং বিনাপ্যেষাং নার্থঃ স্বাধিগতো ভবেৎ।।

বিদ্যানন্দ সূরি-রচিত 'কাতন্ত্রোত্তর' নামে এক গ্রন্থের সংবাদ পাওয়া যায়। ইহা সম্ভবতঃ কাতন্ত্রপরিশিষ্টের পরিপূরক গ্রন্থ। বিদ্যানন্দের স্থলে 'বিজয়ানন্দ' এমন কি 'সিদ্ধানন্দ' পাঠও দৃষ্ট হয়। রচয়িতার নামানুসারে 'কাতন্ত্রোত্তর'কে 'বিদ্যানন্দ'ও বলা হইত ঃ 'কাতন্ত্রোত্তরং বিদ্যানন্দাপরনামকং সমাসপ্রকরণং যাবৎ বিদ্যানন্দসূরিকৃতং ব্যাকরণম্'—বৃহট্টিপ্পণিকা। শুনা যায়, তিনি কাব্যাদর্শের টীকা, কাতন্ত্রধাতুবৃত্তি এবং ক্রিয়াকলাপ নামে ৪ অধ্যায়ে বিভক্ত শ্লোকবদ্ধ (ধাতুবিষয়ক) এক গ্রন্থও রচনা করেন। 'কাতন্ত্রপ্রকীর্ণক' সম্ভবতঃ কাতন্ত্রোত্তরের বিশেষণ বা নামান্তর। কলাপচন্দ্রে এবং ব্যাখ্যাসারে বিদ্যানন্দের উল্লেখ আছে। কাতন্ত্রপরিভাষাবৃত্তিতে ভাবশর্মা বিদ্যানন্দের নাম করিয়াছেন। পদ্মনাভদত্ত ক্রিয়াকলাপের নাম করিয়াছেন। ইহার শ্লোক সংখ্যা ৫৫। শেষের শ্লোকটি লক্ষণীয় ঃ

অত্র যে ধাতবো নোক্তা বিস্মৃত্যাবজ্ঞয়াপি বা ।
জ্ঞেয়াঃ কবীন্দ্রসংবদ্ধে ধাতুপারায়ণে চ তে।।

এখানে ধাতুপারায়ণকৃৎ জনৈক কবীন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়। বৃহট্টিপ্পণিকার পূর্বোদ্ধৃতি হইতে প্রমাণিত যে 'কাতন্ত্রোত্তরে'রই নামান্তর 'বিদ্যানন্দ'—যাহা কাতন্ত্রের সমাসপ্রকরণ পর্যন্ত রচিত বিদ্যানন্দ সূরির ব্যাকরণ। কাজেই ইহার সহিত কাতন্ত্রপরিশিষ্টের পূর্বোক্তরূপ সম্বন্ধের সম্ভাব্যতা সুদূরপরাহত। এই বিষয়ে হালদার মহাশয় তাঁহার 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থে (পৃঃ ৪৫৪) কাতন্ত্রোত্তরকে বিদ্যানন্দব্যাকরণ হইতে পৃথক্‌নির্দেশপূর্বক উহাকে যে 'কৌমারদের দৌর্গটীকার...ব্যাখ্যা' বলিয়াছেন তাহাও ঠিক নয়। আসলে বিদ্যানন্দব্যাকরণেরই প্রকৃত নাম 'কাতন্ত্রোত্তরব্যাকরণ' যাহা গ্রন্থকারের নামের অন্তরালে লুপ্তপ্রায় হইয়া তাঁহার কৃতিত্বকেই উজ্জ্বলতর করিয়াছে ঃ

বিদ্যানন্দাভিধং যেন কৃতং ব্যাকরণং স্বকম্।
ভাতি সর্বোত্তমং স্বল্পসূত্রবহ্বর্থসংগ্রহম্ ।।

শ্লোকটি হালদার-লক্ষিত এবং তাঁহার মতে বিদ্যানন্দ দেহরক্ষা করেন ১২৬৭ খ্রীষ্টাব্দে।

(১১)

টীকা-টিপ্পনীরচনার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য পাণিনীয় সম্প্রদায়ের পরেই কাতন্ত্রের স্থান। একটি ব্যাকরণকে কেন্দ্র করিয়া এত বেশী গ্রন্থরচনা, ইহার ব্যাপকতা তথা জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক। এই সব রচনার এক বৃহদংশ চিরতরে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির আকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে অযত্নে ধ্বংসোন্মুখ। কোনো কোনোটি এমন খণ্ডিতভাবে আবিষ্কৃত যে, কে ইহার রচয়িতা এবং কোন্ প্রসঙ্গে কোন্ গ্রন্থের উপরে ইহা রচিত তাহা নির্ণয় করাও প্রায় অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। পরবর্তী গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী গ্রন্থের যে পরিচয় ফুটিয়া উঠে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট এবং অকিঞ্চিৎকর। স্থলবিশেষে কেবল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু প্রণেতার নাম বাদ পড়িয়াছে। আবার বিপরীতক্রমে এমন অনেকের নাম করা হইয়াছে যাঁহাদের গ্রন্থাদির নাম অনুপস্থিত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 'তথাচোক্তম্', 'তদুক্তম্', 'শ্রূয়তে', 'ইতি প্রাচীনাঃ' ইত্যাদি কৌশলের আবরণে প্রচুর উদ্ধৃতি পাওয়া যায়—যাহার উৎস নির্ধারণ করা প্রায় সাধ্যাতীত। বলা বাহুল্য, কোনো বিখ্যাত বা অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থই একেবারে লুপ্ত হয় নাই। নিতান্ত সাধারণ স্তরের মৌলিকতাবর্জিত রচনা বিশেষতঃ উৎকট তর্কবহুল এবং বিদ্বেষপ্রসূত পুস্তকাদিই প্রায়শঃ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই এবং সেই জন্য সম্প্রদায়-হিসাবে কাতন্ত্রের তেমন কিছু ক্ষতিও হয় নাই। অন্যান্য ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও এই সব কথা ন্যূনাধিক প্রযোজ্য।

কাতন্ত্রের ব্যাখ্যাস্থানীয় গ্রন্থরাশির মধ্যে যেগুলি এখনও কোনও রূপে টিকিয়া আছে, নিম্নে তাহাদের কিছু সংবাদ সঙ্কলিত হইল। বলা বাহুল্য, ইহাদের সব কয়টিরই চিরকাল এইরূপ নিষ্প্রভ অবস্থা ছিল না। পরবর্তী গ্রন্থসমূহে ইহাদের উল্লেখ এবং সমালোচনা দেখিয়া মনে হয়, কোনো কোনটি একদা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়া যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছিল। পরে ইহাদের সারাংশের অবলম্বনে উৎকৃষ্টতর

গ্রন্থরাজির সৃষ্টি হওয়ায় ক্রমে ইহাদের পঠনপাঠনের ব্যাপকতা হ্রাস পায় এবং চরম অন্তিমে আজ ইহাদের ধ্বংসাবশেষ আসিয়া ঠেকিয়াছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হস্তলিখিত অতি দুর্লভ ২।৪ খানি কঙ্কালসার ভগ্নপত্র-পুঁথিতে। দৌর্গ বৃত্তির উপর রচিত এইরূপ কতকগুলি গ্রন্থ ঃ বর্ধমান উপাধ্যায়ের কাতন্ত্রবিস্তর, কুলচন্দ্রের দুর্গবাক্য-প্রবোধ, কর্মধর-প্রণীত কাতন্ত্রবৃত্তিপ্রকাশ, মহাদেবকৃত শব্দসিদ্ধি, হরিরাম ভট্টাচার্যকৃত কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা বা ব্যাখ্যাসার, রামনাথ চক্রবর্তীর কাতন্ত্রবৃত্তিপ্রবোধ, রঘুনন্দন ভট্টাচার্যশিরোমণির কলাপতত্ত্বার্ণব এবং অজ্ঞাতকর্তৃক মুগ্ধপ্রবোধমার্তণ্ড প্রভৃতি।

"কাতন্ত্রবিস্তর" প্রণেতা বর্ধমান ছিলেন গোবিন্দ সূরির শিষ্য এবং গুজরাটের চৌলুক্যবংশীয় রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহের (খ্রীঃ ১০৯৪-১১৪৩) সভাপণ্ডিত। তৎপ্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ 'গণরত্নমহোদধি' (১৯২,৩৩৪) হইতে জানা যায়, তিনি এই রাজার প্রশস্তিমূলক 'সিদ্ধরাজবর্ণন' নামক এক কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের (৩।৫২৮) টীকায় গোয়ীচন্দ্র 'কাতন্ত্রে বর্ধমানো ব্যাখ্যাতবান্' বলিয়া যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহা কাতন্ত্রবিস্তর হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়। 'অষ্ট(ম)মঙ্গলা'য় ইহাকে 'বিস্তরবৃত্তি' বলা হইয়াছে। গোয়ীচন্দ্রের টীকার একাধিক স্থলে (১।৬, ৪।৯৪৭, ৭।৪৫৯) বর্ধমানের লক্ষণ বা সূত্র উদ্ধৃত হওয়ায় তৎকৃত এক স্বতন্ত্র ব্যাকরণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। কৃষ্ণ মিশ্রের 'বর্ধমানসংগ্রহে' বর্ধমান-প্রণীত বলিয়া যে 'সূত্রসারপ্রক্রিয়া'র উল্লেখ আছে, তাহাই সম্ভবতঃ সেই ব্যাকরণ। উহারই আদর্শে এবং অবলম্বনে খ্রীঃ ১৪শ/১৫শ শতাব্দীর কুবের পণ্ডিত সূত্রসার (কাতন্ত্রসূত্রসার?) ব্যাকরণ রচনা করেন। 'প্রক্রিয়াসার' বা 'বর্ধমানসার'—উহারই নামান্তর। এই কুবের পণ্ডিত ছিলেন শান্তিপুরের বিখ্যাত অদ্বৈত প্রভুর (১৪৩৪-১৫৫৯ খ্রীঃ) পিতা। ইনি কুবেরোপাধ্যায় বা কুবের তর্কপঞ্চানন নামেও প্রসিদ্ধ। শ্রীহট্টের লাউড় অঞ্চলে রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রিপদে কিছুকাল নিযুক্ত থাকিয়া পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শান্তিপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ভরদ্বাজগোত্রের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। পূর্বোক্ত "বর্ধমানসংগ্রহ" সম্ভবতঃ "কাতন্ত্রবিস্তরেরই" সার সংগ্রহ। পৃথ্বীধর উপাধ্যায় - প্রণীত 'কাতন্ত্রবিস্তর বিবরণ' ঐ কাতন্ত্রবিস্তরের টীকা।

কাতন্ত্রবৃত্তিপ্রকাশের প্রণেতা কর্মধরের পিতা লক্ষ্মীধর এবং পিতামহ যশোধর। খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীয় মিথিলার রাজা রুদ্রসিংহ যশোধরকে আশ্রয়দান করেন। হুসেনশাহের মন্ত্রী দেবনাথের আদেশে কর্মধর ঐ টীকা (খ্রীঃ ১৬শ শতক) রচনা করেন। প্রারম্ভিক শ্লোকগুলি লক্ষণীয় ঃ

ত্রিলোচনখ্যাতমভিন্নদুর্গং শর্বং নমস্কৃত্য বিবিক্তবিদ্যম্।
কাতন্ত্রসূত্রার্থবিনিশ্চয়ার্থময়ং প্রযত্নঃ ক্রিয়তে শিশূনাম্।।
দুর্গত্বমুন্নীয় স পঞ্জিকায়া বৃত্তের্বিবেকে বিজয়ঃ প্রবৃত্তঃ।
বিবেচয়ংস্তদ্‌বচনানি বাগ্মী স্বয়ং পুনর্দুর্গতমো বভূব।।
ত্রিলোচনাচার্যবচঃ প্রসাদাদ্ দুর্গস্য বৃত্তিঃ সুগমা যদীয়ম্।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মে বচসোঽবকাশঃ শিলোঞ্ছবৃত্ত্যা ঘটতে তথাপি।।
কলাপকে ব্যাকরণে গভীরে সন্দেহসন্দোহমপোহয়িষ্যন্।
নিবন্ধমেতং বহুযুক্ত্যুপেতং চাচীকরৎ কর্মধরেণ তেন।।
বাররুচং পরিশিষ্টং টীকামপি বার্ধমানিকোপেতাম্।
বিদ্যানন্দপ্রভৃতীন্ সমীক্ষ্য চিরমেষ যত্নো মে।।

'ত্রিলোচনখ্যাতমভিন্নদুর্গং শর্বং' কথায় মুখ্যার্থে দুর্গাযুক্ত ত্রিলোচন শিব বুঝাইলেও ব্যাকরণপক্ষে কাতন্ত্রপঞ্জীকৃৎ ত্রিলোচন দাস, বৃত্তিকৃদ্ দুর্গসিংহ এবং কাতন্ত্রসূত্রকৃৎ শর্ববর্মা সূচিত হইয়াছেন।

কুলচন্দ্রের 'দুর্গবাক্যপ্রবোধ' রচিত হয় ত্রিলোচনের কাতন্ত্রপঞ্জিকার পরে এবং সুষেণের কলাপচন্দ্রের পূর্বে। খ্রীঃ ১৬শ শতকে রঘুনন্দন কলাপতত্ত্বার্ণবে (কৃৎ ৫।৪,৩৯,১১০) কুলচন্দ্রের মতোল্লেখ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তকৌমুদীর 'প্রৌঢ়মনোরমা' টীকায় দুর্গবাক্যপ্রবোধের নাম আছে। কুলচন্দ্র স্বীয় গ্রন্থের বহু স্থলে টীকা-পঞ্জীর বিরুদ্ধ সমালোচনাও করিয়াছেন ; যেমন, দৌর্গ বৃত্তির নমস্কার শ্লোকের 'সার্ববর্মিক ব্যাখ্যান' প্রসঙ্গে পঞ্জীকারের 'নন্বীষত্তন্ত্রং জয়দেবাদি-প্রোক্তমপ্যস্তি ইত্যাহ শার্ববর্মিকমিতি। শর্ববর্মাচার্যেণ যৎ কৃতং তৎ শার্ববর্মিকমিতি...ননু যদি ব্যাখ্যানং বৃত্তিগ্রন্থস্তৎ কথং শার্ববর্মিকমিতি ইদানীং দুর্গসিংহেন ক্রিয়মাণত্বাৎ। সত্যমেতৎ কিন্তু শর্ববর্মকৃতসূত্রসম্বন্ধাদ্ ব্যাখ্যানমপি শার্ববর্মিকমিত্যুচ্যতে উপচারাৎ'—উক্তির তীব্র সমালোচনায় কুলচন্দ্র লিখিলেন ঃ 'যে পুনঃ কাতন্ত্রশব্দস্য নানার্থকল্পনায়াং সংশয়মুৎপাদ্য সার্ববর্মিকপদেন ব্যাখ্যানং বিশেষয়ন্তস্তৎ ত এব বুধ্যন্তে ন তু মাদৃশাঃ'। অতএব কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ঃ

ত্রিলোচনো হ্যত্র সমাধিলোচনো ন দৌর্গসিংহীয়নয়ে মনো দদৌ।
যতস্তু মুখ্যার্থ ইহোপপদ্যতে ততঃ কথং স্যাদুপচারচাতুরী ।।

সুষেণ বিদ্যাভূষণ তাঁহার কলাপচন্দ্রে (= কবিরাজে) পঞ্জীকারের উপচার গ্রহণ সমর্থনপূর্বক তদ্বিরোধী কুলচন্দ্রের সমালোচনার সমুচিত জবাব দিয়াছেন।

দৌর্গ বৃত্তির আর এক টীকা কাতন্ত্রচন্দ্রিকা বা ব্যাখ্যাসার ; রচয়িতা হরিরাম চক্রবর্তী। ইহার পূর্ণনাম 'কাতন্ত্রবৃত্তিচন্দ্রিকা', যদিও বিভিন্ন প্রকরণে ইহার বিভিন্ন নাম দেখা যায়, যেমন সন্ধিচন্দ্রিকা, চতুষ্টয়প্রদীপ, আখ্যাতপ্রদীপ বা আখ্যাতচন্দ্রিকা, কৃৎপ্রদীপ বা কৃদ্দীপিকা। এই গ্রন্থে হরিরাম দৌর্গ সম্প্রদায়ের প্রায় সমস্ত পূর্বাচার্যের গ্রন্থসম্বন্ধে স্বীয় পরিচয়ের প্রমাণ রাখিয়াছেন। বৃত্তির ব্যাখ্যা করা অপেক্ষা পঞ্জীর ব্যাখ্যা দেওয়াই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। রামদাস চক্রবর্তী (সম্ভবতঃ হরিরামের বংশধর) পরিশিষ্টের চন্দ্রিকা রচনার দ্বারা এই গ্রন্থের পূর্ণতা দান করেন। পাণিনীয় সম্প্রদায়ে অনেক টীকা-টিপ্পনীর রচয়িতা এক হরিরামের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি খ্রীঃ ১৭শ/১৮শ শতাব্দীয় নাগেশ ভট্টের একাধিক গ্রন্থেরও টীকা রচনা করিয়াছেন। এই হরিরামই চন্দ্রিকাকৃৎ হরিরাম হইয়া থাকিলে তাঁহাকে ১৮শ/১৯শ শতাব্দীয় বলা চলে। কৃদ্‌ব্যাখ্যাসারের বহু স্থলে শিরোমণির (= রঘুনন্দনের) মতোল্লেখপূর্বক উহার দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত রামদাস চক্রবর্তীর আর এক গ্রন্থ 'কাতন্ত্ররহস্য'।

মহাদেবের শব্দসিদ্ধি ১৩৪০ সংবতে (খ্রীঃ ১২৮৩/৮৪) রচিত। তাহার পিতার নাম (?) পাওয়া যায় ধুন্ধুক বা ঢুন্ঢুক। মহাদেবের নামে এক 'অব্যয়কোশ' এবং মহাদেব ভট্টাচার্যের নামে 'উপসর্গবর্গ' নামক এক শ্লোকবদ্ধ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই এক ব্যক্তি না হওয়াই সম্ভব। উণাদিবৃত্তিকৃৎ এক মহাদেব বেদান্তী এবং মুগ্ধবোধের টীকাকার এক মহাদেবের উপাধি ছিল সরস্বতীকণ্ঠাভরণ। আবার অমরকোষের 'বুধমনোহরা' বা 'বিদ্বন্মনোহরা' টীকার প্রণেতা ছিলেন মহাদেব তীর্থ—যাঁহার বিদ্যাগুরুর নাম স্বয়ংপ্রকাশ তীর্থ।

কাতন্ত্রবৃত্তিপ্রবোধের প্রণেতা রামনাথ চক্রবর্তীই বোধ হয় খ্রীঃ ১৫শ/১৬শ শতাব্দীয় রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি—যিনি অমরকোষের 'লিঙ্গাদিসংগ্রহটিপ্পনী' রচনা করেন। 'কারকরহস্য' এবং 'শব্দরত্নাবলী' (বা

'শব্দসাধ্যপ্রয়োগ' বা 'শব্দসাধ্যপ্রবোধিনী') গ্রন্থের কৃতিত্বও তাঁহাতে আরোপিত। শেষোক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন বিভক্তিতে শব্দের রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

কলাপতত্ত্বার্ণব' কৃদ্‌বৃত্তির 'পাঞ্জিকাস্থানীয় টিপ্পনী। রচয়িতা রঘুনন্দন আচার্যশিরোমণিই বিখ্যাত স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। স্মৃতিগ্রন্থ উদ্বাহতত্ত্বে'র 'আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্' ইত্যাদি শ্লোকের বিচারস্থল দর্শনেও প্রতীয়মান হয় তিনি কলাপে পণ্ডিত ছিলেন। খ্রীঃ ১৬শ শতকের প্রারম্ভে নবদ্বীপে জন্ম। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় 'সময়প্রদীপ' নামক স্মৃতিগ্রন্থের রচয়িতা। স্থলবিশেষে 'কলাপতত্ত্বার্ণবে'র 'শব্দশাস্ত্রবিবৃতি' নামও দেখা যায়।

কৃৎপ্রকরণের টীকা 'কৃন্মঞ্জরী'—মাত্র ১৮টি শ্লোকে নিবদ্ধ। শিবরাম শর্মা ইহার রচয়িতা এবং ব্যাখ্যাতাও। এই ব্যাখ্যায় অন্যান্যদের মধ্যে কমলাক্ষ চক্রবর্তী, যদুনাথ, হেমকর এবং নরসিংহ চক্রবর্তীর উল্লেখ আছে। ইঁহারা কাতন্ত্রব্যাকরণের গ্রন্থাদি রচনা করিয়া থাকিবেন। শিবরামের পিতার নাম গোপীরমণ চক্রবর্তী। 'মুগ্ধপ্রবোধমার্তণ্ড'ও দৌর্গ কৃদ্‌বৃত্তির উপর রচিত। দৌর্গ বৃত্তির উপর ঢুন্টিকা বা ঢুন্টক রচনা করেন জৈন ধনপ্রভ সূরি। হৈম ব্যাকরণের ঢুন্টিকা-র অনুকরণে ইহা রচিত। খ্রীঃ ১৩শ/১৪শ শতাব্দীয় মণ্ডনাচার্যের নামে এক দৌর্গ টিপ্পনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। চাঙ্গুদাস দৌর্গ বৃত্তির টীকাকার। সর্বধর-রচিত 'বাঙ্‌ময়প্রদীপ', দুর্গবৃত্তির আখ্যাতাংশের উপর রচিত মোক্ষেশ্বরের টীকা, মেরুতুঙ্গের (খ্রীঃ ১৩৪৬-১৪১৪) 'বালাববোধ', দেবদত্তের কাতন্ত্র-বৃত্তি, রামানন্দতীর্থের 'কাতন্ত্রসংগ্রহ', ভাবসেনের 'লঘুবৃত্তি', মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের টীকা (ইহা সন্ধিপ্রকরণের উপর রচিত) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। কাতন্ত্রে রামচন্দ্র তর্কবাগীশের নামেও গ্রন্থের কথা শুনা যায়।

উল্লিখিত বালাববোধ ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। গ্রন্থকার জৈন অঞ্চল-গচ্ছীয় মহেন্দ্রপ্রভ-র ছাত্র। সর্বধরের বাঙ্‌ময়প্রদীপ সম্ভবতঃ দৌর্গ উণাদিবৃত্তির টীকা।[২৬ক] তিনি অমরকোষেরও টীকাকার। দিগম্বর জৈন ভাবসেন ত্রিবিদ্যেশ (খ্রীঃ ৯ম/১০ম শতাব্দীয়) কাতন্ত্রলঘুবৃত্তি রচনা করেন। কৃদন্ত সমগ্র কাতন্ত্রের ১৩৮৩টি সূত্রকে সজ্জিত করিয়া ইনি এক 'প্রক্রিয়াগ্রন্থও প্রস্তুত করেন—যাহাকে 'কাতন্ত্ররূপমালা' বা 'রূপমালাপ্রক্রিয়া'ও বলা হয়। ইহার ব্যাখ্যাতাও ভাবসেন। কাতন্ত্রের এই

প্রক্রিয়া-সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে মাঝে মাঝে সূত্রের সঙ্গে তদর্থজ্ঞাপক শ্লোকাবলীও প্রদত্ত হইয়াছে, যেমন ৪নং সংজ্ঞাসূত্রের পরেঃ

ক্রমেণ বৈপরীত্যেন লঘূনাং লঘুভিঃ সহ।
গুরূণাং গুরুভিঃ সার্ধং চতুর্ধেতি সবর্ণতা।।

সেইরূপ 'অঃ ইতি বিসর্জনীয়ঃ' সূত্রের পর 'শৃঙ্গবদ্ বালবৎসস্য কুমারীস্তনযুগবৎ। নেত্রবৎ কৃষ্ণসর্পস্য বিসর্গোঽয়মিতি স্মৃতঃ।।' 'রেফাক্রান্তস্যদ্বিত্বমশিটৌ বা' সূত্রের প্রসঙ্গে—'তুংবুরুং তৃণকাষ্ঠং চ তৈলং জলমুপাগতম্। স্বভাবাদূর্ধ্বমায়াতি রেফস্যৈতাদৃশী গতিঃ।। ইতি জলতুম্বিকান্যায়েন রেফস্যোর্ধ্বগমনম্।' 'চং শে' সূত্রের পরে বলা হইয়াছে—'চং শে ব্যর্থমিদং সূত্রং যদুক্তং শর্ববর্মণা। তস্যোত্তরপদং ব্রূহি যদি বেৎসি কলাপকম্।। মূঢ়ধীস্ত্বং ন জানাসি ছত্বং কিল বিভাষয়া। অচ্ছত্বপক্ষে[২৭] বচনং নূনং চং শে ব্যবস্থিতম্।।' 'স্বস্রাদীনাং চ' সূত্রপ্রসঙ্গে—'স্বসা নপ্তা চ নেষ্টা চ ত্বষ্টা ক্ষত্তা তথৈব চ। হোতা পোতা প্রশাস্তা চেত্যষ্টৌ স্বস্রাদয়ঃ স্মৃতাঃ।।' 'টাদৌ ভাষিতপুংস্কংপুংবদ্ বা'সূত্রের পর—'যন্নিমিত্তমুপাদায় পুংসি লিঙ্গে প্রবর্ততে। ক্লীববৃত্তৌ তদেব স্যাত্তদ্ধি ভাষিত পুংসকম্।। শুচি ভূমিগতং তোয়ং শুচির্নারী পতিব্রতা। শুচির্ধর্মপরো রাজা ব্রহ্মচারী সদা শুচিঃ।।' 'ভ্যসভ্যাম্' সূত্রের প্রসঙ্গে—'আদিলোপোঽন্ত্যলোপশ্চ মধ্যলোপস্তথৈব চ। বিভক্তিপদবর্ণানাং দৃশ্যতে[২৮] শার্ববর্মিকে।।' কাতন্ত্ররূপমালার দুইটি প্রধান বিভাগ—তদ্ধিতান্ত এবং তিঙ্‌কৃদন্ত। কাতন্ত্রের বঙ্গীয় সূত্রপাঠের সহিত তুলনায় কিছু কিছু সূত্রের অভাব ইহাতে দৃষ্ট হয়, আবার এমন কতকগুলি নূতন সূত্রের বিন্যাসও দেখা যায় যাহাদের আংশিক বা কথঞ্চিৎ সন্ধান দৌর্গ বৃত্তিতে মিলে। রূপমালার ভাবসেনকৃত বৃত্তিই বোধ হয় পূর্বোক্ত 'কাতন্ত্রলঘুবৃত্তি'। উপাধিসহ তাঁহার পূর্ণ নাম 'বাদিপর্বতবজ্র ভাবসেন ত্রিবিদ্য'। গ্রন্থারম্ভে বর্ধমানমহাবীরকে নমস্কার করা হইয়াছে। সর্বশেষে এই ব্যাকরণকে নমস্কার করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

যত্রার্হৎপদসন্দর্ভাদ্ বর্ণাম্নায়ঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তস্মৈ কৌমারশব্দানুশাসনায় নমোনমঃ।।

'কাতন্ত্ররূপসিদ্ধি' বোধ হয় ঐ রূপমালা জাতীয় গ্রন্থ। রচয়িতা অজ্ঞাত। গঙ্গাদাস আচার্যের ব্যাখ্যালেখা এবং গৌতম-রচিত দীপিকা, কাতন্ত্রের ব্যাখ্যাস্থানীয় পুস্তক। গৌতম বীরসিংহ উপাধ্যায়ের ছাত্র। 'কাতন্ত্রদীপক',

'কৌমারসমুচ্চয়' (পদ্যাত্মক), 'লঘুললিতবৃত্তি' প্রভৃতি ঐ ধরনের গ্রন্থ। বিবিধ গ্রন্থের প্রণেতা বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাধর সেন (১৭৯৮-১৮৮৫) কলাপের এক ব্যাখ্যা রচনা করেন। যশোহর জেলার মাগুড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম এবং কর্মস্থান মুর্শিদাবাদের সৈদাবাদে। পিতা ভবানীপ্রসাদও চিকিৎসক ছিলেন। কলাপ-ব্যাখ্যা ভিন্ন গঙ্গাধর কাত্যায়ন-বার্ত্তিকের 'উদ্ধার' নামে বৃত্তি, 'ত্রিসূত্র ব্যাকরণ' নামে দুইখানি (?) পদ্যাত্মক ব্যাকরণ, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকা, ধাতুপাঠ ও গণপাঠ এবং 'শব্দ-ব্যুৎপত্তিসংগ্রহ' বা 'ত্রিকাণ্ডশব্দশাসন' নামে কোষবিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেন বলিয়া শুনা যায়। শেষোক্ত পুস্তক, অমরকোষের উপর রচিত। অলঙ্কার এবং স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। শাস্ত্রীয় প্রমাণের ভিত্তিতে একাধিক গ্রন্থ লিখিয়া তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদে চরকসংহিতার উপরে তাঁহার টীকা আছে। ইহার নাম 'জল্পকল্পতরু'। কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন।

(১২)

দৌর্গ টীকা এবং ত্রিলোচনের পঞ্জীর উপরেও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। দৌর্গ টীকার উপর পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগরের 'কাতন্ত্রপ্রদীপ' অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহার নামান্তর 'কলাপপ্রদীপ' বা 'বিদ্যাসাগর'। বিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌমের পিতৃব্যপুত্র তিনি। পিতা শ্রীকান্তপণ্ডিত, পিতামহ রত্নাকর। বাসুদেব খ্রীঃ ১৫শ/১৬শ শতাব্দীয় ; পুণ্ডরীকাক্ষও সেই সময়ের। তাঁহার টীকার কিছু বিচ্ছিন্নাংশ মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'সপ্তমঙ্গলা' নামে মুদ্রিতাংশও এই বিদ্যাসাগরী টীকারই অংশ। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁহার 'বঙ্গে নব্য ন্যায়চর্চ্চা' গ্রন্থে (পৃঃ ৫৪-৭) পুণ্ডরীকাক্ষ-প্রণীত বিভিন্নবিষয়ক যে ১০খানি গ্রন্থের নাম দিয়াছেন, তম্মধ্যে কাতন্ত্রপ্রদীপ, ন্যাসটীকা, কারককৌমুদী, কলাপদীপিকা এবং কাতন্ত্রপরিশিষ্টের টীকা প্রধানতঃ ব্যাকরণসম্পর্কিত। কাতন্ত্রপ্রদীপ-সম্বন্ধে দীনেশবাবুর প্রণিধানযোগ্য উক্তি ঃ

> ...কারকপ্রকরণের ১২টি সূত্রের টীকা ক্ষুদ্র অক্ষরে ঘনভাবে বৃহদাকার পত্রে মুদ্রিত (গুরুনাথ বিদ্যানিধি-সম্পাদিত কলাপ ব্যাকরণ, সন ১৩১২) হইয়াও ৬৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী বটে ; ইহা হইতে এই গ্রন্থের আকার অনুমান করা যায়। যাঁহারা ধৈর্য্য সহকারে এই অশুদ্ধিবহুল মুদ্রিত ব্যাখ্যা পাঠ করিবেন, তাঁহারাই

বুঝিতে পারিবেন, কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লইয়া বিদ্যাসাগর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে এক জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন বলিলে একটুও অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের বিষয়, কলাপব্যাকরণের এক দুরূহ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা বিলয়প্রাপ্ত হইল ; বাঙ্গালী তাহার সম্যক্ আস্বাদগ্রহণে বঞ্চিত। বিদ্যাসাগরের বৈশিষ্ট্য, তিনি অধিকাংশ স্থলে পূর্ব্বগামী গ্রন্থকারদের নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদের মতের খণ্ডন-মণ্ডন করিয়াছেন। তিনি কাতন্ত্রের টীকাকার হইলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য পাণিনিতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঙ্গালাদেশে প্রাচীন কাল হইতে পাণিনিতন্ত্রের যে এক বিশিষ্ট প্রস্থান গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার গ্রন্থসমূহ হইতে তিনি প্রচুর উপকরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—ন্যাসকার ইন্দুমিত্র (অনুন্যাসকার), মৈত্রেয় রক্ষিত, পুরুষোত্তম, শরণদেব, সীরদেব প্রভৃতির সন্দর্ভ তিনি পদে পদে আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মৈত্রেয় রক্ষিতের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মুদ্রিত কারকপ্রকরণের ক্ষুদ্র অংশেই বিদ্যাসাগর কিঞ্চিন্ন্যূন একশত বার তাঁহার মত ও সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন —অধিকাংশ স্থলে 'রক্ষিত' নামে, অনেক স্থলে 'মৈত্রেয়' নামে এবং কতিপয় স্থলে 'তন্ত্রপ্রদীপ' গ্রন্থ নামে। মৈত্রেয় রক্ষিতই বিদ্যাসাগরের পরম প্রমাণস্বরূপ ছিলেন এবং অনুমান হয়, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি নিজ গ্রন্থের নাম 'কাতন্ত্রপ্রদীপ' রাখিয়াছিলেন (ঐ, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৫৪-৫)।

পুণ্ডরীকের 'কলাপদীপিকা'—ভট্টিকাব্যের টীকা। কলাপ বা কাতন্ত্রের মতানুসরণে ('কাতন্ত্রবর্ত্মনা') রচিত বলিয়া ঐ নাম। ইহাতে (১।৩) কাতন্ত্রপ্রদীপের উল্লেখ থাকায় তৎপরে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। অসামান্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই রচনায় তাঁহার 'পাণিনিপ্রক্রিয়ায়াং মে প্রসিদ্ধত্বান্ন কৌতুকম্। কলাপপ্রক্রিয়া তস্মাদপ্রসিদ্ধা চ কথ্যতে।।' উক্তি লক্ষণীয়। এই টীকায় তাঁহার 'ইতি ন্যাস-টীকায়াং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ' ইত্যাদি উক্তি হইতে প্রমাণিত যে, এই টীকা ঐ ন্যাস-টীকারও পরে রচিত। এই ন্যাস কোন্ ন্যাস তাহা নিশ্চিত রূপে জানা না গেলেও ইহা যে বঙ্গদেশে প্রচলিত জিনেন্দ্রবুদ্ধির ন্যাস (= কাশিকা বিবরণ-পঞ্জিকা) তাহা অনুমান করা চলে। ভট্টিটীকায় পুণ্ডরীকাক্ষ তিনটি

অলঙ্কার-গ্রন্থের উপরেও কলাপানুযায়ী টীকা রচনার কথা বলিয়াছেন। দীনেশবাবুর মতে ইহাদের একটি 'কাব্যপ্রকাশে'র টীকা, একটি 'কাব্যাদর্শে'র টীকা এবং অপরটি সম্ভবতঃ বামনের 'কাব্যালঙ্কারে'র টীকা। এই সব হইতে প্রতীয়মান হয়, প্রসিদ্ধ পাণিনীয় প্রক্রিয়ার তুলনায় 'অপ্রসিদ্ধা কলাপপ্রক্রিয়া'কে যথোচিত প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিতে তিনি যেন সকৌতুক আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থই এখন আর পাওয়া যায় না। তবে কি পাণ্ডিত্যবাহুল্যই এই অবস্থার জন্য দায়ী? ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত রমানাথের 'মনোরমা'য় (ইহা দৌর্গ ধাতুবৃত্তির টীকা), রঘুনন্দনের কলাপতত্ত্বার্ণবে, হরিরামের এবং রামদাসের কাতন্ত্রচন্দ্রিকায়, নরহরি তর্কাচার্যের পঞ্জীব্যাখ্যায়, সুষেণের কলাপচন্দ্রে, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতির অমরকোষ-টীকায়—এককথায় পরবর্তী প্রায় সমস্ত বঙ্গীয় গ্রন্থকার—তাঁহার নাম ও সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। 'সুপদ্মব্যাকরণে'র মতানুসরণে কন্দর্প চক্রবর্তী ভট্টিকাব্যের যে টীকা ('কন্দর্প-টীকা') রচনা করেন তাহাতে বিদ্যাসাগরের ভট্টিটীকার উল্লেখপূর্বক লিখিত হইয়াছে ঃ

বিদ্যাসাগরটীকায়াং কাতন্ত্র-প্রক্রিয়া যতঃ।
সুপদ্মপ্রক্রিয়া তস্মাৎ তস্যামেব প্রণীয়তে।।

স্বস্ব ব্যাকরণ-পাণ্ডিত্যের নৈপুণ্যপ্রদর্শনই যেন মুখ্য উদ্দেশ্য। খ্রীঃ ১৬শ শতকের শেষ দিকে মুকুন্দ শর্মা ভট্টির 'কলাপচন্দ্রিকা' নামে যে টীকা রচনা করেন তাহা বহুলাংশে বিদ্যাসাগরী টীকার নিকট ঋণী। এইরূপ ঋণী ভট্টির অপর টীকাকার ভরত মল্লিকও। তিনি খ্রীঃ ১৭শ শতকের মধ্যভাগে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মতানুসরণে ভট্টিটীকা 'মুগ্ধবোধিনী' প্রণয়ন করেন। কামদেব ঘোষ নামক জনৈক কালাপক, ভট্টিকাব্যের 'পদকৌমুদী' টীকা রচনা করিয়া একাধিক স্থলে বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত খণ্ডনে চেষ্টিত হইয়াছিলেন।

কাতন্ত্রপঞ্জিকার ব্যাখ্যা 'পঞ্জিকাপ্রদীপ' রচনা করেন কুশল[২৯] নামক পণ্ডিত। আর এক টীকা 'পঞ্জিকোদ্দ্যোত' রচনা করেন ত্রিবিক্রম। তিনি বর্দ্ধমানের শিষ্য। তাঁহার পিতা রাঘবাচার্য খ্রীঃ ১১শ শতকে গৌড়দেশ হইতে গুজরাটের অনহিলবাড়পত্তনে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন। নরহরির টীকার নাম 'পঞ্জীবাক্যপ্রবোধ' বা 'পঞ্জিকাপ্রবোধ'। ইহা সম্ভবতঃ কেবল আখ্যাতপ্রকরণের উপর রচিত। পঞ্জিকার ভুল ব্যাখ্যা

সংশোধন করাই নরহরির টীকারচনার উদ্দেশ্য। ১২২১ সংবতে (খ্রীঃ ১১৬৪/৬৫) লিখিত ত্রিবিক্রমের উদ্দ্যোত-টীকার পুঁথি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। পঞ্জী-টীকা 'আখ্যাতাষ্টমমঙ্গলা' আখ্যাতের ৮ম পাদের উপর রামকিশোর চক্রবর্তীর রচনা। ইহাকে সংক্ষেপে 'অষ্ট (ম) মঙ্গলা' বলা হয়। রামকিশোর ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, উপাধি ছিল তর্কালঙ্কার। পূর্ববঙ্গের মেহারে সর্ববিদ্যাবংশে (অর্থাৎ কালীসাধক সর্বানন্দের বংশে) তাঁহার জন্ম। ১৭৯১খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কাশীর সংস্কৃত কলেজে তিনি ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তৎপ্রণীত আর এক গ্রন্থ 'শব্দবোধপ্রকাশিকা'। পঞ্জিকার আর এক টীকা 'পঞ্জীনিবন্ধ'। ইহার রচয়িতা হেমকর। কলাপতত্ত্বার্ণবে (খ্রীঃ ১৬শ শতক) বহুবার উদ্ধৃত হওয়ায় ইনি তৎপূর্ববর্তী সাব্যস্ত হইয়াছেন। জৈন পণ্ডিত প্রবোধমূর্তি গণি (বা লেশপ্রবোধমূর্তি গণি) ১৩২৮ সংবতে (খ্রীঃ ১২৭১/৭২) 'পঞ্জিকাদুর্গপদপ্রবোধ' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। খরতরগচ্ছীয় জিনেশ্বর (বা জিনদত্ত) সূরি তাঁহার গুরু। সূরিপদলাভের পর প্রবোধমূর্তির নাম হয় জিন প্রবোধ সূরি। সূরি হওয়ার আগেই এই টীকা রচিত হয়। ১৩৪১ সংবতে ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন। ইহার ১০ বৎসর পরে প্রহ্লাদপুরে শিষ্য জিনেন্দ্র সূরি-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাঁহার মূর্তি স্তম্ভতীর্থে (গুজরাটের Cambay) বিদ্যমান।

'কারকরত্ন' নামে এক গ্রন্থের কর্তৃত্ব দুর্গসিংহে আরোপিত। ইহাতে কবিরাজের উল্লেখ থাকায় গ্রন্থকার খ্রীঃ ১৭শ শতকের পরবর্তী হইতেছেন। গ্রন্থের কর্তৃত্বজ্ঞাপনায় ভুল না থাকিলে কালাপক '৩য় দুর্গসিংহে'র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। টীকাকার দুর্গসিংহের নামে কারকবিষয়ক ১৪ টি কারিকা (শ্লোক) প্রচলিত। এইগুলিকে 'ষট্‌কারক-কারিকা' বলা হয়। রভস নন্দী ইহাদের উপর এক টীকা রচনা করেন। সেই টীকার নাম বোধ হয় 'সম্বন্ধোদ্দ্যোত'। টীকাকারের নাম পুঁথিভেদে কোথাও বল্লভানন্দ এবং কোথাও বা মহেশ নন্দী। আধুনিকযুগে অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি কারকপ্রকরণের 'যতোঽপৈতি ভয়মাদত্তে বা তদপাদানম্' ইত্যাদি ৭টি (চ. ২১৪-২০) প্রধান সূত্রের 'কৌমুদী' নামে এক টীকা প্রস্তুত করেন। ঐ সব সূত্রের দৌর্গ বৃত্তি এবং পঞ্জী-কবিরাজাদির পরিপ্রেক্ষায় রচিত এই টীকার মুদ্রিত পুস্তকে ইহাকে 'ষট্‌কারকবিবেকে'র টীকা রূপে দেখানো হইয়াছে। বহু গ্রন্থের প্রণেতা

অন্নদাচরণ ছিলেন পূর্বোক্ত সর্ববিদ্যা-বংশীয়। নোয়াখালি জেলার সোম-পাড়া গ্রামে অবস্থানকালে তিনি এই টীকা রচনা করেন। কৃৎপ্রকরণের 'বিমলা' টীকা তাঁহার ব্যাকরণ-সম্পর্কিত অপর গ্রন্থ। ১৮৬১ খ্রীঃ উক্ত গ্রামে তাঁহার জন্ম। প্রথমে নোয়াখালি জেলাস্কুলে হেডপণ্ডিত এবং পরে ক্রমে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, 'ধর্মশাস্ত্র-কোষে'র সম্পাদনা, মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ (খ্রীঃ ১৯২২) এবং কাশীপ্রাপ্তি। অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার কৃতিত্বপূর্ণ গ্রন্থ আছে।

(১৩)

কাতন্ত্রগণমালাকে অবলম্বন করিয়া দৌর্গ সম্প্রদায়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, যেমন ঃ রমানাথ চক্রবর্তীর 'মনোরমা' বৃত্তি,রামকান্তের ধাতুঘোষা বা ধাতুসাধন, ষষ্ঠীদাস বিশারদের ধাতুমালা, দনোকাচার্যের ধাতুলক্ষণ, বঙ্গসেন-কৃত ধাতুরূপ বা আখ্যাতবিবরণ, কাশীনাথ মিশ্রের ধাতুসংগ্রহ, বিজয়ানন্দ বা বিদ্যানন্দের ক্রিয়াকলাপ, উৎসবকীর্তির পদরোহণ, কালিদাস-রচিত ধাতুপ্রবোধ, কবিচন্দ্র-প্রণীত ধাতুসাধন প্রভৃতি; এই সবের বেশীর ভাগই ধাতুরূপাত্মক। পূর্বোক্ত মনোরমা বিখ্যাত টীকা। 'বসুবাণভবনগণিতে শাকে (১৪৫৮ শকাব্দে = খ্রীঃ ১৫৩৬/৩৭) ধর্মদ্রবীতীরে' 'বেদগর্ভতর্কাচার্যাত্মজ রায়িকুলপ্রসূত' রমানাথ শর্মা এই 'কাতন্ত্রধাতুবৃত্তি' রচনা করেন। ধর্মদ্রবীতীরে কোন স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল জানা যায় নাই (ধর্মদ্রবী = গঙ্গা)। মনোরমার প্রারম্ভে লিখিত আছে ঃ

> প্রায়েণ ধাতুবৈষম্যাৎ সর্বেষাং ঘূর্ণ্যতে শিরঃ।
> যা তৎ ক্রিয়ায়ৈ প্রভবেৎ সৈব বৃত্তির্মনোরমা।।
> ভূরিসূরিকৃতা বৃত্তির্ভূয়সী যুক্তযুক্তিকা।
> নিশ্চেতুং ধাতবস্তস্যাং ন শক্যাস্তেন মে শ্রমঃ।।

ব্রহ্মাদিত্য ভট্টের পুত্র গোবিন্দ ভট্ট কাতন্ত্রধাতুপাঠের 'শিষ্যপ্রবোধিকা' নামে আর এক টীকা রচনা করেন।

রামকান্ত চক্রবর্তীর গ্রন্থে ভূ, স্থা, গম্, দৃশ্, অস্, দা, হৃ, ভ্রা, গ্রহ ও চিন্তি—এই দশ ধাতুর অর্থসহ সমস্ত বিভক্তিতে এবং কৃদন্ত রূপসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে ঃ

> যদ্যপি বহবো ধাতবস্তথাপি গ্রন্থগৌরবভয়াৎ ঝটিতি সর্বধাতু-সাধনানুসন্ধানধীজনকত্বাচ্চ বৃদ্ধসম্মতা দশৈবাত্র নিবধ্যন্তে। যদুক্তং

বৃদ্ধৈঃ 'ভূস্থাগমদৃশোঽস্তিদাহৃত্ত্বা গৃহ্লাতি চিন্ত্যঃ। দশৈতে পুরতো জ্ঞেয়াঃ শীঘ্রজ্ঞানায় ধাতবঃ।।' ইতি।

অন্যত্র অস্ এবং হৃ ধাতুর পরিবর্তে হন্ ও কৃ ধাতুর উল্লেখ দেখা যায়। প্রায় অসংখ্য ধাতুর মধ্যে বাছাই করা উক্ত দশটি ধাতুর রূপ আয়ত্ত করার এই প্রাচীন রীতিকে আধুনিক 'short cut' বলা চলে। কবিচন্দ্রের ধাতুসাধনেও আদিতে এইরূপ দশধাতুর বর্ণনা আছে। ইহা ১৪১১ শকাব্দে (১৪৮৯/৯০ খ্রীঃ) রচিত। মহানন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে (?) ('মহানদ্যাঃ সমীপস্থো জাহ্নবীক্ষেত্র সন্নিধৌ') গোপালপুরে ষষ্ঠীদাসের ধাতুমালা রচিত হয়। ইহাতে মনোরমা-র উল্লেখ আছে। জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশের পুত্র ষষ্ঠীদাস বৈদিক ব্রাহ্মণ। দনোকাচার্যের গ্রন্থের অন্য নাম ধাতুমালা। ইহাতেও ভূ, স্থা, গম্ ইত্যাদি ১০ ধাতুর রূপবর্ণনা আছে। বঙ্গসেনের গ্রন্থের 'ধাতুব্যাকরণ' নামও শুনা যায়। গঙ্গাধরের (গদাধরের?) পুত্র বঙ্গসেন খ্রীঃ ১১শ/১২শ শতাব্দীয়। কাঞ্চিকানগরে বাস। কাহারও মতে এই কাঞ্চিকা বা কাঞ্জিকাই রাঢ়ের কাঞ্জিবিল্লী গ্রাম। তাঁহার বৈদ্যক গ্রন্থের নাম চিকিৎসাসারসংগ্রহ। অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ের টীকায় হেমাদ্রি (খ্রীঃ ১৩শ শতক) বহু স্থলে বঙ্গসেনের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। কাশীনাথ মিশ্রের ধাতুসংগ্রহে ধাতুগুলির অর্থ ও রূপাদর্শ বিদ্যমান। Rosen সাহেব ল্যাটিন ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। পদরোহণের প্রণেতা উৎসবকীর্তি নেপালের লোক। 'সারঙ্গধরোপাধ্যায়' তাঁহার উপাধি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে উৎসবকীর্তি-রচিত 'পদসূর্যপ্রকরণ' বা 'পদসূর্যপ্রক্রিয়া'ই 'পদরোহণ' বা 'পদারোহ' এবং ইহাতে তিনি গুহ অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়-রচিত যে ভিন্ন ব্যাকরণের আভাস দিয়াছেন তাহার কিয়দংশই নাকি গরুড়পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অভিনব কালিদাস 'নানার্থশব্দরত্ন' কোষের প্রথমে সূর্যনাম-সংশ্লিষ্ট যে ব্যাকরণ শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নাকি এই 'পদসূর্যপ্রক্রিয়া'। আবার কাহারও মতে 'পদরোহণ' 'পদসূর্যপ্রক্রিয়া'রই সংক্ষেপ। ইহার প্রারম্ভিক উক্তি হইতে কিন্তু ইহাকে খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না :

শর্ববর্মগুণাদীনামনুসাদায় ভাস্বরম্।
পদসূর্যোময়োদ্দ্যোতো লিখ্যতে ধ্বান্তশান্তয়ে।।
ক্রিয়াকারকসংজ্ঞাধ্বা বিনা বাক্যেন দুর্ঘটঃ।
বিভক্তিদ্বয়যোগেন যত্তদ্বোধমদুর্ঘটম্।।

উদেতি পদসূর্যোঽয়ং স্বস্তধ্বান্তস্য নাশকঃ।
তমোহীনেন চিত্তেন দৃশ্যতে নির্মলং পদম্।।

গ্রন্থকারের নামের স্থলে 'মিশ্রোপাধ্যায়সারঙ্গ' বা 'মিশ্রসারঙ্গোপাধ্যায়'ও দৃষ্ট হয়। রামগোবিন্দ চক্রবর্তীর আদেশে 'ধাতুপ্রবোধ' রচনা করেন কামদেব বাচস্পতির পুত্র কালিদাস। পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণাভুক্ত পয়সাগাঁও গ্রামের অধিবাসী মহোপাধ্যায় পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ ধাতুসূত্রীয় কবিরাজের (অর্থাৎ 'কলাপ-চন্দ্র' টীকার) এক পত্রিকা (অধ্যাপনার্থ অধ্যাপকের স্বহস্তলিখিত টিপ্পনী-বিশেষ) রচনা করেন। কলাপব্যাকরণে অসাধারণ পাণ্ডিত্যহেতু তিনি 'কালাপকেশরী' বলিয়া অভিহিত। বাখরগঞ্জ জেলার চাঁদসী গ্রামনিবাসী সীতানাথ ভট্টাচার্য সিদ্ধান্তবাগীশ ১৮৪৬ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৯২৪/২৫) কাতন্ত্রগণমালা-র 'শিশুবোধিনী' ব্যাখ্যা রচনা করেন। বলা বাহুল্য, এই 'গণ' ধাতুর গণ—'গণ্যতে সম্যক্ খ্যায়তে প্রতিপাদ্যতে বা ধাতুতত্ত্ব-মনেনেতি গণঃ'। 'দণ্ডক ধাতুবৃত্তি'—কলাপব্যাকরণের আর এক ধাতু-বিষয়ক পুস্তিকা। আখ্যাতের 'ক্রিয়াভাবো ধাতুঃ' (৯) সূত্রের উপর রচিত 'আখ্যাতমঞ্জরী' এক খণ্ড-পুস্তক। আখ্যাতের রুচাদি৩০ সূত্রসমূহের উপর যে বৃত্তি আছে তাহা মধুসূদন-রচিত। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে (খ্রীঃ ১৮৯৬/৯৭) হরিনাথ শাস্ত্রী রুচাদিবৃত্তির 'সুবোধিনী' টীকা রচনা করেন।

গণ অর্থে সমূহ—'গণশব্দঃ সমূহবচনঃ'—রামচন্দ্র তর্কবাগীশ (মুগ্ধ-বোধটীকা ১১)। ব্যাকরণে গণ বলিতে প্রধানতঃ ধাতুগণ এবং শব্দগণ বা নামগণ বুঝায়। কৃৎপ্রকরণের (৫।৮২) বৃত্তিতে দুর্গসিংহের 'ভিদাদিভ্যো নামগণনির্দিষ্টেভ্য এব' উক্তির পঞ্জীতে ত্রিলোচন দাস 'ধাতুগণ' এবং 'নামগণে'র পৃথগুল্লেখ করিয়াছেন। ভ্বাদি, অদাদি, জুহোত্যাদি ক্রমে দশগণে বিন্যস্ত ন্যূনাধিক ২০০০ ধাতুর একত্র সংগ্রহকে 'ধাতুপাঠ' বলা হয়। দৌর্গ সম্প্রদায়ে ইহা 'গণমালা' নামে প্রসিদ্ধ। দুর্গবৃত্তিতে (কৃৎ ৫।৮২, ৬।৯৫) ইহাকে (?) 'গণপাঠ'ও বলা হইয়াছে। সেখানকার '...সংগ্রাম যুদ্ধ ইতি গণপাঠো জ্ঞাপয়তি' (কৃৎ ৬।৯৫) উক্তির প্রথম পদ দুইটি কিন্তু পাণিনীয় ধাতুপাঠের (চুরাদিগণীয়) ধাতুসূত্র 'সংগ্রাম যুদ্ধে' (১৯২২)। বস্তুতঃ কাতন্ত্রে 'নামগণ' বা প্রাতিপদিকপাঠ বা (শব্দ) গণপাঠ নাই ; একদা থাকিলেও এখন পাওয়া যায় না, যদিও সূত্রাংশে এইসব গণের উল্লেখ রহিয়াছে :

স্বস্রাদি, সর্বাদি, ত্যদাদি, গর্গাদি, যস্কাদি, বিদাদি, কুঞ্জাদি, বাহ্বাদি, গবাদি, শরৎপ্রভৃতি, পচাদি, নন্দ্যাদি, গ্রহাদি, ভিদাদি, ভীমাদি, ন্যঙ্ক্বাদি, গম্যাদি, কেবলাদি, কদ্রাদি, ছন্দোগাদি, সোমাদি, পূর্বাদি, অল্লাদি, দৃগাদি, মুহাদি, নিষ্ঠাদি, পূরণ্যাদি, অত্র্যাদি, রুধাদি, রুচাদি, জ্বলাদি, যষ্ট্যাদি প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে ধাতুগণ এবং নামগণ দুই-ই বিদ্যমান। কিছু কিছু পরিবর্তন সহ এইগুলির অধিকাংশই মূলত পাণিনীয় গণপাঠ হইতে গৃহীত। যে দুই-চারিটির সন্ধান সেখানে পাওয়া যায় না তাহাদের গঠন বৃত্তিভাগে দেখানো হইয়াছে ; অন্যগুলির বর্ণনা দিয়াছেন টীকাকার দুর্গসিংহ। কেবলাদি, কদ্রাদি, ছন্দোগাদি ও সোমাদিগণ কাতন্ত্রের ছন্দঃপ্রক্রিয়ার অন্তর্গত।

'সমাসান্তগতানাং বা রাজাদীনামদন্ততা' ইত্যাদি কম-বেশী ৬০টি সূত্রের উপর রত্নেশ্বর চক্রবর্তীর টীকা আছে। 'কাতন্ত্রবার্ত্তিকপাঠ' নামে এক পৃথক্ অমুদ্রিত বার্ত্তিকপাঠ এই ব্যাকরণসম্প্রদায়ে বর্তমান। ইহাতে দৌর্গ বৃত্তি হইতে সঙ্কলিত বার্ত্তিকসমূহ রহিয়াছে।

পূর্ববর্ণিত ধাতুরূপাদর্শের পুস্তকসমূহের মতো একাধিক শব্দরূপাত্মক পুস্তকও দৌর্গ সম্প্রদায়ে রচিত হইয়াছে। রামনাথ চক্রবর্তীর 'শব্দসাধ্য-প্রবোধিনী', ভৈরব মিশ্র প্রণীত 'শব্দসাধনসংগ্রহ', জনার্দনের 'শব্দরত্ন', রামকান্ত-কৃত 'শব্দসাধন', গোপীনাথ শর্মার 'শব্দমালা', রামচন্দ্র-কৃত 'শব্দার্ণব' এবং অজ্ঞাত-কর্তৃক 'শব্দাবলী'—এই জাতীয় গ্রন্থনা। নেপালে প্রচলিত 'সুবন্তপ্রকরণ'—এই ধরনের গ্রন্থ। 'শব্দসাধন ব্যাকরণে'র নামও পাওয়া যায়। ইহাই রামকান্তের 'শব্দসাধন' কি না বলা যায় না। শব্দরত্ন নামে একাধিক গ্রন্থ ছিল।

কাতন্ত্রের অবলম্বনে যে সব সংগ্রহাত্মক ও সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে তাহাদের প্রায় সবই অর্বাচীন কালের সৃষ্টি। তন্মধ্যে সংগ্রাম সিংহ-রচিত 'বাল-শিক্ষা'ই বোধহয় বেশী পুরাতন। এই সংগ্রাম সিংহ গুর্জরদেশীয় এবং মালবংশীয় ঠক্কুর ক্রূর সিংহের পুত্র। ইঁহাদিগকে শ্রীমালী ব্রাহ্মণ বলা হয়। স্থল-বিশেষে ১৩৩৬ সংবৎ (১২৭৯/৮০ খ্রীষ্টাব্দ) ঐ গ্রন্থের রচনাকাল বলা হইয়াছে। অন্য মতে গ্রন্থকার খ্রীঃ ১৬শ/১৭শ শতাব্দীয়। এই মতই বোধহয় ঠিক। নরহরির 'বালকবোধ' —এই জাতীয় অপর গ্রন্থ। আর এক গ্রন্থ মুরারি-রচিত 'রত্নসার ব্যাকরণ'। বর্ধমানের 'কাতন্ত্রবিস্তর' ইহার প্রধান্ উপজীব্য। হরিদ্রার রাজ-

পুত্রের জন্য এই ব্যাকরণ রচিত হয়। পূর্বোক্ত 'সূত্রসার ব্যাকরণ' কলাপের সংক্ষেপ। রামকুমার ন্যায়ভূষণ-রচিত 'কলাপসার' নামে এক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের সন্ধান মিলিয়াছে। ইহা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক রচনা। বন্দ্যোপাধ্যায়বংশীয় রামকুমারের পিতা পাঁচচড়-নিবাসী রামগতি বাচস্পতি। রাজা গোপীমোহনের আদেশে মুগ্ধবোধ, সারস্বত ও কলাপ ব্যাকরণের সারসংগ্রহপূর্বক এই নূতন সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ রচিত। দুঃখের বিষয় এই প্রচেষ্টা আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই। ঐ গোপীমোহন যদি কলিকাতা-পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশের গোপীমোহন ঠাকুর (১৭৬০-১৮১৯) হন তবে রামকুমার অবশ্যই খ্রীঃ ১৮শ/১৯শ শতাব্দীয়। কলাপের বিশেষ প্রয়োজনীয় সূত্রগুলির সোদাহরণ সংগ্রহাত্মক 'কলাপ-সংগ্রহ', আর এক প্রচেষ্টার ফল। সঙ্কলয়িতার নাম জানা যায় নাই। এই নামে আর যে গ্রন্থ আছে তাহার রচয়িতা শম্ভুনাথ সেন কবিভূষণ। ইহার নামান্তর 'কাতন্ত্রসংগ্রহ'। ফরিদপুর জেলার বামুনকান্দি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এই শম্ভুনাথ। তিনি পুস্তক সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তদ্ধিত ও কৃৎ সঙ্কলনের পূর্বেই ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৭৮ খ্রীঃ) ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। এই পুস্তকে কাতন্ত্রের কতকগুলি সূত্রকে ন্যূনাধিক পরিবর্তনসহ গ্রহণ করা হইয়াছে; যেমন কাতন্ত্রের প্রথম সূত্রটির নূতন রূপ দেওয়া হইয়াছে : 'সিদ্ধোঽত্র বর্ণানাং ক্রমঃ।' এইসব সূত্রের ব্যাখ্যাতাও শম্ভুনাথ নিজেই।

(১৪)

বিচিত্র এই গ্রন্থরাজি ; ততোধিক বিচিত্র এই সব গ্রন্থরচনার পশ্চাৎপট। কত আশা আকাঙ্ক্ষা, কি বিপুল প্রেরণা এবং উৎসাহ ইহাদের মূলে কার্যকরী ছিল তাহার সংবাদ কোথায়? কোথায় ইহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির ও জয়-পরাজয়ের ইতিহাস? ক্ষণিকের বুদ্‌বুদের মতো সেই অলিখিত ইতিহাস কালস্রোতে চিরতরে বিলীন হইয়া গিয়াছে! তাহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাজড়িত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ব্যতীত আমাদের আর কি-ই বা করণীয় আছে!

বৃত্তি-টীকা সব ব্যাকরণেরই থাকে। ব্যাকরণ-সাহিত্যের আধিপত্য বিস্তারে ইহাদের প্রভাব অপরিমেয়। তথাপি বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে এই প্রধান গ্রন্থগুলিকে সরাইয়া রাখিয়া তদানুষঙ্গিক অন্যান্য রচনাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এই পরিপ্রেক্ষায় এক পাণিনীয় সম্প্রদায়ভিন্ন

অন্য কোনও ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ই কাতন্ত্রের মতো এত অধিক বৈচিত্র্যের অধিকারী নয়। গঙ্গেশ শর্মার 'কাতন্ত্রকৌমুদী' এই ধরনের এক বিচিত্র রচনা। ইহাতে সংস্কৃত সাহিত্যের 'সৈষ দাশরথী রামঃ সৈষ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ। এসৈষ রথমারুহ্য মথুরাং যাতি মাধবঃ।।' ইত্যাদি ধরনের বহু অসংস্কৃত ব্যবহার বা প্রয়োগের কাতন্ত্রসম্মত সমাধান প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রারম্ভে বলা হইয়াছে ঃ 'শর্ব (অর্থাৎ শর্ববর্মা)-কৃত সূত্রানুসন্দেহে বিপরীতপদস্য সিদ্ধির্জ্ঞাতব্যা।' এই গ্রন্থরচনা করিতে বসিয়া গঙ্গেশ নিজেকে এই বিষয়ে চন্দ্রগোমী, দুর্গসিংহ এমন কি কাত্যায়ন অপেক্ষাও বড় পণ্ডিত বলিয়া জাহির করিয়াছেন ঃ

ন চন্দ্রগোমী ন চ দুর্গসিংহঃ কাত্যায়নশ্চাপি তথা ন বেদ।
যথাহমালোকিতসর্বশাস্ত্রঃ কাতন্ত্রতন্ত্রার্থবিনিশ্চয়াদ্যঃ।।

রমাকান্ত চক্রবর্তীর 'বিভক্তিতত্ত্ব'—কাতন্ত্রের বাদার্থজাতীয় গ্রন্থ। ইহাতে কাতন্ত্রসূত্র, পরিশিষ্টকারিকা, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা-কারিকা ও কাতন্ত্রের ব্যাখ্যাগ্রন্থাদি হইতে বিশেষ স্থলসমূহের উদ্ধারপূর্বক বাদার্থের পদ্ধতিতে প্রথমাদি বিভক্তিসমূহের প্রাঞ্জল আলোচনা করা হইয়াছে। রমাকান্তের অপর গ্রন্থ 'সারনির্ণয়'। দৌর্গ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থে ধৃত পাণিনি প্রভৃতি অন্য ব্যাকরণের সূত্রাদির ব্যাখ্যামুখে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচিত। রমাকান্তের পিতা মধুসূদন তর্কবাগীশ ছিলেন পূর্বোক্ত রত্নেশ্বর চক্রবর্তীর ভ্রাতা। ইঁহাদের পূর্বাপর কয়েক পুরুষ দীর্ঘকাল কলাপব্যাকরণের চর্চা এবং গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। রত্নেশ্বরের পিতামহ রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি (১৫শ/১৬শ খ্রীঃ শতক) অমরকোষের টিপ্পনী রচনা করেন। ইঁহারই ভ্রাতা রমানাথ কাতন্ত্রধাতুপাঠের 'মনোরমা' ব্যাখ্যার রচয়িতা। রত্নেশ্বরের পিতার নামও রমানাথ। তিনি 'বক্তব্যবৃত্তি'র প্রণেতা। জয়দেব চক্রবর্তীর নামেও বক্তব্যবৃত্তির পুঁথি আছে। রমানাথের 'ত্রিকাণ্ডবিবেক' এবং রত্নেশ্বরের 'রত্নমালা'—অমরকোষের কাতন্ত্রসম্মত টীকা। আখ্যাতের রুচাদি-বৃত্তিকার মধুসূদনই বোধহয় উল্লিখিত মধুসূদন তর্কবাগীশ। রামকান্ত বিদ্যাবাগীশ-রচিত 'শব্দরহস্য'—কাতন্ত্রের দার্শনিক গ্রন্থ। ব্যাকরণের দর্শনস্থানীয় এই গ্রন্থে অন্যান্যদের সহিত গঙ্গেশ্বর উপাধ্যায়, চিন্তামণিকৃৎ, সাগরসিদ্ধান্ত-প্রদীপ, পরমানন্দ চক্রবর্তীর উল্লেখ আছে। রামকান্তের পিতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। ইঁহারাও সম্ভবতঃ ঐ রত্নেশ্বর চক্রবর্তীর বংশীয় হইবেন।

খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দী নাগাদ কবিকণ্ঠহার 'চর্করীতরহস্য' নামে এক ক্ষুদ্র শ্লোকাত্মক পুস্তিকা রচনা করেন। ইহা লুপ্তচেক্রীযিত ধাতু-বিবরণ। 'রহস্য' বলার কারণ দেখানো হইয়াছে—'...চর্করীতানাং ধাতূনামিতি অতি গূঢ়ব্যুৎপাদকমিদং শাস্ত্রং রহস্যত্বেন নিরূপিতম্'—ঐ ব্যাখ্যা। পুস্তকের ৫ম-১০ম শ্লোকে চর্করীতের স্বরূপ বর্ণিত। ৫ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছেঃ '...চেক্রীযিতলুকিনিষ্পন্নো ধাতুশ্চর্করীতাভিধঃ।' পাণিনিমতে পৌনঃপুন্য অর্থে ধাতুর উত্তর যে যঙ্ (যাহার য্ থাকে) প্রত্যয় হয়, কাতন্ত্রমতে তাহাই 'চেক্রীযিত' সংজ্ঞায় অভিহিত ('ধাতোর্যশব্দশ্চেক্রীযিতং ক্রিয়াসমভিহারে')। মহাভাষ্যেও (৪।১।৭৮) যঙন্ত বুঝাইতে চেক্রীযিত শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। তাই ইহার ব্যাখ্যায় প্রদীপকৃৎ কৈয়ট লিখিয়াছেন ঃ 'যঙঃ পূর্বাচার্যসংজ্ঞা চেক্রীযিতমিতি।' সুতরাং যঙন্ত = চেক্রীযিতান্ত। এখন, এই যঙ্ প্রত্যয়ের লোপ অর্থাৎ যঙ্লুক্ বা লুপ্তচেক্রীযিত বুঝাইতে চর্করীত সংজ্ঞার ব্যবহার অতিপ্রাচীন। নিরুক্তে (২।২৮, ৬।২২) ইহার উল্লেখ আছে। পাণিনীয় ধাতুপাঠে অদাদিগণের শেষে চর্করীত সংজ্ঞার ব্যবহার আছে। [যঙন্ত ও যঙ্লুগন্ত ধাতুসমূহ যথাক্রমে আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী হইয়া থাকে।] পুরুষোত্তমদেব (খ্রীঃ ১২শ শতক) তাঁহার ভাষাবৃত্তিতে (২।৪।৭২) লিখিয়াছেন ঃ 'চর্করীতমিতি যঙ্লুকঃ প্রাচাং সংজ্ঞা।' মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে (১।২) সায়ণাচার্য ঃ 'চর্করীতমিতি যঙ্লুগন্তস্য পূর্বাচার্যব্যপদেশঃ।' কৃধাতুর উত্তর যঙ্লুক্ করিয়া লট্ 'তি' বিভক্তিতে যে 'চর্করীতি' পদ হয়, তাহা হইতেই চর্করীত সংজ্ঞার উদ্ভাবনা। যঙ্লুগন্ত = চেক্রীযিতলুগন্ত = চর্করীত। কাতন্ত্রে বৃত্তিকার দুর্গসিংহ চর্করীত স্বীকার না করিলেও পরিশিষ্টকার শ্রীপতি এবং উত্তরপরিশিষ্টকার ত্রিলোচন দাস ইহাকে স্বীকৃতি দিয়াছেন ঃ

> যস্ত্বাহ ভাষায়াং চর্করীতং নাস্তীতি তন্মতমেবাদৃতবান্ বৃত্তিকারঃ। যস্ত্বাহ ভাষায়াং চর্করীতমস্তীতি তন্মতমাশ্রিত্য চর্করীতাভ্যাসস্যেতি সূত্রিতবান্ পরিশিষ্টকারঃ। অতএবোত্তরপরিশিষ্টে তস্য লুক্ চর্করীতঞ্চ বহুলমিত্যাদিকং সূত্রিতং মদ্‌গুরুণেতি।—কবিকণ্ঠহার (ঐ ব্যাখ্যা)।

মহাভাষ্য, নির্লূরবৃত্তি, চান্দ্র ব্যাকরণ, সুপদ্মব্যাকরণ, কাশিকাবৃত্তি, ভাগবৃত্তি এবং রসবদ্‌ব্যাকরণ (সংক্ষিপ্তসার) হইতে (সংস্কৃতে) যঙ্লুক্

গ্রহণের পক্ষে প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে এই চর্করীতরহস্যে। ইহার মূলগ্রন্থ বলিতে মাত্র ২৪টি শ্লোক। তন্মধ্যে প্রথম চারি শ্লোকে পুস্তকের ভূমিকা এবং শেষ শ্লোকে নিজের কিঞ্চিৎ পরিচয় বর্তমান। ইহাদের ব্যাখ্যাও কবিকণ্ঠহার-রচিত। তিনি কাতন্ত্রোত্তর-পরিশিষ্টকৃৎ ত্রিলোচন দাসের পুত্র এবং পরিভাষা-টীকাকৃৎ মাধবদাস কবিচন্দ্রের পৌত্র। রাজা রামচন্দ্রের (বার ভূঁইয়ার অন্যতম?) দ্বারপণ্ডিতরূপে কলাপব্যাকরণের অধ্যাপনায় রত হইয়া তিনি স্বীয় উপাধ্যায়-পুত্র কবি সার্বভৌমের প্রার্থনায় এই পুস্তক রচনা করেন। গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য-সম্পাদিত এবং ১৩১২ বঙ্গাব্দে (খ্রীঃ ১৯০৫/৬) কলিকাতায় প্রকাশিত কলাপব্যাকরণের ৪র্থ খণ্ডের উপান্তে চর্করীতরহস্য ব্যাখ্যাসহ মুদ্রিত হইয়াছে।

কলাপচন্দ্র, ব্যাখ্যাসার প্রভৃতি গ্রন্থে এমন কয়েকজন কালাপক পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়, যাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির সন্ধান না পাওয়া গেলেও, আনুষঙ্গিক উদ্ধৃতি ও প্রসঙ্গ হইতে বুঝা যায় যে তাঁহারা কাতন্ত্রে এক বা একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ একদা সবিশেষ প্রামাণিক আচার্যরূপেও পরিগণিত হইতেন, যেমন ঃ উমাপতি, দুর্গাদিত্য, যদুনাথ, হেমমালী, শ্রীকণ্ঠ, কেশবাচার্য, নরসিংহ চক্রবর্তী, কমলাক্ষ চক্রবর্তী, ভট্টনন্দন, শ্রুতপাল প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে শেষোক্ত জন সর্বাধিক প্রাচীন এবং সম্ভবতঃ অন্য সম্প্রদায়ের বৈয়াকরণ। দুর্গসিংহ কৃৎপ্রকরণের (১।৪১, ৬৮, ৬।৭৬) টীকায় শ্রুতপালের মতোল্লেখ করিয়াছেন। টীকার এক স্থলে (কৃৎ ১।৬৮) তাঁহার নামে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ 'শ্রুতপালোঽপ্যাহ বৃহয়তীত্যেতৎ ক্বচিদপি মাভূদিত্যুপসংখ্যায়তে।' জৈন শাকটায়নের অমোঘবৃত্তিতে (৪।১।২৫২) 'শ্রুতপালস্তু গ্রহণং মন্যতে' লিখিত হওয়ায় তিনি তৎপূর্ববর্তী অর্থাৎ খ্রীঃ ৯ম শতাব্দীর পূর্ববর্তী প্রমাণিত হইতেছেন। উমাপতি বোধ হয় লক্ষ্মণ সেনের (খ্রীঃ ১২শ শতক) সভ্য উমাপতি ধর নহেন। হালদার মহাশয় বলিয়াছেন উমাপতি সেন। ব্যাখ্যাসারে তাঁহার নামে বিবিধ কারিকা উদ্ধৃত হওয়ায় প্রতীয়মান হয়, তিনি ব্যাকরণবিষয়ক কোনও শ্লোকবদ্ধ গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন যাহা এখন আর পাওয়া যায় না। গ্রন্থের কাঠিন্যই বোধহয় ইহার অবলুপ্তির কারণ। তন্নামে প্রাপ্ত কয়েকটি শ্লোক ঃ

কর্মস্থঃ পচতে ভাবঃ কর্মস্থা চ ভিদেঃ ক্রিয়া।
অস্ত্যাদিভাবঃ কর্তৃস্থঃ কর্তৃস্থা চ গমেঃ ক্রিয়া।। (আখ্যাত ৭৫)
পরাদিত্বেঽপি সর্বস্যৈ ন বিসর্গঃ কথঞ্চন।
বিরামেঽন্তর্গতস্যৈব সাহচর্যাদদূষণম্।। (চ. ৪৩)
পরা ইতি স্যাদি বিশেষণত্বাৎ পুংস্যাহ কশ্চিৎ স ন বেত্তি কিঞ্চিৎ।
বিভক্তয়ো বা প্রথমাদয়ো বা স্যুঃ স্যাদয়ো বোভয়তঃ স্ত্রিয়স্তাঃ।।
(চ. ২)
বিভক্তিপক্ষে প্রথমা দ্বিতীয়া দ্বাবেব ঘট্ত্বং কিল জস্শসোঃ স্যাৎ।
যেনৈব সিদ্ধং নিয়মোঽপি তেন নাম্নেত্যসিদ্ধং স্ফুটমেব যাতম্।।
(চ. ৩)
সত্তার্থতা যস্য ভুবঃ প্রয়োগে নানার্থতাকল্পনয়াভিধেয়া।
অতো ন সর্বং ভবতীতি দেশ্যং যথেষ্টমন্যে প্রলপন্তি চান্যৎ।।
(কৃৎ ২।২১)
দেবায়েতি কৃতে দীর্ঘে কাযিহেতি কথং ন হি।
একপদাশ্রিতো দীর্ঘো ন তু ভিন্ন পদাশ্রিতঃ।। (সন্ধি ৭০)
আদেশবানেষ ইতীহ যস্মাৎ অতঃ সকারো যদি তৎপ্রকারঃ।
তদা সলুপ্তস্বর এব যুক্তঃ স্যদাদিরেতাদৃশ এব যুক্তঃ।।
(সন্ধি ৭৬)

কলাপতত্ত্বার্ণবে (কৃৎ ১।২০, ২।১৩, ৪।৩২, ৫।৯, ৬।৩, ৫৬) এবং ব্যাখ্যাসারে (কৃৎ ১।৬) দুর্গাদিত্যের উল্লেখ হইতে মনে হয় কাতন্ত্রে বিশেষতঃ কৃৎপ্রকরণে তাঁহার রচিত গ্রন্থ ছিল। হেম ও হেমকরের উল্লেখপ্রাচুর্য ঐসব গ্রন্থে লক্ষণীয়। কলাপতত্ত্বার্ণবে 'হেম' বোধহয় সর্বাধিক উল্লিখিত ; সেখানে হেমকরের উল্লেখ (কৃৎ ৩।৫৭, ৪।১৪, ৫।১৬, ৯৩, ৯৫) অপেক্ষাকৃত কম। ব্যাখ্যাসারে (কৃৎ ২।৮) এবং 'কৃন্মঞ্জরী'র ব্যাখ্যায় হেমকরের মতোল্লেখ আছে। তত্ত্বার্ণবের 'হেমোক্তবচনমসঙ্গতমিতি সাগরঃ' (কৃৎ ৪।১৪) উক্তির 'সাগর' যদি পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর হন—(এবং তাহা একরূপ নিঃসন্দেহ) তবে এই হেম খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীয় বা তৎপূর্ববর্তী। কৃদ্ ব্যাখ্যাসারে (১।৪৩, ৫।১০৫, ৫।১০৮) হেমমালী, শ্রীকণ্ঠ এবং কেশবাচার্যের নাম পাওয়া যায়। শ্রীকণ্ঠ নামে একজন অমরকোষ-টীকাকার ছিলেন। হেমমালীর নামে উদ্ধৃত 'অঙ্কুর্ব্রণোধসি ক্লীবে পিষ্টপে স্যাদুপদ্রবে' ইত্যাদি শ্লোকাংশ

হইতে মনে হয় তিনি কোনও শব্দকোষ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কৃদ্‌ব্যাখ্যাসারেই (২।২১) অনুরূপ উল্লেখ ঃ 'তদুক্তং ভট্টনন্দনেন— ভবতীত্যেষ সত্তায়াং প্রাপ্তিসম্পত্তিজন্মসু।' কৃন্মঞ্জরীর ব্যাখ্যায় নরসিংহ চক্রবর্তী এবং কমলাক্ষ চক্রবর্তীর উদ্ধৃতি হইতে প্রতীয়মান হয় প্রথমজন কাতন্ত্রের (কৃদংশের) টীকাকার এবং দ্বিতীয় জনও সম্ভবতঃ তাহাই ; উদ্ধৃতাংশ লক্ষণীয় ঃ 'অত্র উপমানোপমেয়য়োরেকব্যক্ত্যাধারতা, যথা—রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব ইতি কমলাক্ষ চক্রবর্তী।' হেমকর-রচিত 'পঞ্জীনিবন্ধ' নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে।

(১৫)

পাণিনির (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতক) পর ভোজদেবের (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' ব্যতীত আর কোন ব্যাকরণেই একাধারে বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের জন্য সূত্রাবলী রচিত হয় নাই। অন্য সব ব্যাকরণই একমাত্র সংস্কৃতভাষা-শিক্ষার উপযোগী করিয়া রচিত, তন্মধ্যে কেবল সংক্ষিপ্তসার ও হৈম ব্যাকরণের শেষে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণও সূত্রিত হইয়াছে। কাতন্ত্রে সংস্কৃত বাদে বৈদিক বা প্রাকৃত ব্যাকরণ আচরিত হয় নাই। আধুনিক যুগে ইহার বৈদিক অভাব পূরণ করিতে চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (১৮৩৬-১৯১০ খ্রীঃ) 'কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ প্রক্রিয়া' প্রণয়ন করেন। লৌকিক ব্যাকরণকে বৈদিক মর্যাদাদানের অভিনব প্রচেষ্টাই বটে! ষড়্ বেদাঙ্গের অন্যতম অঙ্গরূপে যে ব্যাকরণের (অর্থাৎ ব্যাকরণ-বিদ্যার) সূচনা, কালে সেই ব্যাকরণেরই বেদ-চর্চা পরিহার ও লৌকিক (বৈদিক ভাষা হইতে পৃথক্ করিয়া সংস্কৃতকে লৌকিক 'ভাষা' বলাই প্রাচীন রীতি) সংস্কৃত-চর্চাধিগ্রহণও ব্যাকরণ-শাস্ত্রের ইতিহাসে কম অভিনব ব্যাপার নয়। ফলে, ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্বচ্যুতি—যাহা আর্য দৃষ্টিতে পরম দোষাবহ। তবে বেদেও অনেক লৌকিক শব্দের ব্যবহার থাকায় 'লোকবেদসাধারণতয়া' লৌকিক ব্যাকরণের বৈদিকত্ব একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই।

ছন্দঃপ্রক্রিয়ার সূত্র ও বৃত্তি উভয়ই চন্দ্রকান্ত-রচিত। মোট ৫২৩টি সূত্রকে প্রধানতঃ সন্ধি, নাম্নি চতুষ্টয়, আখ্যাত এবং কৃৎ এই চারি প্রকরণে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। প্রকরণগুলির পাদসংখ্যা যথাক্রমে ৪, ৬, ৪ এবং ৪। শেষ প্রকরণের ৩য় পাদে বৈদিক উণাদি (প্রত্যয়ান্ত)

শব্দ এবং ৪র্থ পাদে কয়েকটি নৈঘণ্টুক শব্দ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাখ্যারচনায় চন্দ্রকান্ত দৌর্গ রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। স্থল-বিশেষে দুর্গসিংহের উক্তিও উদ্ধৃত হইয়াছে। পাণিনি-সূত্র, পাতঞ্জল মহাভাষ্য, কাত্যায়ন-বার্ত্তিক, কাশিকাবৃত্তি এবং সিদ্ধান্তকৌমুদীর সাহায্য এই গ্রন্থ রচনায় প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করা হইয়াছে। মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত, লঘুশব্দেন্দুশেখর এবং প্রৌঢ়মনোরমার সাহায্যের কথাও গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন। এক কথায় পাণিনীয় তন্ত্রই এই রচনার প্রধানতম ভিত্তি। বলা বাহুল্য ইহা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না, কারণ বৈদিক ব্যাকরণের আর কোনো মৌলিক গ্রন্থনিদর্শন দুর্লভ। সরস্বতী কণ্ঠাভরণের বৈদিকাংশও পাণিনি-ভিত্তিক। পাণিনি-অনুপদিষ্ট কতকগুলি পদের ব্যুৎপত্তিও চন্দ্রকান্ত দেখাইয়াছেন ঃ

> ...পাণিন্যাদিভিরননুশিষ্টান্যপি কতিচিৎ পদানি প্রয়োগদর্শনাদিহ ব্যুৎপাদিতানি। প্রয়োগদর্শনাদেব ক্বচিৎ ক্বচিৎ পাণিনিতন্ত্ররীতি-মননুসৃত্য প্রয়োগানুসারিণী রীতিরনুসৃতা।—অনুক্রমণিকা।

পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায় সেরপুর গ্রামে চন্দ্রকান্তের পৈতৃক নিবাস। পিতা রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ, মাতা ব্রহ্মময়ী। নবদ্বীপে নানা শাস্ত্রে শিক্ষালাভের পর চন্দ্রকান্ত ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা গভঃ সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকপদে বৃত হইয়া ১৮৯৭ খ্রীঃ অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার কর্তৃক ভারতের বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিদানের রীতি প্রবর্তিত হইলে ঐ বৎসরই তিনি এই উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া প্রণীত হয়। ১৮৯৭ খ্রীঃ তিনি কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রীগোপালবসুমল্লিক-ফেলো নির্বাচিত হন। কলি. এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সঙ্গেও তিনি বিশেষ ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। ২।২।১৯১০ তারিখে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

খ্রীঃ ২০শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতাস্থ পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশের হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০-১৯১৪ খ্রীঃ) 'গান্ধর্বকলাপব্যাকরণ' নামে এক অভিনব গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃতে রচিত এই গ্রন্থ কলিকাতায় গিরীশ বিদ্যারত্ন প্রেস হইতে শশিভূষণ কীর্তিরত্ন কর্তৃক ১৮২৪ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৯০২)

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য, ইহাতে সঙ্গীতশাস্ত্রের তথ্য ও তত্ত্বগুলিকে কাতন্ত্রিক সূত্রের ধাঁচে ফেলিয়া তদনুরূপ একটি সূত্রাত্মক গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের নিজের ভাষায় ঃ 'কলাপব্যাকরণোক্ত সূত্রানুরূপগান্ধর্বশাস্ত্রীয়সূত্রজাতম্।' গ্রন্থের একদিকে কলাপের সূত্রাবলী প্রদর্শনপূর্বক অপরদিকে তদনুরূপ গান্ধর্ব সূত্রসকল বর্ণিত হইয়াছে, যেমন ঃ

কলাপে— 'অকারাদিহকারান্তা বর্ণমালা প্রকীর্তিতা।' গান্ধর্বে— 'ষড়্‌জাদিনিষাদান্তা স্বরমালা প্রকীর্তিতা। শারীরং নাদসম্ভূতিঃ স্থানানি শ্রুতয়স্তথা।।'

কলাপে— 'তত্র চতুর্দশাদৌ স্বরাঃ।' গান্ধর্বে—'তত্র চ সপ্ত স্বরাঃ। স্বয়ং যো রাজতে নাদঃ স স্বরঃ পরিকীর্তিতঃ। স ঋ গ ম প ধ নি।'

কলাপে— 'পূর্বো হ্রস্বঃ।' গান্ধর্বে—'একমাত্রো হ্রস্বঃ। স ঋ গ ম প ধ নি।'

কলাপে— 'তে বর্গাঃ পঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ।' গান্ধর্বে—'তে বর্গা উদাত্তাদিষু সপ্ত সপ্ত সপ্ত। উদারায়াং ষড়্‌জাদি সপ্ত। মুদারায়াং ষড়্‌জাদি সপ্ত। তারায়ামপি ষড়্‌জাদি সপ্ত।' ইত্যাদি।

কলাপের সংজ্ঞা, সন্ধি, চতুষ্টয় ইত্যাদির ন্যায় এই গ্রন্থেও প্রকরণবিভাগ করা হইয়াছে। ব্যাকরণের প্র, পরা, অপ ইত্যাদি ২০ উপসর্গের অনুরূপ 'তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী...' ইত্যাদি ২২টি উপসর্গ দেখানো হইয়াছে—'সঙ্গীতে দ্বাবিংশতিরুপসর্গাঃ' এই সূত্রের অধীনে।

সঙ্গীত-শাস্ত্রের সহিত ব্যাকরণ-শাস্ত্রের সাদৃশ্যজ্ঞাপক ইহা এক অপূর্ব গ্রন্থ। শব্দব্রহ্ম বা নাদব্রহ্মের দিক্ দিয়া এই উভয় শাস্ত্রের মধ্যে মূলতঃ একটা দার্শনিক তথা বাস্তব ঐক্য থাকিলেও উহারই ভিত্তিতে অন্যান্য বিভাগেও ইহাদের এইরূপ ব্যাপক সমন্বয়-প্রদর্শন-চেষ্টা ইতঃপূর্বে আর দেখা যায় নাই। অবশ্য প্রাতিশাখ্যাদিতে এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ইহার ইঙ্গিত বহু পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল।[৩১] অন্যান্য শাস্ত্রে শৌরীন্দ্রমোহনের পাণ্ডিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবল ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে পাণ্ডিত্যের জন্যই তিনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবেন। সঙ্গীতই ছিল তাঁহার প্রাণ। বঙ্গদেশে মার্গসঙ্গীত প্রচারের জন্য তিনি

আমৃত্যু নানাবিধ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতে অবদানের জন্য তিনি ভারতসরকারের নিকট হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। এমন কি ভারতের বাহিরে সুদূর উত্তর আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া রাজ্য হইতেও এইজন্য তাঁহাকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

---

১ 'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেনেতি ব্যাকরণম্।'

২ অনুশিষ্যন্তেঽসাধুশব্দেভ্যো বিবিচ্য জ্ঞাপ্যন্তেঽনেনেতি শব্দানুশাসনম্'—নাগেশ ভট্ট (ম. প্র. উ.)

৩ ...প্রতিশাখং ভবং প্রাতিশাখ্যম্।'—মাধবীয় ধাতুবৃত্তি (১।৭০) তত্র হি তত্তচ্ছাখাগতানামেব শব্দানাং প্রতিপাদনং...।'—নাগেশ ভট্ট (ম. প্র. উদ্দ্যোত)

৪ সভাপতির অভিভাষণ, সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ৩৬ ভাগ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬-৭

৫ কাতন্ত্রশব্দো লোকে কৌমারব্যাকরণে রূঢ় ইতি জয়দেবাদিতন্ত্রং ন প্রতীয়তে ইতি চন্দ্রঃ'—নমস্কার শ্লোকের টীকা।

৬ ঈষৎ শব্দঃ স্বল্পার্থবাচকঃ।...তস্যাল্পত্বং পাণিন্যপেক্ষয়া। ননু কাতন্ত্রশব্দঃ কৌমারব্যাকরণে রূঢ় ইতি।'

৭ 'উপজ্ঞাতং প্রথমকৃতমিতি দত্তম্। যৎ কেনাপি ন কৃতং তৎ প্রথমকৃতং জ্ঞেয়ম্। বিনোপদেশেন জ্ঞাতমিত্যন্যে।...কালাপমিতি কলাপিনোপজ্ঞাতমিত্যর্থঃ।'—বালতোষণী

৮ 'ককারাদীনাং হলিতি পাণিনীয়সংজ্ঞা। ব্যঞ্জনমিতি শ্রৌতসংজ্ঞা। তমেবোপজীব্য কৌমারব্যাকরণে "কাদীনি ব্যঞ্জনানী"তি সূত্রিতম্।...ঘোষোষ্মাদিসংজ্ঞাপি কৌমারে সূত্রিতা।'—সায়ণ

৯ 'শ্রীতত্ত্বনিধি'র মুদ্রিত পুস্তকে কিন্তু শ্লোকটি দৃষ্ট হয় না।

১০ কথিত আছে ঃ 'দ্বাদশভির্বর্ষৈস্তাবদ্ ব্যাকরণং শ্রূয়তে'—পঞ্চতন্ত্র (অর্থাৎ ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে সাধারণতঃ ১২ বৎসর সময় দরকার।)

১১ রাজা কশ্চিন্মহিষ্যা সহ সলিলগতঃ খেলয়ন্ পাণিতোয়ৈঃ
সিঞ্চংস্তাং ব্যাহৃতোঽসাবতিসলিলতয়া মোদকং দেহি দেব।
মূর্খত্বাত্তন্ন বুদ্ধ্বা স্বরঘটিতপদং মোদকস্তেন দত্তো-
প্যাজ্ঞী প্রাজ্ঞী ততঃ সা নৃপতিমপি পতিং মূর্খমেনং জগর্হ।।

১২ রাজধানীযুক্ত স্থানকে পত্তন বলে ঃ '...রাজধানিকান্বিতং পত্তনম্'—টীকাসর্বস্ব (২।২।১)

১৩ Detailed Report of a Tour in search of Sanskrit Manuscripts made in Kasmir, Rajputana and Central India, 1877.

১৪ Archaeological Survey of India, Vol. V, p. 20 (Archaeological Report 1872-73)

১৫ '...Andhra, a name applied to the people of the Telugu-speaking tract at the mouth of the Godavari and the Krishna,...kings of this line are invariably referred to as Satavahana and a "district of the Satavahanas" has been proved to lie in the neighbourhood of Bellary in the Kanarese area of the Madras Presidency. The memory of the

dynasty lingers in the story of the king Salivahana famous in Indian folk-lore.'—An Advanced History of India, 1965, p. 115

১৬ ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক (১৮৮৪-১৯৮২) রচিত 'সাতবাহন নরপতি হালের গাথা সপ্তশতী' নামক গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধ রচনায় ইতিহাসগত সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে (Hala's Gathasaptasati—Calcutta, 1956.)

১৭ দ্রষ্টব্য : 'On the Aindra School of Sanskrit Grammarians' by A.C. Burnell, Mangalore, 1875

১৮ পেগানের সদ্ধম্মঞাণ থের খ্রীঃ ১৪শ শতকে পালি ভাষায় কাতন্ত্রব্যাকরণের অনুবাদ করেন।

১৯ এক মতে চীনের তুরফানে কাতন্ত্রের খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে কাতন্ত্রের কুমারলাতকৃত ব্যাখ্যা বর্তমান। দ্রষ্টব্য : H. Luders, Katantra und Kaumaralata, Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, XXV. pp. 483-583, Berlin, 1930, এবং A. B. Keith, A History of Sanskrit Literature, London, 1920, p. 431.

২০ দ্রষ্টব্য : Julius Eggeling-সম্পাদিত 'কাতন্ত্র' (১৮৭৪)। কাতন্ত্রের বাররুচ বৃত্তির হস্তলিখিত পুঁথিতেও কিন্তু 'নাম্নি চতুষ্টয়ে ষষ্ঠঃ পাদঃ সমাপ্তঃ'—এইরূপ দেখা যায়।

২১ চতুষ্টয়ের প্রথম পাদের প্রথম সূত্র হইতে 'বিভক্তি', দ্বিতীয় পাদের প্রথম সূত্র হইতে 'সখি' এবং তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্রের 'যুষ্মৎ' শব্দ একত্রে 'বিভক্তিসখিযুষ্মদ্ভিঃ' পদের দ্বারা (উক্ত তিন পাদে) চতুষ্টয়ের একপাদ নির্দিষ্ট বুঝিতে হইবে।

২২ পরমার্থসারের ব্যাখ্যাতা যোগরাজ (খ্রীঃ ১০ম শতক) কাশ্মীরদেশীয় কাতন্ত্রের পাদপ্রকরণসঙ্গতিতে লিখিয়াছেন : 'কৃতস্তব্যাদয়ঃ সোপপদানুপপদাশ্চ যে। লিঙ্গপ্রকৃতিসিদ্ধ্যর্থং তাঞ্জগৌ শাকটায়নঃ।।' স্থলটি হালদার-দৃষ্ট, ব্যাকরণ দ. ইতিহাস, প্রাক্কথন, পৃঃ ৭১

২৩ আখ্যাত শব্দের মোটামুটি অর্থ এখানে ক্রিয়া। 'কর্ম্মবাচ্যে আ—চক্ষিঙ্ + ক্ত = আখ্যাত।' ত্যাদি বিভক্তিকে আখ্যাত বলে। অন্য ব্যাকরণে 'দশলকার-বিশিষ্টত্বমাখ্যাতত্বম্' এইরূপ লক্ষণ বলা হইয়াছে। লকার শব্দের অর্থ ত্যাদি বিভক্তি। আখ্যাত শব্দ ত্যাদিতে যোগরূঢ়। এখানে ত্যাদ্যন্ত পদসাধক সূত্রসকলও আখ্যাতশব্দের তাৎপর্যলভ্য অর্থ বলিতে পারা যায়। '...তথা চ আখ্যাতং ক্রিয়াপ্রধানমিতি টীকাকারাঃ'—গুরুনাথ বিদ্যানিধি।

২৪ 'A fact to note about this dhatupatha is that it has greatly influenced the later development of the P. Dh. through Maitreyaraksita. There are many roots (like khurd, manth, sphurch, met, mut, ruth, luth etc.) which must have crept from the Kt. Dh. into the P. Dh. through M, seeing that though they have been regularly read by M, Ks. did not find them in his version of the P. Dh. but added them on the express authority of Durga. And this is not to be wondered at, since M hails from Bengal which had been a stronghold of the Kt.'—G.B. Palsule, The Sanskrit Dhatupathas..., Poona, 1961, p. 53. [P. Dh. —পাণিনীয় ধাতুপাঠ, Kt. Dh.—কাতন্ত্র ধাতুপাঠ, M—মৈত্রেয়রক্ষিত, Ks.—ক্ষীরস্বামী]

২৫ গুরুনাথ বিদ্যানিধি-কর্তৃক সম্পাদিত এবং প্রকাশিত (কলিকাতা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ) কলাপব্যাকরণের চতুর্থ খণ্ডে (কৃদ্বৃত্তিঃ) 'কবিরাজ' নামে যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা

আসলে রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের কলাপতত্ত্বার্ণব। গুরুনাথ তৎপ্রকাশিত ঐ ৪র্থ খণ্ডের বিজ্ঞাপনে এই ভুল স্বীকার করিয়াছেন।

২৬ অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রাবলীকে বৈদিক এবং লৌকিক এই দুই ভাগে সজ্জিত করিয়া তাহাদের উপর রচিত বৃত্তিকে 'ভাগবৃত্তি' বলে। শ্রীধর ইহার এক টীকা রচনা করেন।

২৬ক গুরুপদ হালদার বলেন : 'উপাধ্যায়সর্ব্বস্বপ্রণেতা সর্ব্বধর উপাধ্যায় দুর্গপ্রণীত ঔণাদিকবৃত্তির প্রথম টীকাকার।'—ব্যা. দ. ই. (১ম খণ্ড), পৃঃ ৫৮৪

২৭ কাতন্ত্রের সন্ধিপ্রকরণের 'বর্গপ্রথমেভ্যঃ... ' ইত্যাদি সূত্রমতে যেই শ্‌কার স্থানে ছ্‌ হয়না সেই অচ্ছত্বপক্ষীয় শ্‌কার পরে থাকিলে 'চং শে' সূত্রানুসারে ত্‌কার স্থানে চ্‌কার হইবে, যেমন তচ্‌শ্মশানম্‌ (= তৎ + শ্মশানম্‌)।

২৮ ব্যাঘ্রভূতি-কথিত এই শ্লোকটির আসল রূপ : 'আদিলোপশ্চান্তলোপো মধ্যালোপস্তথৈব চ। বিভক্তিপদবর্ণানাং ক্রিয়তে শব্দবেদিভিঃ।।' মুগ্ধবোধসম্প্রদায়ে কথিত আছে : 'ত্রয়ো যত্রৈকবর্গীয়া মধ্যমস্তত্র লুপ্যতে।'

২৯ শরৎচন্দ্র দাস তাঁহার 'Indian Pandits in the Land of Snow' (1893) গ্রন্থে (পৃঃ ৫৪) এক কুসলের (Kusala) নাম করিয়াছেন। তিনি খ্রীঃ ১১শ শতকের প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন। এই কুসলই 'পঞ্জিকাপ্রদীপে'র রচয়িতা কিনা বলা শক্ত।

৩০ 'যেভ্য আত্মনে ভাষাঃ শ্রূয়ন্তে তে রুচপ্রকারাগণে ঙানুবন্ধবর্জিতা ইতি'—দুর্গবৃত্তি (কৃৎ ৪।৩১) অর্থাৎ যে সকল ঙানুবন্ধ বর্জিত ধাতুর উত্তর গণপাঠে 'আত্মনে ভাষাঃ' উক্ত হইয়াছে তাহারাই রুচাদিধাতু। এই গণপাঠ অর্থাৎ ধাতুগণপাঠ বা ধাতুপাঠ।

৩১ নন্দিকেশ্বর-প্রণীত বলিয়া কথিত 'রুদ্রডমরূদ্ভবসূত্রবিবরণ' নামক এক পুস্তকে (ইহার প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি খণ্ডিত) পাণিনীয় চতুর্দশ প্রত্যাহার-সূত্রের ১ম, ৩য় ও ৪র্থ স্বর-সূত্র তিনটির অন্তর্ভুক্ত ৭টি স্বরবর্ণের সহিত সঙ্গীতের সপ্তস্বরের সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে : 'ত্রিবিধং স্বরসূত্রং তু নামাক্ষরস্বরাত্মকম্‌।। ত্রিসূত্রেষ্বে স্বরাঃ প্রোক্তা দ্বিতীয়ং তু নিরর্থকম্‌। লঘুসূত্রং তু প্রথমং গুরু সূত্রং তৃতীয়কম্‌।। চতুর্থং প্লুতসূত্রং স্যাদইউণ্‌ সরিগাঃ স্মৃতাঃ। এওঙ্‌ মপৌ ধনী ঐঔচ্‌ দ্বেধা সপ্তস্বরা মতাঃ।।...' অর্থাৎ প্রথম সূত্র 'অইউণ্‌' = সরিগাঃ (সা রে গা) লঘু, দ্বিতীয় সূত্র 'ঋঌক্‌' পরিত্যক্ত, তৃতীয় সূত্র 'এওঙ্‌' = মপৌ (মা পা) গুরু এবং চতুর্থ সূত্র 'ঐঔচ্‌' = ধনী (ধানি) প্লুত স্বরের সমন্বিত রূপ।

চান্দ্র ব্যাকরণ

(খ্রীঃ ৫ম শতক)

চন্দ্র, চন্দ্রাচার্য এবং চন্দ্রগোমী এই তিন নামেই ব্যাকরণকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই তিন নামেই গ্রন্থকারগণ একই ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়াছেন কি না, বিশেষতঃ চন্দ্রাচার্য এবং চন্দ্রগোমী একই ব্যক্তি কি না, সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং 'ব্যাকরণ-দর্শনের ইতিহাস' প্রণেতা গুরুপদ হালদার এই সন্দেহের অনুকূলে অভিমত পোষণ করিয়াছেন। শাস্ত্রিমহাশয়ের অনুমান, চন্দ্রাচার্যের ব্যাকরণের নাম 'চান্দ্রব্যাকরণ'। মল্লিনাথ এবং দক্ষিণাবর্তনাথ উভয়েই চন্দ্রব্যাকরণ হইতে যে 'বিশ্রামো বা' সূত্রটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সন্ধান বর্তমান চান্দ্র ব্যাকরণে পাওয়া যায় না। মহাভারতের অনুশাসন পর্বের (১৭।৭৮, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ-সংস্করণে ১৬।৭৮) 'ভারতভাবদীপ' টীকায় 'নিশাকর' শব্দপ্রসঙ্গে টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন ঃ 'নিশাকরশ্চন্দ্রশ্চান্দ্রব্যাকরণপ্রণেতা।' (অভিনব?) কালিদাস স্বরচিত 'নানার্থশব্দরত্ন'কোষের প্রারম্ভে পাণিনি, শক্তি, চন্দ্র, সূর্য এবং ইন্দ্র এই পাঁচ জন বৈয়াকরণের নাম করিয়াছেন। ইহার টীকায় নিচুলকবি 'রহস্য' নামক গ্রন্থ হইতে প্রসঙ্গতঃ যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহাতে যে ছয় জন বৈয়াকরণের নাম আছে, নিশাকর তাঁহাদের অন্যতম ঃ 'শক্তিঃ শম্ভুঃ কুমারশ্চাপীন্দ্রঃ সূর্যো নিশাকরঃ।' ভবিষ্যপুরাণে (১।১।৫৮-৬১) যে ব্রাহ্ম, ঐন্দ্র, যাম্য, রৌদ্র, বায়ব্য, বারুণ, সাবিত্র এবং বৈষ্ণব এই 'অষ্ট ব্যাকরণে'র উল্লেখ আছে, তাহাতে 'সাবিত্র' (সবিতৃ-বা সূর্য-রচিত) ব্যাকরণের নাম থাকিলেও কিন্তু চান্দ্র ব্যাকরণের নাম নাই। এইসব স্থলে দেবতা সূর্যে এবং নিশাকর চন্দ্রে বৈয়াকরণত্ব আরোপের পশ্চাতে যে ক্রিয়াশীল পৌরাণিক ঐতিহ্য বিদ্যমান, তাহাতে যে বৈয়াকরণ চন্দ্রাচার্য বা

চন্দ্রগোমীর নামের প্রভাব পড়ে নাই তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ভর্তৃহরি-প্রণীত 'বাক্যপদীয়ে'র ২য় কাণ্ডের টীকা-শেষে চন্দ্রাচার্যের শিষ্য বসুরাতকে[১] 'শশাঙ্কশিষ্য'[২] বলা হইয়াছে (কারিকা ৫৯)।

খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত বাক্যপদীয় গ্রন্থে চন্দ্রাচার্যের উল্লেখ সবিশেষ লক্ষণীয় ঃ

যঃ পতঞ্জলিশিষ্যেভ্যো ভ্রষ্টো ব্যাকরণাগমঃ।
কালে স দাক্ষিণাত্যেষু গ্রন্থমাত্রে ব্যবস্থিতঃ।।
পর্বতাদাগমং লব্ধ্বা ভাষ্যবীজানুসারিভিঃ।
স নীতো বহুশাখত্বং চন্দ্রাচার্যাদিভিঃ পুনঃ।।
ন্যায়প্রস্থানমার্গাং স্তানভ্যস্য স্বং চ দর্শনম্।
প্রণীতো গুরুণাঽস্মাকময়মাগমসংগ্রহঃ।। (২।৪৮৮-৯০)।

এখানে, কালক্রমে পতঞ্জলির মহাভাষ্যের ব্যাপক পঠন-পাঠন লুপ্তপ্রায় হইয়া দাক্ষিণাত্যে অতিশয় সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িলে সেখান হইতে চন্দ্রাচার্য-কর্তৃক উহাকে উদ্ধার ও ব্যাপক প্রচারের কথা বলা হইয়াছে। ইহারই যেন প্রতিধ্বনি শুনা যায় কল্হণের 'রাজতরঙ্গিণী'তে ঃ

চন্দ্রাচার্যাদিভির্লব্ধ্বা দেশাত্তস্মাত্তদাগমম্।
প্রাবর্তিতং মহাভাষ্যং স্বং চ ব্যাকরণং কৃতম্।। (১।১৭৬)।

রাজতরঙ্গিণীমতে ইহা কাশ্মীররাজ অভিমন্যুর সময়ের ঘটনা। তাঁহার রাজত্বকাল-সম্বন্ধেও ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। স্টাইনের (Sir Aurel Stein) মতানুসারে খ্রীঃ ৪০০-৫০০ অব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে তাঁহার রাজ্যকাল ধরিয়া অবশ্য চন্দ্রাচার্যকে খ্রীঃ ৫ম শতকের চন্দ্রগোমীর কাছাকাছি আনা যায়। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগোমীও দাক্ষিণাত্যে পাতঞ্জল মহাভাষ্যের সংস্পর্শে আসেন এবং পরে স্বীয় ব্যাকরণ রচনা করেন। কাজেই, চন্দ্রাচার্য যে চন্দ্রগোমী নহেন এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পক্ষে কোনো শক্তিশালী প্রমাণ আপাতত নাই বলা চলে। অঞ্চল-বিশেষের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের হাতে পড়িয়া বৌদ্ধপ্রভাবমুক্তির তাগিদে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাও অসম্ভব নয়।

চন্দ্রগোমী বৌদ্ধ। তাঁহার পূর্বে ও পরে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে একাধিক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচিত হইয়া থাকিলেও তিনিই এই ধারার একমাত্র বৈয়াকরণ যিনি পরিশিষ্টাদিসহ এমন এক পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এক্ষেত্রে একটা সুসংহত ব্যাকরণ-

সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ব্যাকরণের তুলনায় চান্দ্রের অসাম্প্রদায়িক আবেদন বেশী এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই পরবর্তী কালে আস্তিক-নাস্তিক-ভেদে প্রায় সমস্ত বিখ্যাত বৈয়াকরণই তাঁহার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নয়, বিখ্যাত প্রাচীন বৈয়াকরণদের পঙ্‌ক্তিতে তাঁহারও আসন নির্দিষ্ট হইয়াছে ; যেমন বোপদেবের 'কবিকল্পদ্রুমে'র প্রারম্ভে : 'ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ। পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ।।' 'শ্রীতত্ত্বনিধি'তে (?) : 'ঐন্দ্রং চান্দ্রং কাশকৃৎস্নং কৌমারং শাকটায়নম্। সারস্বতং চাপিশলং শাকল্যং পাণিনীয়কম্।।' 'গণরত্নমহোদধি'তে : 'শালাতুরীয়-শকটাঙ্গজ-চন্দ্রগোমি-দিগ্‌বস্ত্র-ভর্তৃহরি-বামন-ভোজমুখ্যাঃ। মেধাবিনঃ প্রবরদীপককর্তৃযুক্তাঃ প্রাজ্ঞৈর্নিষেবিতপদদ্বিতয়া জয়ন্তি।।' অগ্নিপুরাণে (৩৫৬।৮) চান্দ্র ব্যাকরণের ছাত্রকে 'চান্দ্রক' বলা হইয়াছে : 'তত্র বাসো মাথুরঃ স্যাদ্বেত্ত্যধীতে চ চান্দ্রকঃ।' মৈত্রেয় রক্ষিতের তন্ত্রপ্রদীপে চন্দ্রগোমী, চন্দ্রশাস্ত্র এবং 'চান্দ্রাঃ' উল্লিখিত।

অগ্নিপুরাণের ৩৪৯-৫৯ পর্যন্ত মোট ১১ অধ্যায়ে অতি সংক্ষেপে কেবল উদাহরণ প্রদর্শনপূর্বক ব্যাকরণের প্রায় সমস্ত বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সমস্তই পদ্যে রচিত। কেবল উদাহরণ-মুখে ব্যাকরণ-বর্ণনার ইহা একটি অপূর্ব নিদর্শন। ১১ অধ্যায়ে যথাক্রমে প্রত্যাহার, সন্ধি-সিদ্ধরূপ, সুব্‌বিভক্তিসিদ্ধরূপ, স্ত্রীলিঙ্গসিদ্ধরূপ, নপুংসক-সিদ্ধরূপ, কারক, সমাস, তদ্ধিত, উণাদি-সিদ্ধরূপ, তিঙ্‌বিভক্তিসিদ্ধ রূপ এবং কৃৎসিদ্ধরূপ প্রদর্শিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রিমহাশয়ের মতে এই একাদশ অধ্যায়ের ব্যাকরণ চান্দ্র ব্যাকরণসম্মত। তবে ইহার প্রত্যাহার-সূত্র ১৪টি কিন্তু পাণিনীয়, চন্দ্রগোমি-নির্ধারিত ১৩টি নয়। বার্নেল সাহেব এই পৌরাণিক ব্যাকরণকে কাতন্ত্রীয় বলিয়াছেন। 'সিদ্ধ' শব্দের ব্যবহারাধিক্য লক্ষণীয়। সে যাহাই হউক, আমাদের বিবেচনায় এই ব্যাকরণে পাণিনি-কাতন্ত্রাদি প্রধান প্রধান ব্যাকরণগুলির ন্যূনাধিক প্রভাব বর্তমান ; কোন ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ই ইহার উপর একাধিপত্য দাবী করিতে পারেন না।

চান্দ্র ব্যাকরণের ১।২।৮১ সূত্রের বৃত্তিতে 'অজয়দ্ জর্তো হূণান্' উদাহরণ হইতে ৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত-কর্তৃক হূণ-বিজয়ের কথা সূচিত হইয়াছে মনে করিয়া, এবং এই ঘটনাকে

বৃত্তিকার চন্দ্রগোমীর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার সমকালীন বলিয়া গ্রহণ করিয়া, খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে চান্দ্র ব্যাকরণের রচনাকাল নির্ধারণ করা হয়। ৬ষ্ঠ শতকের প্রারম্ভেও সম্ভবতঃ জীবিত থাকিয়া তিনি গ্রন্থাদি রচনা করেন। তিব্বতী ঐতিহ্যানুসারে তিনি ছিলেন একাধারে বৈয়াকরণ, দার্শনিক এবং তান্ত্রিক। ঐতিহাসিক লামা তারনাথের গ্রন্থ এবং চন্দ্রগোমি-প্রণীত 'মনোহরকল্প' নামক স্তোত্র হইতে জানা যায় যে চন্দ্রগোমীর জন্মস্থান উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্রভূমি। তিব্বতী 'পাগ-সাম-জোন-জাং' গ্রন্থের মতে তিনি কোনও কারণে নির্বাসিত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে শেষজীবন অতিবাহিত করেন। খুব সম্ভব এই জন্যই তিব্বতী 'তেঙ্গুরে'-তালিকাভুক্ত এক গ্রন্থে তাঁহাকে 'দ্বৈপ' বলা হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার 'বাক্‌লা—চন্দ্রদ্বীপ'ই উক্ত 'চন্দ্রদ্বীপ'—এইরূপ অনুমিত। আবার কাহারও মতে নোয়াখালির 'সন্দ্বীপ'ই পূর্বোক্ত 'চন্দ্রদ্বীপ'। এই মতে চন্দ্রদ্বীপের অপভ্রংশ 'সন্দ্বীপ'। 'তেঙ্গুরে' চন্দ্রগোমি-রচিত 'আর্যতারাদেবীস্তোত্রমুক্তিকামালা' গ্রন্থের অনুবাদে তাঁহার 'অমরচন্দ্র' নাম পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন বরেন্দ্রক্ষত্রিয়, গোমিন্ তাঁহার উপাধি। চান্দ্র ব্যাকরণের 'গোমিন্ পূজ্যে' (৪।২।১৪৪) সূত্রানুসারে 'গোমিন্' শব্দ পূজ্য অর্থে ব্যবহৃত। এই সূত্রের বৃত্তিতে ঃ 'গোমিন্নিতি পূজ্যে নিপাত্যতে।' গণরত্নমহোদধির টীকায় এই প্রসঙ্গে লিখিত আছে ঃ 'পূজ্যশ্চন্দ্রঃ চন্দ্রগোমী।' উজ্জ্বল দত্তের উণাদিবৃত্তিতে (৪।১৫৮) ঃ 'গোমী গোমানুপাসক ইতি ধরণিঃ। গোমী নিন্দ্যপ্রশস্তয়োরিতি রুদ্রকোশঃ।' ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাঙ্গালীদের মধ্যে 'গুঁই'পদবী এই গোমিন্ শব্দ হইতে আগত।

তিব্বতী উপাদান হইতে জানা যায়, চন্দ্রগোমী নানা শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিক বজ্রযান-সাধন বিষয়ে নাকি তাঁহার ৩৬ খানি গ্রন্থ ছিল। ইহা ছাড়া, তারা মঞ্জুশ্রীর উদ্দেশে রচিত কয়েকটি স্তোত্র, 'লোকানন্দ' নামে নাটক, 'শিষ্যলেখধর্ম' নামক কাব্য এবং 'ন্যায়সিদ্ধালোক' বা 'ন্যায়সিদ্ধি' নামক এক তর্কশাস্ত্রীয় গ্রন্থও তাঁহার রচনা বলিয়া কথিত। 'শিষ্যলেখধর্ম', শিষ্য রত্নকীর্তিকে (ইনি রাজকুমার ছিলেন) ধর্মোপদেশ দিবার জন্য ১৪৪ শ্লোকে গ্রথিত। লোকানন্দের তিব্বতী অনুবাদমাত্র বর্তমানে পাওয়া যায়। নালন্দা মহাবিহারের আচার্য স্থিরমতি ছিলেন চন্দ্রগোমীর বিদ্যাগুরু। সেখানে বৌদ্ধ পণ্ডিত

চন্দ্রকীর্তির নিকট দীক্ষিত হইয়া চন্দ্রগোমী নালন্দার অন্যতম আচার্যপদে বৃত হন।

পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁহার 'A History of Indian Logic (Cal. 1921) গ্রন্থে (পৃঃ ৩৩৩-৩৬) প্রাচীন-অর্বাচীন ভেদে দুই চন্দ্রগোমীর কথা লিখিয়াছেন—একজন খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীয় এবং অপর জন খ্রীঃ ৭ম/৮ম শতাব্দীয়। তাঁহার বিবেচনায় ১ম চন্দ্রগোমী ছিলেন নৈয়ায়িক—যিনি 'ন্যায়ালোকসিদ্ধি' গ্রন্থ রচনা করেন এবং যেহেতু তাঁহার গুরু আর্য অশোক খ্রীঃ ৯০০ অব্দ নাগাদ বিখ্যাতিলাভ করেন, সেইহেতু শিষ্য চন্দ্রগোমীর ৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বর্তমান থাকার কথা। ইনিই বঙ্গদেশীয় বারেন্দ্র ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিয়া নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হন এবং আচার্য স্থিরমতির নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে বিদ্যাধর আচার্য অশোক তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দেন। বৌদ্ধ দেব-দেবী অবলোকিতেশ্বর ও তারার প্রতি চন্দ্রগোমীর সমধিক অনুরক্তি ছিল। বারেন্দ্র ভূমির রাজা তাঁহাকে বিবাহে কন্যাদান করিলে সেই কন্যার নাম তারা ছিল বলিয়া তাঁহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে ভীত হওয়ায় ক্রুদ্ধ রাজা জামাতাকে সিন্দুকে ভর্তি করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। দেবী তারার কৃপায় সেই সিন্দুক জলপথে গঙ্গার (?) মোহানা পর্যন্ত নীত হয় এবং সেখানে তিনি সিন্দুক হইতে বাহির হইয়া এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই দ্বীপই পরে চন্দ্রদ্বীপ নামে খ্যাতি লাভ করে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগোমী সিংহলে যান এবং সেখান হইতে ফিরিবার সময় দাক্ষিণাত্যে বররুচির গৃহে পতঞ্জলির মহাভাষ্য দর্শন করেন এবং তাহাতে 'অধিক কথা এবং অল্প চিন্তা' লক্ষ্য করিয়া তিনি নিজে পাণিনির ব্যাকরণের উপরে এক ব্যাখ্যা রচনা করেন, তাহাই পরে চান্দ্র ব্যাকরণ নামে বিখ্যাত হয়। এই ব্যাকরণ লইয়া তিনি নালন্দায় আসেন এবং সেখানে চন্দ্রকীর্তি-রচিত ব্যাকরণ দর্শন করিয়া নিজ গ্রন্থকে তাহা হইতে নিকৃষ্ট বিবেচনায় নালন্দার কূপে নিক্ষেপ করেন। এই সময় পূর্বোক্ত দেব-দেবী তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার গ্রন্থই অধিকতর কর্মোপযোগী বলিয়া ভবিষ্যতে জগতের যথেষ্ট উপকারে আসিবে এইরূপ আশ্বাস দিয়া কূপ হইতে সেই ব্যাকরণ উদ্ধার করেন। ইহার পর হইতে ঐ কূপ 'চন্দ্রকূপ' নামে প্রসিদ্ধ হয় এবং উহার জল বিদ্যার্থিগণ তীক্ষ্ণধীশক্তিপ্রদ বলিয়া পান করিয়া থাকেন। আচার্য

চন্দ্রকীর্তিই চন্দ্রগোমীকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া নালন্দায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

বলা বাহুল্য, এই সব কথা সর্বথা প্রকৃত তথ্যসম্মত নয় বা পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত বা স্থিরীকৃত ঐতিহাসিক মতামতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণও নয়। বর্তমানে ঐ দুই চন্দ্রগোমী এক হইয়া গিয়াছেন এবং তাহাই ঠিক। চান্দ্র ব্যাকরণ কিন্তু আসলে পূর্ববর্ণিত পাণিনিব্যাকরণের ব্যাখ্যা বা বৃত্তি নয়, যদিও ইহা ঐ ব্যাকরণের অনুসরণেই রচিত। পূর্বোক্ত স্থিরমতি আরও বেশী প্রাচীন। তিনি এবং আচার্য অশোক বলভী হইতে নালন্দায় আসিয়াছিলেন। ইঁহারা বলভীর বৌদ্ধমঠের প্রতিষ্ঠাতা। এই বলভীই বর্তমান গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত কাথিয়াবারের বল্লভীপুর (Vallabhipur)। খ্রীঃ ৫০০-৬৪১ অব্দ নাগাদ চারি জন ধরসেন (শ্রীধরসেন) রাজত্ব করেন এই বল্লভীপুরে। ২৬৯ সংবতে উক্ত মঠের সম্মানে বা উদ্দেশে ১ম ধরসেন-কর্তৃক প্রদত্ত দানপত্রে স্থিরমতির নাম আছে। এই ২৬৯ সংবৎকে গুপ্ত সংবৎ ধরিয়া খ্রীষ্টীয় ৫৫৮ অব্দ পাওয়া যায়।[৪] কাজেই তাঁহার ছাত্র চন্দ্রগোমী কোন মতেই খ্রীঃ ১০ম (বা ৭ম/৮ম) শতাব্দীয় হইতে পারেন না। কলাপব্যাকরণে স্থিরমতির বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের একাধিক গ্রন্থ তিনি তিব্বতে প্রচার করিয়াছিলেন। তিব্বতী ভাষাও তিনি জানিতেন (Radhakumud Mookerji, 'Ancient Indian Education,' 3rd edn., 1960, pp. 577,581)।

মৌর্য যুগের অন্তে সংস্কৃত ভাষার পুনরভ্যুদয়ের ফলে বৌদ্ধগণ ক্রমে এই ভাষার শরণাপন্ন হইলেও তাঁহাদের ব্যবহৃত সংস্কৃত সর্বথা ব্যাকরণসম্মত ছিল না। এই তথাকথিত ভাষাকে বলা হইত 'বৌদ্ধ সংস্কৃত'। ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া বৌদ্ধদিগকে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করিতে চন্দ্রগোমী তদুপযোগী এই ব্যাকরণ রচনা করেন। এই ব্যাকরণ লইয়া তিনি নালন্দায় গিয়া সেখানকার ব্যাকরণাধ্যাপক চন্দ্রকীর্তিকে ইহা দেখান। চন্দ্রকীর্তিও প্রাচীন বৌদ্ধাচার্য ইন্দ্রগোমীর লুপ্তপ্রায় ব্যাকরণের অবলম্বনে একখানি শ্লোকবদ্ধ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ১ম শতাব্দী (বা তাহারও আগে) নাগাদ ইন্দ্রগোমীর ব্যাকরণ রচিত হয়। ইহাই বৌদ্ধদের সম্ভবতঃ প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণে প্রাচীন ঐন্দ্র ব্যাকরণের প্রচুর উপাদান

সংগৃহীত ছিল। লামা তারনাথের মতে পাণিনি-ব্যাকরণের অনুসরণে রচিত চান্দ্র ব্যাকরণের মতো, ইন্দ্রগোমীর ব্যাকরণের ভিত্তিতে শর্ববর্মার কাতন্ত্র (=কলাপ) ব্যাকরণ প্রণীত হয়। প্রথমে কাতন্ত্রও বৌদ্ধ ব্যাকরণরূপেই পরিগণিত ছিল—এমন কথাও প্রাচীন পণ্ডিতদের নিকট শুনিয়াছি। বেদপন্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হাতে কাতন্ত্রের বৌদ্ধত্ব মোচন এবং ইন্দ্রগোমীর দেবরাজ ইন্দ্রে পর্যবসান অসম্ভব ব্যাপার নয়। লক্ষণীয় যে, কাতন্ত্রে বৈদিকাংশ ছিল না এবং যে তথাকথিত প্রাচীন ঐন্দ্র ব্যাকরণ-ধারার গৌরবে ব্যাকরণের ইতিহাস সবিশেষ গৌরবান্বিত, তাহার নাম-গন্ধও পাণিনির ব্যাকরণে নাই। 'শব্দভেদ প্রকাশ' কোষের টীকাকার জৈন পণ্ডিত জ্ঞানবিমল গণি (১৫৯৮ খ্রীঃ) ইন্দ্রগোমীর ব্যাকরণের প্রথম সূত্র বলিয়া 'সিদ্ধিরনুক্তানাং রূঢ়েঃ'র উল্লেখ করিয়াছেন। হেমচন্দ্রাচার্য তাঁহার বৃহদ্‌বৃত্তির ন্যাসে অনেকবার ইন্দ্রগোমীর নাম করিয়াছেন—'ইন্দ্রগোমিচন্দ্র-প্রভৃতয়ঃ,' 'চন্দ্রেন্দ্রগোমি-প্রভৃতয়ঃ' ইত্যাদি। হালদার মহাশয়ের মতে চন্দ্রকীর্তির পূর্বোক্ত ব্যাকরণের নাম ছিল 'সমন্তভদ্র' ব্যাকরণ। লামা তারনাথের মতে ইহাই চান্দ্রের তুলনায় নিকৃষ্ট পরিগণিত হওয়ায় নালন্দার কূপে নিক্ষিপ্ত হয়। সমন্তভদ্র নামে একজন জৈন পণ্ডিত ছিলেন; জৈন ঐতিহ্যানুসারে খ্রীঃ ২য় শতকে তাঁহার আবির্ভাব। ব্যাকরণে এবং তর্কশাস্ত্রে তাঁহার গ্রন্থাদি ছিল। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের একটি সূত্র ঃ'চতুষ্টয়ং সমন্তভদ্রস্য' (৫।৪। ১৬৮)। তাঁহার পরম্পরা-শিষ্য লক্ষ্মীধর স্বীয় 'একান্তখণ্ডন' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ 'সকলতার্কিকচক্রচূড়ামণিমরীচিমেচকিতচরণময়ূখা ভগবন্তঃ শ্রীস্বামিসমন্তভদ্রাচার্যা অসিদ্ধিবিরোধাবব্রুবন্। তদুক্তং—"অসিদ্ধং সিদ্ধসেনস্য বিরুদ্ধং দেবনন্দিনঃ। দ্বয়ং সমন্তভদ্রস্য সর্বথৈকান্তসাধনম্।।' ইহারই প্রতিধ্বনি-স্বরূপ 'অসিদ্ধঃ সিদ্ধসেনস্য বিরুদ্ধো দেবনন্দিনঃ। দ্বেধা সমন্তভদ্রস্য হেতুরেকান্তসাধনে।।' এই শ্লোকটি 'সিদ্ধিবিনিশ্চয়ে'র টীকা 'সিদ্ধিবিনিশ্চয় বিবরণে' লক্ষিত হয়।

চান্দ্র ব্যাকরণ স্বীয় উৎকর্ষে তৎপূর্ববর্তী সমস্ত জৈন-বৌদ্ধ ব্যাকরণকে অতিক্রম করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহার পরে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে উৎকৃষ্টতর অন্য কোন ব্যাকরণ তো রচিত হয়ই নাই, এমন কি পরবর্তী জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ বা জৈন শাকটায়নের ব্যাকরণও গুণগরিমায় ইহাকে নিষ্প্রভ করিতে পারে নাই।

(২)

চান্দ্র ব্যাকরণের অধ্যায়-সংখ্যা ৬, প্রতি অধ্যায়ে ৪ পাদ, সূত্রসংখ্যা মোট ৩০৯৯। বিষয়-বিন্যাস পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর ন্যায় কৃত্রিম। এই ক্ষেত্রে চান্দ্রের ৬ অধ্যায় যথাক্রমে অষ্টাধ্যায়ীর শেষ ৬ অধ্যায়ের অনুরূপ। অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম দুই অধ্যায়ের বিষয়-বস্তু চান্দ্রের ৬ অধ্যায়েই ন্যূনাধিক ছড়াইয়া আছে। সাম্প্রদায়িক অনুরোধে বৈদিকাংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। তবে ১।১।২৩, ১।১।১০৫, ১।১।১০৮, ১।১।১৩৪, ১।১।১৪৫ এবং ৩।৪।৬৮ সংখ্যক সূত্রের বৃত্তিভাগে স্বরবিষয়ক বর্ণনার প্রতিশ্রুতি থাকায় প্রতীয়মান হয় যে চন্দ্রগোমী ঐ বিষয়েও সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। বৈদিক প্রয়োগেই স্বরের আবশ্যক হয় বলিয়া এই ব্যাকরণেরও বৈদিকাংশ ছিল—যাহা খুব সম্ভব ইহার ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে আচরিত হইয়াছিল। মূল গ্রন্থের শেষে প্রযুক্ত হওয়ায় পরে সাম্প্রদায়িক তাগিদে এই দুই অধ্যায়কে বাদ দেওয়াও সহজ হইয়াছে। ১।১।১৪৫ সূত্রের বৃত্তিতে 'স্বরবিশেষমষ্টমে বক্ষ্যামঃ' উক্তি হইতে চান্দ্রের অষ্টম অধ্যায়ের খবর পাওয়া যায়। চান্দ্র ধাতুপাঠে কয়েকটি বৈদিক ধাতুর অন্তর্ভুক্তিও দৃষ্ট হয়। এই ব্যাকরণের বেদ-চ্যুতি খ্রীঃ ১২শ শতকের পূর্বেই যে ঘটিয়াছিল তাহার প্রমাণ—ঐ শতাব্দীয় পুরুষোত্তমদেব তদীয় 'ভাষাবৃত্তি'তে (৭।৩।৯৪) চন্দ্রগোমীকে 'ভাষাসূত্রকার' বলিয়াছেন : 'চন্দ্রগোমী ভাষাসূত্রকারো যঙোবেতি সূত্রিতবান্।' এই প্রসঙ্গে ৭।২।৬৯ সূত্রের ভাষাবৃত্তিও দ্রষ্টব্য।

চান্দ্রের প্রত্যাহার-সূত্রগুলি পাণিনীয় প্রত্যাহার-সূত্রের অনুরূপ। পাণিনির ৫ম ও ৬ষ্ঠ প্রত্যাহার-সূত্র 'হযবরট্' ও 'লণ্'কে একত্র করিয়া চান্দ্রে 'হযবরলণ্' সূত্র করায় এখানে এই জাতীয় সূত্রসংখ্যা ১৪ হইতে কমিয়া ১৩ দাঁড়াইয়াছে। ফলে চান্দ্রে 'অট্' প্রত্যাহারের অভাব ঘটায় চন্দ্রগোমী 'অম্' দ্বারা সেই অভাব পূরণ করিয়াছেন। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন আগেই অবশ্য এই পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়া পাণিনির সংশোধন করিয়াছিলেন। চন্দ্র পাণিনির 'অণ্' এবং 'ঝষ্' প্রত্যাহার দুইটিও বাদ দিয়াছেন এবং 'ঋক্', 'ঞম্', 'মম্' এবং 'চয়্' এই চারি প্রত্যাহার প্রয়োগ করিয়াছেন—যাহা পাণিনিতে নাই। 'চয়্' প্রত্যাহারের ব্যবহারও কাত্যায়নবার্ত্তিকে উপদিষ্ট। প্রত্যাহারঘটিত এই পরিবর্তনের

S.K.B. — "Chandragomin's grammar was ... mainly in the way of greater brevity & precision" "the rules of Panini are recast simply"

দ্বারা চান্দ্রে, পাণিনির কতকগুলি সূত্রের তুলনায়, উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার প্রতিপাদন সম্ভব হইয়াছে।

উপাদান এবং বিষয়-বিন্যাসের দিক্ দিয়া চান্দ্রের মৌলিকতা অকিঞ্চিৎকর। বহু শব্দের সাধুত্ব-বিষয়ে বার্ত্তিক ও মহাভাষ্যের অনুমোদন সযত্নে গৃহীত হইয়াছে। এই দুই-এর নির্দেশিত সংশোধন, পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনাদির ভিত্তিতে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর অপেক্ষা আরও সুষ্ঠু এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ রচনা করাই ছিল চন্দ্রগোমীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ফলে যে ৩৫টি সূত্রে তিনি নূতনত্ব ও উৎকর্ষ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেইগুলির সবই 'কাশিকা'বৃত্তিতে গৃহীত হইয়াছে, উদ্ভাবকের নামোল্লেখ না করিয়াই। মহাভাষ্যের 'প্রদীপ' টীকায় কৈয়ট উহাদের সম্বন্ধে 'অপাণিনীয় সূত্রেষু পাঠঃ' মাত্র বলিয়াই নীরব হইয়াছেন।

VII চান্দ্র ব্যাকরণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—সংজ্ঞা ব্যবহারে অকৃত্রিম সরলতা। এই ক্ষেত্রে চন্দ্রগোমী অন্য যে কোনো বৈয়াকরণের তুলনায় অধিক অগ্রসর। কেবল কৃত্রিম সংজ্ঞার পরিহারই নয়, অন্বর্থ সংজ্ঞার ব্যবহারও যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া কার্যসাধন করাই যেন সূত্রকারের একান্ত অভিপ্রায়। সংজ্ঞা-শব্দের পরিবর্তে 'নাম', প্রাতিপদিকের স্থলে 'শব্দ', উপসর্গের জন্য 'প্রাদি', সর্বনামের পরিবর্তে 'সর্বাদি', অব্যয়ের স্থলে 'অসংখ্য', উপধার জন্য 'উপান্ত্য' প্রভৃতির ব্যবহার, ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। পাণিনির গুণ, বৃদ্ধি, প্রগৃহ্য, সর্বনামস্থান, ঘি, নদী, ষট্ প্রভৃতি কতকগুলি সংজ্ঞা সযত্নে বাদ দেওয়া হইয়াছে ; ফলে সূত্রসংখ্যা কিছু কমিয়াছে অথচ বিষয়বস্তুর তেমন কোন হানি ঘটে নাই। এই কারণে চান্দ্রকে 'অসংজ্ঞক ব্যাকরণ' বলা হয় ঃ 'চন্দ্রোপজ্ঞমসংজ্ঞকং ব্যাকরণম্' (২।২।৬৮ সূত্রের বৃত্তি)। ভোজদেবের 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' ব্যাকরণের 'হৃদয়হারিণী' বৃত্তিতে ঃ 'চান্দ্রমসংজ্ঞকং ব্যাকরণম্' (৪।৩। ২৪৬)। বামনের লিঙ্গানুশাসনে এবং ক্ষীরস্বামীর অমরকোষের টীকায় (২।৭।১২) ইহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়। অবশ্য পাণিনির কিছু সংজ্ঞাকে চান্দ্রে ব্যবহার করিতেও হইয়াছে, যেমন দশ 'ল'কার (লট, লোট ইত্যাদি)। গ্রন্থের প্রারম্ভে নমস্কার-শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে 'লঘুবিস্পষ্ট-সম্পূর্ণমুচ্যতে শব্দলক্ষণম্' উক্তির মধ্যে রচনার যে লঘুতা (নাতিবিস্তৃতি), স্পষ্টতা (সারল্য) এবং সম্পূর্ণতা সাধনের প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত

হইয়াছে, তাহার সার্বকালিক আবেদনটিও লক্ষণীয়। একাধারে এই তিনটি গুণ সমন্বিত হইলেই তো সর্বদেশে সর্বকালে সর্বশাস্ত্রের রচনাই পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। সর্বতোভদ্র রচনার ইহাই সোনার কাঠি। চন্দ্রগোমীর সমকালীন ব্যাকরণক্ষেত্রে পাণিনির অতিবিস্তৃতি এবং দুরূহতা আর কাতন্ত্রের অসম্পূর্ণতা, তাঁহাকে যেন যুগ-প্রয়োজনেই এইরূপ লঘু, সরল ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

ব্যাকরণের সম্প্রদায়-নিষ্পত্তির জন্য সূত্রপাঠের আনুষঙ্গিক গণপাঠ, ধাতুপাঠ, উণাদিপাঠ, লিঙ্গানুশাসন এবং তদতিরিক্ত বর্ণসূত্র, উপসর্গবৃত্তি এবং একখানি শব্দকোষও চন্দ্রগোমী রচনা করিয়া গিয়াছেন। জার্মেনির Breslau বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Dr. Bruno Liebich চান্দ্র সম্প্রদায়ের ৮৬টি পরিভাষা-সূত্রেরও এক তালিকা দিয়াছেন। তাঁহারই সম্পাদনায় Leipzig হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে চান্দ্র ব্যাকরণ (সূত্র, উণাদি ও ধাতুপাঠ) এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে চান্দ্র বৃত্তি সর্বপ্রথম মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়। পরে ডঃ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া সবৃত্তি চান্দ্র ব্যাকরণ দুইখণ্ডে ১৯৫৩ ও ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে পুণা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

কাশিকাবৃত্তিতে অনুসৃত পাণিনীয় গণপাঠের মতো চান্দ্র গণপাঠও সূত্র-বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। শুনা যায় তিব্বতী ভাষায় নাকি ইহা পৃথক্ গ্রন্থরূপেও বর্তমান ছিল। কপিলদেব শাস্ত্রী তাঁহার 'সংস্কৃত ব্যাকরণ মে গণপাঠ কী পরম্পরা ঔর আচার্য পাণিনি' গ্রন্থে (পৃঃ ১০৭-১৩) চান্দ্রের গণপাঠ লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

ভূবাদি, অদাদি, জুহোত্যাদি-ক্রমে দশ ভাগে বিভক্ত চান্দ্র ধাতুপাঠে মোট ১১৭৪টি ধাতুর প্রতিটির মাত্র একটি করিয়া অর্থ প্রদর্শিত ('...একৈকোঽর্থঃ প্রদর্শিতঃ') হইয়াছে। পাণিনীয় সংজ্ঞা আত্মনেপদী, পরস্মৈপদী এবং উভয়পদীর স্থলে চান্দ্রে যথাক্রমে 'তঙানিন্', 'অতঙান্' এবং 'বিভাষিত' স্থান পাইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটির ক্ষেত্রে পাণিনির ১।৪।১০০ সূত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। 'বিভাষিত' শব্দটি পাণিনীয় ধাতুপাঠেও (৪।৭৮) আছে। চুরাদিগণে পাণিনীয় ধাতুপাঠের ৪১০টির স্থলে চান্দ্রে মাত্র ১১৪টি ধাতুর উল্লেখহেতু সূত্রসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মাত্র ১০৫ (পা. ধাতুপাঠের প্রায় ৪০০ সূত্রের স্থলে)। চন্দ্রগোমী বৈদিক ধাতু বর্জন করেন নাই, কিন্তু পরবর্তী জৈন বৈয়াকরণ তাহা

করিয়াছেন। পাণিনীয় অনুবন্ধগুলির মধ্যে কেবল 'ঞি' পরিত্যক্ত। চান্দ্র ধাতুপাঠের শেষ 'ক্রিয়াবাচিত্বমাখ্যাতুমেকৈকোঽর্থঃ প্রদর্শিতঃ। প্রয়োগতোঽনুগন্তব্যা অনেকার্থা হি ধাতবঃ।।'—শ্লোকের 'ক্রিয়াবাচিত্বমাখ্যাতুম্' কথায় 'আখ্যাত'শব্দের ক্রিয়াবাচিত্ব অর্থ গৌণতঃ স্পষ্ট। শেষাংশে 'অনেকার্থা হি ধাতবঃ' প্রবচনের মূলে মহাভাষ্যের (১।৩।১, ৬।১।৯,১২,৪৫) 'বহ্বর্থা অপি ধাতবো ভবন্তি' উক্তি ক্রিয়াশীল। এই জাতীয় অন্য উক্তি 'ধাতূনামনেকার্থত্বম্।' পাণিনীয় ধাতুপাঠের (১০।৩৯২) 'বহুলমেতন্নিদর্শনম্' সূত্রটিও প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়। ক্ষীরস্বামীর মতে সৌনাগ বৈয়াকরণগণ এই সূত্রটিকে ধাতুসমূহের অনেকার্থত্বের পক্ষেই ব্যাখ্যা করিতেন। ধাতুর এই অনেকার্থতা অবশ্যই প্রয়োগানুসারিণী। প্রয়োগ অর্থে শিষ্টপ্রয়োগ—যাহা ব্যাকরণের সর্বক্ষেত্রেই চরম ও পরম নিয়ন্তা বলিয়া স্বীকৃত। ধাতুগ্রন্থ 'দৈব'র 'পুরুষকার'টীকায় কৃষ্ণলীলাশুক এই প্রয়োগকে ভগবান্ বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই ঃ

পাঠা ব্যাখ্যাশ্চ ধাতূনাং দৃশ্যন্তে স্বৈরিণঃ ক্বচিৎ।
প্রয়োগ এব ভগবাংস্তান্ ব্যবস্থাপয়েৎ পথি।।

এই ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই বৈয়াকরণকুলে 'লক্ষ্যমূলং হি লক্ষণম্', 'লোকাৎসূরিভিরত্যূহ্যম্', 'ন পুনঃ পাঠ এব শরণম্,' 'প্রয়োগশরণা বৈয়াকরণাঃ' প্রভৃতি প্রবচনের সৃষ্টি। আবার দেশভেদে ধাতুর অর্থভেদও লক্ষিতব্য বলিয়া 'তত্তদ্দেশাদি প্রসিদ্ধার্থানাং পৃথঙ্‌নির্দেশঃ' ('ক্ষীরতরঙ্গিণী' ১।৬৩৭-৩৮)। 'সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণের টীকাকার গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ 'ধাতূনামনেকার্থত্বেনেষ্টসিদ্ধিমভ্যুপগন্তং চন্দ্র এব পরং পরমপণ্ডিতঃ' (তিঙ্ ৭৩০)। Dr. Liebich-এর মতে কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহ চান্দ্র ধাতুপাঠকেই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া কাতন্ত্রে চালাইয়াছেন।পূর্ণচন্দ্র চান্দ্র ধাতুপাঠের উপরে যে 'চান্দ্র ধাতুপারায়ণ' রচনা করেন তাহা এই ধাতুপাঠের মাধবীয় ধাতুবৃত্তি-সদৃশ ব্যাখ্যাস্থানীয় গ্রন্থ।

(১১) চান্দ্র ধাতুপাঠের ন্যায় চান্দ্র লিঙ্গানুশাসনও বিখ্যাত গ্রন্থ। হর্ষবর্ধন স্বীয় লিঙ্গানুশাসনের শেষে, বামনও তাঁহার লিঙ্গানুশাসনের অন্তে, সর্বানন্দ তাঁহার 'টীকাসর্বস্বে' (২।৬।৬৩) চান্দ্র লিঙ্গানুশাসনের উল্লেখ করিয়াছেন। হর্ষবর্ধনের লিঙ্গানুশাসনের 'সর্বার্থলক্ষণা টীকা'য় পৃথ্বীশ্বর লিখিয়াছেন ঃ 'ননু সন্তি ব্যাড়ি-বররুচি-চন্দ্রগোমিপ্রভৃতিমহাপুরুষ বিরচিতানি লিঙ্গানুশাসনানি।' উজ্জ্বলদত্তের উণাদিবৃত্তিতে (৪।১) চান্দ্র

লিঙ্গানুশাসন উল্লিখিত। ইহা কারিকাবদ্ধ ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সর্বানন্দ এক 'চন্দ্রলিঙ্গবৃত্তি'র নাম করিয়াছেন।

চান্দ্র ব্যাকরণের উণাদিসূত্রপাঠ তিন অধ্যায়ে বিভক্ত, মোট সূত্রসংখ্যা ৩২৮। ইহাতে শব্দসমাবেশে দুই (অন্তঃস্থ ও বর্গ্য) বকারের পার্থক্য রক্ষা না করায় চন্দ্রগোমীর বঙ্গীয়ত্ব প্রমাণিত, কারণ বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ উক্ত পার্থক্য-বিষয়ে প্রায়শঃ উদাসীন থাকিতে অভ্যস্ত। পাণিনীয় উণাদিপাঠের সহিত চান্দ্র উণাদিপাঠের সাদৃশ্যই বেশী, পার্থক্য খুব কম। যোগবিভাগাদির দ্বারা কতকগুলি নূতন সূত্র রচিত হইয়াছে এবং কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রে চন্দ্রগোমী নূতন শব্দের বিশ্লেষণ দেখাইয়াছেন।

'বর্ণসূত্র', পাণিনীয়শিক্ষা-স্থানীয় এক ক্ষুদ্র পুস্তক। মাত্র ৪৮টি সূত্রে বর্ণের উচ্চারণস্থান এবং প্রযত্নাদি সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার 'অন্তঃস্থা যরলবাঃ', 'কাদয়ো মাবসানাঃ স্পর্শাঃ', '...শষসহাশ্চোষ্মাণঃ' প্রভৃতি সূত্রে কলাপ (= কাতন্ত্র) ব্যাকরণের প্রভাব পড়িয়াছে, যদিও ঌবর্ণের দীর্ঘত্ব অস্বীকৃত। ধর্মপাল (ধর্মদাস?) ইহার উপর ১১৯টি কারিকা-নিবদ্ধ এক বৃত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

চন্দ্রগোমীর উপসর্গবৃত্তি তিব্বতী ভাষায় রক্ষিত ছিল। তাঁহার শব্দকোষগ্রন্থের অস্তিত্বও পরবর্তী গ্রন্থকারগণের উদ্ধৃতি হইতে প্রমাণিত হয়। সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বে এবং উজ্জ্বলদত্তের উণাদিবৃত্তিতে এই কোষ হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে প্রতীয়মান যে চন্দ্রগোমীর কোষ, অমরকোষের মতোই বিভিন্ন কাণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং ইহার শব্দসমূহের সন্নিবেশ ছিল অন্ত্যবর্ণানুক্রমিক। পূর্বোক্ত লিঙ্গানুশাসন এবং এই শব্দকোষ দুই পৃথক্ গ্রন্থ কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে।

চন্দ্রগোমী সম্ভবতঃ সমগ্র ব্যাকরণেরই বৃত্তি রচনা করেন। ইহা দুষ্প্রাপ্য। পূর্বোক্ত Liebich-এর সম্পাদনায় চান্দ্র বৃত্তি বলিয়া যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহাই মূল চান্দ্র বৃত্তি কিনা সেই বিষয়ে গভীর সন্দেহ বর্তমান। উহার আদ্যা বৃত্তি না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এই সন্দেহের পক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, চান্দ্রের ২।২।৬৮ সূত্রের বৃত্তিতে যে বলা হইয়াছে 'চন্দ্রোপজ্ঞমসংজ্ঞকং ব্যাকরণম্'—তাহা নিশ্চয়ই চন্দ্রগোমীর নিজের উক্তি নয়, কারণ স্বীয় ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক এবং নিজের নামোল্লেখপূর্বক এই জাতীয় মন্তব্য গ্রন্থকারের নিকট হইতে আশা করা যায় না এবং তাহা ঐতিহ্যবিরোধীও। আসলে উহা ধর্মদাসকৃত বৃত্তি।

চন্দ্রগোমীর আদ্যা বৃত্তির অবলম্বনে অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে ধর্মদাস এই (লঘু) বৃত্তি রচনা করেন। রচনার ধরন-ধারণ তথা আঙ্গিকের দিক্ দিয়া ইহা খ্রীঃ৭ম শতাব্দীয় কাশিকাবৃত্তির সদৃশ। পরে হয়তো মূল চান্দ্র বৃত্তি হইতে অবিকল কিছু কিছু অংশ ধর্মদাসের বৃত্তিতে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। পূর্বোক্ত গোয়ীচন্দ্র, জয়াদিত্য (?), দুর্গসিংহ প্রভৃতি অনেকেই অন্যান্য বৈয়াকরণদের সহিত ধর্মদাসের নাম করিয়াছেন। টীকাসর্বস্বে (১।৭।৩৩) ধর্মদাসের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। অমরকোষের (১।৬।২০৮, ২।৪।৭৬) 'পদচন্দ্রিকা' টীকাতেও তাঁহার নামে উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। আনন্দ দত্ত, ভিক্ষু রত্নমতি, পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি অনেকে চান্দ্র ব্যাকরণের টীকা-টিপ্পনীমূলক ব্যাখ্যাদি রচনা করেন। পূর্ণচন্দ্র নাকি চান্দ্রের 'পঞ্জিকা' রচনা করিয়াছিলেন। অমরকোষের টীকাসর্বস্বে (১।১। ৪৪) পূর্ণচন্দ্র-রচিত ধাতুপারায়ণ হইতে উদ্ধৃতি আছে। ইহা ছাড়া বিমলমতি এবং রত্নশ্রীপাদ নাম দুইটিও চান্দ্র ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে এই বিমলমতিই কাতন্ত্রপরিশিষ্টে (১।১৪২) লক্ষিত ভাগবৃত্তিকার বিমলমতি কিনা বলা কঠিন। 'কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা'তেও (সমাসপাদ) ত্রিলোচন দাস বিমলমতির একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

বৌদ্ধ ভারতে একদা চান্দ্র ব্যাকরণের যথেষ্ট প্রসার-প্রতিপত্তি ছিল সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চান্দ্র ব্যাকরণের উপরেও একাধিক বৃত্তি-টীকার রচনা অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু পরিণামে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে এই ব্যাকরণও ভারত হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। তাই ভারতে ইহার গ্রন্থাদি খুবই দুষ্প্রাপ্য। তবে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের মতো এই ব্যাকরণও ভারতসীমান্তে কোথাও ভাষান্তরিত হইয়া কোথাও বা ছিন্ন পাণ্ডুলিপির আকারে এখনও কথঞ্চিৎ বর্তমান। নেপালী ও তিব্বতী ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে। তিব্বতে আজিও এখানে ইহার পঠন-পাঠন প্রচলিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রিমহাশয় নেপাল হইতে চান্দ্রের পূর্ণ পাণ্ডুলিপি লইয়া আসেন। Dr. Buehler (1837-98) নেপালী ভাষায় অনূদিত এই ব্যাকরণের কতকগুলি অনুলিপি সংগ্রহ করেন। তবে কলহণের বর্ণনার ভিত্তিতে কেহ কেহ যে কাশ্মীরকে চন্দ্রাচার্যের দেশ বলিয়া থাকেন, সেখানে কিন্তু চান্দ্রের তেমন বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নাই, কেবল 'বর্ণসূত্র' এবং এই ব্যাকরণের কতকগুলি পরিভাষাসূত্র পাওয়া গিয়াছে। মনে রাখিতে

হইবে, কাশ্মীরও একদা বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির এক প্রধান লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বৌদ্ধ প্রভাবে ভর করিয়া সিংহলেও চান্দ্র ব্যাকরণ প্রবেশ করে। সেখানে কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম স্থায়ী হইলেও চান্দ্রের স্থায়িত্ব তদনুপাতে ঘটে নাই। খ্রীঃ ১১শ/১২শ শতাব্দী বরাবর কাশ্যপ (বা মহাকাশ্যপ) নামে এক সিংহলী বৌদ্ধ পণ্ডিত (পুরোহিত) চান্দ্রের এক সহজপাঠ্য সংস্করণ প্রস্তুত করেন। ইহার নাম 'বালাববোধন'[৫] ঃ'বালাববোধনং বিন্দুং চান্দ্রসিন্ধৌ করোম্যহম্।' ইহার বিষয়-বিন্যাস কৌমুদীগুলির মতো। সিংহলে ইহারই বহুল প্রচলন এবং ফলে মূল চান্দ্রের পশ্চাদপসরণ। যবদ্বীপেও চান্দ্র ব্যাকরণের সমাদরের কথা শুনা যায়। শ্যাম, কাম্বোডিয়া, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানেও একদা ইহার প্রচলন ছিল।

চান্দ্রের অবলম্বনে খণ্ডিতাকারে রচিত অথচ ভাষান্তরিত একাধিক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের একটির নাম 'তিঙন্ত'। চান্দ্রের ধাতুপাঠের ভিত্তিতে রচিত ইহা একটি ধাতুরূপাত্মক গ্রন্থ। 'সুবন্তরত্নাকর'—এই ধরনের আর এক গ্রন্থ। ইহাতে চান্দ্র ব্যাকরণ-সম্মত কতকগুলি শব্দকে লিঙ্গ ও শেষ বর্ণের অনুক্রমে বিন্যস্ত দেখানো হইয়াছে। আর এক গ্রন্থ 'ব্যাকরণসুবন্ত'। ইহাও চান্দ্র-সম্মত শব্দ-রূপাদর্শের ন্যায়। ঈশ্বরভদ্র- বা সিংহভদ্র-রচিত 'বিভক্তিকারিকা'ও এই সম্প্রদায়ের অন্যতম গ্রন্থ। ইহার বিষয়বস্তু 'ব্যাকরণসুবন্তে'র অনুরূপ।

ধর্মপাল (ইনি খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে ইউয়েন সাঙ্-এর নালন্দা-পরিদর্শনের সময় শীলভদ্রকে নালন্দার অধ্যক্ষপদে বসাইয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করেন) চন্দ্রগোমীর 'বর্ণসূত্রে'র উপর যে ব্যাখ্যা রচনা করেন তাহার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই বৃত্তির নাম 'বর্ণসূত্রবৃত্তিনাম'। ধর্মপাল দক্ষিণভারতীয়, কাঞ্চীপুরমের অধিবাসী। তিনি বাক্যপদীয়ের প্রকীর্ণকাণ্ডের উপরও টীকা রচনা করেন।

---

১ বসুরাত ছিলেন নরসিংহগুপ্ত (বালাদিত্য)-র ভগিনীপতি। তিনি ব্যাকরণের দিক্ হইতে বসুবন্ধু-রচিত 'অভিধর্মকোশে'র (খ্রীঃ ৫ম শতক) সমালোচনা করেন। কিংবদন্তী অনুসারে বসুবন্ধু বসুরাতকে তর্কে পরাজিত করিয়া ৩২ অধ্যায়ে (পাদে?) এক ব্যাকরণ রচনা করেন—যাহা বর্তমানে পাওয়া যায় না।

২ মতান্তরে, 'শশাঙ্কশিষ্য' চন্দ্রাচার্যশিষ্য নয়, পরন্তু শশাঙ্কধরের শিষ্য, কাশ্মীরদেশীয় সহদেব—যিনি পাণিনীয় ব্যাকরণে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং যাঁহার নিকট পুণ্যরাজ

'বাক্যপদীয়' অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ক্ষীরতরঙ্গিণীতে ভট্টশশাঙ্কধরের উল্লেখ আছে।

৩ মহাভারত (২।৪৬।২৬)মতে জর্ত এক প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতি। হৈম উণাদিপাঠের (সূত্র ২০০) স্বোপজ্ঞবৃত্তিতে জর্তনামক রাজার গঠন-নির্দেশ আছে।

৪ বলা বাহুল্য খ্রীঃ ৫৫৮ অব্দ স্থিরমতির সময় নয়। এই সময়ে লিখিত দানপত্রে স্থিরমতির উল্লেখ থাকিলেও তিনি উহার প্রাপক ছিলেন না। তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে তাঁহার নামোল্লেখ করা হইয়া থাকিবে।

৫ The Orientalist পত্রিকায় ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাগে ভাগে এই বালাববোধন প্রকাশিত হয়—'The Balavabodhana. A re-arrangement of...grammatical Sutras of Candra with a gloss by Kasyapa Thera, ed. with...notes by William Goonetilleke [in The Orientalist—1 (1884) pp. 41-5, 69-72, 95-6, 120, 143-44, 168, 192, 216 ; 2(1885) pp. 78-80, 118-20.]

জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ

(খ্রীঃ ৫ম শতক)

জৈনাচার্যদের রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের যে সব গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে 'জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ'ই প্রাচীনতম। সাম্প্রদায়িক কিংবদন্তী অনুসারে 'জৈনেন্দ্র' নামটি জিন (মহাবীর) এবং দেবরাজ ইন্দ্রের সংস্রবসূচক। জৈন সাহিত্যের একাধিক গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, জিনদেব মহাবীর আট বৎসর বয়সে ইন্দ্র-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যে শব্দবিদ্যা প্রকাশ করেন তাহাই ক্রমে ঐন্দ্র বা জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।—'যদিন্দ্রায় জিনেন্দ্রেণ কৌমারেঽপি নিরূপিতম্। ঐন্দ্রং জৈনেন্দ্রমিত্যেতৎ প্রাহুঃ শব্দানুশাসনম্।।'—(জৈন) কল্পসূত্রটীকা। এই টীকাতেই প্রসঙ্গতঃ কথিত হইয়াছে ঃ

> তত ইন্দ্রো বৃদ্ধব্রাহ্মণ-রূপং কৃত্বা ভগবন্তমুচ্চৈর্যোগ্যাসন উপবেশ্যোপাধ্যায়মনোগতান্ সন্দেহান্ ভগবন্তং পৃচ্ছতি স্ম। ভগবাংশ্চ তেষামুত্তরাণি দত্তবান্। উপাধ্যায়শ্চ ভগবতা কথ্যমানান্যুত্তরাণি শৃণ্বন্নেবমচিন্তয়ৎ। অহো এতে ব্যাকরণসন্দেহা মম বাল্যাবস্থাত আরভ্যাভূবন্ পরং ন কেনাপি পণ্ডিতেন ভগ্না অনেন বালকেনাপি ভগ্নাঃ।... ইত্যাশ্চর্যে ক্রিয়মাণে ইন্দ্র উপাধ্যায়-পণ্ডিতং প্রাহ। ভো এনং বালমাত্রং ন জানীহি। অয়ং ত্রিভুবনস্বামী জ্ঞানত্রয়সহিতঃ সর্বজ্ঞপ্রায়ো মহাবীরদেবঃ। ইন্দ্রেণ দশধা সূত্রাণি পৃষ্টানি—সংজ্ঞাসূত্রং পরিভাষাসূত্রং বিধিসূত্রং নিয়মসূত্রং প্রতিষেধসূত্রমধিকার সূত্রমতিদেশসূত্রমনুবাদসূত্রং বিভাষাসূত্রং নিপাতন-সূত্রম্। ভগবতা চৈতেষাং দশানাং ব্যাকরণসূত্রাণাং প্রত্যুত্তরাণি দত্তানি। তদা তত্রস্থানে জৈনেন্দ্র ব্যাকরণং জাতম্।

জৈন্ কল্পসূত্রের লক্ষ্মীবল্লভকৃত 'কল্পদ্রুমকলিকা' নাম্নী আর এক টীকায় লিখিত আছে ঃ

'তদা দশাঙ্গং ব্যাকরণং কৃতম্। জিনেন সূত্রাণি প্রতিপাদিতানি। ইন্দ্রেণ বৃত্তিরুদাহরণানি দর্শিতানি। তল্লোকে জৈনেন্দ্রং ব্যাকরণং জাতম্।' জৈনেন্দ্র মহাবৃত্তিতে—'পঞ্চাধ্যায়াঃ পরিমাণমস্য পঞ্চকং সূত্রম্। এবমষ্টকং দ্বাদশকম্। পঞ্চকমধীয়তে বিদন্তি বা পঞ্চকা জৈনেন্দ্রাঃ' (৩।২।৫৫)।

লিঙ্গানুশাসনে বামনের (খ্রীঃ ৮ম/৯ম শতক) 'ব্যাড়িপ্রণীতমথবাররুচং সচান্দ্রং জৈনেন্দ্রলক্ষণগতং বিবিধং তথান্যৎ' (৩১) ইত্যাদি শ্লোকাংশে এবং মেরুতুঙ্গাচার্য-রচিত 'প্রবন্ধচিন্তামণি'তে উল্লিখিত সিদ্ধরাজ জয়সিংহের সহিত হেমচন্দ্রাচার্যের কথোপকথনের সময়ে হেমচন্দ্রের 'পুরা শ্রীজিনেন শ্রীমন্মহাবীরেণেন্দ্রস্য পুরতঃ শৈশবে যদ্ ব্যাখ্যাতং তজ্জৈনেন্দ্রব্যাকরণমধীয়ামহে বয়ম্' ইত্যাদি উক্তিতেও জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের নাম পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া 'কবিকল্পদ্রুমে'র প্রারম্ভে বোপদেবের 'ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ। পাণিন্যমর-জৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ।।' এই বিখ্যাত শ্লোকে জৈনেন্দ্র তো তদিষ্ট আদ্য অষ্ট শাব্দিকের (= বৈয়াকরণের) অন্যতম রূপেই পরিগণিত। আবার কেহ কেহ পূর্ববৎ আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া এই ব্যাকরণকেই 'ঐন্দ্র' নামেও অভিহিত করিয়াছেন। জৈন 'আবশ্যকসূত্রে'র হরিভদ্র-রচিত বৃত্তিতে ঃ

শক্রঃ তৎসমক্ষং লেখাচার্য-সমক্ষং ভগবন্তং তীর্থঙ্করং আসনে নিবেশ্য শব্দস্য লক্ষণং পৃচ্ছতি। ভগবতা চ ব্যাকরণমভ্যধায়ি। ব্যাক্রিয়ন্তে লৌকিকসাময়িকাঃ শব্দাঃ অনেন ইতি ব্যাকরণং শব্দশাস্ত্রম্। তদবয়বাঃ কেচন উপাধ্যায়েন গৃহীতাঃ। ততশ্চ ঐন্দ্রং ব্যাকরণং সংজাতম্।

উদয়প্রভদেব সূরি-রচিত 'উপদেশ-মালাকর্ণিকা'তেও এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে ঃ

মত্বাবধেস্তমবধিং গত্বা নত্বা চ জিষ্ণুনা। পৃষ্টোঽধ্যাস্য গুরোঃপীঠং শব্দবিদ্যাং জগৌ প্রভুঃ।। ইন্দ্রায়েদং জিনেন্দ্রেণোপদিষ্টমিতি বিষ্টপে। ঐন্দ্রাখ্যং তদুপাধ্যায়োঽখ্যাপয়চ্ছব্দশাসনম্।।

এমন কি হেমচন্দ্রও অন্যত্র ইহার 'ঐন্দ্র' নামেই প্রকাশিত হওয়ার কথা বলিয়াছেন ঃ

মাতা পিতৃভ্যামন্যেদ্যুঃ প্রারব্ধেঽধ্যাপনোৎসবে। আঃ সর্বজ্ঞস্য শিষ্যাত্বমিতীন্দ্রস্তমুপাশ্রিতঃ।। উপাধ্যায়াসনে তস্মিন্ বাসবেনো-পবেশিতঃ। প্রণম্য প্রার্থিতঃ স্বামী শব্দপারায়ণং জগৌ।। ইদং ভগবতেন্দ্রায় প্রোক্তং শব্দানুশাসনম্। উপাধ্যায়েন তচ্ছ্রুত্বা লোকেঽস্মৈন্দ্রমিতীরিতম্।।—যোগশাস্ত্র (১।৫৬-৮)।

বস্তুতঃ ঐন্দ্র ব্যাকরণ বলিতে যে প্রাচীন ব্যাকরণ বুঝায় তাহা অন্য ব্যাকরণ। বৈদিক দেবতা ইন্দ্র তাহার প্রণেতা। চীনা, তিব্বতী এবং ভারতীয় সাহিত্যে এই ইন্দ্রের উল্লেখ আছে এবং তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া বোপদেব 'ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ...'ইত্যাদি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। জৈন হরিবংশপুরাণে জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের রচয়িতা দেবনন্দীকে 'ইন্দ্রচন্দ্রার্কজৈনেন্দ্রব্যাপিব্যাকরণেক্ষণঃ' বলা হইয়াছে। কাহারও মতে দেবনন্দীর ব্যাকরণকে আদিতে 'ঐন্দ্র' নামেই অভিহিত করা হইত, পরে প্রাচীন ঐন্দ্র ব্যাকরণ হইতে পৃথক্ নির্দেশিত করিতে ইহাকে জৈনদের ঐন্দ্র ব্যাকরণ অর্থাৎ জৈনেন্দ্র (= জৈন + ইন্দ্র) ব্যাকরণ বলা হইতে থাকে। এইভাবে বৌদ্ধ ইন্দ্রগোমীর ব্যাকরণকেও বৌদ্ধদের ঐন্দ্র ব্যাকরণ বলা অস্বাভাবিক নয়। কেবল নাম-সাদৃশ্যই নয়, প্রাচীন ঐন্দ্র ব্যাকরণের দৈব ঐতিহ্যও এই নামকরণের মূলে কার্যকর ছিল বলিয়া মনে হয়। অন্য কয়েকটি ব্যাকরণের রহস্যঘন উৎপত্তির মতো এই জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের উৎপত্তিতেও অলৌকিকত্ব বা দেবত্বের আরোপ এবং অন্যান্য জৈন শাস্ত্রের মতো জৈন ব্যাকরণেও মহাবীরের কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া আত্মপ্রসাদলাভের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি, পূর্বোক্ত আখ্যায়িকা রচনার মূলে ক্রিয়াশীল থাকাও স্বাভাবিক। নতুবা ঐধরনের কিংবদন্তীর মূলে কোনও বাস্তব সত্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। সব কিছুকেই 'জিনাস্যবিনির্গতম্' বলিয়া প্রতিপন্ন করার একটা প্রচেষ্টা জৈন সাহিত্যে বড় বেশী প্রকট। খ্রীঃ ১৩শ শতকের লেখক সকলকীর্তি 'মহাবীর চরিতে' লিখিয়াছেন যে, মাগধী ও অর্ধমাগধী ভাষা দুইটিও প্রথমে জিনের মুখ হইতেই বাহির হইয়াছিল। এক সন্ধিভট্টারক তাঁহার স্থাপত্য-বিষয়ক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, শিল্পশাস্ত্রও মহাবীরের মুখ হইতেই প্রথম বিনির্গত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, হেমচন্দ্রের মতো বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতও জৈনেন্দ্রের দৈবী উৎপত্তিকে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

বস্তুতঃ জৈনেন্দ্রের প্রণেতা পূজ্যপাদ দেবনন্দীরই নামান্তর 'জিনেন্দ্রবুদ্ধি' হইতে ব্যাকরণের এই নামকরণ। অবশ্য এই জিনেন্দ্র-বুদ্ধি, 'কাশিকা-বিবরণ-পঞ্জিকা'র প্রণেতা জিনেন্দ্রবুদ্ধি নহেন। তিনি ছিলেন 'বোধিসত্ত্বদেশীয়াচার্য' অর্থাৎ বৌদ্ধ। একাধিক শিলালিপিতে দেবনন্দীর 'জিনেন্দ্রবুদ্ধি' নাম পাওয়া যায় ঃ

> 'যো দেবনন্দিপ্রথমাভিধানো বুদ্ধ্যা মহত্যা স জিনেন্দ্রবুদ্ধিঃ। শ্রীপূজ্যপাদোঽজনি দেবতাভির্যৎপূজিতং পাদযুগং তদীয়ম্।।'—শ্রবণবেলুগোলা শিলালেখ নং ৪০(৬৪) এবং 'শ্রীপূজ্যপাদো-দ্ধৃতধর্মরাজ্যস্ততঃ সুরাধীশ্বরপূজ্যপাদঃ। যদীয় বৈদুষ্যগুণানিদানীং বদন্তি শাস্ত্রাণি তদুদ্ধৃতানি।। ধৃতবিশ্ববুদ্ধিরয়মত্র যোগিভিঃ কৃতকৃত্যভাবমনুবিভ্রদুচ্চকৈঃ। জিনবদ্ বভূব যদনঙ্গচাপহৃৎ স জিনেন্দ্রবুদ্ধিরিতি সাধুবর্ণিতঃ।।'—১৩৬৫ শকাব্দীয় মঙ্গরাজকবির শিলালেখ হইতে।

বিভিন্ন গ্রন্থকার, বিশেষতঃ জৈন সাহিত্যিকগণ, 'পূজ্যপাদ' বা 'দেবনন্দী' নামেই প্রায়শঃ তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। অমিত গিরি-রচিত 'ধর্মপরীক্ষা,' চামুণ্ডারাজ-প্রণীত 'চামুণ্ডারাজপুরাণ' (খ্রীঃ ১০ম শতক), মেঘচন্দ্রের (খ্রীঃ ১১শ/১২শ শতক) 'শ্রাবকাচার' এবং 'সমাধিশতক'-টীকা প্রভৃতি গ্রন্থে পূজ্যপাদের উল্লেখ আছে। অমিত গিরি তাঁহাকে জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের, পাণিনীয় ব্যাকরণের ব্যাখ্যার এবং উমাস্বাতি-কৃত 'তত্ত্বার্থে'র ব্যাখ্যার রচয়িতা বলিয়াছেন। দেবনন্দী এবং পূজ্যপাদ এই দুই নামেই তাঁহাকে বৈয়াকরণ মানা হইয়াছে। সোমদেব 'শব্দার্ণব চন্দ্রিকা' বৃত্তিতে লিখিয়াছেন 'অনুপূজ্যপাদং বৈয়াকরণাঃ' এবং 'পৌজ্যপাদমনেকশেষং ব্যাকরণম্'। অনুরূপভাবে এই ব্যাকরণের 'উপজ্ঞাতে' (৩।৩।৮৪) সূত্রের ব্যাখ্যায় মহাবৃত্তিকার অভয় নন্দীও বলিয়াছেন—'দৈবনন্দিনমনেকশেষং ব্যাকরণম্' এবং তিনি ও সোমদেব উভয়েই যথাক্রমে ১।৪।৯৭ এবং ১।৪।১১৪ সূত্রের বৃত্তিতে 'দেবোপজ্ঞমনেকশেষব্যাকরণম্' বলিয়াছেন।[১] সোমদেব দেবনন্দীর সম্পূর্ণ নামটিরই উল্লেখ করিয়াছেন 'স্বস্যাভাব্যোঽৎপরোঽণ্দি' সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই শ্লোকে ঃ 'আদেশঃ প্রত্যয়শ্চৈব কটমেতো হি লক্ষ্মণি। ভাব্যশব্দেন পঞ্চৈতে কথ্যন্তে দেবনন্দিভিঃ।।' অর্থাৎ এই সূত্রের অন্তর্গত ভাব্য শব্দের দ্বারা দেবনন্দী এই পাঁচটিকে নির্দেশ

করিতেছেন—আদেশ, প্রত্যয়, এবং সেই তিনটি—যাহাদের অনুবন্ধরূপে ক্‌, ট্‌ এবং ম্‌ বিদ্যমান। 'পঞ্চবস্তু'র রচয়িতা শ্রুতকীর্তিও গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন ঃ 'কৃতিরিয়ং দেবনন্দ্যাচার্যস্য পরিবাদিমথনস্য।' এই পঞ্চবস্তু—জৈনেন্দ্র ব্যাকরণেরই সূত্রাবলীর প্রক্রিয়াবদ্ধ রূপ। মাদ্রাজের Govt. Oriental Manuscripts Library-স্থিত পূজ্যপাদ-রচিত জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ-সূত্রপাঠের এক পাণ্ডুলিপির শেষে এই শ্লোকটি পাওয়া গিয়াছে ঃ

ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ শাকটতনয়ঃ পাণিনিঃ পূজ্যপাদো যৎ প্রোবাচা-
পিশলিরমরঃ কাশকৃৎস্নস্তথান্যঃ। কৃৎস্নন্যায়ব্যবহিতপদং লক্ষণং
শব্দরাশেঃ সূত্রোপাত্তং তদিহ নিখিলং শব্দপারায়ণেঽস্তি।।

ইহা, সম্ভবতঃ, জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের গুণনন্দী যে পরিবর্ধিত ও পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রস্তুত করেন সেই 'শব্দার্ণবে'র উদ্দেশে রচিত। Kielhorn সাহেব নাকি এই শ্লোকটিই ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন 'শব্দার্ণবচন্দ্রিকা'র এক পাণ্ডুলিপির শেষে। ধনঞ্জয়-প্রণীত 'নামমালা'তেও পূজ্যপাদের লক্ষণকে (= ব্যাকরণকে) ত্রিরত্নের অন্যতম রূপে প্রশংসা করা হইয়াছেঃ

প্রমাণমকলঙ্কস্য পূজ্যপাদস্য লক্ষণম্।
ধনঞ্জয়কবেঃ কাব্যং রত্নত্রয়মপশ্চিমম্।।২০।

স্থল-বিশেষে কেবল 'দেব' বা 'নন্দী' নামেও দেবনন্দীর উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের নমস্কারশ্লোকে স্বয়ং দেবনন্দীই এইরূপ খণ্ডিত নাম ব্যবহার করিয়াছেন ঃ

লক্ষ্মীরাত্যন্তিকী যস্য নিরবদ্যাবভাসতে।
দেব-নন্দিত-পূজেশে নমস্তস্মৈ স্বয়ম্ভুবে।।

এখানে 'দেবনন্দিতপূজেশ' পদটি লক্ষণীয়। কৌশলে ইহাদ্বারা দেব, নন্দী এবং পূজ্যপাদ এই তিনেরই অভিব্যক্তি ঘটানো হইয়াছে। জিন সেনের আদিপুরাণের প্রথম পর্বে ঃ

কবীনাং তীর্থকৃদ্দেবঃ কিংতরাং তত্র বর্ণ্যতে।
বিদুষাং বাঙ্‌মলধ্বংসি তীর্থং যস্য বচোময়ম্।।৫২

এবং বাদিরাজসূরিকৃত 'পার্শ্বনাথচরিতে'র প্রথম সর্গে ঃ

অচিন্ত্যমহিমা দেবঃ যোঽভিবন্দ্যো হিতৈষিণা।
শব্দাশ্চ যেন সিদ্ধ্যন্তি সাধুত্বং প্রতি লম্ভিতাঃ।।১৮।

এই দুই 'শ্লোকে 'দেব'শব্দ দেবনন্দি-সূচক। হেমচন্দ্রের লিঙ্গানুশাসনে 'নন্দিধাতুপারায়ণ' এবং 'নন্দিপারায়ণে'র উল্লেখ আছে। এই নন্দি(ন্)

শব্দ দেবনন্দিবাচক। এইসব হইতে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের মূলে দৈব প্রভাব যাহাই থাকুক না কেন, জৈন পণ্ডিতগণই কার্যতঃ ইহাকে পূজ্যপাদ. দেবনন্দীর রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

চন্দ্রয্য কবি কানাড়ী ভাষায় পূজ্যপাদচরিত রচনা করেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই গ্রন্থের তেমন কোনও মূল্য না থাকিলেও ইহা হইতে জানা যায় যে, দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটক দেশের অন্তর্গত 'কোলে' (কালংগল) নামক গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে দেবনন্দীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মাধব ভট্ট এবং মাতার নাম শ্রীদেবী। কালে এই বালক ত্রিলোকপূজ্য হইবে—জ্যোতির্বিদের এই ঘোষণা-অনুসারে তাঁহার নাম রাখা হয় পূজ্যপাদ (?)। কথিত আছে যে, পূজ্যপাদের কনিষ্ঠা ভগিনী গুণ ভট্টের সঙ্গে বিবাহিতা হইলে তাঁহাদের নাগার্জুন নামে পুত্র জন্মে। এই সংবাদ সত্য হইলে দেবনন্দী নাগার্জুনের মাতুল ছিলেন। বলা বাহুল্য ইনি কনিষ্ক-সভ্য বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত খ্রীঃ ১ম/২য় শতাব্দীয় নাগার্জুন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। সর্পকবলিত একটি ব্যাঙের মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখিয়া পূজ্য-পাদের বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং তিনি জৈন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি পরম জিন-ভক্ত এবং মহাজ্ঞানী বলিয়া প্রতিভাত হন।

'কর্ণাটককবিচরিত্র'-মতে পূজ্যপাদ ছিলেন গঙ্গবংশীয় রাজা অবিনীতের পুত্র দুর্বিনীতের গুরু। কুর্গ (মর্করা) হইতে প্রাপ্ত ৩৮৩ শকাব্দীয় এক তাম্রশাসনে মহারাজ অবিনীতের উল্লেখ আছে। এই অনুসারে দুর্বিনীতের রাজ্যকাল দাঁড়ায় খ্রীঃ ৫ম শতকের শেষদিকে। কাহারও মতে তিনি ৪৮৩–৫১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কাজেই দেবনন্দী যে খ্রীঃ ৫ম শতকের ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ায় তাঁহার জীবিত থাকা অসম্ভব নয়। জৈনেন্দ্র মহাবৃত্তিতে (২।২।৯২) প্রদত্ত 'অরুণন্মহেন্দ্রো মথুরাম্' উদাহরণ হইতে মহেন্দ্রকে গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ মহেন্দ্রকুমার বা কুমারগুপ্ত (খ্রীঃ ৪১৫-৫৫) ধরিয়া পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক দেবনন্দীর খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীয়ত্বের পক্ষে প্রমাণ খাড়া করিয়াছেন। চান্দ্র ব্যাকরণের (১।২। ৮১) বৃত্তিভাগেও অনুরূপ উদাহরণ লক্ষণীয়। মীমাংসকের মতে এই উদাহরণ দুইটি যথাক্রমে জৈনেন্দ্র ও চান্দ্র ব্যাকরণের অভয়নন্দী এবং ধর্মদাসের বৃত্তিতে দেখা গেলেও, আসলে ইহা এই দুই ব্যাকরণের

স্বোপজ্ঞ বৃত্তি অর্থাৎ সূত্রকার-কৃত বৃত্তি হইতেই গৃহীত ('সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রকা ইতিহাস,' ১ম ভাগ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৪১৫–১৭)। এই জাতীয় উদাহরণের মূল রহস্য এই যে, কাত্যায়নের 'পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞাতে প্রযোক্তুর্দর্শন বিষয়ে' (মহাভাষ্য ৩।২।১১১) এই বার্ত্তিকানুসারে, প্রযোক্তা (গ্রন্থকার) প্রত্যক্ষ করেন নাই, অথচ তাঁহার পক্ষে দর্শন করা অসম্ভব ছিল না এমন কোনও বিশেষ ঘটনার বর্ণনা-কালে তিনি তৎসম্পর্কিত ধাতুর উত্তর অতীতকালবাচক লঙ্ বিভক্তি ব্যবহার করিবেন। এই নিয়মানুসারে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তীকালের অনেক বৈয়াকরণই তাঁহাদের জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত বিখ্যাত ঘটনা-মূলক উদাহরণের যথাযথ বিন্যাস করিয়া গিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ ক্ষেত্রে মহেন্দ্রাদিত্য বা কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং তাহাদের কবল হইতে মথুরা-বিজয়ের প্রসিদ্ধ ঘটনা সূচিত হইয়াছে।

চান্দ্র এবং জৈনেন্দ্র দুই ব্যাকরণই গুপ্তযুগের মধ্যভাগে, সময়ের অল্প ব্যবধানে রচিত হইলেও প্রথমটির কিছু কিছু মত-বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয়ে স্বীকৃত বা গৃহীত হইয়াছে ; যেমন পাণিনি-মতে (৭।৩।৩৪) 'বিশ্রম' শুদ্ধ, 'বিশ্রাম' অশুদ্ধ ; চান্দ্র মতে (৬।১।৪২) 'বিশ্রাম' শুদ্ধ, 'বিশ্রম' অশুদ্ধ ; জৈনেন্দ্র মতে (৫।২।৪১) বিশ্রম ও বিশ্রাম—দুইই শুদ্ধ। সেইরূপ, পাণিনি-মতে (৫।৪।১২৯) 'প্রজ্ঞুঃ' এবং 'সংজ্ঞুঃ' শুদ্ধ ; চান্দ্র মতে (৪।৪।১১৯) শুদ্ধ—'প্রজ্ঞঃ' এবং 'সংজ্ঞঃ', জৈনেন্দ্রের মতে (৪।২।১৬৪) এই চারিটি পদই শুদ্ধ[২]। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, চান্দ্র ব্যাকরণের পরে জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ রচিত হয়।

দেবনন্দী ছিলেন দিগম্বর জৈন। 'গণরত্নমহোদধি' গ্রন্থে (১।২) তাঁহাকে 'দিগ্‌বস্ত্রো দেবনন্দী' এবং পরে (৭।৪১৭) 'দিগম্বর'ও বলা হইয়াছে। জৈন সম্প্রদায়ে রচিত জৈনেন্দ্র, অভিনব বা জৈন শাকটায়ন এবং হৈম—এই তিন প্রধান ব্যাকরণের মধ্যে কেবল প্রথমটিই দিগম্বরদের এবং বাকী দুইটিই শ্বেতাম্বর জৈনদের মধ্য হইতে অভ্যুদিত।

(২)

জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের পাঁচটি অধ্যায়, প্রতি অধ্যায়ে চারি পাদ। ইহার দুইটি সূত্রপাঠ প্রচলিত—একটি দেবনন্দিকৃত মূল সূত্রপাঠ, অপরটি

মূলের গুণনন্দিকৃত পরিবর্ধিত রূপ। প্রথমটির সূত্রসংখ্যা তিন হাজারের কিছু বেশী (৩০৬৩), অপরটির ৩৬৯৬। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'ই জৈনেন্দ্রের প্রধান উপজীব্য, তবে স্থলবিশেষে চান্দ্রের সহায়তাও গৃহীত হইয়াছে। পাণিনি-দর্শিত শব্দসামগ্রীর নিরাকরণের পরিবর্তে উহার অবিকল সংরক্ষণই দেবনন্দীর অভিপ্রায়। কেবল যুগপ্রয়োজনে বা সাম্প্রদায়িক অনুরোধে বৈদিকাংশ বাদ দিয়াছেন। কাত্যায়নের বার্ত্তিকে এবং মহাভাষ্যের ইষ্টিতে যে সব নূতন রূপ বা বিষয় ব্যাকরণ-সিদ্ধ বলিয়া স্থিরীকৃত, দেবনন্দী সেইসবও গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে জৈনেন্দ্র কোনও মৌলিকতা দাবী করিতে পারে না। সূত্রগুলিও প্রায়শঃ পাণিনীয় সূত্রাবলীর অনুকরণে রচিত ; দুই-একটি শব্দকে এদিক-ওদিক করিয়া আংশিক পরিবর্তন ঘটানো হইয়াছে মাত্র। বৈদিক প্রক্রিয়া পরিত্যক্ত হইলেও 'ধায্যা, আনায্য, সানায্য, কুণ্ডপায্য, পরিচায্য, উপচায্য' (২।১।১০৪-০৫), 'গ্রাবস্তুৎ' (২।২।১৫৬) প্রভৃতি বৈদিকসাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দ এবং 'শুক্র, অপোনপ্তৃ, মহেন্দ্র, সোম, দ্যাবাপৃথিবী, শুনাসীর, মরুত্বৎ, অগ্নীষোম, বাস্তোস্পতি, গৃহমেধ' প্রভৃতি গৃহ্যসূত্রকালীন দেবতাদের নাম পাণিনীয় প্রকরণের অনুসারে এই ব্যাকরণে (৩।২।২১-৮) রহিয়া গিয়াছে। প্রত্যাহারগুলিও পাণিনির ১৪টি প্রত্যাহার-সূত্রেরই অনুরূপ, কোনো নূতনত্ব নাই।

জৈনেন্দ্রের যাহা কিছু নূতনত্ব, তাহা ইহার সংজ্ঞাকরণে। প্রসিদ্ধ অন্বর্থ সংজ্ঞা-সমূহের পরিবর্তে অধিকাংশস্থলেই ঐকাক্ষরিক নূতন এবং অর্থহীন সূচকসমূহ উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে অবশ্য কোথাও কোথাও সূক্ষ্মবুদ্ধির দীপ্তিও পরিলক্ষিত হয়। 'বিভক্তী' (বিভক্তিস্থলে) শব্দটিতে ব্যবহৃত (ব্ + ই + ভ্ + অ + ক্ + ত্ + ঈ) ৭টি বর্ণকে পৃথক্ রূপে লইয়া, ব্যঞ্জনের অন্তে 'আ' এবং স্বরের অন্তে 'প্' যোগ করিয়া প্রথমাদি ৭বিভক্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে ঃ বা = ১মা, ইপ্ = ২য়া, ভা = ৩য়া, অপ্ = ৪র্থী, কা = ৫মী, তা = ৬ষ্ঠী, ঈপ্ = ৭মী বিভক্তি। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত যথাক্রমে 'প্র, দী, প'। 'প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানাম্' প্রবচন এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ব্যাকরণ তথা শব্দবিদ্যাকে (মতান্তরে তর্কবিদ্যা তথা ন্যায়শাস্ত্রকে) সমস্ত বিদ্যার প্রদীপ বলা হয়। প্রাতিপদিক হইয়াছে 'মৃৎ' এবং লোপ = 'খ'। এখানেও সূক্ষ্মতা লক্ষণীয়। 'খ' বা আকাশের শূন্যতার সহিত লোপের

সাদৃশ্য এবং মৃত্তিকার উপাদানত্বের সহিত প্রাতিপদিকের বৈশিষ্ট্যগত সাম্য উপলক্ষিত হইয়াছে। অন্যান্য সংজ্ঞাগুলি এইরূপ ঃ একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচন যথাক্রমে 'এক', 'দ্বি' এবং 'বহু'; প্রথম, মধ্যম ও উত্তম পুরুষ যথাক্রমে 'অন্য', 'যুষ্মদ' এবং 'অস্মদ্'; গুণ—'এপ্', বৃদ্ধি—'ঐপ্', উপধা—'উঙ্', লঘু—'ঘি', গুরু—'রু', আত্মনেপদ—'দ', পরস্মৈপদ—'ম', সমাস—'স', তৎপুরুষ—'ষ', কর্মধারয়—'য', দ্বিগু—'র', বহুব্রীহি—'ব', অব্যয়ীভাব—'হ', সবর্ণ—'স্ব', তদ্ধিত—'হৃৎ', সম্বুদ্ধি—'কি', সংজ্ঞা—'খু', উপসর্গ—'গি', অব্যয়—'ঝি', নিষ্ঠা—'ত', গতি—'তি', প্রত্যয়—'ত্য', প্রগৃহ্য—'দি', উত্তরপদ—'দ্যু', সর্বনামস্থান—'ঘ', অকর্মক ধাতু—'ধি', ধাতু—'ধু', নিপাত—'নি', উপসর্জন—'ন্যক্', সার্বধাতুক—'গ', উপপদ—'বাক্', অনুনাসিক—'ঙ' ইত্যাদি।

সম্ভবতঃ জৈনেন্দ্রের পূর্ববর্তী অন্য কোন ব্যাকরণেই এত বেশী কৃত্রিম আক্ষরিক সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয় নাই। পরবর্তীকালে একমাত্র বোপদেবের মুগ্ধবোধব্যাকরণে এই আত্যন্তিক সংক্ষেপ অনুকৃত হইয়াছে। তৎপূর্ববর্তী জৈন শাকটায়নও এই বিষয়ে কতক পরিমাণে জৈনেন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছেন। কৃত্রিম সংজ্ঞাজাল এবং সূত্রগঠনপ্রণালী দেখিয়া মনে হয়, পাণিনীয় ব্যাকরণকে সংক্ষিপ্তাকারে পরিবেষণের আগ্রহও যেন দেবনন্দীকে সবিশেষ অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। পাণিনির অনুকরণে জৈনেন্দ্রের সূত্রপাঠেও উণাদ্যংশ অনুপস্থিত, কেবল অষ্টাধ্যায়ীর 'উণাদয়ো বহুলম্' (২।২।১৬) সূত্রটি গৃহীত হইয়াছে। এই সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অভয়নন্দী মহাবৃত্তিতে কয়েকটি উণাদিসূত্রের উল্লেখপূর্বক উহাদের দ্বারা সিদ্ধ কতকগুলি প্রয়োগ উপস্থাপিত করিয়াছেন। একশেষ পরিত্যক্ত। এই প্রসঙ্গে অবশ্য দেবনন্দী একটি সূত্র রচনা করিয়াছেন ঃ 'স্বাভাবিকত্বাদভিধানস্যৈকশেষানারম্ভঃ' (১।১।১০০)। পাণিনির 'পূর্বত্রাসিদ্ধম্' (৮।২।১) সূত্রটিকে জৈনেন্দ্রে ৫।৩।২৭ সংখ্যক সূত্ররূপে উপস্থাপনার দ্বারা পূর্ববর্তী কিঞ্চিদধিক সাড়ে চারি অধ্যায়ের প্রতি পরবর্তী কিঞ্চিন্ন্যূন দুই পাদের (নিয়মাবলীর) অসিদ্ধত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে। জৈনেন্দ্রের সূত্রপাঠে দেবনন্দী ছয়জন পূর্বাচার্যের অনুস্মরণ করিয়াছেন ঃ (১) শ্রীদত্ত (১।৪।৩৪), (২) যশোভদ্র (২।১।৯৯), (৩) ভূতবলি (৩।৪।৮৩), (৪) প্রভাচন্দ্র (৪।৩।১৮০), (৫) সিদ্ধসেন (৫।১।৭) এবং (৬) সমন্তভদ্র (৫।৪।১৪০)। ইঁহারা

সকলেই যে প্রামাণিক বৈয়াকরণ ছিলেন বা ব্যাকরণগ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আশ্চর্যের বিষয়, অষ্টাধ্যায়ীর কতকগুলি বিভাষাসূত্র ইঁহাদের নামে আরোপিত হইয়াছে [দ্রষ্টব্য—সূর্যকান্ত শাস্ত্রিসম্পাদিত 'অথর্বপ্রাতিশাখ্যে'র (Lahore, 1939) ভূমিকা, পৃঃ ২৯]। মহাভাষ্য ও কাশিকাবৃত্তির অনুসরণে মহাবৃত্তিতে উদাহরণমুখে ইঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ 'অনুসমন্তভদ্রং তার্কিকাঃ' (১।৪।১৫), 'উপসিদ্ধসেনং বৈয়াকরণাঃ' (১।৪।১৬), 'আকুমারেভ্যো যশঃ সমন্তভদ্রস্য' (১।৪।২০), 'আকুমারং যশঃ সমন্তভদ্রস্য' (১।৩।১০), 'শ্রীদত্তশব্দো লোকে প্রকাশতে' (১।৩।৫), 'গোতমেন প্রোক্তং গৌতমম্। শ্রীদত্তীয়ম্। সামন্তভদ্রম্' (৩।৩।৭৬)। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৭৬-৪১৪খ্রীঃ) নবরত্নের অন্যতম 'ক্ষপণক'ই উল্লিখিত সিদ্ধসেন—কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন। মৈত্রেয়রক্ষিতের 'তন্ত্রপ্রদীপে' (১।৪।৫৫ এবং ৪।১।১৫৫) 'ক্ষপণক ব্যাকরণ' এবং 'ক্ষপণক-মহান্যাস' উদ্ধৃত হইয়াছে। 'আখ্যাতমঞ্জরী' নামে এক গ্রন্থের রচয়িতা ক্ষপণক। উজ্জ্বলদত্তের উণাদিবৃত্তিতে (১। ১৫৮) লিখিত আছে ঃ 'ক্ষপণকাবৃত্তাবত্রেতি শব্দ আদ্যর্থে ব্যাখ্যাতঃ।' এই 'ক্ষপণকবৃত্তি' সম্ভবতঃ কোনও উণাদিপাঠের বৃত্তি। খ্রীঃ ৯ম শতকে রচিত অভিনব শাকটায়নের ব্যাকরণে (২।১।২২৯) এক সিদ্ধনন্দীর নাম করা হইয়াছে। 'সিদ্ধসেন দিবাকর' বা 'সিদ্ধসেন গণি দিবাকর' নামও দৃষ্ট হয়। উমাস্বাতি-প্রণীত 'তত্ত্বার্থাধিগম সূত্রভাষ্যে'র সিদ্ধসেনগণি-রচিত টীকা হইতে পণ্ডিত P.K. Gode উদ্ধৃতি দিয়াছেন (দ্রঃ New Indian Antiquary, Vol. II, No.2, May 1939)। 'ন্যায়াবতার' ইঁহার অপর গ্রন্থ। খ্রীঃ ২য় শতকে অভ্যুদিত সমন্তভদ্রের কোনও নিজস্ব ব্যাকরণ ছিল কিনা সন্দেহস্থল। খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীয় তিব্বতী বৌদ্ধ ঐতিহাসিক লামা তারনাথের ('তারানাথ' নয়) মতে নালন্দার বৌদ্ধ পণ্ডিত চন্দ্রকীর্তি 'সমন্তভদ্র' নামে এক শ্লোকাত্মক ব্যাকরণ রচনা করেন—যাহা চান্দ্র ব্যাকরণের উৎকর্ষে হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। এই চন্দ্রকীর্তি খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীয় তথা দেবনন্দীর সমকালীন হইলেও বয়সে বড় বলিয়া মনে হয়। এখন, এই সমন্তভদ্র ব্যাকরণের সহিত জৈনাচার্য সমন্তভদ্রের কোনও সংস্রব ছিল কিনা বলা যায় না। মহাবৃত্তিধৃত পূর্বোক্ত উদাহরণে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ তার্কিক এবং সিদ্ধসেনকে

শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ বলা হইয়াছে। সমন্তভদ্রের পরম্পরা-শিষ্য লক্ষ্মীধর তাঁহার 'একান্তখণ্ডন' গ্রন্থে সমন্তভদ্রের তার্কিক শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার পর এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

অসিদ্ধং সিদ্ধসেনস্য বিরুদ্ধং দেবনন্দিনঃ।
দ্বয়ং সমন্তভদ্রস্য সর্বথৈকান্তসাধনম্।।

অকলঙ্ক-রচিত 'সিদ্ধিবিনিশ্চয়' গ্রন্থের টীকায় এবং অনন্তবীর্য-প্রণীত 'ন্যায়বিনিশ্চয়বিবরণে' এই শ্লোকটির পাঠান্তর ঃ

অসিদ্ধঃ সিদ্ধসেনস্য বিরুদ্ধো দেবনন্দিনঃ।
দ্বেধা সমন্তভদ্রস্য হেতুরেকান্তসাধনে।।

বলা বাহুল্য, ইহাদ্বারা সিদ্ধসেন, সমন্তভদ্র এবং দেবনন্দী—এই তিনজনেরই ন্যায়শাস্ত্রীয় কৃতিত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। জৈন সম্প্রদায়ে 'ইতি শ্রীদত্তঃ' প্রয়োগ,'ইতি পাণিনিঃ'র মতোই প্রসিদ্ধ ছিল। 'শ্রীদত্তশব্দো লোকে প্রকাশতে'—মহাবৃত্তি (১।৩।৫)। 'তেন প্রোক্তম্' (৩।৩।৭৬) সূত্রের উদাহরণে অভয়নন্দী শ্রীদত্ত-রচিত গ্রন্থকে 'শ্রীদত্তীয়ম্' বলিয়াছেন ঃ 'ব্যাখ্যাদিনা প্রকর্ষেণোক্তং প্রোক্তমিতি গৃহ্যতে। ...গোতমেন প্রোক্তং গৌতমম্। শ্রীদত্তীয়ম্। সামন্তভদ্রম্। আপিশলম্।' এই উদাহরণ-মালাতে সমন্তভদ্রের গ্রন্থের অনুস্মরণও লক্ষণীয়।

জৈনেন্দ্র সূত্রপাঠের দেবনন্দিকৃত কোনও বৃত্তি পাওয়া যায় নাই। এইরূপ কোনও বৃত্তি আদৌ ছিল কিনা সেই সম্বন্ধেও কিছু জানা যায় না। শিলা-লেখ হইতে প্রমাণিত হয়, তিনি 'জৈনেন্দ্র ন্যাস' নামে এই ব্যাকরণসংক্রান্ত গ্রন্থ এবং পাণিনিব্যাকরণেরও 'শব্দাবতার' নামে এক ন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, ইহাদের একটিকেও বর্তমানে পাওয়া যায় না।[৩] সূত্রকার সূত্রব্যাখ্যামূলক বৃত্তি রচনা করেন না—এমন প্রায়শঃ ঘটে না। সুতরাং মনে হয়, পূর্বোক্ত জৈনেন্দ্র ন্যাস-ই হয়তো বা এই ব্যাকরণের বৃত্তির স্থলবর্তী ছিল।

ব্যাকরণ-বিষয়ক গ্রন্থ ভিন্ন দেবনন্দী আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। এই সম্বন্ধে শিলা-লেখ হইতে প্রাপ্ত নিম্নের শ্লোক দুইটিতে কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় ঃ

ন্যাসং জৈনেন্দ্রসংজ্ঞং সকলবুধনুতং পাণিনীয়স্য ভূয়ো ন্যাসং শব্দাবতারং মনুজততিহিতং বৈদ্যশাস্ত্রং চ কৃত্বা। যস্তত্ত্বার্থস্য টীকাং ব্যরচয়দিহ তাং ভাত্যসৌ পূজ্যপাদঃ স্বামী ভূপালবন্দ্যঃ

স্বপরহিতবচঃ পূর্ণদৃগ্‌বোধবৃত্তঃ।। —Epigr. carn., vol, viii, part II, p. 268 (Mysore Inscription) ; জৈনেন্দ্রং নিজশব্দভাগমতুলং সর্বার্থসিদ্ধিঃ পরা সিদ্ধান্তে নিপুণত্বমুদ্ধকবিতাং জৈনাভিষেকঃ স্বকঃ। ছন্দঃ সূক্ষ্মধিয়ং সমাধিশতকং স্বাস্থ্যং যদীয়ং বিদামাখ্যাতীহ স পূজ্যপাদমুনিপঃ পূজ্যো মুনীনাং গণৈঃ।।—শ্রবণ বেলগোলাশিলা-লেখ, ৪০ (৬৪)।

এই বর্ণনা হইতে জানা যায়, পূজ্যপাদ জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ, জৈনেন্দ্র ন্যাস, শব্দাবতারন্যাস, বৈদ্যক গ্রন্থ, (উমাস্বাতি-রচিত) তত্ত্বার্থসূত্রের টীকা 'সর্বার্থসিদ্ধি', সমাধিশতক, জৈনাভিষেক (৫১ শ্লোকাত্মক) এবং ছন্দঃশাস্ত্রীয় (ইহাই কি সমাধিশতক?) গ্রন্থ রচনা করেন। শুভচন্দ্র-প্রণীত 'জ্ঞানার্ণবে' দেবনন্দীর বাক্যকে মানুষের দেহ, মন ও বাক্যের কলঙ্কভঞ্জক বলা হইয়াছে; অর্থাৎ তিনি চিকিৎসা-বিষয়ক, ধর্মোপদেশ-মূলক এবং শব্দবিষয়ক (ব্যাকরণ) গ্রন্থ রচনার দ্বারা যথাক্রমে কায়, মন ও বাক্যের মল দূর করিয়াছিলেন ঃ

অপাকুর্বন্তি যদ্‌বাচঃ কায়বাক্‌চিত্তসম্ভবম্।
কলঙ্কমঙ্গিনাং সোঽয়ং দেবনন্দী নমস্যতে।।

এইসব ভিন্ন, 'ইষ্টোপদেশ' (৫১ শ্লোকাত্মক), 'সিদ্ধপ্রিয়স্তোত্র' (২৬ শ্লোকে ২৪ তীর্থঙ্করের স্তুতি), 'সারসংগ্রহ' (ন্যায়গ্রন্থ) এবং 'দশ বিভক্তি' নামক গ্রন্থকয়টির কর্তৃত্বও তাঁহাতে আরোপিত। প্রভাচন্দ্রাচার্যের 'ক্রিয়াকলাপ' গ্রন্থে 'দশবিভক্তি'কে পূজ্যপাদ-রচিত বলা হইয়াছে। আবার এক তাম্রশাসনে (দানপত্রে) রাজা অবিনীতের পুত্র দুর্বিনীত 'শব্দাবতার' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন দেখা যায় ঃ 'শ্রীমৎ কোঙ্কণমহারাজাধিরাজস্যাবিনীতনাম্নঃ পুত্রেণ শব্দাবতারকারেণ দেবভারতীনিবদ্ধ-বৃহৎকথেন কিরাতার্জুনীয়পঞ্চদশ-সর্গটীকাকারেণ দুর্বিনীতনামধেয়েন...'অর্থাৎ কোঙ্কণরাজ অবিনীতের পুত্র দুর্বিনীত শব্দাবতার কৃৎ, (পৈশাচী ভাষায় রচিত) 'বৃহৎকথা'র সংস্কৃতে অনুবাদক এবং কিরাতার্জুনীয়ের পঞ্চদশ সর্গের টীকাকার। এই 'শব্দাবতার' হয়তো দুর্বিনীত-রচিত অন্য কোন পৃথক্ ব্যাকরণ গ্রন্থ।

জৈনেন্দ্র সূত্রপাঠের অভয়নন্দি-রচিত 'মহাবৃত্তি' এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার রচনাকাল সঠিক নিধারিত না হইলেও অভয়নন্দীর অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ৯ম/১০ম শতাব্দী বলিয়া অনুমিত। 'চন্দ্রপ্রভচরিত'-মহাকাব্যের

রচয়িতা বীরনন্দীর গুরু এই অভয়নন্দী। বীরনন্দীর সময় খ্রীঃ ১০ম শতক ধরিয়া অভয়নন্দীকে ৯ম/১০ম শতাব্দীয় বলা যাইতে পারে। খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীয় অকলঙ্ক-রচিত তত্ত্বার্থবার্ত্তিকের উল্লেখ করায় অভয়নন্দী তৎপূর্বগ নহেন। মহাবৃত্তিতে (৩।২।৫৫) এই প্রসঙ্গে লিখিত আছে ঃ 'তত্ত্বার্থবার্ত্তিকমধীতে তাত্ত্বার্থবার্ত্তিকঃ, কলাপকমধীয়তে কালাপকাঃ।...অষ্টকাঃ পাণিনীয়াঃ, দ্বাদশকা আৰ্হতাঃ।' মহাবৃত্তির পরিমাণ প্রায় ১২০০০ শ্লোকের সমান। মূল ব্যাকরণের অপূর্ণতা দূর করিতে এবং ইহাকে কার্যোপযোগী করিয়া লইতে অভয়নন্দীকে বহু বার্ত্তিক ও উপসংখ্যানাদি মহাবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইয়াছে। এই ধরনের বার্ত্তিক সংখ্যায় প্রায় পাঁচশত (৪৯২)। তিনি কোথা হইতে এইগুলি গ্রহণ করিয়াছেন বা তিনি নিজেই ইহাদের রচয়িতা কিনা সে সম্বন্ধে কিছু বলা দুঃসাধ্য। স্থানে স্থানে তিনি মহাভাষ্যকারের ন্যায় এইসব বার্ত্তিকের নিরাকরণপূর্বক মূল সূত্রদ্বারাই অভীষ্ট ব্যাকরণ-কার্য সিদ্ধ হইতে পারে এইরূপ দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ ঐসব স্থলে বার্ত্তিকের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কাজেই ঐগুলির রচয়িতা যে তিনি নহেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য মহাভাষ্যের রচনা-পদ্ধতিকে নকল করিতে যদি তিনি এইরূপ কৃত্রিমতার আশ্রয় লইয়া থাকেন তবে তাহা কেবল হাস্যকর নয় লজ্জাজনকও।

মহাবৃত্তিতে অনেক উণাদি সূত্রও উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদের কয়েকটি পঞ্চপাদী উণাদি সূত্রপাঠের সঙ্গে মিলে, কয়েকটির পাঠান্তর দৃষ্ট হয়, আবার কয়েকটিতে প্রত্যক্ষভাবে জৈনেন্দ্রের সংজ্ঞাসমূহের প্রয়োগও দেখা যায়। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, এই ব্যাকরণ-সম্মত এক উণাদিপাঠ ছিল। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, এই ব্যাকরণের গণপাঠ, লিঙ্গানুশাসন, উণাদিসূত্রপাঠ ইত্যাদি খিল (পরিশিষ্ট) পাঠ সমূহের কোনটিরই কোন পৃথক্ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। অথচ মূল সূত্রাংশ, মহাবৃত্তি এবং অন্যান্য গ্রন্থকার-কর্তৃক উদ্ধৃতিসমূহের পর্যালোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কোনও না কোনও আকারে এই ব্যাকরণেও ঐসব আনুষঙ্গিক গ্রন্থ একদা বিদ্যমান ছিল এবং দেবনন্দী নিজেই সম্প্রদায়-নিষ্পত্তির জন্য ঐগুলির সঙ্কলন করিয়াছিলেন।[৪]

জৈনেন্দ্র ধাতুপাঠ বর্তমান। ইহাতে ১৪৭৮টি ধাতুর অর্থ দেওয়া আছে। অন্য এক ধাতুপাঠে ১৭৬৫টি ধাতু পাওয়া যায়। এই ধাতুপাঠ

জৈনেন্দ্রর বৃহৎ সংস্করণের সহিত সংশ্লিষ্ট। বৃহৎ সংস্করণের 'শব্দার্ণব' নামানুসারে ইহাকে 'শব্দার্ণবধাতুপাঠ' বলা হয়। পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত খুর্দ্, মস্থ্ প্রভৃতি ধাতুর অন্তর্ভুক্তি হইতে প্রমাণিত যে, ক্রমে ইহার দেহেও পরিবর্ধনাদি ঘটানো হইয়াছে। জৈনেন্দ্র গণপাঠ মহাবৃত্তিতে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট আছে। গণের সংখ্যা সব মিলাইয়া ১৫০টি। খ্রীঃ ৮ম/৯ম শতাব্দীয় বামনের লিঙ্গানুশাসনের শেষে এবং হৈম লিঙ্গানুশাসনের স্বোপজ্ঞ বিবরণে যথাক্রমে '...জৈনেন্দ্রলক্ষণগতং...লিঙ্গস্য লক্ষ্ম...' এবং 'নন্দী'র নামে উদ্ধৃতি হইতে দেবনন্দীর লিঙ্গানুশাসনের দীর্ঘকালীন অস্তিত্ব প্রমাণিত। হেমচন্দ্র 'ইতি নন্দী' বলিয়া তাঁহার নামে 'ভ্রামরং তু ভবেচ্ছুক্লং ক্ষৌদ্রং তু কপিলং ভবেৎ' এই যে শ্লোকার্ধের উদ্ধার করিয়াছেন, অমরকোষের (২।৫।২৬) 'টীকাসর্বস্বে' তাহার সম্পূর্ণটাই নিমি-র নামে উদ্ধৃত হইয়াছে। উজ্জ্বলদত্তের উণাদিবৃত্তিতে (৪।১৪৬) জিনেন্দ্রবুদ্ধির নামে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ 'অশ্মানং দৃষদং মন্যে মন্যে কাষ্ঠমুলূখলম্। অন্ধায়াশ্চ সুতং মন্যে যস্য মাতা ন পশ্যতি।। ইতি জিনেন্দ্রবুদ্ধিঃ।'এই জিনেন্দ্রবুদ্ধি যদি দেবনন্দীর নামান্তর হয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত বৌদ্ধ জিনেন্দ্রবুদ্ধি না হন, তবে তাঁহার লিঙ্গানুশাসন যে শ্লোকবদ্ধ ছিল তাহা প্রমাণিত হয়। তবে ইহা দ্বারা, তাঁহার সূত্রাত্মক লিঙ্গানুশাসনের অভাব প্রতিপন্ন হয় না। অমরকোষের (১।২।৮৯) 'পদচন্দ্রিকা' টীকায় 'নন্দিস্বামী'র নামে 'দাক্ষায়ণী শ্রীরিব নির্বভাসে' এই শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই নন্দিস্বামীর সহিত দেবনন্দীর অভিন্নতা পূর্বেই প্রমাণিত।

মহাবৃত্তিতে প্রায় ৭০টি পরিভাষা-সূত্র লক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের কয়েকটি সূত্রপাঠের অন্তর্ভুক্ত এবং কয়েকটি সূত্রপাঠের বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও বৃত্তিকার-কর্তৃক স্বীকৃত। ভাষ্যকার পতঞ্জলির অনুকরণে অভয়নন্দীও সূত্র হইতে কতকগুলি পরিভাষাকে জ্ঞাপিত করিয়াছেন। এইসব পরিভাষার পাঠ পাণিনীয় পরিভাষাসমূহের ন্যায় হইলেও জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের উপযোগী করিয়া লইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করা হইয়াছে।

মহাবৃত্তিতে ৪০টি শিক্ষা-সূত্রেরও উল্লেখ আছে। এইগুলি মূলতঃ আপিশলির শিক্ষা হইতে গৃহীত হইলেও এইস্থলে জৈনেন্দ্রের উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ মহাবৃত্তিকারই ইহাদের সংস্কর্তা।

(৩)

মহাবৃত্তির প্রারম্ভিক শ্লোক হইতে জানা যায়, ইহার পূর্বে আরও অনেকে এই ব্যাকরণের ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন। সমগ্রতার দিক্ দিয়া সেই সব ব্যাখ্যা ত্রুটিহীন না হওয়ায় অভয়নন্দী ('অভয়নন্দিমুনি') এই পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা রচনা করেন। রচনাশৈলীতে কাশিকাবৃত্তির প্রভাব থাকিলেও, ইহার প্রণয়নে মহাভাষ্যাদির সহায়তা গ্রহণ এত বেশী প্রকট যে তাহা অনুকরণের পর্যায়ে পড়ে। মহাভাষ্যের মতো এই মহাবৃত্তিতেও যোগ-বিভাগ দেখাইয়া অনেক পদের সাধুত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। পরিমাণে ইহা কাশিকাবৃত্তি অপেক্ষা বৃহত্তর। জৈনেন্দ্র সূত্রপাঠের উপর প্রভাচন্দ্র 'শব্দাম্ভোজভাস্কর' নামে যে ন্যাস রচনা করেন, আকারে তাহা মহাবৃত্তি অপেক্ষাও বৃহৎ। বর্তমানে ইহা পাওয়া যায় না। প্রভাচন্দ্র খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীয় এবং ধারা-নিবাসী। রাজা ভোজের রাজত্বকালে (খ্রীঃ ১০১০–১০৬৫) তিনি 'প্রমেয়কমল-মার্তণ্ড' নামক ন্যায়-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার অপর গ্রন্থ 'ন্যায়কুমুদচন্দ্র'। ভোজদেবের উত্তরাধিকারী জয়সিংহদেবের শাসনকালে (১০৬৫–১০৬৮) তাঁহার ঐ ন্যাস রচিত হইয়াছিল।

জৈনেন্দ্র সূত্রাবলীর অবলম্বনে 'পঞ্চবস্তু' নামে এক প্রক্রিয়াত্মক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন আর্য শ্রুতকীর্তি। কৌমুদীর পদ্ধতিতে রচিত হওয়ায় প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারক। 'লঘুকৌমুদী'র মতো ইহার নামান্তর 'লঘুজৈনেন্দ্র' বা 'লঘুজৈনেন্দ্র প্রক্রিয়া'। পরিমাণে প্রায় ৩৩০০ শ্লোকের সমান। পঞ্চবস্তু অর্থাৎ পাঁচটি অধ্যায় ঃ সন্ধিবস্তু, নামবস্তু, স-বিধি-(সমাসবিধি)বস্তু, হ্যদ্‌বিধি-(তদ্ধিতবিধি)বস্তু এবং আখ্যাতবস্তু। সঙ্গে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। কানাড়ী ভাষায় অগ্‌গল কবি-রচিত 'চন্দ্রপ্রভচরিতে' শ্রুতকীর্তিকে 'শ্রুতকীর্তিত্রৈবিদ্যচক্রবর্তী' বলিয়া অগ্‌গল কবির গুরুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ ১০১১শকাব্দে (১০৮৯খ্রীঃ) রচিত। তদনুসারে শ্রুতকীর্তিকে খ্রীঃ ১১শ বা ১১শ/১২শ শতাব্দীয় বলা চলে। নন্দিসঙ্ঘের গুর্বাবলীতে 'ত্রৈবিদ্যঃ শ্রুতকীর্ত্যাখ্যো বৈয়াকরণভাস্করঃ' এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। পঞ্চবস্তুর অন্তে জৈনেন্দ্র ব্যাকরণকে এক বিশাল প্রাসাদের সহিত তুলিত করিয়া ইহার ন্যাস ও বৃত্তি প্রভৃতিকে ঐ প্রাসাদের বিভিন্ন অংশরূপে বর্ণনাপূর্বক রচিত শ্লোকটি সুন্দর ঃ

সূত্রস্তম্ভ সমুদ্ধৃতং প্রবিলসন্ ন্যাসোরুরত্নক্ষিতিঃ
শ্রীমদ্‌বৃত্তি কপাট সংপুটযুতং ভাষ্যোঽথ শয্যাতলম্।
টীকামালমিহারুরুক্ষুরচিতং জৈনেন্দ্রশব্দাগমং
প্রাসাদং পৃথুপঞ্চবস্তুকমিদং সোপানমারোহণাৎ।।

অর্থাৎ জৈনেন্দ্র শব্দাগমরূপ প্রাসাদের স্তম্ভ মূলসূত্র, ন্যাস ইহার রত্নময় ভূমি, বৃত্তি ইহার কপাট, ভাষ্য শয্যাতল, টীকা ইহার মাল (মঞ্জিল) এবং পঞ্চবস্তু ইহাতে আরোহণের সোপান। শ্লোককথিত ভাষ্য ও টীকার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। খ্রীঃ ২০শ শতকে মহাচন্দ্র মহাবৃত্তির আধারে 'লঘুজৈনেন্দ্র' নামে এক বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। এই শতাব্দীতেই বংশীধর-কর্তৃক এক 'জৈনেন্দ্র প্রক্রিয়া' রচিত হইয়াছে।

জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের গুণনন্দিকৃত পরিবর্ধিত রূপ বা সংস্করণের নাম 'শব্দার্ণব'। এমন অনুমিত হয় যে খ্রীঃ ৯ম শতকে অভিনব শাকটায়নের শব্দানুশাসন রচনার পূর্বপর্যন্ত জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের সূত্রপাঠ অপরিবর্তিতই ছিল। ইহার অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া, অর্থাৎ বার্ত্তিক ও উপসংখ্যানাদি ভিন্ন ইহা দ্বারা যথেষ্ট কার্য সম্পাদন করা যায় না বলিয়াই বোধ হয় শাকটায়ন অপর পূর্ণাঙ্গতর জৈন ব্যাকরণ রচনা করেন। তাই এই শেষোক্ত ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনায় ইহার চিন্তামণি বৃত্তিতে যক্ষবর্মা লিখিয়াছেন ঃ

ইষ্টির্নেষ্টা ন বক্তব্যং বক্তব্যং সূত্রতঃ পৃথক্।
সংখ্যাতং নোপসংখ্যানং যস্য শব্দানুশাসনে।।

অর্থাৎ শাকটায়নের শব্দানুশাসনে সূত্ররচনার দ্বারাই যাবতীয় বক্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, (জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের ন্যায়) এইজন্য ইষ্টি-বার্ত্তিকাদি-রচনার ব্যবস্থা করিতে হয় নাই। সূত্রাতিরিক্ত বক্তব্য না থাকায় ইষ্ট্যাদির প্রয়োজন উপলব্ধ নহে। তাই শাকটায়নের ব্যাকরণ রচিত হওয়ার পর জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের অনুগামীরা নিজেদের ব্যাকরণের ত্রুটি দূর করিয়া উহার কার্যোপযোগী প্রতিসংস্কার সাধনে ইচ্ছুক হইলে, গুণনন্দী তদনুযায়ী এই পরিবর্ধিত বৃহত্তর সূত্রপাঠ প্রস্তুত করেন। 'শব্দার্ণব-প্রক্রিয়া'র একটি শ্লোকে এই সূত্রপাঠকে 'শ্রীগুণনন্দিতানিতবপুঃ' বলা হইয়াছে ঃ

সৎসন্ধিং দধতে সমাসমভিতঃ খ্যাতার্থনামোন্নতং
নির্দ্ধাতং বহুতদ্ধিতং কৃতমিহাখ্যাতং যশঃ শালিনম্।

সৈষা শ্রীগুণনন্দিতানিতবপুঃ শব্দার্ণবং নির্ণয়ে
নাবিত্যাশ্রয়তাং বিবিক্ষুমনসাং সাক্ষাৎ স্বয়ং প্রক্রিয়া ।।

'শ্রীগুণনন্দিতানিতবপুঃ শব্দার্ণবং' অর্থাৎ গুণনন্দি-কর্তৃক তানিত বা বর্ধিত শরীর-বিশিষ্ট শব্দার্ণব। তাঁহার সময়ে ব্যাকরণ-সিদ্ধ বলিয়া গৃহীত সমস্ত প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সূত্রপাঠ রচিত। মহাবৃত্তিতে লক্ষিত বহু বার্ত্তিক এই সূত্রপাঠের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মূল জৈনেন্দ্র সূত্রপাঠের অর্ধেকেরও বেশী সূত্র শব্দার্ণবে অপরিবর্তিত রূপে বিদ্যমান। মঙ্গলাচরণ-শ্লোক এবং রচয়িতার নাম যথাপূর্বং সুরক্ষিত। মূল সূত্রপাঠে যে বৈদিক ছাপ ছিল, শব্দার্ণবে তাহা অনুপস্থিত। পূর্ণাঙ্গ বলিয়া, ইহার ব্যাখ্যাতাদের কোন বার্ত্তিক বা উপসংখ্যানাদির আশ্রয় লইতে হয় নাই। সর্বপ্রয়োজন-পূরণের উদ্দেশ্যই এখানে অধিকতর প্রকটিত।

খ্রীঃ ৯ম শতকের মধ্যভাগে গুণনন্দীর আবির্ভাব। কর্ণাটক-কবিচরিত্রের রচয়িতা, গুণনন্দীর প্রশিষ্য ও দেবেন্দ্রের শিষ্য পম্পের জন্মকাল স্থির করিয়াছেন ৯৫৯ সংবৎ অর্থাৎ ৯০২ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা হইতে অনুমিত হয়, গুণনন্দী খুব সম্ভব খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভেও জীবিত ছিলেন। তাঁহার গুরুর নাম বলাকপিচ্ছ। শ্রবণ বেলগোলা-শিলা-লেখতে ঃ 'তচ্ছিষ্যো গুণনন্দিপণ্ডিতযতিশ্চারিত্রচক্রেশ্বরস্তর্কব্যাকরণাদি-শাস্ত্রনিপুণঃ সাহিত্যবিদ্যাপতিঃ।'

গুণনন্দী স্বয়ং শব্দার্ণবের কোন বৃত্তি বা ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। খ্রীঃ ১৩শ শতকের প্রারম্ভে রচিত সোমদেবের 'শব্দার্ণবচন্দ্রিকা', ইহার প্রামাণিক বৃত্তি। ইহার নমস্কার-শ্লোকে ক্রমান্বয়ে পূজ্যপাদ ও গুণনন্দীর নাম করা হইয়াছে। কোহ্লাপুর রাজ্যের অন্তর্গত অর্জুরিকা গ্রামে ত্রিভুবন তিলক নামক জৈন মন্দিরে শিল্হার-বংশীয় ২য় ভোজের রাজ্যকালে ১১২৭ শকাব্দে (খ্রীঃ ১২০৫) সোমদেব এই বৃত্তিরচনা সম্পূর্ণ করেন। বাদীভ বজ্রাঙ্কুশ শ্রীবিশালকীর্তি পণ্ডিতের অনুরোধে এই বৃত্তি রচিত। পাণিনির ১৪টি প্রত্যাহার-সূত্রের স্থলে ১৩টি করা হইয়াছে ; পাণিনির হযবরট্ ও লণ্ প্রত্যাহার মিলাইয়া শব্দার্ণবে হযবরলণ্ এবং পাণিনির ঋ৯ক্ হইয়াছে ঋক্। ব্যাকরণে অযোগবাহ সংজ্ঞাধীন অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয় এবং যম বর্ণের উল্লেখ পাণিনীয় তথা জৈনেন্দ্রী প্রত্যাহার-সূত্রে নাই,

কিন্তু শব্দার্ণবের প্রত্যাহার-সূত্রে কিছু আছে ঃ 'শষস অং অঃ ≍ক≍প'। জৈন শাকটায়নের ব্যবহৃত ১৩টি প্রত্যাহার-সূত্রও এইরূপ। বলা বাহুল্য সেখান হইতেই শব্দার্ণবে এইগুলি গৃহীত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত কৌমুদীর হল্-সন্ধিপ্রকরণে যে বলা হইয়াছে 'অনুস্বার-বিসর্গ-জিহ্বামূলীয়োপধ্মানীয়-যমানামকারোপরি শর্ষু চ পাঠস্যোপসংখ্যানত্বেন...' তাহা সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত অভিনব প্রত্যাহার-সূত্রের জ্ঞাননির্দেশক। শব্দার্ণবচন্দ্রিকায় ও শব্দার্ণব-প্রক্রিয়ায় একশেষ প্রকরণ বর্তমান, মহাবৃত্তির অনুকরণে পরিত্যক্ত নয়।

শব্দার্ণবচন্দ্রিকার আধারে রচিত প্রক্রিয়াগ্রন্থ এই 'শব্দার্ণবপ্রক্রিয়া'। ইহার প্রণেতার নাম জানা যায় নাই। মহাবৃত্তির সহিত 'পঞ্চবস্তু'র যে সম্বন্ধ, শব্দার্ণবচন্দ্রিকার সহিত এই প্রক্রিয়ার সম্বন্ধও তদ্রূপ। ভুলক্রমে ইহার কর্তৃত্ব গুণনন্দীতে আরোপিত। আনুমানিক খ্রীঃ ১২শ শতকের প্রথমার্ধ ইহার রচনাকাল। সূত্রসংখ্যা ১১০৫। নিম্নের শ্লোকে ইহার প্রক্রিয়াবিভাগ ব্যক্ত হইয়াছে ঃ

> সন্ধের্নাম্নঃ সমাসস্য হৃদ্‌বিধের্মিঙ্‌কৃতোরপি।
> সংক্ষেপাদজ্ঞসংজ্ঞপ্ত্যৈ প্রক্রিয়ামবতারয়ে।।

সন্ধি, শব্দ, সমাস, তদ্ধিত, আখ্যাত ও কৃৎ—এই ছয় বিভাগ। ইহা ছাড়া কাশীধর-রচিত 'বৃহজ্জৈনেন্দ্রপ্রক্রিয়া,' সোমেশ্বরকৃত 'মধ্যজৈনেন্দ্র ব্যাকরণ' এবং নেমিচন্দ্র-রচিত 'প্রক্রিয়াবতার' (জৈনেন্দ্র প্রক্রিয়া বিশেষ) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। অভয়নন্দীর মহাবৃত্তিসহ জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ, পণ্ডিত শম্ভুনাথ ত্রিপাঠি-কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে 'ভারতীয় জ্ঞানপীঠ,' কাশী হইতে 'জ্ঞানপীঠ মূর্তি দেবী জৈন গ্রন্থমালা—সংস্কৃত গ্রন্থাঙ্ক ১৭' রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

> 'পূজ্যপাদাপরাখ্যায় নমঃ শ্রীদেবনন্দিনে।
> ব্যধায়ি পঞ্চকং যেন সূত্রং জৈনেন্দ্রমূলকম্।।
> মহাবৃত্তিকৃতে তস্মৈ নমোঽস্ত্বভয়নন্দিনে।
> যদ্‌বাক্যাদভয়া ধীরাঃ শব্দবিদ্যাসু সন্ততম্।।'
>
> —প্রশস্তি

---

১ জৈনেন্দ্রের অনেকশেষত্ব এমন কিছু অভিনব নয়। চান্দ্র ব্যাকরণেও একশেষ প্রকরণ নাই। মহাভাষ্যেও একশেষের অনাবশ্যকতা সূচিত ঃ'অশিষ্য একশেষ একোনকত্বাৎ। অর্থাভিধানং পুনঃ স্বাভাবিকম্।' (১।২।৬৪) অর্থাৎ শব্দের অর্থাভিধান-শক্তি স্বাভাবিক বলিয়া এক শব্দ হইতে অনেক অর্থ প্রতীত হয়, তাই একশেষপ্রকরণ অনাবশ্যক।

তৎপূর্ববর্তী মাথুরী বৃত্তিতেও যে ইহার সমর্থন ছিল তাহার প্রমাণ ভাষাবৃত্তিতে (১।২।৫৭) পুরুষোত্তমদেবের উক্তি ঃ 'মাথুর্যাং তু বৃত্তাবশিষ্যগ্রহণমাপাদমনুবর্ততে।' অর্থাৎ অষ্টাধ্যায়ীর ১।২।৫৩-৭৩ পর্যন্ত ২১টি সূত্র অশিষ্য বা অনাবশ্যক। ইহাদের মধ্যে একশেষের কথাও আছে। পূর্বোক্ত ভাষ্যোক্তির প্রতিধ্বনিস্বরূপ জৈনেন্দ্রে সূত্রিত হইয়াছে ঃ 'স্বাভাবিকত্বাদভিধানস্যৈকশেষানারম্ভঃ' (১।১।১০০)। এই জন্য এই ব্যাকরণকে 'অনেকশেষ ব্যাকরণ' বলা হয়। জৈন মহাবৃত্তিতে (৩।৩।৮৪) অভয়নন্দী উদাহরণ দিয়াছেন 'দৈবনন্দিনমনেকশেষং ব্যাকরণম্' এবং 'শব্দার্ণবচন্দ্রিকা'-বৃত্তিতে (১।৪।১১৪) উদাহৃত হইয়াছে 'দেবোপজ্ঞমনেকশেষ ব্যাকরণম্।'

২ অমরকোষের (২।৬।৪৭) সর্বানন্দকৃত 'টীকাসর্বস্বে' ধৃত কাতন্ত্রটীকার (২।৬।১৩৮) বচন ঃ 'সংপ্রাভ্যাংজানুনোর্জুজ্ঞাবূর্ধ্বাৎজ্ঞুঃস্যাদ্ বিভাষয়া। সংহতে জানুনী যস্য সংজ্ঞুঃ প্রজ্ঞুঃ স উচ্যতে।।' এবং রায়মুকুট-কৃত 'পদচন্দ্রিকা' টীকায় ধৃত সাহসাঙ্কের বচন ঃ 'প্রজ্ঞুঃ প্রগতজানুঃস্যাৎ প্রজ্ঞোঽপ্যত্রৈব দৃশ্যতে। সংজ্ঞুঃ সংহতজানৌ চ ভবেৎ সংজ্ঞোঽপি তত্র হি।। উর্ধ্বজ্ঞুরূর্ধ্বজানুঃ স্যাদূর্ধ্বজ্ঞোঽপ্যূর্ধ্বজানুকঃ।'

৩ কন্নড় কবি পোন্ন তৎকৃত শান্তিপুরাণে (৯৩৩ খ্রীঃ) ন্যাসকারকে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাকৃৎ বলিয়াছেন এবং শান্তিপুরাণের প্রারম্ভে পূজ্যপাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন। 'বৃত্তিবিলাস' (খ্রীঃ ১১৬০)-মতে পূজ্যপাদ জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ রচনা করেন এবং পাণিনিব্যাকরণের ব্যাখ্যা লিখেন। খ্রীঃ ৭ম শতকে রচিত হর্ষচরিতের (Fuhrer's edn.p.133) 'কৃতগুরুপদন্যাসাঃ', মাঘকবির 'শিশুপালবধ' কাব্যে (২।১১২)—'অনুৎসূত্রপদন্যাসা,' খ্রীঃ ৬ষ্ঠ।৭ম শতাব্দীয় ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে (৬।৩৬) 'শিষ্টপ্রয়োগমাত্রেণ ন্যাসকারমতেন বা' ইত্যাদিস্থলে উল্লিখিত ন্যাস বলিতে যে কেবল দেবনন্দি-প্রণীত ন্যাসই বুঝিতে হইবে এমন নয়। কাশিকাবৃত্তির উপর বৌদ্ধ জিনেন্দ্রবুদ্ধি-রচিত 'কাশিকা বিবরণ পঞ্জিকা'ও 'কাশিকা-ন্যাস' বা 'ন্যাস' নামে অভিহিত। সায়ণাচার্য-রচিত 'মাধবীয় ধাতুবৃত্তি'তে 'বোধিন্যাস' এবং 'শাকটায়ন-ন্যাসে'র উল্লেখ ও উদ্ধৃতি আছে।

৪ যুধিষ্ঠির মীমাংসকের মতে [দ্রঃ 'জৈনেন্দ্রশব্দানুশাসন ঔর উসকে খিলপাঠ' নামক হিন্দী প্রবন্ধ—যাহা কাশীর 'ভারতীয় জ্ঞানপীঠ' হইতে প্রকাশিত (১৯৫৬) মহাবৃত্তিসহ জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের অগ্রভাগে যোজিত হইয়াছে] আচার্য দেবনন্দী স্বীয় ব্যাকরণে সূত্রপাঠ, ধাতুপাঠ, ধাতুপারায়ণ, গণপাঠ, উণাদিসূত্র, লিঙ্গানুশাসন, লিঙ্গানুশাসনব্যাখ্যা, বার্ত্তিকপাঠ, পরিভাষাপাঠ, শিক্ষাসূত্র এবং জৈনেন্দ্র ন্যাস রচনা করিয়া যান। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে—সর্বার্থসিদ্ধি, সমাধিতন্ত্র, ইষ্টোপদেশ ও দশভক্তি (?) এবং পাওয়া যায় নাই—শব্দাবতারন্যাস, বৈদ্যকগ্রন্থ, সারসংগ্রহ, জৈনেন্দ্রন্যাস ও জৈনাভিষেক।

জৈন শাকটায়নের ব্যাকরণ

(খ্রীঃ ৯ম শতক)

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে উল্লিখিত প্রাচীন শাকটায়ন হইতে পৃথক্ করিয়া জৈন শাকটায়নকে অর্বাচীন বা 'অভিনব' শাকটায়ন বলা হয়। বোপদেব তাঁহার 'কাব্যকামধেনু'টীকায় এবং ভট্টোজি দীক্ষিত এই 'অভিনব' বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন। হেমচন্দ্র, 'গণরত্নমহোদধি' প্রণেতা বর্ধমান, 'মাধবীয় ধাতুবৃত্তি'তে সায়ণাচার্য প্রভৃতি অনেকে শাকটায়ন-ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি শ্বেতাম্বর জৈন বলিয়া অনুমিত। যুধিষ্ঠির মীমাংসকের মতে ইনি জৈন যাপনীয় সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। দিগম্বর এবং শ্বেতাম্বর এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের আড়ালে পড়িয়া ক্রমে তৃতীয় উক্ত সম্প্রদায়টির অবলুপ্তি ঘটিলে বর্তমান দুই প্রধান সম্প্রদায়েই তিনি আচার্যরূপে পূজিত। রচিত ব্যাকরণের প্রতি পাদের শেষে 'মহাশ্রমণ সঙ্ঘাধিপতেঃ শ্রুতকেবলিদেশীয়াচার্যস্য শাকটায়নস্য...' অভিধা পাওয়া যায়। 'চিন্তামণি' বৃত্তিকার যক্ষবর্মাও তাঁহাকে 'মহাশ্রমণসঙ্ঘাধিপতি' বলিয়াছেন। তীর্থঙ্করদের মুখে উপদেশাবলী শুনিয়াই যাঁহারা নির্বাণ মার্গে আরূঢ় হন তাঁহাদিগকে বলা হয় শ্রুতকেবলী। কেবলী = পূর্ণজ্ঞানী। 'শ্রুতকেবলিদেশীয়' অর্থাৎ শ্রুতকেবলীদের প্রায় সমপর্যায়ের। এই ব্যাকরণেরই 'প্রক্রিয়া সংগ্রহে'র রচয়িতা অভয়চন্দ্র, শাকটায়নের অপর নাম 'পাল্যকীর্তি'র উল্লেখ করিয়াছেন। এই পাল্যকীর্তিই[১] তাঁহার প্রকৃত নাম। লুপ্তপ্রায় প্রাচীন শাকটায়নের ব্যাকরণের ভিত্তিতে, উহারই (?) যুগোপযোগী প্রতিসংস্কারপূর্বক শব্দানুশাসন রচনা করেন বলিয়া তিনিও ঐ শাকটায়ন নামে অভিহিত হন। প্রাচীন শাকটায়ন-ব্যাকরণের ন্যায় ('চতুষ্কাঃ শাকটায়নীয়াঃ') এই ব্যাকরণও চারি অধ্যায়বিশিষ্ট। ইহার 'অমোঘাবৃত্তি'তে শাকটায়ন নিজেও 'ভগবান্ আচার্য শাকটায়ন' বলিয়া প্রাচীন শাকটায়নের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই ভক্ত-শিষ্যদের দ্বারা তিনিও 'শাকটায়ন' অভিধায় ভূষিত হইয়া তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাকেই মর্যাদা দিয়া থাকিবেন।

প্রাচীন শাকটায়নের ব্যাকরণ বহুকাল পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে পাণিনির কোন কোন সূত্রে সেই ব্যাকরণের মতামতের যে আংশিক আভাস পাওয়া যায়, তাহার সমর্থনে এই অভিনব শাকটায়নের ব্যাকরণসূত্র উপস্থাপিত করা চলে। অষ্টাধ্যায়ীর যে তিনটি সূত্রে (৩।৪। ১১১, ৮।৩।১৮ ও ৮।৪।৫০) শাকটায়নীয় মতের উল্লেখ আছে, তাহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ই নবীন শাকটায়নের ৬টি সূত্রে (১।৪।১০৬ ও ১।১।১৫৩-৫৪ এবং ১।১।১১৭-১৯) ব্যক্ত করা হইয়াছে, অথচ শাকটায়নের নামোল্লেখ করা হয় নাই। ইহা হইতে অবশ্য এই ব্যাকরণের সহিত প্রাচীনের সংস্রব থাকার অনুমান দৃঢ় হয়। আবার এই ব্যাকরণের যে তিনটি সূত্রে (১।২।১৩, ৩৭ এবং ২।১।২২৯) তিন জন প্রাচীন আচার্যের (আর্যবজ্র, ইন্দ্র, সিদ্ধনন্দী) মত উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের শেষ দুইটির বক্তব্যের সহিত অষ্টাধ্যায়ীর ৭।২।১০ এবং ৫।৪।১৫৪ সূত্রীয় বক্তব্যের সাদৃশ্য আছে, অথচ সেখানে আনুষঙ্গিক কোনও আচার্যের নাম করা হয় নাই, কিন্তু বিভাষা বা বিকল্পের (option) নির্দেশ দেওয়া আছে। আশ্চর্যের বিষয়, এই বিভাষার সুযোগেই নবীন শাকটায়ন দুই জন তথাকথিত পূর্বাচার্যের নাম জুড়িয়া দিয়াছেন। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের সূত্রপাঠেও যে ছয় জন তথাকথিত প্রাচীন আচার্যের নাম করা হইয়াছে তাঁহাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে অষ্টাধ্যায়ীর ছয়টি বিভাষাসূত্রের যোজনা করা হইয়াছে। এই সব দেখিয়া পণ্ডিত সূর্যকান্ত শাস্ত্রী এমন সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, দেবনন্দী বা শাকটায়ন কেহই ঐ সব পূর্বাচার্যদের কোনও গ্রন্থাদির সহিত পরিচিত ছিলেন না ; কেবল বিকল্পত্ব প্রদর্শনের জন্যই উঁহাদের নাম করিয়াছেন [দ্রঃ সূর্যকান্ত শাস্ত্রি-সম্পাদিত 'অথর্বপ্রাতিশাখ্যে'র (Lahore, 1939) ভূমিকা, পৃঃ ২৯]। 'পূজার্থ' বা শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য পূর্বাচার্যদের নামোল্লেখ ('নামগ্রহণ') একটি প্রাচীন রীতি হইলেও তাহার যদৃচ্ছা ব্যবহার সমর্থন পাইতে পারে না। কাত্যায়ন-পতঞ্জলির মতে পাণিনীয় 'ক্রৌড্যাদি' গণের (৪।১।৮০) প্রাচীন (অর্থাৎ তৎপূর্ববর্তী আচার্যদের ব্যবহৃত) নাম 'রৌঢ্যাদি' গণ। বর্তমান 'ক্রৌড্যাদিগণে' অবশ্য 'রৌঢ়ি' শব্দের নাম-গন্ধও নাই। সম্ভবতঃ পাণিনিই রৌঢ়িকে ক্রৌডিতে পরিণত করিয়াছেন। অভিনবের এই ব্যাকরণে কিন্তু 'রূঢ়াদিভ্যশ্চ' (১।৩।৪) সূত্রে রূঢ়াদিগণের সন্ধান পাওয়া

যায়। এই রূঢ়াদি প্রাচীন রৌঢ়্যাদির২ ভ্রষ্টরূপ হইয়া থাকিলে, রৌঢ়্যাদিগণ প্রাচীন শাকটায়নীয় হওয়া অসম্ভব নয়।

চারি অধ্যায় এবং ১৬ পাদে বিভক্ত এই ব্যাকরণের নাম 'শব্দানুশাসন'। সূত্রসংখ্যা মোট ৩২৩৬। শ্লোকের পরিমাণে অক্ষরগণনায় এই সূত্রগুলির দ্বারা ৭৫০টি অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোক গঠিত হইতে পারে ঃ

> গণনেয়ং সূত্রাণামনুষ্টুভামর্ধসপ্তমশতীহ্।
> ত্রীণি সহস্রাণি শতেদ্বেষট্ত্রিংশচ্চ যোগানাম্।।

আবার 'সংজ্ঞা নিয়ম নিষেধাধিকার-নিত্যাপবাদ বিধিপরিভাষাঃ। অতিদেশবিকল্পাবিতি গতয়ঃ শব্দানুশাসনে সূত্রাণাম্।।'—শ্লোকটিতে সূত্রসমূহের সংজ্ঞা, নিয়ম, নিষেধ, অধিকার, নিত্য, অপবাদ, বিধি, পরিভাষা, অতিদেশ ও বিকল্প এই দশ শ্রেণীবিভাগ কথিত হইয়াছে। সংজ্ঞাকরণে শাকটায়ন সংক্ষেপের পক্ষপাতী। এই ব্যাপারে তিনি পাণিনির, বিশেষতঃ জৈনেন্দ্রের অনুকরণ করিয়াছেন। মাত্র দুই-একটি স্থলে তাঁহার মৌলিকতা দেখা যায়, যেমন—কালবাচক বর্তমান সংজ্ঞার জন্য 'সৎ', ভবিষ্যৎ-এর জন্য 'বর্ৎস্যৎ', বৃদ্ধির স্থলে 'আরৈচ্', উপধার জন্য 'উপান্ত' (চান্দ্রে 'উপান্ত্য') ইত্যাদির ব্যবহারে। কেবল সংজ্ঞাকরণেই নয়, অন্য অনেক বিষয়েও তিনি জৈনেন্দ্রের নিকট ঋণী। জৈনেন্দ্রের অনেক সূত্র তিনি অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রাবলীর সঙ্গেও অভিনবের অনেক সূত্রসাদৃশ্য আছে। স্থলবিশেষে পাণিনির সূত্রকেই কৌশলে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। পাণিনীয় ১৪টি প্রত্যাহার-সূত্রকে ১৩টি করিয়া, তদুপরি আবার কাত্যায়নের মতানুসরণে অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় এবং উপধ্মানীয় বর্ণের প্রবেশ ঘটানো হইয়াছে ঃ শষস অং অঃ ক≍প≍র্'। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের শব্দার্ণব-সংস্করণে ইহার অনুসরণ দেখা যায়। পূর্বব্যাকরণ সমূহের গৃহীত উপাদানে গঠিত হওয়ায় অভিনবে মৌলিকতা বলিতে প্রায় কিছুই নাই। ঋণ স্বীকার না করিয়াই চান্দ্র ব্যাকরণের যাবতীয় নূতনত্ব গ্রহণ করা হইয়াছে, এমনকি জৈনেন্দ্রে চান্দ্রের উপর যে সব সংস্কারের ইঙ্গিত আছে, সেই সকলের সদ্ব্যবহারেও এখানে দ্বিধা করা হয় নাই। স্বর-বৈদিক প্রক্রিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে—যাহা সাম্প্রদায়িক বেদ-বিরোধিতার পরিচায়ক। তথাপি স্থানে স্থানে বৈদিক শব্দেরও বিবেচনা

থাকায়—তাহা প্রাচীন শাকটায়নের দুস্ত্যাজ্য প্রভাব বলিয়া মনে হয়। অর্বাচীন, প্রাচীনের বেদচর্চা পরিহার করিতে সচেষ্ট হইয়াও সর্বথা কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

অভিনবের বিষয়বিন্যাস অষ্টাধ্যায়ীর মতো নয় ; তাহা এইরূপ ঃ ১।১ (অর্থাৎ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদে) সংজ্ঞা, পরিভাষা ও সন্ধি, ১।২—ষত্ব-ণত্ববিধান এবং শব্দরূপ, ১।৩—স্ত্রীপ্রত্যয় ও কারক, ১।৪—পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদবিধান, ২।১—২—সমাস, ২।৩—দ্বিরুক্তপ্লুত-বিধি, ২।৪—৩।৪—তদ্ধিত, ৪।১—তিঙন্ত এবং ৪।২—৪—কৃৎ। একশেষ বাদ দেওয়া হয় নাই।

শাকটায়ন স্বয়ং তাঁহার ব্যাকরণের যে বৃত্তি রচনা করেন তাহার নাম অমোঘাবৃত্তি ঃ 'শব্দানুশাসনস্যেয়মমোঘা বৃত্তিরুচ্যতে।' রাষ্ট্রকূটরাজ ১ম অমোঘবর্ষের রাজ্যকালে (৮১৫-৭৭ খ্রীঃ) তাঁহারই নামাঙ্কিত এই বৃত্তি রচিত হয়। রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা ৩য় গোবিন্দের পুত্র এই অমোঘবর্ষ—স্বীয় উপাধি-নামেই পরিচিত ছিলেন। ৬২ বৎসর ব্যাপী তাঁহার রাজত্বকালের ঠিক্ কোন্ অংশে এই গ্রন্থ রচিত হয় তাহা জানা না গেলেও, মোটামুটি খ্রীঃ ৯ম শতকের মাঝামাঝি নাগাদ ইহার রচনাকাল ধরিয়া লওয়া যায়। একমতে ৭৮৯ শকাব্দে (খ্রীঃ ৮৬৭) ইহা রচিত হয়। গণপাঠ, ধাতুপাঠ, লিঙ্গানুশাসন এবং উণাদ্যংশ প্রণয়ন করিয়া শাকটায়ন এই ব্যাকরণের পঞ্চাঙ্গতা সম্পূর্ণ করেন। এই সবই মোটামুটি ঐ অমোঘাবৃত্তিরই অন্তর্ভুক্ত। ব্যাকরণের ১৬পাদের অনুক্রমে গণপাঠ সজ্জিত। চিরাচরিত 'ধাতুপাঠে'র পরিবর্তে তিনি 'মূলপ্রকৃতি পাঠ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আর এক বৈশিষ্ট্য, তিনি 'ভূ' ধাতু দিয়া ধাতুপাঠ আরম্ভ করেন নাই। অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার ধাতুপাঠ অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিপাঠ প্রায়শঃ জৈনেন্দ্র ধাতুপাঠেরই অনুরূপ। ৪পাদে বিভক্ত উণাদিসূত্রগুলি পাণিনীয় সম্প্রদায়ের উণাদিসূত্রগুলির তুলনায় অনেকাংশে পৃথক্। তাঁহার লিঙ্গানুশাসন ৭০টি আর্যাচ্ছন্দের শ্লোকে নিবদ্ধ। ইহার একটি বৃত্তিও আছে। হৈম লিঙ্গানুশাসন—ইহারই পরিবর্ধিত রূপ। পরিভাষা-সূত্রগুলিরও পৃথক্ সঙ্কলন দেখা যায়। 'উপসর্গার্থ'—ঐ অমোঘাবৃত্তিরই অন্তর্ভুক্ত। ৩।১।১৮৯ সূত্রের বৃত্তিতে শাকটায়ন 'বাক্যপদীয়ে'র উল্লেখ করিয়াছেন। ৪।১।২৫২-৫৩ সূত্রের বৃত্তিতে শ্রুতপালের নাম করা হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং না দেখিয়া থাকিলেও

তাঁহার পক্ষে দেখা অসম্ভব ছিল না—অতীত কালের এমন ঘটনার বর্ণনায় 'লঙ্' ব্যবহারের উদাহরণ দিতে তিনি লিখিয়াছেন—'অদহদমোঘ-বর্ষোঽরাতীন্' এবং 'অরুণদ্দেবঃ পাণ্ড্যম্' (৪।৩।২০৭)। 'দেব' অর্থে 'অমোঘদেব'—অমোঘবর্ষেরই নামান্তর। মান্যখেটে (বর্ত্তমান আন্ধ্রপ্রদেশের পূর্বপ্রান্তে মালখেদ) তাঁহার রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ এইখানে তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া শাকটায়ন স্বীয় ব্যাকরণ রচনা করেন। অমোঘবর্ষ শেষ জীবনে জৈন দিগম্বর শাখার প্রতি অনুরক্ত হইয়া কঠোর আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিন যাপন করিতেন।

(২)

শাকটায়নীয় শব্দানুশাসন এবং ইহার অমোঘাবৃত্তির উপরে অন্যান্য যে সব গ্রন্থ রচিত হয়, সেই সকলের মধ্যে প্রভাচন্দ্রের ন্যাসই সম্ভবতঃ প্রথম রচনা। খ্রীঃ ৯ম শতাব্দীই ইহার রচনাকাল। ইহার নাম 'শাকটায়নন্যাস।' ধাতুবিষয়ক গ্রন্থ 'দৈব'র কৃষ্ণলীলাশুক-রচিত টীকা 'পুরুষকারে' (৭৬) শাকটায়নন্যাসের উল্লেখ আছে। 'মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে' সায়ণাচার্য 'শাকটায়নন্যাস' (১।৭) এবং 'অমোঘন্যাস' (৬। ১০) এই দুই-এরই উল্লেখ করিয়াছেন। সায়ণ ঐ বৃত্তিতে (১।২০) এক 'অমোঘ-বিস্তর'-এরও নাম করিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ অমোঘাবৃত্তির উপর রচিত অন্য গ্রন্থ। এই প্রসঙ্গে 'অমোঘ' এবং 'অমোঘা'—দুই পদেরই ব্যবহার লক্ষণীয়। বৃত্তির বা ব্যাখ্যার বিশেষণরূপেই প্রধানতঃ 'অমোঘা' পদের ব্যবহার দেখা যায়, অন্যত্র 'অমোঘ'। যেমন, সায়ণ লিখিয়াছেন—'তদেতদমোঘায়াং শাকটায়নধাতুবৃত্তৌ' ('মাধবীয় ধাতুবৃত্তি'র শেষে নামধাতুবৃত্তিতে ৭) এবং 'শাকটায়ন-সূত্রব্যাখ্যায়ামমোঘায়াম্' (ঐ ১।৪৪)। শাকটায়নন্যাসের প্রথমে ঃ

> শব্দানাং শাসনাখ্যস্য শাস্ত্রস্যান্বর্থ-নামতঃ।
> প্রসিদ্ধস্য মহামোঘবৃত্তেরপি বিশেষতঃ।।
> সূত্রাণাং চ...।
> গ্রন্থস্যাস্য চ ন্যাসেতি (?) ক্রিয়তে নামনামতঃ।।

জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের 'শব্দাম্ভোজভাস্কর' ন্যাসের রচয়িতা প্রভাচন্দ্র খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীয়। শাকটায়নন্যাসের কর্তা প্রভাচন্দ্র, ৮ম শতাব্দীয় অকলঙ্কদেবের ছাত্র (প্রশিষ্য?) হইয়া থাকিলে, জৈনেন্দ্রন্যাসকার হইতে ভিন্ন ব্যক্তি, সন্দেহ নাই।

ইহার পরে উল্লেখ্য যক্ষবর্মার 'চিন্তামণি' বৃত্তি। ইহার রচনাকাল জানা যায় নাই। রচয়িতা ইহাকে 'সম্পূর্ণ লক্ষণাবৃত্তি' বলিয়াছেন। গণ-ধাতু-লিঙ্গ-উণাদিবাদে এই ব্যাকরণের কেবল সূত্রপাঠের উপরে এই বৃত্তি রচিত ঃ 'গণধাতুপাঠয়োর্গণধাতূন্ লিঙ্গানুশাসনে লিঙ্গগতম্। ঔণাদিকানুণাদৌ শেষং নিঃশেষমত্র বৃত্তৌ বিদ্যাৎ।।' এই গ্রন্থের পরিমাণ ৬০০০ অনুষ্টুপ্ শ্লোকের সমান। শাকটায়নের 'অতি মহতী' অমোঘা বৃত্তিকে সংক্ষেপ করিয়া এই ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছে। ইহার সূচনা-শ্লোকগুলি লক্ষণীয় ঃ

> স্বস্তি শ্রীসকলজ্ঞানসাম্রাজ্যপদমাপ্তবান্। মহাশ্রমণসঙ্ঘাধিপতির্যঃ শাকটায়নঃ ।। একঃ শব্দাম্বুধিং বুদ্ধিমন্দরেণ প্রমথ্য যঃ। সযশঃ শ্রীঃ সমুদ্দধ্রে বিশ্বং ব্যাকরণামৃতম্।। স্বল্পগ্রন্থং সুখোপায়ং সম্পূর্ণং যদুপক্রমম্। শব্দানুশাসনং সার্বমর্হচ্ছাসনবৎ পরম্।। ইষ্টির্নেষ্টা ন বক্তব্যং বক্তব্যং সূত্রতঃ পৃথক্। সংখ্যাতং নোপসংখ্যানং যস্য শব্দানুশাসনে।। তস্যাতি মহতীং বৃত্তিং সংহৃত্যেয়ং লঘীয়সী। সম্পূর্ণলক্ষণা বৃত্তির্বক্ষ্যতে যক্ষবর্মণা।। গ্রন্থবিস্তরভীরূণাং সুকুমার-ধিয়াময়ম্। শুশ্রূষাদি গুণান্ কর্তুং শাস্ত্রে সংগ্রহণোদ্যমঃ।। শব্দানু-শাসনস্যান্বর্থায়াশ্চিন্তামণেরিদম্। বৃত্তের্গ্রন্থপ্রমাণং তু ষট্‌সহস্রং নিরূপিতম্।। ইন্দ্রচন্দ্রাদিভিঃ শাব্দৈর্যদুক্তং শব্দলক্ষণম্। তদিহাস্তি সমস্তং চ যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।। বালাবলাজনোঽপ্যস্যা-বৃত্তেরভ্যাসবৃত্তিতঃ। সমস্তং বাঙ্‌ময়ং বেত্তি বর্ষেণৈকেন নিশ্চয়াৎ।। ৩-১১।

উপরের ৩য় ও ৪র্থ শ্লোকের ইঙ্গিত সবিশেষ অর্থপূর্ণ। দেবনন্দী যে জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ রচনা করেন তাহার সূত্রপাঠ সমগ্রতার দিক্ দিয়া ত্রুটিহীন ছিল না। ফলে ইহার বৃত্তিকার অভয়নন্দীকে তৎপ্রণীত মহাবৃত্তিতে বহু শব্দের বা প্রয়োগের ব্যাকরণসিদ্ধি দেখাইতে মূল ব্যাকরণের অতিরিক্ত বা বহির্ভূত বহু বার্তিক এবং উপসংখ্যানাদির সহায়তা লইতে হয়। জৈনেন্দ্রের এই অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়াই অভিনব শাকটায়ন তাঁহার 'স্বল্পগ্রন্থ সুখোপায় সম্পূর্ণ শব্দানুশাসন' রচনা করেন—যাহাতে সূত্রাতিরিক্ত কিছু বক্তব্য না থাকায় তৎসাধনে ইষ্টি-বার্তিকাদিরও আবশ্যকতা লক্ষিত হয় না। যক্ষবর্মার চিন্তামণিবৃত্তির উপরেও একাধিক টীকাটিপ্পনী রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অজিত

সেনাচার্যের 'চিন্তামণিপ্রকাশিকা', মঙ্গরসকৃত 'চিন্তামণিপ্রতিপদ' এবং জনৈক সমন্তভদ্র-রচিত টিপ্পনীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

পাণিনির অবলম্বনে রচিত লঘুকৌমুদীর মতো, দয়াপাল-প্রণীত 'রূপসিদ্ধি'—এই ব্যাকরণের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীর প্রথম পাদে অভিনব শাকটায়নের মোট ৯৮৪টি সূত্রাবলম্বনে দয়াপাল মুনি এইটি প্রস্তুত করেন। মতিসাগরের ছাত্র 'পার্শ্বনাথচরিত'-প্রণেতা বাদিরাজের সহপাঠী ছিলেন তিনি। খুব সম্ভব ইঁহারা দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসী। রূপসিদ্ধির বিষয়-বিন্যাসক্রম—সংজ্ঞাসিদ্ধি, সন্ধি-সিদ্ধি, নামসিদ্ধি, স্ত্রীপ্রত্যয়সিদ্ধি, সমাসসিদ্ধি, অশ্লুক্‌সিদ্ধি, তদ্ধিতসিদ্ধি, ধাত্বিষ্টকার্য ও কৃৎ।

খ্রীঃ ১৩শ শতকের শেষ দিকে অথবা ১৪শ শতকের প্রারম্ভে অভয়চন্দ্র সূরি 'প্রক্রিয়াসংগ্রহ' নামে শাকটায়নব্যাকরণের আর এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করেন। রূপসিদ্ধি অপেক্ষা ইহা আকারে বৃহত্তর। মূল সূত্রপাঠের ২১০৫টি সূত্র এই গ্রন্থে সংগৃহীত। বিষয়গুলি 'সংগ্রহ' নাম দিয়া বিন্যস্ত করা হইয়াছে—যেমন, সংজ্ঞাসংগ্রহ, সন্ধিসংগ্রহ, সুবন্তসংগ্রহ, স্ত্রীপ্রত্যয়সংগ্রহ, কারকসংগ্রহ, সমাসসংগ্রহ, দ্বিরুক্ত প্লুতবিধি-সংগ্রহ, তদ্ধিতসংগ্রহ, তিঙন্তসংগ্রহ ও কৃৎসংগ্রহ। বৃত্তি অতি সরল, প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গ্রন্থকার ব্যাকরণের আনুষঙ্গিক প্রাচীন শিক্ষাদি গ্রন্থে প্রচারিত বিখ্যাত কারিকাগুলিকে স্থলবিশেষে পরিবর্তিত করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন :

> কণ্ঠৌষ্ঠমূর্ধজিহ্বা দন্তোরস্তালুনাসিকা বর্ণানাম্। স্থানান্যাস্যং স্পৃষ্টেষৎস্পৃষ্টং বিবৃতসংবৃতেষদ্ বিবৃতম্।। হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতহলো হ্যেকদ্বিত্র্যর্ধমাত্রিকাঃ। নাসিকামনুজাতশ্চ বর্ণঃ স্যাদনুনাসিকঃ।। উচ্চৈরুদাত্তো নীচৈঃ স্যাদনুদাত্তঃ স্বরস্তথা। ব্যামিশ্রঃ স্বরিতো জ্ঞেয়ঃ প্রত্যেকং বিবুধৈরিহ।। বর্গেষ্বাদ্যা দ্বিতীয়াশ্চ শষসা অপ্যঘোষকাঃ। দ্বিতীয়তুর্যবর্ণাঃ স্যুঃ মহাপ্রাণা হসংযুতাঃ।। ইত্যাদি।

কোন কোন সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অভয়চন্দ্র জিন বা বর্ধমানের উদ্দেশে উদাহরণাত্মক নমস্কারশ্লোক রচনা করিয়াছেন, যেমন 'গোষ্পদং সেবিতপ্রমাণে' (২।২।২৬) সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে : 'শ্রীমতে বর্ধমানায় নমো নমিতবিদ্বিষে। যদ্‌জ্ঞানান্তর্গতং ভূত্বা ত্রৈলোক্যং গোষ্পদায়তে।।' আবার 'প্রোপোৎসংপাদপূরণে' (২।৩।৬) সূত্রের ব্যাখ্যায়—'প্রপ্রণম্য

জিনংতব্যঃ সংসংশ্রিত্য তপঃ পরম্। উপোপপদ্যতে শ্রেয়ঃ উদুৎপন্নমহোদয়ঃ।।' ভাবসেন ত্রৈবিদ্য শাকটায়ন ব্যাকরণের এক ব্যাখ্যা রচনা করেন। ইহা উক্ত প্রক্রিয়ানুসারিণী টীকা।

পরিশেষে বাদিরাজসূরি-রচিত 'পার্শ্বনাথচরিত' হইতে অভিনব শাকটায়ন পাল্যকীর্তির প্রশস্তিমূলক শ্লোক পাঠ করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করা গেল ঃ

কুতস্ত্যতস্য সা শক্তিঃ পাল্যকীর্তের্মহৌজসঃ।
শ্রীপদশ্রবণং যস্য শাব্দিকান্ কুরুতে জনান্।।

---

১ খ্রীঃ ৯ম/১০ম শতাব্দীয় রাজশেখর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়ে পাল্যকীর্তির নামে উদ্ধৃতি দিয়াছেন ঃ 'যথা তথা বাংস্তু বস্তুনোরূপং বক্তৃপ্রকৃতিবিশেষায়ত্তা তু রসবত্তা।তথা চ যমর্থং রক্তঃ স্তৌতি তং বিরক্তো বিনিন্দতি। মধ্যস্থস্তু তত্রোদাস্তে— ইতি পাল্যকীর্তিঃ।' অর্থাৎ পাল্যকীর্তির মতে বস্তুর রূপ যেমনই হউক না কেন, সেই বিষয়ের রসবোধ বক্তার প্রকৃতি বিশেষের উপর নির্ভর করে। তাই যাহা অনুরাগীর প্রশংসা লাভ করে, তাহা বিরাগীর নিন্দাভাজন হয় এবং মধ্যস্থ নিরপেক্ষ ব্যক্তি সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। অমরকোষের (৩।২।৪২) 'টীকাসর্বস্বে' সর্বানন্দ পাল্যকীর্তির বিবরণ (?) হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন ঃ 'তথা হি তত্র পাল্যকীর্তের্বিবরণং পোটগলো বৃহৎপাশঃ।'

২ সংস্কৃতে অকারাদি হকারান্ত বর্ণমালায় 'ড়' এবং 'ঢ়' বর্ণের পৃথক্ সংস্থান নাই, সেখানে কেবল ড এবং ঢ।

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ-ব্যাকরণ

(খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী)

মহামতি রাজা ভোজদেব 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' নামক ব্যাকরণ রচনা করেন। ইনি মালবের পরমারবংশীয় ৯ম নরপতি। নবসাহসাঙ্ক সিন্ধুরাজের* পুত্র এই ভোজদেব। রত্নাবতীর রাজা বজ্রাঙ্কুশের কন্যা শশিপ্রভা ছিলেন তাঁহার গর্ভধারিণী। খ্রীঃ ১০১০-১০৬৫ অব্দ পর্যন্ত ভোজদেবের রাজ্যকাল পরিব্যাপ্ত। এই বিষয়ে মতভেদ আছে। ঐতিহাসিক স্মিথ সাহেবের মতে তিনি ১০১৮-১০৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন (V. A. Smith—Early History of India, 3rd edition, p. 395)। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন 'কাব্যপ্রকাশে'র টীকার ভূমিকায় (পৃঃ ১৩) প্রসঙ্গতঃ বল্লালকবি-রচিত 'ভোজপ্রবন্ধে'র এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন ঃ

পঞ্চাশৎপঞ্চবর্ষাণি সপ্তমাসা দিনত্রয়ম্।
ভোজরাজেন ভোক্তব্যং সগৌড়ং দক্ষিণাপথম্।।৬।।

অর্থাৎ ভোজরাজ ৫৫বৎসর ৭মাস ৩দিন গৌড়সহ দক্ষিণাপথের রাজ্য ভোগ করিবেন। ন্যায়রত্নের মতে ৯৩২-৮৭ শকাব্দ (১০১০-১০৬৫ খ্রীঃ) পর্যন্ত ভোজের রাজ্যকাল। ইনিই উজ্জয়িনী হইতে ধারানগরীতে স্থায়ীভাবে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাই 'ধারেশ্বর' বলিলে ভোজদেবকেই বুঝায়। 'ভোজরাজ' বলিয়াও তিনি পরিচিত। তাঁহার রাজ্যের পশ্চিমে ছিল চৌলুক্যদের রাজ্য গুজরাট। অনহিলবাড় ইহার রাজধানী। এই রাজ্যের সোলঙ্কিরাজ ভীম (?) ছিলেন তাঁহার সমকালীন।

পরম বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ভোজদেব। তিনি নিজেও ছিলেন মহাপণ্ডিত। তাঁহার সমসাময়িক রাজাদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সর্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত আর কেহ ছিলেন না। জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, কোষ, ধর্ম, শিল্প, দর্শন, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে রচিত বহু গ্রন্থ তাঁহার নামে প্রচলিত দেখা যায়। পাতঞ্জল দর্শনের তৎকৃত 'রাজমার্তণ্ড' বৃত্তিতে বলা হইয়াছে ঃ

শব্দানুশাসনং বিদধতা পাতঞ্জলে কুর্বতা বৃত্তিং রাজমৃগাঙ্ক-সংজ্ঞকমপি ব্যাতন্বতা বৈদ্যকে। বাক্‌চেতোবপুষাং মলঃ ফণভৃতাং ভর্ত্রেব যেনোদ্ধৃতস্তস্য শ্রীরণরঙ্গমল্লনৃপতের্বাচো জয়ন্ত্যুজ্জ্বলাঃ।।

অর্থাৎ শেষনাগের অবতার পতঞ্জলি যেমন শব্দশাস্ত্রে পাণিনি-ব্যাকরণের মহাভাষ্য, দর্শনে যোগসূত্র এবং বৈদ্যকে চরক সংহিতার (প্রতিসংস্কারমূলক) ব্যাখ্যাদি রচনাদ্বারা যথাক্রমে বাক্, চিত্ত এবং দেহের মল বা গ্লানি অপনোদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ যৎকর্তৃক শব্দানুশাসন, পাতঞ্জল দর্শনের বৃত্তি এবং বৈদ্যশাস্ত্রে রাজমৃগাঙ্ক নামক গ্রন্থরচনার দ্বারা মানুষের বাক্য, মন ও শরীরের মল নিরাকৃত হইয়াছিল, সেই শ্রীরণরঙ্গমল্লনৃপতির উজ্জ্বলা বাণী জয়যুক্তা হয়। বলা বাহুল্য, শ্রীরণরঙ্গমল্লনৃপতি স্বয়ং ভোজদেব। তাঁহার অলঙ্কার-গ্রন্থের নামও সরস্বতীকণ্ঠাভরণ। ইহার টীকা-প্রণেতা আজড়ের মতে ভোজরাজ বিভিন্ন বিষয়ে ৮৪খানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং এইগুলির সবই তাঁহার উপাধি-নামে নামাঙ্কিত হয়। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, শৃঙ্গারপ্রকাশ, রাজমার্তণ্ড, রাজমৃগাঙ্ক, সমরাঙ্গণ-সূত্রধার, বিদ্যাবিনোদ, বিদ্বজ্জন বিনোদ, বিশ্রান্তবিদ্যাবিনোদ, আদিত্যপ্রতাপসিদ্ধান্ত প্রভৃতি তাঁহার যেমন উপাধি তেমন গ্রন্থনামও। ৮৪খানা গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাকে 'চতুরশীতিবিরুদ প্রকাশিত স্বকৃত গ্রন্থসমাজঃ' আখ্যায় ভূষিত করা হয়। প্রভাচন্দ্রাচার্য-প্রণীত 'প্রভাবকচরিতে'র অন্তর্গত 'হেমচন্দ্র সূরি প্রবন্ধে' বর্ণিত আছে যে, মালব-বিজয়ের পর অবন্তির গ্রন্থাগার হইতে আনীত গ্রন্থরাশির মধ্যে একটি ব্যাকরণগ্রন্থ দেখিতে পাইয়া গুজরাটের রাজা জয়সিংহ (১০৯৪-১১৪৩) উহা কি জানিতে চাহিলে, উহা ভোজরাজ-রচিত ব্যাকরণ বলিয়া তাঁহাকে জানানো হয় এবং তদানুষঙ্গিক ভোজ-প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের কথাও বলা হয় ঃ

অন্যদাবন্তিকোশীয়পুস্তকেষু নিযুক্তকৈঃ। দর্শ্যমানেষু ভূপেন প্রৈক্ষি লক্ষণপুস্তকম্।। কিমেতদিতি পপ্রচ্ছ স্বাম্যপীতি ব্যজিজ্ঞপৎ। ভোজব্যাকরণং হ্যেতচ্ছব্দশাস্ত্রং প্রবর্ততে।। অসৌ হি মালবাধীশো বিদ্বচ্চক্রচূড়ামণিঃ। শব্দালঙ্কারদৈবজ্ঞতর্কশাস্ত্রাণি নির্মমে।। চিকিৎসারাজসিদ্ধান্তরুবাস্তুদয়ানি চ। অঙ্কশাকুনকাধ্যাত্মস্বপ্ন-সামুদ্রিকান্যপি।। গ্রন্থান্নিমিত্তব্যাখ্যান প্রশ্নচূড়ামণীনিহ। (৭৪-৮)।

তিনি নিঘণ্টুবিষয়ে ‘সংযমি-নামমালা’ এবং অমরকোষের এক টীকাও রচনা করেন বলিয়া শুনা যায়।

তাঁহার সভাতে মহাভাষ্যের ‘প্রদীপ’টীকা-প্রণেতা কৈয়ট, ‘ভট্টভাস্করীয়’ ও ‘সুশ্রুতপঞ্জিকা’ প্রভৃতির রচয়িতা ভাস্কর ভট্ট এবং মিতাক্ষরাস্মৃতির ব্যবস্থাপক বিজ্ঞানেশ্বরের মতো বিখ্যাত পণ্ডিতগণ অবস্থান করিতেন।

ইহা ছাড়া তাঁহার অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ হইতেও বুঝা যায় যে তিনি (ভোজরাজ) ছিলেন সরস্বতীর একনিষ্ঠ সাধক। ধারানগরীতে সরস্বতীমন্দির নামে তিনি এক বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। ইহাকে ‘সারদাসদন’ বা ‘সারদামন্দির’ বলা হইত। ইহার মধ্যে প্রস্তর নির্মিত এক সরস্বতীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১০৯১ সম্বতে (১০৩৫ খ্রীঃ) ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। এই মূর্তি বর্ত্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়মে ভগ্নাবস্থায় রক্ষিত আছে। ভোজদেব স্বীয় ‘কূর্মশতক’ নামক দুই কাব্য এবং ভর্তৃহরি-কারিকা পাষাণে খোদাই করিয়া মন্দিরমধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ কাব্যের প্রত্যেকটিতে ১০৯টি করিয়া প্রাকৃত গাথা পাওয়া যায়। ইহার একাংশে কূর্মাবতারের প্রশংসা এবং অপরাংশে ভোজ-রাজের প্রশস্তি বর্ণিত। মন্দিরের পার্শ্বস্থ একটি কূপ ‘সরস্বতী-কূপ’ আখ্যা লাভ করিয়াছিল। ইহা পরে ‘অক্কল-কুই’ নামে প্রসিদ্ধ হয়। সকলের ধারণা এই কূপের জল পান করিলে সরস্বতীর কৃপালাভ ঘটে।

ভোজ-প্রতিষ্ঠিত সেই সারস্বত মন্দির এখন আর নাই। মাণ্ডুর সুলতান মহ্‌মুদ সা খিলজি মালব অধিকার করিয়া ঐ মন্দির ধ্বংস করেন এবং সেই ধ্বংসাবশেষ দ্বারা ঐ স্থানে ৮৬১ হিজরিসনে (খ্রীঃ ১৪৫৭) এক মস্‌জিদ নির্মাণ করান। প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসরণে এই মস্‌জিদকে লোকে এখনও ‘ভোজরাজকি নিসল’ (অর্থাৎ রাজা ভোজের কলেজ) বলিয়া থাকে। ইহার অভ্যন্তরে মৌলানা কামালুদ্দিনের কবর-স্থলের নিকটে দুইটি প্রস্তর স্তম্ভের গাত্রে দুইটি সর্প-লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের একটিতে একটি সর্পাকৃতি চিত্র আঁকিয়া তাহার মধ্যে সংস্কৃত বর্ণমালা, এবং অপরটিতে দুইটি সাপের ছবি একত্রে আঁকিয়া উহাদের লেজের দিকের রেখা দুইটিকে আড়াআড়ি বাড়াইয়া এক রেখা-চিত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের ধাতুপ্রত্যয়মালা দেবনাগরী অক্ষরে খোদাই

করা হইয়াছিল। এই লেখ-মালার উপরিভাগে এই সংস্কৃত শ্লোক দুইটিও বর্তমান ঃ

একেয়মুদয়াদিত্য-নরবর্মমহীভুজোঃ।
মহেশস্বামিনো বর্ণস্থিত্যৈ সিদ্ধাসি পুত্রিকা।।
উদয়াদিত্য দেবস্য বর্ণনাগকৃপাণিকা।
কবীনাং চ নৃপাণাং চ বেষো বক্ষসি রোপিতঃ।।

শ্লোকোক্ত উদয়াদিত্য এবং নরবর্মা ভোজরাজের প্রায় অব্যবহিত পরবর্তী উত্তরাধিকারী। পূর্বোক্ত সর্পবন্ধ-লেখ দুইটিকে শ্লোকে 'বর্ণনাগ-কৃপাণিকা' বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা প্রমাণিত যে ভোজের বিদ্যানুরাগ তাঁহার উত্তরপুরুষকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার— এই দুই শাস্ত্রের গ্রন্থেরই এক 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' নাম রাখার মূলে একটি গূঢ় অভিপ্রায় বর্তমান। শব্দ ও অর্থ এই উভয়ের আকৃতিস্বরূপা সরস্বতীর শব্দে ও অর্থে সমান নিবদ্ধমান কোনও আভরণই কেবল উপযুক্ত হইতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষায় সরস্বতীকণ্ঠাভরণ নামে শব্দের দিক্ হইতে এই ব্যাকরণ এবং অর্থের দিক্ হইতে অলঙ্কারনিবন্ধ, এক যোগে সরস্বতীর একটি পূর্ণ আভরণের দ্যোতক। ইহাছাড়া, ভোজদেবের পরিষদ্‌ভবন, কয়েকজন বিশিষ্ট পারিষদ এবং এক গোচারকও এই 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' নামে অভিহিত হইত বলিয়া শুনা যায়। এমন রাজার মৃত্যুতে যে সরস্বতী 'নিরালম্বা' হইবেন তাহাতে বিচিত্র কি![১]

(২)

মূলতঃ পাণিনীয় ব্যাকরণের অবলম্বনে রচিত হইলেও এই ব্যাকরণের এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, যাহা এই ধরনের অন্য কোন ব্যাকরণেই নাই। ইহার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের যাবতীয় বিষয় (ধাতুপাঠভিন্ন) একাধারে ইহার সূত্রপাঠের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ; ফলে ইহার সূত্রসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার (৬৪২৮)। এত অধিক সূত্র আর কোনও ব্যাকরণে দেখা যায় না। খিলপাঠ অর্থাৎ পরিশিষ্টাদিসহ সমগ্র পাণিনি ব্যাকরণের সহিত কাত্যায়নের বার্ত্তিকপাঠ মিলাইয়া ভোজদেব এই ব্যাকরণের সূত্রাবলী রচনা করিয়াছেন। কেবল তাহাই নয়, এই ব্যাপারে তিনি ব্যাড়ি, পতঞ্জলি, কাশিকাবৃত্তিকার বামন-জয়াদিত্য এবং এই

সম্প্রদায়ের অন্য প্রামাণিক আচার্যদের দ্বারা দৃষ্ট বা উপদিষ্ট সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনাদি এই ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এমনকি অন্যান্য ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট বা প্রদর্শিত নূতনত্বও তিনি বাদ দেন নাই। তাই অনেক চান্দ্র সূত্রও গৃহীত হইয়াছে। সূত্ররচনায় এবং প্রকরণ-বিভাগে চান্দ্র ব্যাকরণের প্রভাব সুস্পষ্ট। পাণিনির প্রত্যাহার-সূত্রগুলি গ্রহণ করা হইলেও 'হযবরট্' ও 'লণ্' এই দুই প্রত্যাহার-সূত্র মিলিত করিয়া 'হযবরলণ্' করা হইয়াছে। অন্যান্য ব্যাকরণের মতো বৈদিকাংশ ও স্বরপ্রক্রিয়া বাদ না দিয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে—যাহা এই ব্যাকরণের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাণিনি-পরবর্তী আর কোন ব্যাকরণেই এমনটি করা হয় নাই—অর্থাৎ সর্বত্রই স্বর-বৈদিকাংশ বর্জন করা হইয়াছে বা কোন কোন ক্ষেত্রে পরে বর্জিত হইয়াছে। কাতন্ত্রে এই অংশ অতি আধুনিক কালের সংযোজন। বর্তমানে প্রচলিত ব্যাকরণগুলির মধ্যে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, কাতন্ত্র এবং এই সরস্বতীকণ্ঠাভরণ—এই তিন ব্যাকরণেই—কেবল বৈদিক ব্যাকরণও আচরিত।

সমগ্র সরস্বতীকণ্ঠাভরণে মোট ৮টি অধ্যায়। এই দিক্ দিয়া ইহাও অষ্টাধ্যায়ী। প্রতি অধ্যায়ে ৪পাদ। বিষয়-বিন্যাস এইরূপ : ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদে সংজ্ঞা, ২য় পাদে পরিভাষা, ৩য় ও ৪র্থ পাদে এবং ২য় অধ্যায়ে উণাদিসহ কৃৎপ্রত্যয়, ৩য় অধ্যায়ের ১ম পাদে বিভক্তিপ্রত্যয়, ২য় ও ৩য় পাদে সমাস, ৪র্থ পাদে স্ত্রীপ্রত্যয়, ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে তদ্ধিত প্রত্যয়, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে পদকার্য (সন্ধি, অলুক্সমাস, সমাসাশ্রয় বিধিসহ) এবং ৮ম অধ্যায়ে বৈদিক প্রক্রিয়া ও ফিট্সূত্র (স্বরপ্রক্রিয়া) বর্ণিত। ২য় অধ্যায়ের প্রথম তিন পাদ ব্যাপী উণাদি সূত্রসমূহ এবং ৮ম অধ্যায়ের ৩য় পাদের ১১০-৯৬ সংখ্যক সূত্র পর্যন্ত শন্তনু আচার্যের ৮৭টি ফিট্সূত্র বিস্তৃত। উণাদিসূত্র সংখ্যা মোট ৭৯৫। গণপাঠও সূত্রাংশে স্থান পাইয়াছে। কেবল ধাতুপাঠ ভিন্ন আর কিছুই এই ব্যাকরণে অন্য গ্রন্থ হইতে পড়িতে হয় না। অন্যান্য ব্যাকরণের মতো সূত্রপাঠ মুখ্য এবং খিল-পাঠ গৌণ হইয়া উঠিবার কোন সম্ভাবনাই এই ব্যাকরণে নাই।

সূত্রসর্বস্ব সরস্বতীকণ্ঠাভরণ আকারে বিশাল হইলেও রচনা-গুণে যথেষ্ট সরল ও প্রাঞ্জল। স্থানে স্থানে সুবিধামত প্রচুর পাণিনি-সূত্র

অবিকল গ্রহণ করা হইয়াছে ; আবার স্থল-বিশেষে কোনও কোনটার রূপান্তরও ঘটানো হইয়াছে কম-বেশী। বহু স্থলে গণপাঠ, বার্ত্তিকপাঠ ইত্যাদির সমন্বয়ে নূতন সূত্রসমূহ ভোজদেব গঠন করিয়াছেন ; যেমন পাণিনির 'প্রাদয়ঃ' (১।৪।৫৮) সূত্রের স্থলে ভোজদেব সূত্র করিয়াছেন 'প্রপরাপসমন্ববনির্দুর্ব্যাঙ্‌ন্যধিপ্রতিপর্যুপাত্যপিসূদভয়ঃ' (১।১।১২৭)। এখানে পাণিনীয় গণপাঠের সাহায্য নেওয়া হইয়াছে। এইরূপ আর একটি সূত্রঃ 'সর্ববিশ্বাবুভোভয়ৌডতরডতমাবিতরান্যতরা বন্যত্বৌ সমাসিমৌনেমশ্চ সর্বনামানি' (১।১।১১২)। কতকগুলি বিখ্যাত পরিভাষা এবং ন্যায়কেও মূল সূত্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, যেমন 'যেন নাপ্রাপ্তে যো বিধিরারভ্যতে স তস্য বাধকঃ' (১।২।১০৭) এবং 'উপসর্গাপবাদয়োরপবাদো বিধির্বলীয়ান্' (১।২।১০১); 'বলবন্নিত্যমনিত্যাৎ' (১। ২।১০৮), 'অন্তরঙ্গং বহিরঙ্গাৎ' (১।২।১০৯), 'অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে' (১।২।৮৪) প্রভৃতি সূত্রও ন্যায়-পরিভাষামূলক। 'ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্ন হি সন্দেহাদলক্ষণম্'—এই পরিভাষাটিকে সংক্ষেপ করিয়া 'ব্যাখ্যানতো বিশেষ প্রতিপত্তিঃ' (১।২।১৩২) সূত্রে পরিণত করা হইয়াছে। 'গৌণমুখ্যয়োর্মুখ্যে কার্যসংপ্রত্যয়ঃ' পরিভাষাটিও এই ব্যাকরণের একটি সূত্র (১।২।৮৬)।

মোট কথা, পাণিনি জ্ঞাপকাদির দ্বারা (by suggestiveness)যাহা যাহা ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, ভোজদেব সেই সবের জন্য সরাসরি নূতন সূত্রই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে বিষয়টি সরলীকৃত হইয়াছে। ইঙ্গিতময়তার কৌশল যতদূর সম্ভব পরিহার করিবার চেষ্টা এই ব্যাকরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাণিনির অনুবৃত্তি অনুসৃত হইলেও খুব বেশী জটিলতা দেখা দেয় নাই। এইসব হইতে প্রতীয়মান হয়, দুরধিগম্য পাণিনীয় ব্যাকরণের জটিলতা-জনিত ক্লেশ হইতে ছাত্রদিগকে মুক্ত করাই ভোজদেবের এই ব্যাকরণ রচনার সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। ইহার 'হৃদয়হারিণী' বৃত্তির ৪র্থ ভাগের ভূমিকায় কে. এস্. মহাদেব শাস্ত্রী এই উদ্দেশ্যটি সংস্কৃত ভাষায় অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

এবমপি লোকবেদোভয়ানুগ্রাহকত্বাদার্ষত্বাদ্, বহুভিরাদৃতত্বাদ্, ব্যাখ্যাশতৈরুপবৃংহিতত্বাচ্চ সর্বতোমুখীং প্রতিষ্ঠামাস্থায় প্রাবর্তমানেঽস্মিন্ পাণিনীয়ে তন্ত্রে বার্ত্তিকগণপাঠাদি-সাপেক্ষতয়াঽধ্যেতৃণামতীব ক্লেশজালং পশ্যন্নাচার্যদেশীয়ো ভোজদেবো বহুগ্রন্থালোড়ন-

মন্তরা একেনৈব গ্রন্থেনাধীতেন কৃৎস্নস্যাপি ব্যাকরণশাস্ত্রস্য লঘুনোপায়েন প্রতিপত্তাবভ্যুপায়ং চিন্তয়ন্ প্রায়েণ পাণিনিমেবানুরুন্ধানঃ তত্র তত্র চান্দ্রকাতন্ত্রাদিগতানপ্যর্থান্ যাবদপেক্ষং সঞ্চিত্য বার্ত্তিকগণোণাদিপরিভাষাপাঠফিট্‌সূত্রাদিকং নিখিলমপি সংগৃহ্য পাণিন্যননুশিষ্টানাং তত্তৎ সময়সমুচ্চিতানাং মহাকবিভিরন্যৈশ্চ সাধুতয়া প্রযুজ্যমানানাং শব্দানামপ্যনুশাসনং বিদধৎ সরস্বতীকণ্ঠাভরণাখ্যং গ্রন্থরত্নং নির্মমে।

এই সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

অস্মিংশ্চ সরস্বতীকণ্ঠাভরণেঽধ্যেতৃজন-সৌকর্যায় মহান্ যত্নঃ কৃতো দৃশ্যতে ভোজদেবেন। ইহ হি পাণিনীয়ং তন্ত্রমধিজিগাং-সমানানাং মহান্ ক্লেশঃ সম্পদ্যতে। তথা হি—ক্বচিদ্ জ্ঞাপকেন, ক্বচিদ্ যোগবিভাগেন, কুত্রচিদ্ ব্যাখ্যানেন, ক্বচন পদানামনুকর্ষেণ, ক্বচিচ্চ মণ্ডূকপ্লুত্যা, ক্বচিচ্চ পরিগণনেন, একত্র ভাষ্যার্থ-পরিশীলনেন, ইতরত্র বার্ত্তিকপরিচিন্তনেন, অপরত্র চ গণপাঠাদি-শীলনেন তে তেঽর্থাঃ সাধনীয়া দৃশ্যন্তে। তানেতান্ ক্লেশান্ পরিজিহীর্ষুর্ভোজদেবো গণপঠিতান্ শব্দান্, পরিভাষাঃ, জ্ঞাপকভাষ্যেষ্টিবার্ত্তিকব্যাখ্যাগম্যানর্থাংশ্চ সূত্ররূপেণ গ্রন্থশরীর এব সমযোজয়ৎ। ক্বচিৎ তত্র তত্র বিপ্রকীর্ণানাং সূত্রাণামেকত্রৈব সমাবেশেন, ক্বচিচ্চ প্রকরণাদিবিনিময়েন, সূত্রাণাং প্রদেশবিনিময়েন, পৌর্বাপর্যবিপরিণামাদিনা চ মহতী সৌকর্যসম্পত্তিঃ সম্পাদিতা।

বার্ত্তিককার কাত্যায়ন এবং ভাষ্যকার পতঞ্জলি কর্তৃক অশুদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত অথচ কবিগণ-কর্তৃক ব্যবহৃত কতকগুলি প্রয়োগকে ভোজদেব কাতন্ত্রের মতানুসরণে সিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 'ঢে অগ্নায়ী' (৬।২।৪৪), 'জপিবভ্যাশ্বসিবিশ্বসিভ্যঃ' (৬।৪।১৫৯), 'বিশ্রমের্বা' (৭।১।৫৬) এবং 'ভক্তৌ চ কর্মসাধনায়াম্' (৬।২।৪৬) সূত্রদ্বারা তিনি আগ্নেয়, বভিত, বিশ্বসিত, জপিত, আশ্বসিত, বিশ্রাম, দৃঢ়ভক্তি ও দৃষ্টভক্তি প্রয়োগের সাধুত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আবার 'পূর্বতরপরতরাভ্যামেদ্যবিঃ পরশ্চ' (৫।৩।৩০), 'আরিঃ সংবৎসরে' (৫।৩।৩১), 'পূর্বাদুচ্চ' (৫।৩।৩২) এবং 'পরাৎ' (৫।৩।৩৩) সূত্র রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে 'পূর্বতরে পরতরে বাহনি' বুঝাইতেও 'পরেদ্যবি', 'পূর্বতরে পরতরে বা সংবৎসরে' বুঝাইতে 'পরারি' এবং

'পূর্বস্মিন্ পরস্মিন্ বা সংবৎসরে' বুঝাইতে 'পরুৎ' শব্দের ব্যবহারও সিদ্ধ। এইসব স্থলে ভাষ্যকার (৫।৩।২২) কেবল একটি মাত্র অর্থে উহাদের প্রয়োগ নির্দিষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার মতে কেবল 'পরস্মিন্ অহনি' বুঝাইতে 'পরেদ্যবি' (আগামী দিবসে), 'পূর্বতরে সংবৎসরে' বুঝাইতে 'পরারি' এবং 'পূর্বস্মিন্ সংবৎসরে' বুঝাইতে 'পরুৎ' শব্দের ব্যবহার স্বীকার্য। অপর পক্ষে ভোজদেব পূর্বোক্ত দুই দুই অর্থেই উহাদের ব্যবহার স্বীকার করিতে বলিয়াছেন। কেরলের কবি-বৈয়াকরণ নারায়ণ ভট্ট যথার্থই বলিয়াছেন২ ঃ

দৃষ্ট্বা শাস্ত্রগণান্ প্রয়োগসহিতান্ প্রায়েণ দাক্ষীসুতঃ
প্রোচে তস্য তু বিচ্যুতানি কতিচিৎ কাত্যায়নঃ প্রোক্তবান্।
তদ্‌ভ্রষ্টান্যবদৎ পতঞ্জলিমুনিস্তেনাপ্যনুক্তং ক্বচি-
ল্লোকাৎ প্রাক্তনশাস্ত্রতোঽপি জগদুর্বিজ্ঞায় ভোজাদয়ঃ।।

——অপাণিনীয় প্রমাণতা, পৃঃ ১৩

সূত্রগত 'সিদ্ধি' শব্দের দ্বারা এই ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়া আবার ঐ 'সিদ্ধি' শব্দের দ্বারাই গ্রন্থের সমাপ্তি টানা হইয়াছে। আদ্যন্তে মঙ্গলবাচক সিদ্ধি শব্দের ব্যবহারে ঐন্দ্র ব্যাকরণ-ধারার প্রভাব সূচিত।

(৩)

ভোজদেব সম্ভবতঃ কেবল সূত্র সমূহেরই গ্রন্থনা করিয়াছিলেন, ইহাদের কোন বৃত্তি বা ব্যাখ্যা রচনা করেন নাই বা করিয়া থাকিলেও এযাবৎ তাহা পাওয়া যায় নাই। সূত্রগুলি অবশ্য অনেক স্থলেই এত সরল যে, ব্যাখ্যা ভিন্নই ইহাদের অর্থ বোধগম্য হয়। ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদ হইতে এইরূপ কয়েকটি সূত্র নিম্নে লিখিত হইল ঃ

'সিদ্ধিঃ ক্রিয়াদের্লোকাৎ' (১।১।১), 'ভূবাদি ক্রিয়াবচনো ধাতুঃ' (১।১।২), 'বিভক্ত্যন্তং পদম্' (১।১।২৫), 'আখ্যাতং সাব্যয়কার-কবিশেষণং বাক্যম্' (১।১।৩১), 'ক্রিয়ানিমিত্তং কারকম্' (১।১।৩২)। দণ্ডনাথ-রচিত 'হৃদয়হারিণী' বৃত্তির পুষ্পিকার ভাষা হইতে অনুমিত হয়, ভোজদেব-রচিত (?) অধুনা-লুপ্ত কোনও বৃহদ্‌বৃত্তির অবলম্বনে ইহা (অর্থাৎ দণ্ডনাথের বৃত্তি) রচিত। পুষ্পিকায় বলা হইয়াছে ঃ 'ইতি শ্রীদণ্ডনাথ নারায়ণ ভট্ট সমুদ্ধৃতায়াং সরস্বতীকণ্ঠাভরণস্য লঘুবৃত্তৌ হৃদয়হারিণ্যাং...।' অর্থাৎ সরস্বতীকণ্ঠাভরণের শ্রীদণ্ডনাথ নারায়ণ ভট্ট-

সমুদ্ধৃত লঘুবৃত্তি হৃদয়হারিণীতে...। এখানে 'সমুদ্ধৃত' এবং 'লঘুবৃত্তি' শব্দ কয়টি পূর্বোক্ত অনুমানের উৎস। অর্থাৎ কিনা, পূর্বের কোনও বৃহৎ বৃত্তি হইতে সমুদ্ধৃত উপাদানে দণ্ডনাথের লঘুবৃত্তির রচনা। ঐ বৃহৎ বৃত্তি অবশ্য ভোজদেব ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিরও রচনা হইতে পারে। যুধিষ্ঠির মীমাংসক মহাশয় 'গণরত্ন মহোদধি'তে এবং 'অমরকোশোদ্‌ঘাটনে' (১।২।২৪) উদ্ধৃত ভোজদেবের উক্তি হৃদয়-হারিণীতে দেখিতে পাইয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, ভোজদেব স্বীয় ব্যাকরণের বৃত্তিও রচনা করিয়াছিলেন (দ্রঃ 'সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রকা ইতিহাস,' ১ম ভাগ, ২য় মুদ্রণ, পৃঃ ৫৫৭–৫৮)।

'হৃদয়হারিণী'বৃত্তি সত্যই হৃদয়হারিণী। সমগ্র সরস্বতীকণ্ঠাভরণের উপরে ইহা রচিত। ভাষা সরল, উদাহরণাদি সমুচিত এবং বর্ণনা বাহুল্যবর্জিত। ইহার রচনায় প্রধানতঃ 'কাশিকাবৃত্তি' এবং কৈয়টের 'মহাভাষ্যপ্রদীপে'র উপর নির্ভর করা হইয়াছে। বৃত্তিকার দণ্ডনাথ নারায়ণ ভট্ট সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় নাই। ইনি মহারাজ ভোজদেবেরই দেওয়া 'দণ্ডনাথ' উপাধি-ধারী অথবা উক্তপদাধিকারী পরবর্তী সময়ের কোন কর্মচারী ছিলেন—এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর দেবরাজ যজ্বার 'নিঘণ্টুটীকা'তে এবং ঐ শতকে রচিত 'মাধবীয় ধাতুবৃত্তি'তেও (১।২৭৭) দণ্ডনাথের উল্লেখ আছে। 'প্রক্রিয়া কৌমুদী'র (৭।৩।৩৮) 'প্রসাদ' টীকায় বিট্‌ঠলাচার্য 'পদসিন্ধুসেতু' নামে সরস্বতীকণ্ঠাভরণের এক প্রক্রিয়া গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] দেব-রচিত 'দৈব' নামক ধাতুবিষয়ক ব্যাকরণ-গ্রন্থের 'পুরুষকার' টীকার প্রণেতা ১২শ।১৩শ খ্রীঃ শতাব্দীর, কৃষ্ণলীলাশুকমুনি সরস্বতীকণ্ঠাভরণেরও 'পুরুষকার' নামে এক টীকা রচনা করেন।[৪] তিনি কাঞ্চীপুর (Conjivaram) -বাসী ছিলেন বলিয়া অনুমিত। রামসিংহদেবের 'রত্নদর্পণ' সরস্বতীকণ্ঠাভরণের আর এক টীকা।

দাক্ষিণাত্যের মালাবার উপকূলে, বিশেষতঃ কেরলে একদা এই ব্যাকরণের পঠন-পাঠন সমধিক প্রচলিত ছিল।

'কবিষু বাদিষু বাগ্মিষু ভোগিষু
দ্রবিণবৎসু সতামুপকারিষু।
ধনিষু ধন্বিষু ধর্মধনেষ্বপি
ক্ষিতিতলে ন হি ভোজসমো নৃপঃ।।'

* বল্লালকবি-রচিত ভোজপ্রবন্ধ-মতে ভোজরাজের পিতা সিন্ধুল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদ্ভ্রাতা মুঞ্জ রাজা হন এবং তৎপরে ভোজের রাজত্ব। ঐতিহাসিকদের মতে (দ্রঃ 'An Advanced History of India, 1965, p. 185) রাজা মুঞ্জ (৯৭৪-৯৯৪খ্রীঃ) কল্যাণের চালুক্যরাজ ২য় তৈলপ (বা তৈল) কর্তৃক বিধ্বস্ত হইলে তাঁহার ভ্রাতা সিন্ধুরাজ নবসাহসাঙ্ক উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজা হন—যাঁহার পত্র ভোজ।

১ 'অদ্য ধারা নিরাধারা নিরালম্বা সরস্বতী। পণ্ডিতাঃ খণ্ডিতাঃ সর্বে ভোজরাজে দিবংগতে।।'— ভোজপ্রবন্ধ ৩২৬

২ নারায়ণ ভট্ট তাঁহার 'প্রক্রিয়া সর্বস্ব' ব্যাকরণের উণাদিবৃত্তিতে (১।৪০) লিখিয়াছেন : 'অকারং মুকুরস্যাদৌ উকারং দর্দুরস্য চ। বভাণ পাণিনিস্তৌ তু ব্যত্যয়েনাহ ভোজরাট্।।' অর্থাৎ পাণিনির মতে মকুরঃ, দুর্দুরঃ; কিন্তু ভোজ ব্যাকরণের (২।৩। ৫২) মতে মুকুরঃ, দর্দুরঃ।

৩ 'তথা চ সরস্বতীকণ্ঠাভরণপ্রক্রিয়ায়াং পদসিন্ধুসেতাবিত্যুক্তং "ধারয়তীত্যেকে প্রায়য়তীত্যেকে" ইতি চ' (৭।৩।৩৮)।

৪ এই বিষয়ে মতদ্বৈধ বর্তমান। এক মতে এই ভোজব্যাকরণের তৎপ্রণীত টীকার নাম 'কৃষ্ণলীলাবিনোদ'। বররুচির 'প্রাকৃত প্রকাশ' ব্যাকরণেরও 'গোবিন্দাভিষেক' নামে এক টীকা তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম বিল্বমঙ্গল, গুরুদত্ত নাম কৃষ্ণলীলাশুক, 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' নামক সুললিত সংস্কৃতপদ্যময় গ্রন্থ রচনা করিয়া বৈষ্ণব ভক্তসমাজে তথা কাব্যজগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার নামে প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক আরও গ্রন্থ এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর উদ্দেশে রচিত কিছু স্তব-স্তুতি পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবেম্বা নদীর পশ্চিম তীরে এই 'কবীন্দ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতে'র বসতি ছিল বলিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে লিখিত আছে। মতান্তরে তিনি কেরল প্রদেশের কবি। উদার ভগবদ্ভক্ত এই কবির শব্দবিদ্যা-প্রীতি লক্ষণীয়। পূর্বোক্ত কর্ণামৃত কাব্যেও তিনি 'মম বাঙ্ময়জীবিতম্' (৮ম শ্লোক) বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের জয় ঘোষণা করিয়াছেন।

সারস্বত ব্যাকরণ

(খ্রীঃ ১২শ শতক)

বাণী-প্রণীত 'সূত্রসপ্তশতী' বা 'সারস্বতী প্রক্রিয়া' নামক এক প্রাচীন ক্ষুদ্র ব্যাকরণের অবলম্বনে কাশীতে অনুভূতি স্বরূপাচার্য এই সারস্বত ব্যাকরণ রচনা করেন। ইহার প্রারম্ভে নমস্কার-শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি বলিয়াছেন ঃ 'সারস্বতীমৃজুং কুর্বে প্রক্রিয়াং নাতিবিস্তরাম্।' অর্থাৎ সরস্বতী-প্রণীত সূত্রাত্মক নাতিবিস্তর ব্যাকরণপ্রক্রিয়াকে তিনি ঋজু (সরল) করিবেন। ঋজু অর্থে যত্রতত্র স্থিত সূত্রসমূহের প্রয়োগার্থ একত্রীকরণ। এই প্রসঙ্গে টীকাকার চন্দ্রকীর্তি ঃ '...অহমনুভূতি স্বরূপাচার্যঃ সারস্বতীং প্রক্রিয়াং...লোকপ্রসিদ্ধ শব্দব্যুৎপাদনার্থম্ ঈষদ্ রচয়ামি... সরস্বতীদত্তসূত্রাণাং ক্রমমুৎসৃজ্য প্রয়োগসাধনার্থং যত্রতত্রস্থিতানাং সূত্রাণামনুক্রমমেলনেন ঋজুং সরলাং কুর্বে ইত্যর্থঃ।' মোট কথা, অনুভূতি আপাত দুর্বোধ এবং সংক্ষিপ্ত সারস্বতী প্রক্রিয়াকে সরল এবং যুগোপযোগী রূপ দান করিয়া এই সারস্বত ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন।

ক্রমে অনুভূতির ঐ 'সারস্বতীমৃজুং কুর্বে...' ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া যে শ্রুতিরোচক কাহিনীর প্রচলন হয়, তাহাতে কিছু সত্য থাকিতে পারে। অনুভূতি স্বরূপাচার্য একদা কাশীর এক পণ্ডিত সভায় পুমস্ শব্দের ৭মী বিভক্তির বহুবচন-সিদ্ধ 'পুংসু' পদের স্থলে 'পুংক্ষু' প্রয়োগ করিলে পর, উপস্থিত সকলে উহা অশুদ্ধ বলিয়া উপহাস করেন। অনুভূতি তাঁহাদিগকে উক্ত পদের শুদ্ধতার পক্ষে প্রামাণিক গ্রন্থ পরদিবস দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া দেবী সরস্বতীর আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। অর্ধরাত্রে দেবী আবির্ভূতা হন এবং অনুভূতির অভীষ্ট পূরণের জন্য স্বীয় কণ্ঠহার হইতে 'সূত্রসপ্তশতী' প্রদান করিয়া অন্তর্ধান করেন। উহার অবলম্বনে অনুভূতি-কর্তৃক যে নূতন ব্যাকরণ রচিত হয় তাহা (মতান্তরে উক্ত সূত্রসপ্তশতী) পণ্ডিতদের গোচরীভূত করিয়া তিনি পূর্বপ্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। সারস্বত ব্যাকরণের শব্দপ্রক্রিয়ার ১৫৪ নং সূত্র 'অসম্ভবে পুংসঃ ককসৌ' অনুসারে 'পুংক্ষু' পদ সিদ্ধ। মেদিনীপুরের হরলাল শর্মা এবং উড়িষ্যার

নবকিশোর শাস্ত্রী এই কিংবদন্তীকে যথাক্রমে গদ্যে ও পদ্যে১ সুন্দর রূপ দান করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই খ্রীঃ ১৯শ।২০শ শতাব্দীয়।

অনুভূতি কোথাও 'সূত্রসপ্তশতী' বা সাতশত সূত্রের উল্লেখ করেন নাই। নরেন্দ্রপুরীর টীকাতেই এই কথা সম্ভবতঃ প্রথম প্রকাশিত হয়। পুঞ্জরাজকৃত সারস্বত প্রক্রিয়ার টীকাতে নরেন্দ্রপুরীর রচনা বলিয়া উদ্ধৃত এই শ্লোকটিতে ঐ সূত্রসপ্তশতীর কথা আছেঃ 'সূত্রসপ্তশতীং যস্মৈ দদৌ সাক্ষাৎ সরস্বতী। অনুভূতিস্বরূপায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। ইতি শ্রীনরেন্দ্রপুরীয় শ্রীচরণৈরুক্তত্বাৎ।' ১৬৬৭ সংবতে (১৬১০খ্রীঃ) মেবারের অন্তর্গত 'উীড্বান'-এ ('পুরে ডিণ্ডুবাণাখ্যে') নারায়ণ সাধু তাঁহার 'সারস্বতসূত্রনির্ণয়' নামক ('সারস্বতানুবৃত্ত্যববোধক') গ্রন্থে সরস্বতী-প্রণীত মূল সূত্রসমূহের সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন ঃ

সারস্বতস্য শাস্ত্রস্য সূত্রাণামনুবৃত্তয়ঃ।
ক্রিয়ন্তে হি ময়া স্পষ্টা যথোক্তাঃ পূর্বসূরিভিঃ।।

এখানে 'যথোক্তাঃ পূর্বসূরিভিঃ' কথা হইতে প্রতীয়মান হয়, পূর্বেও অনেকে এই বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাধুজীর মতে তথাকথিত ৭০০সূত্রের মধ্যে মূল সূত্রসংখ্যা ৬১৬, বাকী ৮৪টি বক্তব্য বা বার্ত্তিক। এদিকে বর্তমানে প্রচলিত সারস্বত ব্যাকরণের মোট সূত্রসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ১৬০০ পর্যন্ত দেখা যায়।২ ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত যে, অনুভূতি-কর্তৃক পূর্বোক্ত 'সারস্বতী প্রক্রিয়া'র যথেষ্ট পরিবর্ধনের পরেও এই ব্যাকরণে আরও নূতন সূত্র যোজিত হইয়াছে। ১৮৩০ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৯০৮।৯) বোম্বাই হইতে প্রকাশিত সদাশিব শাস্ত্রি-সম্পাদিত 'সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা' বৃত্তিতে (ইহার উত্তরার্ধের সম্পাদক নবকিশোর শাস্ত্রী) সারস্বতের মোট সূত্রসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২১৩২। সিদ্ধান্তচন্দ্রিকার আর এক সংস্করণে এই সংখ্যা ২৩০৫-এ পৌঁছিয়াছে দেখা যায়!! এইগুলি পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, প্রয়োজনানুসারে (?) এই ব্যাকরণে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সূত্র প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, পরিবর্তিত হইয়াছে এবং কিছু কিছু বর্জিতও হইয়াছে। এই কারণে এই ব্যাকরণের বহু পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। ইহার প্রক্রিয়া-বিভাগেও দেখা যায় প্রচুর পার্থক্য। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় প্রক্রিয়ার সংখ্যা ৫০। পণ্ডিত শিবদত্ত শাস্ত্রী কুদাল-সম্পাদিত চন্দ্রকীর্তির ব্যাখ্যা-

যুক্ত সারস্বতের (বোম্বাই, ১৯১৬, ৩য় সংস্করণ) সূত্রসংখ্যা ১২৭৫, প্রক্রিয়ার সংখ্যা ৬০। সম্ভবতঃ সমস্ত ব্যাকরণের মধ্যে সারস্বতেরই সর্বাধিক বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পরে এই বিষয়ে আরও আলোচনা করা যাইবে।

অনুভূতি স্বরূপাচার্য সূত্রসমূহের বৃত্তিও স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন কিনা তাহাতে গভীর সন্দেহ বর্তমান। তাঁহার 'ঋজুং কুর্বে' কথার এযাবৎ যে সব ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কোথাও বৃত্তি রচনা-পূর্বক সারস্বতী প্রক্রিয়াকে সরল করিবার কথা বলা হয় নাই । সরস্বতী-দত্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সূত্রসমূহের ক্রম(?) পরিত্যাগ করিয়া উহাদের প্রয়োগানুকূল একত্রীকরণের দ্বারাই তিনি উহার সরলতা সম্পাদন করেন এবং তৎসঙ্গে লোকপ্রসিদ্ধ শব্দসমূহের সাধনের জন্য নিজেও কিছু সূত্র রচনা করিয়া জুড়িয়া দেন। 'প্রসাদ'টীকায় ঋজুকরণের অর্থ বলা হইয়াছে ঃ 'সূত্রপাঠাদিক্রমাতিক্রমেণ চ প্রয়োগানুকূলসূত্রাদিক্রমকরণা-দৃজুকরণম্।' যদি তাহাই হয়, তবে বর্তমানে প্রাপ্ত সারস্বত সূত্রবৃত্তির রচয়িতা কে? সম্ভবতঃ অনুভূতি স্বরূপের শিষ্য নরেন্দ্রনগরীই ইহার রচয়িতা। টীকাকার অমৃতভারতী তাঁহার টীকায় সারস্বত প্রক্রিয়ার পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাতৃরূপে এই নরেন্দ্রনগরীর নাম করিয়াছেন ঃ 'যন্নরেন্দ্র-নগরীপ্রভাষিতং যচ্চ বৈমলসরস্বতীরিতম্। তন্ময়াত্র লিখিতং তথাধিকং কিঞ্চিদেব কলিতং স্বয়া ধিয়া।।' আবার সারস্বতের টিপ্পনীকার ক্ষেমেন্দ্র, সারস্বত প্রক্রিয়ার কর্তৃত্বই নরেন্দ্রে আরোপ করিয়া বসিয়াছেন ঃ 'প্রোক্তা নরেন্দ্রনগরীমুনিভিঃ সুবন্দ্যৈর্যা প্রক্রিয়া শিশুমনঃ পরিবোধ-হেতোঃ।' এবং টিপ্পনীর শেষেও লিখিয়াছেন ঃ'ইতি শ্রীনরেন্দ্রাচার্যকৃতে সারস্বতে ক্ষেমেন্দ্রটিপ্পণং সমাপ্তম্।'[৩] হরিভদ্র সূরির পুত্র এই ক্ষেমেন্দ্র সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে তিনি যে 'বৃহৎকথা-মঞ্জরী'-প্রণেতা কাশ্মীরী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র (খ্রীঃ ১১শ শতক) নহেন তাহা নিঃসন্দেহ। (খ্রীঃ১৩শ শতাব্দীয়) বোপদেবের গুরু ধনেশ্বর ভট্ট ক্ষেমেন্দ্র-টিপ্পন-খণ্ডনাত্মক 'সারস্বতপ্রদীপ' রচনা করেন। তিনি এই গ্রন্থে, নরেন্দ্রনগরীই সারস্বত প্রক্রিয়ার প্রণেতা—এই ক্ষেমেন্দ্রমতও খণ্ডন করিয়াছেন শুনা যায়। ধনেশ্বর মহাভাষ্যের 'চিন্তামণি' টীকা এবং 'প্রক্রিয়ারত্নমণি' নামে এক ব্যাকরণও রচনা করেন। তাঁহার গুরুর নাম পীতাম্বর শর্মা।

শুনা যায়, নরেন্দ্র গুজরাটের আনন্দপুর নগরে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহাকে 'নগরী' বলা হইত। 'প্রক্রিয়াকৌমুদী'র বিট্‌ঠল-রচিত 'প্রসাদ' টীকায় (৫।৪।২১,৬।৩।৭৪) নরেন্দ্রাচার্যের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। কাহারও মতে নরেন্দ্রনগরী পরিব্রাজক হইয়া নরেন্দ্রাচার্য নামে অভিহিত হন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী তাঁহার 'বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ' গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৪৩০) দ্বারকামঠাধীশ খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীয় আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরির সতীর্থরূপে এক নরেন্দ্রগিরির নাম করিয়াছেন। সেখানে তাঁহাকে ঈশাভাষ্য-টিপ্পনী প্রভৃতির রচয়িতা বলা হইয়াছে। আনন্দজ্ঞান ছিলেন গুজরাটের অধিবাসী এবং অনুভূতি স্বরূপের ছাত্র। 'বেদান্ততত্ত্বালোক,' 'তর্কসংগ্রহ' এবং শঙ্করাচার্যের প্রায় সমস্ত ভাষ্যগ্রন্থের টীকা তিনি রচনা করেন। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ('A History of Indian Philosophy'—Vol. II, Cambridge, 1932,p.192) কিন্তু খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ আনন্দজ্ঞানের সময় নির্ধারিত হইয়াছে। এইরূপ হইলেই অবশ্য তাঁহার বিদ্যাগুরু অনুভূতি স্বরূপকে খ্রীঃ ১২শ।১৩শ শতাব্দীয় ধরিয়া, খ্রীঃ ১২শ শতকের শেষ প্রান্তে বা ১৩শ শতকের প্রারম্ভে সারস্বত ব্যাকরণের রচনাকাল নির্ধারণ করা চলে এবং সেক্ষেত্রেই ভট্ট ধনেশ্বরের পক্ষে পূর্বোক্ত ক্ষেমেন্দ্র-টিপ্পন খণ্ডন করা, কাল-গণনায় খুব অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এই ধনেশ্বরই পরিণত বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া অমলানন্দ নামে (তিনি 'ব্যাসাশ্রম' নামেও অভিহিত) শাঙ্কর ভাষ্যের বাচস্পতি মিশ্রকৃত 'ভামতী' টীকার উপর 'বেদান্তকল্পতরু' টীকা রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। দাশগুপ্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থে (Vol.I,p.418; Vol. II, pp. 108, 119) খ্রীঃ ১৩শ শতকের মধ্যভাগে (১২৪৭–৬০) তাঁহার অভ্যুদয়-কাল দেখানো হইয়াছে। এই গ্রন্থেই আবার তাঁহাকে খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীয় বিদ্যারণ্যের সমকালীন বলা হইয়াছে (ঐ Vol.II, pp. 57,86)।

এইসব বিবেচনা করিয়া বলা যায়, নরেন্দ্রনগরী (যিনি নরেন্দ্রগিরি বা নরেন্দ্রাচার্য নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন) স্বীয় গুরু অনুভূতি স্বরূপাচার্য-সংকলিত সারস্বত ব্যাকরণের বৃত্তি রচনা করেন। নবকিশোর শাস্ত্রীও এই মতেরই সমর্থক। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

মন্যোঽহং প্রকৃতা যাত্র বৃত্তিরস্তি সুবিস্তরা।
তৎকর্তা কুশলী শ্রীমন্নরেন্দ্রাচার্য পণ্ডিতঃ।।

পূর্বোক্ত কিংবদন্তী অনুসারে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই ব্যাকরণ রচিত হইয়া থাকিলে, এই কার্যে অনুভূতির শিষ্যদের বা কোনও প্রিয়তম শিষ্যের হাত থাকা খুবই স্বাভাবিক। পুঞ্জরাজ 'নরেন্দ্রপুরী'র নামেও শ্লোকোদ্ধার করিয়াছেন। এই নামে 'সারস্বত প্রক্রিয়া ধাতুপাঠ' নামক যে পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার টীকাকার গুণরত্ন (সূরি)।

(২)

অনুভূতি স্বরূপাচার্যের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তিনি যে সন্ন্যাসী ছিলেন তাহা তাঁহার নামেই প্রতিভাত। সারস্বতের কৃৎপ্রক্রিয়াশেষে একটি শ্লোকে তাঁহাকে 'মস্করী' বলা হইয়াছে ঃ

স্বরূপান্তোঽনুভূত্যাদিঃ শব্দোঽভূদ্ যত্র সার্থকঃ।
স মস্করী শুভাং চক্রে প্রক্রিয়াং চতুরোচিতাম্।।

কাহারও মতে তিনি কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার উপ নামের 'স্বরূপ' শব্দের দ্বারা দ্বারকার শারদামঠের সহিত তাঁহার যোগ সূচিত হয়, কারণ শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত মঠাম্নায়-অনুসারে ঐ মঠের ব্রহ্মচারীর উপাধি স্বরূপ। তাঁহার (অনুভূতির) দুই শিষ্য আনন্দজ্ঞান এবং নরেন্দ্রনগরী ছিলেন ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী, বিশেষতঃ আনন্দজ্ঞান তো ঐ মঠের আচার্যের পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই সব হইতে প্রতীয়মান যে, অনুভূতির জীবনের এক প্রধান অংশ (সম্ভবতঃ ১ম ভাগ) গুজরাটে অতিবাহিত হয়। সারস্বতের রচনাস্থলও বোধ হয় ইহাই; তবে কাশীতেই এই ব্যাকরণের সমধিক প্রতিপত্তি লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ কাশীকেই ইহার উৎপত্তিস্থল বলিয়া থাকেন। তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক। ইহা তাঁহার গ্রন্থাদি হইতেই প্রমাণিত। ব্যাকরণ ভিন্ন তাঁহার আরও চারিখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ঃ ১। গৌড়পাদ-রচিত মাণ্ডূক্যকারিকার শঙ্করকৃত ভাষ্যের টীকা, ২। খ্রীঃ১১শ। ১২শ শতাব্দীয় আনন্দবোধ যতি-রচিত 'ন্যায় মকরন্দে'র 'সংগ্রহ'নামে টীকা, ৩। আনন্দবোধের 'ন্যায় দীপাবলী'র 'চন্দ্রিকা' টীকা এবং ৪। উঁহারই 'প্রমাণমালা'র উপর 'নিবন্ধ' নামে টীকা। এই সব গ্রন্থই শাঙ্কর বেদান্তের উপরে রচিত।

সারস্বতের সূত্রগুলি অতি সাধারণভাবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে রচিত। কাতন্ত্রব্যাকরণও প্রথমে এই উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল—অর্থাৎ কৃষক, বণিক্, চিকিৎসক এবং অন্যান্যদের জন্য—যাঁহারা সংস্কৃতের কেবল মোটামুটি কাজ-চলা-গোছের জ্ঞান লাভ করিতে চান। কিন্তু কালক্রমে সেই কাতন্ত্রও টীকা-পঞ্জী রচয়িতাদের হাতে পড়িয়া বিশাল আকার ধারণ করিলে এই সারস্বতই কাতন্ত্রের সেই মৌলিক উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে। কিংবদন্তীমূলক দৈব এবং স্বল্প-সূত্রাত্মক উৎপত্তির দিক্ দিয়া এই উভয় ব্যাকরণের প্রারম্ভিক সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

সম্ভবতঃ সরলতার জন্যই মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে সারস্বতের খুব প্রসার লক্ষিত হয়। ভারতীয় হিন্দুরাজাদের এমন কি মুসলমান শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষণ হইতেও ইহা বঞ্চিত হয় নাই। পরে অবশ্য পাণিনীয় সিদ্ধান্তকৌমুদী ও লঘুকৌমুদীর প্রভাবে উত্তর ভারতের এক প্রধান অংশ হইতে ইহার একরূপ অবলুপ্তি ঘটে। তথাপি বিহার, কাশী, মালব, নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার কিঞ্চিৎ চর্চা এখনও চোখে পড়ে। নেপালে এখনও সারস্বত পঠিত হয়। গোবিন্দাচার্য-রচিত সারস্বত-ভাষ্য-টীকা 'পদচন্দ্রিকা' হইতে জানা যায় ১৬শ শতকে বঙ্গদেশে এই ব্যাকরণের পাঠনা হইত। এখনও বাঙ্গলায় ইহার প্রচলন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ত্রিপুরারাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ধনঞ্জয় ঠাকুর খ্রীঃ ১৯শ শতকের শেষ দিকে (১৮৮০?) নিজ ব্যয়ে এই ব্যাকরণ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে Sir Charles Wilkins (১৭৪৯–১৮৩৬) খুব আগ্রহের সহিত সারস্বত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া ইহারই ভিত্তিতে ইংরেজী ভাষায় প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ 'A Grammar of the Sanscrit Language'প্রণয়ন করেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। Wilkins 'East India Co.'র Writer-এর চাকরি লইয়া ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন এবং ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া গিয়া 'India Office Library'র প্রথম গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। রংপুরে ইউরোপীয় অফিসারদের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সারস্বতেরই এক সংস্করণ প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

(৩)

বর্ণ-বিষয়ে সারস্বতে 'ইৎ' বা অনুবন্ধ পরিত্যাগপূর্বক প্রত্যাহার-সূত্র গৃহীত হইয়াছে। এই ব্যাপারে ইহা মুগ্ধবোধের নিকটবর্তী হইলেও,

মুগ্ধবোধের ন্যায় ঐকাক্ষরিক সংজ্ঞার ব্যবহার সারস্বতে অনুসৃত হয় নাই, বরং লোকপ্রসিদ্ধ সাধারণ সংজ্ঞাই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার সূত্র-বৃত্তিতে বহু ব্যাকরণকারিকা উদ্ধৃত এবং উদাহরণমালাও সংগৃহীত হইয়াছে পাণিনীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন টীকা-টিপ্পনী হইতে। বিষয়-বিন্যাস ভাষাশিক্ষার উপযোগী অর্থাৎ স্বাভাবিক, যেমন ঃ সংজ্ঞা, সন্ধি, শব্দ, স্ত্রী-প্রত্যয়, কারক, সমাস, তদ্ধিত, আখ্যাত ও কৃৎ। কৃৎপ্রক্রিয়ার শেষে উণাদির আলোচনা। বৈদিক প্রক্রিয়া নাই। মুগ্ধবোধ অপেক্ষা সরল হওয়ায় অনেকের ধারণা, সারস্বত মুগ্ধবোধের পরে রচিত। এই ধারণা বা অনুমান ভুল। আমাদের বিবেচনায় মুগ্ধবোধের রচয়িতা বোপদেবের জন্মের পূর্বেই সারস্বত ব্যাকরণ রচিত হয়। তবে, সুবিধামতো পরিবর্তনের জন্য এই 'ব্যাকরণমন্দিরের দুয়ার'যে প্রায় সর্বদা সর্বত্রই খোলা ছিল, তাহা আমরা আগেই লক্ষ্য করিয়াছি।

সারস্বতের বহু টীকা-টিপ্পনী। এইগুলির রচয়িতাদের অনেকেই সন্ন্যাসী, কেহ হিন্দু, কেহ বা জৈন। সন্ন্যাসীদের ইহার প্রতি অনুরক্তির কারণ, সহজে সংস্কৃত শিখিয়া তাহার সাহায্যে ধর্মমূলক সংস্কৃত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করা। এই ক্ষেত্রে সারস্বতের উপযোগিতা সমধিক। তাই ইহাকে সন্ন্যাসীদের ব্যাকরণ বলা যাইতে পারে। নরেন্দ্রমুনির ছাত্র মণ্ডনাচার্যই বোধ হয় সারস্বতের প্রথম টীকা-প্রণেতা। এই টীকার নাম 'সারস্বত মণ্ডন'। নরেন্দ্রমুনি সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত নরেন্দ্রনগরী। তাঁহার পরেই নাম করিতে হয় টীকাকার পুঞ্জরাজের। তাঁহার পিতা মালবদেশীয় শ্রীমালবংশীয় জীবনেন্দ্র। মাতার নাম মকূ। পূর্বোদ্ধৃত 'সূত্রসপ্তশতীং যস্মৈ...' ইত্যাদি শ্লোকের পরে পুঞ্জরাজের 'ইতি নরেন্দ্রপুরীয় শ্রীচরণৈ-রুক্তত্বাৎ' উক্তি হইতে প্রতীত হয় যে, নরেন্দ্রপুরী ছিলেন তাঁহার গুরু। এই নরেন্দ্রপুরী যদি পূর্বোক্ত নরেন্দ্রনগরী হন, তবে এই ক্ষেত্রে কালগণনায় খানিকটা পিছাইয়া আসিতে হয়, কারণ পুঞ্জরাজ ছিলেন মালবের শাসনকর্তা ঘিয়াসুদ্দীন খিলজির (১৪৬৯–১৫০০) মন্ত্রী এবং সম্ভবতঃ এই সময়েই অলঙ্কারশাস্ত্রীয় 'শিশুপ্রবোধ' এবং 'ধ্বনিপ্রদীপ' গ্রন্থ দুইটিও তিনি রচনা করেন (দ্রঃ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত 'The Delhi Sultanate', p. 482)। খ্রীঃ ১২শ। ১৩শ শতাব্দীয় নরেন্দ্র-পুরীর (= নরেন্দ্রনগরীর) পক্ষে খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীয় পুঞ্জরাজের গুরু হওয়া একেবারেই অসম্ভব। অবশ্য নরেন্দ্রপুরী পুঞ্জরাজের মহাগুরুর

গুরুও হইতে পারেন। টীকাশেষে পুঞ্জরাজ নিজেকে 'নরেন্দ্র' বলিয়াছেন : 'সোঽয়ং টীকাং ব্যরচয়দিমাং চারুসারস্বতস্য, ব্যুৎপিৎসূনাং সমুপকৃতয়ে পুঞ্জরাজো নরেন্দ্রঃ।' নরেন্দ্র তাঁহার প্রকৃত নাম এবং পুঞ্জরাজ তাঁহার উপাধি হওয়াও অসম্ভব নয়।

সারস্বতের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ টীকা-প্রণেতা চন্দ্রকীর্তি ছিলেন জৈন সন্ন্যাসী। টীকার পুষ্পিকায় 'নাগপুরস্থ তপাগচ্ছাধিরাজ ভট্টারক' বলিয়া তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির মীমাংসকের মতে তিনি নাগপুরীয় বৃহদ্‌গচ্ছের সংস্থাপক দেবসূরি হইতে অধস্তন ১৫শ পট্টাধীশ। তাঁহার শিষ্য হর্ষকীর্তির বর্ণনা হইতে জানা যায়, দিল্লীর সম্রাট্ সলিম শাহ্ (১৫৪৫–৫৪) কর্তৃক চন্দ্রকীর্তি সম্মানিত হইয়াছিলেন : 'শ্রীমৎ সাহিসলেম ভূমিপতিনা সম্মানিতঃ সাদরং, সূরিঃ সর্বকলিন্দিকা কলিতধীঃ শ্রীচন্দ্রকীর্তিঃ প্রভুঃ।।' এই সাহিসলেম (= সলিম শাহ্) ছিলেন বিখ্যাত শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহ্। চন্দ্রকীর্তির টীকার নাম 'সুবোধিকা'। পদ্মচন্দ্র উপাধ্যায় নামক কোনো এক ব্যক্তির অনুরোধে এই টীকা রচিত হয়। লিপিকর ছিলেন শিষ্য হর্ষকীর্তি। এই হর্ষকীর্তি কতকগুলি প্রসিদ্ধ ধাতুর সমবায়ে 'সারস্বতমতানুগ' এক ধাতুপাঠ প্রস্তুত করেন খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীতেই ষণ্ডেল (= 'ষণ্ডেল্বাল') বংশীয় সুধী হেমসিংহের অনুরোধে। তপাগচ্ছীয় আর এক সন্ন্যাসী হংসবিজয় গণি 'স্বোপজ্ঞ-শব্দার্থচন্দ্রিকোদ্ধার' (= শব্দার্থচন্দ্রিকা, নবকিশোর শাস্ত্রীর মতে) নামে সারস্বতের টীকা প্রস্তুত করেন। 'স্বোপজ্ঞ' বলিলে মূলগ্রন্থকার-কৃত বুঝায়, ব্যাকরণ ক্ষেত্রে বুঝায় সূত্রকার-কৃত। তদনুসারে 'স্বোপজ্ঞশব্দার্থ-চন্দ্রিকোদ্ধার' নাম হইতে বুঝা উচিত—ইহা অনুভূতি স্বরূপাচার্য-কৃত 'শব্দার্থচন্দ্রিকা' নামক কোনও (বৃত্তি) গ্রন্থের পুনরুদ্ধারমূলক রচনা। কিন্তু বস্তুতঃ এক্ষেত্রে ঠিক তাহা নয়। 'ইহ কিল...শ্রীসারস্বতশব্দানু-শাসনাদিমবৃত্তিদ্বিতয়স্য ব্যাখ্যা সংহিতাদিভেদেন যোঢ়া প্রস্তূয়তে।'—অর্থাৎ ইহা সন্ধি হইতে তদ্ধিত পর্যন্ত ছয়টি বিষয়ের উপরে সারস্বতের আদিম দুই বৃত্তির ব্যাখ্যা। পুষ্পিকায় লিখিত আছে : 'ইতি...শ্রীবিজয়ানন্দসূরীশ্বর শিষ্যহংসবিজয়গণিসমর্থিতে স্বোপজ্ঞশব্দার্থচন্দ্রিকোদ্ধারে শ্রীসারস্বত-শব্দানুশাসনদ্বিতয়বৃত্ত্যর্থলেশঃ সম্পূর্ণঃ।' সারস্বতের 'আদিমবৃত্তিদ্বিতয়' পদটি সবিশেষ লক্ষণীয় বর্তমান প্রসঙ্গে। এই বৃত্তিযুগল কাহার রচনা? উপরের 'ইহ কিল...' ইত্যাদি উক্তির সহিত পুষ্পিকার বক্তব্যের

অর্থগত বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়। টীকার সূচনায় বলা হইয়াছে ঃ 'স্বোপজ্ঞ-চারুশব্দার্থচন্দ্রিকোদ্ধার উচ্যতে।' এইসব হইতে প্রতীয়মান হয়, হংস-বিজয়গণির পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ তাঁহার জীবদ্দশাতেই কোন কারণে লুপ্তপ্রায় হইলে উহার পুনরুদ্ধারমূলক এই গ্রন্থ তাঁহারই সমর্থনপুষ্ট হইয়া রচিত (বা পুনর্লিখিত)হয়।

হৃদয়ানন্দসূরি-ভট্টাচার্যের ছাত্র বাসুদেব, সিদ্ধান্তকৌমুদীর অনুকরণে সারস্বতের অবলম্বনে 'সারস্বত ক্রম কৌমুদী' রচনা করেন। সেখানে প্রকরণ সমূহের এই ক্রম বর্ণিত হইয়াছে ঃ

সংজ্ঞা সন্ধির্বিভক্তিশ্চ যুষ্মদস্মচ্চ কারকম্।
তদ্ধিতঃ স্ত্রী সমাসশ্চ দশধাখ্যাতমিত্যপি।।
কৃতশ্চ প্রত্যয়া অত্র ক্রমেণৈব নিরূপিতাঃ।
তত্তৎক্রমানুসারেণ জ্ঞেয়া ব্যাখ্যা বিচক্ষণৈঃ।।

গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে দেবী সরস্বতীকর্তৃক অনুভূতি স্বরূপাচার্যকে 'সূত্র-সপ্তশতী' প্রদানের কথা উল্লেখ করিয়া পরে ব্যাখ্যাস্থলে সেই সূত্রাবলীর স্বরূপনির্ণয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। চণ্ডীশ্বরের ছাত্র আর এক বাসুদেব ভট্ট ১৬৩৪ সংবতে (১৫৭৭খ্রীঃ) সারস্বতের 'প্রসাদ' নামে টীকা রচনা করেন। ইহার পূর্ণনাম 'সারস্বতপ্রসাদ।' ১৫২১ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৫৯৯/১৬০০) গোবিন্দাচার্য 'সারস্বত ভাষ্যে'র এক টীকা প্রণয়ন করেন। 'সারস্বত ভাষ্যে'র প্রণেতা খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীয় কাশীনাথ বিদ্যানিবাস নবদ্বীপের অধিবাসী। তিনিই বঙ্গদেশে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের প্রচলন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। নবকিশোর শাস্ত্রী এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ

কাশীনাথো বুধশ্রেষ্ঠঃ ফণিভাষিতভাষ্যবৎ।
যৎ সারস্বতভাষ্যং তচ্চক্রেঽলভ্যং ভবেজ্জনৈঃ।।

এই ভাষ্য সত্যই পাওয়া যায় না। গোবিন্দাচার্যের ঐ টীকার নাম 'পদচন্দ্রিকা'। তাঁহার মতে সারস্বতের সূত্রাবলী ৫অধ্যায়ে, এবং প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া মোট ২০ পাদে ক্রমান্বয়ে সংজ্ঞা (১ম পাদ), সন্ধি (২–৫পাদ), শব্দরূপ ও স্ত্রীপ্রত্যয় (৬-৮), কারক (৯), সমাস (১০), তদ্ধিত (১১), আখ্যাত(১২–১৯) এবং কৃৎ (২০)-বিষয়ানুক্রমে বিন্যস্ত। তাঁহার 'সূত্রাণি ভাষ্যকারোক্তসূত্রাণি চ তু কৃৎস্নশঃ। বিলিখ্যাত্র যথাজ্ঞানং তেষাং ব্যাখ্যা বিধীয়তে।।'–উক্তি হইতে জানা যায়, সারস্বত

ভাষ্যে ভাষ্যকারোক্তসূত্রাদিও ছিল এবং তিনি সমস্ত (সারস্বতের এবং ভাষ্যকারের) সূত্রকেই ব্যাখ্যার বিষয়ীভূত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং শ্রীকান্ত আচার্যের ছাত্র বা শিষ্য। জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালে ('ক্ষিতিভবতি শ্রীজহাঙ্গীরে') ১৬৭২ সংবতে (খ্রীঃ ১৬১৫) হোড়া (হাওড়া?) নামক নগরে ('নগরে চ হোড়াখ্যে') দ্বারিকাদাস ভট্টাচার্যের পুত্র তর্কতিলক ভট্টাচার্য সারস্বত ব্যাকরণের এক বৃত্তি রচনা করেন। ইহাকে 'অনুভূতিলিখনরূপ দুগ্ধে জলবৎ প্রক্ষিপ্ত' বলিয়া তিনি বিনয়ের অভিনব প্রকাশ দেখাইয়াছেন।

সারস্বতের 'সুদীপিকা' টীকা বিশ্বেশ্বরাব্ধি ('বিশ্বেশ্বরাব্ধি মুনিনা মুনিপণ্ডিতেন')-রচিত। তাঁহার অপর (গৃহাশ্রমের?) নাম সত্যপ্রবোধ ভট্টারক।[৪] গুরুর নাম ব্রহ্মসাগর। খ্রীঃ ১৫শ শতকের শেষ ভাগে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ইহা রচিত হয়। তাঁহার মতে নরেন্দ্রনগরী (সারস্বত) প্রক্রিয়ার বক্তা—'প্রোক্তা নরেন্দ্রনগরীমুনিভিস্ত বন্দ্যৈর্যা প্রক্রিয়া...' ইত্যাদি। তাঁহার পিতা বা শিক্ষাগুরুর নাম রঘুনাথ('রঘুনাথং প্রণম্য')।

আন্ধ্রদেশীয় শ্রীরাম ভট্ট (বা ভট্ট শ্রীরাম বা রাম ভট্ট)- রচিত 'বিদ্বৎপ্রবোধিনী' সারস্বতের আর এক টীকা। রচনাকাল খ্রীঃ ১৬শ শতকের শেষভাগ। গ্রন্থকারের পিতার নাম নরসিংহ, মাতা কামা। তীর্থভ্রমণ-কালে রচিত বলিয়া টীকার প্রত্যেক প্রকরণের শেষে পবিত্র তীর্থ সমূহের অল্প-বিস্তর বর্ণনা দৃষ্ট হয়। রচয়িতার নামানুসারে ইহাকে 'রামভট্টী'ও বলা হইয়া থাকে।

সারস্বতের 'মাধবী' বা 'সিদ্ধান্তরত্নাবলী' টীকার প্রণেতা মাধব। তাঁহার পিতার নাম কাহ্ন, মাতা শ্রীনায়কদেবিকা, গুরু শ্রীরঙ্গ। পিতামহ শ্রীজনার্দন বৎসরাজ। খ্রীঃ ১৬শ শতকের মধ্যভাগ এই টীকার রচনাকাল। ইহার সম্বন্ধে নবকিশোর লিখিয়াছেন ঃ 'মাধবীতি সমাখ্যাতা ব্যাখ্যা গুর্বর্থবোধিকা।'

সারস্বতের পঞ্জী 'প্রভাবতী' রচনা করেন কৃষ্ণনাথ। পঞ্জী বা পঞ্জিকা বৃত্তির উপরে রচিত ব্যাখ্যাবিশেষ। 'পঞ্জিকা পদভঞ্জিকা'। আর এক সারস্বত পঞ্জিকার প্রণেতা ধর্মদেব।

হিন্দু সন্ন্যাসী অমৃত ভারতী 'সুবোধিনী' নামে সারস্বতের যে টীকা (?) রচনা করেন তাহাতে প্রকারান্তরে নরেন্দ্রনগরীকে সারস্বতের ব্যাখ্যাতা ('যন্নরেন্দ্রনগরী প্রভাষিতং') বলা হইয়াছে। কাহারও মতে এই

শ্লোকে (যাহা পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে) তাঁহার সূত্রকারত্ব সূচিত। সমগ্র শ্লোকটি পর্যালোচনা করিলে এই মত ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে বাধ্য। ভাষ্‌ধাতুঘটিত 'ভাষ্য' শব্দটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পাণিনীয় ধাতুপাঠের 'ভাষব্যক্তায়াংবাচি' সূত্রটিতে অব্যক্তকে ব্যক্ত করার দ্যোতনা বিদ্যমান। সম্পূর্ণ শ্লোকটির আক্ষরিক অর্থঃ 'যাহা নরেন্দ্রনগরী-প্রভাষিত এবং যাহা বিমল সরস্বতী (ছন্দের অনুরোধে 'বৈমল...'করা হইয়াছে)–ঈরিত তাহা আমাকর্তৃক এখানে লিখিত এবং তাহার অধিক আরও কিছু নিজ বুদ্ধির দ্বারা গ্রথিত হইল। ভাষ্যের 'স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে' লক্ষণটি এখানে পরিস্ফুট। তাই 'সুবোধিনী' 'টীকা নিরন্তরা ব্যাখ্যা' মাত্র নয়। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরীতে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

জগন্নাথ আর একজন সারস্বত-টীকাকার। এই টীকার নাম 'সার-প্রদীপিকা'। নবকিশোর শাস্ত্রী ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ 'সারপ্রদীপিকা নাম্না সারার্থস্য প্রকাশিকা।' জৈন বৃহৎখরতরগচ্ছীয় বিনয়সুন্দর সূরির ছাত্র মেঘরত্ন সূরির টীকার নাম 'সারস্বতদীপিকা'। নবকিশোর ইহাকে 'ঢুন্টিকা' বলিয়াছেন এবং তাঁহার মতে মেঘরত্ন অমল স্বামীর শিষ্য ঃ

কৃতবান্ যোঽমলস্বামি-শিষ্য আসীৎ সদা সুখী।
ঢুণ্টিকাং মেঘরত্নো হি গম্ভীরার্থপ্রদর্শিকাম্।।

বিনয়সুন্দরও সারস্বতের এক টীকা রচনা করেন।

ভট্টোজি দীক্ষিতের ছাত্র (খ্রীঃ ১৬শ।১৭শ শতাব্দীয়) রঘুনাথ নামক এক নাগর ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাভাষ্যের অনুকরণে সারস্বতের 'লঘুভাষ্য' প্রণয়ন করেন। তাঁহার পিতার নাম বিনায়ক। গ্রন্থশেষে ঃ

হাটকেশপুরস্থায়ী বিনায়কসুতোঽকরোৎ।
রঘুনাথাভিধো ব্যাখ্যাং সপ্তানঞ্চৈব নাগরঃ।।

পুষ্পিকায় এই লঘুভাষ্যকে 'সরস্বতী সূত্রবিবরণ' বলা হইয়াছে। ইহাতে কলাপ, মুগ্ধবোধ এবং সিদ্ধান্তকৌমুদীর সিদ্ধান্তও খণ্ডিত হইতে দেখা যায়। তাই এই গ্রন্থ অধিগত করিতে পারিলে কৌমুদ্যাদি অন্য যে কোন ব্যাকরণের পণ্ডিতকে নাকি শব্দবিদ্যার বিচারে পরাজিত করিবার সামর্থ্য জন্মে! স্বীয় গুরু ভট্টোজির মত খণ্ডন করিলেও গ্রন্থের নমস্কার-শ্লোকে তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে ঃ

গোপিকাবল্লভং নত্বা গিরং ভট্টোজিদীক্ষিতম্।
বাক্‌সূত্রে বিদধে ব্যাখ্যাং ফণিভাষিত মার্গগাম্।।

খ্রীঃ ১৭শ শতকের প্রারম্ভে ভট্টগোপাল (বা গোপাল ভট্ট) এবং সহজকীর্তি সারস্বত ব্যাকরণে ব্যাখ্যাগ্রন্থাদি রচনা করেন। গোপাল ভট্টের গ্রন্থকে 'গোপালভট্টী'ও বলা হইত। সহজকীর্তির গ্রন্থের নাম 'প্রক্রিয়া-বার্ত্তিক'। ইহার রচনাসমাপ্তির কাল ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ (মাঘী শুক্লা পঞ্চমী, ১৬৮১ সংবৎ)। সহজকীর্তি জৈন এবং খরতরগচ্ছীয় হেমনন্দন-গণির শিষ্য।

(৪)

হরিদ্বারী, বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, রামাশ্রম প্রভৃতি অনেকে সারস্বতের বৃত্তি রচনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে রামাশ্রমের 'সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা' বৃত্তিই সমধিক প্রসিদ্ধ বলিয়া সবিশেষ উল্লেখ্য। স্বাতন্ত্র্যগৌরবে এই বৃত্তি দেদীপ্যমানা। নবকিশোর শাস্ত্রী ইহার বিষয়ে বড় সুন্দর লিখিয়াছেন ঃ

সারস্বতীয় সূত্রাণামপরা বৃত্তিরস্তি যা।
রামাশ্রমকৃতা রম্যা সা হি সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা।।
ভট্টোজিদীক্ষিতস্যৈব পুত্রো ভানুজি দীক্ষিতঃ।
রামাশ্রমাপরাখ্যোঽসৌ কথ্যতে সকলৈর্জনৈঃ।।
অয়ং পতঞ্জলের্ভাষ্যং স্বীকৃত্য সকলং পদম্।
লৌকিকং লোকভদ্রায় সংসাধ্যাঽদর্শয়দ্ বুধঃ।।
সিদ্ধান্ত-কৌমুদীগ্রন্থে যানি সন্তি পদানি বৈ।
তানি তানি চ সর্বাণি বর্তন্তেঽত্র সুবিস্তরম্।।
অল্পকালেন বোধো হি পদার্থানাং প্রজায়তে।
সিদ্ধান্তচন্দ্রিকাগ্রন্থপাঠেনৈব যথার্থতঃ।।

ভট্টোজিদীক্ষিতের পুত্র ভানুজি সন্ন্যাস গ্রহণের পর রামাশ্রম বা রামভদ্রাশ্রম নামে পরিচিত হন। খ্রীঃ ১৬শ শতকের শেষপ্রান্তে অথবা ১৭শ শতকের গোড়ায় তাঁহার জন্ম। তিনি অমরকোষের 'ব্যাখ্যাসুধা' নামে এক টীকাও রচনা করেন। এই টীকার পুষ্পিকা হইতে জানা যায়, তিনি ছিলেন ভট্টোজিদীক্ষিতের ছাত্র এবং বঘেল-বংশীয় রাজা কীর্তিদেব ছিলেন তাঁহার আশ্রয়দাতা। এখানে তিনি নিজেকে 'গুর্জরজাতীয় রামাশ্রম' বলিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, তিনি ঐ অঞ্চলের শারদামঠের সন্ন্যাসী ছিলেন। এই মঠের সন্ন্যাসীদের উপাধি 'তীর্থ' বা 'আশ্রম'। সিদ্ধান্তচন্দ্রিকার সংক্ষেপ 'লঘুসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা'ও তাঁহার রচনা।

পাণিনি-ব্যাকরণে যেমন ভট্টোজির 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী,' সেইরূপ সারস্বতে তৎপুত্র রামাশ্রমের 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা'। ইহার প্রারম্ভিক 'নমস্কৃত্য মহেশানং মতং বুদ্ধ্বা পতঞ্জলেঃ। বাণীপ্রণীতসূত্রাণাং কুর্বে সিদ্ধান্তচন্দ্রিকাম্।।' শ্লোকের 'বাণীপ্রণীত সূত্রাণাং কুর্বে' কথার সঙ্গে অনুভূতি স্বরূপাচার্যের 'সারস্বতীমৃজুং কুর্বে' উক্তির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। উভয়েরই মূল ভিত্তি সরস্বতীর সূত্রাবলী বা সারস্বতী প্রক্রিয়া। অথচ সূত্রতঃ উভয় রচনার মধ্যে পার্থক্য অনেক। আমরা বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা-র যে কয়টি মুদ্রিত সংস্করণ দেখিয়াছি তাহাদের প্রত্যেকটির সূত্রসংখ্যা দ্বিসহস্রাধিক। প্রকরণ বা প্রক্রিয়ার সংখ্যাতেও বেশ কিছু পার্থক্য আছে (২০হইতে ৬০পর্যন্ত)। চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, কাশী হইতে ১৯৩৫–৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নবকিশোর শাস্ত্রীর সংস্করণে সারস্বত ব্যাকরণের সূত্র ও প্রক্রিয়ার সংখ্যা যথাক্রমে ১২০৭ এবং ২০। মেদিনীপুর—মিরগোদা হইতে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণদাস মিশ্রের সংস্করণে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১৬৩০ এবং ৮। তুলনায় প্রমাণিত, সারস্বতের সূত্রাবলী অপেক্ষা সিদ্ধান্তচন্দ্রিকার সূত্রপাঠ অধিকতর সুস্থির। ইহার সূত্রাধিক্যের মূলে রহিয়াছে ব্যাকরণের পূর্ণাঙ্গতা সাধনের চেষ্টা। আবার সরলতার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। মূল সূত্রে আদৌ যাহা ইঙ্গিতে অতি সংক্ষেপে বলা হইয়াছিল, তাহা বোধগম্য করিবার জন্য কতকগুলি গুরুতর টীকা-টিপ্পনীর সৃষ্টি না করিয়া, সেই স্থলে দুই-একটি সহজ সূত্র জুড়িয়া দেওয়া অনেক বেশী সুবিধাজনক। এই ব্যাপারে অবশ্য পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সূত্রপাঠের কাঠামোতেও কিছু পরিবর্তন ঘটানো অপরিহার্য।

সূত্রাবলীর তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় সারস্বতের অধিকাংশ সূত্রই সিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় ধৃত এবং ক্বচিৎ কিছু সূত্র পরিবর্তিত। সারস্বতের এমন সূত্রও অনেক আছে যাহারা সিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় অনুপস্থিত। ৭০০ সূত্রের প্রাচীন কোনও ব্যাকরণের কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে, সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা পর্যন্ত ইহার ক্রমবর্ধমান অবস্থা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিবার মতো। ব্যাকরণের ইতিহাসে এইরূপ অবাধ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি দেখা যায় না।

সিদ্ধান্তচন্দ্রিকার উপর রচিত সদানন্দগণির 'সুবোধিনী' এবং লোকেশকরের 'তত্ত্বদীপিকা' টীকা। সিদ্ধান্তকৌমুদীর উপরে প্রণীত

যেমন জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর 'তত্ত্ববোধিনী,' সিদ্ধান্তচন্দ্রিকার তেমন সুবোধিনী। এই প্রসঙ্গে নবকিশোরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ

সিদ্ধান্তচন্দ্রিকাগ্রন্থে দ্বে টীকে স্তো মনোহরে।
একা সুবোধিনী নাম্না চাপরা তত্ত্বদীপিকা।।
সুবোধিন্যাং হি টীকায়াং পদার্থাঃ সন্তি ভূরিশঃ।
পরিভাষাদিভিঃ সম্যগ্ ভাষ্যোদাহরণানি চ।।
সিদ্ধান্তকৌমুদী-তত্ত্ববোধিনীমনুকৃত্য সা।
সদানন্দকৃতামূলং সাধ্বী টীকার্থগহ্বরা।।

এই সদানন্দ গণি ভক্তিবিনয়ের শিষ্য। খরতরগচ্ছীয় জৈন। ১৭৯৯ সংবতে (খ্রীঃ ১৭৪২) 'সুবোধিনী' রচিত হয়। ইহার অপর নাম 'সদানন্দী'। কৃদন্তপ্রক্রিয়ার সদানন্দী টীকার নাম 'কৃৎ প্রকাশিকা'। ইহার প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে ১৭৪১ সংবতে (খ্রীঃ ১৬৮৪) লোকেশকর 'তত্ত্বদীপিকা' ('দীপিকা বুধপ্রধীপ্রদীপিকা') রচনা করেন। ইহাই সিদ্ধান্তচন্দ্রিকার প্রথম টীকা। ইহার মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে খ্রীঃ ১৭শ শতকের মধ্যভাগে রামাশ্রম সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা প্রণয়ন করেন। লোকেশকর নিজেকে যে 'বিদ্যানগরস্থায়ী' বলিয়াছেন, তাহা দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর। তাঁহার পিতা ও পিতামহের নাম যথাক্রমে ক্ষেমঙ্কর ও শ্রীনাথ কর। জনৈক মথুরানাথও সিদ্ধান্তচন্দ্রিকার আর এক টীকা রচনা করেন।

আধুনিক যুগে রচিত 'সংক্ষিপ্তবালবোধিনী'—সিদ্ধান্তচন্দ্রিকার টীকা, রচয়িতা সদাশিব শাস্ত্রী। তিনি ইহার দ্বিরুক্তপ্রক্রিয়া পর্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন; বাকী অংশ রচনা করেন নবকিশোর ন্যায়পঞ্চানন। পুষ্পিকায় সদাশিব লিখিয়াছেন ঃ 'ইতি শ্রীকৌণ্ডিন্যকুলাবতংসব্যাকরণাচার্য্য–সাহিত্যোপাধ্যায়- জোশীত্যুপাহ্বদামোদরতনূদ্ভব-পণ্ডিত শ্রী-সদাশিবশাস্ত্রিকৃত সংক্ষিপ্ত বালবোধিনী টীকা...।' উত্তরভাগের রচয়িতা নবকিশোর ন্যায়পঞ্চাননই নবকিশোর শাস্ত্রী—যিনি একাধিক বার এই প্রবন্ধে উল্লিখিত। সারস্বতের তথা সিদ্ধান্তচন্দ্রিকার টীকা-টিপ্পনী রচনা করিয়া এবং নবীন ও প্রাচীন ব্যাখ্যা-টীকাসম্বলিত এই দুই ব্যাকরণ-গ্রন্থকে আধুনিক পদ্ধতিতে সম্পাদন-পূর্বক মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করিয়া এই যুগের সারস্বত সম্প্রদায়ে তিনি এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হইয়াছেন। বাসুদেব ভট্ট-রচিত 'প্রসাদ' নামক সারস্বতের অসম্পূর্ণ টীকারও পূর্ণতা দান করিয়াছেন তিনি। এই বাসুদেবের গুরুর নাম

চণ্ডীশ্বর। সিদ্ধান্তকৌমুদীর 'প্রৌঢ়মনোরমা' টীকার সহিত 'প্রসাদ' তুলিত হইবার যোগ্য। ন্যায়-ব্যাকরণে অসাধারণ পণ্ডিত বাসুদেব পাণিনীয় সূত্র-প্রমাণ দ্বারা সারস্বত সূত্রাবলীর সাধন-সৌকর্য যথারীতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নানা মতের নিরসনপূর্বক রচিত হওয়ায় 'প্রসাদ' অতি গম্ভীরার্থক হইয়াছে।

যাস্কবংশে নবকিশোর শাস্ত্রীর জন্ম। সাধারণ উপাধি করশর্মা। পিতার নাম চক্রধর। গুরু হরিহর শাস্ত্রী। পিতার নামানুসারে নবকিশোর 'সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা'র 'চক্রধরা' টিপ্পনী রচনা করেন। ইহার সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন ঃ

> ইয়ং হি টিপ্পনী সুবোধিনী-টীকায়া অপরা টীকেব সঞ্জাতা। যস্যাঃ কিল সাহায্যেন সুবোধিনীটীকা-পঠনপাঠনমনায়াসেন সম্পদ্যতে। অস্যাং হি টিপ্পন্যাং সংজ্ঞাপ্রকরণাদারভ্য স্ত্রীপ্রত্যয়প্রকরণপর্যন্তং পূর্বোত্তরপক্ষোদ্‌ঘাটনপূর্বকং সমাধানং প্রতিস্থলং সরলয়া সুরগিরা বর্ততে।

তিনি সারস্বতের যে টীকা প্রণয়ন করেন তাহার নাম 'মনোরমা'। এই টীকার প্রারম্ভে পিতা চক্রধরের সঙ্গে যে বিম্বাধরের উল্লেখ আছে তিনিও নবকিশোরের শিক্ষাগুরু। ইঁহার নিকট তিনি বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অর্থসহ অব্যয় সমূহের তালিকা, অকারাদিক্রমে উণাদ্যন্ত শব্দসমূহের কোষ এবং সারস্বতের এক লিঙ্গানুশাসনও নবকিশোর রচনা করিয়াছেন। এইসব সম্বন্ধেও তাঁহার উক্তি উল্লেখযোগ্য ঃ

> লিঙ্গানুশাসনং নাসীদ্ গ্রন্থেঽস্মিন্নতিবিস্তরম্।
> পাণিনীয়াদিসূত্রেণ টীকয়া পূরিতং ময়া।।
> প্রাচ্যপুস্তকমতান্তরগর্ভা পাঠভেদসহিতা সুগমাত্র।
> টিপ্পনীকথিতচক্রধরাখ্যা যোজিতা সকলবালহিতয়া।।
> যদত্র বিকলং চাসীৎ প্রক্রিয়ায়াং বিশেষতঃ।
> পাণিনীয়াদিপদ্ধত্যা পূরিতং তদ্ বিভাব্যতে।।
> এবমত্র নিহিতোঽর্থসনাথঃ প্রত্যয়েন সহ কোষ উণাদেঃ।
> মাতৃকাক্রমনিবন্ধনচারুর্বর্ততে বুধমুদে ভবতাং সঃ।।

'চক্রধরা' টিপ্পনী ছাড়া এই লিঙ্গানুশাসনের সূত্র এবং বৃত্তির অংশও নবকিশোরের রচনা। সূত্রসংখ্যা ১৬৬। পুষ্পিকায় লিখিত হইয়াছে ঃ

'ইতি শ্রীযাস্কবংশসম্ভূত শ্রীনবকিশোরকরবেদান্তশাস্ত্রিপ্রপূরিতা সূত্রবৃত্ত্যাত্মিকা লিঙ্গানুশাসন প্রক্রিয়া সমাপ্তিমগাৎ।' উণাদিকোষে শব্দের অর্থও দেখানো হইয়াছে ঃ 'উণাদিকোষবিজ্ঞানং ব্যুৎপত্ত্যর্থেন ভণ্যতে।' ইহার শেষে তাঁহার 'শাসনপুরুষোত্তমপুরবাস্তব্য' উক্তি হইতে জানা যায়, তিনি উড়িষ্যা প্রদেশের পুরী জেলার অধিবাসী। তিনি এবং সদাশিব উভয়েই খ্রীঃ ১৯শ/২০শ শতাব্দীয়। সিদ্ধান্তচন্দ্রিকার উণাদিপ্রকরণের 'ব্যুৎপত্তি-সার' নামক এক ব্যাখ্যার সন্ধান দিয়াছেন পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক (দ্রঃ সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রকা ইতিহাস, ১ম ভাগ, ২য় মুদ্রণ, পৃঃ ৫৭৬)।

মেদিনীপুর জেলার শিবপুর পরগণার চাটুলাগ্রামনিবাসী হরলাল মিশ্র সারস্বতের 'বালমনোরমা' টীকা রচনা করেন। ১৮৪৫ শকাব্দে 'মহাবিষুবসংক্রমে' (খ্রীঃ১৯২৪) ইহার রচনা সমাপ্ত হয়। তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন, মাতা ত্রিপুরা। টীকার শেষে রচয়িতার আত্মপ্রচার প্রকটিত। বগুড়া জেলার খানপুর গ্রামের অধিবাসী রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য 'আরেভে বিশদীকর্ত্তুং শ্রীসারস্বতভাষ্যকম্' বলিয়া যে পুস্তক রচনা শুরু করেন তাহার কারকপ্রকরণের প্রারম্ভে আবার এই উক্তিও দৃষ্ট হয় ঃ 'শ্রীসারস্বতসূত্রভাষ্যমমলং শ্রীরামনারায়ণশ্চক্রে চারুপদং স্বভাব-সুলভৈর্জ্ঞানৈর্বিদগ্ধপ্রিয়ম্।।' সুতরাং ইহাকে 'সারস্বত ভাষ্য' বলাই সমীচীন। ঐ জেলার রায়কালী শ্রীশ্রীগোপীনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বিপিনচন্দ্র বিদ্যানিধি এই গ্রন্থের কারকপ্রকরণের ভাষ্যের এক টিপ্পনী রচনা করিয়া ১৩২১ বঙ্গাব্দে (খ্রীঃ ১৯১৪/১৫) সটিপ্পন উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

সারস্বত ব্যাকরণেরও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আছে। কল্যাণসরস্বতীর 'লঘু সারস্বত' এই জাতীয় গ্রন্থ। দেবানন্দ সূরির 'সিদ্ধসারস্বত ব্যাকরণ' এবং বিদ্যাভূষণকৃত 'সারস্বতপ্রদীপ'ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এই শেষোক্ত গ্রন্থ পদ্যে রচিত। দেবানন্দ সূরি জৈনাচার্য। খ্রীঃ ১৩শ শতকের প্রারম্ভে রচিত তাঁহার ব্যাকরণ 'সারস্বত' নামাংশ ধারণ করিলেও ইহা প্রকৃত পক্ষে হৈম ব্যাকরণের ভিত্তিতে রচিত ; অনুভূতির সারস্বত ব্যাকরণের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই (দ্রঃ 'হেমচন্দ্র সূরি ও হৈম ব্যাকরণ' প্রবন্ধ)। বল্লভ বিট্‌ঠলেশ-কৃত 'সারস্বতসূত্রদীপিকা' সারস্বতসম্প্রদায়ের পুস্তক। মহীধর বা মহীদাস ভট্টের 'মহীভট্টী' বা 'মহীদাসভট্টী' বা 'মহীধরী'—সারস্বতের টীকা। মহীধরের পিতার নাম রামভক্ত এবং

গুরুর নাম রত্নেশ্বর। মহীধর খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীয় (১৫৩০-১৬১০?)। সারস্বতের সূত্রগুলিকে ৮অধ্যায়ে সাজাইয়া 'অষ্টাধ্যায়ী' রচনার প্রচেষ্টাও দেখা .যায়। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিজরাজ এই অষ্টাধ্যায়ীর ব্যাখ্যা রচনা করেন। সাগরেন্দুপদ্মের শিষ্য জিনেন্দু 'সিদ্ধান্তরত্নিকা' নামে যে 'শব্দানুশাসন' রচনা করেন তাহার প্রারম্ভিক শ্লোকে বলা হইয়াছে ঃ 'সরস্বত্যুক্ত সূত্রাণাং কুর্বে সিদ্ধান্তরত্নিকাম্।'

---

১ কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ হইতে প্রকাশিত (১৯৩১-৩৩) নবকিশোর শাস্ত্রি-সম্পাদিত 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা'র তৎকৃত ভূমিকা।

২ মেদিনীপুর (পোঃ মিরগোদা) চাটুলা সারস্বত .চতুষ্পাঠী হইতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সারস্বত ব্যাকরণের শ্রীকৃষ্ণদাস মিশ্র-সম্পাদিত সংস্করণ।

৩ ক্ষেমেন্দ্রকৃত 'নরেন্দ্রসারস্বতটিপ্পনী' এবং ক্ষেমেন্দ্র সূরিকৃত 'সারস্বতী প্রক্রিয়া' পুঁথিও আছে।

৪ কোথাও বা 'সারস্বত দীপিকা'—সত্যবোধ ভট্টাচার্যকৃতা এইরূপও দেখা যায়।

সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ

(খ্রীঃ ১২শ শতক)

এই ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য তিনজন—ক্রমদীশ্বর, জুমরনন্দী এবং গোয়ীচন্দ্র। ইঁহাদিগকে সংক্ষিপ্তসারের 'ত্রিমুনি' বলা চলে। ক্রমদীশ্বর এই ব্যাকরণের সূত্রকার, জুমরনন্দী ইহার পরিশোধিত 'রসবতী' বৃত্তির প্রণেতা এবং গোয়ীচন্দ্র সমগ্র ব্যাকরণের টীকাকার। ইঁহাদের আবির্ভাব-কাল এবং বাসস্থল বা জন্মভূমি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যায় নাই। কিংবদন্তী হইতে জানা যায়, প্রথম দুইজন সমকালীন।

শুনা যায়, শৈশবে মাতা-পিতৃহীন ক্রমদীশ্বর একদা কোনও ক্ষুদ্র নদীর তীরে একজন পথিক অধ্যাপকের নদীর গভীরতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন যে, যেখানে জলের স্রোত বেশী সেখানে গভীরতা কম। বালকের এইরূপ সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া সেই অধ্যাপক তাহাকে স্বগৃহে লইয়া যান এবং যথাবিধি শিক্ষাদানে কৃতবিদ্য করিয়া তোলেন। ছাত্রাবস্থায়ই ক্রমদীশ্বর সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ঈর্ষাপরবশ কোনও সতীর্থের হস্তে এই ব্যাকরণের কিয়দংশ এবং তাঁহার জীবন উভয়ই বিনষ্ট হয়। পরে রাজা জুমরনন্দীর সভাপণ্ডিতগণ ব্যাকরণের সম্পূর্ণতা সম্পাদন করেন। আবার কেহ বলেন, নূতন বলিয়া সংক্ষিপ্তসারের আদর না হওয়ায় ক্ষুব্ধ ক্রমদীশ্বর উহা রাজা জুমরনন্দীর দীঘির জলে ফেলিয়া দেন। বিদ্যানুরাগী রাজা স্বয়ং উহা দেখিতে পাইয়া জল হইতে তুলিয়া আনেন এবং পড়িয়া মুগ্ধ হন। জলে তদ্ধিতাংশের কিছুটা নষ্ট হওয়ায় রাজা ক্রমদীশ্বরকে তাহা পুনরায় লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলে তিনি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন বিদ্বান্ রাজা নিজেই সেই নষ্ট অংশ রচনা করিয়া পূর্ণ ব্যাকরণ প্রচার করেন। এই মতে ব্যাকরণের তদ্ধিত-পরিশিষ্ট জুমরনন্দীর রচনা।

এই জুমরনন্দী কে? তাঁহার 'রাজাধিরাজ' উপাধি দৃষ্ট হয়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বৃহদ্বঙ্গ' গ্রন্থে (পৃঃ ৩৬৯)

জুমরনন্দীকে মুর্শিদাবাদ-বাসী বলিয়াছেন। গোয়ীচন্দ্রের বর্ণনা হইতে জানা যায়, উমাপতি দত্ত প্রভৃতি গুণিজন ছিলেন জুমরের সভাজন। গোয়ীচন্দ্র জুমরকে 'উক্তানুক্ত দুরুক্তবিচারচারুচতুর' বলিয়াছেন ঃ

> তেষাঞ্চ লক্ষণানাং ব্যাসশীলাদি পরিশীলন- বিমলমতিরধিকৃতোমাপতি দত্তপ্রভৃতিসভাজনসভজনপর উক্তানুক্ত-দুরুক্ত-বিচারচারুচতুরো জুমরনন্দি-পরিশোধিতলক্ষণাং বৃত্তিং কৃতবান্।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ছাত্রগণ জুমরকে জুগী বা জোলা (তাঁতী) বলিয়া বিদ্রূপ করিতে অভ্যস্ত। তাঁহারা সংক্ষিপ্তসারের ক্লান্তিজনক সূত্রবাহুল্য ও রচনাপদ্ধতিতে কঠোর যুক্তিযুক্ততার অভাব লক্ষ্য করিয়া ইহার নিন্দাও করিয়া থাকেন। সে যাহাই হউক, জুমরনন্দী এই ব্যাকরণের একজন প্রামাণিক আচার্য এবং তাঁহারই নামানুসারে ইহাকে জৌমর ব্যাকরণ এবং সম্প্রদায়কে জৌমর সম্প্রদায়ও বলা হয়। 'জৌমর ধাতুমালা' এই ব্যাকরণের একখানা নামকরা বই। আবার তদ্দ্বারা পরিশোধিত 'রসবতী' বৃত্তিকেও বলা হয় জৌমর বৃত্তি।

ক্রমদীশ্বর স্বয়ং যে সূত্রানুগা বৃত্তি রচনা করেন তাহার নাম 'রসবতী' ছিল না। পরবর্তী গ্রন্থাদিতে তাহাকে 'পূর্ববৃত্তি' বলা হইয়াছে (দ্রঃ গোয়ীচন্দ্রের টীকা ৬।৩৭৯,৭।১৮১ ; অভিরাম—সন্ধিপাদ, সমাসপাদ ; ন্যায়পঞ্চানন—তিঙন্তপাদ, কৃদন্তপাদ)। বলা বাহুল্য, জুমরনন্দীর বৃত্তিকে পরবৃত্তি ধরিয়া ক্রমদীশ্বরের বৃত্তিকে 'পূর্ববৃত্তি' বলা হইয়াছে। যে কোনও কারণেই হউক, জুমরনন্দী ক্রমদীশ্বরকৃত সবৃত্তি সূত্রাবলীর বিশেষ সংশোধন এবং পরিবর্ধনাদির দ্বারা ইহাকে প্রায় নূতন রূপ দান করেন। পূর্বোদ্ধৃত গোয়ীচন্দ্রের উক্তিতেও ইহার সমর্থন রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উণাদিপাদের জৌমর বৃত্তির পুষ্পিকাও লক্ষণীয় ঃ 'ইতি সংক্ষিপ্তসারে রসবত্যাং বৃত্তৌ পণ্ডিতশ্রীক্রমদীশ্বরকৃতৌ মহারাজাধিরাজ শ্রীমজ্জুমর-নন্দি-পরিশোধিতায়াং কৃচ্ছেষোণাদিপাদঃ সমাপ্তঃ।' বৃত্তির 'রসবতী' নামের সহিত পূর্বোক্ত কিংবদন্তীর (জলসিক্ত ব্যাকরণের উদ্ধার ইত্যাদির) কিছু সম্পর্ক থাকিতেও বা পারে। এই 'রসবতী' নামের ভিত্তিতেই আবার এই জৌমর সম্প্রদায়কে 'রাসবত' অভিধাও দেওয়া হয় এবং জুমরকে বলা হয় 'রসবজ্জুমর'। খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীয় কবিকণ্ঠহার তৎকৃত 'চর্করীতরহস্যে' একাধিকবার যে 'রসবদ্ ব্যাকরণে'র উল্লেখ করিয়াছেন তদ্দ্বারা এই জৌমর ব্যাকরণই উপলক্ষিত।

জৌমরবৃত্তিও কালক্রমে একাধিক স্থলে বিকৃত হইয়া পড়িলে উহার সমুদ্ধারের জন্য ('তস্যাশ্চ ক্বাপি ক্বাপি সময়বশব্যাকুলপাঠ-সমুদ্ধরণায় চ'—গোয়ীচন্দ্র) গোয়ীচন্দ্রকে টীকা রচনা করিতে হয়।

খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীয় কৈয়ট (২।৫১২,৬।৪১), মৈত্রেয়রক্ষিত (২।২৮২, ৭৯৫, ৭।১৫৯,১৮১) এবং ইন্দুমিত্রের 'অনুন্যাসে'র (৫।১০ এই সব সংখ্যাই জৌমর বৃত্তিসূচক) উল্লেখ করায় জুমরনন্দী ইঁহাদের পরবর্তী এবং সম্ভবতঃ খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীয় বোপদেবের পূর্ববর্তী, কারণ সংক্ষিপ্তসারের তিঙন্তপাদের ২৯৯ সূত্রের বৃত্তিতে যে 'ঔজঢ়ৎ' এবং 'ঔজিঢ়ৎ' পদ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা বোপদেব-সম্মত নয়। এই প্রসঙ্গে মুগ্ধবোধব্যাকরণের ৮৫৬ সংখ্যক সূত্রের বৃত্তিভাগে তিনি লিখিয়াছেন ঃ 'ঔড়িঢ়ৎ। ঔজিঢ়দিত্যেকে।' জুমরনন্দী বোপদেবের 'ঔড়িঢ়ৎ' পদের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না ; থাকিলে এই সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু বলিতেন। অবশ্য ইহা হইতেই সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় না যে তিনি বোপদেবের পূর্বগ। তথাপি আনুমানিক খ্রীঃ ১২শ-১৩শ শতকের মধ্যবর্তীকালে তাঁহার জীবদ্দশা নির্দিষ্ট করা গেল (আপাতত)। জৌমরবৃত্তি ততটা ব্যাখ্যামূলক নয় যতটা উদাহরণাত্মক ; বিখ্যাত কাব্য, শব্দকোষ এবং ব্যাকরণাদি হইতে এই সব উদাহরণ গৃহীত হইয়াছে।

(২)

সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত কিংবদন্তী এবং দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই গুরুপদ হালদার তাঁহার 'ব্যাকরণ-দর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থে (পৃঃ ৪৫৫) ক্রমদীশ্বরকে 'বঙ্গীয়' বলিয়াছেন ঃ

> ক্রমদীশ্বরবিপ্রেণ বঙ্গীয়েন ততঃপরম্।
> সংক্ষিপ্তসারনাম্না তু মহদ্ ব্যাকরণং কৃতম্।।

'ততঃপরম্' অর্থাৎ খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীয় ভোজদেবের 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' নামক ব্যাকরণ রচনার পর। হালদার মহাশয়ের বর্ণনার ক্রম-অনুসারে (পরবর্তী শ্লোকে) হৈম ব্যাকরণ সংক্ষিপ্তসারের পরবর্তী। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমপ্রান্তে এই দুই ব্যাকরণ প্রায় একই সময়ে (খ্রীঃ ১২শ শতক) রচিত ধরিয়া লইলে খুব অসমীচীন হইবে না বোধহয়।

সংক্ষিপ্তসারের শেষে ক্রমদীশ্বরের পরিচয় জ্ঞাপক এই যে শ্লোকটি পাওয়া যায় ইহা সম্ভবতঃ তাঁহারই রচনা ঃ

বিদ্যাতপোঽর্থিবাদীন্দ্রঃ পূর্বগ্রামি-দ্বিজঃ কবিঃ।
চক্রপাণিসুতো জ্যায়ান্ নপ্তাসৌ শ্রীপতেঃ কৃতী।।

এই শ্লোকানুসারে ক্রমদীশ্বরের পিতার নাম চক্রপাণি, পিতামহ শ্রীপতি ; তিনি পূর্বগ্রামবাসী, দ্বিজ এবং কবি, বাদীন্দ্র তাঁহার উপাধি। তাঁহার 'বাদীন্দ্রচক্রচূড়ামণি' এই নাতিদীর্ঘ উপাধিই প্রায় সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি কবি, কৃতী, বাদীন্দ্র বা তার্কিক-শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত, তিনি ছাত্রাবস্থায়ই নিহত হইয়াছিলেন—এই কিংবদন্তী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে তিনি (ক্রমদীশ্বর) শৈবদের নিকট ঐ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী নাগাদ মধ্য ভারতে অভ্যুদিত (শৈব) পাশুপত সম্প্রদায়ের জন্য সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ রচিত হয়। ঐ সময়ে শৈবগণ সাধারণের কথ্য ভাষাতেই ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন বলিয়া ক্রমদীশ্বর তাঁহার ব্যাকরণশেষে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণও যোজনা করিয়া দেন। শাস্ত্রিমহাশয়ের অভিপ্রায়—ক্রমদীশ্বর খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীয়। প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণযোজনা—সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। হৈম ব্যাকরণ ব্যতীত অন্য কোন সংস্কৃত ব্যাকরণে এইরূপ করা হয় নাই। ক্রমদীশ্বর স্বীয় ব্যাকরণের প্রারম্ভিক নমস্কার-শ্লোকেই সর্বভাষার ব্যাকরণ রচনার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

শিবং প্রণম্য সর্বেশং সর্বভাষাসু লক্ষণম্।
সংক্ষিপ্তসারমাচষ্টে পণ্ডিতঃ ক্রমদীশ্বরঃ।।

ইহার টীকায় গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ

সর্বভাষাসু সংস্কৃত-প্রাকৃত পৈশাচ্যাদিষু সংক্ষিপ্তসারং লক্ষণং ক্রমদীশ্বরনামা পণ্ডিত আচষ্টে ব্রবীতি ইতি শ্লোকার্থঃ। ...ভাষাগ্রহণেন ছান্দসলক্ষণ-পরিত্যাগশ্চ সূচিতঃ।

ছাত্রাবস্থায় ব্যাকরণরচনার পূর্বোক্ত কিংবদন্তীর সঙ্গে শ্লোকোক্ত 'পণ্ডিত' শব্দ ব্যবহারের বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়। কোনও ছাত্রের পক্ষে গ্রন্থরচনা করিতে বসিয়াও নিজেকে 'পণ্ডিত' বলিয়া 'জাহির' করা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

'পূর্বগ্রামী'-বিশেষণের প্রয়োগ হইতে তিনি পূর্বগ্রামবাসী ছিলেন—এইরূপই বুঝা যায় সহজ অর্থে। সম্ভবতঃ বঙ্গদেশেরই কোনও গ্রামের প্রাচীন নাম 'পূর্বগ্রাম'। আবার 'ক্রমদীশ্বর' নামটিও লক্ষণীয়। সচরাচর এই নাম দৃষ্ট হয় না। তন্ত্রমতে ৫১পীঠের অন্যতম জয়ন্তীতে দেবী—ঁজয়ন্তী, ভৈরব—ক্রমদীশ্বর। এই ঁজয়ন্তীপীঠের অবস্থান লইয়া মতভেদ আছে। এক মতে ইহা শ্রীহট্টের জয়ন্তী পরগণার অন্তর্গত 'কালযোড় বাউর ভোগ' নামক স্থানের পীঠ। অন্য মতে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার অন্তর্গত এবং দামোদর নদের পশ্চিমতীরস্থ জয়ন্তী গ্রামেই এই পীঠস্থান। 'মেলাই চণ্ডী' এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বর্তমানে এই ঁদেবী দামোদরের পূর্বতীরে আমতাগ্রামে স্থানান্তরিতা হইয়া পূজা পাইতেছেন। অধুনালুপ্ত মার্টিন রেলওয়ের আমতা স্টেশনের দক্ষিণ দিকে ঁদেবী-মন্দিরের অগ্নিকোণে-স্থিত 'ক্রমদীশ্বর' নামক অনাদি শিবলিঙ্গকে পীঠস্থানের ভৈরব বলা হয়। এই আমতা গ্রামই কি প্রাচীন 'পূর্বগ্রাম'? এবং এই ক্রমদীশ্বর শিবের সহিত বৈয়াকরণ ক্রমদীশ্বরের নাম-সাদৃশ্যের মূলে, পূজা-প্রার্থনা-কৃপা ঘটিত কোনও দৈব যোগ—যাহা মহাপুরুষদের জন্মের ক্ষেত্রে প্রায়শঃ শুনা যায়—ছিল কিনা কে জানে!

'Indian Culture' (Vol. V., No. 4, April 1939, pp. 357-61) পত্রে নলিনীনাথ দাশগুপ্তের লেখা 'Kramadisvara and his school of Grammar' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি এই পূর্বগ্রাম-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন ঃ

> According to certain lexicographer, as we are told, Kramadisvara was a resident of Radha (West Bengal), and we have now positive epigraphical evidence that Purvagrama was a village in Daksina-Radha (South Radha). Purvagrama is celebrated in the Malakapuram Stone Pillar inscription (1262 A.D.) of the time of the Kaktiya queen, Rudradevi, as the native place of the distinguished Saiva pontiff, Visvesvara Sambhu, and is described as to have been situated in the Radha division of Gauda, as also in Daksina-Radha in Gauda.—p. 358.

অর্থাৎ 'পূর্বগ্রাম' যে দক্ষিণ-রাঢ়ের একটি গ্রামের নাম, তাহার পক্ষে উৎকীর্ণ লিপির সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে। কাকতীয়রাণী রুদ্রদেবীর সময়কার মলকাপুরম্ শিলাস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপিতে (খ্রীঃ ১২৬২) পূর্বগ্রামকে বিখ্যাত শৈবাচার্য বিশ্বেশ্বর শম্ভুর জন্মস্থান বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। সেখানে ইহাকে গৌড়ের রাঢ়-অঞ্চলে তথা দক্ষিণরাঢ়ে অবস্থিত বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 'পূর্বগ্রাম'কে বঙ্গীয় রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ৫৬ 'গাঞি'র অন্যতম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা 'বন্দ্যঘটীয়', 'কাঞ্জিবিল্বীয়' এবং এই ধরনের অন্যান্য পদের মতো জন্মকুল-বাচক, জন্মস্থানবাচক নয় এবং এই বংশে জাত ব্যক্তিগণ—যাঁহারা 'পূর্বগ্রামী' বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন—বঙ্গদেশের সর্বত্র ছড়াইয়া আছেন (দ্রঃ 'Indian Culture'—Vol., VI., No. 4, April 1940, p. 474)।

সংক্ষিপ্তসারেরই টীকাকার ন্যায়পঞ্চানন ছিলেন এই ধারার লোক। তাঁহার পিতা নারায়ণ বিদ্যাবিনোদ অমরকোষের 'শব্দার্থ সন্দীপিকা' টীকার এবং সংক্ষিপ্তসারের প্রাকৃতপাদের টীকার প্রারম্ভে নিজপরিচয় জ্ঞাপক শ্লোকে স্বীয় জ্যেষ্ঠ-পিতামহ সুমেরুকে 'পূর্বগ্রামিকুলে কলানিধিনিভশ্ছত্রী' বলিয়াছেন। ন্যায়পঞ্চানন-কৃত 'গণপ্রকাশে'র পুষ্পিকায় লিখিত আছে : 'ইতিপূর্বগ্রামিকুলকলানিধিমহামহোপাধ্যায়-বিদ্যা-বিনোদাত্মজ শ্রীমদাচার্যপঞ্চাননকৃতো গণপ্রকাশশ্চ সম্পূর্ণঃ।'

পূর্বোক্ত গাঞি (= গাঁই) সংস্কৃত গ্রামিন্ শব্দের অপভ্রংশ। প্রাচীন কুলাচার্য হরিমিশ্রের মতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ৫৬ গাঞির অন্যতম ২৫সংখ্যক গাঞি হইতেছে পূর্বগাঞি (= পূর্বগ্রামিন্)। আবার তৎপরবর্তী কুলাচার্য বাচস্পতি মিশ্রের মতে রাঢ়ীয়দের ৫৭গাঞি-র মধ্যে ৫৫নং গাঞি ঐ পূর্বগাঞি বলিয়া গ্রহণীয়। ইহা কুলপতি ছান্দরের বংশ [দ্রঃ 'বিশ্বকোষ' (৫ম ভাগ, ১৩০১ সাল) গাঁই বা গাঞি শব্দ]। নৃপতি আদিশূরের (ইঁহার ঐতিহাসিকত্ব নিঃসন্দিগ্ধ নয়) সময়ে এবং পরে কনৌজ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে আসিয়া যে যে গ্রামে বাস করেন, ক্রমে সেই সেই গ্রামের নামেই তাঁহাদের কুল-পরিচায়ক গাঞি বা গাঁই-র সৃষ্টি হয়। শুনা যায় খ্রীঃ ১১শ শতকের মধ্যভাগে এতদ্দেশে তাঁহাদের আগমন ঘটে। সেই মতে খ্রীঃ ১২শ

শতাব্দীয় ক্রমদীশ্বরকে খাস পূর্বগ্রামেরই অধিবাসী বলিয়া সাব্যস্ত করিলে বোধ হয় খুব অযৌক্তিক হয় না এবং সম্ভবতঃ দামোদর নদের পূর্বতীরবর্তী আমতা বা উহার কাছাকাছি কোনও অঞ্চলই সেই সময় পূর্বগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

(৩)

'সংক্ষিপ্তসার' নামটি শুনিলেই মনে হয় যেন ইহা অন্য কোনও বৃহত্তর গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার-গ্রহণ বা সারসংগ্রহ জাতীয় রচনা। কিন্তু আসলে তাহা নয়। ইহার সূত্রসংখ্যা (পরিশিষ্টাদি সহ) মোট ৪৬৯৯। ইহার সহিত প্রাকৃতপাদের ৪৭৪ (৪৮৫?) সূত্র যোগ করিলে সমগ্র ব্যাকরণের সূত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৫১৭৩। ইহার পরে আছে ছন্দঃ প্রকরণ এবং ৫০½টি শ্লোকে গাঁথা অলঙ্কারপ্রকরণ। মোট ৮পাদে ঐ সূত্রগুলিকে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। এক একটি পাদে এক একটি বিষয় ঃ ১। সন্ধি, ২। তিঙন্ত, ৩। কৃদন্ত, ৪। তদ্ধিত, ৫। কারক, ৬। সুবন্ত, ৭। সমাস এবং ৮। প্রাকৃতপাদ। উণাদি এবং অব্যয় কৃদন্তপাদের শেষে এবং তদ্ধিতপরিশিষ্ট তদ্ধিতপাদের শেষে যুক্ত করা হইয়াছে। সন্ধির পরেই শব্দরূপাত্মক সুবন্তপাদের ব্যবস্থা না করিয়া ঐ স্থলে ধাতুরূপাত্মক তিঙন্ত ও কৃদন্তপাদের সমাবেশ, অন্য ব্যাকরণের তুলনায় বিলক্ষণ। ইহা লক্ষ্য করিয়া গোয়ীচন্দ্র তাঁহার টীকায় এই ব্যবস্থাপনার পক্ষে যুক্তিপ্রদর্শন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন ঃ

> নমস্কারাদ্যনন্তরং সর্বভাষাপ্রধানত্বাৎ প্রথমং সপ্তভিঃ পাদৈঃ সংস্কৃতভাষালক্ষণানি প্রক্রমমাণঃ, সকলবিষয়ব্যাপকত্বাৎ সন্ধি-কার্যাণাং তদ্বিধানায় প্রথমং সন্ধিপাদমারব্ধবান্। তদনন্তরং ধাতুমূলকত্বাৎ সকলপদানাং তদধিকারবিহিতানাং তিঙাদীনাং কৃতাঞ্চ বিধানায় দ্বিতীয়-তৃতীয়ৌ তিঙ্‌কৃৎপাদৌ। তদনন্তরং 'নাম চ ধাতু-জমাহ নিরুক্তে ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্। যন্ন পদার্থ-বিশেষসমুত্থং প্রত্যয়তঃ প্রকৃতেশ্চ তদূহ্যম্।।' ইতি ন্যায়েন ধাতোঃ কৃন্নিষ্পন্নমেব নামেতি মতমাশ্রিত্য নামাধিকারবিহিতানাং তদ্ধিতানাং বিধানায় চতুর্থং তদ্ধিতপাদম্। তস্মাদেব নাম্নো বিহিত কর্ত্রাদিসংজ্ঞাৎ উক্তত্বাদনুক্তত্বাচ্চ স্বাদীনাং বিধানায় পঞ্চমং কারকপাদম্। নাম্নঃ সুপি বিহিতে বিশেষবিধানায় ষষ্ঠং সুবন্তপাদম্। সুবন্তানাঞ্চ সমাসাশ্রয়কার্যাদিবিধানায় সপ্তমং সমাসপাদমিতি।

সংস্কৃতভাষালক্ষণানি সমাপ্যাষ্টমেন পাদেন প্রাকৃতাদিভাষালক্ষণানি বিরচিতবান্।

সংস্কৃত পক্ষীয় প্রথম ৭টি বিষয়কে সন্ধি, প্রকৃতি, প্রত্যয়, শব্দ তথা পদ ও সমাস—ইত্যাদিক্রমে মূলতঃ পদসাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপন্যস্ত করা হইয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই ব্যাপারে বাক্যপদীয়ের কাণ্ডবিভাগের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন।[১] গোয়ীচন্দ্রের পূর্বোদ্ধৃত মতে সর্বত্র সন্ধিকার্যের ব্যাপকতা হেতু ব্যাকরণের প্রথমেই সন্ধি বর্ণিত হইয়াছে। পরের দুই পাদে ধাতুবিষয়ক বর্ণনার মূলে রহিয়াছে শব্দবিদ্যায় ধাতুর প্রাধান্য প্রদর্শন। প্রাচীন শাকটায়নের মতে সমস্ত শব্দই ধাতুজ। ধাতুই শব্দের মূলপ্রকৃতি। তাই ধাতুর প্রাধান্য সর্ববাদিসম্মত। ইহার পর শব্দাধিকারে প্রত্যয় ও বিভক্তি-আদির বর্ণনায় তদ্ধিত, কারক ও সুবন্তের অবতারণা এবং এইভাবে শেষে পদাধিকারে সমাসের প্রদর্শনী। প্রথমে সন্ধিকার্যের ব্যবস্থাপনার দ্বারা এই ব্যাকরণে বিশ্লেষণী ক্রিয়ার সূচনা করা হইলেও ক্রমে ধাতুপ্রত্যয় সমন্বিত শব্দে এবং পরে শব্দের সহিত কারক-বিভক্তি যোগে পদে পৌঁছিবার সংশ্লেষণী বৃত্তিই সমধিক বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। বিষয়ের স্বভাব-সুন্দর বিন্যাসই বটে।

কোনো এক বৃহত্তর ব্যাকরণগ্রন্থের নয়, পরন্তু পূর্ববর্তী সমস্ত ব্যাকরণসাহিত্যের সারোপাদান-সংগ্রহের ভিত্তিতে এই ব্যাকরণের রূপায়ণ। গোয়ীচন্দ্র সংক্ষিপ্তের অর্থ করিয়াছেন সংগৃহীত ঃ 'শাস্ত্রান্তরেষু সৎস্বপি...সংক্ষিপ্তঃ সংগৃহীতঃ সারো যত্র তৎ সংক্ষিপ্তসারম্।' তাঁহার মতে এই ব্যাকরণরচনায় ক্রমদীশ্বর সূত্র সমূহের বর্ণঘটিত লাঘব পরিহার করিয়া বৃত্তিঘটিত লাঘবের অনুসরণ করিয়াছেন ; এই কারণেই এই ব্যাকরণে সূত্রবাহুল্য এবং বৃত্তিভাগের সংক্ষিপ্ততা। এখানে অবশ্য স্পষ্টতই তিনি ক্রমদীশ্বর-কর্তৃক ব্যাখ্যা রচনার কথা স্বীকার করিয়াছেন ঃ 'অতএবাচার্যেণ বর্ণকৃতলাঘবমনঙ্গীকৃত্য ব্যাখ্যাকৃতলাঘবমেবাঙ্গীকৃতম্।' মূলতঃ পাণিনি-প্রভাবিত হইলেও সংক্ষিপ্তসারের কাঠামো রচনায় এবং উদাহরণাদির প্রয়োগে ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়, মহাভাষ্যটীকা এবং ভট্টি-কাব্যের প্রভাব প্রচুর। কাতন্ত্র (১।১০৬, ১৯৬, ২।৬২৬ সংক্ষিপ্ত-সারে), চান্দ্র (১।৩৪২, ৭।২১২ঐ), ভাগবৃত্তি (৫।১০১, ৭।৪৩৬), বামন (৭।১৬৫), ক্ষপণক (৭।৪০৭),অনুপদকার (১।২১৫), ভারবি

(২।১৬৩) স্পষ্টতঃই উল্লিখিত হইয়াছেন। বৃত্তিতে সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ব্যাকরণ-সিদ্ধাসিদ্ধ বিভিন্ন প্রয়োগের বিচার-বিবেচনায় জুমরনন্দীর 'কারুকার্য' অনুমিত। এই ব্যাকরণ সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (সভাপতির অভিভাষণে) প্রাসঙ্গিক কিছু স্পষ্টোক্তি ঃ

> যেখানে যেখানে চন্দ্র ও পাণিনি দুই রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে সেখানে তিনি (অর্থাৎ ক্রমদীশ্বর) আপন সূত্রে বিকল্প শব্দ যোজনা করিয়াছেন। যেখানে যেখানে পাণিনি সূত্রে পাতঞ্জল ভাষ্য ও বৌদ্ধ বৃত্তি দুই রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে তিনি প্রায়ই বিকল্প বিধান করিয়াছেন ; অথবা বৌদ্ধ মত পরিত্যাগ করিয়া ভাষ্যের মত প্রবল করিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি পাণিনির সংক্ষিপ্তসার ; কিন্তু তিনি বাস্তবিক সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের সংক্ষিপ্তসার। চান্দ্রের প্রতি তিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন, কাতন্ত্রের প্রতিও তিনি সেই ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ সংক্ষিপ্তসারে চান্দ্রের ও কাতন্ত্রের যাহা কিছু ভাল, সব লওয়া হইয়াছে। তাই চান্দ্র ভারতে একেবারে লোপ পাইয়াছে আর কাতন্ত্র কাশ্মীর ও পূর্ব্ববঙ্গে লুকাইয়া আছে। ...সংক্ষিপ্তসারের প্রভাবে চান্দ্র, কাতন্ত্র, রভস (বৌদ্ধ রভসনন্দীর ব্যাকরণ-কারিকা), চাঙ্গু (চাঙ্গু দাস নামক জনৈক বৌদ্ধ কায়স্থের ব্যাকরণ যাহা বর্তমানে লুপ্ত কিন্তু তাঁহার কতকগুলি কারিকা এখনও উড়িষ্যায় পঠিত হয়) লোপ পাইয়াছেন।
>
> —সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৬, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৭-৮

(৪)

সাংক্ষিপ্তসারকদের তৃতীয় প্রামাণিক আচার্য গোয়ীচন্দ্র। তাঁহার নামের পূর্বে 'ঔত্থাসনিক' বিশেষণ দৃষ্ট হয়। উত্থাসন শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি। অভিরাম বিদ্যালঙ্কারের 'কৌমুদী'টীকার শেষে লিখিত আছে ঃ 'উত্থস্য উত্থিতস্য রাজ্ঞঃ আসনমর্হতীতি ঔত্থাসনিকঃ।' ইহার তাৎপর্য এই যে, গোয়ীচন্দ্র যখনই রাজসভায় যাইতেন তখনই রাজা সিংহাসন হইতে উঠিয়া স্বয়ং তাঁহার জন্য আসনের ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিতেন। রাজপুতনায় এখনও নাকি এই প্রথা চালু আছে, তবে ইহার নাম পরিবর্তিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—'তাজিমি ওমরহ্'।

গোয়ীচন্দ্র সম্ভবতঃ বোপদেবের পূর্ববর্তী অথবা সমকালীন। তিনিও বোপদেবের 'ঔড়িঢ়ৎ'পদের বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। প্রাকৃতপাদসহ সমগ্র ব্যাকরণের উপরেই তিনি টীকা রচনা করিলেও[২] প্রাকৃতাংশের টীকা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনি নিজেই তাঁহার টীকার স্বরূপ বর্ণনায় লিখিয়াছেন ঃ 'প্রতিলক্ষণ-বিহিতবিবরণা টীকা।' তাঁহার রচনা পর্যালোচনা করিলে, তিনি যে একজন দক্ষ নৈয়ায়িক ছিলেন, তাহা প্রতীয়মান হয়। তিনি উড়িষ্যাতে গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রিমহাশয় অনুমান করিয়াছেন। পূর্বোদ্ধৃত সভাপতির অভিভাষণে তিনি সংক্ষিপ্তসারের যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা মূলতঃ গোয়ীচন্দ্রের টীকা হইতে গৃহীত। মুগ্ধবোধে রামচন্দ্র তর্কবাগীশের যে স্থান, সংক্ষিপ্তসারে গোয়ীচন্দ্রের স্থান প্রায় সেইরূপ। সংক্ষিপ্তসারের পরিশিষ্টভাগের সহিতও তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। তদ্ধিত-পরিশিষ্টের প্রথমে তাঁহার এই উক্তি লক্ষণীয় ঃ 'শ্রীমজ্জুমরনন্দিপরিশোধিতবৃত্তিভাগাৎ পরিশিষ্টমস্তি যৎ কিঞ্চিৎ তৎ সম্পূর্ণং কুরুতে গোয়ীচন্দ্রঃ প্রকীর্ণয়া বৃত্ত্যা'—অর্থাৎ জুমরনন্দী রসবতী বৃত্তির পরিশোধনদ্বারা যে পরিশিষ্ট-ভাগের সূচনা করিয়া যান, গোয়ীচন্দ্র তাহাকেই সবৃত্তি সম্পূর্ণতা দান করেন। তবে কোন্ অংশ কাহার রচনা তাহা এখন আর বুঝিবার উপায় নাই। তাহা ভিন্ন, উপরিলিখিত গোয়ীচন্দ্রের উক্তির তাৎপর্য সম্বন্ধেও মতভেদের অবকাশ আছে। পুষ্পিকায় অবশ্য লিখিত আছে ঃ ইত্যৌত্থাসনিক শ্রীগোয়ীচন্দ্রবিরচিতং জুমরনন্দিপরিশোধিতবৃত্তৌ যৎ কিঞ্চিৎ পরিশিষ্টং তদ্ধিতপাদস্য সমাপ্তম্।' ইহা অবশ্য পূর্বের উক্তিরই প্রতিধ্বনি। কৃচ্ছেষোণাদিপাদের ৫৪৩-৭৬৪ পর্যন্ত ২২২টি সূত্র, কৃচ্ছেষাব্যয়পাদের ৭৬৫-৮২৪ পর্যন্ত ৬০টি সূত্র এবং তদ্ধিতপরিশিষ্টের ৯০২-১৪৫৮ পর্যন্ত ৫৫৭টি সূত্রের ও তাহাদের বৃত্তিপ্রভৃতির কর্তৃত্ব বিষয়ে বেশ কিছু রহস্য বর্তমান। গোয়ীচন্দ্র এই ব্যাকরণের ১২৭টি পরিভাষাও সংগ্রহ করেন।

(৫)

গোয়ীচন্দ্রের সঙ্গেই সংক্ষিপ্তসারের মৌলিকরচনার ধারা বিলুপ্ত হয়। পরবর্তী গ্রন্থকারগণ প্রায়শঃ তাঁহার টীকার উপরে টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতি রচনা করিয়া এই সম্প্রদায়ের পুস্তক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই বঙ্গীয় বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গীয়। ইঁহাদের মধ্যে

সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য—ন্যায়পঞ্চানন। তাঁহার প্রকৃত নাম জানা যায় নাই। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২৪-৯১) এই নামের প্রসঙ্গে যথার্থই বলিয়াছেন—'...lost under the glory of his title'[৩] অর্থাৎ উপাধির গৌরবে তাঁহার নাম চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। পঞ্চাননের আংশিক পরিচয় আগেই দেওয়া হইয়াছে। বাৎস্য গোত্র। বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবংশে জন্ম। পিতা নারায়ণ বিদ্যাবিনোদ অমরকোষ এবং প্রাকৃতপাদের টীকা ব্যতীত ভট্টিকাব্যেরও 'ভট্টিবোধিনী' টীকা রচনা করেন, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ-মতের পরিপ্রেক্ষিতে। ন্যায়পঞ্চাননের টীকার নাম 'ব্যাকরণদীপিকা' বা 'ব্যাকারদীপিকা'।[৪] ইহা প্রাকৃতপাদসহ (?) সমগ্র সংক্ষিপ্তসারের উপর রচিত। জুমরবৃত্তি এবং গোয়ীচন্দ্রের টীকাই প্রধান উপজীব্য—'নিরবোচমতঃ প্রযত্নতঃ পরিসংগৃহ্য চ বৃত্তিটীকয়োঃ'—ন্যায়-পঞ্চানন। 'গণপ্রকাশ' নামেও তাঁহার আর এক গ্রন্থ ধাতুবিষয়ক, সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত জৌমর ধাতুমালার (বা জৌমরগণের) উপর রচিত। তাঁহার টীকায় এই মূলগ্রন্থের আভাস পাওয়া যায় ঃ 'যদ্যপি গণকারেণ ঋসৃগতাবিত্যস্য ছান্দসত্বমুক্তং, কিন্তু তৎসূত্রকারস্য ন সম্মতম্' (২। ৩৪০) এবং 'জুমরপরিশোধিত ধাতৌ চ দাহার্থঃ শ্লিষ্ সেঙ্ প্রকরণে পঠিতঃ' (২।৭০৪)। গণপ্রকাশের প্রারম্ভে লিখিত আছে ঃ

> গণপ্রকাশঃ ক্রিয়তে ন্যায়পঞ্চাননেন চ।।
> দৃষ্ট্বোপাধ্যায়-সর্বস্বং ধাতুপারায়ণাদিকম্।
> অসন্দেহায় সাধ্যন্তে প্রকৃতি-প্রত্যয়ৈর্গণাঃ।।
> শাস্ত্রান্তরেষ্বদৃষ্টা যে তেঽপি সাধ্যাঃ প্রযত্নতঃ।
> বৃত্তিপাঠানুরোধেন টীকাব্যাখ্যানতস্তথা।।

গ্রন্থের সর্বশেষ শ্লোকে যে দম্ভোক্তি ব্যক্ত হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয়, ইহা অন্য কাহারও রচনা ঃ

> একঃ পঞ্চাননঃ শ্রীমান্ পণ্ডিতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে।
> নাস্তি কশ্চিত্তদন্যোঽপি জুমরামরভট্টিনি।।

অর্থাৎ পৃথিবীতে এক পঞ্চাননই শ্রীমান্ পণ্ডিত ; জৌমরব্যাকরণে, অমরকোষে এবং ভট্টিকাব্যে তদপেক্ষা বড় পণ্ডিত নাই। ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে[৫] রচিত কাতন্ত্রীয় ধাতুবৃত্তি 'মনোরমা' হইতে কারকপাদের টীকায় উদ্ধৃত করায় তিনি খ্রীঃ ১৬শ/১৭শ শতাব্দীয় বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন।

খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বংশীবদন কবিচন্দ্র উক্ত 'ব্যাকার-দীপিকা'র এক টিপ্পনী রচনা করেন, ইহার নাম 'ব্যাকরণাদর্শ'। কবিচন্দ্র তাঁহার উপাধি। পিতার নাম বশিষ্ঠ, মাতা রায়মতি। হরপ্রসাদশাস্ত্রীর মতে বংশীবদন ন্যায়পঞ্চাননের ছাত্র। কিন্তু দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই অভিমত ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন ('Indian Culture', Vol. VI, NO. 4, p. 475)। বংশীবদনের এই টিপ্পনীতে স্থানে স্থানে'ইতি প্রসিদ্ধাঃ' বলিয়া ন্যায়পঞ্চাননের উক্তির সমালোচনাও করা হইয়াছে। 'ব্যাকারসারলহরী' নামে আর এক গ্রন্থও তিনি প্রস্তুত করেন। ইহাতে সংক্ষিপ্তসারের বিশেষ প্রয়োজনীয় সূত্রগুলি উপনিবদ্ধ করিয়া ব্যাকরণের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহার পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে কবিচন্দ্র বৈদ্য ছিলেন ঃ 'ইতি বৈদ্যশ্রীকবিচন্দ্র-বিরচিতায়াং সারলহর্য্যাং...।' আবার 'ব্যাকরণাদর্শে'র শেষে তাঁহার শর্মা (শর্মন্) উপাধিও দৃষ্ট হয়ঃ 'কৃতা শ্রীকবিচন্দ্রেণ বংশীবদনশর্মণা।।' আমরা আরও দুইজন কবিচন্দ্রের সন্ধান পাইয়াছি। একজন ১৪১১ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৪৮৯) দশটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ধাতু (ভূ, স্থা, গম্, দৃশ্, হন্, দা, কৃ, জ্ঞা, গ্রহ্ ও চিন্ত্) অবলম্বনে 'ধাতুসাধন' পুস্তক রচনা করেন। আর একজন মাধবদাস কবিচন্দ্র বা কবীন্দ্র; তিনি খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীয় ও বৈদ্য। তাঁহার পুত্র ত্রিলোচন দাস 'কাতন্ত্রোত্তর পরিশিষ্ট' রচনা করেন এবং পৌত্র কবিকণ্ঠহার রচনা করেন কাতন্ত্রে 'চর্করীতরহস্য'।

বংশীবদনের ছাত্র গোপাল চক্রবর্তী 'সারার্থদীপিকা' নামে সংক্ষিপ্তসারে এক টীকা রচনা করেন। বিদ্যাবিনোদ, ন্যায়পঞ্চানন ও কবিচন্দ্রের গ্রন্থোপাদানকে মুখ্য অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া রচিত এই গ্রন্থ পশ্চিমবঙ্গীয় বিদ্বৎ সমাজে 'গোপাল' নামে প্রচলিত ছিল। পঞ্চবিধ কর্তার প্রতিপাদক এই শ্লোকটি গোপালে উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ

ক্রিয়ামুখ্যো ভবেৎ কর্তা হেতুকর্তা প্রযোজকঃ।
অনুমন্তা গ্রহীতা চ কর্তা পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ ।।

১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'জ্যোতীরত্ন' নামক জ্যোতিষের গ্রন্থ এবং ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে গীতগোবিন্দের টীকা রচনা করেন। চণ্ডীর 'তত্ত্বার্থপ্রকাশিকা' টীকাও তাঁহার রচনা। গয়ঘর-বন্দ্যঘটীয় কুলে মেদিনীপুর জেলায় তাঁহার জন্ম। এই জেলার ব্রাহ্মণভূম পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামে এখনও তদ্বংশীয়গণ বাস করিতেছেন।

কেশবদেব তর্কপঞ্চানন গোয়ীচন্দ্রের উক্তির ভুল ব্যাখ্যা সংশোধনের উদ্দেশ্য লইয়া 'দুর্ঘটোদ্‌ঘাট' নামে এক টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কার্যসম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন :

গোয়ীচন্দ্রমতং সম্যক্‌প্রবুদ্ধ্বা দূষিতং তু যৎ।
অন্যথা বিবৃতং যদ্‌বা তন্ময়া প্রকটীকৃতম্‌।।

পূর্বোক্ত গয়ঘর-বন্দ্যঘটীয় কুলোদ্ভব অভিরাম বিদ্যালঙ্কারভট্টাচার্য গোয়ীচন্দ্রের টীকার ব্যাখ্যাস্বরূপ কৌমুদীটিপ্পনী রচনা করেন। তাঁহার উদ্দেশ্যও পূর্বোক্ত তর্কপঞ্চাননের মতোই। ইহা অভিরাম নিজেই রচনার শেষে ব্যক্ত করিয়াছেন :

গোয়ীচন্দ্রবচঃ প্রমাদবচনব্যাখ্যাং স্বকৌতূহলাৎ, স্বাতন্ত্র্যেণ পথঃ প্রকল্পনপরাং কে কে ন বা কুর্বতে। তত্রাস্মাকমতীবযত্নরচিতা-ষ্টীকানুসারাদিমাঃ, পূর্বাচার্যপদপ্রয়োগসহিতাঃ শৃণ্বন্তু বাচো বুধাঃ।।

এই গ্রন্থকারের 'কারকটিপ্পনী' এত উৎকৃষ্ট ন্যায়যুক্তি-সমন্বিত যে, অন্য ব্যাকরণের ছাত্রগণও যত্নসহকারে ইহা অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার এবং হরিরাম বাচস্পতি একত্রে 'অর্থবোধিনী' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাও গোয়ীচন্দ্রের টীকার ব্যাখ্যা। ইহাতে ঐ টীকার দুর্বোধ অংশের ব্যাখ্যা বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। গোয়ীচন্দ্রের টীকার উপরে রচিত অন্যান্য টীকাটিপ্পনী—গয়ঘর-বন্দ্যঘটীয় সর্ববিদ্যালঙ্কারের টিপ্পনী, ১৮১২ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৮৯০) বিদ্যার্ণবের পুত্র মহেশ পঞ্চাননের লেখা 'ভাবার্থদীপিকা' টীকা, রামেশ্বর তর্কালঙ্কারের সংক্ষিপ্তসার টীকা 'দীধিতি', প্রদ্যুম্নাচার্য বিদ্যাভূষণকৃত 'প্রক্রিয়াপ্রদীপ', খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীয় যদুনন্দনের 'জুমর কৌমুদী' এবং বৈদ্যনাথ-রচিত 'পংক্তিটিপ্পনী'। এই শেষোক্ত পুস্তকে সংক্ষিপ্তসারের কতকগুলি সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, পূর্ববর্তী ৭টি টীকা হইতে পংক্তি উদ্ধার করিয়া।

সংক্ষিপ্তসারের 'সারসংগ্রহ' প্রণেতা পীতাম্বর শর্মা। ইহা সংক্ষিপ্ত-সারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইহারই ধাত্বংশের উদাহরণস্বরূপ রামায়ণের ঘটনা অবলম্বনে তিনি 'ছাত্রব্যুৎপত্তি' নামে ৯সর্গে বিভক্ত এক কাব্য রচনা করেন। প্রথম সর্গের শ্লোকসংখ্যা ১৪, বাকীগুলির প্রত্যেকটিতে ২৫টি করিয়া। সারসংগ্রহের টীকার নাম 'সন্দর্ভ'। সন্দর্ভকার নিজেকে 'খুল্লনাত্মজ' বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে খ্রীঃ ১৯শ/২০শ শতাব্দীয়

দ্বারকানাথ ন্যায়ভূষণের 'লঘুসংক্ষিপ্তসার' উল্লেখ্য। তাঁহার আর এক বই 'গণকারিকা'। তিনি সম্ভবতঃ মেদিনীপুরের অধিবাসী।

সংক্ষিপ্তসারের ধাত্বংশ অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ। এই বিষয়ে একাধিক পৃথক্ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। পূর্বকথিত 'জৌমর-ধাতুমালা' বা 'ধাতুপারায়ণ' মূলতঃ পাণিনীয় ধাতুপাঠের অবলম্বনে রচিত। জুমরনন্দীর মতে সংস্কৃত ধাতুসমূহ মহাদেবের মুখ হইতে উদ্ভূত। কালে ইহাদের বৈকল্য ঘটিলে জুমর ইহাদের শুদ্ধির জন্য চেষ্টিত হইয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন ঃ

ধাতৌ শম্ভুমুখোদ্ভূতে ভ্রান্ত্যা বৈকল্যমাগতে।
ক্রিয়তে তস্য শুদ্ধ্যর্থং যত্নো জুমরনন্দিনা।।

মহেশকৃত 'ধাতুমালা', কুল্লুক ভট্টের 'রূপপ্রকাশ' এবং রাধাকৃষ্ণ শর্মার 'ধাতুরত্নাবলী' এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। ধাতুমালা-প্রণেতা মহেশই পূর্বোক্ত 'ভাবার্থদীপিকা'র প্রণেতা মহেশ পঞ্চানন কিনা বিচার্য। সম্ভবতঃ ধাতুমালারই প্রকৃত নাম 'ভাবার্থদীপিকা'। ধাতুমালায় অর্থনিরূপণমুখে ধাতুসমূহের রূপও প্রদর্শিত। 'রূপপ্রকাশ' রচয়িতা এই কুল্লুক ভট্ট অবশ্য মনুসংহিতার টীকাকার নহেন। গুরুপদ হালদার গ্রন্থের নাম বলিয়াছেন 'ধাতুপ্রকাশ'। গ্রন্থকার বিশাল-এর অধিবাসী। তিনি মৈত্রেয়রক্ষিতের 'ধাতুপ্রদীপে'র অনুসরণে এই গ্রন্থ রচনা করেন ঃ

রূপপ্রকাশমকরোদ্ধি বিশালবর্তী ধাতুপ্রদীপমনু কুল্লুকভট্টধীরঃ।।

রাধাকৃষ্ণের গ্রন্থ শ্লোকবদ্ধ। ১৬৮৬ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৭৬৪) ইহা রচিত হয়। রচয়িতার উপাধি সার্বভৌম, পিতা শ্রীহরি স্মার্ত, পিতামহ সীতারাম বিদ্যানিবাস এবং প্রপিতামহ কামদেব ভট্টাচার্য। পূর্বোক্ত 'ধাতুপ্রদীপ,' 'গণসূত্র', 'মনোরমা' প্রভৃতি হইতে রাধাকৃষ্ণ স্বীয় গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন ঃ 'ধাতুপ্রদীপগণসূত্রমনোরমাদে-র্ধাত্বাবলীবলিতগর্ভনিদেশ এষঃ। সন্দর্ভ আবিরভবন্নিরবদ্যপদ্যঃ ষণ্নাগরাগধরণীগণিতে শকাব্দে।।' 'বসুধাতুকারিকা' এবং 'দশবলকারিকা'-ও এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। অজ্ঞাত-কর্তৃক 'ধাতুসংগ্রহ' —এই জাতীয় আর এক গ্রন্থ। নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন-রচিত 'গণমার্তণ্ড'—এই সম্প্রদায়ের ধাতুপাঠের টীকা। গঙ্গাতীরবর্তী উদ্ধারণপুর হইতে চারি মাইল পশ্চিমে কেতুগ্রামে ছিল তাঁহার আবাস। তৎপ্রদত্ত বংশতালিকা হইতে জানা যায়, ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে কালনার নিকট তাঁহার উর্ধ্বতন

১১শ পুরুষ চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় বসতি স্থাপন করেন। কাজেই গ্রন্থকারের সময় (প্রতিপুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া) খ্রীঃ ১৮শ শতকের পরবর্তী নয়। তাঁহার পিতার নাম কুশল তর্কপঞ্চানন। সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ১৭৩) 'তর্কভূষণ' লিখিত হইয়াছে। তাঁহার পিতা গোপাল সার্বভৌম। গণমার্তণ্ডের শেষে ঃ

নৃসিংহমুখসন্তানচণ্ডীদাসকুলোদ্ভবঃ।
নৃসিংহঃ সৌত্রধাতূনাং গণবৃত্তিং নিরুক্তবান্।।
কাব্যবাক্যপদৈঃ সূত্রৈঃ প্রসিদ্ধা ধাতবোময়া।
প্রসাদিতাঃ প্রসাধ্যন্তামন্যে মান্য বিচক্ষণৈঃ।।
বৈষম্যতমসাচ্ছন্নে সর্বশাস্ত্রেক্ষণে গণে।
তমোঽপহঃ প্রযত্নো মে মার্তণ্ডো মেঘবর্জিতঃ।।
...কেতুগ্রামনিবাসিশ্রীনৃসিংহো গণবৃত্তিকৃৎ।।
গঙ্গাতীরগতগ্রাম উদ্ধারণপুরাখ্যকঃ।
তস্মাৎপশ্চিমগব্যূতৌ কেতুগ্রামাভিধা পুরী।।

সংক্ষিপ্তসারের বিভিন্ন পাদ হইতে জ্ঞাপকসমূহ (Indicatory Sutras) সংগ্রহ করিয়া হরগোবিন্দ বাচস্পতি 'সংক্ষিপ্তসার জ্ঞাপকাবলী' নামে যে গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, তাহাতে জ্ঞাপকগুলির ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন টীকা-টিপ্পনাদি হইতে সংগৃহীত জ্ঞাপকগুলিও একত্র প্রদর্শিত। জ্ঞাপকের সংগ্রহ ও বিন্যাস সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ঃ

যত্র যজ্জ্ঞাপকং গ্রাহ্যং কথনীয়ং বিবিচ্যতে।
সূত্রানুসারিতা হ্যেষাং নাত্র জ্ঞাপ্যানুসারিতা।।
যানি টীকাকৃতোক্তানি টিপ্পনীকৃদ্‌ভিরেব চ।
জ্ঞাপকান্যত্র লিখ্যন্তে তান্যেকত্রাশুবুদ্ধয়ে।।

পরে তৎপ্রদর্শিত পথেই অন্য জ্ঞাপকসমূহেরও জ্ঞাপ্যানুসারে কল্পনা করিতে বলা হইয়াছে ঃ

কতিচিদ্‌জ্ঞাপকানীহ দর্শিতানি ময়া বুধাঃ।
জ্ঞাপ্যানুসারতোঽন্যানি কল্প্যানি দিশয়া যয়া।।

সচ্চিদানন্দ মহান্তঠাকুর-রচিত 'তদ্ধিতগণদীপিকা'—সংক্ষিপ্তসার-সম্মত তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহের প্রদর্শনী। এই ব্যাকরণের (?) উণাদি সূত্রাবলীর বৃত্তি রচনা করেন শিবদাস চক্রবর্তী।

সংক্ষিপ্তসারের অবলম্বনে রচিত তিনখানা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ঃ ১। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'সারাবলী', ২। গৌরমোহন ভট্ট-রচিত 'রত্নাবলী' এবং ৩। আনন্দি-কৃত 'শীঘ্রবোধ' ব্যাকরণ। সারাবলীর রচয়িতা ছিলেন হুগলী জেলার খানাকুলের বন্দ্যোপাধ্যায়বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের রঘুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় সারাবলীর পরিশিষ্টস্বরূপ 'কৃৎপাদ-বিবরণ' রচনা করেন। 'রত্নাবলী' ব্যাকরণ পদ্যে রচিত, আলোচ্য বিষয়—কারক, সমাস ও তদ্ধিত। 'শীঘ্রবোধ'ও শ্লোকাত্মক। সাত অধ্যায়ে বিভক্ত এই ব্যাকরণের উদাহরণসমূহ প্রায়শঃ শ্রীচৈতন্যপক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিষয়বিভাগ সংক্ষিপ্তসারের অনুরূপ—সন্ধি, তিঙন্ত ইত্যাদিক্রমে—'সর্বকার্য্য-ব্যাপকত্বাত্তত্রাদৌ সন্ধিরুচ্যতে।' ইহা অবশ্য পূর্বোদ্ধৃত গোয়ীচন্দ্রের উক্তিরই প্রতিধ্বনি। গ্রন্থকারের নিজের উক্তি হইতেই জানা যায়, তিনি ১৬৪০ শকাব্দে (১৭১৮ খ্রীঃ) নীলাচলে 'বটসাগরে' এই ব্যাকরণ রচনা করেন। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রবোধানন্দসরস্বতী-রচিত স্তোত্রকাব্য 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে'র টীকাও তাঁহার রচনা। তিনি 'ঈশ্বরী' নামেও অভিহিত হইতেন।

রচনা-গুণে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ অতিশয় সরল ও প্রাঞ্জল। পাণিনির প্রত্যাহার এবং বৈদিকাংশ ইহার বিষয়ীভূত করা হয় নাই। তবে, বৈদিকাংশবাদে ত্রিমুনি (পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলি)-সাধিত অন্য পদসমূহের উপদেশ করিতে গিয়া ইহাকে সংক্ষিপ্ত করা যায় নাই। ২। ৬৮৭ সূত্রের টীকায় তাই গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ '...এতেনৈতৎ প্রতিপাদিতং ছান্দসব্যতিরিক্তানাং পদানাং ত্রিমুনিপ্রসাধিতানাম্ অত্র শাস্ত্রে সাধনং ন্যূনত্বমিতি সর্বথা ন সম্ভাবনীয়ম্।' সংজ্ঞাব্যবহারেও বিশেষ কোনও নূতনত্বের আমদানী না করিয়া পূর্বাচার্যপ্রসিদ্ধ সংজ্ঞাগুলিকেই প্রায়শঃ রক্ষা করা হইয়াছে ঃ 'পূর্বাচার্যপরম্পরাধিগতাভিঃ প্রসিদ্ধাভিঃ সংজ্ঞাভিরেব প্রায়েণাস্য গ্রন্থকৃতো ব্যবহারঃ'—গোয়ীচন্দ্রটীকা (৭।১)। ইহার ফলে বক্তব্যের সরলতা অব্যাহত রহিয়াছে। বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্রই এই ব্যাকরণের প্রচলন ছিল। তবে গৌড়ে নাকি এককালে ইহার সর্বাধিক পঠনপাঠন দেখা যাইত। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর এবং তন্নিকটবর্তী উড়িষ্যার অঞ্চল-বিশেষে ইহার প্রচার গোচরীভূত। পূর্বোক্ত গোয়ীচন্দ্র এই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন বলিয়া অনুমিত।

১ দ্রঃ 'A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the collections of the Asiatic Society of Bengal,' Vol. VI—(Grammar) by H. P. Sastri, 1931, Introduction, p. Lxi. বর্তমান প্রবন্ধ-রচনায় শাস্ত্রিমহাশয়ের এই গ্রন্থের প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

২ দ্রঃ ফরাসী ভাষায় রচিত প্রাকৃত ব্যাকরণের ইতিহাস—'Les Grammairiens Prakrits' par Luigia Nitti Dolci, Paris, 1938, pp. 131-32.

৩ দ্রঃ 'A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts', A.S.B., 1877, Part I, Grammar, p. 125.

৪ 'ব্যাকারদীপিকা'র প্রারম্ভে : 'নত্বা শ্রীহরিচরণং কৃত্বা শরণং পিতুঃ পদং চ মতম্। বিমলধিয়াং হিতজননী ক্রিয়তে ব্যাকারদীপিকা।। যস্মাৎ কোঽপি পুরাণ-কাব্যনিচয়ালঙ্কারবৈশেষিকব্যাকারশ্রুতিনাটকস্মৃতিগুরুর্বিদ্যাবিনোদাৎস্থিতঃ। তৎপুত্রোঽস্য বিচারনির্মলমতঃ শ্রীন্যায়পঞ্চানন ঔৎসুক্যং সুধিয়ে বিধায় বিমলাং শৃণ্বন্তু বাচং হিতাম্।।'

৫ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এক্ষেত্রে '১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দ' লিখিয়াছেন '১৪৬৮ শকাব্দ' ধরিয়া ('Indian Culture'—Vol. VI., No. 4)। শকাব্দের এই অঙ্ক তিনি কোথায় পাইলেন? মনোরমার অন্তে পরিষ্কার লিখিত আছে—'বসুবাণভুবনগণিতে শাকে...' অর্থাৎ ১৪৫৮ শকাব্দে (= ১৫৩৬।৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) ইহা রচিত হয়।

হেমচন্দ্র সূরি ও হৈম ব্যাকরণ

(খ্রীঃ ১২শ শতক)

বৈয়াকরণদের মধ্যে হেমচন্দ্রই একমাত্র ব্যক্তি যাঁহার প্রায় পূর্ণাঙ্গ জীবনী সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। প্রভাচন্দ্রাচার্যের 'প্রভাবকচরিত' (১২৭৮ খ্রীঃ), মেরুতুঙ্গাচার্য-রচিত 'প্রবন্ধচিন্তামণি' (১৩০৬ খ্রীঃ), হেমচন্দ্রকৃত 'দ্ব্যাশ্রয়কাব্য', যশঃপাল-রচিত 'মোহরাজপরাজয়', সোম-প্রভাচার্য-প্রণীত 'কুমারপাল প্রতিবোধ' (১১৮৫ খ্রীঃ), রাজশেখরসূরির 'প্রবন্ধকোশ' (১৩৪৮ খ্রীঃ), জয়সিংহ সূরির 'কুমারপালচরিত', চারিত্র-সুন্দরকৃত 'কুমারপাল-চরিত' এবং জিনমণ্ডন উপাধ্যায়-রচিত 'কুমারপালপ্রবন্ধ' (১৪৩৫/৩৬ খ্রীঃ) প্রভৃতি গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদিতে এবং 'প্রমাণমীমাংসা' ও 'স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী' গ্রন্থের মুখবন্ধে হেমচন্দ্রের জীবনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। প্রধানতঃ প্রবন্ধচিন্তামণি ও প্রভাবকচরিতে প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে Vienna-র জার্মান পণ্ডিত Georg Buehler (1837-98) জার্মান ভাষায় হেমচন্দ্রের এক জীবনী ('Uber das Leben des Jaina Monches Hemacandra) রচনা করেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক ডঃ মণিলাল প্যাটেলকৃত ইহার ইংরেজী অনুবাদ 'The Life of Hemacandracarya' নামে প্রকাশিত হয়। Alexander Kinloch Forbees-সঙ্কলিত গুজরাটের পুরাবৃত্ত Rasmala (London, 1924)-ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

গুজরাটের বর্তমান আমেদাবাদ জেলার অন্তর্গত ধন্ধুক (Dhandhuka) নামক স্থানে ১১৪৫ সংবতের কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাত্রিতে (খ্রীঃ ১০৮৮) শ্রীমোঢ়নামক বণিক্‌কুলে আচার্য হেমচন্দ্র সূরি জন্মগ্রহণ করেন। এই বাণিয়া-সম্প্রদায় ভারত তথা জগৎকে আর একজন সুসন্তান উপহার দিয়াছেন—তিনি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। হেমচন্দ্রের পিতার নাম 'চাচ' বা 'চাচিগ' এবং মাতার নাম পাহিনী। তিনি চামুণ্ডাগোত্রীয়া ছিলেন বলিয়া চামুণ্ডার আদ্যাক্ষরযোগে শৈশবে হেমচন্দ্রের নাম রাখা হয় চাঙ্গদেব। প্রায় ৯বৎসর (অন্যমতে ৫বৎসর)

বয়সে দেবচন্দ্র সূরি[১] (১০৮৬-১১৬৯) তাঁহাকে জৈন ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই সময়ে তাঁহার নূতন নাম হয় সোমচন্দ্র। স্তম্ভতীর্থে (বর্তমান Cambay) দ্বাদশবৎসরব্যাপী কঠোর বিদ্যাভ্যাসের পর তিনি সর্বশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া একুশ বৎসর বয়সে সূরি বা আচার্য-পদে উন্নীত হন। এই সময় হইতেই তিনি হেমচন্দ্রসূরি নামে অভিহিত।

তাঁহার বিদ্যাচর্চাসম্বন্ধে তেমন কোনও যুক্তিযুক্ত সংবাদ কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। প্রভাবকচরিতে এই বিষয়টিকে কতকটা অলৌকিক রহস্যে মণ্ডিত করা হইয়াছে। 'ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত' নামক গ্রন্থের ১০ম পর্বের প্রশস্তিতে হেমচন্দ্রের উক্তি হইতে জানা যায়, দেবচন্দ্র সূরির প্রসাদে তিনি জ্ঞান-সম্পদ অধিগত করেন। প্রভাবকচরিত-মতে সোমচন্দ্র তর্ক, লক্ষণ ও সাহিত্যে পারদর্শী হইয়া স্মৃতিপথে লক্ষ পদ রক্ষার সামর্থ্যেও সন্তুষ্ট না হইয়া কাশ্মীরবাসিনী (বিদ্যা) দেবীর কৃপালাভের জন্য কাশ্মীরযাত্রা করেন। পথিমধ্যে রৈবতাবতারে (জুনাগড়) নেমিনাথের মন্দিরে রাত্রিযাপনের সময় মধ্যরাত্রে ধ্যানমগ্ন সোমচন্দ্রের নিকট বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন এবং দেবীরই উপদেশে শ্রমসাধ্য কাশ্মীরযাত্রায় বিরত হইয়া তিনি স্বস্থানে ফিরিয়া আসেন এবং একরূপ বিনা আয়াসে 'সিদ্ধসারস্বত' হইয়া সূরিপদে বৃত হন।

এই অবাস্তবতার মধ্যেও যেটুকু সত্য ঘটনার ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইল, বিদ্যাপীঠ কাশ্মীরের সহিত তাঁহার বিদ্যা-ঘটিত সংস্রব। গুজরাটের রাজসভায় 'উৎসাহ' নামে এক অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ পণ্ডিতের সন্ধান পাওয়া যায়—যিনি হৈম ব্যাকরণরচনার জন্য কাশ্মীর হইতে আনীত অষ্ট ব্যাকরণ ফেরৎ দিতে পুনরায় কাশ্মীরে গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি এবং অপর কয়েকজন কাশ্মীরী পণ্ডিতও হেমচন্দ্রের (তখন সোমচন্দ্র) বিদ্যাগুরু ছিলেন, কারণ বিল্‌হণের বর্ণনায় জানা যায়, তখন কাশ্মীর ও গুজরাটের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার্থ গমনাগমন হইত।

হেমচন্দ্র যেমন অনন্যসাধারণ বিদ্বান্ ছিলেন, তেমন ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমানও। এই বুদ্ধি ধর্মান্ধতার ভাবালুতার দ্বারা চালিত না হইয়া উদার এবং কালোপযোগী বাস্তবতার অনুগামী হওয়ায় সমস্ত দিক্ দিয়া বড়ই শুভজনক হইয়াছিল। এই বুদ্ধির গুণেই তিনি সাম্প্রদায়িক

ও রাজনৈতিক নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতে সমর্থ হন। তখনকার দিনে রাজশক্তির প্রত্যক্ষ সহায়তা ব্যতীত বড় রকমের কিছু করা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই জৈন সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি রাজসংস্রবে আসিয়া রাজানুগত্য স্বীকারে কুণ্ঠিত হন নাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি বিদ্যোজ্জ্বলা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, রাজশক্তিকে 'জনহিতায়' তথা 'জগদ্ধিতায়' পরিচালিত করাই ছিল বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁহার সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। স্বীয় প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, চরিত্র, পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য এবং সর্বোপরি তাঁহার অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব—এককথায় তাঁহার সর্বস্ব তিনি এই ব্যাপারে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং পরিণামে রাজা কুমারপালের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তারের দ্বারা এই বিষয়ে চরম সাফল্যও অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জৈন শ্বেতাম্বর শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি।

(২)

হেমচন্দ্রের প্রথম জীবনে গুজরাটের রাজা ছিলেন সিদ্ধরাজ জয়সিংহ (১০৯৪-১১৪৩ খ্রীঃ)। তাঁহার রাজত্বকালে হেমচন্দ্রের জীবনের প্রধান ঘটনা হৈম ব্যাকরণ প্রণয়ন। ইহার পূর্ণনাম 'সিদ্ধহেমচন্দ্রাভিধস্বোপজ্ঞশব্দানুশাসন', সংক্ষেপে 'সিদ্ধহেমশব্দানুশাসন'। নিতান্ত সাধারণভাবে 'হৈম ব্যাকরণ' বলা হয়। 'সিদ্ধ' শব্দে সিদ্ধরাজের সংস্রব সূচিত। খ্রীঃ ১২শ শতকের ২য় পাদ ইহার রচনাকাল।

এই ব্যাকরণ রচনার আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত বিবিধ ঘটনার যে ধারাবাহিক বর্ণনা প্রভাবকচরিতের 'হেমচন্দ্রসূরিপ্রবন্ধে' এবং প্রবন্ধ-চিন্তামণির 'সিদ্ধরাজাদি প্রবন্ধে' পাওয়া যায় তাহা তুলনারহিত। উভয় প্রবন্ধে এই বিষয়ে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও প্রভাবকচরিতের বর্ণনাই অধিকতর তথ্যবহুল। মালব-বিজয়ের পর অবন্তির গ্রন্থাগার হইতে আনীত (লুণ্ঠিত?) গ্রন্থসমূহের মধ্যে ভোজদেব-রচিত ব্যাকরণ দেখিতে পাইয়া সিদ্ধরাজ জয়সিংহ তাঁহার গ্রন্থাগারে ঐরূপ কোনও ব্যাকরণ না থাকায়, এমন কি ব্যাকরণরচনাক্ষম কোনও পণ্ডিত গুজরাটে নাই বলিয়াও দুঃখপ্রকাশ করিলে, সমস্ত বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি সেখানে উপস্থিত হেমচন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। রাজা এই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া হেমচন্দ্রকে নূতন ব্যাকরণ রচনা করিতে অনুরোধ করেন ঃ

যশো মম তব খ্যাতিঃ পুণ্যং চ মুনিনায়ক।
বিশ্বলোকোপকারায় কুরু ব্যাকরণং নবম্।। ৮৪।।

হেমচন্দ্র এই কার্যে সুবিধার জন্য কাশ্মীর হইতে (প্রাচীন) অষ্ট ব্যাকরণ আনাইয়া দিতে রাজাকে অনুরোধ করিলে রাজ-চেষ্টায় সেইসব আনীত হয় এবং উহাদের আদর্শে তিনি 'শ্রীমৎসিদ্ধহেমাখ্য', বত্রিশ পাদে বিভক্ত, অষ্টাধ্যায়ী, উণাদি-ধাতুপারায়ণ লিঙ্গানুশাসন-নামমালাযুক্ত, বৃত্তিসমন্বিত এক নব ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ইহাতে চৌলুক্যবংশীয় মূলরাজাদির প্রশস্তিবাচক ৩৫টি শ্লোকও (প্রতি পাদের শেষে একটি এবং সর্বশেষ পাদের শেষে চারিটি) সংযোজিত করিয়াছিলেন। সিদ্ধরাজ তিনশত লেখক (লিপিকর) নিযুক্ত করিয়া তিন বৎসরের চেষ্টায় এই ব্যাকরণের বহু পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী করান এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন কি ভারতের বাহিরে নেপাল, সিংহল, পারস্য প্রভৃতি দেশেও সেইগুলি প্রেরণ করেন। কাশ্মীরে হেমচন্দ্রের বিভিন্ন গ্রন্থের ২০খানা লিপি পাঠান। অষ্টব্যাকরণের ছাত্র, কাকল নামক একজন কায়স্থকে— যিনি দৃষ্টিমাত্র এই শাস্ত্রের তত্ত্বার্থ অবগত ছিলেন—হেমচন্দ্র এই ব্যাকরণের অধ্যাপক মনোনীত করেন। তিনি (কাকল) রাজ-সহায়তায় এই ব্যাকরণের পঠনপাঠনের এবং উপযুক্ত ছাত্রদিগকে মূল্যবান্ পুরস্কার প্রদানেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই ব্যাকরণের রচনা-প্রসঙ্গে 'প্রবন্ধচিন্তামণি'র 'সিদ্ধরাজাদিপ্রবন্ধে' মেরুতুঙ্গাচার্যের বর্ণনা হইতে জানা যায়, সিদ্ধরাজ জয়সিংহ মালবাভিযানে বিজয়ী হইয়া বিজয়গর্বে প্রত্যাবর্তন করিলে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মুখপাত্রগণ আশীর্বাদের দ্বারা তাঁহার গুণগান করিবার জন্য বিভিন্ন দিনে আহূত হইতে থাকেন। এইভাবে একদিন জৈনাচার্যদের ডাক পড়িলে তাঁহারা হেমচন্দ্র সূরিকে অগ্রে রাখিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হন। হেমচন্দ্র 'ভূমিং কামগবি...' ইত্যাদি শ্লোকে রাজার মঙ্গল কামনা করিলে রাজা শুনিয়া তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করেন। ইহাতে ঈর্ষান্বিত কয়েকজন বিরুদ্ধবাদী ঐ সময়ে বলিয়া উঠেন—'অস্মচ্ছাস্ত্রাধ্যয়নবলাদেতেষাং বিদ্বত্তা'—অর্থাৎ 'আমাদের শাস্ত্র পড়িয়া ইঁনি বিদ্বান্ হইয়াছেন।' তখন রাজার জিজ্ঞাসার উত্তরে হেমচন্দ্র বলেন—'পুরা, শ্রীজিনেন শ্রীমন্মহাবীরেণ ইন্দ্রস্য পুরতঃ শৈশবে যদ্ ব্যাখ্যাতং তজ্জৈনেন্দ্রব্যাকরণমধীয়ামহে বয়ম্' অর্থাৎ 'পুরাকালে জিন

মহাবীর শৈশবে ইন্দ্রের নিকট যে জৈনেন্দ্রব্যাকরণ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাই আমরা অধ্যয়ন করিয়া থাকি।' এই কথায় অপরপক্ষীয় বলিয়া উঠেন—'ইমাং পুরাণবার্তামপহায় অস্মাকমেব সন্নিহিতং কমপি ব্যাকরণ-কর্তারং ব্রূতাম্'—'এই পুরাতন সংবাদ ছাড়িয়া আমাদের সমকালীন কোনও ব্যাকরণকর্তার কথা বলুন।' ইহাতে হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন—'যদি শ্রীসিদ্ধরাজঃ সহায়ী ভবতি তদা কতিপয়ৈরেব দিনৈঃ পঞ্চাঙ্গমপি নূতনং ব্যাকরণং রচয়ামঃ।'—'শ্রীসিদ্ধরাজ সহায় হইলে কয়েকদিনের মধ্যেই নূতন পঞ্চাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করিব।' রাজা 'তাহাই হইবে' বলিয়া জৈনাচার্যদিগকে বিদায় করেন।

ইহার পর, এই ব্যাকরণ-রচনায় রাজকীয় সহায়তা এবং অনুগ্রহ লাভের যে বর্ণনা প্রবন্ধকার দিয়াছেন, ঘটনার দিক্ দিয়া তাহাকে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' ধরনের বলা যাইতে পারে ঃ

> নৃপেণ স্মারিতে ব্যাকরণ-বৃত্তান্তে বহুভ্যো দেশেভ্যস্তত্তদ্বেদিভিঃ পণ্ডিতৈঃ সমং সর্বাণি ব্যাকরণানি পত্তনে সমানীয় শ্রীহেমচন্দ্রাচার্যৈঃ শ্রীসিদ্ধহেমাভিধানং অভিনবমপি ব্যাকরণং সপাদলক্ষগ্রন্থপ্রমাণং সংবৎসরেণ রচয়াঞ্চক্রে। রাজবাহ্যকুম্ভিকুম্ভে তৎপুস্তকমারোপ্য সিতাতপবারণে ধ্রিয়মাণে চামরগ্রাহিণী-চামরযুগ্মবীজ্যমানং নৃপমন্দিরমানীয় প্রাজ্যবর্যপূজাপূর্বং কোশাগারে ন্যধীয়ত। ততো রাজাজ্ঞয়া অন্যানি ব্যাকরণানি অপহায় তস্মিন্নেব ব্যাকরণে সর্বত্রাধীয়মানে কেনাপি মৎসরিণা 'ভবদন্বয়বর্ণনা-বিরহিতং ব্যাকরণমেতদ্' ইত্যুক্তে শ্রীহেমাচার্যঃ ক্রুদ্ধং রাজানং রাজমানুষাদবগম্য দ্বাত্রিংশ চ্ছোকান্ নূতনান্নির্মায় দ্বাত্রিংশৎসূত্রপাদেষু তান্ সম্বদ্ধানেব লেখয়িত্বা প্রাতর্নৃপসভায়াং বাচ্যমানে ব্যাকরণে—
>
> 'হরিরিব বলিবন্ধকরস্ত্রিশক্তিযুক্তঃ পিণাকপাণিরিব।
> কমলাশ্রয়শ্চ বিধিরিব জয়তি শ্রীমূলরাজনৃপঃ।।'
>
> ইত্যাদীন্ চৌলুক্যবংশোপশ্লোকান্, দ্বাত্রিংশৎসূত্রপাদেষু দ্বাত্রিংশচ্ছোকানবলোক্য প্রমুদিতমনা নরেন্দ্রোব্যাকরণং বিস্তারয়ামাস। তথাচ শ্রীসিদ্ধরাজদিগ্-বিজয়বর্ণনে দ্ব্যাশ্রয়নামা গ্রন্থঃ কৃতঃ।
>
> ভ্রাতঃ সংবৃণু পাণিনিপ্রলপিতং কাতন্ত্রকন্থা বৃথা
> মাকার্ষীঃ কটুশাকটায়নবচঃ ক্ষুদ্রেণ চান্দ্রেণ কিম্।

কঃ কণ্ঠাভরণাদিভির্বঠরয়ত্যাত্মান মন্যৈরপি
শ্রূয়ন্তে যদি তাবদর্থমধুরাঃ শ্রীসিদ্ধহেমোক্তয়ঃ।।

এই বর্ণনায়ও বিভিন্ন দেশ হইতে আনীত ব্যাকরণগ্রন্থের সহিত সেই সেই ব্যাকরণবিৎপণ্ডিতদের আনয়নের কথা আছে। তাছাড়া, হৈম ব্যাকরণের ১২৫০০০ শ্লোকপরিমিতির কথা নূতন। বিশেষতঃ ব্যাকরণ গ্রন্থ লইয়া রাজকীয় শোভাযাত্রার সংবাদ ব্যাকরণের ইতিহাসে সত্যই অভিনব। রাজবাহী হস্তীর মস্তকে ব্যাকরণের পুঁথি স্থাপন করিয়া তদুপরি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ এবং চামর ব্যজন করিতে করিতে রাজপ্রাসাদে আনিয়া যথাযোগ্য পূজাপূর্বক উহাকে কোষাগারে রাখা হইয়াছিল। অধিকন্তু ইহাও জানা যায় যে, গ্রন্থের প্রতি পাদের শেষে প্রশস্তিমূলক অবান্তর শ্লোকগুলি হেমচন্দ্র প্রথমেই যোজনা করেন নাই ; ঈর্ষান্বিত কোনো ব্যক্তির প্ররোচনায় উত্তেজিত রাজার ক্রোধ প্রশমনের জন্যই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পরে ঐরূপ করিতে হয়।

সিদ্ধরাজ জয়সিংহ খ্রীঃ ১১৩৬/৩৭ অব্দ নাগাদ্ পূর্বোক্ত মালবাভিযান করেন। এই অভিযান হইতে ফিরিয়া তিনি হেমচন্দ্রকে ব্যাকরণ রচনার জন্য অনুরোধ করেন। সমকালীন অথচ পরোক্ষ অতীত ঘটনার বর্ণনায় 'লঙ্'-এর ব্যবহার উদাহৃত করিতে হৈম বৃত্তিতে (৫।২।৮) হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ 'অরুণৎ সিদ্ধরাজোঽবন্তিম্।' প্রবন্ধচিন্তামণির মতে এই ব্যাকরণ রচনা করিতে এক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ইহা হইতেই হৈম ব্যাকরণরচনার কাল নির্ধারণ করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, এত বড় সপরিশিষ্ট এবং সবৃত্তি সূত্রগ্রন্থের রচনা এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কাজেই এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, সিদ্ধরাজের সাহায্য লাভের পূর্ব হইতেই হেমচন্দ্র এই কার্যে প্রবৃত্ত ছিলেন অথবা এইজন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সূরিপদে বৃত হইবার পূর্বে তাঁহার কাশ্মীরযাত্রার প্রচেষ্টার মূলেও ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছা থাকা অসম্ভব নয়। এইসব বিবেচনা করিয়া খ্রীঃ ১১৩৫ হইতে ১১৪০ পর্যন্ত পাঁচ বৎসর সময়কে রচনার মুখ্য কাল রূপে ধরা যায়। হৈম বৃহদ্‌বৃত্তির টীকাকার চন্দ্রসাগর সূরির মতে ১১৯৩-৯৪ সংবতে (১১৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) হৈম ব্যাকরণ রচিত হয়। পূর্বোক্ত কারণে, এই সময়-নির্ধারণও অভ্রান্ত নয়। তখনকার দিনে বিভিন্ন দেশে খবর পাঠাইয়া সেইসব দেশ হইতে

স-পণ্ডিত ব্যাকরণ-গ্রন্থ আনয়ন ও পর্যালোচনা বেশ সময়সাপেক্ষ।

প্রভাবকচরিতে কাশ্মীর হইতে অষ্টব্যাকরণ আনয়নের কথা বলা হইলেও উহাদের নামোল্লেখ নাই। প্রবন্ধচিন্তামণিতে অবশ্য হৈম ব্যাকরণের প্রশংসা-উপলক্ষ্যে পাণিনি, কাতন্ত্র, চান্দ্র, শাকটায়ন এবং (সরস্বতী) কণ্ঠাভরণ—এই পাঁচখানি ব্যাকরণের নাম করা হইয়াছে। ইহাদের সহিত তৎপূর্বে উল্লিখিত জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ যোগ করিলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়। প্রভাবকচরিতে কাকল-কে অষ্টব্যাকরণবেত্তা বলা হইয়াছে। সেখানে কাশ্মীরাগত উৎসাহ পণ্ডিতের নামও আছে। প্রসঙ্গ-বশে বুঝা যায়, তিনিও ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইঁহাদের কেহ কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় নাই। দেবচন্দ্র সূরির ছাত্র গুণচন্দ্র, কক্কলের উপদেশানুসারে 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' বা 'হৈমবিভ্রম' নামে হৈম ব্যাকরণের টীকা রচনা করেন। তিনি কক্কলকে 'ষট্‌তর্ককর্কশমতি', 'কবিচক্রবর্তী' এবং 'শব্দানুশাসনমহাম্বুধিপারদৃষ্ট' বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই 'কক্কল'ই কাকল। সংস্কৃত 'কর্ক' শব্দের প্রাকৃত রূপ—কক্কল,[১ক] কাকল। প্রবন্ধচিন্তামণির মতে কাকল ১১৮১ সংবতে (খ্রীঃ ১১২৪) দেবচন্দ্র সূরি ও কুমারচন্দ্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত তর্কে উপস্থিত থাকিয়া 'কোটি' শব্দের স্থলে 'কোটী' শব্দের প্রয়োগও যে শুদ্ধ, তাহা শাকটায়ন ব্যাকরণের প্রমাণের জোরে প্রতিপন্ন করেন। 'প্রভাবকচরিত'কার কিন্তু 'দেবসূরি প্রবন্ধে' এই ঘটনাটিকে উৎসাহ পণ্ডিতে আরোপ করিয়াছেন ঃ

> বুদ্ধ্বা চ দূষিতে তত্র দেবসূরিস্তদাঽবদৎ।।
> অনূদ্য দূষণং ভিত্ত্বা স্বপক্ষং স্থাপয়ন্নিহ।
> কোটা কোটীতি শব্দং স প্রযুযোজ বিদূষণম্।।
> অপশব্দোঽয়মিত্যুক্তে বাদিনা পার্ষদেশ্বরঃ।
> উৎসাহঃ প্রাহ শুদ্ধোঽয়ং শব্দঃ পাণিনিসূচিতঃ।।
> উক্তং চ—কোটা-কোটিঃ, কোটি-কোটী, কোটি-কোটিরিতি ত্রয়ঃ।
> শব্দাঃ সাধুতমা হন্ত সম্মতাঃ পাণিনেরমী।। (২৩১–৩৪)।

উৎসাহের 'পার্ষদেশ্বর' (সভাপণ্ডিত) বিশেষণটি লক্ষণীয়। হৈম বৃত্তির ন্যাসে নাকি কক্কলের নামে এক ব্যাকরণ-মতের উল্লেখ আছে।

১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধরাজ জয়সিংহের মৃত্যু হইলে কুমারপাল গুজরাটের রাজা হন। হেমচন্দ্র এই নব নরপতির উপর অধিকতর

প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি ক্রমে এতদূর কৃতকার্য হন যে, রাজা কুমারপাল শেষ পর্যন্ত তাঁহার নিকট জৈন দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরুর অভিপ্রেত কার্যসাধনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এই আনুগত্য চরম পর্যায়ে পৌঁছে—যখন তিনি হেমচন্দ্রের নিকট একটি গাথার মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যা শুনিয়া বৈরাগ্য-বশে সমগ্র রাজ্য তাঁহাকে দান করিয়া বসেন! সন্ন্যাসী হেমচন্দ্র এই দান প্রত্যাখ্যান করিলেও রাজা উহার পুনর্গ্রহণে অস্বীকৃত হন; তখন মন্ত্রী মধ্যস্থ হইয়া রাজাকে হেমচন্দ্রের অভিপ্রায়-মতো রাজ্য-শাসনে উদ্বুদ্ধ করিয়া এই সমস্যার সমাধান করেন। প্রবন্ধচিন্তামণির 'কুমারপাল প্রবন্ধ' হইতে জানা যায়, সময় সময় হেমচন্দ্রকে কুমারপালের মহর্ষি, পিতা, গুরু ও দেবতা বলিয়া মনে হইত ('মহর্ষিং পিতরং গুরুং দৈবতং মন্যমানো...')। হেমচন্দ্রের আদেশে রাজা তদধীন ১৮টি রাজ্যে ১৪ বৎসরের জন্য পশুহত্যা নিষিদ্ধ করিয়া দেন, ১৪৪০টি বিহার নির্মাণ করান এবং রাজকোষে 'অপুত্রক মৃত ব্যক্তির ধন' গ্রহণের প্রথা রহিত করিয়া দেন। গুরু হেমচন্দ্রের জন্মস্থানে সপ্তদশ হস্ত পরিমিত এক ঝোলিকা-বিহার (cradle temple) নির্মাণ করান ('প্রভূণাং জন্মগৃহভূমৌ স্বয়ং কারিত-সপ্তদশহস্ত প্রমাণে ঝোলিকা-বিহারে...')। বলা বাহুল্য কুমারপালের রাজ্য-কালেই হেমচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ এই সময়ে রচিত হয়। কুমারপালের অনুরোধে তিনি রচনা করেন 'ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত' এবং বিংশতি বীতরাগ স্তুতি-সহিত 'যোগশাস্ত্র'।

গুজরাটে চৌলুক্যবংশীয় রাজত্বের চরম উন্নতি-ক্ষণে হেমচন্দ্রের আবির্ভাব। পূর্ব হইতেই অন্যান্য দেশ, বিশেষতঃ মালবের সহিত রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুজরাটের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল, তাহাতে এক দিকে সিদ্ধরাজ জয়সিংহ এবং অপর দিকে হেমচন্দ্রাচার্য নূতন শক্তি সঞ্চার করেন। এই দুই জনের চেষ্টায় মালব তথা উজ্জয়িনীর গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়া গুজরাটের আকাশে সমুদিত হন। গুর্জর-লক্ষ্মীর সহিত হৈম সরস্বতীর অপূর্ব সমন্বয়ের এক অপূর্ব ফলশ্রুতি। ভারতীয় বিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে হেমচন্দ্র স্বয়ং যে সব গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার পরিমাণই (প্রায়) সাড়ে তিন কোটি শ্লোকের সমান ('সার্ধ ত্রিকোটি শ্লোক পরিমিত গ্রন্থগণ-গুম্ফয়িতা')! প্রভাবকের বর্ণনায়

আছে যে, এই সমস্ত গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুত করিতে রাজোদ্যানের সমস্ত তালগাছের পাতা নিঃশেষিত হইয়াছিল ('তাড়পত্রক্রুটির্জজ্ঞে') এবং এই কারণে অন্য দেশ হইতে তালপত্র আনয়নের চিন্তাও নাকি রাজা কুমারপালের মনে উদিত হয়। হেমচন্দ্রের গ্রন্থরচনাগারও ছিল এক বিশাল ব্যাপার। প্রভাচন্দ্র সূরি ইহাকে 'ব্রহ্মোল্লাস-নিবাস' বা 'ভারতী-পিতৃমন্দির' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ঃ

অন্যদাভিনবগ্রন্থগুম্ফাকুলমহাকবৌ।
পট্টিকাপট্টসংঘাতলিখ্যমানপদব্রজে।।
শব্দব্যুৎপত্তয়েঽন্যোন্যং কৃতোহাপোহবন্ধুরে।
পুরাণকবিসংদৃষ্ট–দৃষ্টান্তীকৃতশব্দকে।।
ব্রহ্মোল্লাসনিবাসেঽত্র ভারতীপিতৃমন্দিরে।
শ্রীহেমচন্দ্র সূরীণামাস্থানে সুস্থকোবিদে।। (২৯২–৯৪)।

এইখানে মহাকবিগণ নূতন গ্রন্থসমূহের রচনায় নিরত থাকিতেন। বহুসংখ্যক পট্টিকা–পট্টের (writing boards) উপরে গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুত করা হইত। বিভিন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং প্রাচীন কাব্য প্রভৃতির উদাহরণ (শব্দ প্রয়োগ) লইয়া তাঁহাদের মধ্যে ইতস্ততঃ আলোচনা চলিতে থাকিত। ইহাকে হেমচন্দ্রের 'আস্থান' (audience hall) বলা হইয়াছে।

১২২৯ সংবতে (খ্রীঃ ১১৭২) ৮৪ বৎসর বয়সে হেমচন্দ্র প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করেন। প্রভাবকচরিতের 'হেমচন্দ্র সূরি-প্রবন্ধে'র শেষে তাঁহার জন্ম-সময়াদির নির্দেশ দিতে গিয়া প্রবন্ধকার লিখিয়াছেনঃ 'শরবেদেশ্বরে (১১৪৫) বর্ষে কার্ত্তিকে পূর্ণিমা নিশি। জন্মাভবৎ প্রভোর্ব্যোমবাণশম্ভৌ (১১৫০) ব্রতং তথা। রসষট্‌কেশ্বরে (১১৬৬) সূরিপ্রতিষ্ঠা সমজায়ত। নন্দদ্বয়রবৌ (১২২৯) বর্ষেঽবসানম-ভবৎ প্রভোঃ।।' (৮৪৮–৪৯)। অর্থাৎ ১১৪৫ সংবতের কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রিতে হেমচন্দ্রের জন্ম, ১১৫০ সংবতে জৈন ধর্মে তাঁহার দীক্ষা, ১১৬৬ সংবতে সূরিপদ প্রাপ্তি এবং ১২২৯ সংবতে জীবনাবসান। দেহত্যাগের পূর্বে তিনি কুমারপালের ছয় মাসমাত্র আয়ুঃ অবশিষ্ট থাকার কথা বলিয়া এবং নিঃসন্তান রাজার পারলৌকিক ক্রিয়া রাজাকেই অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়া যান। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া হেমচন্দ্রের প্রাণবায়ু নির্গত ('দশমদ্বারেণ প্রাণোৎক্রান্তি...') হয়।[২] তাঁহার শ্মশান-ভূমিকে 'হেমখণ্ড' (আধুনিক হেমখড়ু বা হেমশড়ু) বলা

হইত। এখনও অনহিল্লপুরে (Anhilvad) একটি কালো (মসীলিপ্ত) প্রস্তরখণ্ডকে দেখাইয়া উহারই উপর হেম-চন্দ্রের আসন স্থাপিত থাকিত বলিয়া স্থানীয় লোকেরা বলাবলি করে।

অসামান্য বিদ্যাবত্তার জন্য হেমচন্দ্রকে 'কলিকালসর্বজ্ঞ' বলা হইত। খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীয় বৌদ্ধ রত্নাকরশান্তিও এই উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি ছিলেন বিক্রমশিলার ছাত্র এবং পরে উহারই দ্বাররক্ষী পণ্ডিত নিযুক্ত হন। 'ছন্দোরত্নাকর', 'অন্তর্ব্যাপ্তি' এবং 'বিজ্ঞপ্তি মাত্রসিদ্ধি' তাঁহার রচিত গ্রন্থ। শেষের দুইটি ন্যায়শাস্ত্রীয়। জনৈক শিষ্য হেমচন্দ্রকে 'বিদ্যাম্ভোনিধিমন্থনমন্দরগিরি' বলিয়াছেন। সোমেশ্বর তাঁহার 'কীর্তি-কৌমুদী'তে লিখিয়াছেন—'বৈদুষ্যং বিগতাশ্রয়ং শ্রিতবতি শ্রীহেমচন্দ্রে দিবি' অর্থাৎ হেমচন্দ্র স্বর্গাশ্রয় করিলে পাণ্ডিত্য আশ্রয়হীন হইল। মালবরাজ মুঞ্জ-সম্বন্ধেও অনুরূপ উক্তি প্রচলিত আছে ঃ 'গতে মুঞ্জে যশঃপুঞ্জে নিরালম্বা সরস্বতী।' হেমচন্দ্র ছিলেন 'চন্দ্রগচ্ছীয়'। চন্দ্রগচ্ছ একটি জৈন-সংস্থা বিশেষ। খরতরগচ্ছ—এই জাতীয় আর একটি। গায়ের রঙ্ সোনার মত ছিল বলিয়া তাঁহাকে হেমচন্দ্র নাম দেওয়া হয়। তিনি শ্বেতাম্বর জৈন ছিলেন। ইঁহাদের ৮৪টি গচ্ছ বা শাখা আছে।

(৩)

প্রভাচন্দ্র 'হেমচন্দ্রসূরিপ্রবন্ধে'র শেষে হেমচন্দ্র-রচিত গ্রন্থসমূহের এক তালিকা দিয়াছেন ঃ

> ব্যাকরণং পঞ্চাঙ্গং প্রমাণশাস্ত্রং প্রমাণমীমাংসা। ছন্দোঽলংকৃতি-চূড়ামণী চ শাস্ত্রে বিভুর্ব্যধিত।। একার্থাঽনেকার্থা দেশ্যা নির্ঘণ্ট ইতি চ চত্বারঃ। বিহিতাশ্চ নামকোশা ভুবি কবিতা নট্যুপাধ্যায়াঃ।। ত্র্যুত্তরষষ্টিশলাকা নরেশবৃত্তং গৃহব্রতবিচারে। অধ্যাত্ম যোগশাস্ত্রং বিদধে জগদুপকৃতিবিধিৎসুঃ।। লক্ষণসাহিত্যগুণং বিদধে চ দ্ব্যাশ্রয়মহাকাব্যম্। চক্রে বিংশতিমুচ্চৈঃ স বীতরাগস্তবানাং চ।। ইতি তদ্‌বিহিত গ্রন্থসংখ্যৈব ন হি বিদ্যতে। নামানি ন বিদন্ত্যেষাং মাদৃশা মন্দমেধসঃ।।—(৮৩২-৩৬)।

অন্য ক্ষেত্র হইতেও তৎপ্রণীত গ্রন্থাদির কিছু সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেই সব মিলাইয়া তাঁহার গ্রন্থাবলীর নাম ও সংখ্যা দাঁড়ায় এইরূপ ঃ (১) সবৃত্তি শব্দানুশাসন, (২) বালভাষা ব্যাকরণ সূত্রবৃত্তি, (৩) উণাদি সূত্রবৃত্তি, (৪) সবৃত্তি লিঙ্গানুশাসন, (৫) ধাতুমালা, (৬) সবৃত্তি ধাতুপাঠ,

(৭) সবৃত্তি অভিধানচিন্তামণি, (৮) সবৃত্তি অনেকার্থসংগ্রহ, (৯) নিঘন্টুশেষ, (১০) সবৃত্তি দেশীনামমালা, (১১) দ্ব্যাশ্রয়কাব্য, (১২) নামমালাশেষ বা শেষসংগ্রহ, (১৩) বিভ্রমসূত্র, (১৪) কাব্যানুশাসন, (১৫) বাদানুশাসন, (১৬) ছন্দোঽনুশাসন, (১৭) অলঙ্কারচূড়ামণি, (১৮) সবৃত্তি প্রমাণমীমাংসা, (১৯) বলাবলসূত্রবৃহদ্‌বৃত্তি, (২০) যোগশাস্ত্র, (২১) ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত, (২২) সারোদ্ধার, (২৩) স্তবমালা প্রভৃতি।

ইহাদের মধ্যে প্রথম ১২ খানা শব্দ বিদ্যা বিষয়ক। শব্দানুশাসন শব্দবিদ্যার একাংশ, প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগের দ্বারা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ক্রমে এই উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপকতা ও জটিলতার বৃদ্ধি হইতে পঞ্চাঙ্গ (সপরিশিষ্ট) ব্যাকরণ। পঞ্চাঙ্গ অর্থে (১) সূত্রপাঠ, (২) গণপাঠ, (৩) ধাতুপাঠ, (৪) উণাদিসূত্রপাঠ ও (৫) লিঙ্গানুশাসন—এই পাঁচ বিভাগ।

হৈম ব্যাকরণের ৮ অধ্যায়ের প্রথম ৭অধ্যায়ে সংস্কৃত এবং শেষ ৮ম অধ্যায়ে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ বর্ণিত হইয়াছে। আর এক 'সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণ ব্যতীত অন্য কোন ব্যাকরণেই একাধারে এইরূপ উভয় ভাষার (সংস্কৃত ও প্রাকৃতের) সূত্রাবলী গ্রথিত হয় নাই। হৈম-র সূত্রপাঠের পরিমাণ ১১০০ শ্লোকের সমান, মোট সূত্রসংখ্যা ৪৬৮৫। তন্মধ্যে ৩৫৬৬টি সংস্কৃতের এবং বাকী ১১১৯টি প্রাকৃতের জন্য রচিত। এই প্রাকৃত ব্যাকরণ অতি উৎকৃষ্ট।

মূলতঃ পাণিনির, এবং প্রসঙ্গতঃ পূর্ববর্তী অন্য সমস্ত ব্যাকরণের সারাংশ গ্রহণ করিয়া রচিত হইলেও, এই হৈম ব্যাকরণে প্রধানতঃ অভিনব শাকটায়নের ব্যাকরণ অনুসৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে অভিনবের সূত্রাবলীর অবিকল অনুকৃতি বিদ্যমান। মোটকথা, ইহা গৌণতঃ উক্ত ব্যাকরণেরই অপেক্ষাকৃত সরল ও উন্নত সংস্করণ বিশেষ। জার্মান পণ্ডিত অধ্যাপক কীলহর্ন (Prof. F. Kielhorn) সাহেব ইহাকে ভারতীয় মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা প্রধানতঃ (অভিনব) শাকটায়ন- এবং কাতন্ত্র—ব্যাকরণের ভিত্তিতে রচিত। তিনি হৈম বৃত্তির টীকাদি হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, প্রথম পাঁচ পাদের রচনার জন্য হেমচন্দ্র কমপক্ষে ১৫খানি বিভিন্ন ব্যাকরণের সাহায্য নিয়াছিলেন। যথাসম্ভব অল্প কথায় পূর্বাচার্যদের যাবতীয়

বক্তব্যের কেবল পুনরাবৃত্তিই নয়, আরও নূতন যাহা কিছু বলা যায়, তাহার উপস্থাপনাতেও তাঁহার চেষ্টা ছিল। ভাষা সরল, বিষয়বিন্যাস কৌমুদীগুলির অনুরূপ। অসম্ভব স্থলে অধিক মৌলিকতার পরিচয় দিতে গিয়া তিনি রচনাকে অযথা কণ্টকিত করিয়া তোলেন নাই। ব্যাকরণের সর্বশেষ শ্লোকের বক্তব্য হইতে বুঝা যায়, রাজা জয়সিংহের বিশেষ অনুরোধেই এইরূপ করা হইয়াছিল অর্থাৎ বিষয়ের সরলসংহতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল।

কেবল ব্যাকরণেই নয়, অন্যান্য হৈম গ্রন্থেও মৌলিকতা অপেক্ষা রচয়িতার পাণ্ডিত্যই অধিকতর পরিস্ফুট। ইহার সহিত মিশিয়াছে বিষয়ের সমগ্রতা এবং বাস্তব প্রয়োজন বোধ। নিজে জৈন হইয়াও তাঁহার গ্রন্থগুলিকে তিনি যথাসম্ভব অসাম্প্রদায়িক রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাকরণের প্রথম সূত্র 'অর্হম্'। ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : 'অর্হমিত্যেতদক্ষরং পরমেশ্বরস্য পরমেষ্ঠিনো বাচকম্। মঙ্গলার্থং শাস্ত্রস্যাদৌ প্রণিদধ্মহে।' দ্বিতীয় সূত্র 'সিদ্ধিঃ স্যাদ্‌বাদাৎ'—ইহার বৃত্তিতে বলা হইয়াছে যে, শব্দানুশাসন সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সাধারণ শাস্ত্র বলিয়া সমস্ত দর্শনের সারভূত স্যাদ্‌বাদের আশ্রয় গ্রহণই সুবিধাজনক। পরের সূত্র 'লোকাৎ' এবং তৎপরবর্তী সূত্র 'ঔদন্তাঃ স্বরাঃ'—ইহার দ্বারা অ হইতে ঔ পর্যন্ত ১৪টি স্বরবর্ণই গৃহীত হইয়াছে; কোন প্রত্যাহার-সূত্রের ব্যবহার করা হয় নাই। সংস্কৃতাংশের সর্বশেষ সূত্র 'সমর্থঃ পদবিধিঃ'—পাণিনির সূত্র (২।১।১)।

হেমচন্দ্র স্বীয় ব্যাকরণের দুইটি ব্যাখ্যা রচনা করেন—একটি বৃহদ্‌বৃত্তি এবং অন্যটি লঘুবৃত্তি। লঘুটি বৃহতেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। বৃহদ্‌বৃত্তি সত্যই বিশাল, লঘুর প্রায় তিন গুণ। এই ব্যাকরণের আনুষঙ্গিক গ্রন্থগুলি মোটামুটি ইহারই অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র ব্যাকরণ-সমুদ্র মন্থন করিয়া বিভিন্ন বৈয়াকরণের মতামত আলোচনা পূর্বক তাহার সারভাগ লইয়া এই বৃত্তি রচিত হইয়াছে। হেমচন্দ্র এই ব্যাকরণের এক বৃহন্ন্যাসও রচনা করিয়াছিলেন—যাহা পাওয়া যায় নাই। কিংবদন্তী—এই ন্যাস বৃহদ্‌বৃত্তি অপেক্ষাও বড় ছিল; ৮০০০০ বা ৮৪০০০ শ্লোকপরিমিত এই গ্রন্থ মহাভাষ্যের ছাঁদে রচিত হইয়াছিল। 'শব্দমহার্ণবন্যাস' ইহার নামান্তর। যুধিষ্ঠির মীমাংসক ইহাকে ৯০০০০ শ্লোকাত্মক বলিয়াছেন। তিনি এই ব্যাকরণের ১২০০০ শ্লোকপরিমিত

এক মধ্যবৃত্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন। হৈম ধাতুপাঠ ও ধাতু পারায়ণ সম্ভবতঃ একই গ্রন্থ। ইহা প্রায়শঃ পাণিনীয় তথা শাকটায়নের ধাতুপাঠের অনুকরণে রচিত ; ধাতুসংখ্যা ১৯৮০। এইগুলি অন্ত্যবর্ণানুসারে বিশেষভাবে সজ্জিত। ক্ষান্ত ধাতুগুলিকে ষান্তধাতুবর্গের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া হান্ত ধাতুসমূহের পরে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। অনিট্‌ধাতু বুঝাইতে অনুস্বারের ব্যবহার দ্বারা হেমচন্দ্র অনুবন্ধের ক্ষেত্রে আর এক বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। সমস্ত ধাতুরই অর্থ প্রদর্শিত। ধাতুবৃত্তির রচনায় হেমচন্দ্র, ক্ষীরস্বামীর (খ্রীঃ ১১শ শতক) পাণিনীয় ধাতুপাঠবৃত্তি 'ক্ষীরতরঙ্গিণী'র উপর নির্ভরশীল। হৈম উণাদিসূত্রের সংখ্যা ১০০৬। জৈন (বা অভিনব) শাকটায়নের লিঙ্গানুশাসনের ভিত্তিতে হৈম লিঙ্গানুশাসন, ১৩৯টি শ্লোকে রচিত এবং ৮ ভাগে বিভক্ত। তাঁহার চারিটি শব্দকোষের কথা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। দ্ব্যাশ্রয়কাব্য[৩] ভট্টিকাব্যজাতীয় গ্রন্থ। একাধারে ব্যাকরণের সূত্রোদাহরণ প্রদর্শন এবং চৌলুক্যবংশীয় রাজাদের ইতিহাস বর্ণনার উদ্দেশ্যে এই কাব্য রচিত। হৈম ব্যাকরণের ন্যায় ইহাতেও ৮টি অধ্যায়—অবশ্য ব্যাকরণপক্ষে। কাব্যের পক্ষে (বা পরিপ্রেক্ষিতে) ইহা ২৮টি সর্গে বিভক্ত। প্রথম ২০ সর্গে বা ৭ অধ্যায়ে হৈম ব্যাকরণের প্রথম ৭ অধ্যায়ের অর্থাৎ সংস্কৃতাংশের সূত্রোদাহরণ দেওয়া হইয়াছে চৌলুক্যরাজদের কীর্তি বর্ণনার মধ্য দিয়া। শেষ ৮ সর্গে বা ৮ম অধ্যায়ে হৈম ব্যাকরণের (৮ম) প্রাকৃতাধ্যায়ের সূত্রোদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে প্রধানতঃ রাজা কুমারপালের চরিতবর্ণনার মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, প্রথমাংশ সংস্কৃতে এবং দ্বিতীয়াংশ প্রাকৃত ভাষায় রচিত। দুই অংশের নাম যথাক্রমে 'চালুক্যবংশোৎকীর্তন' এবং 'কুমারপালচরিত'। প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে ঐ শ্লোকের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তিনির্দেশক ব্যাকরণসূত্রাবলী উপন্যস্ত করা হইয়াছে। অভয়তিলক গণি এবং পূর্ণকলস গণি যথাক্রমে এই কাব্যের সংস্কৃত ও প্রাকৃত অংশের টীকাকার। হেমচন্দ্র হৈম ব্যাকরণের প্রাকৃতাংশের যে বৃত্তি রচনা করেন, তাহার নাম 'প্রকাশিকা'।

২১ কারিকাত্মক হৈম বিভ্রম সূত্রের (?) উপর গুণচন্দ্র-রচিত 'তত্ত্ব প্রকাশিকা' টীকাই বোধহয় হৈম ব্যাকরণের সর্বপ্রথম টীকা। দেবচন্দ্র সূরির ছাত্র এই গুণচন্দ্র হেমচন্দ্রের গুরুভাই (?) এবং সতীর্থ। রচনার

প্রারম্ভে ঃ 'সুখপ্রবোধিকা বৃত্তীরূপসিদ্ধিসমন্বিতা। সিদ্ধহেমানুশাসনে ক্রিয়তে তন্ত্রবিভ্রমে।।' এবং পুষ্পিকায় ঃ 'ইতি পণ্ডিতপুণ্ডরীকেণ শ্রীকক্কল্লোপদেশেন তত্ত্বপ্রকাশিকাবৃত্তিঃ...গুণচন্দ্রেণ স্বপরোপকারার্থং শ্রীহেমচন্দ্রব্যাকরণাভিপ্রায়েণ প্রাণায়ি।' হৈম ব্যাকরণের অবলম্বনে দেবানন্দ সূরি খুব সম্ভব খ্রীঃ ১২শ শতকের শেষ দিকে বা ১৩শ শতকের প্রারম্ভে বা কিছু পরে 'সিদ্ধসারস্বত' ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'প্রভাবকচরিতে'র অন্তর্গত 'মহেন্দ্রসূরিপ্রবন্ধে'র শেষে ৩২৯ সংখ্যক শ্লোকে ইহার উল্লেখ আছে ঃ

শ্রীদেবানন্দসূরির্দিশতুমিদমসৌ লক্ষণাদ্যেন হৈমাদুদ্ধৃত্যাপ্রাজ্ঞহেতোর্বিহিতমভিনবং সিদ্ধসারস্বতাখ্যম্। শাব্দং শাস্ত্রং...ইত্যাদি।

হেমচন্দ্রের অন্যতম শিষ্য উদয়চন্দ্রের 'ন্যাস'ও এই সময়ের রচনা। ইহা হৈম বৃহদ্‌বৃত্তির উপর রচিত। উদয়চন্দ্র মরুদেশের (?) খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীয় রাজা অনূপ সিংহের আশ্রয়ে থাকিয়া 'পাণ্ডিত্যদর্পণ', 'পাণিনীয়মতদর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করেন। 'প্রক্রিয়াকৌমুদী'র 'প্রসাদ'টীকায় শেষোক্ত গ্রন্থ হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। উদয়চন্দ্রের শিষ্য কনকপ্রভ দেবেন্দ্রসূরি পূর্বোক্ত ন্যাসের 'কতিচিদ্দুর্গপদব্যাখ্যামূলক' এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাকে কেহ কেহ 'হৈম লঘুন্যাস' বা 'লঘুন্যাস' বলিয়াছেন। ঁহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহাকে গুরুর গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার বলিয়াছেন। আসলে ইহা ন্যাসের কতকগুলি কঠিন স্থলের ব্যাখ্যা ('ন্যাসতঃ কতিচিদ্দুর্গপদব্যাখ্যাভিধীয়তে।')। এই সম্প্রদায়ে 'শব্দার্ণব' নামক যে আরও একখানি ন্যাসের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা সম্ভবতঃ হেমচন্দ্রেরই প্রাচীনতম শিষ্য[৪] একচক্ষুঃ রামচন্দ্র-কর্তৃক নির্মিত।

হৈম বৃহদ্‌বৃত্তির উপর রচিত এক 'ঢুন্ঢিকা'র সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে বলা হয় 'বৃহদ্‌বৃত্তিঢুন্ঢিকা'। ইহার সম্পূর্ণ গ্রন্থ না পাওয়া গেলেও যে সব খণ্ডিত পুঁথি এযাবৎ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে প্রতীয়মান হয়, বিভিন্ন ব্যক্তি ভাগে ভাগে ইহা রচনা করেন। ব্যুলার সাহেবের মতে বিনয়চন্দ্র ইহার সংস্কৃতাংশের রচনা শুরু করেন। পরে ধনচন্দ্র, নন্দসুন্দর, জিনসাগর প্রভৃতি একাধিক পণ্ডিত ইহার বিভিন্নাংশের রচনায় প্রবৃত্ত হন। কাহারও মতে 'দীপিকা' 'অবচূরি' 'অবচূর্ণিকা' প্রভৃতি ঐ ঢুন্ঢিকা-রই নামান্তর। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে

প্রাকৃতাংশের ঢুন্টিকা রচনা করেন উদয়সৌভাগ্য গণি। তিনি ছিলেন তপাগচ্ছীয় সৌভাগ্যসাগর সূরির ছাত্র। তাঁহার এই রচনার প্রকৃত নাম বোধ হয় 'ব্যুৎপত্তিদীপিকা'। হৈম লঘুবৃত্তিরও এক ঢুন্টিকা আছে। ইহার কর্তৃত্ব স্থল-বিশেষে উদয়শীল গণিতে আরোপিত দেখা গেলেও পুষ্পিকায় কিন্তু ইহাকে উদয়শীলের আগ্রহে জিনসাগর সূরি-কৃত বলা হইয়াছে ঃ 'শ্রীখরতরগচ্ছে শ্রীজিনবর্ধনসূরিপটে...শ্রীজিনসাগরসূরিভিরুদয়-শীলগণীনামাগ্রহেণ...কৃতায়াং শ্রীহেমলঘুব্যাকরণ-ঢুন্টিকায়াং...।' হৈম বৃহদ্‌বৃত্তির 'আনন্দবোধিনী' টীকা চন্দ্রসাগর সূরির রচনা।

দেবসুন্দর সূরির ছাত্র গুণরত্ন সূরি ১৪৬৬ সংবতে (১৪০৯ খ্রীঃ) হৈম ধাতুপারায়ণ হইতে গৃহীত কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় ধাতুর রূপাদর্শ প্রদর্শনপূর্বক 'ক্রিয়ারত্নসমুচ্চয়' নামে এক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। 'বহূপযোগিধাতূনাং ক্রিয়ারত্নসমুচ্চয়ম্‌।' গুণরত্ন তপাগচ্ছীয় শ্বেতাম্বর জৈন। 'ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়ে'র উপর 'ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়বৃত্তি' বা 'তর্করহস্য-দীপিকা' টীকাও তাঁহার রচনা।

সোমসুন্দরের শিষ্য হেমহংস গণি হৈম ব্যাকরণ হইতে ১৪১টি পরিভাষা সংগ্রহ করিয়া ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদে উহাদের উপর 'ন্যায়ার্থমঞ্জূষা' নামে এক টীকার রচনা সমাপ্ত করেন। মূল গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছিল 'ন্যায়সংগ্রহ'। সোমসুন্দর হেমহংসের দীক্ষাগুরু, বিদ্যাগুরু রত্নশেখর। হেমচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার বৃহদ্‌বৃত্তির প্রান্তে ৫৭টি ন্যায় সমুচ্চিত করিয়াছিলেন। কোন এক পণ্ডিত উহাদের উপর 'প্রজ্ঞাপনী' নামে টীকা রচনা করেন। সেই ৫৭টির সহিত হেমহংস-সংগৃহীত ৮৪টি একত্র করিয়া মোট ঐ ১৪১টি ন্যায়-পরিভাষা। 'ন্যায়ার্থমঞ্জূষা'কে কোথাও 'ন্যায়ার্থমঞ্জূষিকা'ও বলা হইয়াছে। সর্বশেষে লিখিত আছে ঃ 'ন্যায়বৃত্তিরিয়ং হৈমী হৈমব্যাকরণাশ্রিতা।' মঞ্জূষার উপরে হেমহংস এক ন্যাসও রচনা করেন।

জ্ঞানবিমল পাঠকের ছাত্র শ্রীবল্লভ বচনাচার্য, যোধপুরের রাজা সুরসিংহের আশ্রয়ে থাকিয়া ১৬৬১ সংবতে (খ্রীঃ ১৬০৪) হৈম লিঙ্গানুশাসন-বিবরণের 'দুর্গপদপ্রবোধ' নামে টীকা প্রণয়ন করেন। হৈম লিঙ্গানুশাসনের আর এক ব্যাখ্যা 'লিঙ্গানুশাসনোদ্ধার'-এর রচয়িতা জয়ানন্দ সূরি। তিনি অমরচন্দ্র সূরি-প্রণীত 'স্যাদিশব্দসমুচ্চয়ে'র [illegible]দীপিকা' টীকাও রচনা করেন।

খ্রীঃ ১৭শ শতকের মধ্যভাগে হৈম ব্যাকরণের একাধিক সংক্ষিপ্তসার রচিত হয়। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কীর্তিবিজয় গণির শিষ্য বিনয়বিজয় গণি (১৬১৩-৮১ খ্রীঃ) 'হৈম লঘুপ্রক্রিয়া' প্রস্তুত করেন। তিনি গুজরাটের এক বৈশ্যবংশের সন্তান ; পিতার নাম তেজঃপাল, মাতা রাজশ্রী। বিদ্যাগুরু সোমবিজয়। বিনয়বিজয় কীর্তিবিজয়ের নিকট জৈন শাস্ত্রাধ্যয়ন শেষ করিয়া যশোবিজয় গণির সহিত বারাণসী গিয়া ১২ বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মণদের দর্শন ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি ভারতপর্যটনে বহির্গত হন। হৈমলঘুপ্রক্রিয়া অত্যন্ত সুখবোধক এবং নাতিবিস্তর। ইহাতে হৈম ব্যাকরণের মোট ১২৪১টি সূত্র গৃহীত হইয়াছে। এইগুলিকে প্রক্রিয়াবদ্ধ করিয়া তিনি ইহার এক বৃত্তিও রচনা করেন। বৃত্তির নাম 'হৈমপ্রকাশ'—'স্বোপজ্ঞ হৈমলঘুপ্রক্রিয়াবৃত্তিরূপে শ্রীহৈমপ্রকাশে...'। বৃত্ত্যংশে নবীন বৈয়াকরণদের মতামতের সারাংশও চয়ন করা হইয়াছে। প্রক্রিয়ারচনার প্রায় ২৫ বৎসর পরে হৈমপ্রকাশ রচিত হয়। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৭০০ খ্রীঃ) মেঘবিজয় উপাধ্যায় সিদ্ধান্তকৌমুদীর অনুকরণে 'হৈম কৌমুদী' ব্যাকরণ রচনা করেন। ইনি বিজয়প্রভসূরি এবং কৃপাবিজয় কবির শিষ্য। হৈম কৌমুদীর বৃত্ত্যংশকে 'শব্দচন্দ্রিকা' বা 'চন্দ্রপ্রভা' নামেও অভিহিত করা হয়। ইহার তিনটি 'প্রকাশ' বা বিভাগ—স্যাদি, ত্যাদি ও কৃৎ। কাহারও মতে তিনি তিনখানা ব্যাকরণ রচনা করেন ঃ (১) চান্দ্র—ষট্‌সহস্রশ্লোকাত্মক, (২) মধ্যব্যাকরণ—পঞ্চত্রিংশচ্ছত শ্লোকাত্মক এবং (৩) লঘুব্যাকরণ—ষট্‌শতশ্লোকপরিমিত।

পুণ্যসুন্দর গণি হৈম ব্যাকরণের ধাতুগুলিকে বর্ণানুক্রমে সাজাইয়া উহাদের এক ব্যাখ্যা যোজনা করিয়া দেন। আধুনিক 'হৈম ধাতুমালা' গ্রন্থ মুনিশ্রীগুণবিজয়-রচিত। সুরাটের 'বোটাদ্'গ্রামবাসী বণিক্‌পুত্র নাগরদাসের ঔরসে ঝবেরীর গর্ভে ১৯৪৮ সংবতে (খ্রীঃ ১৮৯১) গুণবিজয়ের জন্ম। মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি ছিলেন বিজয়দর্শন সূরির শিষ্য। এই বিজয়দর্শনের গুরু বিজয়নেমি সূরি হৈম ব্যাকরণের সূত্রবিন্যাসক্রম রক্ষা না করিয়া সর্বসাধারণের সৌকর্যার্থে সংজ্ঞা, সন্ধি, লিঙ্গ, কারকাদিপ্রকরণক্রমে সূত্র সাজাইয়া 'বৃহদ্‌হেমপ্রভা', 'লঘুহেমপ্রভা' এবং 'পরমলঘুহেমপ্রভা' নামে

তিনখানা ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। উদয়সূরির শিষ্য নন্দনসূরি পূর্বোক্ত ধাতুমালাকে বহুলাংশে পরিবর্ধিত করিয়াছেন :

সূরিণা নন্দনেনেয়ং প্রভূতং পরিবর্ধিতা।
উদয়সূরিশিষ্যেণ নেমিসূরীশশাসনাৎ।।

হৈম ধাতুপাঠকে শ্লোকবদ্ধ করিয়া শ্রীহর্ষকুলগণি যে 'কবিকল্পদ্রুম' রচনা করেন, তাহা ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'হৈমচতুষ্কবৃত্তিটিপ্পনিকা' নামে গোল্হণ-রচিত এক গ্রন্থের নামমাত্র সন্ধান পাওয়া যায়।

পরিশেষে হেমচন্দ্রের ছাত্র রামচন্দ্রের ভাষায় মহাপণ্ডিত আচার্য হেমচন্দ্রকে নমস্কার করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি :

শব্দ-প্রমাণ-সাহিত্য-ছন্দোলক্ষ্মবিধায়িনাম্।
শ্রীহেমচন্দ্রপাদানাং প্রসাদায় নমোনমঃ।।—'নাট্যদর্পণবিবৃতি'

---

১ দেবচন্দ্র সূরি 'বাদিপ্রবর' বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার গুরু মুনিচন্দ্র সূরি। 'প্রমাণন্যায়তত্ত্বালোকালঙ্কার' এবং উহার টীকা 'স্যাদ্বাদরত্নাকর' দেব সূরির রচনা। উত্তর গুজরাটের অনহিল্লপুর পত্তনে রাজা জয়সিংহদেবের সভায় দেবসূরি দিগম্বর জৈন কুমুদচন্দ্রাচার্যকে তর্কে পরাজিত করেন।

১(ক) অমরকোষের 'পদচন্দ্রিকা'-টীকায় (১।৫।১৮০, ২৩৮, ২৪৫, ২৪৭, ৩।২।...) এক কোক্কটের নামে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। এই 'কোক্কট' যদি কক্কল (কোক্কল) হন, তবে শব্দশাস্ত্রে তাঁহার রচিত গ্রন্থ ছিল।

২ 'ব্রহ্মরক্ষাধ্বনাপ্রাণান্ হেমাচার্যো বিমুক্তবান্।'—জয়সিংহ সূরি ('কুমারপালচরিত'—শ্লোক ১৯৮)।

৩ 'দ্বয়োঃ মহাকাব্যলক্ষণ-শব্দলক্ষণয়োরাশ্রয়ো দ্ব্যাশ্রয়ঃ'—পূর্ণকলস গণি

৪ হেমচন্দ্রের প্রধান শিষ্যগণ—(একচক্ষুঃ) রামচন্দ্র, গুণচন্দ্র, যশশ্চন্দ্র, বালচন্দ্র, উদয়চন্দ্র, মহেন্দ্র এবং বর্ধমান গণি।

বোপদেব ও তাঁহার মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ

(খ্রীঃ ১৩শ শতক)

বঙ্গদেশে ব্যাকরণ-চর্চার ক্ষেত্রে বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বিরাজমান। সাতশত বৎসর পূর্বে মধ্য ভারতে ইহার উৎপত্তি এবং গত চারিশত বৎসর ব্যাপিয়া এতদ্দেশে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে ইহার প্রসার ও প্রতিপত্তি। বর্তমানে বাংলার বাহিরে ইহার প্রচলন একরূপ নাই-ই বলা চলে। বঙ্গদেশে প্রচলিত ব্যাকরণগুলির মধ্যে 'কলাপে'র পরেই মুগ্ধবোধের প্রসিদ্ধি।

বৈয়াকরণ বোপদেব বঙ্গদেশীয় এবং বৈদ্য-কুলোদ্ভব—এইরূপ একটা ধারণা এদেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কেহ কেহ পোষণ করিতেন বলিয়া শুনা যায়। এই মর্মে একদা কিঞ্চিৎ লেখালেখিও হইয়াছিল। মনীষী দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বৃহদ্‌বঙ্গ' গ্রন্থে (পৃঃ ৩৬৮) বোপদেবকে বাঙ্গালী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকেই এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'বরদা-তটে' 'বেদপদ' নামক স্থানে মারাঠী ব্রাহ্মণকুলে বোপদেবের জন্ম। তাঁহার পিতা কেশব এবং বিদ্যা-গুরু ধনেশ ছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। 'শতশ্লোকী' বা 'বোপদেব-শতক'[১] নামক বোপদেব-রচিত এক পুস্তকের শেষে এই সংবাদ বর্ণিত আছে ঃ

> দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহাস্থানং বেদপদং সদগ্রজগণাগ্রণ্যঃ সহস্রং দ্বিজাঃ। তত্রামীষু ধনেশ-কেশববিদৌ বৈদ্যৌ বরিষ্ঠৌ ক্রমাচ্চক্রে শিষ্যসুতস্তয়োঃ কৃতিমিতি শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ।।

এই শ্লোকটির একাধিক পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। তাহাতে অবশ্য মূল বক্তব্যের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। পুণা হইতে প্রকাশিত 'Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute' (Vol. XXXIV, 1953)-এ মুদ্রিত 'Identification of Vedapada' নামক নিবন্ধে নিবন্ধকার G.B. Palsule এই শ্লোকটির পরিপ্রেক্ষিতে বেশ মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্লোকস্থ বরদাতটই আধুনিক বেরার

(Berar বা Varhad), বরদানদীর নাম উচ্চারণতঃ দাঁড়াইয়াছে Vardha (বা Wardha), 'বেদপদ'ই আধুনিক 'Bedoda'—বর্তমান আন্ধ্রপ্রদেশের সর্বোত্তর প্রান্তে আদিলাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত একটি ক্ষুদ্র সহর। ইহার প্রায় ১০ মাইল পূর্বে বরদা নদী প্রবাহিত। Bedoda শব্দের স্থানীয় উচ্চারণ 'Bedud'. বোপদেবের সময়ে এই বেদপদ মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল, কারণ কেশব-রচিত 'সিদ্ধমন্ত্র' গ্রন্থের টীকায় বোপদেব 'বেদপদাভিধান-মহারাষ্ট্রনিবাসী' বলিয়া স্বীয় পিতামহের বর্ণনা দিয়াছেন।

শ্লোকস্থ 'সার্থাভিধান' পদ বেদপদের বিশেষণ, অর্থ—সার্থকনামা ; কারণ, এই স্থানে যথার্থই উত্তম বেদজ্ঞ বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। 'বাররুচ সংগ্রহে'র 'দীপপ্রভা' টীকার শেষে টীকাকার নারায়ণ লিখিয়াছেন ঃ 'বেদো নাম মহৎপদং জনপদো যত্র দ্বিজানাং ততিঃ।' বোপদেব স্বরচিত ধাতুবিষয়ক 'কবিকল্পদ্রুম' গ্রন্থের শেষে নিজেকে 'বেদপদস্থ' বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহার বেদপদে বাস সূচিত। মুগ্ধবোধব্যাকরণের অন্তেও লিখিত আছে ঃ

বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্ কেশবনন্দনঃ।
বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্।।

বেদপদের আস্পদ এই ব্যাকরণ বিপ্র বোপদেবের রচনা। উল্লিখিত ধনেশ্বরই পূর্বোক্ত ধনেশ। দক্ষিণ ভারতে বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বৈদ্য-বৃত্তির প্রচলন দেখা যায়।

প্রায় ৯০ বৎসর পূর্বে অধুনা-লুপ্ত 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক মারাঠী পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২) বোপদেবের জন্মস্থানে গিয়া কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন—যাহা তৎকালীন মাসিক 'সাহিত্য' পত্রে (ভাদ্র, ১৩১৩) 'বোপদেবের পরিচয়' নামক প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে জানা যায়, বংশের আদিপুরুষ আপদেব হইতে অধস্তন ১৮শ পুরুষ ছিলেন বোপদেব। ইঁহাদের বংশধরগণ গুজরাটের আমেদাবাদে এবং মহারাষ্ট্রের 'চান্দা' (Chanda) নগরে বসবাস করিতেছেন। এই চান্দা পূর্বোক্ত বেদপদ হইতে প্রায় ৩০ মাইল উত্তরে এবং বরদানদীর কয়েক মাইল পূর্বে অবস্থিত।

আপদেব, বোপদেব, বোপালিত (প্রাচীন কোষকার) নামগুলি প্রায় একই ধরনের। নামের কোনও অর্থ নাই (?) বলা হইলেও লোকে তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া চিরকাল নামের অর্থ খুঁজিয়াছে। মুগ্ধবোধের

টীকাকার দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ বোপদেব নামের অর্থ নির্দেশ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন ঃ 'উঃ শিবঃ। অকারো বিষ্ণুঃ। উশ্চ অশ্চ বৌ। বয়োরুপ সমীপে দীব্যতীতি...বোপদেবঃ।'—অর্থাৎ উ (মহেশ্বর) + অ (বিষ্ণু) + উপ (সমীপে) + দেব = বোপদেব। ইহার মোটামুটি অর্থ দাঁড়ায় শিব ও বিষ্ণুর ভক্ত, পূজক বা উপাসক। বস্তুতঃ তিনি যে এই দুই দেবতার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন তাহা তাঁহার গ্রন্থাদিতেই প্রমাণিত।

বোপদেবের পিতা কেশব 'সিদ্ধমন্ত্র' নামে যে চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহা হইতে জানা যায়, কেশবের পিতার নাম ছিল মহাদেব, এবং কেশব যাদববংশীয় রাজা সিংহরাজ-কর্তৃক সম্মানিত হন। এই সিংহরাজ দেবগিরিতে (বর্তমান মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত দৌলতাবাদ) ১২১০ হইতে ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 'সিদ্ধমন্ত্রে'র টীকা 'সিদ্ধমন্ত্রপ্রকাশ' বোপদেবের রচনা।

গুরু ধনেশ বা ধনেশ্বর সন্ন্যাসাশ্রমে অমলানন্দ স্বামী (বা ব্যাসাশ্রম) নাম গ্রহণপূর্বক বাচস্পতি মিশ্রের শঙ্কর-ভাষ্য-টীকা 'ভামতী'র উপরে 'বেদান্ত-কল্পতরু' নামে অতি প্রাঞ্জল টীকা রচনা করেন। যাদববংশীয় জৈত্রদেবের পুত্র কৃষ্ণের রাজ্যকালে এই টীকা রচিত হয়। কৃষ্ণের পরে তাঁহার ভাই মহাদেব (১২৬০-৭১) এবং তাঁহার পর কৃষ্ণাত্মজ রামচন্দ্র বা রামদেব রাও (১২৭১-১৩০৯ খ্রীঃ) দেবগিরিতে রাজা হন। এই মহাদেবের এবং রামচন্দ্রের অন্যতম মন্ত্রী পরম বিদ্যোৎসাহী এবং বিশিষ্ট গ্রন্থকার হেমাদ্রি ছিলেন বোপদেবের গুণমুগ্ধ পৃষ্ঠপোষক।

হেমাদ্রির 'দানখণ্ডে'র ভূমিকায় ভরতচন্দ্র শিরোমণি 'অনুমীয়তে পক্ষবসু-ধরেন্দুমিতে শকসংবৎসরে দ্বিত্র্যাদিবৎসর-ন্যূনাধিক্যেন সমজনিষ্ট' বলিয়া ১১৮২ শকাব্দের কাছাকাছি বোপদেবের যে জন্মকাল অনুমান করিয়াছেন তাহা সন্দেহাতীত নয়। ১১৮২ শকাব্দ = ১২৬০/৬১ খ্রীষ্টাব্দ। ১২০৯ শকাব্দে (খ্রীঃ ১২৮৭/৮৮) মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাননগরে (বর্তমান নাম পৈঠান) এক সামাজিক সভার মুখপাত্ররূপে বোপদেব মহারাষ্ট্রের সমাজচ্যুত কবি জ্ঞানেশ্বরকে সমাজে গ্রহণ করিবার সময় স্বগ্রথিত এক শুদ্ধিপত্র প্রদান করেন। পূর্বোক্ত 'সাহিত্য' পত্রিকায় (পৃঃ ২৬২-৬৪) শুদ্ধিপত্রটি অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। ১২৬০/৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম হইলে ঐ শুদ্ধিক্রিয়ার সময় বোপদেবের বয়স দাঁড়ায় ২৬/২৭ বৎসর। বলা বাহুল্য এই বয়সে ঐ জাতীয় সভায় নেতৃত্ব করা প্রায়

অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। ঐ সময়ে তাঁহার বয়স আরও বেশী হওয়ারই সম্ভাবনা। কলসীর নিয়মিত ঘর্ষণে জলাধার-সোপানের পাষাণ ক্ষয় দেখিয়া পাঠে বোপদেবের অধ্যবসায়প্রবৃত্তির বিখ্যাত গল্পটি সর্বজনবিদিত বলা চলে। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে তিনি বিদ্যার্জনে মনোযোগী হন।

হেমাদ্রির সঙ্গে বোপদেবের মিলন, বিদ্বৎক্ষেত্রে মণিকাঞ্চন যোগের মতো। হেমাদ্রি তাঁহার 'দানখণ্ডে' নিজেকে মহারাজ মহাদেবের 'ধর্মাধিকরণপ্রাড়্‌বিবাক' এবং 'ধর্মাধ্যক্ষ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার অধীনস্থ ধর্মাধিকরণের ব্যবহারদর্শী পারিষদ ছিলেন বোপদেব। তাঁহার প্রত্যেকটি গ্রন্থরচনার মূলে যে হেমাদ্রির প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ছিলেন বৎসগোত্রীয় কামরাজের পুত্র এবং মারাঠী ব্রাহ্মণ। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আয়ুর্বেদরসায়ন (বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকা) এবং 'চতুর্বর্গচিন্তামণি' খুব বিখ্যাত। সমস্ত পুরাণ এবং স্মৃতিশাস্ত্রের মন্থনে রচিত শেষোক্ত গ্রন্থটি তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। কেহ কেহ অনুমান করেন যে তাঁহার নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলি বোপদেবেরই রচনা। এই অনুমান অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। তবে, হেমাদ্রির তুষ্টিবিধানের জন্য এবং তাঁহারই অনুপ্রেরণায় গ্রন্থরচনার কথা বোপদেব নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ঃ

> শ্রীমদ্ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।।
> বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রিহেমাদ্রি-তুষ্টয়ে।
> বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্-কেশব-সূনুনা।
> হেমাদ্রির্বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ।।

এই শ্লোক দুইটি বোপদেবের 'হরিলীলা' এবং 'মুক্তাফল' নামক গ্রন্থদ্বয় হইতে উদ্ধৃত। হেমাদ্রি স্বয়ং এই দুই গ্রন্থের 'হরিলীলাবিবেক' এবং 'কৈবল্যদীপিকা' নামে টীকা রচনা করেন। তাঁহারা উভয়েই পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। কৈবল্যদীপিকায় বোপদেবের প্রশংসা করিতে হেমাদ্রির উক্তি ঃ

> শ্রীবোপদেবস্য নিধের্গুণানাং জয়ন্তি তে তে ভুবি বাগ্‌বিলাসাঃ।
> বিকুণ্ঠ্য যেষু স্বয়মীশ্বরোঽপি সর্বজ্ঞশব্দং স্বমবৈতি রূঢ়ম্।।

বোপদেবও হেমাদ্রির প্রশংসায় লিখিয়া গিয়াছেন ঃ

> চতুরেণ চতুর্বর্গচিন্তামণি-বণিজ্যয়া।
> হেমাদ্রিণার্জিতং মুক্তাফলং পশ্যত কৌতুকাৎ।।

নির্মথ্য পয়সাংরাশিং মন্দরঃ কৌস্তুভং ন্যধাৎ।
হেমাদ্রিবচসাং মুক্তাফলং রত্নং হৃদিপ্রভোঃ।।
হেমাদ্রিমাদ্রিয়ত এব গুণেন যেন তেনৈব পূরিতমুখেন সুবদ্ধমেতৎ।
মুক্তাফলং প্রতিফলজ্জগদীশরূপং যৎকর্ণকণ্ঠকুহরে সুষমাস্য কাচিৎ।।
—মুক্তাফল ৪৭-৯।

(২)

'কৈবল্যদীপিকা'র একটি শ্লোকে বোপদেব কোন্ কোন্ বিষয়ে কতখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে :

যস্য ব্যাকরণে বরেণ্য ঘটনাঃ স্ফীতাঃ প্রবন্ধা দশ প্রখ্যাতা নব বৈদ্যকেঽথ তিথিনির্ধারার্থমেকোঽদ্ভুতঃ। সাহিত্যে ত্রয় এব ভাগবত-তত্ত্বোক্তৌ ত্রয়স্তস্য চ ভূগীর্বাণশিরোমণেরিহ্‌গুণাঃ কে কে ন লোকোত্তরাঃ।।

এই শ্লোকটিকে কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত অর্থাৎ পরবর্তী কালের যোজনা বলিয়া মনে করেন। আবার কাহারও মতে ইহা মধুসূদন সরস্বতী-রচিত 'হরিলীলাভাষ্যবিবরণ' টীকা হইতে নেওয়া। সে যাহাই হউক, এই শ্লোকানুসারে বোপদেব ব্যাকরণে দশ, বৈদ্যকশাস্ত্রে নয়, তিথিনির্ধারার্থ এক, সাহিত্যে তিন এবং শ্রীমদভাগবতে তিন—এই মোট ২৬ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত তিনখানা—হরিলীলা, মুক্তাফল এবং পরমহংসপ্রিয়া। হরিলীলাকে ভাগবতের সূচী বলা চলে। ভাগবতের কোন্ অধ্যায়ে কি কি ঘটনা বর্ণিত আছে তাহাই শ্লোকবদ্ধভাবে হরিলীলায় প্রদর্শিত। মুক্তাফলে দেখানো হইয়াছে ভাগবতে কত প্রকারের রস বিদ্যমান। ইহা কোন মৌলিক গ্রন্থ নয়, রসের বর্ণনাত্মক শ্লোকাবলীর সংগ্রহমাত্র। ইহাদের প্রথম পাঁচটি এবং শেষ ছয়টি শ্লোক বোপদেব-রচিত, বাকী শ্লোকগুলি ভাগবত হইতে গৃহীত। 'পরমহংস-প্রিয়া'তে তিনি দেখাইয়াছেন যে শ্রীভাগবতে ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ সহস্রাধিক প্রয়োগ বর্তমান। এই প্রসঙ্গে গোপালাচার্য তাঁহার 'ভাগবতভূষণ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন : 'কবিশিরোমণির্বোপদেবোঽপি...পরমহংসপ্রিয়ায়াং ভাগবত-ব্যাখ্যায়াং রেতসেত্যাদি সহস্রাবধি প্রয়োগাণামার্ষত্বং নাভ্যধাস্যৎ।' কাহারও মতে 'পরমহংসপ্রিয়া' মুক্তাফলের উপরে রচিত টীকা।

ব্যাকরণ ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থাদির মধ্যে : ১। শার্ঙ্গধরসংহিতার টীকা—চিকিৎসাগ্রন্থ। খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীতে শ্রীকৃষ্ণশার্ঙ্গধর মিশ্র বিদ্যাহবীর

এই শার্ঙ্গধরসংহিতা রচনা করেন। ২। 'ত্রিংশচ্ছ্লোকী' বা 'অশৌচ ত্রিংশচ্ছ্লোকী'—ধর্মশাস্ত্র। ইহার অন্য নাম 'সূতকারিকা' বা 'সূতক-ত্রিংশচ্ছ্লোকী'। ৩। চন্দ্রকলা—বোপদেব-রচিত পূর্বোক্ত শতশ্লোকী বা বোপদেবশতকের স্বরচিত টীকা। ৪। 'আচারদর্পণ', ৫। পরশুরাম-প্রতাপশ্রাদ্ধকাণ্ডদীপিকা বা শ্রাদ্ধদীপ-কলিকা, ৬। মহিম্নঃস্তোত্রটীকা, ৭। হৃদয়দীপনিঘণ্টু। চন্দ্রিকা বা শতশ্লোকীচন্দ্রিকা—হেমাদ্রি-রচিত (?), শতশ্লোকী নামক বৈদ্যক গ্রন্থের টীকা 'চন্দ্রকলা'র টিপ্পনী (?)।

বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও আন্তরিকভাবে বোপদেব ছিলেন পরম ঈশ্বরভক্ত ও কবি। ভাগবত-বিষয়ক পূর্বোক্ত গ্রন্থাদি ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থসমূহেও এই ভগবদ্‌ভক্তির প্রমাণ অল্পাধিক বর্তমান। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণেও নানা দেবদেবীর নাম বিশেষতঃ বিষ্ণুনামঘটিত প্রচুর উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে ঐ একই কারণে। এইজন্য বলা হয় ঃ

গীর্বাণবাণীবদনং মুকুন্দসংকীর্তনঞ্চেত্যুভয়ং হি লোকে।
সুদুর্লভং তচ্চন মুগ্ধবোধান্নলভ্যতেঽতঃ পঠনীয়মেতৎ।।

অর্থাৎ ব্যাকরণশিক্ষা এবং হরিনামকীর্তন একাধারে এই দুইটি মুগ্ধবোধে ভিন্ন অন্যত্র দুর্লভ, তাই মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত। খ্রীঃ ১৬শ শতকে রচিত হরিনামামৃত ব্যাকরণে এই উদ্দেশ্য চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণে (প্রতিসর্গ পর্বে চতুর্যুগখণ্ডাপর পর্যায়ে কলিযুগীয়েতিহাস-সমুচ্চয়ের ৩২শ অধ্যায়ে) পাণিনির আখ্যান-বর্ণনার পর তোতাদরীর (?) অধিবাসী বেদবেদাঙ্গপারগ বোপদেবকে কৃষ্ণভক্ত এবং ভাগবতজ্ঞানী বলা হইয়াছে ঃ

তোতাদর্যাং দ্বিজঃ কশ্চিদ্ বোপদেব ইতিশ্রুতঃ।
বভূব কৃষ্ণভক্তশ্চ বেদবেদাঙ্গপারগঃ।।
গত্বা বৃন্দাবনং রম্যং গোপগোপীনিষেবিতম্।
মনসা পূজয়ামাস দেবদেবং জনার্দনম্।।
বর্ষান্তে চ হরিঃ সাক্ষাদ্দদৌ জ্ঞানমনুত্তমম্।
তেন জ্ঞানেন সংপ্রাপ্তা হৃদি ভাগবতী কথা।।
শুকেন বর্ণিতা যা বৈ বিষ্ণুরাতায় ধীমতে।
তাং কথাং বর্ণয়ামাস মোক্ষমূর্তিং সনাতনীম্।। ১-৪ ।।

ভবিষ্যপুরাণের এই উক্তি হইতেই ক্রমে শ্রীমদ্‌ভাগবতও যে বোপদেব-প্রণীত এইরূপ একটা ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। ভক্তিগ্রন্থকার হিসাবে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে 'বোপদেব গোস্বামী' বলিয়াও পূজিত।

বস্তুতঃ ভাগবতপুরাণের রচনার সহিত বোপদেবের সংস্রব একেবারে অমূলক নয়। শ্রীমৎ নাভাজী-রচিত 'ভক্তমাল' গ্রন্থ হইতে জানা যায়, বোপদেব 'শ্রী'সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন এবং তিনি লুপ্ত ভাগবত উদ্ধার করেন ঃ 'বোপদেব ভাগবত লুপ্ত ধর্য়ো উনবনীতা'—ভক্তমাল (১০ম মালা)। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজীর বঙ্গভাষায় অনূদিত ভক্তমালে ঃ

তত শ্রীমান্ ষটকোপ তত বোপদেব।
লুপ্ত ভাগবত উদ্ধারি ঘুচাইল ক্ষোভ।।
প্রসঙ্গে শ্রীভাগবত উদ্ধারকারণ।
বোপদেব গোস্বামীর কহি বিবরণ।।
ভাগবতহীন দেশ দেখি সাধুগণ।
কাতরে শ্রীভগবানে করয়ে স্তবন।।
প্রিয়পাত্র শ্রীল বোপদেব গোসাঞিরে।
হইল আকাশবাণী উপায় সুন্দরে।।
যত ভাগবত গ্রন্থ গঙ্গায় ডারিল।
যতন করিয়া তাহা জাহ্নবী রাখিল।।
কিছু হানি নাহি হয় উঠাও ডুবিয়া।
যথাশুষ্ক পূর্ব্ববৎ উঠিবে আসিয়া।।
এত শুনি গোসাঞি যে প্রহৃষ্ট অন্তরে।
উঠাইল গ্রন্থ ডুবি জাহ্নবীর নীরে।।
বহু সম্মানিয়া স্থানে স্থানে পাঠাইলা।
মুক্তাফল নামে গ্রন্থের টীকা বিস্তারিলা।।

—১০ মালা, পৃঃ ১১৭-১৮ (বসুমতী সংস্করণ)।

বেদব্যাস-রচিত মহাভারতের তুলনায় ভাগবতের ভাষা দুর্বোধ এবং কর্কশ। এই কারণে একটি শ্লোক প্রচলিত আছে ঃ

ভূয়ঃ কর্কশশব্দাঢ্যা নৈষারীতির্মহাত্মনাম্।
কৃতং বৈ বোপদেবেন ব্যাসতুল্যেন ধীমতা।।

বোধহয় ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে 'দেবী ভাগবতে'র টীকাকার নীলকণ্ঠ উভয় ভাগবতের মধ্যে কোন্‌খানা মহাপুরাণ তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া

প্রসঙ্গতঃ লিখিয়াছেন ঃ 'দ্বিতীয়পক্ষৈকদেশিনোঽপি বিষ্ণুভাগবতং বোপদেব-কৃতমিতি বদন্তি।'

শঙ্করাচার্য বা রামানুজাচার্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই। আনন্দতীর্থ মাধব (১১৯৯-১২৭৮ খ্রীঃ) ইহার প্রাচীনতম ভাষ্যকার। তিনি বোপদেবের জীবৎকালেই এই ভাষ্যরচনা করিয়াছিলেন বলিয়া স্বামী গিরিজানন্দ তাঁহার 'ভাগবত' নামক নিবন্ধে (উদ্বোধন—৪১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৃঃ ৭২৩-৩১) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় শ্রীমদ্‌ভাগবত মূলতঃ বোপদেব-রচিত নয় বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহার প্রকাশ বা প্রতিসংস্কারাদির সহিত তাঁহার সংস্রব-সম্ভাবনা অনস্বীকার্য। এই সংস্রব তাঁহার এমন বয়সেই ঘটিয়া থাকিবে—যখন তিনি বৈয়াকরণকেশরী হইয়া উঠেন নাই। ভাগবতের 'সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণম্ অশেষাঘহরংবিদুঃ।।' (৬।২।১৪) বচনের আদর্শেই যে তিনি মুগ্ধবোধ রচনা করিয়াছিলেন তাহা পূর্বোক্ত 'গীর্বাণবাণীবদনং...' ইত্যাদি শ্লোকেই ধ্বনিত হইয়াছে।

(৩)

বোপদেব-রচিত পূর্বোক্ত ব্যাকরণ-বিষয়ক দশখানা গ্রন্থের মধ্যে এযাবৎ মাত্র তিনখানার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কবিকল্পদ্রুম এবং কাব্যকামধেনু। ইহা ছাড়া পদার্থাদর্শ, পরিভাষাভাষ্য, রামব্যাকরণ[২] এবং মহাভাষ্যের এক টীকাও তিনি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত। প্রক্রিয়াকৌমুদীর টীকাকার বিট্‌ঠলাচার্য বোপদেব-রচিত 'বিচারচিন্তামণি' নামক এক ব্যাকরণগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

মুগ্ধবোধ মূলতঃ পাণিনির অনুসরণ হইলেও সমজাতীয় অন্যান্য ব্যাকরণের তুলনায় ইহাতে মৌলিকতার নিদর্শন বেশী। পাণিনির পরবর্তী সমস্ত বৈয়াকরণই প্রধানতঃ ভাষা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ব্যাকরণ রচনা করিয়া গিয়াছেন, যদিও পাণিনির উদ্দেশ্য ছিল অন্য। তাঁহার সময়ে সংস্কৃতভাষাকে অন্যান্য অপভাষার পীড়ন হইতে রক্ষা করাই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল এবং এই কারণেই শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদিঘটিত বিশ্লেষণাদির দ্বারা উহার সাধুত্ব নির্ণয়ের মানদণ্ডস্বরূপ তিনি যে পদ্ধতি রচনা করিলেন তাহার যথার্থ নামান্তর

'শব্দানুশাসন'। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে (১।১৪২) ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন : 'সাধুত্বজ্ঞানবিষয়া সৈষা ব্যাকরণস্মৃতিঃ।'

বোপদেবের ব্যাকরণরচনার উদ্দেশ্য—পাণিনি-শাসিত সংস্কৃত ভাষা কত সংক্ষেপে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তাহার উপায় নির্ধারণ। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনের তাগিদেই তাঁহাকে পাণিনির বিশ্লেষণাত্মক (analytical) রীতি পরিত্যাগ করিয়া তদ্বিপরীত সংশ্লেষণাত্মক (synthetical) পদ্ধতিতে স্বীয় ব্যাকরণ রচনা করিতে হইয়াছে। Euclid-এর জ্যামিতির মতো তিনিও সামান্য হইতে বিশেষে অর্থাৎ প্রথমে সংজ্ঞাসূত্রাদি প্রদর্শনের দ্বারা বর্ণ হইতে শব্দে এবং ক্রমে শব্দ হইতে সমাসাদি হইয়া বাক্যে আসিয়া পৌঁছিতে চাহিয়াছেন এবং এই কারণে তাঁহার সংজ্ঞা, সন্ধি, শব্দ, স্ত্রীপ্রত্যয়, কারক, সমাস, তদ্ধিত, ধাতু ও কৃৎ—এই ক্রমান্বিত বিষয়বিন্যাস, উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিয়াই টীকাকার রামচন্দ্র তর্কবাগীশ 'মুগ্ধবোধ' শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন : 'অন্যাপেক্ষয়া প্রকরণশুদ্ধ্যা ঝটিতি পদপদার্থজ্ঞানং যস্মাৎ...।'

পাণিনি-ব্যবহৃত ১৪টি শিবসূত্র বা প্রত্যাহার-সূত্রকে কমাইয়া মুগ্ধবোধে ১০টিতে পরিণত করা হইয়াছে; তদনুসারে ইহার বর্ণমালা প্রচলিত প্রসিদ্ধ ধারার পরিবর্তে কৃত্রিম ধারায় বিন্যস্ত*, পাণিনির স্বরাভিঘাতজনিত বৈচিত্র্যের নির্দেশ মুগ্ধবোধে অনুপস্থিত; ইহাতে বৈদিক প্রক্রিয়াও নাই।

মুগ্ধবোধের সূত্রসংখ্যা ১১৮৫। মোট ১০ অধ্যায়ে এইগুলি বিন্যস্ত; প্রতি অধ্যায়ে ৪ পাদ। কোন কোন সংস্করণে ১৭টি অধ্যায় দেখা যায়। রামচন্দ্র তর্কবাগীশ এই ব্যাকরণকে 'দশাধ্যায়ী' বলিয়াছেন : '...এতেন শংশব্দৈরিত্যাদি বহুলং ব্রহ্মণীত্যন্ত দশাধ্যায়ীরূপ ব্যাকরণস্য সাধ্যত্বং...।' তিনি 'শংশব্দৈঃ' সূত্রকে আদিসূত্র ধরিয়াছেন। তাহা হইলে মোট সূত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ১১৮৪। আমাদের বিবেচনায় অবশ্য 'ওঁ নমঃ শিবায়'—এই নমস্কার-সূত্রটিকেই আদিসূত্র ধরিয়া সূত্রগণনায় কোনও বাধা পরিলক্ষিত হয় না। সর্বশেষ সূত্র 'বহুলং ব্রহ্মণি' দ্বারা অন্তিমে চূড়ান্ত অর্থবহ ব্রহ্মন শব্দের ব্যবহার বড় সুন্দর হইয়াছে। সর্বারম্ভে 'ওঁ'-কারের প্রয়োগও লক্ষণীয়।

গঠন-শৈলীতে অত্যধিক সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করায়, প্রচলিত প্রধান ব্যাকরণগুলির মধ্যে মুগ্ধবোধ ক্ষুদ্রতম আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। সুদীর্ঘ ১০ বা ১২ বৎসরের পরিবর্তে কত অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রকে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহার পরীক্ষা করাই ছিল যেন এই ব্যাকরণ রচনার প্রধানতম উদ্দেশ্য। এইজন্য অন্য ব্যাকরণের একাধিক সূত্রের বক্তব্য মুগ্ধবোধে একটিমাত্র সূত্রে ব্যক্ত করার চেষ্টা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যায় যে, ইহার 'গোতৃণ-মেধাদস্তু...কিন বা' (৪৪৭) সূত্রদ্বারা পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর ৫।২।১১৪, ৪।২।৮০, ৫।২। ১০৬, ১০৮, ১১১, ১৩৯, ৯৬, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৭, ১০৯, ১১২, ১২৩, ১৪০, ১২৭, ১২৯—এই ১৭টি সূত্রের কার্য সম্পাদন করা হইয়াছে। এইরূপ 'টঘেকাৎ...' (৪৩০) ইত্যাদি আর একটি সূত্রে অষ্টাধ্যায়ীর ১৮টি সূত্রের বক্তব্য অনুপ্রবিষ্ট। এই কার্যে তদ্ব্যবহৃত কৃত্রিম সংজ্ঞাগুলি সবিশেষ সহায়ক হইয়া উঠিয়াছে, অথবা, বলা যায়, এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই তিনি সংজ্ঞাগুলিকে পূর্বপরিকল্পনামত গঠন করিয়া লন। যেমন—সমাসের পরিবর্তে ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র 'স'; দীর্ঘ ও হ্রস্বের স্থলে যথাক্রমে 'ঘ' ও 'স্ব'; প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদির জন্য যথাক্রমে 'প্রী', 'দ্বী', 'ত্রী' প্রভৃতি; একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন যথাক্রমে 'ক', 'দ্ব', 'ধ্ব'; গুণ ও বৃদ্ধির জন্য 'ণু' ও 'বৃ'; সর্বনামের পরিবর্তে 'শ্রি'; ধাতু স্থলে 'ধু'; লট-লোট ইত্যাদি দশলকারের জন্য ক্রমান্বয়ে 'কী', 'খী', 'গী', 'ঘী', 'টী', 'ঠী', 'ডী', 'ঢী', 'তী' এবং 'থী'; তদ্ধিত='ত'; পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ যথাক্রমে 'পং' ও 'মং'। এইরূপ সর্বত্র। সংজ্ঞাসমূহের এই জাতীয় সংক্ষিপ্তকরণের আদর্শ তিনি সম্ভবতঃ জৈনেন্দ্রব্যাকরণ হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

বলা বাহুল্য মুগ্ধবোধের এই সংক্ষিপ্ততা সর্বথা সুখকর তথা শুভজনক হয় নাই। সাধারণভাবে প্রচলিত প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ-সংজ্ঞাগুলিকে বর্জন করায় প্রধান অসুবিধা হইয়াছে এই যে, অন্যান্য শাস্ত্রাদির জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অথবা সাধারণভাবে ব্যাকরণবিষয়ে আলোচনা করিতে মুগ্ধবোধের ছাত্রকে ঐসব প্রসিদ্ধ সংজ্ঞাও জানিয়া লইতে হয়, কেবল মুগ্ধবোধের জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ থাকিলে চলে না। তাছাড়া, সংজ্ঞাগুলির এই অস্বাভাবিক সংক্ষেপের ফলে ইহার সূত্রগুলিও

আপাতদুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং উহাদের উচ্চারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যেন 'কুলিশকঠোর'—যাহাকে বলা যায় 'দাঁতভাঙ্গা' ভাষা, যেমন 'ড্রোট্রির্ঘশ্চানুঃ' (৭৭) মুগ্ধবোধের একটি সূত্র। সূত্রের স্বল্পতার দরুণ কেবল সহজ সংস্কৃত শিক্ষা ভিন্ন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের কঠিন বা জটিল অংশের অর্থগ্রহণ বা সমাধান মাত্র মুগ্ধবোধের জ্ঞানদ্বারা সর্বত্র সম্ভবপর নয়। সম্ভবতঃ এই অবস্থাকে কটাক্ষ করিয়াই তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮১২-৮৫) তাঁহার বিশাল অভিধান 'বাচস্পত্যে'র প্রাক্‌কথনের শেষে লিখিয়াছেন ঃ

কথঞ্চিন্মুগ্ধবোধস্য পাঠমাত্রমদোদ্ধতৈঃ।
কাব্যমাত্রসমালোকাদ্ ব্যুৎপত্তের্দর্শনং কথম্।।
উক্তশাস্ত্রৈকশরণাঃ সূরিসৌরভলোভতঃ।
কুমারাশ্চেৎপ্রবর্তেরন্ প্রবর্তন্তাং হঠান্বিতাঃ।।
তদ্‌বাক্যেষ্বাদরকৃতঃ শোচনীয়াঃ পরং জনাঃ।
দৌর্ভাগ্যাদ্ বত বঙ্গানাং বালবাক্যে সমাদরঃ।।

মুগ্ধবোধের ছাত্রগণ অবশ্য রামচন্দ্র তর্কবাগীশের টীকা-রূপ বর্মের আশ্রয়ে বাচস্পতির এই বাক্যবাণ প্রতিহত করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

(৪)

খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী নাগাদ ভট্টোজি দীক্ষিতাদি মারাঠী পণ্ডিতদের হাতে পাণিনির পুনরভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত অন্যান্য ব্যাকরণের সহিত মুগ্ধবোধও ভারতের বিভিন্ন স্থলে কম-বেশী প্রচলিত ছিল। পরে পূর্বোক্ত কারণে নূতন করিয়া পাণিনির সমাদর বৃদ্ধি পাওয়ায় মুগ্ধবোধের প্রসার সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে এবং পরিশেষে বঙ্গদেশে ভাগীরথীর উভয়তীরে ইহার প্রচলন সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। ঐ শতকেই পণ্ডিত কাশীনাথ বিদ্যানিবাস মুগ্ধবোধের এক টীকা রচনা করিয়া এখানে মুগ্ধবোধের ভিত্তি আরও দৃঢ় করিয়া দেন। এই টীকা অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। বিদ্যানিবাস ছিলেন বিখ্যাত বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির ('বঙ্গে নব্য ন্যায় চর্চা'মতে বিষ্ণুদাস বিদ্যা-বাচস্পতির) পুত্র। বিদ্যানিবাসের পিতামহ নরহরি বিশারদ ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত এবং পুত্র বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন 'ভাষা পরিচ্ছেদ'-প্রণেতা।[৩] রাঢ়ীয় আখণ্ডলবংশে তাঁহাদের জন্ম ; আদিনিবাস মধ্যমগ্রাম বা মাঝের গাঁ। বাংলা-অঞ্চলে মুগ্ধবোধের প্রাধান্য সূচনায় বিদ্যানিবাসের

কীর্তি চিরস্মরণীয়। টীকাকার রামচন্দ্র তর্কবাগীশ এতদঞ্চলের তৎকালীন ব্যাকরণক্ষেত্রটির পর্যালোচনায় লিখিয়াছেন ঃ

পরেঽত্র পাণিনীয়জ্ঞাঃ কেচিৎ কালাপ-কোবিদাঃ।
একে বিদ্যানিবাসাঃ স্মৃরন্যে সাংক্ষিপ্তসারকাঃ।।

লক্ষণীয় যে, আঞ্চলিক তিন মুখ্য ব্যাকরণের ছাত্রদের সঙ্গে মুগ্ধবোধে বিদ্যানিবাসের অনুবর্তিগণও উল্লেখ্য হইয়া উঠিয়াছেন।

রামতর্কবাগীশ, ভট্টোজির ছাত্র বরদরাজের 'মধ্যকৌমুদী'র 'মধ্য-মনোরমা' টীকা রচনা করিয়া বিদ্যানিবাসকে উৎসর্গ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'সিদ্ধান্তকৌমুদীর যে মনোরমা (অর্থাৎ ভট্টোজি-রচিত "প্রৌঢ়মনোরমা") টীকা ছিল, রামচন্দ্র শর্ম্মা, শিবানন্দ ভট্ট বা শিবানন্দ গোস্বামীর অনুরোধে, তাহা হইতে বাছিয়া লইয়া এবং নিজের মত যোজনা করিয়া মধ্যকৌমুদীর এক টীকা লেখেন ; তাহার নাম "মধ্য-মনোরমা"। এই বইখানি রামচন্দ্র বিদ্যানিবাসের নামে উৎসর্গ করেন। যেভাবে উৎসর্গ করেন, তাহাতে বোধ হয়, বিদ্যানিবাস তাঁহার গুরু ছিলেন।'—হরপ্রসাদ-রচনাবলী, ২য় সম্ভার, পৃঃ ৭৩। ভট্টোজি-কর্তৃক প্রৌঢ়মনোরমায় মুগ্ধবোধের বিরুদ্ধ-সমালোচনাই, উত্তর ও পশ্চিম ভারত হইতে ইহার বিতাড়নের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বিদ্যানিবাস সম্ভবতঃ সেই সমালোচনাকে উপেক্ষা বা উহার বিরুদ্ধতা করিয়া রাঢ়ে মুগ্ধবোধকে আশ্রয় দেন বা প্রকারান্তরে সমর্থন জানান। শাস্ত্রিমহাশয়ের মতে 'রামচন্দ্র শর্ম্মা, বোধহয়, এই দুই বিরুদ্ধ মতের কোনরূপ সমন্বয় করিয়াছেন।'—ঐ পৃঃ ৭৪।

কাশীনাথ বিদ্যানিবাস নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। পিতামহ নরহরি বিশারদের ন্যায় তিনি বঙ্গদেশ হইতে বারাণসীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। দিল্লীর মুঘল দরবারে তাঁহার খ্যাতি পৌঁছে। কথিত আছে, এক শ্রাদ্ধক্রিয়া-উপলক্ষ্যে টোডরমলের গৃহে নিমন্ত্রিত পণ্ডিতদের মধ্যে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। সেই সভাতে কাশীর বিখ্যাত মারাঠী পণ্ডিত নারায়ণ ভট্টও ('প্রক্রিয়াসর্বস্ব' ব্যাকরণ-প্রণেতা) উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিদ্যানিবাসের দুই পুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি এবং বিশ্বনাথ (তর্ক) সিদ্ধান্তপঞ্চানন। বিশ্বনাথের পুত্র রামদেব, ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশীর বিশ্বনাথমন্দির মুঘল সম্রাট্-কর্তৃক বিধবস্ত হইলে ঢাকা (বর্তমান বাংলাদেশে) চলিয়া যান (Gopinath Kaviraj, 'Bengali Pandits in

Mediaeval Varanasi', Vivekananda Commemoration Volume, Vardhaman University, Feb. 1966, p. 13.)। বিদ্যানিবাস-রচিত 'সচ্চরিতমীমাংসা' নামক সদাচারবিষয়ক এক বৃহৎ ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৪৮০ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৫৫৮/৫৯) বৈদ্যনাথের গর্গবংশীয় শিখরেশ্বরের অনুরোধে এই গ্রন্থ প্রণীত হয়। ইহাতে গৌড়ীয় আচারের বর্ণনা থাকিলেও দাক্ষিণাত্যস্মৃতির ও মধ্যদেশীয় আচারের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত সূচিত (শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান, পৃঃ ১৭৯২)। ১৫১০ শকাব্দে (১৫৮৮/৮৯ খ্রীঃ) তাঁহার 'দানকাণ্ড' পুস্তকের, জনৈক কবিচন্দ্রের দ্বারা পুনর্লিখনের (নকল করার) সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 'শিশুবোধ' নামক এক স্বতন্ত্র ব্যাকরণও বিদ্যানিবাস রচনা করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে প্রচলিত ব্যাকরণগুলির মধ্যে এক কাতন্ত্র বাদে, মুগ্ধবোধের বঙ্গীয়পণ্ডিত-রচিত টীকা-টিপ্পনীর সংখ্যাই বোধ হয় সর্বাধিক। গুণের দিক দিয়া যেমনই হউক, কোনও অবাঙ্গালীর রচনা এই ব্যাকরণের উপরে অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। বোপদেব স্বয়ং মুগ্ধবোধের সূত্রবৃত্তি-প্রণেতা। টীকাগুলির মধ্যে রামচন্দ্র তর্কবাগীশের 'প্রমোদজননী' এবং দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ-রচিত 'সুবোধা' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের রচনায় এই ব্যাকরণের পূর্বোক্ত ত্রুটিগুলি যতদূর সম্ভব দূর করিবার চেষ্টা লক্ষিত হয়।

(৫)

রামচন্দ্র তর্কবাগীশ কলিকাতার উত্তরদিগ্‌বর্তী আড়িয়াদহের ঘোষালদের পূর্বপুরুষ। খ্রীঃ ১৬শ শতকের শেষদিকে অথবা ১৭শ শতকের গোড়ায় তিনি মুগ্ধবোধের ঐ টীকা রচনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত এই টীকার একাধিক পুঁথিতে 'অশোকমালিকা' নাম দেখা যায়, যদিও ইহার 'প্রমোদজননী' নামই সর্ববাদিসম্মত। ১৭শ শতকের মধ্যভাগে রচিত দুর্গাদাসের টীকায় রামতর্কবাগীশের উল্লেখ আছে। 'তর্কবাগীশ' ন্যায়শাস্ত্রীয় উপাধি, এবং তিনি যে একজন উৎকৃষ্ট নৈয়ায়িক ছিলেন তাহা তাঁহার রচনাতেই প্রতিপন্ন হয়। পাণিনি হইতে শুরু করিয়া তৎপরবর্তী প্রায় সমস্ত ব্যাকরণের জ্ঞান আহরণপূর্বক তিনি এই টীকারচনায় প্রবৃত্ত হন। ন্যায়োজ্জ্বলা তীক্ষ্ণ সমালোচনা-বুদ্ধির দ্বারা যথোপযুক্ত খণ্ডন-মণ্ডনে এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে মুগ্ধবোধের

জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির মূলে তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টা ব্যাকরণক্ষেত্রে আদর্শস্থানীয়। এই টীকায় অন্যান্য ব্যাকরণ হইতে এত বেশী উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে যে ফলে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মূল-গ্রন্থের চতুর্গুণেরও বেশী। মুগ্ধবোধকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিনি পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণদের কতকগুলি সূত্রকে সংক্ষিপ্তাকারে পরিবর্তিত করিয়া স্বীয় টীকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। 'অবশেষ' নামে মুগ্ধবোধের এক পরিশিষ্টও তাঁহার রচনা : 'মুগ্ধবোধস্যাবশেষস্তন্যতে রামশর্মণা।' তাঁহার রচিত এক প্রাকৃত ব্যাকরণও ছিল[৪]—ইহা স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সন-এর উক্তি হইতে জানা যায়। 'মধ্যমনোরমা'র কথা আগেই বলা হইয়াছে। 'পদার্থনিরূপণ' নামে আর এক গ্রন্থের কর্তৃকত্বও তাঁহাতে আরোপিত। মুগ্ধবোধের পরিভাষাবৃত্তি এবং উণাদিকোষও তাঁহার রচনা।

মুগ্ধবোধের অপর বিখ্যাত টীকাকার দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশের পিতা গাঙ্গুলী বাসুদেব সার্বভৌম। বলা বাহুল্য ইনি নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম নহেন। দুর্গাদাস খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুগ্ধবোধের 'সুবোধা' টীকা রচনা করেন। কবিকল্পদ্রুমের তৎপ্রণীত 'ধাতুদীপিকা' টীকায় ইহার রচনাকাল বলা হইয়াছে ১৫৬১ ('শাকে সোমরসেষুভূমিগণিতে') শকাব্দ (= খ্রীঃ ১৬৩৯/৪০)। এই প্রমাণের জোরে খ্রীঃ ১৭শ শতকের প্রথমার্ধ তাঁহার অভ্যুদয়কাল সাব্যস্ত করা চলে। সুবোধা টীকায় তিনি রামতর্কবাগীশ, কাশীশ্বর এবং রামানন্দের নাম করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর-রাজপরিবারের সভাপণ্ডিত রামানন্দাচার্য মুগ্ধবোধের টীকাকার। পরিণত বয়সে তিনি সন্ন্যাসী হন। শ্রীপতি দত্ত-রচিত কাতন্ত্রপরিশিষ্টে প্রদর্শিত শব্দসমূহের গ্রহণই রামানন্দের টীকারচনার প্রধান উদ্দেশ্য :

কাতন্ত্রপরিশিষ্টাদৌ বিবৃতানি চ কানি চিৎ।
পদান্যত্র প্রপঞ্চার্থং দর্শিতানি যথামতি।।

কাশীশ্বর ভট্টাচার্য মুগ্ধবোধের অন্যতম টীকাকার। ইনি এই ব্যাকরণের এক পরিশিষ্টও রচনা করেন। 'ভূরিপ্রয়োগ-গণপাঠ' নামক এক অজ্ঞাত গ্রন্থের 'গণধাতুপরিভাষা' (?) নামে টীকার রচয়িতাও এই কাশীশ্বর। রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রকাশিত এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথির তালিকায়[৫] ইহাকে 'কবিকল্পদ্রুমে'র ধাঁচে রচিত মুগ্ধবোধসম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলা হইয়াছে। ইহার প্রারম্ভিক 'ভূরিপ্রয়োগস্য গণস্য টীকাং তনোতি কাশীশ্বরদেবশর্মা'

উক্তি, 'সুপদ্ম'কৃৎ পদ্মনাভ দত্তের 'ভূরিপ্রয়োগ' কোষের কথা মনে করাইয়া দেয়। আবার সুপদ্ম-সম্প্রদায়ের 'ধাতুগণপ্রকাশ' বা 'ধ্বনিযোনিবাব্য' (ইহাকে 'কাশীশ্বরীগণ' বলা হইয়াছে) গ্রন্থের রচয়িতাও কাশীশ্বর বাচস্পতি, যাহার রামকান্ত-রচিত টীকায় বলা হইয়াছে : 'কাশীশ্বরেণ স চ ধাতুগণপ্রকাশস্তোষং প্রকাশয়তু ভূরিবিচক্ষণানাম্।' পূর্বোক্ত তালিকায় দুই গ্রন্থকে পৃথক্ বলা হইলেও, উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাহাতে 'ভূরিপ্রয়োগে'র কোনও সংস্রব আছে কিনা পুনর্বিবেচ্য। অপটু বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লিপিকরের হাতে মূল পুঁথির বিকৃতি, বহু ভুল সিদ্ধান্তের জন্মদাত্রী।

দেবিদাস চক্রবর্তী মুগ্ধবোধের আর এক টীকাকার। গোবিন্দরাম বিদ্যাশিরোমণির টীকার নাম 'শব্দদীপিকা'। ইহাতে রামানন্দ ও দেবিদাসের নাম করা হইয়াছে। ভুল ব্যাখ্যা নিরসনপূর্বক মুগ্ধবোধকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করাই গোবিন্দরামের উদ্দেশ্য। এই ব্যাকরণের 'বালবোধিনী' টীকার প্রণেতা শ্রীবল্লভাচার্য বা শ্রীবল্লভবিদ্যাবাগীশ। তাঁহার পিতার নাম শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়। এই টীকাতে দুর্গাদাস, দেবিদাস, রামানন্দ ও বিদ্যানিবাসের টীকা হইতে উদ্ধৃতি আছে। রাধাকৃষ্ণ কবীন্দ্র চক্রবর্তীর পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র তর্কালঙ্কার চক্রবর্তী মুগ্ধবোধের 'প্রবোধাঙ্কুর' টীকার রচয়িতা। মুগ্ধবোধ-শিক্ষাকে সরলতা দান করাই এই টীকারচনার প্রধান উদ্দেশ্য। ছাত্রদিগকে শীঘ্র ব্যাকরণ-শিক্ষা দিবার জন্য কার্ত্তিকেয় সিদ্ধান্ত 'সুবোধা' টীকা রচনা করেন। তিনি বৈদ্যডাঙ্গা-নিবাসী পূর্বপুরুষগণের এক তালিকাও টীকার শেষে জুড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার পিতা ধীরমান, পিতামহ রামদেব। তদ্ধিতপাদের টীকান্তে তিনি (সিদ্ধান্ত-মহাশয়) প্রায়ই বিদ্যানিবাসের উল্লেখ করিয়াছেন এবং দুর্গাদাসের টীকার স্থূল উদ্ধারপূর্বক খণ্ডনও করিয়াছেন। ইহাতে রামতর্কবাগীশ, কাশীশ্বর এবং দয়ারাম বাচস্পতির নাম করা হইয়াছে। নবদ্বীপের মুগ্ধবোধসম্প্রদায়ে এই টীকার বহুল প্রচলন।

খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীয় ভরত মল্লিক মুগ্ধবোধের অতি বিখ্যাত পণ্ডিত। বর্ধমান জেলার জামগাঁ-র নিকটবর্তী 'পিড়্যা' ('পিণ্ডিরা') গ্রামে বিখ্যাত বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম। বৈদ্য হরিহর খান (নামান্তর মহাদেব সেন) তাঁহার পূর্বপুরুষ। 'ভরত সেন' নামেও তিনি পরিচিত । পিতার নাম গৌরাঙ্গ মল্লিক। ভরত ভূরিশ্রেষ্ঠীর (ভুরশুট পরগণা) রাজা প্রতাপ-

নারায়ণের (কাহারও মতে রাজা কল্যাণ মল্লের) সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজসভায় তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' এবং 'যশশ্চন্দ্ররায়' উপাধি লাভ করেন। তৎপ্রণীত বৈদ্য-কুলজী গ্রন্থ 'চন্দ্রপ্রভা'র স্বহস্ত-লিখিত পুঁথির শেষে ঃ 'ভরত মল্লিকস্য স্বহস্তলিখিতপুস্তকসমাপ্তিঃ। শকাব্দাঃ ১৫৯৭।' অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়গণনায় ১৬৭৫।৭৬ অব্দ। এই চন্দ্রপ্রভাতেই আছে ঃ

পরো ভরতমল্লিকো দ্বিজ-বৈদ্যাঙ্ঘ্রিসেবিতঃ।
ভূরিশ্রেষ্ঠমহীপাল-সভা-পণ্ডিতবিশ্রুতঃ।।

ভুরশুটের রাজা কৃষ্ণরায়ের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র, তৎপুত্র গজমল্ল, তৎপুত্র কল্যাণমল্লই কল্যাণানন্দ বা প্রতাপনারায়ণ। ইনি সম্রাট্ সাহ্জাহানের তথা ঔরঙ্গজীবের অধীনে রাজা উপাধি লাভ করিয়া খুব সম্ভব ১৬৫২-৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভুরশুটে জমিদারী করিয়া গিয়াছেন।

ভরত মল্লিক মুগ্ধবোধের সরাসরি কোনও টীকা রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা না গেলেও এই ব্যাকরণানুসারী তৎপ্রণীত একাধিক গ্রন্থ বিদ্যমান। এইসব গ্রন্থ হইতে তিনি যে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ছিলেন তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ধাত্রী গ্রামে টোল খুলিয়া তিনি শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন। অমরকোষের 'মুগ্ধবোধিনী'টীকা, ভট্টিকাব্যেরও ঐ নামের টীকা, 'লিঙ্গাদিসংগ্রহ', 'উপসর্গবৃত্তি', 'কারকোল্লাস', 'দ্রুতবোধ ব্যাকরণ' ও ইহার 'দ্রুতবোধিনী' বৃত্তি, 'একবর্ণার্থসংগ্রহ', 'দ্বিরূপধ্বনি-সংগ্রহ', 'সুখলেখন' প্রভৃতি শব্দবিদ্যার গ্রন্থ তাঁহার রচনা। দ্রুতবোধ ব্যাকরণ শ্লোকবদ্ধ এবং মুগ্ধবোধের মতানুসরণে রচিত। দ্রুতবোধিনী উহার দীর্ঘ ব্যাখ্যা। 'প্রসিদ্ধপদবোধ' নামে তিনি দ্রুতবোধের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণও প্রণয়ন করেন। কারকোল্লাসও শ্লোকে রচিত ; মোট ১০৭টি শ্লোক। শিক্ষার্থীদের প্রারম্ভিক স্তরে কারক শিক্ষা দেওয়া এই পুস্তকরচনার উদ্দেশ্য। নির্দিষ্ট কোনও ব্যাকরণকে অনুসরণ না করিয়া সর্বসম্মত পদ্ধতিতে কারকের কথা বলা হইলেও মুগ্ধবোধ-সম্প্রদায়ে এই পুস্তকের বিশেষ সমাদর। ইহাতে প্রধানতঃ কৃষ্ণ ও শিবের নামাবলম্বনে উদাহরণসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে ঃ

ত্রাতা ভবতি গোবিন্দঃ সদা ভাতি মহেশ্বরঃ।
চিত্তে তিষ্ঠতু মে শম্ভুরেবমন্যেঽপ্যকর্মকাঃ।।

সুখলেখন-পুস্তকে প্রথমে ব্যাকরণের ষত্ব-ণত্ববিষয়ক প্রক্রিয়া. পরে এক-তালব্য, দ্বি-তালব্য, তালব্য-মূর্ধন্যাদি শব্দসমূহের অর্থ ও লিঙ্গগত

বৈশিষ্ট্য, শব্দের বানান-বিষয়ে প্রচলিত ব্যবস্থা হইতে ব্যবস্থান্তর প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলে ইহাতে একাধারে কোষ ও ব্যাকরণের মিলিত উদ্দেশ্য অংশতঃ সিদ্ধ হইয়াছে। রত্নকৌমুদী, সারকৌমুদী নামক বৈদ্যক গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছেন।

মধুসূদন বাচস্পতি 'মধুমতী' নামে মুগ্ধবোধের টীকা রচনা করেন। ইহার উদ্দেশ্য মুগ্ধবোধের বিষয়বস্তুকে আরও সংক্ষেপে শিক্ষা দেওয়া। এই ব্যাকরণের 'সংস্কারমঞ্জরী' টীকাও তাঁহার রচনা। ইহার নামান্তর 'সংস্কার-সম্মঞ্জরী'। তিনি 'চট্টকুলোদ্ভব মধুসূদন ভট্টাচার্য'। মিথিলা বা ত্রিহুতের অধিবাসী জনৈক 'মিশ্র', 'ছটা' নামে মুগ্ধবোধের যে টীকা রচনা করেন, তাহাই বোধহয় একমাত্র (?) অবাঙ্গালী-রচিত টীকা। ভোলানাথ মিশ্র এবং রাধাবল্লভ তর্কপঞ্চানন মুগ্ধবোধের যথাক্রমে 'সন্দর্ভামৃততোষিণী' এবং 'মুগ্ধবোধসুবোধিনী' টীকার রচয়িতা। বাসুদেব-রচিত 'মুগ্ধবোধপ্রদীপ'ও এক টীকা। এইসব ভিন্ন রামপ্রসাদ তর্কবাগীশ, দয়ারাম বাচস্পতি, রতিকান্ত তর্কবাগীশ, রামদাস, মহাদেব কণ্ঠাভরণ, রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি অনেকে মুগ্ধবোধের টীকা রচনা করেন।

নন্দকিশোর শর্মাই বোধহয়, মুগ্ধবোধের প্রথম (১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ?) পরিশিষ্টকার। ইহা মুগ্ধবোধের অনুক্ত বিষয়সমূহের পরিপূরক। প্রারম্ভে ঃ 'সু মৌগ্ধবোধং পরিশিষ্টমুচ্যতে সমাসতো নন্দকিশোরশর্মণা।' ইনি সম্ভবতঃ বঙ্গীয় নহেন। কাহারও মতে ১৭৫৬ শকাব্দে (১৮৩৪/৩৫ খ্রীঃ) এই পরিশিষ্ট রচিত হয়। কুমারহট্ট বা হালিশহরের শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র গঙ্গাধর তর্কবাগীশ 'সেতুসংগ্রহ' নামে ১৭৫৭ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৮৩৫/৩৬) মুগ্ধবোধের টীকা রচনা করেন। তিনি ছিলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, যেখানে প্রথম হইতেই মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল দেখা যায়। তিনি 'ব্যাকরণ সংগ্রহ' নামে মুগ্ধবোধের এক সরল সারসংগ্রহও রচনা করেন। এই দুই গ্রন্থেরই প্রারম্ভে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণকে 'দুর্গম্য' এবং 'দুর্বোধ' বলা হইয়াছে। নলডাঙ্গার রাজপণ্ডিত নবদ্বীপের মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত (১৭৮৩-১৮৬৫) মুগ্ধবোধের এক টীকা রচনা করেন।

(৬)

'কবিকল্পদ্রুম' বোপদেব-রচিত ধাতুবিষয়ক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। শ্লোকে নিবদ্ধ এই গ্রন্থে অকারান্তবর্গ, আকারান্তবর্গ,...কান্তবর্গ, খান্তবর্গ, গান্তবর্গ ইত্যাদিক্রমে অ্‌ হইতে হ্‌ পর্যন্ত অন্ত্যবর্ণানুসারে সমস্ত ধাতু সজ্জিত। বিভিন্ন ব্যাকরণমতের আলোচনাপূর্বক রচিত বলিয়া সমস্ত ব্যাকরণ-সম্প্রদায়েই ইহার সমাদর। গ্রন্থারম্ভে ঃ

ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রাজয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ।।
মতানি তেষামালোক্য সর্বসাধারণঃ স্ফুটঃ।
ধাতুপাঠঃ স্বদাদ্যাদ্য ক্রমাদন্তাদিমক্রমঃ।।
কবিকল্পদ্রুমোনাম পদ্যৈর্নিষ্পাদ্যতেঽত্র চ।
ধাতবঃ পঠিতাঃ পাঠসূত্রলোকাগমস্থিতাঃ।।

বিভিন্ন ধাতুপাঠে পঠিত ধাতু, লৌকিক ধাতু, বৈদিক ধাতু এবং ৪২টি সৌত্র ধাতু (সূত্রেপঠিত ধাতু) মিলাইয়া মোট ১৭৫৪টি ('সপ্তদশ শত্যা ষট্‌কোনষষ্ট্যা') ধাতু এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, যদিও গণনায় আমরা পাইয়াছি ১৭৫৬টি। বিন্যাসের দিক্‌ দিয়া বোপদেবই সর্বপ্রথম সমগ্র ধাতুপাঠকে ধাতুসমূহের অন্তিম বর্ণানুসারে সজ্জিত করেন।

কবিকল্পদ্রুমের বোপদেব-রচিত 'কাব্যকামধেনু' এবং দুর্গাদাস-কৃত 'ধাতুদীপিকা' টীকা ব্যতীত রামরাম ন্যায়ালঙ্কার-রচিত এক টীকাও ('কবিকল্পদ্রুমভাষ্য'?) পাওয়া গিয়াছে। এই টীকায় গোয়ীচন্দ্র, ত্রিলোচন, রামতর্কবাগীশ, ভট্টমল্ল, মৈত্রেয় (রক্ষিত) এবং 'বিস্তরবৃত্তি'র উল্লেখ বিদ্যমান। খ্রীঃ ১৭শ শতকে নারায়ণ নামক জনৈক পণ্ডিত কবিকল্পদ্রুমের অনুকরণে ধাতুবিষয়ক একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ইহা ছাড়া 'মুগ্ধবোধ ধাতুবৃত্তি' নামে দামোদর-রচিত আর এক গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়। মুখোপাধ্যায়বংশীয় মৃত্যুঞ্জয় সরস্বতীর পুত্র ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন-ভট্টাচার্য-প্রণীত 'ধাতুচন্দ্রিকা' মুগ্ধবোধানুসারী ধাতুগ্রন্থ।

পাণিনীয় সম্প্রদায়ে রামশর্ম-প্রণীত পদ্যবদ্ধ উণাদিকোষের এক টীকা রচনা করিয়া রামচন্দ্র তর্কবাগীশ ইহাকে মুগ্ধবোধ-সম্প্রদায়ের উপযোগী করিয়া লন।

'কারকলক্ষণ' পদ্যাত্মক এবং মুগ্ধবোধ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। উদ্ধৃতিবহুল এবং উন্নত ধরনের রচনা। রচয়িতার নাম জানা যায় নাই। এই

সম্প্রদায়ের কারকসম্বন্ধীয় আর এক গ্রন্থ 'কারকচন্দ্রিকা'—রামচন্দ্র বিদ্যাভূষণের রচনা। ইহা প্রাচীন কারিকার ভিত্তিতে রচিত। ভরত মল্লিকের কারকোল্লাসের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

'মুগ্ধবোধপরিভাষাটীকা' নামে গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। পুষ্পিকায় ইহাকে '...বোপদেবসঙ্কলিতপরিভাষাসংযুক্তটীকা' বলা হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ে রামচন্দ্র বিদ্যাভূষণের নামে এক 'পরিভাষা-বৃত্তি' পাওয়া গিয়াছে। ১৬১০ শকাব্দে (১৬৮৮/৮৯) ইহার রচনা।

ত্রিবেণীর বিখ্যাত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ছাত্র রামচন্দ্রবিদ্যালঙ্কার দুর্গাদাসের টীকা হইতে পরিপূরক সূত্রসমূহ সংগ্রহপূর্বক 'বার্ত্তিকমালা' নামে এক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ইহা খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর ঘটনা। বার্ত্তিকমালার প্রারম্ভে লিখিত আছে ঃ

> শ্রীদুর্গাদাসমাহাত্ম্যং জ্ঞাতুং কঃ ক্ষমতে যতঃ।
> মূলস্রষ্টুরসাধ্যং যৎ পদং তৎ সাধ্যতে পরৈঃ।।
> তট্টীকাসাগরপ্রাপ্তলক্ষ্যলক্ষণ-মৌক্তিকৈঃ।
> রম্যা বার্ত্তিকমালেয়ং ক্রমসূত্রেণ তন্যতে।।

মুগ্ধবোধে বিদ্যালঙ্কার-কৃত এক সুবন্তটিপ্পনীর কথা শুনা যায়। 'দুর্বার্ত্তিক-লক্ষণ' নামে এই সম্প্রদায়ের আর এক গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে —যাহা ঐ বার্ত্তিক-বিষয়ক। ইহা দুর্গাদাসের রচনা বলিয়া অনুমিত।

মুগ্ধবোধের অবলম্বনে গদ্যে ও পদ্যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ একাধিক ব্যাকরণগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ভরত মল্লিকের 'দ্রুতবোধ'-এর কথা আগেই বলিয়াছি। গত শতাব্দীর শেষ দিকেও এই জাতীয় গ্রন্থরচনার খবর পাওয়া যায়। ১৮১২ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৮৯০/৯১) হরনাথ বিদ্যারত্ন 'সুগম মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' নামে এক শ্লোকাত্মক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে সন্ধি, শব্দ, ধাতু, কারক, সমাস, তদ্ধিত ও কৃৎ ইত্যাদি ব্যাকরণের সমস্ত প্রধান বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইহা মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়। রচনা আশানুরূপ প্রাঞ্জল হয় নাই ; বিষয়বস্তুর আপাত কাঠিন্য অবশ্য ইহার অন্যতম প্রধান কারণ।

১৮১৬ শকাব্দে (১৮৯৪/৯৫ খ্রীঃ) হুগলী জেলার পূর্বস্থলী গ্রামনিবাসী মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মুগ্ধবোধের অভাব-স্থলগুলির পূর্ণতা-বিধানপূর্বক 'বৃহন্মুগ্ধবোধ' নামে ইহাকে এক পরিবর্ধিত

আকার প্রদান করেন। চারি বৎসর পরে কলিকাতায় ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহাতে মুগ্ধবোধের সমস্ত অসুবিধা দূর করার চেষ্টা লক্ষণীয়। বিজ্ঞপ্তিতে কৃষ্ণনাথ লিখিয়াছেন ঃ

> ...ইহাতে আচার্য্যের সমস্ত সূত্র, বৃত্তি ও উদাহরণ অবিকল থাকিল, যে যে অংশের ন্যূনতা আছে ঐ অংশগুলির স্থলবিশেষে স্বকৃত সূত্র, বৃত্তি ও উদাহরণ সন্নিবেশনপূর্বক ন্যূনতা পরিহার করিয়াছি। আদি পদগ্রাহ্য গণগুলি সেই সেই স্থানে নিবেশিত করিয়াছি ; ইহাদ্বারা মুগ্ধবোধাধ্যায়ীদের অসাধ্য সাধনের নিমিত্ত ব্যাকরণান্তরের অনুসন্ধান ও তদর্থগ্রহের নিমিত্ত অধ্যাপক-বিশেষের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে না। মুগ্ধবোধ হইতেই নিখিল বিষয়ের আস্বাদন করিতে পারিবেন।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং নবদ্বীপ-নিবাসী শিবনারায়ণ শিরোমণি-কৃত মুগ্ধবোধের কঠিন স্থলসমূহের বিশদ টিপ্পনীসহ এবং রামচন্দ্র তর্কবাগীশ ও দুর্গাদাসের টীকাসম্বলিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ সন ১৩২৩ সালে (খ্রীঃ ১৯১৬/১৭) কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সম্পাদনায় কলিকাতায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহাতে অতি নিপুণতার সহিত উক্ত টীকাদ্বয়ের সম্পাদনা করা হইয়াছে।

ব্যাকরণক্ষেত্রে মুগ্ধবোধের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে অন্য সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ ভট্টোজি দীক্ষিতাদি নব্য-পাণিনীয় বৈয়াকরণদিগের কম বেগ পাইতে হয় নাই। ভট্টোজির 'শব্দকৌস্তুভ' এবং 'প্রৌঢ়মনোরমা' গ্রন্থে ইহার প্রচুর নিদর্শন বর্তমান। নিম্নে এইরূপ একটি স্থলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে ঃ পাণিনির 'পূর্বত্রাসিদ্ধম্' (৮।২।১) সূত্রের কাশিকাবৃত্তিতে 'শুষ্কিকা শুষ্কজঙ্ঘা চ...' ইত্যাদি শ্লোকবার্তিক উদ্ধৃত করিয়া তদন্তর্গত 'ঔজঢ়ৎ' পদের ব্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গে যে 'ঔজিঢ়ৎ' পদও প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদে বোপদেব কাব্যকামধেনুতে লেখেন ঃ '...যত্তু বামনেন কাশিকায়াং পূর্বত্রাসিদ্ধমিতি সূত্রে ঔজঢ়ৎ ইত্যাদাহৃত্য ক্তিন্নন্তস্য ত্বৌজিঢ়দিত্যুক্তম্...তদ্ বৈয়াঘ্রপদ্যবার্তিক শ্রোত্রিয়-শ্রদ্ধাজাড্যমূলম্...।' মুগ্ধবোধের ৮৫৬ নং সূত্রের বৃত্তিতেও তিনি লিখিয়াছেন ঃ '...ঔড়িঢ়ৎ। ঔজিঢ়দিত্যেকে।' টীকাকার রামতর্কবাগীশ এবং দুর্গাদাসের অভিমত এই যে, 'ঔজঢ়ৎ' এবং 'ঔজিঢ়ৎ'[৬] পদ

দুইটি পাতঞ্জল মহাভাষ্য-বিরুদ্ধ বলিয়া বোপদেব ইহাদের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করেন নাই। খ্রীঃ ১৪শ শতকে সায়ণাচার্য-কর্তৃক 'মাধবীয় ধাতুবৃত্তি'তে (১০।১০২) বোপদেবের উক্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য এবং কাশিকাবৃত্তিকৃৎ বামনের উক্তি সমর্থিত হওয়ায়, খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীতে ভট্টোজি দীক্ষিত মহাভাষ্যের টীকা শব্দকৌস্তুভে (১।১।৮) লিখিলেন ঃ

বোপদেবমহাগ্রাহগ্রস্তো বামনদিগ্‌গজঃ।
কীর্তেরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন বিমোচিতঃ।।

অর্থাৎ পূর্বে যেমন গজ-কচ্ছপের যুদ্ধে মাধব (নারায়ণ)-কর্তৃক বামন নামক দিগ্‌গজ কূর্ম-কবল হইতে মুক্ত হন, সেইরূপ এই ক্ষেত্রেও বোপদেবরূপ হাঙ্গরের করাল গ্রাস হইতে মাধবাচার্য (এখানে ভট্টোজি সায়ণ-রচিত 'মাধবীয় ধাতুবৃত্তি'কে সায়ণাগ্রজ মাধবাচার্যের রচনা বলিয়া ধরিয়াছেন) কাশিকাবৃত্তি-প্রণেতা দিগ্‌গজসদৃশ বামনকে তাঁহার কীর্তি-রক্ষার অভিপ্রায়ে 'কৃৎ'ধাতুর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে (কৃৎ ধাতুর উত্তর পাণিনীয় ৩।৩।৯৭ সূত্রানুসারে 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া 'কীর্তি' হয়) বিমুক্ত করেন। নামসাদৃশ্যে তুলনাটি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সর্বশেষে বোপদেব-শিষ্য-কৃত প্রশস্তিসহ মুগ্ধবোধ-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি ঃ

দ্যৌর্বাচস্পতিনেব পন্নগপুরী শেষাহিনেবাভবৎ
যেনৈকেন বিদুষ্মতী বসুমতী মুখ্যেন সংখ্যাবতাম্।
সোঽয়ং ব্যাকরণার্ণবৈকতরণী চাতুর্যচিন্তামণি-
র্জীয়াৎ কোবিদগর্বপর্বতপবিঃ শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ।।

---

১ ১৮১৮ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৮৯৬/৯৭) এই পুস্তক 'বোপদেববৈদ্যশতক' নামে বোম্বাই হইতে হিন্দী অনুবাদসহ সর্বপ্রথম মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়।

২ 'প্রক্রিয়াকৌমুদী'র (৭।১।৬০) প্রসাদ-টীকায় বিট্‌ঠলাচার্য বোপদেব-রচিত বলিয়া 'রামব্যাকরণ' হইতে যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহা মুগ্ধবোধব্যাকরণে পাওয়া গেলে বুঝিতে হইবে মুগ্ধবোধকে প্রথমে রামব্যাকরণ বলা হইত এবং বোপদেব দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র বা রামদেবরাও-র (১২৭১-১৩০৯ খ্রীঃ) প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ স্বরচিত ব্যাকরণের রামনামযুক্ত নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রসাদে (৩।১।১৩৮) 'মুগ্ধবোধপ্রদীপ' হইতে উদ্ধৃত হওয়ায় এবং প্রসাদের একাধিকস্থলে (১।২।২৬, ৭।১।৬০) রামব্যাকরণের নামে কেবল শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় প্রমাণিত যে, বোপদেব রামব্যাকরণ নামে শ্লোকাত্মক পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

২ 'অইউঋঌক্, এওঙ্, ঐঔচ্, হযবরল, ঞণনঙম, ঝঢধঘভ, জডদগব, খফছঠথ, চটতকপ, শষসাদ্যন্তাখ্যাঃ' (৩)।।

৩ বর্তমানে পণ্ডিতদের মত এই যে, 'ভাষাপরিচ্ছেদ' এবং তাহার টীকা 'ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' দুই-এরই রচয়িতা কৃষ্ণদাস সার্বভৌম, বিশ্বনাথ নহেন।

৪ ইহার নাম 'প্রাকৃতকল্পতরু'। ইহার ১ম শাখা L. Nitti Dolci-কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে প্রকাশিত হইয়াছে।

৫ A descriptive catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Asiatic Society of Bengal, 1st part—grammar, ed. by Rajendralala Mitra, LL.D., Calcutta, 1877.

৬ বহ্ (ধাতু) + ক্ত = ঊঢ়, অর্থ—বিবাহিত ; বহ্ (ধাতু) + ক্তিন্ = ঊঢ়ি, অর্থ—বিবাহ। ঊঢ় এবং ঊঢ়ি এই দুই পদকে নামধাতু-ণিচ্ করিয়া ইহাদের উত্তর লুঙ্ দ্ করিলে যথাক্রমে 'ঔজঢ়ৎ' এবং 'ঔজিঢ়ৎ' পদ হয়, অর্থ যথাক্রমে 'বিবাহিতকে বলিয়াছিল' এবং 'বিবাহকে বলিয়াছিল'। কথিত আছেঃ 'অজর্ঘাশ্চ অবর্বাশ্চ যো ন জানাতি ঐয়রুঃ। ঔজঢ়ৎ যো ন জানাতি তস্মৈ কন্যা ন দীয়তে।।' দুর্গসিংহ কাতন্ত্রব্যাকরণের (আ. ৯২) দৌর্গ বৃত্তিতে 'ঊঢ়মাখ্যাতবান্' অর্থে ঔজঢ়ৎ পদের উল্লেখ করিয়া 'অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গ ইত্যেকে' লিখিয়াছেন। এই ব্যাকরণমতে 'ঔঢ়ঢ়ৎ' পদ সিদ্ধ এবং 'যদাক্ত্যন্তাদূঢ়িশব্দাদিন্ চণৌ, তদা ঔড়িঢ়দিতি ভবতি।'—ঐ পঞ্জী। ঐয়রুঃ = ঋ + অন্ → ঋ + ঋ + অন্ → ই + ঋ + অন্ → ই + ঋ + উস্ ; অর্থ—গমন করিয়াছিল।

সুপদ্ম ব্যাকরণ

(খ্রীঃ ১৪শ শতক)

পদ্মনাভ দত্ত সুপদ্ম ব্যাকরণের প্রণেতা। মিথিলায় কর্ণাটকী (?) রাজত্বের অবসানে খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে নান্যদেব-কর্তৃক এক ব্রাহ্মণ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই বংশীয়দেরই রাজত্বকালে খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীতে পদ্মনাভ এই ব্যাকরণ রচনা করেন। রামনাথ সিদ্ধান্ত-রচিত "পরিভাষাবৃত্তির" টীকা হইতে জানা যায়, পদ্মনাভ দত্ত ছিলেন মিথিলার 'ভোর'গ্রামের অধিবাসী, দামোদর দত্তের পুত্র এবং শ্রীদত্তের পৌত্র : 'ভোরগ্রামবাসি-মৈথিল-মহামহোপাধ্যায় শ্রীদত্তাত্মজ সূনুনা... তদাত্মজদামোদরদত্ত তৎপুত্রেণ শ্রীপদ্মনাভ দত্তেন পরিভাষাবৃত্তি-র্বিশেষেণ ভাষ্যতে...।' এই পরিভাষাবৃত্তিরই অন্তে পদ্মনাভের রচনা বলিয়া কথিত কতকগুলি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি মুখ্যতঃ তাঁহার পূর্বপুরুষদের নাম এবং তাঁহাদের অধীত শাস্ত্রাদির বর্ণনা। সেখানে রাজা বিক্রমাদিত্যের অন্যতম সভাসদ্ বররুচি হইতে পদ্মনাভের বংশক্রম দেখানো হইয়াছে :

> ...সদা বন্দে বিক্রমো যত্র ভূপতিঃ। কালিদাসাদয়স্তত্র সংখ্যাবন্তঃ সহস্রশঃ। তেষামেকো বররুচিঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ। তৎসুতো ন্যাসদত্তশ্চ ফণিভাষ্যার্থতত্ত্ববিৎ। তৎসুতো দুর্ঘটোজ্ঞেয়ঃ পাণিনীয়ার্থতত্ত্ববিৎ। জয়াদিত্যস্তৎসুতশ্চ মীমাংসাশাস্ত্রপারগঃ। শ্রীপতিস্তৎসুতশ্চৈব সাংখ্যশাস্ত্রবিশারদঃ। গণেশ্বরস্তৎসুতশ্চ কাব্য-শাস্ত্রবিশারদঃ। ভানুভট্টস্তৎসুতশ্চ রসমঞ্জরীকারকঃ। হলায়ুধস্তৎ-সুতশ্চ মীমাংসাশাস্ত্রপারগঃ (বা 'বেদমন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ')। শ্রীদত্তস্তৎ-সুতশ্চৈব স্মৃতিশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ। তৎসুতো ভবদত্তশ্চ বেদান্তী কবিসত্তমঃ। দামোদরস্তৎসুতশ্চ কাব্যালঙ্কারকারকঃ। তৎসুতঃ পদ্মনাভোঽহং ময়ৈবৈতন্নিগদ্যতে।।'

এই মতে পদ্মনাভের পিতা দামোদর, কিন্তু পিতামহ ভবদত্ত এবং প্রপিতামহ শ্রীদত্ত—যিনি, রামনাথ সিদ্ধান্তের মতে পদ্মনাভের পিতামহ।

পদ্মনাভের পৃষোদরাদিবৃত্তির শেষে তাঁহার সময়নির্দেশক এই শ্লোকটি পাওয়া গিয়াছে ঃ

শাকে শৈলনবাদিত্যে চৈত্রে মাসি রবেঃ স্থিতৌ।
দ্বিজেন পদ্মনাভেন ভাষাসূত্রমিদং কৃতম্।।

অর্থাৎ ১২৯৭ শকাব্দের চৈত্র মাসে (১৩৭৬ খ্রীঃ) দ্বিজ পদ্মনাভ এই গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নের শ্লোকগুলিতে তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর নাম পাওয়া যায় ঃ

পাণিন্যাদ্যবভাষ্যভাষ্যবিতত গ্রন্থার্থমালোকনাৎ।
বক্তুং যুক্তমিদং সদর্থরুচিরং সম্পূর্ণমাবিষ্কৃতম্।।
দিঙ্‌মাত্রং দর্শিতং কিন্তু সকলার্থ-বিকাশনম্।
ধৈর্যাবধেয়ং ধীরাঃ শ্রীপদ্মনাভনিবেদিতম্।।
উক্তো ব্যাকরণাদর্শঃ সুপদ্মস্তস্য পঞ্জিকা।
ততো হি বালবোধায় প্রয়োগাণাঞ্চ দীপিকা।।
উণাদিবৃত্তীরচিতা তথাচ ধাতুকৌমুদী (পাঠান্তর—'ধাতুচন্দ্রিকা')।
তথৈব যঙ্‌লুকো বৃত্তিঃ পরিভাষা ততঃপরম্।।
গোপালচরিতং নাম সাহিত্যে গ্রন্থরত্নকম্।
আনন্দলহরীটীকা টীকা মাঘে বিনির্মিতা।।
ছন্দোরত্নং ছন্দসি চ স্মৃতাবাচারচন্দ্রিকা।
কোশে ভূরিপ্রয়োগাখ্যো রচিতস্তত যত্নতঃ।।
ধীরাঃ শ্রীপদ্মনাভেন গৃহ্যতে হ্যয়মঞ্জলিঃ।
সংস্কার্যাঃ প্রতিপাল্যা বঃ পুত্রবন্মম পুস্তকাঃ।।

এই বর্ণনানুসারে পদ্মনাভের রচিত গ্রন্থগুলি যথাক্রমে (১) সুপদ্ম ব্যাকরণ, (২) সুপদ্ম পঞ্জিকা, (৩) প্রয়োগদীপিকা, (৪) যঙ্‌লুগাদিবৃত্তি, (৫) উণাদিবৃত্তি, (৬) ধাতুকৌমুদী বা ধাতুচন্দ্রিকা, (৭) পরিভাষাবৃত্তি, (৮) গোপালচরিত, (৯) আনন্দলহরীটীকা, (১০) মাঘ কবি-রচিত শিশুপাল-বধের টীকা, (১১) ছন্দোরত্ন, (১২) আচারচন্দ্রিকা এবং (১৩) ভূরিপ্রয়োগ। ইহাদের প্রথম সাতখানা ব্যাকরণ-গ্রন্থ, পরবর্তী তিনখানা সাহিত্যবিষয়ক, এবং বাকী তিনখানা যথাক্রমে ছন্দঃ, স্মৃতি এবং শব্দকোষ বিষয়ক গ্রন্থ। এই সব হইতে প্রমাণিত হয়, শব্দশাস্ত্রই ছিল তাঁহার মুখ্য আলোচ্য বিষয় এবং সেক্ষেত্রে তিনি কেবল সূত্রপ্রধান একক ব্যাকরণগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া ইহার আনুষঙ্গিক

গ্রন্থাদির ও রচনার দ্বারা এক স্বতন্ত্র ব্যাকরণসম্প্রদায়-নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

(২)

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণই সুপদ্ম ব্যাকরণের ভিত্তি। ইহার সূত্রাবলী অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলিরই সরলীকৃত রূপায়ণ-বিশেষ। পাণিনির প্রত্যাহার-সূত্রগুলি গ্রহণ করা হইলেও তাঁহার স্বর ও বৈদিকাংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। তাই ব্যাকরণের প্রারম্ভেই ঘোষিত হইয়াছে—'পদ্মনাভঃ স্ফুটং পূর্ণং ভাষায়ামাহলক্ষণম্'—'ভাষায়াং বৈদিকাতিরিক্ত সংস্কৃতরূপায়াং প্রকৃতি-প্রত্যয়বিভাগেন লৌকিকশব্দব্যুৎপাদন-লক্ষণায়ামিত্যর্থঃ'—ঐ বৃত্তি। অর্থাৎ 'বৈদিকাতিরিক্ত লৌকিক সংস্কৃতরূপা' ভাষার (এককথায় সংস্কৃত ভাষার) এই ব্যাকরণ। ইহার সংজ্ঞা-বিজ্ঞানও অষ্টাধ্যায়ীর অনুরূপ। সমশ্রেণীর অন্যান্য ব্যাকরণের তুলনায় ইহাতে ভাষ্য-বার্ত্তিকাদির মতগ্রহণও অধিক লক্ষিত হয়।

সুপদ্মের সূত্রসংখ্যা ন্যূনাধিক ২৮০০। বিভিন্ন সংস্করণে এই সংখ্যা ২৭৯৮ হইতে ২৮৪৫ পর্যন্ত পাওয়া যায়। বিষয়-বিন্যাস সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার্থীর সবিশেষ অনুকূল : সংজ্ঞা, সন্ধি, ষত্ব, ণত্ব, কারক, বিভক্তি, সুবন্ত, সর্বনাম, সনন্তাদি, ঙিৎ, পদকদম্ব, অট্, কৃৎ, সমাস, অলুক্ ও তদ্ধিত (বৃদ্ধি-তদ্ধিত, স্ত্রী-তদ্ধিত, শেষ-তদ্ধিত ও মধু-তদ্ধিত)। এই ব্যাকরণের কারক, বিভক্তি, সমাস ও তদ্ধিত-প্রকরণ অতিশয় প্রাঞ্জল ও পরিপাটী।

পদ্মনাভ স্বয়ং সূত্রসমূহের যে বৃত্তি রচনা করেন তাহার নাম 'সুপদ্ম-বিবরণ'। তৎকৃত 'সুপদ্মবিবরণ পঞ্জিকা' (সুপদ্ম পঞ্জিকা) এখনও পাওয়া যায় নাই। সুপদ্মের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা বিষ্ণু মিশ্র। তাঁহার ব্যাখ্যার নাম 'সুপদ্মমকরন্দ'। ইহা বিশ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগের নাম বিন্দু। সুপদ্ম যেন পদ্মফুল, মকরন্দ উহার মধু এবং উক্ত বিভাগগুলি সেই মধুর এক একটি বিন্দুর মতন—কল্পনাটি সুন্দর। 'সুপদ্ম-মকরন্দ-প্রকাশ'নামেও এক গ্রন্থের কথা শুনা যায়। বিষ্ণুমিশ্রের গ্রন্থের ভিত্তিতে রামশঙ্কর তর্কপঞ্চানন 'শঙ্করী' নামে এক টীকা রচনা করেন।

পদ্মনাভের উণাদিবৃত্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ইহার দুইটি পাদ। প্রথম পাদে স্বরাদিপ্রত্যয় এবং দ্বিতীয় পাদে ব্যঞ্জনাদি প্রত্যয়গুলিকে অন্ত্য-বর্ণানুসারে ককারাদিক্রমে সাজানো হইয়াছে। প্রারম্ভিক শ্লোকদ্বয় এইরূপঃ

প্রণম্য গোপীজনবল্লভং হরিং সুপদ্মকারেণ বিধীয়তেঽধুনা।
অচোঽত্বকাদি ক্রমতোঽজ্ঝলন্তয়োরুণাদিবৃত্তেরিতি সারসংগ্রহঃ।।
বুধৈরুণাদের্বহুধা কৃতোঽস্তি যো মনীষিদামোদরদত্তসূনুনা।
স পদ্মনাভেন সুপদ্মসম্মতং বিধিঃ সমগ্রঃ সুগমং সমস্যতে।।

অনুপ্রাস-বহুল শেষ পংক্তিটি বড় শ্রুতিমধুর হইয়াছে। পাণিনীয় সম্প্রদায়ে প্রচলিত উণাদি সূত্রাবলীর সহিত সৌপদ্ম উণাদি সূত্রগুলির বিশেষ সাদৃশ্য নাই। পদ্মনাভের পৃষোদরাদিবৃত্তিও এই উণাদিসূত্রবৃত্তিরই অংশ। অন্যান্য ব্যাকরণে পৃষোদরাদিকে সমাসের এবং উণাদিকে কৃৎপ্রকরণের পরিশিষ্টরূপে উপস্থাপিত করা হইলেও পদ্মনাভ উভয়কেই একত্র গ্রথিত করিয়াছেন। রূপনারায়ণ চক্রবর্তীর পুত্র রামগোবিন্দ পদ্মনাভের উণাদিবৃত্তি হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া এক শব্দকোষ প্রস্তুত করেন ; ইহার নাম 'শব্দাব্ধিতরী'। ইহার গঠন-পদ্ধতি এবং বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে গ্রন্থের গোড়াতেই বলা হইয়াছে ঃ

আদৌ প্রত্যয়মদ্রূপমুক্ত্বাঽজন্তহসন্তয়োঃ।
কাদিক্রমেণ কথয়াম্যুণাদীন্ প্রত্যয়ানহম্।।
পৃষোদরাদৌ বিদ্বদ্ভিস্তত্র সিদ্ধা নিরুক্তিতঃ।
রূঢ়িশব্দাঃ প্রপঠ্যন্তে যদৃচ্ছালক্ষণান্বিতাঃ।।

১৬৬৭ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৭৪৫) রামনাথ সিদ্ধান্ত পদ্মনাভের পরিভাষাবৃত্তির এক টীকা লিখেন। পদ্মনাভের 'ধাতুকৌমুদী'র টীকা 'ধাতুনির্ণয়' ; রচয়িতা অজ্ঞাত। 'প্রয়োগদীপিকা'—কোমলমতি বালকদের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী পুস্তক। ইহার স্বরূপ ঃ

বরদং মাধবং নত্বা বালবোধায় দীপিকা।
এষা সুপদ্মকারেণ প্রয়োগাণাং বিনির্মিতা।।
কারকাণাং চ সন্ধীনাং সমাসানাং সমুচ্চয়ঃ।
কৃতাং চ তদ্ধিতানাং চ সমাসেনাত্র কীর্তিতঃ।।

এই পুস্তকে কারক, সন্ধি, সমাস, কৃৎ ও তদ্ধিতের প্রয়োগগুলি ক্রমান্বয়ে উদাহৃত হইয়াছে। শব্দরূপাদর্শ-স্বরূপ 'সুবন্তপ্রক্রিয়া' নামে এক পুস্তকের কর্তৃত্ব পদ্মনাভে আরোপিত দৃষ্ট হয়।

সুন্দর ও জয়ার পুত্র বলিয়া কথিত এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি 'গণপঙক্তিকা' নামে এক শ্লোকবদ্ধ ধাতুপাঠ রচনা করেন। ইহার প্রথমে বলা হইয়াছে ঃ 'শ্রীবিষ্ণূক্তং গণং ব্রূয়াজ্জয়া-সুন্দরজঃ শুভম্।'

এই 'শ্রীবিষ্ণু' পূর্বোক্ত বিষ্ণুমিশ্র ব্যতীত অপর কেহ নহেন। শ্রীবিষ্ণু-কৃত 'কল্পলতা' নামে এই ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের এক ধাতুগণবৃত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার সর্বশেষে 'শাকে মহেশক্ষণতর্কভেদ সুধাময়ূখৈর্গণিতে দ্বিজেন। শ্রীবিষ্ণুনেয়ং নিরমায়ি যত্নাৎ সুপদ্মকর্তুর্গণধাতুবৃত্তিঃ।। ইতি গণবৃত্তৌ কল্প-লতাখ্যায়াং স্বার্থণিজন্তচুরাদিবৃত্তিঃ সমাপ্তা' উক্তি হইতে শ্রীবিষ্ণুর (বিষ্ণুমিশ্রের) অভ্যুদয়কাল ১৫১১ শকাব্দ (১৫৮৯/৯০ খ্রীষ্টাব্দ) পাওয়া যায়। তাঁহার এই রচনা অর্থাৎ গণবৃত্তি 'কল্পলতা' পদ্মনাভের 'ধাতুকৌমুদী'র উপর প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। 'কাশীশ্বরীগণ' এই সম্প্রদায়ের আর এক বিখ্যাত ধাতুবিষয়ক গ্রন্থ। ইহার প্রকৃত নাম 'ধাতুগণপ্রকাশ' এবং নামান্তর 'ধ্বনি যোনি কাব্য'। কাশীশ্বর বাচস্পতি ভট্টাচার্য ইহার রচয়িতা। ইহাতে ১২৮৫টি ('পঞ্চাষ্টযুগ্মধরণী সংখ্যাতা ধাতবো ময়া') ধাতু অর্থসহ সুপদ্মের উপযোগী করিয়া বিন্যস্ত আছে। হেনরি টমাস্ কোলব্রুক (১৭৬৫-১৮৩৭ খ্রীঃ) ইহার নাম দিয়াছেন 'কাশীশ্বরীগণ'। প্রারম্ভিক শ্লোকটি এইরূপ ঃ

আলোচ্য পাণিনি কলাপ সুপদ্মসিদ্ধান্
অর্থানুকারি কৃতিনা ক্রমশোঽত্র পদ্যৈঃ।
কাশীশ্বরেণ স চ ধাতুগণপ্রকাশ-
স্তোষং প্রকাশয়তু ভূরি বিচক্ষণানাম্।।

রূপনারায়ণ সেন নামে বৈদ্যবংশজ এক পণ্ডিত 'সমাস সংগ্রহ' এবং 'সুপদ্মষট্কারক' নামক যে দুই গ্রন্থ প্রস্তুত করেন তাহাতে যথাক্রমে সুপদ্মের সমাস-ও কারক-অধ্যায়ের শ্লোকাত্মক বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। ১৭০১ শকাব্দ (খ্রীঃ ১৭৭৯) ইহাদের রচনাকাল। বিষ্ণুমিশ্রের টীকার অবলম্বনে তিনি শ্লোকাবলীর অর্থবোধক দুই ব্যাখ্যাও রচনা করিয়া গিয়াছেন। পয়োগ্রাম ছিল তাঁহার নিবাসস্থল। এই সম্প্রদায়ের কারকবিষয়ক আর এক গ্রন্থ 'কারকরহস্য'। ইহার রচয়িতা রূপরাম ন্যায়পঞ্চানন। সুপদ্ম ব্যাকরণের সুবন্তাধ্যায়ের (শব্দরূপাধ্যায়ের) এক শ্লোকাত্মক সংগ্রহ প্রণয়ন করেন রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার। ইহার নাম 'শব্দাবলী'। 'কাতন্ত্রপ্রক্রিয়া'র ন্যায় বালকদের জন্য এক 'সুপদ্মপ্রক্রিয়া' রচনা করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য ঃ

প্রতীতা বালবোধিন্যাং কাতন্ত্রপ্রক্রিয়া যতঃ।
সুপদ্মপ্রক্রিয়া তস্মাদ্ রামভদ্রেণ তন্যতে।।

কান্দি-স্কুলের হেডপণ্ডিত রামতারণ শিরোমণি 'সুপদ্মকৌমুদী' নামে এক গ্রন্থের সঙ্কলন করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইহার প্রথম ভাগ মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়। সুপদ্ম এবং সিদ্ধান্ত কৌমুদীর অবলম্বনে সরল সংস্কৃত ভাষায় সহজপ্রণালীতে এই গ্রন্থ রচিত। অবলম্বিত গ্রন্থদ্বয়ের নামের আদ্যন্ত গ্রহণপূর্বক ঐ 'সুপদ্মকৌমুদী' নামকরণ। ইহার ব্যাখ্যাও রামতারণ-রচিত। 'গণদর্পণ' নামে আর এক গ্রন্থও তাঁহার রচনা। তাঁহার পিতার নাম রামরত্ন।

'সুপদ্মপরিশিষ্ট' নামে এক গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। ইহার স্বরূপ বা রচয়িতার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। এই ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ে 'সারমঞ্জরী', 'সংজ্ঞাবিচার' প্রভৃতি আরও গ্রন্থ এবং কন্দর্প সিদ্ধান্ত, শ্রীধর চক্রবর্তী, রামচন্দ্র প্রভৃতি টীকাকারের কথা শুনা যায়।

পদ্মনাভের 'ভূরিপ্রয়োগ' অমরকোষের টীকা-বিশেষ। ইহার পুষ্পিকায় লিখিত আছে : '...শ্রীপদ্মনাভ দত্তসংগৃহীতে ভূরিপ্রয়োগাভিধানে নাম-লিঙ্গানুশাসনে সামান্যকাণ্ডস্তৃতীয়ঃ সমাপ্তঃ।'

মিথিলায় রচিত হইলেও সেখানে সুপদ্মের তেমন আদর হয় নাই। বঙ্গদেশের খুলনা, যশোহর, নৈহাটি ও ভাটপাড়াতে ইহার পঠনপাঠন একরূপ সীমাবদ্ধ।

'বৃহদ্‌বঙ্গ' গ্রন্থে (পৃঃ ৩৬৯) দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় পদ্মনাভ দত্তকে পূর্ববঙ্গবাসী বলিয়াছেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অমূলক।

প্রয়োগরত্নমালা ব্যাকরণ
(১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দী)

প্রয়োগরত্নমালা ব্যাকরণের রচয়িতা পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য বিদ্যাবাগীশ। তিনি ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের নির্দেশে এই ব্যাকরণ রচনা করেন। কোচবিহারের রাজবংশাবল্যাদির প্রথমেই এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে ঃ

জন্মমৃত্যুবিহীনো যো মহাদেবো জগৎপতিঃ।
আসীত্তত্তনয়ো বিশ্বসিংহং-নামা নৃপাগ্রণীঃ।।
বিহারাদ্দেবদেবস্য দেশো বিহার-নামকঃ।
যোঽসাবত্রৈব বসতিং চক্রে স গিরিশাজ্ঞয়া।।
নরনারায়ণস্তস্য পুত্রঃ ক্ষ্মাপালকেশরী।
অভূন্নারায়ণী মুদ্রা তস্যৈব সময়ে পুরা।।
ধরাদেবান্ সমানীয় নানাস্থানেভ্য এব সঃ।
অস্থাপয়ন্নিজরাজ্যে নানা শাস্ত্রবিশারদান্।।
পুরুষোত্তমনামৈকস্তেষাং তদ্‌ভূপদেশনাৎ।
প্রয়োগরত্নমালাখ্যং চক্রে ব্যাকরণং বুধঃ।।

পুরুষোত্তম স্বয়ং প্রয়োগরত্নমালার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন ঃ

শ্রীমল্লদেবগুণৈকসিন্ধোর্মহীমহেন্দ্রস্য যথানিদেশম্।
যত্নাৎ প্রয়োগোত্তমরত্নমালা বিতন্যতে শ্রীপুরুষোত্তমেন।।

এই শ্লোকে যে 'শ্রীমল্লদেব' নাম রহিয়াছে তাহা নরনারায়ণেরই নামান্তর। এই প্রসঙ্গে 'গূঢ়প্রকাশিকা' টীকায় লিখিত আছে ঃ

কোচবিহারাধিপো নরনারায়ণনামা ভূপতিরাসীৎ।
স চাতি বলবত্তয়া মল্লৈরদীব্যদিতি মল্লদেব ইত্যপরনামাভূৎ।
তদাদেশেন কোচবিহারান্তর্গত খাগড়াবাড়ীনামক গ্রাম-নিবাসী
পুরুষোত্তমনামা কশ্চিৎ সুপণ্ডিতঃ প্রয়োগরত্নমালাভিধং
ললিতপদাবলীযুক্তং নানা-ছন্দোবদ্ধ সূত্রাত্মককারিকাবলীঘটিতং
ব্যাকরণং তনোতিস্ম।

তদ্ধিত-বিন্যাসের শেষে পুরুষোত্তমও নরনারায়ণের নাম করিয়াছেন।

কোচবিহারের প্রাচীন নাম কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। প্রাচীন কোচবিহার অবশ্য বর্তমান কোচবিহারের চেয়ে অনেক বড় ছিল। রাজা বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ (১৫৩৩/৩৪-৮৭ খ্রীঃ) বিদ্যোৎসাহী পিতার

আগ্রহে কাশীতে গিয়া উচ্চশিক্ষালাভ করেন এবং স্বয়ং রাজা হইয়া পিতৃবৎ বিদ্যানুরাগের পরিচয় দেন। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় গৌড় হইতে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ এবং পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ নামক পণ্ডিতদ্বয় কোচবিহারে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে ইঁহাদেরও রাজসভায় বিশিষ্ট আসন দেওয়া হয় এবং ইঁহাদের চেষ্টায় সে দেশে সংস্কৃত শিক্ষা প্রভৃত প্রসারলাভ করে। রাজসভায় সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন হইত। 'মহাপুরুষ শংকরদেব ও মাধবদেবের জীবনচরিত্র' (পৃঃ ১৬৮) হইতে এই সংবাদ জানিতে পারি ঃ

সংস্কৃত বিনে আন মাত না মাতায়।
সামান্য কথাকো সবে সংস্কৃত কয়।।

কোচবিহারের রাজধানীর নিকটবর্তী খাগড়াবাড়ী নামক গ্রামে পুরুষোত্তমের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার আগমনের অনেক পরে খ্রীঃ ১৮শ শতকের প্রারম্ভে এই গ্রামে অন্য অনেক ব্রাহ্মণের বসবাস লক্ষিত হয়। আধুনিক জীবনীকোষ প্রভৃতি গ্রন্থে পুরুষোত্তমকে কলিকাতার ঠাকুর-বংশের পূর্বপুরুষ জগন্নাথ (বন্দ্যোপাধ্যায়) কুশারীর পুত্র বলা হইয়াছে। বর্ধমান জেলার কুশারীগ্রামে ছিল তাঁহাদের আদিনিবাস। পুরুষোত্তমের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ পঞ্চানন ঠাকুর কলিকাতায় ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

খাগড়াবাড়ীতেই প্রয়োগরত্নমালা ব্যাকরণ রচিত হয়। কেবল রাজা নরনারায়ণই নয়, রাণী ভানুপাটেশ্বরীরও এই কার্যে প্রচুর আগ্রহ ছিল। গন্ধর্বনারায়ণের বংশাবলীতে লিখিত আছে ঃ

নৃপতির প্রিয়তমা ভানু পাটেশ্বরী।
ভট্টাচার্য্য আগে কথা কহিলা সাদরি।।
পাণিনির বর্ণক্রম গ্রন্থে নে লিখিবা।
মহেশের কৃত কলাপের ক্রম দিবা।।—৯৩ পত্র।

দরঙ্গের রাজা জগন্নারায়ণের পুত্র গন্ধর্বনারায়ণের আদেশে মঙ্গলদই-নিবাসী সূর্যদেব সিদ্ধান্তবাগীশ অসমীয়া ভাষায় পদ্যে এই বংশাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রাজা জগন্নারায়ণ ছিলেন রাজা নরনারায়ণের প্রপৌত্র এবং সূর্যদেব সিদ্ধান্তবাগীশ ছিলেন নরনারায়ণের পূর্বোক্ত সভাপণ্ডিত পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশের বংশধর।

পুরুষোত্তম স্বয়ং রত্নমালার শেষে ইহার রচনা-সমাপ্তির কাল ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন ঃ

গগন-গ্রহ-মনু-শাকে নাকেন্দ্রাচার্যবাসরে শরদি।
অধিপৌর্ণমাসি পূর্ণা সমপদ্যতে শব্দবিদ্যেয়ম্।।

অর্থাৎ ১৪৯০ শকাব্দে (১৫৬৮ খ্রীঃ) শরৎকালীন পূর্ণিমা তিথিতে বৃহস্পতিবারে এই গ্রন্থরচনা সম্পূর্ণ হয়। নরনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেবনারায়ণকে এবং সম্ভবতঃ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণকেও এই ব্যাকরণের সাহায্যে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। নরনারায়ণের মৃত্যুর পর কোনও কারণে রঘুদেব পুরুষোত্তমের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের আশ্রয়ে চলিয়া আসেন। . . .

(২)

এই ব্যাকরণ 'প্রয়োগরত্নমালা' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও ইহার মুখবন্ধের ৩য় শ্লোকে গ্রন্থকার ইহাকে 'প্রয়োগোত্তমরত্নমালা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অন্যান্য স্থলে অবশ্য 'প্রয়োগরত্নমালা'ই দেখা যায়। তথাপি প্রথমেই স্বয়ং গ্রন্থকার-কথিত বলিয়া ঐ বিশেষ নামটির একটি মৌলিক গুরুত্ব থাকিবার কথা। নামপার্থক্যের এই বিষয়টি কিন্তু টীকাকার জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই তিনি তাঁহার 'প্রভাপ্রকাশিকা' টীকায় এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিয়াছেন ঃ

প্রয়োগেভ্য উত্তমাঃ প্রয়োগোত্তমাঃ। উত্তমপ্রয়োগাস্ত এব রত্নানি... তেষাং মালাসমূহো যত্র সা প্রয়োগোত্তমরত্নমালা। ...অত্র যদ্যপি প্রয়োগোত্তমরত্নমালেত্যুক্তং তথাপি প্রয়োগরত্নমালেত্যেব গ্রন্থনাম বোদ্ধব্যং তত্র তত্র তথৈব দর্শনাৎ। অত্র তু অধিকং তত্রানুপ্রবিষ্টং ন তু তদ্ধানিরিতি নান্যেনাপি সমর্থনীয়ত্বাদিতি।

অর্থাৎ ইহাতে উত্তমপ্রয়োগরূপ রত্নসমূহের সমাবেশ ঘটিয়াছে বলিয়া ইহার 'প্রয়োগোত্তমরত্নমালা' নাম এবং যদিও এই স্থলে এইরূপ নামকরণ ঘটানো হইয়াছে তথাপি অন্যান্য স্থলে 'প্রয়োগরত্নমালা' নাম দৃষ্ট হওয়ায় এই নামই গ্রহণীয়। তবে বর্তমানস্থলে 'উত্তম' শব্দটির অনুপ্রবেশবশতঃ যে আধিক্য ঘটিয়াছে তাহাতে তেমন কোনও ক্ষতি হয় নাই। সম্ভবতঃ এই মতের ন্যায্যতাবশতঃই 'প্রয়োগরত্নমালা' নামের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। মুখবন্ধের ৪র্থ শ্লোকে পুরুষোত্তম ইহার প্রয়োগ-

গুলিকে মহৎ ব্যক্তিদের হৃদ্বিভাবনীয়, মহনীয় এবং গুণবৃদ্ধিমান্ বলিয়াছেন ঃ

মহতামপি হৃদ্বিভাবনীয়ৈর্মহনীয়ৈর্গুণবৃদ্ধিমৎপ্রয়োগৈঃ।
রচিতাং পুরুষোত্তমেন বালাঃ প্রতিভায়ৈ পরিধত্ত রত্নমালাম্।।

মুগ্ধবোধপ্রভৃতি ব্যাকরণের মতো এই ব্যাকরণের বিষয়-বিন্যাস সংস্কৃতভাষা শিক্ষার্থীর পক্ষে সবিশেষ অনুকূল। মোট ২১টি বিন্যাসে সমগ্র ব্যাকরণ বিভক্ত। এক একটি বিন্যাস যেন এক একটি অধ্যায়। প্রথমে সংজ্ঞা ও সন্ধি বর্ণনার পর ক্রমান্বয়ে শব্দ, কারক, সমাস, তদ্ধিত, আখ্যাত ও কৃৎ বর্ণিত হইয়াছে। বৈদিকাংশ অনুপস্থিত। তদ্ধিতান্ত পূর্বার্ধে সাতটি বিন্যাস, উত্তরার্ধে আখ্যাত ও কৃৎ। আখ্যাত-প্রকরণের স্বতন্ত্র নাম 'পদমঞ্জরী'। ইহার বিন্যাস-সংখ্যা আট। সর্বশেষ কৃৎপ্রকরণের বিন্যাস-সংখ্যা ছয়।

পাণিনি-কাতন্ত্র-প্রভাবিত এই ব্যাকরণ। ঐ দুই ব্যাকরণঘটিত সংজ্ঞা-সমূহের সংমিশ্রণে এই ব্যাকরণের সংজ্ঞাবলী গঠিত হইয়াছে। এই বিষয়ে অবশ্য কাতন্ত্রের প্রভাবই অধিকতর কার্যকরী দেখা যায়। কয়েক স্থানে চান্দ্র ব্যাকরণের মতও গৃহীত হইয়াছে। এই সময়ে বঙ্গদেশে চান্দ্রের খুব ব্যবহার ছিল। ইহার অনুসরণে পুরুষোত্তম 'জম্' ও 'দম্' এই দুই অব্যয় হইতে যথাক্রমে জম্পতি ও দম্পতি শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে চান্দ্রই প্রথম অসংজ্ঞক ব্যাকরণ—'তস্য সংজ্ঞারহিতস্য ব্যাকরণস্য প্রথমপ্রকাশত্বম্' (৬।৮৮১ সূত্রের বৃত্তি)—অর্থাৎ চান্দ্র ব্যাকরণেরই সংজ্ঞারহিত ব্যাকরণরূপে প্রথম প্রকাশ। চান্দ্র ব্যাকরণের টীকাকার রত্নমতিরও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সুভূতি এবং পুরুষোত্তমদেবের ত্রিকাণ্ডশেষের উল্লেখও আছে। এই দুইজনই বৌদ্ধ। বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধৃতিপ্রদানের একটা প্রবল আগ্রহ যে পুরুষোত্তম পোষণ করিতেন তাহার প্রমাণ এই ব্যাকরণের স্থানে স্থানে বর্তমান। কয়েক স্থলে বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্যবহৃত ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ প্রয়োগাদিরও নিদর্শন দেওয়া হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে প্রয়োগরত্নমালার অভ্যুদয়ে বঙ্গদেশে 'চান্দ্র ব্যাকরণে'র প্রভাব লোপ পায়। 'সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা'য় (১৩৩৬, ১ম সংখ্যা) প্রকাশিত 'সভাপতির অভিভাষণে' শাস্ত্রি-মহাশয়ের উক্তি ঃ

বাঙ্গালায় চন্দ্রের যদিও বা কিছু আলোচনা হইত, প্রয়োগরত্নমালা তাহা একেবারে লোপ করিয়া দিয়াছে। এই গ্রন্থখানি কোচবিহারে তৈয়ারী হয়। কামতাপুর রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিয়া গৌড়ের বাদশাহ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ যখন সমস্ত কামতাপুর রাজ্য আপন রাজ্যভুক্ত করিতে পারিলেন না, তখন কোচ ও হাজোরা বাঙ্গালার উত্তরে এক প্রকাণ্ড রাজ্য স্থাপন করিল। সেই কোচবিহারের রাজাদের অনুরোধে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত প্রয়োগরত্নমালা নামে এক ব্যাকরণ লিখিলেন খ্রীঃ ১৫৮০ সালে। চন্দ্রের যাহা কিছু জ্যোতি ছিল, রত্নমালার আলোতে তাহা আরও ম্লান হইয়া গেল। রত্নমালা বাঙ্গালা ও আসামের অনেক অংশে পুরাদমে চলিতেছে।

ঐ ১৫৮০ সাল তিনি কোথায় কিভাবে পাইলেন তাহা অজ্ঞাত।

এই ব্যাকরণের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার পদ্যময়তা। প্রায় সমগ্র ব্যাকরণ নানা ছন্দে বদ্ধ কতকগুলি শ্লোক বা কারিকার সমষ্টি। এত বড় শ্লোকবদ্ধ ব্যাকরণ বর্তমানে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্লোকগুলিকে নানা ক্ষুদ্র ও বৃহদংশে বিভক্ত করিয়া এক একটি পৃথক্ সূত্র পরিকল্পিত হইয়াছে। কেবল সূত্রাংশই নয়, ইহার পুরুষোত্তম-কৃত বৃত্ত্যংশও শ্লোকাত্মক। কয়েকটি শ্লোকাত্মক সূত্র (পার্শ্বের অঙ্কগুলি সূত্র-সংখ্যানির্দেশক) ঃ 'অকারাদিক্ষকারান্তা বর্ণমালাঽনুবর্ততে' (১।১), 'তস্যামকারাদৌকারং যাবদ্বর্ণাঃ স্বরা অচঃ' (১।২), 'অকারাদয় ৯দন্তাঃ সমানাঃ স্যুরকশ্চ তে' (১।৩), 'সস্থানাকৌ সবর্ণঃ স্যাৎ' (১।৪), 'সাবর্ণ্যমৃ৯ বর্ণয়োঃ' (১।৫), 'অইউঋ৯ হ্রস্বাঃ স্যুর্লঘবশ্চৈকমাত্রকাঃ' (১। ৬), 'অন্যে স্বরা দীর্ঘসংজ্ঞা জ্ঞাতব্যাস্তে দ্বিমাত্রকাঃ' (১।৭), 'গানাহ্বানক্রন্দনেষু স্বরাস্ত্রিমাত্রকাঃ প্লুতাঃ' (১।১২), 'একো বিন্দুরনুস্বারস্তিলবদ্ বার্ধচন্দ্রবৎ' (১।২৮), 'ঊর্ধ্বাধঃস্থং বিন্দুযুগং বিসর্গ ইতি গীয়তে' (১।২৯), 'সসুব্লিঙ্গসতিঙ্ধাত্বোরর্থানুভাবকঃ পদম্' (১।৩৩), 'ব্যঞ্জনং পরগামি স্যাৎ' (১।৩৮) ইহার বৃত্ত্যংশে—'যথা বাক্ পাবনী সতাম্', 'মস্করঃ কথিতো বেণৌ পরিব্রাজি তু মস্করী' (১।১৬০) ; ইহার অনুরূপ পাণিনি-সূত্র 'মস্করমস্করিণৌ বেণু পরিব্রাজকয়োঃ' (৬।১। ১৫৪), 'লক্ষণৈর্নোপপন্না যে শব্দা রূঢ়া ইহৈব তে। বিজ্ঞাতব্যা লিঙ্গসংখ্যাদয়ো লোকপ্রসিদ্ধতঃ।।' (১।১৬২), 'ছন্দসি সর্বে বিধয়ো

বিজ্ঞাতব্যা বিকল্পেন। ছন্দসি বেদে পদ্যে চ...' (১।১৬৩), 'বাহুল্যং ব্যত্যয়মাহঃ' (১।১৬৪), 'প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্যাপি সম্বন্ধ-নিয়মং বিনা। বর্ণসংজ্ঞানুবন্ধী যঃ কার্যঃ স সন্ধিরুচ্যতে।।' (১।১৬৫), 'বিলম্বিতোচ্চারণে তু সন্ধ্যভাবঃ ক্বচিদ্ ভবেৎ' (১।১৬৬), 'শব্দোঽর্থবাঁল্লিঙ্গসংজ্ঞো বিভক্তিধাতুবর্জিতঃ' (২।১৬৮); ইহার অনুরূপ কাতন্ত্রসূত্র 'ধাতুবিভক্তিবর্জমর্থবল্লিঙ্গম্' (২।১।১), 'শব্দানুকরণে ধাতুবিভক্ত্যোর্লিঙ্গ সংজ্ঞকে' (২।১৬৯), 'সমাসশ্চানেকপদস্যৈকলিঙ্গত্বমুচ্যতে' (৬।৭২১), 'যঃ সরূপবিরূপৈকশেষঃ পাণিনিসম্মতঃ। চান্দ্রাঃ প্রকৃতিবৃত্তিভ্যাং সিদ্ধৌ তন্নানুমেনিরে।।' (৬।৮৫৯), 'ময়ড় বিকারে' (৭।৩১৫), 'প্রাচুর্যে' (৩১৬), 'স্বরূপে' (৩১৭) 'প্রস্তুতেঽপি চ' (৩১৮), 'দ্রষ্টা সাক্ষী স ঈশ্বরঃ' (৭।১৩০৯) ; আখ্যাতে—'ঘ্রো জেঘ্রীঃ' (৬৫৫), 'ধ্মো দেধ্মীঃ কার্যঃ' (৬৫৬), 'প্যায়ঃ পেপীঃ' (৬৫৭), 'চায়শ্চেকীঃ' (৬৫৮), 'লুপাদের্ভাবগর্হায়াং' (৬৫৯), 'কৌটিল্যে গমনার্থকাৎ' (৬৬০) প্রভৃতি। বৃত্ত্যংশের অনেকাংশও পদ্যময়, যেমন—'সংজ্ঞোপসর্জনে হিত্বা বিশেষার্থব্যবস্থয়া। সর্বাদ্যাঃ সর্বনামানি চত্বারিংশৎ সমীরিতাঃ।।' (২।২১৮), 'আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসত্তিযুক্তং পদকদম্বকম্' (৬।৭২০) প্রভৃতি।

উদ্ধৃত প্রথমসূত্রে দেখা যায়, পুরুষোত্তম বর্ণমালায় 'ক্ষ'কে একক বা স্বতন্ত্র বর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কারণ তিনি লিখিয়াছেন ঃ 'উক্তঃ ক্ষো বর্ণমালায়াং মন্ত্রস্যোপচিকীর্ষয়া। অত্র সংজ্ঞাবিধানানুপযুক্তোঽপি ক্ষকারঃ পাণিনীয়বর্ণক্রমব্যবচ্ছেদার্থঃ'—অর্থাৎ তান্ত্রিক মন্ত্রের ('মন্ত্রস্য—মাতৃকামন্ত্রস্য'—প্রভাপ্রকাশিকা) সুবিধার জন্য এবং পাণিনীয় বর্ণক্রমের ব্যবচ্ছেদ ঘটাইতে বর্ণমালায় ক্ষকার[১] গ্রহণ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'প্রভাপ্রকাশিকা' টীকায় নিম্নলিখিতরূপ বিশদ আলোচনা রহিয়াছে ঃ

> পাণিনীয়বর্ণক্রমো হ্যকারাদিহকারান্তঃ। অস্মাভিরপি তাদৃশে কৃতে পাণিন্যনুসারেণেদং ব্যাকরণমিতি ভ্রমঃ সংশয়ো বা স্যাদিতি তন্নিরাসার্থমেব ক্ষকারপাঠ ইত্যর্থঃ। কৃতে চ ক্ষকারপাঠে পাণিনীয়বর্ণক্রমে ক্ষকারাভাবাৎ সূত্রপ্রসিদ্ধমাহেশ্বরবর্ণমালা[২]হলাভঃ। তেন তদনুসারেণৈবেদং ব্যাকরণমিতি ফলিতার্থঃ। কালাপৈঃ সিদ্ধপদোপাদানাৎ কল্পিতস্য পাণিনীয়বর্ণক্রমস্য ব্যুদাসঃ কৃতঃ। অস্মাভিস্তু ক্ষকারপাঠেনেতিশেষঃ।

'গূঢ়প্রকাশিকা' টীকায় ক্ষকারের সমর্থনে 'নারদীয়শিক্ষা' হইতে নিম্নের শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ

অকারাদিক্ষকারান্তং বিন্দুযুক্তং বিভাব্য চ।
ক্ষার্ণং মেরুমুখং তত্র কল্পয়েন্মুনিসত্তম।।

এই শ্লোকের মাতৃকাবর্ণসাধনার ইঙ্গিতই পুরুষোত্তমের 'উক্তঃ ক্ষো বর্ণমালায়াং মন্ত্রস্যোপচিকীর্ষয়া' উক্তিতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তান্ত্রিকসাধক ছিলেন। অন্যত্রও তাঁহার তান্ত্রিকতার আভাস বর্তমান। এই প্রসঙ্গে 'কামরূপ-কামাখ্যা'র সান্নিধ্য লক্ষণীয়। 'পদমঞ্জরী' নামক আখ্যাত-প্রকরণের প্রারম্ভে তিনি সসম্ভ্রমে পাণিনি-কাত্যায়নের নিকট ঋণ স্বীকার করিতে গিয়া লিখিয়াছেন ঃ 'দাক্ষায়ণীয়মতকাত্যসুত-প্রবন্ধ-মন্ত্রানুরঞ্জিতগুণা পদমঞ্জরীয়ম্।' প্রাসঙ্গিক ব্যাকরণচিন্তা-মুক্ত চিত্তে এই বাক্যটি প্রথমেই এক তান্ত্রিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

(৩)

বিভিন্ন সম্পাদক-কর্তৃক সম্পাদিত প্রয়োগরত্নমালার বিভিন্ন সংস্করণে ইহার মোট সূত্রসংখ্যায় পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ পুরুষোত্তম নিজে এই সূত্রসংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া যান নাই। তাই ব্যাকরণের কারিকাগুলিকে ভাঙ্গিয়া সূত্রে বিভক্ত করার ব্যাপারে নানা মতপার্থক্য দেখা দেওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অধিকন্তু ব্যাকরণের পদ্যাত্মক বৃত্ত্যংশ হইতেও একাধিক সূত্র গৃহীত হওয়ার বা সূত্রাংশের কিয়দংশ বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হওয়ার সম্ভাবনাও বর্তমান। এই সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন সিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশ-মহাশয়। প্রয়োগ-রত্নমালার 'পরিভাষাসূত্র' বলিয়া কথিত 'সংজ্ঞাং নিমিত্তং কর্তারং পরিমাণং প্রয়োজনম্। প্রাগুক্ত্বা সর্বতন্ত্রাণাং পশ্চাদ্‌বক্তানুবর্ণয়েৎ।।'— শ্লোকের 'পরিমাণ' শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি তাঁহার 'সূত্রবিবোধিনী' টীকায় লিখিয়াছেন ঃ

> যদ্যপি গ্রন্থকৃতাস্মদ্ গ্রন্থে সূত্রাণাং পরিমাণং নোক্তং তথাপ্যেক-বিংশতি-বিন্যাসাত্মককৃদন্তগ্রন্থান্তর্গতানি কারিকাবলীমধ্যগ্রথিতানি চতুর্বিংশত্যধিক সপ্তবিংশতিশত সূত্রাণি (২৭২৪), এবং বৃত্তাবুক্তানি দ্বাবিংশতি (২২) সূত্রাণি মিলিত্বা ষট্‌চত্বারিংশদধিক-

> সপ্তবিংশতিশত (২৭৪৬) সংখ্যানি সূত্রাণ্যত্র সন্তি, তত্র পঞ্চাধিক-
> সপ্তবিংশতিশত (২৭০৫) সূত্রাণাং মধ্যে কানি সূত্রৈঃ সহ
> কানিচিদ্‌বৃত্তিভিঃ সহানুষ্টুবাদি নানাছন্দোবদ্ধতয়া কারিকারূপাণি,
> পাণিন্যানুসারিতয়োক্তান্যেকচত্বারিংশৎ সংখ্যানি ছন্দোরহিতানি সূত্রাণি,
> এতদেব গ্রন্থস্য পরিমাণং বোধ্যং...।

এই মতে মোট সূত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ২৭৪৬। ইহার মধ্যে কারিকাধৃত সূত্র ২৭২৪টি এবং বাকি ২২টি সূত্র বৃত্তি হইতে গৃহীত। আবার সূত্রসমষ্টির ২৭০৫টি নানাছন্দের কারিকায় নিবদ্ধ এবং ৪১টি পাণিনীয় মতানুসারী এবং গদ্যাত্মক। কিন্তু এই বিদ্যাবাগীশমহাশয়ই কোচবিহার হইতে ১৮১২ শকাব্দে (১।১।১২৯৭ বঙ্গাব্দ তাং, খ্রীঃ ১৮৯০) তৎসংস্কৃত (ও সম্পাদিত) যে সমগ্র প্রয়োগরত্নমালা ব্যাকরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সূত্রগণনায় কিন্তু মোট ২৭৪১টি সূত্র পাওয়া যায়, ২৭৪৬টি নয়। যথা ঃ

তদ্ধিতান্ত প্রথম সাত বিন্যাসে মোট সূত্রসংখ্যা—	১৫৭০
পদমঞ্জরীতে বা আখ্যাতের ৮ বিন্যাসে মোট সূত্রসংখ্যা—	৬৬৪
কৃদংশের ৬ বিন্যাসে মোট সূত্রসংখ্যা—	৫০৭
সর্ব মোট—	২৭৪১

রাজা প্রাণনারায়ণ বা প্রাণদেবের নির্দেশে কামরূপের পণ্ডিত জয়কৃষ্ণ প্রয়োগরত্নমালার 'প্রভাপ্রকাশিকা'টীকা রচনা করেন। এই টীকা সমাস-বিন্যাস পর্যন্ত বিস্তৃত। পদমঞ্জরীর উপরেও এই টীকা পাওয়া যায়, কেবল সমাস-বিন্যাসেব এবং কৃৎপ্রকরণের টীকা অনুপস্থিত। তদ্ধিতবিন্যাসের পঞ্জিকা রচনা করেন জীবেশ্বর শর্মা। ইনিও কামরূপের পণ্ডিত। রাজা প্রাণদেব খ্রীঃ ১৭শ শতকের মধ্যভাগে কোচবিহারে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইনি কোচবিহারের অন্তর্গত কামতাপুরে (কান্তাপুরে) কামতেশ্বরী-মন্দির নির্মাণ করান। ইহার দ্বারদেশস্থ শিলালিপি হইতে জানা যায়, ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নির্মিত হয় ঃ

> শাকাব্দে নগনাগমার্গণহিমজ্যোতির্মিতে নির্মিতঃ।
> শ্রীভাজা কবিমণ্ডলেন ভজতা ভব্যো ভবানীমঠঃ।।

'নগনাগমার্গণহিমজ্যোতিঃ' = ১৫৮৭ শকাব্দ = ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। এই মন্দির যেখানে অবস্থিত তাহার বর্তমান নাম গোসানী (মারি)।

'কৃৎপ্রদীপিকা' কৃৎপ্রকরণের টীকা। ইহার প্রণেতা মহেন্দ্র শর্মোপাধ্যায়। 'অর্কেঽশ্বদিঙ্নাগরসেন্দুশাকে' অর্থাৎ ১৬৮৭ শকাব্দে কার্ত্তিক মাসে এই টীকা রচিত হয়। খ্রীষ্টীয় গণনায় ১৭৬৫ সাল। জয়কৃষ্ণের পিতার নাম বিদ্যানন্দ চক্রবর্তী। সমগ্র রত্নমালার টীকা রচনা করেন সিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশ। এই টীকা অতি প্রাঞ্জল। অন্যান্য টীকায় যাহা বর্ণিত হয় নাই বা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে তাহার বর্ণনা দেওয়াই সিদ্ধনাথের মুখ্য উদ্দেশ্য। টীকার নাম 'গূঢ়প্রকাশিকা'। ইহার প্রারম্ভে কথিত আছে ঃ

> বিহারদেশাধিপতির্নৃপঃ শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণনামধেয়ঃ।... তদাদেশান্মুদা শ্রীল সিদ্ধনাথাগ্রজন্মনা। মুন্যঙ্কমিত্রবঙ্গাব্দে বৈশাখে প্রথমেঽহনি।। প্রয়োগরত্নমালায়া নিগূঢ়ার্থপ্রকাশিকা। যথাধি ক্রিয়তে টীকা নাম্না গূঢ়প্রকাশিকা।। যন্নোক্তং জয়কৃষ্ণাদ্যৈঃ সংক্ষেপেণাপ্যভাষি যৎ। স্বস্বনির্মিতটীকায়ু তত্তদুক্ত্যে মমোদ্যমঃ।।

কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আদেশে ১২৯৭ বঙ্গাব্দে (= ১৮৯০ খ্রীঃ) ১লা বৈশাখ সিদ্ধনাথ এই টীকার রচনা শুরু করেন এবং ১২৯৯ বঙ্গাব্দে বা ১৮১৪ শকাব্দে ২৬শে চৈত্র (১৮৯৩ খ্রীঃ) সমাপ্ত করেন। তাঁহার নিজের কথায় ঃ

> নরনারায়ণানীতো নারায়ণপরায়ণঃ। শাস্ত্রপারায়ণাভিজ্ঞ আসীন্নারায়ণাভিধঃ।।... আনন্দনাথস্তনয়স্তদীয়োধীরঃ... শ্রীসিদ্ধনাথস্তনয়স্তদীয়ো বিপ্রঃ শ্রুতীন্দুদ্বিপচন্দ্রশাকে। অঙ্কগ্রহাহস্করবঙ্গবর্ষে ষড়্বিংশমানাহনি চৈত্র যব্যে।। পুরুষোত্তমসংখ্যাবদ্রচিতায়াঃ সমাপয়ৎ। প্রয়োগরত্নমালায়াঃ টীকাং গূঢ়প্রকাশিকাম্।।—'গূঢ়প্রকাশিকা'কারের পরিচয়।

আশ্চর্যের বিষয়, উপরি-কথিত ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ তারিখটি, সিদ্ধনাথ-সম্পাদিত প্রয়োগরত্নমালার পূর্বোক্ত কোচবিহার-সংস্করণের প্রকাশনার তারিখ রূপেও উহাতে মুদ্রিত দেখা যায়। গূঢ়ার্থপ্রকাশিকা টীকা এই সংস্করণেরই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, যে তারিখে গ্রন্থরচনার সূচনা সেই তারিখে উহা প্রকাশিত হইতে পারে না, অধিকন্তু যেখানে প্রায় তিন বৎসর পরে উহার সমাপ্তিকাল সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়া যাইতেছে ইহা হইতে প্রমাণিত যে, ঐ প্রকাশনার তারিখে ভুল আছে। সে যাহাই হউক, ঐ নৃপেন্দ্রনারায়ণও ছিলেন পূর্বোক্ত রাজা নরনারায়ণেরই অধস্তন ১১শ পুরুষ এবং 'নরনারায়ণানীত শাস্ত্রপারায়ণাভিজ্ঞ' নারায়ণনামক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরই বংশধর ছিলেন টীকাকার

সিদ্ধনাথ। তাঁহার পিতার নাম আনন্দনাথ ভট্টাচার্য। 'খাগরাবাটা' অর্থাৎ পূর্বোক্ত খাগড়াবাড়ী গ্রামেই ছিল তাঁহাদের নিবাস। গূঢ়প্রকাশিকায় চন্দ্রশেখর (১।৬০) এবং ভৈরবদেব ভট্টাচার্য (২।১৬৯, ২০৪) নামক দুইজন বৈয়াকরণের নামোল্লেখ রহিয়াছে। ইঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

কয়েক পুরুষ ধরিয়া একটি রাজবংশের পোষকতায় এবং তদাশ্রিত পণ্ডিতদের দ্বারা পুরুষপরম্পরায় টীকা-টিপ্পনী রচনার দ্বারা একটি সংস্কৃত ব্যাকরণকে কয়েকশত বৎসর ধরিয়া এইরূপ সঞ্জীবিত রাখার দৃষ্টান্ত বিরল। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, গৌরীপুর, হাকামা, সালকচা, লক্ষ্মীপুর, বিজ্নী, হাবারাঘাট, পাঙ্গু প্রভৃতি স্থানে অর্থাৎ বঙ্গদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এবং আসামের এতৎসন্নিহিত অঞ্চলে প্রয়োগ-রত্নমালার পঠনপাঠন ন্যূনাধিক প্রচলিত। বিদ্যাবাগীশের ছন্দে গাঁথা উত্তম প্রয়োগের রত্নমালা পুরুষোত্তমের কণ্ঠশোভা বর্ধন করিতে থাকুক।

---

১ 'অকারাদিক্ষকারান্তবর্ণাবয়বসুন্দরীম্'—দক্ষিণামূর্তিসংহিতা (১৬শ অধ্যায়)। সবিশেষ লক্ষণীয় এই যে, বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণ চিরকাল ক্ষকারকে বর্ণমালার শেষ বর্ণরূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন। একেবারে আধুনিক ব্যবস্থায় ইহার ব্যত্যয় দেখা যায়। 'কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী'—রামপ্রসাদ।

২ জৈনদের 'সমবায়সূত্র' নামক ৪র্থ অঙ্গে ১৮ রকমের লিপির মধ্যে 'মাহেশ্বরলিপি'র নাম পাওয়া যায়। পাণিনীয় শিক্ষাতেও দেখা যায়, মহেশ্বরই ৬৩ বা ৬৪ বর্ণের প্রকাশক : 'ত্রিষষ্টিশ্চতুঃষষ্টির্বা বর্ণাঃ শম্ভুমতে মতাঃ। প্রাকৃতে সংস্কৃতে চাপি স্বয়ং প্রোক্তাঃ স্বয়ম্ভুবা।।' বেদাঙ্গসিদ্ধ এই বর্ণসংখ্যা। বৈদিকসাহিত্যে ইহাদের ব্যবহার থাকিলেও লৌকিক ভাষায় (কার্যতঃ) অনেক অক্ষর পরিত্যক্ত। তাই পরবর্তী কালে শুনা যায়, 'সিদ্ধিঃ সংস্কৃতশব্দানাং ভবেৎ পঞ্চাশদক্ষরৈঃ।' এই ৫০টি বর্ণ এইরূপ : অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ,ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ (= ১৬) + ক্ – ম্ পর্যন্ত বর্গীয়বর্ণ (= ২৫) + য্, র্, ল্, ব্, শ্, ষ্, স্, হ্, ক্ষ্ (= ৯) = ৫০। চীনা পর্যটক ইৎসিং-এর মতে, 'সিদ্ধিরস্তু' দিয়া আরম্ভ করিয়া মহেশ্বর-রচিত যে 'সিদ্ধান্ত' পুস্তক বালকেরা প্রথমে মুখস্থ করিত তাহাতে ৪৯টি বর্ণ ছিল। ললিতবিস্তরে (১০ম অধ্যায়ে) ৬৪ লিপির (ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধলিপি, চীনলিপি প্রভৃতি) যে লিপি বুদ্ধদেব অভ্যাস করিয়াছিলেন তাহাতে বর্ণসংখ্যা ছিল ৪৬ = অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ (= ১২) + ক্–ম্ (= ২৫ বর্গীয় বর্ণ) + য্, র্, ল্, ব্, শ্, ষ্, স্, হ্, ক্ষ্ (= ৯)। সেখানে ইহাকে 'অক্ষরমাতৃকা' বলা হইয়াছে। কলাপব্যাকরণে প্রদর্শিত বর্ণক্রম প্রায় পূর্বোক্ত পঞ্চাশৎ বর্ণেরই মতো। সেখানে ক্ষবর্ণকে বাদ দিয়া অং অঃ অর্থাৎ 'ং' এবং 'ঃ' কে

জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় বর্ণের সহিত 'অকারাদি-হকারান্ত বর্ণমালা'র শেষে দেখানো হইয়াছে। ফলে কলাপের বর্ণসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৫১ (= অ—ঔ পর্যন্ত ১৪ স্বরবর্ণ + ২৫ বর্গীয় বর্ণ + য্ র্ ল্ ব্ ইত্যাদি হ্ পর্যন্ত ৮ বর্ণ + ঃ, জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয়, ং এই ৪ বর্ণ)। পাণিনি-মতে দীর্ঘ ৯ (= ৯৯) নাই, কাত্যায়ন দীর্ঘ ৯ স্বীকার করিয়াছেন। আপিশলি 'ঋ' এবং '৯' এতদুভয়েরই দীর্ঘত্ব স্বীকার করিতেন। অলবীরূনী ভারতভ্রমণে আসিয়া যে সব বর্ণমালা এখানে প্রচলিত দেখেন তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিতটি—যাহা কাশ্মীর এবং বারাণসী অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত, তাহাকে 'সিদ্ধমাতৃকা' বলা হইত। ইহা খুবসম্ভব কলাপের বর্ণক্রম। অকারাদি ৪১টি ধ্বনি ওষ্ঠাধরের বিস্ফারণে, উ, ঊ, ও, ঔ এই চারিটি ধ্বনি ওষ্ঠাধরের সঙ্কোচনে এবং প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্ এই ৫টি ধ্বনি ওষ্ঠাধরের সম্মেলনে উচ্চারিত হয়। বিস্ফারণের প্রতিভূ অ, সঙ্কোচনের প্রতিভূ উ এবং সম্মেলনের প্রতিভূ ম্। এই তিনে মিলিয়া অ + উ + ম্ = 'ওম্' এবং উ + অ + ম্ = 'বম্' মানবের অভ্যন্তরে নিরন্তর প্রবাহিত নাদ, অনাহত নাদ। অনাহত নাদ বা স্বর বা ধ্বনি—বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা আহত হইয়া অন্যান্য ব্যঞ্জন বর্ণগুলির সৃষ্টি করে। [পাণিনিসূত্র 'অকঃসবর্ণে দীর্ঘঃ' (৬।১।১০১) মতে দীর্ঘ ৯ (৯৯) স্বীকৃত।]

৩ এই নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর (১৮৬২–১৯১১ খ্রীঃ) কলিকাতার বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮–১৮৮৪) জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীকে (১৮৬৪–১৯৩২) বিবাহ করেন। কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের সহিত কেশব বাবুর ২য়া কন্যা সাবিত্রী দেবীর বিবাহ হয়।

হরিনামামৃত ব্যাকরণ

(খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী)

প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের ফলে বৈষ্ণব জগতে যে অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দেয়, তাহাই ক্রমে সুসম্বদ্ধ হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা দান করে। 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ'—এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদেরই অন্যতম গ্রন্থমণি। আপাত-নীরস ব্যাকরণ-শাস্ত্রও যে কৃষ্ণভক্তি-রসামৃতধারার অভিসেচন হইতে বঞ্চিত হয় নাই, এই গ্রন্থ তাহারই নিদর্শন বহন করিতেছে।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, স্বয়ং গৌরাঙ্গসুন্দরই এইরূপ ব্যাকরণ-রচনার আত্মিক প্রেরণাদাতা। তাঁহার সময়ে 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' বঙ্গদেশে প্রচারিত হয় নাই। ফলে এখানকার ব্যাকরণ-ক্ষেত্রে প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল 'কলাপ ব্যাকরণে'র। 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থের বর্ণনা হইতে জানা যায়, 'নিমাই পণ্ডিত' মুখ্যতঃ ব্যাকরণশাস্ত্রেরই অধ্যাপনা করিতেন, এমন কি তাঁহার বিদ্যাভ্যাসের বর্ণনাতেও ব্যাকরণ অধ্যয়নের কথাই প্রধান ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে এই ক্ষেত্রে তিনিও টীকা-পঞ্জী-সমন্বিত কলাপ ব্যাকরণেই সমধিক পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া উহার চর্চাতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতে ঃ

> নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক শিরোমণি।
> গঙ্গাদাস পণ্ডিত যে হন সান্দীপনী।।
> ব্যাকরণশাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ।
> তাঁর ঠাঁই পড়িতে প্রভুর সমীহিত।।...
> জিজ্ঞাসা করহ বুঝি কার কোন্ বুদ্ধি।
> বৃত্তি পাঁজি টীকার যে জানে দেখি শুদ্ধি।।
> ধাতুসূত্র বাখানহ বলে সে পড়ুয়া।
> প্রভু বলে বাখানি যে শুন মন দিয়া।।...
> আপনি করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী।—আদি খণ্ড, ৭ম অধ্যায়।

চৈতন্যচরিতামৃতে ঃ

গঙ্গাদাস পণ্ডিতস্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ।।
অল্পকালে হৈল পঞ্জীটীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন।।—১।১৫।৩–৪।

ঐ পঞ্জী ও টীকা যথাক্রমে ত্রিলোচনদাস-রচিত 'কাতন্ত্রবৃত্তি-পঞ্জিকা' এবং দুর্গগুপ্ত সিংহ-রচিত 'কাতন্ত্রবৃত্তিটীকা'। 'গণ'ও এই ব্যাকরণের ধাতু-বিষয়ক ('কাতন্ত্রগণমালা') পুস্তক। 'কাতন্ত্র' যে কলাপ ব্যাকরণেরই নামান্তর তাহা বলাই বাহুল্য। বৃত্তি = সূত্রব্যাখ্যা, টীকা নয়। টীকা = বৃত্তির ব্যাখ্যা।

গঙ্গাদাস 'বাক্যপদী' নামে এক ব্যাকরণগ্রন্থের প্রণেতা। তবে ইনিই চৈতন্যদেবের অধ্যাপক গঙ্গাদাস কিনা সঠিক বলা যায় না। মহাপ্রভু-রচিত (কলাপ) সূত্রের টিপ্পনী বা টীকার কথা অন্যত্র পাওয়া যায়। 'ভক্তিরত্নাকরে'র ১২শ তরঙ্গে ঃ

দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈঞা চমৎকার।
ব্যাকরণের করয় টিপ্পনী আপনার।।

অন্যত্র ঃ উদ্দেশে আমরা সব তোমার টিপ্পনী।
লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি।।

ঈশান নাগর-রচিত 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থ হইতে জানা যায়, নিমাই পণ্ডিত পাণ্ডিত্যের জন্য 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন এবং তাঁহার টীকার নামও ছিল 'বিদ্যাসাগর' টীকা ঃ

বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাই পণ্ডিত।
বিদ্যাসাগর নামে টীকা যাহার রচিত।। ১২শ অধ্যায়।

এই 'অদ্বৈতপ্রকাশ' খ্রীঃ ১৫৪৮ অব্দে রচিত বলিয়া অনুমিত। দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতও প্রথমে অবজ্ঞাভরে নিমাইকে বলিয়াছিলেন ঃ

ব্যাকরণ পড়হ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম।।
ব্যাকরণ-মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের আলাপ।।...
ব্যাকরণীয়া তুমি নাহি পড় অলঙ্কার।...

—চৈ. চ. ১।১৬।২৯–৩০, ৪৭।

এই নিমাই পণ্ডিতই গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া অন্য রূপ ধারণ করিলেন। এই সময় তিনি কৃষ্ণপ্রেমে এমন মাতোয়ারা হইলেন

যে ছাত্রদের নিকট অধ্যাপনা করিতে বসিয়াও ব্যাকরণের কৃষ্ণমূলক ব্যাখ্যা দিতে লাগিলেন :

আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
সূত্র-বৃত্তি-টীকায় সকল হরিনাম।।
প্রভু বলে সর্বকালে সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বলয়ে আন।।—চৈ.ভা. ২।১।...

ঐ যে 'সূত্র-বৃত্তি-টীকায় সকল হরিনাম'—এই ভাবাদর্শই 'হরিনামামৃত' ব্যাকরণের মূলমন্ত্র বা বীজ। কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গের ঐ ভাববিহ্বল ব্যাখ্যান-রীতির আদর্শে, উহারই অপেক্ষাকৃত বাস্তব বা কার্যকরী রূপদানের চেষ্টা, 'হরিনামামৃত ব্যাকরণে'র রচনা-শৈলীতে অনুসৃত হইয়া আছে। ইহার সমর্থনে 'জৈমিনিভারতে'র 'যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে। শ্রোতব্যং নৈব তচ্ছাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ।।' এই নিষেধ-বিধি তো আছেই। তাই ব্যাকরণের পাঠ লইবার সময়েও যাহাতে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে হরিনাম-সম্বলিত ব্যাকরণের পরিকল্পনা ; কারণ—'সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।।'—ভাগবত ৬।২।১৪ ; এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই এই ব্যাকরণের সূত্র এবং উদাহরণ প্রভৃতিতে বিশেষতঃ সংজ্ঞাসমূহে যতদূর সম্ভব হরি ও তদানুষঙ্গিক দেব-দেবীর নাম ব্যবহার করা হইয়াছে।[১]

(২)

হরিনামামৃত ব্যাকরণের দুইটি রূপ—একটি সংক্ষিপ্ত, অপরটি বৃহৎ। সংক্ষিপ্তের সমস্তটাই বৃহতে অনুপ্রবিষ্ট। টীকাকার হরেকৃষ্ণাচার্যের মতে পরম ভাগবত সনাতন গোস্বামী সর্বপ্রথম ঐ সংক্ষিপ্ত রূপটি প্রস্তুত করেন এবং পরে উহাকে পরিবর্ধিত করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী বর্তমান প্রচলিত বৃহদাকার দান করেন : '...সদা হরিরসলুব্ধমানসানামনধীত-ব্যাকরণানামধীতেতরব্যাকরণানাঞ্চ বৈষ্ণবানাং হিতাভিলাষপরবশতয়া, শ্রীনামগ্রহণপূর্বক-বিশিষ্ট-ব্যুৎপত্তি-বাঞ্ছয়া শ্রীকৃষ্ণদেবপ্রসাদমধিগম্য শ্রীমৎশ্রীল সনাতন গোস্বামিনাং সূত্রানুসারেণ শ্রীজীব গোস্বামিনামা গ্রন্থকারঃ পরমমঙ্গলরূপ মনোহর-মধুর-হরিনামাবলিভিঃ সঙ্কেতী কুর্বন্ শ্রীহরিনামামৃতাখ্যবৈষ্ণব-ব্যাকরণমারভমাণঃ...' ইত্যাদি। কোথাও আবার

সনাতন-ভ্রাতা শ্রীরূপ গোস্বামীতে ঐ সংক্ষিপ্তটির কর্তৃকত্ব আরোপিত হইয়াছে। আবার অনেকের মতে স্বয়ং শ্রীজীবই প্রথমে ঐ ক্ষুদ্র ব্যাকরণ রচনা করিয়া পরে উহাকে বৃহদাকার দান করেন।

বর্তমান মালদহ জেলার রামকেলি গ্রামে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণবংশে ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীজীবের জন্ম। মালদহ রেলস্টেশন হইতে কিঞ্চিদধিক পাঁচ মাইল দূরে প্রাচীন গৌড়ের নিকট এই রামকেলি গ্রাম। শ্রীজীবের পিতা শ্রীবল্লভ বা অনুপম ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব রূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ভাগবতের লঘুতোষিণী টীকার উপসংহারে শ্রীজীব-বর্ণিত নিজবংশপরিচয় হইতে জানা যায়, তাঁহার ঊর্ধ্বতন ৮ম পুরুষ 'জগদ্‌গুরু' সর্বজ্ঞ দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটদেশীয় (বর্তমান মহীশূর তথা কর্ণাটকপ্রদেশভুক্ত) অগ্রগণ্য এবং রাজা ছিলেন। এই কর্ণাটক হইতেই গৌড়ের সেনবংশীয় রাজাদের পূর্বপুরুষগণের আগমন ঘটে। সর্বজ্ঞের প্রপৌত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরবর্তী নবহট্টে (বঙ্গদেশের নৈহাটিতে) আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। পদ্মনাভের পৌত্র কুমারদেব নৈহাটি ত্যাগ করিয়া বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত বরিশাল জেলার বাকলা চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহারই তিন পুত্র : সনাতন (১৪৬৪–১৫৫৪ খ্রীঃ), শ্রীরূপ (১৪৭০–১৫৫৪) এবং অনুপম (১৪৭৩–১৫১৫)[২]। সনাতনাদি নাম-তিনটি মহাপ্রভুর দেওয়া। পিতৃদত্ত নাম যথাক্রমে অমরদেব, সন্তোষদেব এবং শ্রীবল্লভ। ইঁহাদের পিতামহ মুকুন্দ গৌড়ে রাজকার্য গ্রহণ করেন। ক্রমে গৌড়ের রাজা আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (বা হুসেন খাঁ সৈয়দ)—ইঁহার রাজত্বকাল ১৪৯৩–১৫১৯ খ্রীঃ—সনাতনপ্রভৃতি তিন ভ্রাতাকে পূর্বোক্ত রামকেলি গ্রামে আনিয়া প্রচুর ভূসম্পত্তিদানপূর্বক স্থাপন করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদিগকে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করা হয়। শ্রীজীবের পিতা অনুপম ছিলেন রাজার টাঁকশালের অধ্যক্ষ। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে'র প্রথম তরঙ্গে এই সকল কথা বিশদভাবে লিখিত আছে।

(৩)

অল্প বয়সেই শ্রীজীবের ব্যাকরণাদি নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের সূচনা হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপায় সনাতনাদির মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইলে তাঁহারা রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার

জন্য ব্যাকুল হন। এই সময়ে শ্রীজীব, পিতা ও শ্রীরূপের সহিত বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে আসেন। তখন তাঁহার বাল্যাবস্থা। পিতা, জ্যেষ্ঠতাতদের মতো দীর্ঘজীবী ছিলেন না। বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে যাইবার পথে গৌড়ে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। শ্রীজীব অধ্যয়নের জন্য চন্দ্রদ্বীপ হইতে ফতেয়াবাদ ও নবদ্বীপ হইয়া বৃন্দাবনের পথে কাশীধামে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া মধুসূদন বাচস্পতির নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন (ভ. র. ১।৭৭-৮) এবং বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের নিকট ভক্তিশাস্ত্রাদিতে শিক্ষিত হন। এই সময়েই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ ঘটে। অসাধারণ পাণ্ডিত্যবলে তিনি বিচারমল্ল অদ্বিতীয় তার্কিক হইয়া উঠেন। দক্ষিণ দেশীয় এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে তিনি তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন। বিচার আরম্ভের পূর্বমুহূর্তে এই পণ্ডিত শ্রীজীবের সন্ধানে যমুনার ঘাটে আসিয়া তাঁহাকে স্নানান্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি না করিয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া বিস্ময়ে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে তিনি এই শ্লোকদুইটি বলেন ঃ

হৃদাকাশে চিদানন্দঃ সূর্যো ভাতি নিরন্তরম্।
উদয়াস্তং ন পশ্যামি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে।।
সদ্‌ভক্তির্দুহিতা জাতা মায়া-ভার্যামৃতাঽধুনা।
অশৌচং দ্বয়মাপ্নোতি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে।।

ক্রমে এই তর্কপ্রিয়তার জন্য তাঁহাকে শ্রীরূপ গোস্বামীর বিরাগভাজনও হইতে হয়। বল্লভী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বল্লভভট্ট (বল্লভাচার্য) যমুনায় স্নানে যাইবার পথে একদা রূপ গোস্বামিপাদকে 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' নামক গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত জানিয়া অযাচিত ভাবেই 'আমি এই গ্রন্থ সংশোধন করিয়া দিব' বলিয়া যমুনায় চলিয়া গেলে নিকটবর্তী শ্রীজীব তাঁহার এই দম্ভোক্তি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি জল আনিবার ছলে তৎক্ষণাৎ যমুনায় গিয়া আচার্যকে উক্ত গ্রন্থের কোথায় ভুল আছে জিজ্ঞাসা করিলে উভয়ের মধ্যে যে শাস্ত্রযুদ্ধের অবতারণা হয় তাহাতে 'শ্রীজীবের বাক্য ভট্ট নারে খণ্ডিবারে' (ভ. র. ৫।১৬৩৫)। ফিরিবার সময় তিনি রূপ গোস্বামীর নিকট শ্রীজীবের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিলে দৈন্যাবতার শ্রীরূপ তাঁহার (শ্রীজীবের) তর্কপ্রবণতায় দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে আদেশ করেন। কিছুদিন পরে নন্দঘাটে উপবাস-ক্লিষ্ট ম্রিয়মাণ শ্রীজীবকে দেখিতে পাইয়া সনাতন গোস্বামী

তাঁহাকে বৃন্দাবনে লইয়া আসেন এবং অগ্রজের আজ্ঞায় শ্রীরূপও তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া স্বয়ং শুশ্রূষার দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তোলেন। তর্কে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতা যে বৈষ্ণবোচিত দীনতার প্রতিবন্ধক হয়, তাহা শিক্ষা দেওয়াই ছিল শ্রীরূপের ঐরূপ কঠোর আচরণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

(৪)

ভক্তিরত্নাকরে সনাতন ও রূপ গোস্বামীদের নামে যে সব গ্রন্থের উল্লেখ আছে, সে সবের মধ্যে লঘুহরিনামামৃতের নাম পাওয়া যায় না। সেখানে শ্রীরূপ-রচিত ১৬ খানি গ্রন্থের মধ্যে ব্যাকরণের ধাতুবিষয়ক যে 'প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা' পুস্তকের নাম করা হইয়াছে তাহাই একমাত্র ব্যাকরণ-বিষয়ক রচনা ঃ

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থরসপূর।
প্রযুক্তাখ্যাত-চন্দ্রিকা গ্রন্থ সুমধুর।। ১।৮১৬।

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরত্নাকরে যে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেও অনুরূপ বর্ণনাই রহিয়াছে ঃ 'উজ্জ্বলাখ্যোনীলমণিঃ প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা' (১।৮২৫)। আসলে কিন্তু এই গ্রন্থের নাম 'প্রযুক্তাখ্যাতমঞ্জরী'। ভট্টমল্ল-রচিত 'আখ্যাতচন্দ্রিকা' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে শ্রীরূপ গোস্বামী এই পুস্তক (ক্রিয়াকোশ) রচনা করেন। ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত শ্রীজীবের ২৫খানা গ্রন্থের প্রথমেই হরিনামামৃত ব্যাকরণের নাম আছে ঃ 'শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত। হরিনামামৃত ব্যাকরণ দিব্যরীত।। সূত্রমালিকা ধাতুসংগ্রহ সুপ্রকার।...' (১।৮৩৩, ৮৩৪) ; ইহার আনুষঙ্গিক সংস্কৃত শ্লোক ঃ 'শ্রীমদ্‌বল্লভপুত্র শ্রীজীবস্য কৃতিষূদ্যতে। শব্দানুশাসনং নাম্না হরিনামামৃতং তথা।। তৎসূত্রমালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ।।' প্রথমে উল্লেখ করা হইলেও এই ব্যাকরণ শ্রীজীবের শেষ বয়সের রচনা। ভক্তিরত্নাকরের ১৪শ তরঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্যকে লেখা শ্রীজীবের যে পত্রগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার প্রথম দুই পত্রে হরিনামামৃত ব্যাকরণের সংশোধন এবং নবদ্বীপে প্রেরণ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ '...শ্রীমাধবমহোৎসবোত্তরচম্পূ-হরিনামামৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি বর্তন্তে ইতি বর্ষাশ্চেতি সম্প্রতি ন প্রস্থাপিতানি, পশ্চাত্তু দৈবানুকূল্যেন প্রস্থাপ্যানি'—১ম পত্র। ২য় পত্রে ঃ 'পূর্বং যদ্‌

হরিনামামৃতব্যাকরণং ভবৎসু প্রস্থাপিতমাসীৎ তদ্ যদি পাঠ্যতে তদা তত্র ভাষ্যাদি বৃত্ত্যাদি দৃষ্ট্বা ভ্রমাদিকং শোধ্যম্।'

১ম পত্রে উল্লিখিত 'উত্তরচম্পূ'—শ্রীজীব-রচিত 'শ্রীগোপালচম্পূ' নামক বিশাল চম্পূকাব্যের উত্তরাংশ—যাহার রচনা সমাপ্ত হয় ১৫১৪ শকাব্দের বৈশাখমাসে। ইহা খ্রীষ্টীয় ১৫৯২ অব্দের ঘটনা। উত্তরচম্পূর সহিত একত্রে হরিনামামৃতেরও সংশোধন কিছু বাকি থাকার কথায় অনুমান করা যাইতে পারে যে উহারও রচনা-সমাপ্তিকাল ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পূর্বে। কাজেই এই ব্যাকরণ শ্রীজীবের শেষ বয়সের রচনা, এবং ২য় পত্র হইতে প্রমাণিত হয়—তাঁহার জীবৎকালেই ইহার পঠন-পাঠনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে ইহার অশোধিত গ্রন্থই নবদ্বীপে পাঠাইতে হইয়াছিল যদিও ইহার যথাভিপ্রেত সংশোধনাদি তাঁহার দেহত্যাগের (১৫৯৬ খ্রীঃ) পূর্বে বা আদৌ সম্পূর্ণ করা হইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই।

'হরিনামাবলি-বলিতং ব্যাকরণং বৈষ্ণবার্থমাচিম্ম' বলিয়া শ্রীজীব এই ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়াছেন এবং শেষে লিখিয়াছেন ঃ

যদত্র ব্যক্তমুক্তং ন ভ্রান্তং বা তদশেষতঃ।
জ্ঞেয়ং শোধ্যঞ্চ বিজ্ঞেভ্যো বিজ্ঞশাস্ত্রাবলোকতঃ।।

একজন গ্রন্থকারের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক বিনয়ের প্রকাশ বোধ হয় সম্ভব নয়। পরে লিখিয়াছেন ঃ

ভগবন্নামবলিতা ভগবদ্‌ভক্তি-তৎপরৈঃ।
বৃন্দাবনস্থজীবস্য কৃতিরেষা তু গৃহ্যতাম্।।
ছান্দসাপ্রচরদ্রূপ-রূঢ়শব্দান্ বিনা ময়া।
তত্রালেখি তদিচ্ছাচেদ্দৃশ্যোঽন্যঃ শাস্ত্রসংগ্রহঃ।।
হরিনামামৃতসংজ্ঞং যদর্থমেতৎ প্রকাশয়ামাসে।
উভয়ত্র চ মম মিত্রং স ভবতু গোপালদাসাখ্যঃ।।

এই গোপালদাস—যাঁহার জন্য এই ব্যাকরণের রচনা—ছিলেন বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের পুত্র। ইঁহার পূর্ব নাম ধীরহাম্বীর। ইঁহারা সকলেই শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য এবং পরম ধার্মিক। শ্রীজীব ধীরহাম্বীরকে বড় স্নেহ করিতেন। তাঁহার 'গোপালদাস' নাম শ্রীজীবেরই দেওয়া। গোপালদাস তাঁহার রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, যে

ব্যক্তি হরিনাম গ্রহণ না করিয়া জলগ্রহণ করিবে তাহাকে ভীষণ শাস্তি পাইতে হইবে। ফলে প্রবাদ দাঁড়াইয়াছিল ঃ গোপালের কালে রাজার মহলে কুক্কুটেও বলে হরি।' তিনি আদর্শ বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই শ্রীজীব কেবল ইহকালে নয়, পরকালেও ('উভয়ত্র') তাঁহার মিত্রতা কামনা করিয়াছিলেন ; ইহা গোপালের পক্ষে যে কত বড় গৌরবের কথা, তাহা সহজেই অনুমেয়।

(৫)

হরিনামামৃত ব্যাকরণের সূত্রসংখ্যা মোট ৩১৯২। প্রকরণের সংখ্যা—৭ ঃ (১) সংজ্ঞা-সন্ধি প্রকরণ, (২) বিষ্ণুপদ প্রকরণ (শব্দরূপ), (৩) আখ্যাত-প্রকরণ (ধাতুরূপ), (৪) কারকপ্রকরণ, (৫) কৃদন্তপ্রকরণ, (৬) সমাসপ্রকরণ ও (৭) তদ্ধিতপ্রকরণ। লঘু-হরিনামামৃতের প্রকরণ-বিভাগও এইরূপ, তবে ইহার সূত্রসংখ্যা একত্রে ৭৫৭। মাত্র ৩২ সূত্রাত্মক এক প্রাকৃতপাদও দৃষ্ট হয়।[৩]

মুখ্যতঃ পাণিনি ও কলাপ ব্যাকরণের অনুসরণে রচিত হইলেও এই ব্যাকরণে পাণিনির প্রত্যাহার (বর্ণসংক্ষেপ) গৃহীত হয় নাই, কলাপের সিদ্ধবর্ণপাঠ (অ, আ, ক্, খ্ ইত্যাদি ক্রমে বর্ণের প্রচলিত পাঠ) হরিনামময় সূত্রসমূহে অনুসৃত হইয়াছে। স্থল-বিশেষে পাণিনির সূত্রসমূহ অবিকল রাখিয়া এবং কোথাও বা সামান্য পরিবর্তন করিয়া ব্যাকরণভুক্ত করা হইয়াছে। পাণিনি (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী) হইতে শুরু করিয়া 'সুপদ্ম ব্যাকরণ' (খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দী) পর্যন্ত বিস্তৃত ব্যাকরণ-ক্ষেত্রের যাবতীয় প্রধান গ্রন্থ ও বিশিষ্ট মতের আলোচনাপূর্বক রচিত হইলেও ইহার রচনাশৈলী, বিশেষতঃ বৃত্তি-ভাগ (অর্থাৎ ব্যাখ্যাংশ) অতিশয় প্রাঞ্জল। উণাদিপ্রক্রিয়া অতি সংক্ষিপ্ত ; ইহা কৃদন্ত প্রকরণের মাত্র ১০টি সূত্রের (৩।৬৬-৭৫) আশ্রয়ে রচিত। বৈদিক প্রক্রিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত 'ছান্দসাপ্রচরদ্রূপ...' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীজীব বলিয়াছেন—এই ব্যাকরণে বৈদিক ও অপ্রচলিত রূঢ়শব্দসমূহ আলোচিত হয় নাই, ইচ্ছা হইলে সেইসব অন্য ব্যাকরণ হইতে জ্ঞাতব্য। স্থল-বিশেষে গোস্বামিপাদ 'সারস্বত' ও 'প্রক্রিয়াকৌমুদী' প্রভৃতি অন্য ব্যাকরণের ভুল-ভ্রান্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কোথাও বা বিভিন্ন সাহিত্য- ও ব্যাকরণ-গ্রন্থাদি হইতে প্রচুর উদাহরণ ও মতান্তর

প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়া সেইগুলির সমালোচনাপূর্বক স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। সূত্রের আক্ষরিক সংক্ষেপের জন্য বৈয়াকরণদের চির-কাম্য যে 'মাত্রা-লাঘব' তাহাকেও তিনি নির্দ্বিধায় তিরস্কার করিয়াছেন : 'মাত্রালাঘবমাত্রং পুত্রোৎসব ইতি পরেঽভিমন্যন্তে। হরিনামাক্ষরলাভাদ্বয়ং ত্বমুদৃক্ তিরস্কুর্মঃ।'—অর্থাৎ অন্য পণ্ডিতেরা কেবল মাত্রালাঘব হইলেই পুত্রোৎসব জ্ঞান করেন ; কিন্তু আমরা হরিনামাক্ষর লাভ করিতে পারিলেই ঐরূপ লাঘবকে তিরস্কার করি।

শিব বা ব্রহ্মা হইতে বর্ণমালার উৎপত্তিকথনের চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করিয়া নারায়ণ হইতে বর্ণক্রমের উদ্ভব ঘোষণার দ্বারা এই ব্যাকরণ আরম্ভ করা হইয়াছে : 'নারায়ণাদুদ্ভূতোঽয়ংবর্ণক্রমঃ' (১।১)। কলাপ (বা কাতন্ত্র) ব্যাকরণের আরম্ভে এই বর্ণক্রমকেই 'বর্ণসমাম্নায়' আখ্যা দিয়া ইহাকে সিদ্ধ বা চিরপ্রসিদ্ধ বলা হইয়াছে : 'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ' (১।১)। হরিনামামৃতের বর্ণক্রম—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্, চ্ ছ্...য্ র্ ল্ ব্ শ্ ষ্ স্ হ্ ক্ষ্। সর্বশেষে 'ক্ষ'র গ্রহণ লক্ষণীয়। বৃত্তিভাগে বলা হইয়াছে : 'এতে বর্ণাঃ, অক্ষরাণি অলঃ চ।' অল্ = অ হইতে হ্ পর্যন্ত সমস্ত বর্ণ বুঝাইতে পাণিনির সংজ্ঞা (Technical term)। শ্রীজীব হরিনামাত্মক সংজ্ঞা বিধানপূর্বক প্রায় প্রত্যেক স্থলেই কাতন্ত্র- এবং পাণিনি-ব্যাকরণ-সম্মত সংজ্ঞাও দেখাইয়াছেন ; যেমন, ২য় সূত্রে 'তত্রাদৌ চতুর্দশ সর্বেশ্বরাঃ।' ইহার বৃত্তি (ব্যাখ্যা)—'এতে স্বরাঃ অচঃ চ।' অর্থাৎ পূর্বোক্ত বর্ণক্রমের প্রথম চৌদ্দটির (এই ব্যাকরণে যাহাদিগকে 'সর্বেশ্বর' নাম দেওয়া হইয়াছে) কলাপ- ও পাণিনি-সম্মত সংজ্ঞা যথাক্রমে 'স্বর' এবং 'অচ্'। যে স্থলে কাতন্ত্রের তদনুরূপ সংজ্ঞা নাই সেক্ষেত্রে কেবল পাণিনির সংজ্ঞাই প্রদর্শিত, যেমন—১১শ সূত্রে ও তাহার বৃত্তিতে : 'ই ঈ উ ঊ চতুঃসনাঃ' (১।১১)। 'ইণঃ চ'। এখানে ই ঈ উ ঊ বর্ণের শ্রীজীব-কৃত সংজ্ঞা 'চতুঃসন', পাণিনীয় সংজ্ঞা 'ইণ্' ; কাতন্ত্রে এইজন্য কোন সংজ্ঞার প্রয়োজন হয় নাই। নিম্নে হরিনামামৃতের কয়েকটি লক্ষণীয় সংজ্ঞা প্রদর্শিত হইল : 'দশাবতার' = অ হইতে ৡ পর্যন্ত দশটি ('সমান') বর্ণ, 'একাত্মক' = সবর্ণ (যেমন অ আ, ই ঈ, উ ঊ ইত্যাদি), 'বামন' = হ্রস্ব, 'ত্রিবিক্রম' = দীর্ঘ, 'মহাপুরুষ' = প্লুত, 'ঈশ্বর' = ই—ঔ পর্যন্ত ১২টি ('নামী') বর্ণ, 'ঈশ' = ই উ ঋ ঌ এ

ঐ ও ঔ, 'অনন্ত' = অ আ ই ঈ উ ঊ, 'চতুর্ভুজ' = উ ঊ ঋ ৠ, 'চতুর্ব্যূহ' = এ ঐ ও ঔ, 'বিষ্ণুচক্র' = ং, 'বিষ্ণুচাপ' = ঁ , 'বিষ্ণুসর্গ' = ঃ, 'বিষ্ণুজন' = ক—হ্ পর্যন্ত সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণ, 'হরিকমল' = ক চ ট ত প, 'হরিখড়্গ' = খ ছ ঠ থ ফ, 'হরিগদা' = গ জ ড দ ব, 'হরিঘোষ' = ঘ ঝ ঢ ধ ভ, 'হরিবেণু' = ঙ ঞ ণ ন ম, 'বিষ্ণুদাস' = ক্ খ্ গ্ ঘ্, চ্ ছ্ জ্ ঝ্ (প্রতি বর্গের পঞ্চম বর্ণব্যতীত মোট ২০টি বর্ণ), 'হরিমিত্র' = য্ র্ ল্ ব্, 'হরিগোত্র' = শ্ ষ্ স্ হ্ ; সূত্র করিয়াছেন—'বিষ্ণুদাস-হরিগোত্রাণি বৈষ্ণবাঃ' (১।৩০) অর্থাৎ পূর্বোক্ত ২০টি বর্ণ এবং শ্ ষ্ স্ হ্ একত্রে 'বৈষ্ণব' সংজ্ঞায় অভিহিত ; 'হরিগদা-হরিঘোষ-হরিবেণু-হরিমিত্রাণি হশ্চ গোপালঃ' (১।৩১) অর্থাৎ সমস্ত ঘোষবদ্ বর্ণকে 'গোপাল' নাম দেওয়া হইয়াছে ; 'যাদব' = অঘোষ বর্ণ, 'রাম' = বর্ণস্বরূপ, যেমন অকার ইকার না বলিয়া অরাম ইরাম ইত্যাদি বলিতে হইবে ; 'বিরিঞ্চি' = আদেশ, 'বিষ্ণু' = আগম, 'হর' = লোপ, 'বিষ্ণুভক্তি' = বিভক্তি, 'পুরুষোত্তম লিঙ্গ' = পুংলিঙ্গ, 'লক্ষ্মীলিঙ্গ' = স্ত্রীলিঙ্গ, 'ব্রহ্মলিঙ্গ' = ক্লীবলিঙ্গ, 'কৃষ্ণনাম' = সর্বনাম, 'পরপদ' = পরস্মৈপদ, 'আত্মপদ' = আত্মনেপদ, 'মিশ্রপদ' = উভয়পদ, 'কৃষ্ণধাতুক' = সার্বধাতুক, 'অচ্যুত' = লট্, 'বিধি' = বিধিলিঙ্, 'বিধাতা' = লোট্, 'ভূতেশ্বর' = লঙ্, 'ভূতেশ' = লুঙ্, 'অধোক্ষজ' = লিট্, 'বালকল্কি' = লুট্, 'কামপাল' = আশীর্লিঙ্, 'কল্কি' = লৃট্, 'অজিত' = লৃঙ্, 'রামধাতুক' = আর্ধধাতুক, 'উপেন্দ্র' = উপসর্গ, 'উদ্ধব' = উপধা, 'কৃষ্ণ' = অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ, 'কৃষ্ণপুরুষ' = তৎপুরুষ, 'শ্যামরাম' = কর্মধারয়, 'ত্রিরামী' = দ্বিগু, 'পীতাম্বর' = বহুব্রীহি, 'রামকৃষ্ণ' = দ্বন্দ্ব, 'কৃষ্ণপ্রবচনীয়' = কর্মপ্রবচনীয়, 'কৃষ্ণস্থান' = ঘুট্, 'কেশব' = টিৎ, 'গোপী' = ঈ এবং ঊ কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, 'গোবিন্দ' = গুণ, 'চক্রপাণি' = যঙ্লুগন্তধাতু, 'নারায়ণ' = দ্বিরুক্তধাতুর পরভাগ, 'নৃসিংহ' = ণিৎ, 'পাণ্ডব' = স্বাদি পঞ্চবিভক্তি, 'বুদ্ধ' = সম্বোধনের সুবিভক্তি, 'মাধব' = টণিৎ, 'রাধা' = আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, 'বিভু' = নামধাতুপ্রত্যয়, 'বিষ্ণুনিষ্ঠা' = ক্তবতু, 'বিষ্ণুপদ' = পদ, 'বিষ্ণুবর্গ' = কাদিপঞ্চ বর্গ, 'বৃষ্ণীন্দ্র' = বৃদ্ধি, 'শিব' = শিৎ, প্রভৃতি।

একটু ধৈর্য ধরিয়া লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে গ্রন্থকার যদৃচ্ছাক্রমে

কেবল দায়সারার তাগিদেই এই সব সংজ্ঞার ব্যবহার করেন নাই, বরং প্রতিটি সংজ্ঞা-নির্দেশের ক্ষেত্রে তিনি গভীর মননশীলতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। সংজ্ঞীর (অর্থাৎ বিষয়ের) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সেই সংজ্ঞীর সংজ্ঞানির্দেশক নামের অধিকারী দেব-দেবীর বা বস্তুর ঐতিহ্যগত চরিত্র বা ক্রিয়াকলাপের মিল বা সামঞ্জস্য যতদূর সম্ভব রক্ষা করিয়াই এই সংজ্ঞাগঠনকার্য সমাধা করা হইয়াছে। নাম ও নামীর তথা সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর অভেদ কল্পনাও এই নির্বাচনের মূলে কম প্রেরণা যোগায় নাই। মোটকথা, ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে বসিয়া সংজ্ঞার তাৎপর্যচিন্তার মধ্য দিয়া শব্দচরিত্র তথা দেব-চরিত্র মননের পরম লাভ—এই ব্যাকরণ-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি। বিচিত্র ধারায় গ্রন্থকার এই সুফল লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বহু স্থলে নিজেই তিনি ব্যাখ্যার দ্বারা এই ফল একেবারে হাতে হাতে ধরাইয়া দিতেও কার্পণ্য করেন নাই। সংজ্ঞা-প্রকরণের ৩৯–৪১ সংখ্যক সূত্র তিনটির বৃত্তিভাগে দৃষ্টি দেওয়া যাক। এই সূত্রগুলিতে যথাক্রমে 'আদেশে'র জন্য 'বিরিঞ্চি', 'আগমে'র জন্য 'বিষ্ণু' এবং 'লোপে'র জন্য 'হর' সংজ্ঞা নির্দেশিত হইয়াছে। বিরিঞ্চির ব্যবহারের কারণ দেখাইতে শ্রীজীব লিখিয়াছেন : 'বিরিঞ্চির্ব্রহ্মা যথৈকং বস্তূপাদায় অন্যৎ করোতি, তথা যো বিধিঃ প্রবর্ততে স আদেশো বিরিঞ্চিশ্চোচ্যতে।' 'বিষ্ণু' সংজ্ঞার ব্যবহারের কারণ বলিয়াছেন : 'বিষ্ণুর্যথা মধ্যতঃ স্বয়মাবির্ভূয় পোষকো ভবতি, তথা যো বিধিঃ প্রবর্ততে স আগমঃ, বিষ্ণুশ্চোচ্যতে।' এইরূপে লোপের 'হর' সংজ্ঞার নির্দেশের কারণ : 'হরো যথা নাশহেতুর্ভবতি, তথা যো বিধিঃ প্রবর্ততে স লোপঃ, হরশ্চোচ্যতে। তত্র হরো দ্বিধা ভবেৎ—তত্রাদর্শনমাত্রহেতুর্হরঃ, আত্যন্তিকলয়হেতুর্মহাহরঃ।' এই তিন স্থলে আদেশ, আগম ও লোপের ব্যাকরণ-ঘটিত বৈশিষ্ট্যের সহিত যথাক্রমে বিরিঞ্চির (ব্রহ্মার) কারকতা, বিষ্ণুর পোষকতা এবং হরের নাশকতার সাদৃশ্যহেতু ব্যাকরণের অনুরূপ কার্যের নামকরণে উহাদের প্রয়োগ সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। বহুব্রীহির জন্য পীতাম্বর সংজ্ঞা-বিধানের মূলানুসন্ধানে দেখা যায়, বিষ্ণুবাচক পীতাম্বর শব্দটি নিজেই বহুব্রীহিসমাস-নিষ্পন্ন পদ। এইরূপ কর্মধারয়, দ্বিগু এবং দ্বন্দ্ব সমাসের জন্য যথাক্রমে 'শ্যামরাম', 'ত্রিরামী' ও 'রামকৃষ্ণ' সংজ্ঞার প্রয়োগ যথেষ্ট সার্থক। ভবিষ্যৎকাল-সূচক 'লৃট্'কে (কাতন্ত্রের 'ভবিষ্যন্তী') 'কল্কি'

সংজ্ঞায় অভিহিত করার পশ্চাতে রহিয়াছে ভবিষ্যতে কল্কিরূপে বিষ্ণুর অবতরণের কল্পনা। লট্, বিধিলিঙ্, লোট্ ইত্যাদি অন্যান্য 'ল'কারের জন্য 'অচ্যুত', 'বিধি', 'বিধাতা' প্রভৃতি সংজ্ঞানির্ধারণের মূলেও অনুরূপ গূঢ় সার্থকতা রহিয়াছে। এইরূপ সর্বত্র। স্থলবিশেষে পূর্বাচার্যদের ব্যবহৃত সংজ্ঞাই বৈষ্ণবী দৃষ্টিতেও যথেষ্ট অর্থবহ হইয়া উঠিয়াছে ; যেমন—সমাসপ্রকরণের সূত্র 'সমাসবাক্যং বিগ্রহঃ' (৬।৫)।এখানকার 'বিগ্রহ' সংজ্ঞাটি বিষ্ণুবিগ্রহের ইঙ্গিত বহন করিতেছে। এইরূপ পদের ব্যাখ্যা-জ্ঞাপক 'বিষ্ণুভক্তি সিদ্ধং বিষ্ণুপদম্' (১।১১৫) সূত্রটি বড়ই চমৎকার হইয়াছে। 'বিষ্ণুভক্তি' = বিভক্তি, 'বিষ্ণুপদ' = পদ। ব্যাকরণে পদকে বিভক্তিযুক্ত বা বিভক্ত্যন্ত বলা হয়। সেই শাস্ত্রীয় অর্থ ছাড়াই, কেবল বিষ্ণ্পাসক ভক্তের দৃষ্টিতেই নয়, সাধারণ ভাবেও সূত্রটি সার্থক, অর্থাৎ ব্যাকরণের সূত্ররূপে ব্যবহার না করিলেও ঐ বাক্যটির বাচ্যার্থের হানি হয় না, কারণ বিষ্ণুভক্তির দ্বারাই ভক্তের পরমকাম্য বিষ্ণুর শ্রীপদ লাভ ঘটিয়া থাকে। আবার 'প্রকৃতিঃ পূর্বা' (১।১৫৯) এবং 'প্রত্যয়ঃ পরঃ' (১।১৫১) সূত্রদ্বয় একত্রে ব্যাকরণশাস্ত্রীয় অর্থের অতিরিক্ত সাধারণ বস্তুবিজ্ঞানের সত্যও প্রকাশ করিতেছে—প্রথমে প্রাকৃত জগৎ এবং পরে তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভ্যুদয়, অথবা যেমন প্রকৃতি তেমন প্রত্যয়।

কেবল সংজ্ঞাকরণেই নয়, সূত্রের উদাহরণেও গ্রন্থকার বিষ্ণুর নাম ব্যবহার করিয়াছেন। সন্ধি প্রকরণের ১ম সূত্র 'দশাবতার একাত্মকে মিলিত্বা ত্রিবিক্রমঃ' (১।৪৬) [যাহার অনুরূপ কাতন্ত্রসূত্র 'সমানঃ সবর্ণে দীর্ঘী ভবতি পরশ্চ লোপম্' (১।২৪)]। উহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—'কৃষ্ণাগ্রে, রাধাগতা, হরীতি, বিষ্ণূদয়ঃ' প্রভৃতি। কোন কোন স্থলে কেবল সংজ্ঞাশব্দটির পরিবর্তন করিয়া কাতন্ত্রের সূত্রকে অবিকল গ্রহণ করা হইয়াছে, যেমন 'উদ্বয়ে ও' (১।৫০)। এখানে কাতন্ত্রের 'উবর্ণে ও' (১।২৬) সূত্রটির বর্ণ-সংজ্ঞার স্থলে, 'তদাদিদ্বয়ে দ্বয়ম্' (১।৩৮) এই সূত্রানুসারে কেবল 'দ্বয়' সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়া ঐ 'উবর্ণে ও' সূত্রটিকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। হরিনামাত্মক সংজ্ঞা-নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রন্থকার যে-সমস্ত বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্ম রসগ্রাহী দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন তন্মধ্যে, আমাদের বিবেচনায়, এই কয়টি প্রধান বলিয়া মনে হয় ঃ (১) বৈষ্ণব দেবতার এবং তদানুষঙ্গিক যাবতীয় ভাব ও বস্তুর

নামাবলীর যত বেশী সম্ভব ব্যবহার, (২) বিষয়ের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য যাহাতে তদ্‌জ্ঞাপক সংজ্ঞার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই স্মৃতিপথে উদিত হয় তদুপযোগী স্বরূপ-বিশিষ্ট সংজ্ঞা-চয়ন, অর্থাৎ এক কথায়—বিষয়ের সহিত সংজ্ঞার পারস্পরিক ঐতিহ্যগত তাদাত্ম্য, (৩) সংজ্ঞার মাধ্যমে সেই বিষয়ের উদাহরণেরও প্রদর্শন, যেমন—দ্বিগুসমাসের জন্য ব্যবহৃত 'ত্রিরামী' সংজ্ঞাটি নিজেই দ্বিগুসমাসঘটিত পদ, (৪) সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের সহিত সংজ্ঞাগুলির সাধারণ দার্শনিক, সাহিত্যিক, অন্য শাস্ত্রীয় এবং ধর্মীয় চিত্তচমৎকারী ঐতিহ্যেরও অনুসরণ এবং (৫) সংজ্ঞার ব্যবহার-নৈপুণ্যে সূত্র-বৃত্তি-উদাহরণ সজ্ঘটিত বাক্যে বা বাক্যাংশে ব্যাকরণাতিরিক্ত অন্য কোনও শাশ্বত সত্যের উপস্থাপনা।

শ্রীজীবের অন্য দুই গ্রন্থ 'সূত্রমালিকা' এবং 'ধাতুসংগ্রহ'—হরিনামামৃতের আনুষঙ্গিক রচনা। প্রথমটি পাওয়া যায় নাই। ইহা সম্ভবতঃ মূল ব্যাকরণের সূত্রগুলিকে কারিকা-নিবদ্ধ করিয়া রচিত হইয়াছিল। ধাতু-সংগ্রহ—এই জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। ইহার শেষে বলা হইয়াছে ঃ

> অপ্রযুক্তাঃ পরে জ্ঞেয়া গ্রন্থাৎ কল্পদ্রুমাদিকাৎ।
> হরিনামামৃতস্যৈষা সংক্ষেপাদ্ধাতুপদ্ধতিঃ।
> ময়া কৃতা প্রযুক্তান্যধাতূংস্ত্যক্ত্বা ক্বচিৎ ক্বচিৎ।।

শ্লোকধৃত 'কল্পদ্রুম' বোধ হয় বোপদেব-রচিত 'কবিকল্পদ্রুম' নামক বিখ্যাত ধাতুসংগ্রহের বই।

অন্যান্য ব্যাকরণের তুলনায় হরিনামামৃতের টীকা-টিপ্পনীর সংখ্যা খুবই কম। ইহার প্রাঞ্জলতা এবং নির্দিষ্ট বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে ইহার পঠন-পাঠনের সীমাবদ্ধতা বোধ হয় এই গ্রন্থ-বিরলতার কারণ। শ্রীজীব স্বয়ং এই ব্যাকরণের বৃত্তি (=ব্যাখ্যা) রচনা করিয়া গিয়াছেন। সূত্রকার-কর্তৃক সূত্রসমূহের বৃত্তিরচনা একরূপ চিরাচরিত প্রথা। ইহার প্রায় আড়াইশত বৎসর পরে বাঁকুড়া জেলায় সোনামুখী গ্রাম-নিবাসী হরেকৃষ্ণ আচার্য 'বালতোষণী' নামে হরিনামামৃতের এক বিস্তৃত টীকা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এই টীকা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই; সমাস-প্রকরণের ২৫৭ সূত্র পর্যন্ত টীকা রচনার পর ভবলীলা সম্বরণ করেন। ১২৫৩ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে (খ্রীঃ ১৮৪৬) গোপীচরণ দাস বেদান্তভূষণ এই টীকার সমাস

প্রকরণ পর্যন্ত রচনা সমাপ্ত করিয়া সর্বশেষ তদ্ধিত-প্রকরণের 'তদ্ধিতোদ্দীপনী' টীকা প্রণয়ন করেন। বীরভূমে ছিল তাঁর পৈতৃক বাড়ী। টীকা রচনার সময় তিনি কেন্দুবিল্বে বাস করিতেছিলেন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেও পূর্বনাম ত্যাগ করেন নাই।

পরিশেষে তাঁহারই কথায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 'ছয় গোসাঞি'র অন্যতম শ্রীজীব গোস্বামিপাদের চরণ যুগলে নমস্কার করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি ঃ

কৃতং যেন ভক্ত্যা পরেশ-প্রবেশং
সুশাস্ত্রং মহাবোধকং শব্দরূপম্।
হরেনার্ম-সন্ধান-শীলৈশ্চ সেব্যং
নমো জীবগোস্বামিনে নিত্যমস্তু।।

---

১ 'হরিনামামৃতমিতি ভঙ্গ্যা গ্রন্থনামাপি নির্দিষ্টং, হরিনামরূপমমৃতং যত্র তৎ—"পিবন্তু রসিকাঃ সর্বে কৃষ্ণাখ্যং পরমামৃতমিতি"পাদ্মবচনাৎ। যদ্বা হরিনামভিস্তৎ কীর্তনাদিভিরমৃতং মুক্তিরবিদ্যামোচনং যস্মাৎ তৎ।'—বালতোষণী টীকা

২ সনাতনাদির সময়-নির্দেশ লইয়া মতবিরোধ আছে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সনাতন ও রূপ গোস্বামীর জীবৎকাল যথাক্রমে ১৩৮৪–১৫৫৮ এবং ১৪৯০–১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রদ্ধেয় রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ আকবরশাহের বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাতের ঘটনাকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন এবং ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে শতাধিক বৎসর বয়সে তাঁহাদের তিরোভাব সাব্যস্ত করিয়াছেন (দ্রঃ—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা, ৩য় সংস্করণ, ১৩৫৫, পৃঃ ২৫-৭)।

৩ কয়েকটি বিরলসংখ্যক পাণ্ডুলিপির শেষে 'ইতি হরিনামামৃতে বৈষ্ণবব্যাকরণে প্রাকৃতপাদঃ সমাপ্তঃ' এইরূপ লিখিত থাকা সত্ত্বেও ইহার মৌলিকতা সন্দেহাতীত নয়। এই সম্বন্ধে ডঃ সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'The Eastern School of Prakrit Grammarians' (Calcutta, 1977) গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে (Appendix D, pp. xxii–xxiv) এই ক্ষুদ্রতম ব্যাকরণ মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

কতকগুলি অপ্রধান ব্যাকরণ
বিশ্রান্তবিদ্যাধর ব্যাকরণ
(খ্রীঃ ২য়।৩য় শতক)

বামন এই ব্যাকরণের রচয়িতা। ইহার 'বিশ্রান্ত...' এবং 'অবিশ্রান্ত...' ইত্যাদি দুই নামেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। মূল গ্রন্থ অনাবিষ্কৃত, কাজেই এই বিষয়ে এবং আরও অনেক বিষয়েই নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়। পরবর্তী গ্রন্থাদিতে ইহার উল্লেখ ও উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করিয়া 'দুধের স্বাদ ঘোলে মিটান' ছাড়া উপায়ান্তর নাই। ১১৪০।৪১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'গণরত্নমহোদধি'র (১।২) বৃত্তিতে বর্ধমান লিখিয়াছেন ঃ 'বামনোঽ-বিশ্রান্তবিদ্যাধরব্যাকরণকর্তা'। এখানে এই ব্যাকরণের 'অবিশ্রান্তবিদ্যাধর' নাম পাওয়া যাইতেছে। আবার ঐ 'গণরত্নমহোদধি'তেই (২।৯২ এবং ২।১৩০) 'বিশ্রান্তন্যাসকৃৎ' এবং 'বিশ্রান্তন্যাসে'রও উল্লেখ রহিয়াছে, যাহা হইতে 'বিশ্রান্তবিদ্যাধর' নামটি সূচিত হয়। খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীয় হেমচন্দ্র সূরি 'বিশ্রান্তবিদ্যাধরকার' এবং 'বিশ্রান্তবিদ্যাধরন্যাসকার' দুই-এরই নাম করিয়াছেন। এই ন্যাসের রচয়িতা মল্লবাদী। তিনি ছিলেন অন্যতম জৈনাচার্য এবং অতি বড় তার্কিক। হৈম বৃহদ্‌বৃত্তিতে (২।২।৩৯) উদাহৃত হইয়াছে ঃ 'অনুমল্লবাদিনস্তার্কিকাঃ।' ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত প্রভাবকচরিতের 'মল্লবাদিসূরিচরিত' প্রবন্ধে লিখিত আছে ঃ

> শব্দশাস্ত্রে চ বিশ্রান্তবিদ্যাধরবরাভিধে।
> ন্যাসং চক্রেঽল্পধীবৃন্দবোধনায় স্ফুটার্থকম্।।৩৮।।

ঐ প্রবন্ধ হইতেই জানা যায়, মল্লবাদীর গুরুর নাম জিনানন্দ সূরি। তিনি নন্দ নামক কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত-কর্তৃক তর্কে পরাজিত হইয়া ভৃগুকচ্ছ (বর্তমান গুজরাট প্রদেশের Broach) হইতে বলভীপুরে গমন করেন। সেখানে তাঁহার সহোদরা দুর্লভাদেবী যে তিন পুত্র সহ বাস করিতেন, তাঁহাদেরই কনিষ্ঠ ছিলেন মল্লবাদী। তিনি উপযুক্ত বিদ্যালাভের পর সূরিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভৃগুকচ্ছে আসিয়া বুদ্ধানন্দ নামক বৌদ্ধ পণ্ডিতকে (সম্ভবতঃ ইনিই পূর্বোক্ত নন্দ নামক পণ্ডিত)

তর্কে পরাজিত করেন এবং রাজার নিকট 'বাদী' উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রভাবকচরিতের অন্তর্গত 'বিজয়সিংহসূরিচরিতে' লিখিত আছে ঃ

শ্রীবীরবৎসরাদথ শতাষ্টকে চতুরশীতি সংযুক্তে।
জিগ্যে স মল্লবাদী বৌদ্ধাংস্তদ্ ব্যন্তরাংশ্চাপি।।৮৩।।

অর্থাৎ মহাবীর সংবৎ ৮৮৪তে মল্লবাদী বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন। ৫৯৯ খ্রীঃ পূর্বাব্দে মহাবীরের জন্ম সময় ধরিয়া তাহা হইতে ৮৮৪ বৎসর পরে ২৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। আবার ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত রাজশেখর সূরির 'প্রবন্ধকোশে'র অন্তর্গত 'মল্লবাদি প্রবন্ধে' বর্ণিত হইয়াছে যে ৩৭৫ বিক্রমসংবতে ম্লেচ্ছদের দ্বারা বলভীনগরী বিধ্বস্ত হইয়াছিল ঃ

বিক্রমাদিত্যভূপালাৎ পঞ্চর্ষিত্রিক (৩৭৫) বৎসরে।
জাতোঽয়ং বলভীভঙ্গো জ্ঞানিনঃ প্রথমং যযুঃ।।৬৬।।

মল্লবাদি-কর্তৃক বৌদ্ধবিজয়ের পূর্বোক্ত ঘটনার কয়েক বৎসর পর বলভীতে এই ম্লেচ্ছ-আক্রমণ ঘটিয়াছিল। ৩৭৫ সংবৎ = ৩১৮। ১৯খ্রীষ্টাব্দ। কাজেই মল্লবাদীর অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ৩য়।৪র্থ শতক এবং তৎপূর্ববর্তী বামনের বিশ্রান্তবিদ্যাধর ব্যাকরণ খ্রীঃ ২য় শতকের শেষ প্রান্তে অথবা ৩য় শতকের প্রারম্ভে রচিত হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে একাধিক বামনের সাক্ষাৎ মিলে ঃ (১) অষ্টাধ্যায়ীর কাশিকাবৃত্তিকার বামন, (২) লিঙ্গানুশাসনকৃদ্ বামন এবং (৩) কাব্যালঙ্কারসূত্র এবং তদ্‌বৃত্তিকৃদ্ বামন। বিশ্রান্তবিদ্যাধরকর্তা বামন, ইঁহাদের সকলের পূর্বগামী।

গণরত্নমহোদধিতে (৪।২৬৪, ৭।৪২৯) বর্ধমান বামনকে 'সহৃদয়-চক্রবর্তী' বলিয়াছেন এবং তাঁহার বৃহদ্‌বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'বামনস্তু বৃহদ্‌বৃত্তৌ যব মাষেতি পঠতি।' বৃহদ্‌বৃত্তির নাম করায়, প্রতীয়মান হয়, বামন এই ব্যাকরণের এক (অবৃহৎ) লঘুবৃত্তিও রচনা করিয়াছিলেন।

কাতন্ত্র-চতুষ্টয়ের প্রথম সূত্রের কলাপচন্দ্রে সুষেণ বিদ্যাভূষণ 'বামনসূত্র' বলিয়া একটি ব্যাকরণ-সূত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'তথা হি "বসেরশ্যর্থস্য" ইতি বামনসূত্রে অশের্ভোজনস্য অর্থো নিবৃত্তির্বাচ্যত্বেন যস্যেতি বিগ্রহে ভোজননিবৃত্তিবচনস্যেতি প্রতীয়তে।' গণরত্নমহোদধি হইতে এইরূপ আরও কয়েকটি স্থলের উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ

সনঞ্ পূর্বাৎ ক্ষণাদুদীচামিতি গণসূত্রমত্র বামনো মন্যতে (২।১৩৬), অঙ্গুল্যাদেষ্ঠণিত্যনেনাঙ্গুল্যাদিগণাদিবার্থে ঠণ্ ভবতি। বামনস্য তু তদাদেষ্ঠগিতি (ণিতি?) সূত্রম্ (৩।১৯২), সহৃদয়চক্রবর্তিনা বামনেন তু হেম্ন ইতি সূত্রেণ বিকারেঽর্থেঽণ্যাজাদের্লুক্ কৃত এব (৪।২৬৪), কুড্যায়া যলোপশ্চেতি গণসূত্রং বামনোক্তমুপলক্ষণং দ্রষ্টব্যম্ (৫।৩১৬), মুখপার্শ্বৈকান্তসো লোপশ্চেতি গণসূত্রমাহ বামনঃ (৫।৩১৭), বিরাগবিরঙ্গ চেতি গণসূত্রং বামনমতেন (৬।৩৭০), স্বকীয়ঃ। পাণিন্যাদয়স্তু স্বদেবশব্দৌ ন পঠন্তি। তন্মতে সৌবং দৈবমিত্যেব ভবতি। বামনমতেন গণকৃতমনিত্যমিতি ন্যায়াৎ কুট্ছাভাবেঽণ্ প্রত্যয়ে সৌবম্ (৫।৩২১), বৈন্যঃ। ...বামনাদয়স্তু ছন্দসি বৈন্যো ভাষায়াং তু বৈনিরিত্যাহুঃ (৩।২১০)।

ইহা হইতে মনে হয় বামনের ব্যাকরণে বৈদিক শব্দও আলোচিত হইয়াছিল। গণরত্নমহোদধির 'কেদারাদৌ বামনাচার্যদৃষ্টে...' (৪।২৫৮) এবং 'শুণ্ডিকা গ্রামঃ অভিজনোঽস্য শৌণ্ডিক্যঃ। অয়ং বামনমতাভিপ্রায়ঃ। পাণিন্যাদয়স্তু শণ্ডিকস্য গ্রামজনপদবাচিনঃ শাণ্ডিক্য ইত্যুদাহরন্তি' (৫।৩৪৩) এই দুই বর্ণনা ও উপরের 'স্বকীয়ঃ'–বিষয়ক বক্তব্য হইতে পাণিনীয় সম্প্রদায়ের সহিত বামনের মতবিরোধ সূচিত হইতেছে।

বুদ্ধিসাগর–ব্যাকরণ (খ্রীঃ ১১শ শতক)

জৈন পণ্ডিত বুদ্ধিসাগর নিজের নামানুসারে ১০৮০ সংবতে (খ্রীঃ ১০২৩।২৪) এই ব্যাকরণ রচনা করেন। শ্রীজাবালিপুরে (Jalor) ইহা প্রণীত হয়। ব্যাকরণের অন্তিম ভাগে প্রাপ্ত একটি শ্লোকে এই সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে: 'শ্রীবিক্রমাদিত্যনরেন্দ্রপালাৎ সাশীতিকে যাতি সমাসহস্রে। সশ্রীক জাবালিপুরে তদাদ্যং...ময়া সপ্তসহস্রকল্পম্।।' আবার প্রভাবকচরিতের মতে এই ব্যাকরণ ছিল সহস্রাষ্টকমান অর্থাৎ আট হাজার শ্লোকপরিমিত: 'শ্রীবুদ্ধিসাগরঃ সূরিশ্চক্রে ব্যাকরণং নবম্। সহস্রাষ্টকমানং তৎ শ্রীবুদ্ধিসাগরাভিধম্।।'—অভয়দেবসূরিচরিত ৯০।। বুদ্ধিসাগরের ভ্রাতা এবং সতীর্থ অষ্টকবৃত্ত্যাদিপ্রণেতা জিনেশ্বর সূরির বর্ণনা হইতে জানা যায়, বুদ্ধিসাগরব্যাকরণ বৃত্তবন্ধ ছিল: 'শ্রীবুদ্ধিসাগরাচার্যৈর্বৃত্তৈর্ব্যাকরণং কৃতম্।' পদ্মপ্রভ সূরির 'কুন্থুনাথচরিতে'ও বলা হইয়াছে: 'শ্রীবুদ্ধি-

সাগরো বুদ্ধিবিভবং বিতনোতু মে। পদ্যৈঃ পদ্মেব শব্দাব্ধের্যেন ব্যাকরণং কৃতম্।।' উল্লিখিত জিনেশ্বর সূরির শ্লোকার্ধের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 'প্রভালক্ষ্মে'র প্রান্তে বলা হইয়াছে ঃ 'পাণিনি-চন্দ্র-জৈনেন্দ্র-বিশ্রান্ত-দুর্গ-টীকামবলোক্য বৃত্তবন্ধৈঃ ধাতুসূত্রগণোণাদিবৃত্তবন্ধৈঃ কৃতং ব্যাকরণং সংস্কৃতশব্দ-প্রাকৃতশব্দসিদ্ধয়ে।' কাজেই এই ব্যাকরণের আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাকৃত শব্দচর্চা, অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণও বুদ্ধিসাগর স্বীয় ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।

এই ব্যাকরণের অপর নাম 'পঞ্চগ্রন্থী'। 'সুরসুন্দরীকথা প্রশস্তি'তে ধনেশ্বর সাধু ইহাকে 'পঞ্চগ্গংথীনই' বলিয়াছেন। ইহার প্রান্তটিপ্পনীতে লিখিত আছে ঃ 'পঞ্চগ্রন্থী পঞ্চাঙ্গং ব্যাকরণম্।' সুমতি গণির 'গণধর-সার্ধশতকবৃহদ্‌বৃত্তি'তে 'অথ চ স্বনামানুরূপকৃত ব্যাকরণোঽপি' কথা দ্বারা বুদ্ধিসাগরকে বিশেষিত করা হইয়াছে। এই ব্যাকরণের আর এক নাম (?) 'শব্দলক্ষ্ম'। শ্রীধর ভাণ্ডারক ইহাকে 'শব্দলক্ষ্ম লক্ষণ' নামে সূচীভুক্ত করিয়াছেন। হৈম লিঙ্গানুশাসন বিবরণে এবং অভিধানচিন্তামণির (৩।২৬৮) ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দেখিয়া মনে হয়, বুদ্ধিসাগর লিঙ্গানুশাসনের কোনও বিশেষ গ্রন্থও রচনা করিয়া থাকিবেন।

জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তিনি। মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম; নাম শ্রীপতি। চন্দ্রকুলের বর্ধমান সূরির নিকট জৈন ধর্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি বুদ্ধিসাগর নাম গ্রহণ করেন। চতুর্দশ বিদ্যাতে পণ্ডিত হইয়া গুজরাটের অনহিল্লপুরে আসিলে তাঁহার এই ধর্মান্তর গ্রহণ সাধিত হয়। ব্যাকরণের রচনা-কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাকে খ্রীঃ ১০ম।১১শ শতাব্দীয় বলা চলে। বল্লাল কবি-রচিত ভোজপ্রবন্ধে (খ্রীঃ ১৬শ শতক) রাজা ভোজের মুখ্য অমাত্যরূপে এক বুদ্ধিসাগরের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ 'ততো মুঞ্জে তপোবনং যাতে বুদ্ধিসাগরং মুখ্যামাত্যং বিধায় স্বরাজ্যং বুভুজে ভোজরাজভূপতিঃ।' এই বুদ্ধিসাগরই নিজনামের ব্যাকরণ-প্রণেতা কিনা তাহা নিশ্চিত বলা যায় না, যদিও ভোজরাজ এই সময়েই (১০১০–১০৫৩ বা ১০৬৫খ্রীঃ) রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

দীপক ব্যাকরণ

এই ব্যাকরণের প্রণেতা ভদ্রেশ্বর সূরি। 'গণরত্নমহোদধি'তে (১।২) বর্ধমান দীপককর্তার উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'মেধাবিনঃ প্রবরদীপককর্তৃ-যুক্তাঃ।' ইহার ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন ঃ 'দীপককর্তা শ্রীভদ্রেশ্বর সূরিঃ। প্রবরশ্চাসৌ দীপককর্তা চ প্রবরদীপককর্তা। প্রাধান্যং চাস্যাধুনিক বৈয়াকরণাপেক্ষয়া।' ঐ গ্রন্থেই (২।১৪০) ভদ্রেশ্বরাচার্য-নির্ধারিত এক স্বাদিগণের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

ভদ্রেশ্বরাচার্যস্তু 'কিঞ্চ স্বা দুর্ভগা কান্তা রক্ষান্তা নিশ্চিতা সমা।
সচিবা চপলা ভক্তির্বাল্যেতি স্বাদয়োদশ'।।
ইতি স্বাদৌ বেত্যনেন বিকল্পেন পুংবদ্‌ভাবং মন্যতে।

ইহার সহিত পাণিনীয় প্রিয়াদিগণের (৬।৩।৩৪) উপাদানগত কিছু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 'মাধবীয় ধাতুবৃত্তি'তে (১০।১, ১৫,৬৫,৯০,২৩৫ এবং নামধাতুবৃত্তিতে) শ্রীভদ্রের নামে ধাতুবিষয়ক উদ্ধৃতি হইতে প্রতীয়মান হয়, শ্রীভদ্র পাণিনীয়(?) ধাতুপাঠের এক বৃত্তি রচনা করেন। অবশ্য এই শ্রীভদ্রই 'দীপককর্তা শ্রীভদ্রেশ্বর সূরি' কিনা, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। গুরুপদ হালদার 'ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থে (পৃঃ ৪৫২) 'ভদ্রেশ্বরসূরি নাম কোথাও পাওয়া যায় না' বলিয়া 'সম্ভবতঃ উপাঙ্গী ভদ্রবাহুসূরিকেই বর্ধমান এস্থলে ভদ্রেশ্বর সূরি বলিয়াছেন' এইরূপ অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই অনুমানও নামের আংশিক সাদৃশ্যনির্ভর। রাজাবলীকথা নামক জৈন গ্রন্থ হইতে জানা যায়, যশোভদ্রের শিষ্য এবং চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন ভদ্রবাহু ছিলেন এক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীতে রচিত জৈনেন্দ্র ব্যাকরণে (২।১।৯৯) দেবনন্দী পূর্বাচার্যরূপে যশোভদ্রের নাম করিয়াছেন।

দীপ ব্যাকরণ

ইহাকে 'ব্যাকরণদীপ'ও বলা হয়। সন্ন্যাসিগণকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে পরমহংস পরিব্রাজক চিদ্রূপাশ্রম এই ব্যাকরণ রচনা করেন। ইহার বিষয়-বিভাগ ঃ সন্ধিপ্রকরণ, শব্দাধিকার, স্ত্রীপ্রত্যয়, কারক, সমাস, তদ্ধিত, পদব্যবস্থা, আখ্যাত এবং কৃৎ। প্রাথমিক শিক্ষোপযোগী স্বতন্ত্র ব্যাকরণ। চিদ্রূপাশ্রমেরই ছাত্র গঙ্গাধর দীক্ষিত 'প্রভা' নামে এই ব্যাকরণের যে টীকা প্রণয়ন করেন তাহার পূর্ণনাম 'ব্যাকরণ-দীপপ্রভা'। এই টীকার রচনাকাল ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দ।

গঙ্গাধরের পিতা বালকৃষ্ণ এবং পিতামহ বিশ্বনাথ সূরি। অম্বিলাল গ্রামে তাঁহাদের বাস ছিল।

ব্যাকরণ-দীপিকা

ইহার রচয়িতা বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন কলিকাতা সিটি কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক ছিলেন। কয়েক বৎসরের চেষ্টায় তিনি সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালীতে সরল সংস্কৃতে সূত্র-বৃত্তি-সম্বলিত এবং ইংরেজী ও বঙ্গানুবাদসহ এই ব্যাকরণ রচনা করিয়া মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সিদ্ধান্তকৌমুদী, কলাপ, মুগ্ধবোধ, সংক্ষিপ্তসার, সুপদ্ম, প্রক্রিয়াকৌমুদী, সারস্বত এবং মহাভাষ্য—এই আটখানি ব্যাকরণ গ্রন্থাবলম্বনে ইহাদের সূত্রসার সঙ্কলনপূর্বক এই ব্যাকরণ রচিত। সূত্রসংখ্যা মোট ৪৬৮। প্রারম্ভিক নমস্কারশ্লোক ঃ

দেবদেবং প্রণম্যাদৌ সর্বজ্ঞং সর্বদর্শিনম্।
সর্ববোধপ্রকাশায় দীপিকেয়ং প্রদীপ্যতে।।

পূর্ববঙ্গীয় (বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার) এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশে গ্রন্থকারের জন্ম। গ্রন্থশেষে তিনি পিতৃ-পিতামহাদি চারিপুরুষের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ঃ

বরিশালপ্রদেশে যা মানমাষেতি বিশ্রুতা।
তত্র কৌলীন্যমর্যাদা-সম্পন্নস্য মহাত্মনঃ।।
লক্ষ্মীনারায়ণাখ্যস্য মুখোপাধ্যায়সৎকৃতেঃ।
সূতঃ সুযশসা বিত্তৌ ন্যায়শাস্ত্রবিশারদঃ।।
সার্বভৌমোপনামা যো রামনাথ ইতিশ্রুতঃ।
বিররাজ কিয়ৎকালং প্রাড়্বিবাকমতং দিশন্।।
রঘুনাথঃ সুতস্তস্য তর্কালঙ্কারলাঞ্ছিতঃ।
প্রাজ্ঞো ন্যায়বিদাং শ্রেষ্ঠস্ত্রয়স্তস্য সুতা ইমে।।
কালীপ্রসাদ ইত্যাদো ন্যায়শাস্ত্রার্থ-তত্ত্ববিৎ।
তর্কসিদ্ধান্তসূপাধিভূষিতো বিদিতঃ সুধীঃ।।
দ্বিতীয়ঃ শিবচন্দ্রশ্চ লোকনাথঃ কনিষ্ঠকঃ।
লোকনাথ-তনূজেন দীপিকেয়ং প্রদীপ্যতে।।

বৈয়াকরণসর্বস্ব

ধরণীধর- ও কাশীনাথ-সঙ্কলিত এই বিশাল গ্রন্থকে ব্যাকরণ-সমুদ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের সংস্কৃত এবং হিন্দু আইনের অবৈতনিক অধ্যাপক হেনরি টমাস্ কোলব্রুকের (১৭৬৫-১৮৩৭) প্রেরণায় ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রস্তুত হয় এবং ঐ বৎসরেই মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়। ধরণীধর-কর্তৃক আরব্ধ এই গ্রন্থ কাশীনাথ সম্পূর্ণ করেন। ইহা কাশিকাবৃত্তির অবলম্বনে মূলতঃ অষ্টাধ্যায়ীর ব্যাখ্যাস্বরূপ হইলেও নানাদিকে সমধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'বৈয়াকরণসর্বস্ব' নামটিতেই তাহা সূচিত। ইহাতে সমগ্র অষ্টাধ্যায়ী, কাত্যায়নের বার্ত্তিক, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী, কাশিকা এবং ব্যাকরণের সমস্ত শাখা বর্তমান। পাণিনীয় গণপাঠ, ধাতুপাঠ, প্রাচীন বার্ত্তিক এবং কারিকাদিও এই সঙ্কলনে স্থান পাইয়াছে। ইহাতে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ-কর্তৃক নির্দিষ্ট ব্যাকরণের দশটি বিভাগ—শিক্ষা, প্রাতিশাখ্য, নিরুক্ত, ফিট্‌সূত্র, সূত্র, কারিকা, পরিভাষা, বার্ত্তিক, ভাষ্য ও ভাষ্যেষ্টি পরিপ্রেক্ষিত এবং ব্যাকরণের দার্শনিক ও ন্যায়শাস্ত্রীয় দিক্ দুইটিও ন্যূনাধিক পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত, মঞ্জূষা ও বাদার্থসমূহের সাহায্যে সঙ্কলক শব্দ ও বাক্যসম্বন্ধে নানা দুরূহ প্রশ্নের অবতারণা করিয়া তাহার সমাধান প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যাকরণশাস্ত্রের উৎপত্তি হইতে শুরু করিয়া ইহার বর্তমান পরিণতি পর্যন্ত বিস্তৃত ধারাটি সমগ্র পাণিনীয় ব্যাকরণ-চর্চার মধ্য দিয়া প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। মোট কথা, পাণিনীয় সম্প্রদায়ের যাবতীয় ফলশ্রুতিকে একাধারে গ্রহণ করিবার ইহা এক সর্বগ্রাসী প্রচেষ্টাস্বরূপ। বৈদিকাংশ এবং প্রত্যাহার-সূত্রাদি—পাণিনীয় কিছুই বাদ পড়ে নাই। পুষ্পিকায় বলা হইয়াছে ঃ

> দেশে শ্রীমতি বঙ্গনাম্নিনগরে শ্রীকল্লকত্তাভিধে শ্রীমত্তামসহেনৃক কুলবুরুক্ সাহেবদত্তাজ্ঞয়া। প্রারব্ধং ধরণীধরেণ বিদুষা ব্যাখ্যানকং পাণিনেঃ সূত্রাণাং সমনুক্রমেণ চ মহাভাষ্যেণ তট্টীকয়া।। কৌমুদ্যাপি চ কাশিকা-সহিতয়া সংযুক্তকং বার্ত্তিকৈস্তদ্বৎ সর্বগণৈঃ সহৈব চ পরিভাষেষ্টিভির্মিশ্রিতম্। মূঢ়ানাং দ্রুতবোধকঞ্চ সুমহৎ সর্বোপকারক্ষমং কাশীনাথ ইতীরিতো বুধবরঃ পূর্ণীচকারাথ তৎ।। গৌরীপুত্রমুখর্তুনাগধরণীসংবৎসরে (১৮৬৬) বৈক্রমে

ভূবৈশ্বানরসপ্তচন্দ্রকমিতে (১৭৩১) শাকে তপস্যোসিতে। পক্ষে সূর্যতিথৌ বিধৌ সুদিবসে বিপ্রস্তু সারস্বতো বাবুরাম-সমাখ্যয়াতি-বিদিতো মুদ্রাক্ষরৈর্ন্যস্তবান্।।

একদা মুদ্রিত হইলেও এই গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

সঙ্কলয়িতাদের অন্যতর ধরণীধর সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই। কাশীনাথ সম্ভবতঃ কাশীর সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ বাঙ্গালী পণ্ডিত কাশীনাথ ভট্টাচার্য, তর্কালঙ্কার, পণ্ডিতেন্দ্র বিদ্যাবাহাদুর। কাশীর তৎকালীন রেসিডেন্ট মিঃ জেঃ ডনকান্ প্রথমে নিজব্যয়ে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নবেম্বর কাশীর সংস্কৃত কলেজ (Benares College) স্থাপন করেন। এবং পরবৎসর হইতেই উহা সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত হইতে থাকে। এই কাশীনাথ স্যার উইলিয়ম জোন্স-এর (১৭৪৭-৯৪) 'শব্দসন্দর্ভসিন্ধু' নামক বৃহৎ সংস্কৃতাভিধান রচনা করিয়াছিলেন। নানাবিধ অসদাচরণের জন্য ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি উক্ত অধ্যক্ষপদ হইতে বিতাড়িত হন। অব্যয়ার্থ-প্রণেতা রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী 'বৈয়াকরণসর্বস্বসূচী' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থসম্পর্কিত।

কারিকাবলী ব্যাকরণ

কৃষ্ণরামের পুত্র রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন (ভট্টাচার্যচক্রবর্তী) ইহার প্রণেতা। তিনি নবদ্বীপ হইতে কৃতবিদ্য হইয়া পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলায়, কলিকাতার প্রায় ৩২ মাইল দক্ষিণে মজিলপুর গ্রামে অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় সারাজীবন অতিবাহিত করেন। বেলবলকরের মতে রচয়িতার নাম নারায়ণ। হালদার মহাশয়ও এই মতেরই অনুবর্তী। অধিকন্তু তিনি ইঁহাকে অমরকোষের 'পদার্থকৌমুদী' নামে টীকার প্রণেতা নারায়ণ হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। এই টীকা ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কারিকাবলী ১৬৪০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১৮/১৯ খ্রীষ্টাব্দের রচনা। সময়ের এত বেশী ব্যবধানে একই গ্রন্থকারের পক্ষে দুই গ্রন্থ রচনা করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই এই দুই গ্রন্থের রচয়িতা দুই ভিন্ন ব্যক্তি।

পুত্র রামপ্রসাদের শিক্ষার জন্য রামনারায়ণ কারিকাবদ্ধ এই ব্যাকরণ রচনা করেন ঃ

...নারায়ণং নমস্কৃত্য ক্রিয়তে কারিকাবলিঃ।।
। বিচার্য-পূর্বতন্ত্রাণি প্রয়োগানুপ লক্ষ্য চ।
স্পষ্টসংক্ষেপসারোক্ত্যা পদ্যেনেয়ং ময়োচ্যতে।।

ব্যাকরণের যাবতীয় প্রধান বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণমালায় 'ক্ষ' বর্ণ গৃহীত এবং ষত্ব ও ণত্ব দুইটি পৃথক্ অধ্যায়ে দর্শিত হইয়াছে। গণানুসারে ধাতুরূপ না দেখাইয়া পরিবর্তনানুসারে দেখানো হইয়াছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ইহা সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণবিশেষ। অথচ ইহাতে সংক্ষিপ্তসারের বিষয়বিন্যাসরীতি গৃহীত হয় নাই। এই ক্ষেত্রে গ্রন্থকার বরং মুগ্ধবোধের অনুপন্থী। পুত্র রামপ্রসাদ পণ্ডিত হইয়া ইহার এক টীকা রচনা করেন। একমতে তাঁহার পিতামহের নাম কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ এবং ঐ মজিলপুর গ্রামে পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের বসবাস।

সারাবলী ব্যাকরণ

ইহার প্রণেতা নারায়ণ ঠাকুর (বন্দ্যোপাধ্যায়)। পশ্চিমবঙ্গের খানাকুলের জমিদার যাদবেন্দ্র চৌধুরী (খ্রীঃ ১৬শ শতক) ইঁহাকে ভূমিদান করিয়া খানাকুলে বাস করান। যাদবেন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী বংশীধরের সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হওয়ার পর সম্ভবতঃ নারায়ণ এই গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার 'ধাতুরত্নাকর' ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। 'স্মৃতিসার' নামে আর এক গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করেন। ইহা স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থ। এই বিষয়ে তাঁহার পারদর্শিতা এবং প্রয়োগনৈপুণ্য সম্বন্ধে এইরূপ কাহিনী শুনা যায় যে, তিনি একবার কাশীধামে থাকাকালীন, দ্বাদশবৎসর-নিরুদ্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে পুনরায় সংসারে গ্রহণ করিবার বিধান দিয়া ইহার বিরুদ্ধবাদী স্থানীয় পণ্ডিত সমাজের সহিত তুমুল বাদবিচারের দ্বারা সেই বিধান রক্ষা করেন। শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী ঐরূপ নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি মৃত বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় ঘরে তাহার স্থান হইত না।

সারাবলী সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ-বিশেষ। ৭ পাদে সম্পূর্ণ। কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সরাদিরাজ-প্রণীত ('সারাবলীমাহ সরাদিরাজঃ') 'সারাবলী' নামক এক সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণের খণ্ডিত পুঁথি আছে। ইহার সংজ্ঞাগুলি কলাপব্যাকরণের অনুকরণে

প্রস্তুত। Catalogus Catalogorum-এ বাদিরাজ-কৃত বলিয়া যে 'সারাবলী' নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা কি এই গ্রন্থ?

সজ্জনেন্দ্রপ্রয়োগ-কল্পদ্রুম

কৃষ্ণপণ্ডিত-রচিত শ্লোকাত্মক এই গ্রন্থ, উদয়পুরের রাণা সজ্জন সিংহের নামাঙ্কিত এবং তাঁহারই গুণবর্ণনাত্মক উদাহরণসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত। খ্রীঃ ১৯শ শতকের ৪র্থ দশকে কৃষ্ণপণ্ডিতের জন্ম এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৫০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু। তাঁহার পিতার নাম বৈদ্যনাথ এবং পিতামহ বিশ্বনাথ। ইঁহারা আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী মারাঠী ব্রাহ্মণ। ব্যাকরণ ও সাহিত্যে কৃষ্ণপণ্ডিতের সবিশেষ পারদর্শিতা ছিল। হরপুরে তিনি বাস করিতেন। পূর্বোক্ত রাণা ছিলেন তাঁহার আশ্রয়দাতা।

সরল সংস্কৃত শ্লোকে কারককুসুম, সমাসকুসুম, তদ্ধিতকুসুম, তিঙ্‌কুসুম ও কৃৎকুসুম এই পাঁচ ভাগে কৃষ্ণপণ্ডিত এই গ্রন্থ রচনা করেন। কৃৎকুসুমে উণাদি প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহের পরিচয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যা মোট ২৫০। প্রারম্ভে ঃ

> উদয়পুরেশো রাণা সজ্জনসিংহো মহারাজঃ।। তদ্‌গুণকীর্তনহেতোঃ সুলভব্যুৎপত্তয়ে চ বালানাম্। কারকসমাসতদ্ধিতযুততিঙ্-কৃৎপ্রত্যয়ান্তশব্দানাম্।। দুর্বোধমল্পবিষয়ং দৃষ্ট্বা বররুচিকৃতং প্রয়োগমুখম্। সুখবোধ এষ রম্যো বহুবিষয়োঽপ্রক্রিয়াক্লেশঃ।। সোদাহরণশ্লোকঃ কাব্যে শব্দানুশাসনে চ হিতঃ। সজ্জন-নৃপকীর্তিকরঃ সগূঢ়বিবৃতিশ্চ কারিকাবদ্ধঃ।। পুরহরপুরবসতিমতা বিদুষা ধর্মাধিকার্যুপাখ্যেন। কৃষ্ণেন সজ্জনেন্দ্রপ্রয়োগকল্পদ্রুমঃ ক্রিয়তে।। এবং উপসংহারে—সংবদ্ গ্রহগুণনন্দাচলামিতে শরদি বাহুলে মাসে। অসিতে পক্ষে করভে দ্বাদশ্যাং ভূমিসুতদিবসে।। কারকসমাস তদ্ধিততিঙ্‌কৃৎকুসুমৈঃ সুগন্ধিভিঃ ফুল্লৈঃ। ভবতি স্ম সজ্জনেন্দ্রপ্রয়োগকল্পদ্রুমঃ পূর্ণঃ।।

১৯৩৯ সংবতে (খ্রীঃ ১৮৮২) এই গ্রন্থরচনা সমাপ্ত হয়। কৃষ্ণপণ্ডিতের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীধর, দিল্লীশ্বরের নিকট সম্মানাত্মক যে 'ধর্মাধিকারী' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বংশধরেরা সেই সময় হইতে বরাবর ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

শব্দার্ণবনব্যপদ্য ব্যাকরণ

ইহার প্রণেতা রত্নকিশোরশর্ম্মা। অনুষ্টুপ্‌ছন্দোবদ্ধব্যাকরণ। কলাপ ও মুগ্ধবোধ ইহার ভিত্তিস্বরূপ। শ্লোকসংখ্যা ১২৫৫। 'দ্বিজঃ শ্রিয়া রত্নকিশোর শর্ম্মা করোতি শব্দার্ণবনব্যপদ্যম্।'

ব্যাকরণ সুধাকর

শ্যামাচরণ কবিরত্ন-সঙ্কলিত এই গ্রন্থকে লঘুকৌমুদীর আধুনিক সংস্করণ বলা চলে। খ্রীঃ ১৯শ শতকের শেষ দিকে প্রস্তুত। সংস্কৃত সূত্র এবং তাহার বাংলা ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। প্রবেশিকা হইতে বি. এ. পর্য্যন্ত পরীক্ষার্থীদের এবং চতুষ্পাঠীর ছাত্রদেরও পাঠোপযোগী।

পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলায় চেঙ্গাইল গ্রামে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কবিরত্নের জন্ম এবং ২১।৩।১৯৪১ তারিখে কাশীপ্রাপ্তি। আমৃত্যু সংস্কৃতশাস্ত্র-চর্চা করিয়া এই বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থের রচনা ও সম্পাদনা করেন।

বাগ্‌ভট-ব্যাকরণ

(খ্রীঃ ২য় শতক)

গুরুপদ হালদার তাঁহার 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থে (পৃঃ ৪৫১) চারিজন বাগ্‌ভটের সন্ধান দিয়া লিখিয়াছেন ঃ

> আমরা চারিজন বাগ্‌ভটকে জানি। তন্মধ্যে দুইজন ভর্ত্তৃহরির পরবর্ত্তী, আর দুই জন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। শেষোক্ত দুইজনের মধ্যে প্রথম বাগ্‌ভট নিঘণ্টু নামে একখানি বৈদিককোষ এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা প্রণয়ন করেন। ইঁহার পুত্র সিংহগুপ্ত এবং পৌত্র অষ্টাঙ্গসংগ্রহ প্রণেতা দ্বিতীয় বাগ্‌ভট। প্রথম বাগ্‌ভটের নিঘণ্টু দেখিলে বুঝা যায় যে, তিনি একজন শাব্দিক আচার্য্য ছিলেন। দ্বিতীয় বাগ্‌ভট কেবল আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।

ঐ 'বৈদিক কোষ' আসলে বৈদ্যক নিঘণ্টু বা আয়ুর্বেদীয় শব্দকোষ। হালদারই তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থ 'বৃদ্ধত্রয়ী'তে (পৃঃ ২৬৩, ২৬৫, ২৬৬, ৩৭৭) ইহাকে 'বৈদ্যকনিঘণ্টু' বলিয়াছেন যদিও তিনি এই গ্রন্থ দেখেন নাই ('...নাস্মাভির্দৃষ্টঃ')।

জগদীশ তর্কালঙ্কার (খ্রীঃ ১৭শ শতক) তাঁহার 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে কারকপ্রকরণের শেষে ভর্তৃহরি-রচিত 'ভাষ্যদীপিকা' হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন প্রসঙ্গক্রমে ঃ

> হন্তেঃ কর্মণ্যুপষ্টম্ভাৎ প্রাপ্তমর্থে তু সপ্তমীম্।
> চতুর্থীবাধিকামাহুশ্চূর্ণিভাগুরিবাগ্ভটাঃ।।

'ভাষ্যদীপিকা'—মহাভাষ্যের দুর্লভ ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে যে-প্রসঙ্গে চূর্ণি (= মহাভাষ্য তথা পতঞ্জলি) এবং ভাগুরির সহিত বাগ্ভটের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় বাগ্ভট ব্যাকরণ-বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। হালদারের মতে ঃ

> প্রথমো বাগ্ভটঃ সিন্ধুদেশজাতো বৈদ্যাগমিকঃ স্মার্ত্তঃ শাব্দিকঃ সদ্‌ব্রাহ্মণশ্চাসীৎ।...মন্যে দ্বিতীয় খৃষ্টশতাব্দ্যা অভ্যন্তরবর্ত্তিনি কুত্রচিৎ সময়ে প্রথমবাগ্ভট আবির্বভূবেতি। তেন স্বনাম্না ব্যাকরণমেকং প্রণীতম্। স চ গ্রন্থো বৈয়াকরণৈরাদরাতিশয়েন পরিগৃহীত আসীদিত্যব-গম্যতে। তন্মতে 'চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তী' ত্যাদৌ 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য কর্ম্মণি স্থানিন' ইতি চতুর্থীনিষেধার্থং হন্তেঃ কর্ম্মণা সোপষ্টম্ভং সংযুক্তে নিমিত্তে সপ্তমী ব্যাখ্যেয়া। চূর্ণিকৃদ্‌ভাগুরী অনুসৃত্যৈব বাগ্ভট এবমুক্তবান্।...চূর্ণিরিত্যনেন পতঞ্জলির্লক্ষিতঃ।—বৃদ্ধত্রয়ী (পৃঃ ২৬৪, ২৬৬-৬৭)।

উক্ত শ্লোকের শেষে উল্লিখিত বাগ্ভটের স্থলে 'বাভট' পাঠও দেখা যায়; ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ-প্রণীত কারকচক্রের মাধবীটীকায় লিখিত আছে ঃ

> জগদীশস্তু কর্মসংযোগে উপষ্টম্ভাখ্যসম্বন্ধে ইতি ব্যাচষ্টে, উপষ্টম্ভাখ্য-সংযোগশ্চ প্রাণিনাং দন্তকেশত্বগাদিষ্বেব, এতাদৃশব্যাখ্যায়াং 'হন্তেঃ কর্মণ্যুপষ্টম্ভাৎ...চূর্ণিভাগুরিবাভটা' ইতি কারিকাপি প্রমাণং দর্শয়তি...।

ভাগুরি এবং বাগ্ভট বা বাভটের গ্রন্থ পাওয়া যায় না, কাজেই এই বিষয়ে তাঁহারা ঠিক্ কি বলিয়াছিলেন তাঁহার রচনাগত প্রমাণ নাই। তবে মহাভাষ্যে ২।৩।৩৬ সূত্রের শেষ বার্ত্তিক 'নিমিত্তাৎকর্মসংযোগে'র ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে ঃ

> নিমিত্তাৎকর্মসংযোগে সপ্তমী বক্তব্যা।
> চর্মণি দ্বীপিনং হন্তি দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরম্।
> কেশেষু চমরীং হন্তি সীম্নি পুষ্ক (ষ্য) লকো হতঃ।।

এই শ্লোকটি সম্ভবতঃ অতি প্রাচীন এবং ভাগুরি-বাগ্‌ভটাদি বৈয়াকরণগণও অনুরূপ প্রসঙ্গে ইহাকে উদ্ধৃত করিয়া থাকিবেন—যাহার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত 'হন্তেঃ কর্মণ্যুপষ্টম্ভাৎ...' ইত্যাদি শ্লোকে 'চতুর্থীবাধিকা সপ্তমী' বিভক্তি প্রদর্শনের সীমিত ব্যবস্থা, কারণ হনন-ক্রিয়ার কর্মে 'প্রাপ্তমর্থে' উপষ্টম্ভাখ্য সংযোগহেতু চতুর্থীর স্থলে সপ্তমী বিভক্তি প্রয়োগের উদাহরণ আর পাওয়া যায় না ('উপষ্টম্ভাখ্যসংযোগো দন্তকেশত্বগাদিষু')।

বাভটের ব্যাকরণ

(খ্রীঃ ১০ম/১১শ শতক)

জগদীশ তর্কালঙ্কার 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা'তে সমাসপ্রকরণের প্রারম্ভে সমাসবিষয়ে বাভটের মতোল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন ঃ

পূর্বমধ্যান্ত্যসর্বান্যপদপ্রাধান্যতঃ পুনঃ।
প্রাচ্যৈঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তঃ সমাসো বাভটাদিভিঃ।।

অর্থাৎ বাভটাদি প্রাচ্য বৈয়াকরণগণ সমাস পঞ্চবিধ বলিয়াছিলেন ; এই পাঁচ প্রকার ঃ (১) পূর্বপদপ্রধান, (২) মধ্যপদপ্রধান, (৩) অন্ত্যপদ-প্রধান, (৪) সর্বপদপ্রধান এবং (৫) অন্যপদপ্রধান। প্রাচ্য বিশেষণের দ্বারা বাভট পূর্বদেশীয় পণ্ডিতরূপে পরিগণিত। আয়ুর্বেদে তিনি বৈদ্যক-সংহিতা এবং 'শ্রাস্ত্রদর্পণনিঘণ্টু' রচনা করেন। বৈদ্যকসংহিতাকে 'বাভটসংহিতা'ও বলা হয়। 'বাহট'—বাভটশব্দের প্রাকৃত রূপ। হালদারের মতে 'বাগ্‌ভট'শব্দের প্রাকৃত রূপ বাহট এবং বাভট খ্রীঃ ১১শ/১২শ শতাব্দীর (বৃদ্ধত্রয়ী, পৃঃ ২৬৩–৬৪)। খ্রীঃ ১১শ/১২শ শতাব্দীয় ক্ষীরস্বামী অমরকোশোদ্‌ঘাটনে (২।৯।৪৩) বাহটের নামে উদ্ধৃতি দিয়াছেন ঃ '"মৎস্যণ্ডিকা খণ্ডসিতাঃ ক্রমেণ গুণবত্তরা" ইতি তু বাহটঃ।' তিনি 'প্রাচ্যাঃ' বলিয়াও উদ্ধৃতি দিয়াছেন ঃ 'উক্তং চ—বুকং বেণং সধত্তূরং সুমনাঃ পাটলা তথা। পদ্মমুৎপলকং সূর্যমষ্টৌ পুষ্পাণি শঙ্করে।।...বাতি বুকঃ। বক ইতি প্রাচ্যাঃ' (—ঐ ২।৪।৮১)। বলা বাহুল্য, এই বাহট যদি বাভট হন, তবে তিনি ক্ষীরস্বামীর পূর্ববর্তী।

সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের জৌমর বৃত্তিতে জুমরনন্দী বেশ কয়েকবার বাভটের ব্যাকরণশাস্ত্রঘটিত মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সংক্ষিপ্তসারের 'কর্মোপাদানেঽপি ভাবে' (৩।১৮০) সূত্রের বৃত্তিতে লিখিত আছে ঃ

'ভ্রান্তং দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎফলমিতি বাভট-পশুপতিভ্যাং ব্যাখ্যাতম্।' অর্থাৎ 'কর্ম্মের উপাদান থাকিলেও সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়। ভাববাচ্যে কর্ম্ম থাকে না, এই সূত্রদ্বারা কর্ম্মবিহিত হইল। যথা "দেশং ভ্রান্তং", "প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলম্" এই উভয় স্থলেই কর্ম্মের উপাদান আছে। অথচ ভাবার্থে ক্ত হইল। দেশং ও ফলং উভয়ই কর্ম্ম। ভ্রান্তং ও প্রাপ্তং এই দুইটি ক্রিয়াপদ। বাভট ও পশুপতি এই পণ্ডিতদ্বয় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।'—গুরুনাথ বিদ্যানিধি। জৌমর বৃত্তির অন্যত্র ঃ 'শূরসেনং পৌরুষং ত্যাজয়তি, দেবদত্তং শতং দাপয়তি ইত্যাদয়োঽসাধব ইতি বাভটঃ। "অযাচিতারং ন হি দেবদেবমদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক" ইত্যসাধুরিত্যনুন্যাসবাভটৌ' (৫।১০), 'তথা চ ভারবিঃ "অথ জয়ায় নু মেরু মহীভৃত" ইতি। বাভটস্ত্বাহ—"মেরুশব্দস্য বাচ্যো মহীভৃদিতি"' (৭।১১৪) এবং 'বাভটস্তু পঠতি "রঞ্জিতানুবিবিধাস্তরুশৈলা" ইতি' (৭।৩৬৬)। গোয়ীচন্দ্রও সংক্ষিপ্তসারের (৬।৩৩) টীকায় বাভটের মতোল্লেখ করিয়াছেন। উপর্যুক্ত '...অনুন্যাসবাভটৌ' প্রয়োগের দ্বারা বাভটাপেক্ষা অনুন্যাসকাব ইন্দুমিত্রের (খ্রীঃ ১০ম/১১শ শতক) প্রাচীনতা, অন্ততঃ উভয়ের সমকালীনতা সূচিত হয়।[১] তা'ছাড়া উদ্ধৃতিগুলির কাব্য-সংস্রব-ও লক্ষণীয়। কাতন্ত্রের (চ. ২৩২) 'কলাপচন্দ্র'টীকায় সুষেণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক 'নমঃকৃঞ্‌যোগে দ্বিতীয়া'র উদাহরণস্বরূপ 'তথাচোক্তং' বলিয়া উদ্ধৃত 'তত্তস্তেষাং বিবেকার্থং নমস্কৃত্য মুনিত্রয়ম্। দর্শিতং বাভটেনেদং বালানাং বুদ্ধিবর্ধনম্।।' শ্লোকদ্বারা বাভটের বাল্যশিক্ষামূলক ব্যাকরণ-কর্তৃত্ব সুপ্রমাণিত।

---

১ একাধিক ব্যক্তির একত্র উল্লেখ হইতে তাঁহাদের আবির্ভাব-কালের পৌর্বাপর্য-নির্ণয় অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপদ্ নয়, ভ্রান্তির সম্ভাবনাই বেশী। বক্ষ্যমাণস্থলের আগে এই জৌমর বৃত্তিতেই (৩।১৮০) '...বাভটপশুপতিভ্যাং ব্যাখ্যাতম্' কথায় পশুপতির পূর্বে বাভটের উল্লেখ কালানুক্রমিক হইয়া থাকিলে তাঁহার সময়কে আরও বেশ কিছু পিছনে ঠেলিয়া দেওয়া যায়।

শিবস্বামীর ব্যাকরণ

(খ্রীঃ ৯ম শতাব্দী)

বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত উদ্ধৃতি হইতে প্রমাণিত হয়, শিবস্বামী এক ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। কাতন্ত্রধাতুবৃত্তি, ক্ষীরস্বামীর ক্ষীরতরঙ্গিণী (১।১২২, ৫।১০), গণরত্নমহোদধি (১।২, ১।২৫) এবং মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে (১।৬২৭, ৭০৩, ৫।৯, ৮।৭) শিবস্বামীর উল্লেখ আছে। তাঁহার গ্রন্থ ধাতুপাঠ এবং তদ্‌ব্যাখ্যামূলক হওয়াও অসম্ভব নয়। কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিণী'তে (৫।৩৪) তাঁহার উল্লেখ হইতে প্রমাণিত হয়, তিনি কাশ্মীরাধিপতি অবন্তিবর্মার (৮৫৫–৮৩ খ্রীঃ) রাজ্যকালে বর্তমান ছিলেন ঃ

মুক্তাকণঃ শিবস্বামী কবিরানন্দবর্ধনঃ।
প্রথাং রত্নাকরশ্চাগাৎ সাম্রাজ্যেঽবন্তিবর্মণঃ।।

কাজেই তাঁহার জীবৎকাল খ্রীঃ ৯ম শতাব্দী বলিয়া সুনির্দিষ্ট।

তিনি 'অবদানশতকে' বর্ণিত দাক্ষিণাত্যের রাজা কপ্‌ফিণের বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে 'কপ্‌ফিণাভ্যুদয়' নামে এক কাব্য রচনা করেন। খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীতে সর্বানন্দ (অমর) টীকাসর্বস্বে একাধিক স্থলে এই কাব্য হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, কিন্তু শিবস্বামীর নাম করেন নাই ঃ 'মাযাতশ্চ্যুতিমাযাতঃ শোভিতঃ শতশোঽভিতঃ। সব্যাসং ধাম্নি সব্যাসং-মানশেবধিমানশে।। ইতি কপ্‌ফিণাভ্যুদয়ে তালব্যযমকম্‌। অশব্যাপ্তৌ। আনশে প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ' (১।১।৭১) এবং 'তথা চ কপ্‌ফিণাভ্যুদয়ে প্রতিলোমানুলোমযমকং—"সেবাবাশিশিবাবাসে" ইতি। সেবা উপাসনা। উপাসনায়া বাশিন্যঃ শব্দকারিণ্যঃ যাঃ শিবাঃ ফেরবাঃ তাসাং বাসো গৃহংযত্র তত্র যুদ্ধমভূদিত্যর্থঃ' (১।৬।২৫)। আবার গ্রন্থের নামোল্লেখ না করিয়া শিবভদ্রের নামে তিনি যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন—'দিষ্ট্যা রমসে সামনি পরমে বচসাং ত্বম্‌। সুজনো হি বদতি মিত্রং পরমেব চ সান্ত্বম্‌।। ইতি শিবভদ্রে দন্ত্যযমকম্‌' (১।৬।১৮) ইহা যদি কপ্‌ফিণাভ্যুদয় হইতে গৃহীত হইয়া থাকে, এবং সেই সম্ভাবনাই সমধিক, তবে শিবস্বামীর 'শিবভদ্র' এই বৌদ্ধ (?) নামটি পাওয়া যাইতেছে।

গণরত্নমহোদধির ২য় শ্লোকের 'ভোজমুখ্যাঃ'র 'মুখ্য'শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে ঃ 'মুখ্যশব্দস্যাদিবচনত্বাচ্ছিবস্বামিপতঞ্জলিকাত্যায়নপ্রভৃতয়ো লভ্যন্তে।' এই গ্রন্থেরই অন্যত্র (১।২৩) লিখিত আছে ঃ 'অথ পরকালসম্বন্ধাৎ পরঃ শ্রীহর্ষঃ। অপরকালসম্বন্ধাৎ অপরো ভোজদেবঃ। পরঃ পাণিনিঃ। অপরঃ শিবস্বামী।'

হালদারমহাশয় যে ষড়্‌গুরু-শিষ্যের অন্যতম গুরু শিবযোগীকে শিবস্বামী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (ব্যা. দ. ই. পৃঃ ৪৫২) তাহা ঠিক নয়, কারণ যেই ষড়্‌গুরু-শিষ্যের ঋক্‌সর্বানুক্রমণী-বৃত্তি ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় (এই বৃত্তির নাম 'বেদার্থদীপিকা'—যাহার শেষে এই রচনাকালের নির্দেশ আছে) তাঁহার গুরু কখনই খ্রীঃ ৯ম শতাব্দীয় অর্থাৎ ৩০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্তী হইতে পারেন না।

বর্ধমানের ব্যাকরণ

গণরত্নমহোদধি নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা বর্ধমান উপাধ্যায় (মিশ্র) 'সূত্রসারপ্রক্রিয়া' নামে এক স্বতন্ত্র (?) ব্যাকরণ রচনা করিয়া-ছিলেন—যাহা এখন দুষ্প্রাপ্য। ব্যাকরণে 'কাতন্ত্রবিস্তর' তাঁহার অপর গ্রন্থ। গণরত্নমহোদধি (৩।১৯২, ৫।৩৩৪) হইতে জানা যায়, তিনি 'সিদ্ধরাজবর্ণন' নামে এক কাব্য (?)-ও রচনা করেন। এই সিদ্ধরাজই গুজরাটের চৌলুক্যবংশীয় রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহ (১০৯৪–১১৪৩) যাঁহার আশ্রয়ে হেমচন্দ্র সূরি হৈম ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। কাজেই হেমচন্দ্র এবং বর্ধমান কেবল সমকালীনই নহেন, পরস্পর সবিশেষ পরিচিতও, যদিও নিজেদের গ্রন্থাদিতে কেহই অপরের নামমাত্রও উল্লেখ করেন নাই।

খ্রীঃ ১৩শ শতকে বোপদেব তাঁহার কাব্যকামধেনুটীকায় কাতন্ত্র-বিস্তরের নাম করিয়াছেন। সংক্ষিপ্তসারের (৩।৫২৮) টীকায় গোয়ীচন্দ্র কাতন্ত্রে বর্ধমানের ব্যাখ্যার কথা লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া গোয়ীচন্দ্রের টীকায় বারকয়েক বর্ধমানের ব্যাকরণ হইতে সূত্রাদিও উল্লিখিত হইয়াছে ; যেমন, বিশ্রাম শব্দবিষয়ে গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ 'চন্দ্রোঽত্র নিত্যাংবৃদ্ধিমাহ। ভাগবৃত্তিকারস্তু নিত্যং বৃদ্ধ্যভাবম্। বেঃশ্রমের্বেতি বর্ধমানঃ' (১।৬)। এখানে উদ্ধৃত 'বেঃশ্রমের্বা' সূত্রটি বর্ধমানের ব্যাকরণ

ব্যাকরণ হইতে গৃহীত। চন্দ্রগোমীর মতে বিশ্রাম শব্দ শুদ্ধ, ভাগবৃত্তি-
কারের মতে বিশ্রম শুদ্ধ এবং বর্ধমান উভয়মতই গ্রহণ করিয়াছেন
এই সূত্রে। তাঁহার এই সূত্রানুসারে বিশ্রম, বিশ্রাম দুইই শুদ্ধ ;
গোয়ীচন্দ্রের টীকার অন্যত্র 'অবেঃ সঙ্ঘাতে কট ইতি বর্ধমানলক্ষণম্'
(৪।৯৪৭) এবং 'তথা হি মন্দাল্লাভ্যাং মেধায়া ইতি চন্দ্রবর্ধমানসূত্রম্'
(৭।৪৫৯)। মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে (১।৩০৯, ৫৩৫, ৬২৭) বর্ধমানের
উল্লেখ আছে।

গণরত্নমহোদধি—বর্ধমানের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ব্যাকরণের গণবিষয়ক
গ্রন্থসমূহের মধ্যেও ইহা সর্বোত্তম। ১১৪০/৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত।
বর্ধমান স্বয়ং ইহার বৃত্তিরও প্রণেতা। গ্রন্থ সুলভ। জার্মান পণ্ডিত Julius
Eggeling (Professor of Sanskrit and Comparative Philology in
the University of Edinburgh)-এর সম্পাদনায় লণ্ডন হইতে
১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সর্বপ্রথম মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়। পরে
১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগ হইতেও ইহার আর এক সংস্করণ ভীমসেন
শর্ম-কর্তৃক মুদ্রাপিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতসরকারের শিক্ষা-
মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনানুসারে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে Eggeling-
সংস্করণ পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 'গণ' মানে নির্দিষ্ট ব্যাকরণ-
কার্যের অধীন একজাতীয় শব্দসমূহের তালিকা।

ব্যাকরণ-সাহিত্যের বিস্তর ঐতিহাসিক উপাদান এই গ্রন্থে বিদ্যমান।
কেবল ব্যাকরণের ক্ষেত্রেই নয়, অভিধান বা শব্দকোষ-রচনার ক্ষেত্রেও
গণরত্নমহোদধির প্রভাব অপরিসীম। মূল গ্রন্থ শ্লোকবদ্ধ। মোট
শ্লোকসংখ্যা ৪৬০। ৮ অধ্যায়ের ১ম অধ্যায়ের নাম 'নামগণাধ্যায়', ২য়
অধ্যায়ের নাম সমাসগণাধ্যায়, ৩য়-৭ম অধ্যায় পর্যন্ত তদ্ধিতগণাধ্যায়
এবং সর্বশেষ ৮ম অধ্যায়ের নাম আখ্যাত-কৃদ্‌গণাধ্যায়। তদ্ধিতাংশ
অত্যধিক উৎকৃষ্ট। গোবর্ধন এবং গঙ্গাধর এই গ্রন্থের দুই টীকাকার।
'গণরত্নমহোদধ্যবচূরি' নামেও এক টীকা পাওয়া যায়, যাহার রচয়িতা
অজ্ঞাত। ইদানীং বালকৃষ্ণ শাস্ত্রী 'গণরত্ন' নামে এক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
প্রস্তুত করিয়াছেন। গোবর্ধনের রচিত এক 'গণসংগ্রহে'র নাম পাওয়া
যায়। অমরকোষের দশটীকাবিদ্ বন্দ্যঘটী সর্বানন্দ তাঁহার টীকাসর্বস্বে
গোবর্ধন ও তৎকৃত উণাদিবৃত্তির নাম করিয়াছেন। এই গোবর্ধন খুব
সম্ভব কবি জয়দেব-কথিত গোবর্ধন।

গণরত্নমহোদধির প্রথমে নামগণাধ্যায়ের ২য় ও ৩য় শ্লোকদ্বয় উল্লেখ্য ঃ

শালাতুরীয়শকটাঙ্গজচন্দ্রগোমি দিগ্‌বস্ত্রভর্তৃহরিবামন ভোজমুখ্যাঃ। মেধাবিনঃ প্রবরদীপককর্তৃযুক্তাঃ প্রাজ্ঞৈর্নিষেবিতপদদ্বিতয়া জয়ন্তি।। বিদিত্বা শব্দশাস্ত্রাণি প্রয়োগানুপলক্ষ্য চ। স্বশিষ্যপ্রার্থিতাঃ কুর্মো গণরত্নমহোদধিম্।।—১।২-৩।।

১ম শ্লোকটির ব্যাখ্যায় বর্ধমান লিখিয়াছেন ঃ

...শালাতুরীয়স্তত্রভবৎপাণিনিঃ। শকটাঙ্গজঃ শাকটায়নঃ। পূজ্যশ্চন্দ্রশ্চন্দ্র-গোমী।... দিগ্‌বস্ত্রো দেবনন্দী। ভর্তৃহরির্বাক্যপদীয়-প্রকীর্ণয়োঃ কর্তা মহাভাষ্যত্রিপাদ্যা ব্যাখ্যাতা চ। বামনোঽবি-শ্রান্তবিদ্যাধরব্যাকরণকর্তা। ভোজঃ সরস্বতীকণ্ঠাভরণকর্তা। মুখ্যশব্দস্যাদিবচনত্বাচ্ছিবস্বামিপতঞ্জলিকাত্যায়নপ্রভৃতয়ো লভ্যন্তে। দীপককর্তা শ্রীভদ্রেশ্বরসূরিঃ।...প্রাধান্যং চাস্যাধুনিক বৈয়াকরণাপেক্ষয়া।

এই সব কথা ইতিহাসের উপাদান স্বরূপ। ২য় শ্লোকটির 'স্বশিষ্য-প্রার্থিতাঃ'র ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে ঃ 'স্বশিষ্যৈঃ কুমারপাল-হরিপাল-মুনিচন্দ্র প্রভৃতিভিঃ প্রার্থিতাঃ।' ইঁহাদের মধ্যে কুমারপাল, সিদ্ধরাজ জয়সিংহের পরে গুজরাটের রাজা হইয়া হেমচন্দ্রের নিকট জৈন ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করেন। বর্ধমান ছিলেন ইঁহাদের শিক্ষাগুরু। গণরত্নমহোদধির পুষ্পিকায় বর্ধমান নিজেকে 'শ্রীগোবিন্দ সূরিশিষ্য' বলিয়াছেন।

মোট ২২২টি গণ আলোচিত হইয়াছে গণরত্নমহোদধিতে। মাত্র তিনস্থলে দুই দুইটি গণ একত্রে দেখানো হইয়াছে—'চাদিস্বরাদী', 'অহরাদিপত্যাদী' এবং 'কুণ্ডাদিপাত্রাদী'। কোন্ ব্যাকরণের সহিত বিশেষ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত এই গ্রন্থ, অথবা কোন্ গণপাঠের শ্লোকবদ্ধরূপ এই রচনা, তাহা নির্ণয় করা যায় নাই। পাণিনীয় গণপাঠের বহির্ভূত অন্যান্য গণপাঠের, বিশেষতঃ চন্দ্রগোমী, পাল্যকীর্তি (অভিনব শাকটায়ন) এবং হেমচন্দ্র-কর্তৃক নির্ধারিত প্রায় সমস্ত গণই বর্ধমান গ্রহণ করিয়াছেন। বামন- এবং ভোজ-প্রদর্শিত গণসমূহ এবং কাত্যায়ন-বার্ত্তিকস্থ গণাবলীও বাদ পড়ে নাই। অরুণ দত্তের মতানুসারে অর্ধর্চাদি গণের অন্তর্গত শব্দসমূহের এক বিস্তৃত সূচী দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলি পাণিনিসূত্র

এবং কতিপয় বার্ত্তিকের আধারে কয়েকটি নূতন গণও গঠিত হইয়াছে। কোথাও আবার পাণিনীয় একাধিক গণকে বর্ধমান একই গণে পরিণত করিয়াছেন এবং স্থলবিশেষে গণের নামান্তরও ঘটাইয়াছেন। প্রচেষ্টা দেখিয়া মনে হয়, গ্রন্থকার তাঁহার রচনাকে সর্বব্যাকরণ-সাধারণ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনি যথেষ্ট কৃতকার্যও হইয়াছেন সন্দেহ নাই। বৃত্তিভাগের রচনা তথ্যবহুল এবং মূলের গৌরববর্ধক। 'ক্রিয়াগুপ্তক' বর্ধমানের অপর গ্রন্থ।

চাঙ্গু-সূত্র

চাঙ্গুদাস-রচিত কারিকাবদ্ধ ব্যাকরণ। ইহার অপর নাম বা প্রকৃত নাম 'বৈয়াকরণ-জীবাতু'। 'জীবাতুর্জীবনৌষধম্' (অমর ২।৮।১১৯)। চাঙ্গুদাস কায়স্থ, পরে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরিত হইয়া তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন, তাই প্রারম্ভে সুগতবুদ্ধকে নমস্কার করা হইয়াছে ঃ

প্রণম্য পরমাত্মানং সুগতং দ্বৈতখণ্ডিতম্।
বৈয়াকরণ-জীবাতুং চাঙ্গুরেতং করোম্যহম্।।

ইহার টীকায় বলা হইয়াছে ঃ 'চাঙ্গুনামাহং পরমাত্মানং প্রণম্য নমস্কৃত্য এবং বক্ষ্যমাণং বৈয়াকরণানাং জীবাতুং জীবনৌষধং করোমি।' কেহ কেহ চাঙ্গুদাসকে ব্রাহ্মণকুলজাত বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহার দাসাত্মক নাম এই অনুমানের বিরোধী। এক স্থলের পুষ্পিকায় 'কায়স্থচাঙ্গদাস বিরচিতে...' ইত্যাদি উক্তিও দৃষ্ট হয়। 'চাঙ্গসূত্র', 'চাঙ্গব্যাকরণ' ইত্যাকার পাঠও স্থল-বিশেষে দেখা যায়। উৎকলবাসিগণ তাঁহাকে উৎকলদেশীয় বলিয়া দাবী করেন। হালদারমহাশয় তাঁহাকে কালাপক এবং পঞ্জীকৃৎ ত্রিলোচনদাসের (খ্রীঃ ১০ম/১১শ শতক) 'সামসময়িক' বলিয়াছেন (ব্যা. দ. ই. পৃঃ ৩২০)।

'চাঙ্গু-সূত্র' নামে এই গ্রন্থ শিবনন্দন পাণ্ডেয়-বিরচিত 'শিববৃত্তি' সহ রামাশিস্ মিশ্র-কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কারিকাসংখ্যা ১১৭। কোন কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে ৫৬-৬০ কারিকা মাত্র পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে আবার অন্য-কৃত একাধিক কারিকার সন্ধানও মিলে। এই সব দেখিয়া মনে হয়, চাঙ্গুদাস-কৃত মূলগ্রন্থ বহুকাল যাবৎই নিতান্ত

দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। তাই খণ্ডিতাকারে ইহার নানা পুঁথি পাওয়া যায় এবং ভ্রমবশতঃ অপরের রচনাও ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চান্দ্র-সারস্বতাদি ব্যাকরণের ব্যাখ্যাদিগ্রন্থে চাঙ্গু-ব্যাকরণের শ্লোকাবলীর পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃতি দেখিয়া শিবনন্দন ইহাকে অতি প্রাচীন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এই পদ্যময় গ্রন্থ প্রকরণাত্মক। মুদ্রিত গ্রন্থে যথাক্রমে তিঙ্ প্রকরণ, কৃৎপ্রকরণ, কারকপ্রকরণ, সমাসপ্রকরণ, তদ্ধিত প্রকরণ, স্ত্রীপ্রত্যয়প্রকরণ এবং সাধারণপ্রকরণ দেখানো হইয়াছে। কোন কোন পুঁথিতে এই কারিকাগুলি 'চাঙ্গুবৃত্তি' বা 'চাঙ্গুদাসকৃত বৃত্তিকারিকা' বলিয়াও অভিহিত। মনে হয়, চাঙ্গুদাস সম্ভবতঃ কোনো ব্যাকরণের এক দীর্ঘ বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন এবং পরে সেই বৃত্তি হইতে স্বকৃত কতকগুলি কারিকা প্রকরণানুযায়ী একত্র করিয়া 'বৈয়াকরণজীবাতু' নামে প্রচার করেন্। কারিকাগুলির কয়েকটি অতি সরল এবং প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কয়েকটি অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং দুরূহ। নিম্নে কয়েকটি প্রদর্শিত হইল ঃ

দ্বিতীয়া কর্মণি প্রোক্তা তৃতীয়া কর্তৃকারকে।
করণে চ ভবেৎসৈব চতুর্থী সম্প্রদানতঃ।। ৬৯।।
পঞ্চমী স্যাদপাদানে ষষ্ঠী সম্বন্ধকারকে।৭০।।
বিশেষণং সদা পূর্বং বিশেষ্যং পরতঃ স্মৃতম্। ৯৫।।
নিপাতাশ্চোপসর্গাশ্চ ধাতবশ্চেত্যমী ত্রয়ঃ।
অনেকার্থা ভবন্ত্যেতে পাঠস্তেষাং নিদর্শকঃ।। ১১১।।
উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে।
প্রহারাহার-সংহার-বিহার-পরিহারবৎ।। ১১২।।
আগমোঽনুপঘাতেন বিকারশ্চোপমর্দনাৎ।
আদেশস্তু প্রসঙ্গেন লোপঃ সর্বাপকর্ষণাৎ।।* ১১৩।।
বর্ণাগমো গবেন্দ্রাদৌ সিংহে বর্ণবিপর্যয়ঃ।
ষোড়শাদৌ বিকারঃ স্যাদ্ বর্ণনাশঃ পৃষোদরে। ১১৫।।
বর্ণনাশবিকারাভ্যাং ধাতোরতিশয়েন যঃ।
যোগঃ স উচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্ময়ূরভ্রমরাদিষু।। ১১৬।।

* অনুপঘাত = অবিনাশ, যেমন 'ভিনত্তি' ; উপমর্দন = অবয়বের বিনাশ, যেমন 'নির্জর' ; সর্বপকর্ষণ = সর্বনাশ, যেমন 'হন্তি' ; প্রসঙ্গাদেশ—'জরসৌ'।

ক্বচিৎপ্রবৃত্তিঃ ক্বচিদপ্রবৃত্তিঃ ক্বচিদ্ বিভাষা ক্বচিদন্যদেব।
বিধের্বিধানং বহুধা সমীক্ষ্য চতুর্বিধং বাহুলকং বদন্তি।। ১১৭।।
সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এব চ।
অতিদেশোঽধিকারশ্চ ষড়্বিধং সূত্রলক্ষণম্।। ১০৬।।

চাঙ্গুদাস সম্ভবতঃ বৈয়াকরণজীবাতুর এক ব্যাখ্যাও রচনা করেন। 'নির্বাণ' এবং 'সূত্রান্বর্থিনী' নামে ইহার দুই টীকা পাওয়া যায়। রচয়িতাদের নাম জানা যায় নাই। পূর্বোক্ত 'শিববৃত্তি' টীকার রচনা সমাপ্ত হয় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। রচয়িতা শাহাবাদ (আরা) জেলার অন্তর্গত পিপরপাংতী গ্রামের অধিবাসী এবং শ্রীরামদহীন পাণ্ডেয়-র পুত্র।

তিব্বতে প্রাপ্ত 'সম্বন্ধোদ্দেশ' নামে প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সম্বন্ধ-নির্ণয়মূলক এক গ্রন্থে ইহার রচয়িতার নাম পাওয়া যায় কায়স্থ চাকা দাস। চঙ্ক দাস, চঙ্গ দাস, চঙ্গকারিকা প্রভৃতি নামও দেখা যায়। ভিশাখাপট্নম্ হইতে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চঙ্গকারিকার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত সম্বন্ধোদ্দেশও শ্লোকবদ্ধ। 'চঙ্গবৃত্তিবিবরণ' উহার টীকা।

বালকবোধ ব্যাকরণ

শ্রীপাদকৃষ্ণ বেলবল্‌কর ইহাকে 'বালাববোধ' বলিয়াছেন। রচয়িতা নরহরি। তাঁহার শিক্ষাগুরুর নাম নারায়ণ তীর্থ। এই গ্রন্থে শব্দাদিবিষয় এমন ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যে, তাহা পাঁচটি বিখ্যাত কাব্যপাঠের অনুকূল। অতি সংক্ষেপে শব্দরূপ ও প্রয়োগ-সিদ্ধ্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। নরহরি নিজেই তাঁহার রচনার উপযোগিতা-বিষয়ে যে উচ্চ প্রশংসা ও গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন তাহা অতিশয়োক্তির পর্যায়ে পড়ে। এই সমস্ত এবং তৎসহ গ্রন্থের বিষয়ভিত্তিক উদাহৃত শব্দসংখ্যা পর্যন্ত তিনি গ্রন্থারম্ভে বলিয়া দিয়াছেন ঃ

শ্রীনারায়ণতীর্থেভ্যো বিদিত্বা পাণিনের্মতম্।
সদ্যো বিভক্তিজ্ঞানায় শব্দমার্গঃ প্রদর্শিতঃ।।
নরহরিবিহিতং বালকবোধং কৃতসঙ্কেতং পঠতি নরো যঃ।
দশভির্দিবসৈর্বৈয়াকরণো ভবতি ন কোঽপি সংশয়লেশঃ।।
পঞ্চকাব্যক্রমেণোক্তাঃ শব্দস্ত্রীপ্রত্যয়াব্যয়াঃ।
সমাসকারককৃতস্তদ্ধিতা ধাতবস্তথা।।

সংক্ষিপ্তং সুগমার্থঞ্চ সদ্যঃ প্রত্যয়কারকম্।
বালবোধসমং শাস্ত্রং ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।।
তত্র শব্দাশ্চতুঃষষ্টিঃ স্ত্রীপ্রত্যয়চতুষ্টয়ম্।
চতুঃ সপ্তত্যুত্তরন্তু শতমেকমিহাব্যয়াঃ।।
ষট্সমাসাঃ কারকাণি পঞ্চত্রিংশৎকৃদন্তকাঃ।
বিংশতিস্তদ্ধিতাঃ প্রোক্তা ধাতবস্তু চতুঃশতম্।।

হালদার মহাশয় নরহরিকে সন্ন্যাসী বলিয়াছেন এবং খ্রীঃ ১৭শ/১৮শ শতাব্দীয় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার মতে বেদান্তে 'বোধসার' গ্রন্থ এই নরহরির রচনা। দাক্ষিণাত্যের লোক হইয়াও তিনি কাশীতেই অবস্থান করিতেন। 'শব্দকৌস্তুভ-ভূষণ'-প্রণেতা ভাস্কর রায় দীক্ষিত ছিলেন তাঁহার অন্যতম শিষ্য।

শব্দরত্নাকর ব্যাকরণ

আনুমানিক খ্রীঃ ১৬শ শতকে নবদ্বীপবাসী কাশীশ্বর ভট্টাচার্য এই ব্যাকরণ রচনা করেন। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের আদর্শে ইহার বিষয়বিন্যাস করা হইলেও সংজ্ঞা-ব্যবহারে ইহা কলাপের অনুসারী। প্রারম্ভে ঃ 'সিদ্ধোবর্ণসমাম্নায়ঃ'। 'পূর্বাচার্যসিদ্ধ এব বর্ণানাং পাঠক্রমো বেদিতব্যঃ।'

শীঘ্রবোধ ব্যাকরণ

এই নামে একাধিক ব্যাকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। ভরতমল্লিক-রচিত 'দ্রুতবোধ' ব্যাকরণের কথা মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ-প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থের নামান্তর 'প্রসিদ্ধপদবোধ'। আনন্দীর শীঘ্রবোধের কথা বলা হইয়াছে সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণপ্রসঙ্গে। শিবপ্রসাদ-রচিত আর এক শীঘ্রবোধ ব্যাকরণের কথাও শুনা যায়। ইহা পাণিনি-প্রভাবিত প্রাথমিক ব্যাকরণ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ইহাতে মুগ্ধবোধ ও কাতন্ত্র এই দুই-এরই সাহায্য নেওয়া হইয়াছে। ১৮৭৭ সংবৎ অর্থাৎ ১৮২০/২১ খ্রীষ্টাব্দ ইহার রচনাকাল।

রঘুনাথসোপান ব্যাকরণ

ইহার রচয়িতার নাম রঘুনাথ কবিকণ্ঠরব। জনৈক চিৎপাবন ব্রাহ্মণপণ্ডিত তিনি। পিতার নাম সরস, পিতামহ কেশব। ভট্টোজি দীক্ষিত, রামাশ্রম এবং বরদরাজ কর্তৃক অনুসৃত পন্থায় মুঘলসম্রাট্

ঔরঙ্গজিবের রাজ্যকালে এই ব্যাকরণ রচিত হয়। ইহার সঙ্গে রঘুনাথ 'মুহূর্তমালা', 'রঘুনাথচম্পূ', 'গঙ্গাস্তুতি' এবং 'মধ্যমবর্তিটীকা' রচনা করিয়া 'পথ্যোপচার' পূর্ণ করেন। গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন ঃ

সুবোধার্থং প্রমাদাদ্ বা যদসাধুভবেদিহ।
পরিসৃজ্যানু গৃহ্নন্তু জলে শৈবালবদ্ বুধাঃ।।
মুহূর্তমালা রঘুনাথচম্পূর্গঙ্গাস্তুতির্মধ্যমবর্তিটীকা।
সোপানমেতৈর্গ্রথনৈর্মদীয়ৈঃ পথ্যোপচারা হরিভক্তিরস্তু।।
ভট্টোজিদীক্ষিতরামাশ্রমবরদরাজগুরুচরণাঃ।
জগতি জয়ন্তি ত্রিমুনি-ব্যাকরণস্য প্রবর্তকাচার্যাঃ।।

এই সমস্ত গ্রন্থই কাশীতে রচিত। দ্বিতীয় শ্লোকটির দ্বিতীয় পঙ্ক্তি কবিত্বগুণে চিত্তগ্রাহিণী।

ব্যাকরণপ্রবেশক

১৬টি প্রবেশক বা অধ্যায়ে বিন্যস্ত পদ্যাত্মক এই ব্যাকরণের রচয়িতা অচ্যুত পিষারোটি। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে প্রবেশার্থীর পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যাকরণশিক্ষার উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ রচিত। সার্থকনামা এই গ্রন্থের প্রারম্ভে তাই বলা হইয়াছে ঃ 'মহাশাস্ত্রপ্রবেশার্থংমার্গং বক্ষ্যে প্রবেশকম্।।'

অচ্যুত পিষারোটি কেরলের বিখ্যাত কবি। কেরলের Tirukkantiyur নামক স্থানে তিনি বাস করিতেন। 'প্রক্রিয়াসর্বস্ব'কৃৎ নারায়ণ ভট্ট ছিলেন তাঁহার ছাত্র। খ্রীঃ ১৬শ শতকের শেষার্ধে এই ব্যাকরণের রচনাকাল ধরা হয়। অনন্তনারায়ণ শাস্ত্রী ইহার এক টীকা রচনা করিয়া তৎসহ এই ব্যাকরণপুস্তকের সম্পাদনাপূর্বক ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রবোধচন্দ্রিকা ব্যাকরণ

এই ব্যাকরণের প্রকৃত রচয়িতা কে? এই প্রশ্নের অবকাশ থাকিলেও তাহার সদুত্তর পাইবার সম্ভাবনা এখন আর নাই। চৌহানবংশীয় বীরসেনের পুত্র বৈজলদেব বা বিজ্জল-ভূপতির নামে এই ব্যাকরণ প্রচারিত থাকিলেও তিনি ইহার রচয়িতা নহেন। খ্রীঃ ১৮শ শতকের শেষ দিকে মুঘল আমলের পাটনার পুরুষানুক্রমিক জায়গীরদার ('পাটনাধিনাথ') ছিলেন তিনি। সেখানে চারিপরগণা-বিশিষ্ট এক জায়গীর

তিনি ভোগ করিতেন। গ্রন্থের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে জমিদার-সুলভ নানা প্রশস্তির ছড়াছড়ি। একস্থলে তাঁহাকে বিক্রমার্কের পুত্রও বলা হইয়াছে। কোন কোন পুঁথিতে রচয়িতাহিসাবে 'বিশ্বশর্মা' নামক পণ্ডিতের উল্লেখও দেখা যায়। খুব সম্ভব তিনিই এই ব্যাকরণ রচনা করিয়া কোনও কারণে 'নয়তন্ত্রবেত্তা চৌহানবংশতিলক পরমাধিনাথ রাজা বৈজলদেবে'র নামে ইহার প্রচারের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজপুত্র হীরাধরের ব্যাকরণ-শিক্ষার জন্য ১৮০৫ (?) খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাকরণ রচিত হয়।

সমগ্র গ্রন্থ শ্লোকবদ্ধ। মোট ৪৩২টি শ্লোক। অধ্যায়সংখ্যা ৮ ঃ স্বাদি, ত্যাদি, কারক, অনুক্ত, সমাস, তদ্ধিত, কৃৎ ও সন্ধি। গ্রন্থকার রামভক্ত, তাই অনেকস্থলে শ্রীরামায়ণের আখ্যায়িকামূলক অনেক উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। পদ্যগুলি খুবই সরল, যেমন ঃ

প্রথমা যত্র কর্তা স্যাদ্ দ্বিতীয়া তত্র কর্মণি।
তৃতীয়া যত্র কর্তা স্যাৎ প্রথমা তত্র কর্মণি।।

গোপাল গিরি এই ব্যাকরণের 'সুবোধিনী' নামে টীকা রচনা করেন। হীরাধরের পুত্র মোহনলাল আবার 'বালবোধ' নামে এক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

পারিজাত ব্যাকরণ

রামহরিরচিত এই ব্যাকরণ শ্লোকবদ্ধ ; শ্লোকসংখ্যা ১৫৬০। প্রথম শিক্ষার্থিগণের পক্ষে এই ব্যাকরণ অতীব মনোরম। 'আকাশানল-ভূধরেন্দুবিমিতে শাকে...' অর্থাৎ ১৭৩০ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৮০৮/৯) ইহা রচিত হয়। রচনায় সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের প্রভাব সর্বাধিক। সংজ্ঞাসংখ্যা অল্প, কোন প্রত্যাহার নাই।

প্রবোধপ্রকাশ ব্যাকরণ

পুরুষোত্তমের পুত্র বলরাম পঞ্চানন শৈবদের জন্য এই ব্যাকরণ রচনা করেন। হরিনামামৃতব্যাকরণে ব্যবহৃত বিষ্ণুবিষয়ক সংজ্ঞাসমূহের ন্যায় এই ব্যাকরণে কেবল শিবনামাত্মক সংজ্ঞা ব্যবহার করা হইয়াছে ; যেমন স্বরবর্ণ = শিব, ব্যঞ্জন = হর, অঘোষ = রুদ্র, ঘোষবৎ = ভগ প্রভৃতি। গ্রন্থ পদ্যাত্মক। প্রারম্ভে ঃ

অকারাদিক্ষকারান্তাঃ পঞ্চাশদ্‌বর্ণসংজ্ঞকাঃ।
তেষাং পাঠক্রমং সিদ্ধং জানীয়াদন্যথা ন তু ।।

প্রবোধপ্রকাশের সন্ধিপ্রকরণ তিন পাদে বিভক্ত ঃ(১) শক্তিসন্ধিপাদ, (২) শিবসন্ধিপাদ এবং (৩) বিসর্গসন্ধিপাদ। বলরামের অপর গ্রন্থ 'ধাতুপ্রকাশ', প্রবোধপ্রকাশের পরিপূরক।

বাক্যপ্রকাশ ব্যাকরণ

মাত্র ১২৫টি শ্লোকে উদয়ধর্ম এই ব্যাকরণ রচনা করেন। তিনি তপাগচ্ছীয় রত্নসিংহ সূরির শিষ্য। ১৫০৭ সংবতে (১৪৫০/৫১ খ্রীঃ) সিদ্ধপুর নগরে এই ব্যাকরণ রচিত হয়। প্রারম্ভে গ্রন্থকার শ্রীদেববর্ধনকে তদীয় বিদ্যাগুরু বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন। তপাগচ্ছীয় হেমবিমলসূরির ছাত্র হর্ষকুল ইহার এক টীকা রচনা করেন। তিনি খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীয়। একস্থলে ইহার টীকাকাররূপে জিনবিজয়ের নাম পাওয়া যায়।

শব্দশোভা ব্যাকরণ

নীলকণ্ঠ-রচিত এই প্রাথমিক ব্যাকরণ ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রণীত হয়। তাঁহার পিতা জনার্দন শুক্ল এবং গুরু বিখ্যাত বৈয়াকরণ ভট্টোজি-দীক্ষিত। শব্দশোভা আসলে বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকাবিশেষ। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ কিরূপ হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা এই গ্রন্থপাঠে জন্মায়। 'তত্ত্বার্থদীপিকা' ইহার টীকা।

শব্দভূষণ ব্যাকরণ

শ্লোকাত্মক প্রাথমিক ব্যাকরণ, দানবিজয় উপাধ্যায়-রচিত। বিজয়রাজ সূরির ছাত্র তিনি। গুজরাটের শাসনকর্তা শেখ ফতে মিঞার পুত্র বড়ে মিঞাকে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা দিবার জন্য এই ব্যাকরণ রচিত হয়। ইঁহারা সম্ভবতঃ দানবিজয়ের পোষকতা করিতেন।

বোধপদ্ধতি ব্যাকরণ

ধরণীধর ইহার রচয়িতা। ১৭৮৬ সংবতে (১৭২৯/৩০ খ্রীঃ) এই প্রাথমিক শিক্ষোপযোগী ব্যাকরণ প্রণীত হয়। ধরণীধরের পিতার নাম জ্বালানন্দ। দ্রুত শব্দশাস্ত্রে প্রবেশের পথ সুগম করাই এই গ্রন্থরচনার প্রধান উদ্দেশ্য ঃ 'মার্গং স্যাৎ সা শব্দশাস্ত্রে প্রবেষ্টৃণাংযথাদ্রুতম্।' [সা = বোধপদ্ধতিঃ]

বাক্যগোবিন্দ ব্যাকরণ

কাবজা পল্লীবাসী বৈদ্যবংশীয় রামেশ্বর সেন এই ব্যাকরণ রচনা করেন। তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন। বাক্যসমূহের বিশ্লেষণমূলক এই গ্রন্থ ১২১০ বঙ্গাব্দে (খ্রীঃ ১৮০৩/৪) রচিত হয়।

প্রক্রিয়াভূষণ

শ্রীনিবাসদাস-রচিত প্রাথমিক ব্যাকরণ। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ দক্ষিণ-ভারতীয়। তিনি নিজেকে রামানুজাচার্য এবং বেঙ্কটাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াছেন।

প্রক্রিয়াপ্রদীপ

প্রদ্যুম্ন বিদ্যাভূষণ-রচিত প্রাথমিক ব্যাকরণ। গ্রন্থারম্ভে ঃ

জাড্যান্ধকারশমনো বিবিধপদার্থাবধারণে হেতুঃ।
বিদ্যাভূষণকৃতিনা বিধীয়তে প্রক্রিয়াপ্রদীপঃ।।
পদসাধনপরিপাটী যৌগ্যেঃ সুকুমার-বুদ্ধি-প্রতিপত্ত্যৈ।
পরিশোধিতরসবত্যাঃ সূত্রৈঃ ক্রিয়তেঽনুগৃহ্যতাং সদ্ভিঃ।।

সর্বশেষ পঙ্‌ক্তিতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সহিত ইহার সম্বন্ধ সূচিত।

সামান্যপ্রক্রিয়া

বসুগ্রহরাজ-কৃত সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ। পাণিনিমতানুবর্তী এই ব্যাকরণেরই নামান্তর 'বসুপ্রক্রিয়া' বা 'বসুসূত্র'। গ্রন্থকার গঞ্জাম জেলার ধারাকোশের অধিবাসী।

পদচন্দ্রিকা

শ্লোকাত্মক ব্যাকরণ। শেষ নৃসিংহের পুত্র শেষকৃষ্ণ ইহার প্রণেতা। তাঁহার পোষ্টা ছিলেন রাজা নরোত্তম (খ্রীঃ ১৬শ শতক)। এই শেষকৃষ্ণই বীরবলের পুত্র কল্যাণের শিক্ষার জন্য 'প্রক্রিয়াকৌমুদী'র 'প্রক্রিয়াপ্রকাশ' টীকা রচনা করেন। পদচন্দ্রিকার বৃত্তিও শেষকৃষ্ণ-রচিত। তাঁহারই ছাত্র বিখ্যাত বৈয়াকরণ ভট্টোজি দীক্ষিত।

গীর্বাণপদমঞ্জরী

ভট্টোজি দীক্ষিতের ছাত্র বরদরাজ ভট্ট ইহার প্রণেতা (খ্রীঃ ১৭শ শতক)। প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে নিত্যনৈমিত্তিক বহু বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ; তন্মধ্যে ব্যাকরণের আলোচনাও আছে। এই

জাতীয় আর এক গ্রন্থ কাশীনাথ-রচিত 'প্রদীপ'। ইনি সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল গ্রামের অধিবাসী। বরদরাজের সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

শুদ্ধাশুবোধ ব্যাকরণ

রামেশ্বর শর্মার রচনা ; প্রাথমিক ব্যাকরণ। ইহার ব্যাখ্যাও তৎপ্রণীত। 'শাকে ভূমিরসপক্ষাগ্নৌ ষষ্ঠ্যাং...গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ' উক্তি হইতে ১৬২৩ শকাব্দ পাওয়া যায়, যদিও তাহাতে 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' রক্ষিত হইতেছে না। খ্রীঃ ১৮শ শতকের প্রারম্ভেই এই গ্রন্থের রচনা বলা চলে। 'শব্দমালা' নামে সংস্কৃত শব্দকোষ এবং 'শিবকীর্তন' নামে এক বাংলা কাব্যও তিনি রচনা করেন। 'শব্দবোধ' নামে আর এক ব্যাকরণের কর্তৃত্বও রামেশ্বরে আরোপিত হইয়া থাকে। ইহা শুদ্ধাশুবোধেরই নামান্তর কিনা অথবা বিভিন্ন হইলেও উভয়েরই একই প্রণেতা কিনা অনুসন্ধেয়।

আশুবোধ ব্যাকরণ ঃ(১) রামকিঙ্কর সরস্বতী-প্রণীত গদ্য-পদ্যাত্মক প্রাথমিক ব্যাকরণ। মুগ্ধবোধের আদর্শে রচিত হইলেও ইহাতে অভিনব সংজ্ঞাসমূহের ব্যবহার দেখা যায়, যেমন 'সিদ্ধা আদ্যাঃ', 'চতুর্দশাদৌ চাঃ', 'কাদ্যা ব্যাঃ', 'পঞ্চশঃ পঞ্চবাঃ', 'শষসবাদ্যদ্বিতীয়াঃ ফাঃ'—এই সবই এই ব্যাকরণের এক একটি সূত্র এবং ইহাদের বৃত্তিতে রামকিঙ্কর লিখিয়াছেন—'অকারাদ্যাবর্ণাঃ প্রসিদ্ধাজ্জ্ঞেয়াঃ', 'আদৌ চতুর্দশ যে বর্ণাস্তে "চ" সংজ্ঞাঃ স্যুঃ', 'শষসা বানামাদ্যা দ্বিতীয়াশ্চ "ফ" সংজ্ঞাঃ স্যুঃ'—অর্থাৎ স্বর, ব্যঞ্জন, বর্গ ও অঘোষের জন্য যথাক্রমে চ, ব্য, ব এবং ফ সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে ; হ্রস্ব ও দীর্ঘ সংজ্ঞার জন্য নূতন সংজ্ঞা করা হইয়াছে লু এবং রু। এইরূপে ব্যাকরণের সমস্ত পূর্বাচার্যপ্রসিদ্ধ সংজ্ঞাগুলিকে রামকিঙ্কর নূতন আক্ষরিক সংজ্ঞায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। (২) মুগ্ধবোধের টীকাকার দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশও 'আশুবোধ' নামে আর এক ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার রচনাকাল ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ। বলা বাহুল্য এই ব্যাকরণ মুগ্ধবোধের দ্বারা প্রভাবিত। ইহার বৃত্তিকারও দুর্গাদাস। দামোদর এবং কাশীনাথ ভট্টাচার্যের নামেও 'আশুবোধ ব্যাকরণে'র কর্তৃত্ব আরোপিত হইতে দেখা যায়। (৩) গত শতাব্দীতে 'আশুবোধ' নামে ব্যাকরণ রচনা করেন

তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮১২-৮৫)। এই রচনার প্রধান অবলম্বন পাণিনির ব্যাকরণ হইলেও, বার্ত্তিক-ভাষ্যাদির অনুসরণে তারানাথ অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রসমূহের নানাভাবে অদল-বদল করিয়াছেন ; কোথাও একাধিক পাণিনিসূত্রকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন, কোথাও বা প্রয়োজন-বোধে নূতন সূত্রও প্রণয়ন করিয়াছেন। পাণিনির প্রত্যাহারাদি সংজ্ঞা গৃহীত হইয়াছে, বাদ পড়িয়াছে বৈদিকাংশ। অল্পায়াসে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়াই এই ব্যাকরণ রচনার মূল উদ্দেশ্য। গ্রন্থারম্ভে কথিত হইয়াছে ঃ

প্রণম্য জগদীশানং ক্রিয়তে শব্দশাসনম্।
আশুবোধাভিধং যত্নাৎ শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা।।
পাণিন্যাদীন্ মুনীন্ নত্বা তদ্গ্রন্থাদ্যনুসারতঃ।
ভূরিপ্রযুক্তশব্দানাং সাধনায়ায়মুদ্যমঃ।।
গ্রন্থাঃ সন্ত্যত্র ভূয়াংসঃ কঠিনা বিপুলাশ্চ তে।
অল্পায়াসেন ভাষায়াঃ শিক্ষণায় মমাগ্রহঃ।।
প্রক্রিয়াকৌমুদীং বীক্ষ্য সিদ্ধান্তকৌমুদীন্তথা।
বালানাং সুখবোধায় প্রক্রিয়েয়ং বিরচ্যতে।।
প্রায়েণ পাণিনেঃ সূত্রং ক্বচিচ্চ পরিবর্তিতম্।
সুবোধং স্বকৃতং ক্বাপি ব্যাখ্যায়োদাহরিষ্যতে।।

বিজ্ঞপ্তিতে গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার রচনাশৈলীর যে বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে পাণিনিতন্ত্রে জ্ঞানলাভের আবশ্যকতার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে ঃ

> পাণিনীয়াগমস্যৈব সর্বপ্রস্থানেষু শ্রেষ্ঠতয়া প্রামাণিকৈর্মল্লিনাথ-জয়মঙ্গলপ্রভৃতিভিঃ কাব্যাদিব্যাখ্যাতৃভিঃ পাণিনিসূত্রাণামেব প্রমাণত্বেনোপন্যস্ততয়া ব্যুৎপিৎসূনাং তৎপরিজ্ঞানস্যাত্যাবশ্যকত্বেন তৎপরিজ্ঞানার্থমেব প্রায়েণাত্র গ্রন্থে পাণিনীয়ানি সূত্রাণি সমাহৃতানি সমাদৃতাশ্চ প্রায়স্তদীয়প্রত্যয়াদিসংজ্ঞাঃ। তত্তৎ সূত্রস্থ বার্ত্তিক-ভাষ্যেষ্ট্যাদ্যনুসারীণ্যপি কানিচিৎ সূত্রাণি সঙ্কলিতানি সূত্রান্ত-রাদপকর্ষণীয়ানি, অনুবর্তনীয়ানি, অনুষঞ্জনীয়ানি চ পদানি তত্তৎ সূত্রেষু সন্নিবেশিতানি, ক্বচিৎ সূত্রস্থানি দুরববোধানি পদানি সুখাববোধৈঃ পর্যায়শব্দৈঃ পরিবর্তিতানি, ক্বচিচ্চ দ্বিত্রীণ্যপি সূত্রাণি একত্র নিবদ্ধানি। এবং সূত্রাণি সঙ্কলয্য সংস্কৃত্য কানিচিচ্চ সূত্রাণি

স্বয়ং বিরচয্য বৃত্ত্যা ব্যাখ্যায় চ উদাহরণেন সমলঙ্কৃতানি। ...ছাত্রাণামভ্যাসসৌকর্যায় অনিঙ্ধাতূনাং, ধাত্বাদেশস্য, শব্দাদেশস্য, পরস্মৈপদাত্মনেপদব্যবস্থায়াঃ, ধাতুভেদেন ঘজাদিব্যবস্থায়াশ্চ বোধিকাঃ কারিকা রচিতাঃ, ন তত্র সূত্রাণ্যুদ্ধৃতানি...।

আশুবোধের সূত্রসংখ্যা মোট ১৬০৫। বিষয়বিন্যাসক্রম—সংজ্ঞা, পরিভাষা, সন্ধি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, স্ত্রীপ্রত্যয়, কারক, সমাস ও তদ্ধিত। ১৮৬৮ খ্রীঃ প্রকাশিত।

তারানাথ বিখ্যাত পণ্ডিত বংশের সন্তান। যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমায় শানহাটী গ্রামে তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বাস করিতেন। তাঁহার প্রপিতামহ মুকুন্দরাম তর্কবাগীশ ঐ গ্রামেই দেহত্যাগ করেন। তৎপুত্র রামরাম ভট্টাচার্য পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয়পূর্বক কাশীতে গিয়া শিক্ষালাভান্তে বিদ্যাধর এবং তর্কসিদ্ধান্ত উপাধি লাভ করেন এবং ক্রমে বর্ধমানের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি কালনার নিকটবর্তী কোনও গ্রামে বিবাহ করিয়া তৎসংলগ্নপল্লী অম্বিকাতে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার দ্বিতীয়পক্ষের কনিষ্ঠ পুত্র কালিদাসই তারানাথের পিতা। তিনি পাঠান্তে সার্বভৌম উপাধি লাভ করিয়া কালনায় টোলস্থাপনপূর্বক অধ্যাপনা করিতেন। তারানাথ প্রথমে এই টোলে এবং পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভের পর সেখান হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তর্কবাচস্পতি উপাধি লাভ করিয়া কাশীধামে গিয়া হনুমান্‌ঘাটের বিশ্বরূপ স্বামীর নিকট ৪ বৎসর বেদান্ত ও পাণিনিব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের (তখন তিনি ছাত্র) সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং সেই সূত্রে বিদ্যাসাগরের বিশেষ চেষ্টায় তিনি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন এবং ৩১।১২।১৮৭৩ তারিখে সেই কার্য হইতে অবসর নেন। ২৩।৬।১৮৮৫ তারিখে কাশীধামে তাঁহার দেহাবসান ঘটে। নিজব্যয়ে দ্বিশতাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রকাশক জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (১৮৪৪-১৯১০) তাঁহার সুযোগ্য পুত্র। তাঁহার প্রথম পুত্রের নাম আশুবোধ। তারানাথের কর্মজীবনের একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য—তিনি কেবল সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চাতেই নিযুক্ত না থাকিয়া বস্ত্র, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতির লাভজনক ব্যবসায়কর্মও করিয়া গিয়াছেন। এই সব বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ

করিয়া তাঁহার একাধিক জীবনীগ্রন্থ রচিত হইয়াছে ঃ 'তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী এবং সংস্কৃতবিদ্যার উন্নতি' (১৮৯৩)—তারাধন তর্কভূষণ-রচিত, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত 'তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত' (কলিকাতা, ১৩০০ বঙ্গাব্দ); অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য-প্রণীত 'তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী' এবং সংস্কৃত ভাষায় রামকৃষ্ণস্বামি-রচিত 'পণ্ডিতকুলতিলকস্য তারানাথ তর্কবাচস্পতেজীর্বনচরিতম্' (কলিকাতা, ১৮৯৪)।

তারানাথ-রচিত অন্যান্য গ্রন্থ ঃ ধাতুরূপাদর্শ (১৮৬৯), বাক্যমঞ্জরী (১৮৫১), শব্দার্থরত্ন (১৮৫১), বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদীর 'সরলা' টীকা (১৮৬৩), লিঙ্গানুশাসন (১৮৬৩), শব্দস্তোমমহানিধি—৫ খণ্ডে (১৮৬৯-৭০) এবং 'বাচস্পত্য' (১৮৭৩-৮৪)। ইহা ছাড়া তিনি মুদ্রারাক্ষস, বেণীসংহার, কাদম্বরী, রত্নাবলী, মালবিকাগ্নিমিত্র এবং মহাবীরচরিত-এর টীকাও রচনা করেন। সংস্কৃত শব্দাভিধান 'বাচস্পত্য'ই তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ; দীর্ঘ ১২ বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে ২২ খণ্ডে ইহা প্রথমে প্রকাশিত হয়। 'শব্দস্তোমমহানিধি'ও সংস্কৃত-শব্দকোষ। বাক্যমঞ্জরী—বাংলা ভাষায় রচিত ক্ষুদ্র পুস্তক ; সংস্কৃত শব্দযোজনা-রীতি (syntax) শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে রচিত। শব্দার্থরত্ন—ব্যাকরণ-দর্শনাত্মক গ্রন্থ ; নাগেশভট্টের 'শব্দেন্দুশেখর', ভট্টোজির 'শব্দকৌস্তুভ' এবং কোণ্ডভট্ট-বিরচিত 'বৈয়াকরণভূষণসার' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রভাবাধীন ইহার রচনা। তৎপুত্র জীবানন্দও 'শব্দরূপাদর্শ' নামে ব্যাকরণের এক গ্রন্থ রচনা করেন।

এইসব ব্যাকরণের প্রায় সবগুলিই পুঁথির আকারে 'গ্রন্থমাত্রে ব্যবস্থিত' হইয়া কোনও প্রাচীন গ্রন্থাগারে বা সংগ্রহশালায় ক্রমাবলুপ্তির অপেক্ষায় দিন গণিতেছে। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে এবং সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে যে কয়েকটির একদা মুদ্রিতাকারে প্রকাশন সম্ভব হইয়াছিল তাহাদেরও পুনর্মুদ্রণের সম্ভাবনা আর নাই বলিলেই চলে। পরিণামে সকলেরই প্রায় সমগতি, অর্থাৎ নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়া পরিশেষে চির-অবলুপ্তি। এই সর্বশেষ অবস্থায় পৌঁছিতে বাকী(?) আছে এইরূপ কয়েকটি ব্যাকরণের নাম বিভিন্ন সূত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া নিম্নে লিখিত হইল ঃ দিব্যব্যাকরণ, সারামৃতব্যাকরণ, উল্কাব্যাকরণ, পদাবলী ব্যাকরণ, বিশ্বব্যাকরণ, ভাষানুশাসন, শব্দতর্কব্যাকরণ, বালভাষা-

ব্যাকরণ, রুদ্র ব্যাকরণ, বৈষ্ণব ব্যাকরণ, সৌম্যব্যাকরণ, বরুণ ব্যাকরণ, বায়ুব্যাকরণ, ব্রহ্মব্যাকরণ, যমব্যাকরণ, ভট্ট অকলঙ্ক-রচিত অকলঙ্ক ব্যাকরণ, বৌদ্ধব্যাকরণ অষ্টধাতু, জৈন মলয়গিরির শব্দানুশাসন 'মুষ্টিসূত্র', সুভাষকীর্তি-প্রণীত সর্বভাষাপ্রবর্তনব্যাকরণ, সাধুকীর্তি-বিরচিত 'মঞ্জুশ্রীশব্দলক্ষণ' নামক ব্যাকরণ, পরমানন্দসেনের চৈতন্যামৃতব্যাকরণ, গোবিন্দনাথের গোবিন্দব্যাকরণ, কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাসাগরের কৃষ্ণলীলামৃত ব্যাকরণ, ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে যুধিষ্ঠির-পুত্র কৃষ্ণ-কর্তৃক রচিত লঘুবোধ-ব্যাকরণ, লক্ষ্মীনরসিংহ-প্রণীত বিলাসব্যাকরণ, লক্ষ্মীদত্তাচার্য-প্রণীত সংগ্রহব্যাকরণ, সুমন্ত-কৃত সুমন্তব্যাকরণ, পুণ্যনাথের পুত্র রুদ্রসূরি-রচিত শব্দচিন্তামণি, বরাহপণ্ডিতের প্রয়োগসংগ্রহবিবেক, রামচন্দ্র মিশ্র-রচিত বিদগ্ধবোধব্যাকরণ, কৃষ্ণভট্ট মৌনীর বৃত্তিদীপিকা (?), পদ্মসুন্দরের সুন্দরপ্রকাশ, আমেদপুরনিবাসী হর্ষজিৎ-প্রণীত শব্দসাধন ব্যাকরণ, রাঘবেন্দ্রাচার্যের রাঘবেন্দ্রীয় ব্যাকরণ, শ্রীপণ্ডিত-রচিত বালবোধব্যাকরণ, রত্নেশ্বরের রত্নাবলীব্যাকরণ, পদ্যব্যাকরণ, দেবসাগরের ব্যাকরণ, ভানুদত্তের ব্যাকরণ, অমরসিংহ-কৃত অমরব্যাকরণ, অত্রির ব্যাকরণ, অনন্তভট্ট-কৃত শব্দসুধাব্যাকরণ, অপ্পাসূরি-কৃত শব্দরত্নাবলী, অনন্ত গোপালকৃষ্ণ শর্মার বেদশব্দবিভূষণ, প্রশ্নব্যাকরণ, অমরচন্দ্রের পরিমল-ব্যাকরণ, আর্যবজ্র স্বামীর জৈন ব্যাকরণ (খ্রীঃ পূঃ ৩১ অব্দ), আত্রেয়-কৃত ব্যাকরণ, বিশ্বেশ্বর-রচিত ১৮ অধ্যায়ে বিভক্ত শব্দার্ণব-সুধানিধি, ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি, ভট্টবিনায়কের ভাবসিংহ-প্রক্রিয়া, মদন পঞ্চানন-প্রণীত প্রক্রিয়ার্ণব, কাশীশ্বরশর্মার জ্ঞানামৃতব্যাকরণ, বিনয়সাগর উপাধ্যায়-রচিত ভোজব্যাকরণ, কেশবপণ্ডিতের কৈশবিব্যাকরণ, ইন্দ্রমিশ্রের ব্যাকরণ, ঈশ্বরানন্দের শাব্দবোধতরঙ্গিণী, উৎপল-রচিত উৎপলব্যাকরণ, কাশ্যপকৃত কাশ্যপিব্যাকরণ, কবিচন্দ্র-রচিত সারসত্বরীব্যাকরণ, শ্রীকান্ত মিশ্র-রচিত চন্দ্রিকা (ব্যাকরণ-চন্দ্রিকা?) নামক প্রাথমিক ব্যাকরণ, সমাশ্রম শ্রীকান্ত আচার্য-কৃত চন্দ্রিকাব্যাকরণ, পূর্ণাচার্য-কৃত দর্পণ ব্যাকরণ, প্রয়োগমুখব্যাকরণ, মহেশ-কৃত প্রয়োগ-চিন্তামণি, পৌরস্ত্যের ব্যাকরণ, বেঙ্কটসুব্বা শাস্ত্রীর 'ভাষামঞ্জরী' ব্যাকরণ, বিনীতকীর্তির ব্যাকরণ, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর (শব্দ) রত্নমহোদধি বা রত্নাকরব্যাকরণ, বলদেব বিদ্যাভূষণের ব্যাকরণকৌমুদী, দামোদর-কৃত বালবোধব্যাকরণ (বাল-ব্যাকরণ?), বারাণসীবাসী রাজরাম শাস্ত্রীর

শব্দব্যুৎপত্তিকৌমুদী (খ্রীঃ ১৯শ শতক), শ্রুতপালের ব্যাকরণ, সোমনাথ-কৃত শিশুবোধ ব্যাকরণ, সিদ্ধনন্দীর ব্যাকরণ, সিদ্ধবর্ণব্যাকরণ, শুভচন্দ্র-কৃত শব্দচিন্তামণিব্যাকরণ, অপ্পয্যদীক্ষিতের প্রসিদ্ধশব্দসংস্কার ব্যাকরণ, অরুণদত্তের ব্যাকরণ, অর্জুনদত্তের ব্যাকরণ, ঈশ্বরীপ্রসাদের শব্দকৌস্তুভ ব্যাকরণ, বালসূরির বালবোধিনী এবং বালরঞ্জনী, চোক্কনাথ-প্রণীত শব্দকৌমুদী, নারায়ণসুধী-রচিত শব্দমঞ্জরী, কোদণ্ডরামের শব্দসিদ্ধান্তমঞ্জরী, চট্টগ্রামের অধিবাসী রজনীকান্ত সাহিত্যাচার্য (১২৭৬-১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)-রচিত সংস্কৃতবোধ-ব্যাকরণ, মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার (১৮৪০-১৯০৮)-রচিত মণিমঞ্জরী ব্যাকরণ ও লঘুমঞ্জরী ব্যাকরণ এবং বাংলায় বোধসার-ব্যাকরণ, কালিদাস বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৫-১৯৪০ খ্রীঃ)-রচিত 'আশুব্যুৎপত্তিসাধনম্' এবং শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার (১২৪১-১৩১১ বঙ্গাব্দ)-রচিত 'কৌমারব্যাকরণম্' প্রভৃতি।

খ্রীঃ ১৭শ শতকে কবীন্দ্রাচার্য[১] তদীয় পুস্তকালয়স্থিত পুস্তকাবলীর যে সূচী প্রণয়ন করেন তাহাতে অন্যান্য ব্যাকরণগ্রন্থের মধ্যে পূর্বোক্ত 'শব্দতর্ক ব্যাকরণ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'যমব্যাকরণ' পর্যন্ত নয়খানা ব্যাকরণের নাম পাওয়া যায়। এই তালিকায় কৃষ্ণভট্ট মৌনীর বৃত্তি-দীপিকার নামও বিদ্যমান। ইহা কোনও প্রাথমিক বা পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ নয়, ব্যাকরণের কয়েকটি বিষয়মাত্র ইহাতে আলোচিত হইয়াছে যাহা ব্যাকরণে কৃতবিদ্য ব্যক্তির পক্ষে ন্যূনাধিক প্রয়োজনীয়। গ্রন্থকারের পিতা রঘুনাথ ভট্ট, পিতামহ গোবর্ধন ভট্ট এবং ভ্রাতা জয়কৃষ্ণ মৌনী সারমঞ্জরী, লঘুকৌমুদী-টীকা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। 'বৈষ্ণব ব্যাকরণ' বলিতে কবীন্দ্রাচার্য এই নামের কোনও স্বতন্ত্র ব্যাকরণ অথবা চৈতন্যামৃতাদি কোনও বৈষ্ণব ব্যাকরণ বুঝিয়াছেন কিনা বলা যায় না। তাঁহার তালিকাভুক্ত 'ব্রহ্ম ব্যাকরণ' বোধ হয় ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী-কৃত কোনও ব্যাকরণ। তিনি রত্নমহোদধি এবং রত্নাকর নামে দুই ব্যাকরণ রচনা করেন। এই দুইই এক ব্যাকরণ কিনা বা ব্রহ্ম ব্যাকরণ নামেও অভিহিত কিনা সন্দেহস্থল। ব্রহ্মানন্দ ছিলেন পরমানন্দ সরস্বতীর শিষ্য এবং মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি ও সিদ্ধান্তবিন্দু গ্রন্থদ্বয়ের যথাক্রমে লঘুচন্দ্রিকা এবং ন্যায়রত্নাবলী টীকার রচয়িতা। 'যমব্যাকরণে'র প্রণেতা বৌদ্ধ পণ্ডিত যমারি প্রথম জীবনে বড় গরীব ছিলেন এবং পরে বুদ্ধগয়ার জনৈক যোগীর প্রভাবে ধনবান্ হন। ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে

পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বিক্রমশীলার রাজকীয় উপাধি লাভ করেন। রাজা নয়পালের সময় (খ্রীঃ ১১শ শতক) তিনি বর্তমান ছিলেন।২

'অষ্টধাতু'র প্রণেতার নাম জানা যায় নাই। খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীয় চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং এবং ১২শ শতাব্দীয় শরণদেব দুর্ঘটবৃত্তিতে (১।৪। ২১, ৮।৪।৬৫) এই গ্রন্থের নাম করিয়াছেন।

মলয়গিরির মুষ্টিসূত্রে হৈমব্যাকরণের সংজ্ঞা এবং অভিনব শাকটায়নের প্রত্যাহার-সূত্র গৃহীত হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা 'মুষ্টিবৃত্তি'ও মলয়গিরির রচনা। সূত্রের অল্পতাহেতু এই নাম প্রচলিত হয়। বৃত্তিতে 'অদহদরাতীন্ কুমারপালঃ' বলায় তিনি খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীয়।

সর্বভাষাপ্রবর্তনব্যাকরণের বৃত্তিও সুভাষকীর্তি-রচিত। রাজরাজদেব সাধুকীর্তির মঞ্জুশ্রীশব্দলক্ষণের প্রথম দুই অধ্যায়ের বৃত্তি রচনা করেন। সুভাষকীর্তি ও সাধুকীর্তির গ্রন্থদ্বয় তিব্বতীভাষায় অনূদিত হইয়া রক্ষিত আছে।

চৈতন্যামৃতের রচয়িতা পরমানন্দদাস সেন 'কবিকর্ণপূর' উপাধিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যে সবিশেষ উল্লিখিত (দ্রঃ চৈ. চ. ১।১০।৬০, ২। ১২।৪৩, ৪৪, ৪৮, ৩।১৬।৬২, ৬৮ প্রভৃতি)। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁচরাপাড়াতে ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। পিতা শিবানন্দ সেন। তাঁহার চেষ্টায় সাতবৎসরের বালক পরমানন্দ পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন লাভ করেন এবং একটি সংস্কৃত শ্লোকপাঠে তাঁহার কর্ণ পূর্ণ (তৃপ্ত) করিয়া 'কর্ণপূর' বা 'কবিকর্ণপূর' আখ্যায় ভূষিত হন। Colebrooke সাহেব তৎসম্পাদিত অমরকোষের মুখবন্ধে (১৮০৮ খ্রীঃ) চৈতন্যামৃত ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন।

গোবিন্দব্যাকরণের রচয়িতা গোবিন্দনাথও বৈষ্ণব। তাঁহার পিতার নাম বিট্ঠলনাথ দীক্ষিত এবং পিতামহ অনুভাষ্যের রচয়িতা শুদ্ধাদ্বৈত-বাদী বল্লভাচার্য। কাজেই গোবিন্দনাথ খ্রীঃ ১৬শ/১৭শ শতাব্দীয়।

কৃষ্ণলীলামৃত ব্যাকরণে নানাচ্ছন্দের কবিতায় ব্যাকরণবর্ণনা উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন করা হইয়াছে। রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাসাগর—' নদীয়া জেলার মহেশপুরের অধিবাসী।

রাঘবেন্দ্রীয়ব্যাকরণ-প্রণেতা রাঘবেন্দ্রাচার্য 'শব্দকৌস্তুভ', 'শব্দেন্দুশেখর' এবং 'পরিভাষেন্দুশেখরে'র উপর যথাক্রমে প্রভা, বিষমী এবং ত্রিপথগা নামে টীকাত্রয় রচনা করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

'প্রসিদ্ধশব্দসংস্কার ব্যাকরণে'র রচয়িতা অপ্পয্য বা অপ্পয় দীক্ষিত 'প্রাকৃতমণিদীপ' নামে এক প্রাকৃত ব্যাকরণও রচনা করেন (খ্রীঃ ১৭শ শতক)। তিনি নারায়ণ দীক্ষিতের পুত্র এবং পিতৃব্য ২য় অপ্পয় দীক্ষিতের দত্তক পুত্র (দ্রঃ প্রাকৃত ব্যাকরণ)। 'শব্দরত্নাবলী'র প্রণেতা অপ্পাসুরি অপ্পয় দীক্ষিতের বংশধর। শব্দরত্নাবলী 'শিষ্টপ্রযুক্তশব্দানাং সাধুত্বস্য প্রকাশিকা।' বৈদ্যনাথ শাস্ত্রীর শিষ্য এই অপ্পাসূরি গুরুদেবের 'পরিভাষার্থসংগ্রহে'র ব্যাখ্যাও রচনা করেন।

'বেদশব্দবিভূষণ'কৃৎ অনন্তগোপালকৃষ্ণের পিতার নাম অনন্তবেঙ্কটেশ। ইঁহারা শ্রীবৎস গোত্রীয়। খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীতে রচিত শাব্দিকচিন্তামণিতে গোপালকৃষ্ণ নমস্কৃত হওয়ায় তিনি তৎপূর্ববর্তী হইতেছেন।

'ভাবসিংহপ্রক্রিয়া'র রচয়িতা ভট্টবিনায়ক, ভট্টগোবিন্দ সূরির পুত্র। তিনি মেদিনীরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র ভাবসিংহের শিক্ষার জন্য এই ব্যাকরণ রচনা করেন। রাজপুত্রের নামানুসারেই গ্রন্থের নামকরণ লক্ষণীয়। ইহা ব্যাখ্যামূলক এবং ব্যাকরণের প্রাথমিক জ্ঞানলাভের উপযোগী। কোথাও 'প্রক্রিয়া ভাবসিংহী' এইরূপও বলা হইয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ইহার উদ্দেশ্য রামচরিত বর্ণনা করা। ইহাতে শিবসূত্রসমূহ এবং পরিবর্তিতাকারে কতকগুলি পাণিনিসূত্র গৃহীত হইয়াছে।

মদন পঞ্চাননের প্রক্রিয়ার্ণবে প্রধানতঃ মুগ্ধবোধব্যাকরণের সূত্র-সংজ্ঞাদি গৃহীত হইলেও কাতন্ত্রাদি অন্য ব্যাকরণের সাহায্যও সমাহৃত হইয়াছে ঃ 'সমাহৃত্যান্যতন্ত্রাণি করোমি প্রক্রিয়ার্ণবম্।' ইহার প্রথম সূত্র ঃ 'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ' (= কলাপব্যাকরণের প্রথমসূত্র)।

কাশীশ্বর শর্মার জ্ঞানামৃত—পাণিনি-প্রভাবিত এক প্রাথমিক সংস্কৃতব্যাকরণ। ১৬৬০ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৭৩৮/৩৯) এই গ্রন্থ প্রণীত হয়। গ্রন্থকারের পিতার নাম রামনারায়ণ। সুপদ্ম ব্যাকরণের 'কাশীশ্বরীগণ' সম্ভবতঃ এই কাশীশ্বরের রচনা। এক স্থলে তিনি ঘনশ্যামের পুত্র এবং রাঘব পণ্ডিতের পৌত্র বলিয়া কথিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহাকে এক সাধারণ প্রাকৃত ব্যাকরণ বলিয়াছেন।

বিশ্বেশ্বরসূরি-রচিত 'ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি' আসলে অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম তিন অধ্যায়ের মহাভাষ্যানুসারিণী ব্যাখ্যা হইলেও ইহাতে বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ও ভাষ্যকার পতঞ্জলির বিবিধ মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে বহু অনধিগম্য বা দুরধিগম্য বিষয়ের পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা

হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরের পিতার নাম লক্ষ্মীধর পণ্ডিত। 'পাণ্ডেয়' ইঁহাদের উপাধি। শব্দকৌস্তুভ হইতে উদ্ধৃতি দেওয়ায় বিশ্বেশ্বর ভট্টোজির পরবর্তী।

বিনয়সাগরের ভোজব্যাকরণে সংস্কৃতের আধারে মাগধী শব্দের ব্যুৎপত্তি (?) মুখ্যতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারমল্লের পুত্র ভোজের তুষ্টির জন্য এই ব্যাকরণ রচিত ঃ 'শ্রীভারমল্লাত্মজভোজতুষ্ট্যৈবিরচ্যতে ব্যাকরণং নবীনম্।' এই ভোজ ছিলেন কচ্ছের রাজা (১৬৩১-১৬৪৫)। কল্যাণসাগরের শিষ্য বিনয়সাগর সম্ভবতঃ জৈন। পাঠক বা উপাধ্যায় তাঁহার (পূর্বাশ্রমের ?) উপাধি। ব্যাকরণ ছন্দোবদ্ধ।

কেশব-কৃত কোন স্বতন্ত্র ব্যাকরণ ছিল কিনা সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট প্রমাণের অভাব রহিয়াছে। হালদার মহাশয় 'প্রাচীন গ্রন্থে "কৈশবী" ব্যাকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়' (ব্যা. দ. ই. পৃঃ ৪৫৩) লিখিলেও ইহার প্রমাণস্বরূপ কোন নিদর্শন উপস্থিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে কেশব 'কর্ণাটদেশীয় পণ্ডিত' এবং 'কর্ণাটী ভাষায় ইঁহার একখানি সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণ আছে বলিয়া' শুনিয়াছেন (?)। তিনি যে অষ্টাধ্যায়ীর বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন তাহা সুনিশ্চিত, পুরুষোত্তমের ভাষাবৃত্তিতে (৮।৪।২০) 'কেশববৃত্তি'র স্পষ্ট উল্লেখ ('কেশববৃত্তৌতু বিকল্প উক্তঃ') আছে। ভাষাবৃত্তির অন্যত্র (৫।২।১১২) যে লিখিত হইয়াছে 'পৃষোদরা-দিত্বাদিকারলোপ একদেশ বিকারদ্বারেণ পর্যচ্ছন্দাদপি বলজিতি কেশবঃ' তাহাও কেশববৃত্তি হইতেই উদ্ধৃত বলা চলে। মৈত্রেয়রক্ষিতের তন্ত্রপ্রদীপে (১।২।৬, ১।৪।৫৫) এবং 'হরিনামামৃত ব্যাকরণে' (৩।৩১৫)ও কেশবের মতোল্লেখ রহিয়াছে।[৩] পাণিনীয় শিক্ষার টীকা 'শিক্ষাপ্রকাশে'র রচয়িতার নামও কেশব। কেশবের উপাধি জানা যায় নাই। 'নানার্থার্ণবসংক্ষেপ' নামক কোষের রচয়িতা কেশবস্বামীও দক্ষিণ-ভারতীয় এবং খ্রীঃ ১১শ/১২শ শতাব্দীয়। উভয় কেশব অভিন্ন কিনা সন্দেহস্থল। তবে 'কল্পদ্রুকোষ' বা 'কেশবনিঘণ্টু'র প্রণেতা কেশব যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি তাহা নিঃসন্দেহ। তিনি খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীয়।

পুণ্ডরীক বিদ্যাসাগরের কাতন্ত্রপ্রদীপে (২।৪।১৩) এবং হৈমব্যাকরণ (খ্রীঃ ১২শ শতক)-সংক্রান্ত বৃহন্ন্যাসাদি (?) গ্রন্থে ইন্দ্রমিত্রের মতোল্লেখ হইতে অনুমিত হয় তিনি ব্যাকরণে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তবে 'মনে হয়, ইঁহার ব্যাকরণই কবীন্দ্রাচার্য্যসূচীপত্রে ঐন্দ্র ব্যাকরণ নামে উল্লিখিত হইয়াছে'—হালদার মহাশয়ের এই উক্তি অত্যধিক কল্পনাশ্রয়ী।

রচয়িতার ইন্দ্রপূর্ব নাম হইলেই যে তাঁহার ব্যাকরণও 'ঐন্দ্র' আখ্যালাভ করিবে এইরূপ অনুমান কল্পনাবিলাসমাত্র।

হৈম বৃহন্ন্যাসে বৈয়াকরণ উৎপলের উল্লেখ হইতে প্রতীয়মান যে ব্যাকরণে তাঁহার কোনও গ্রন্থ ছিল। পাণিনীয় লিঙ্গানুশাসনের সঙ্কলয়িতা ও ব্যাখ্যাতা ভট্টোৎপল যদি সেই উৎপল হন, তবে তিনি খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীয়।

ব্যাকরণকৌমুদীর প্রণেতা বলদেব বিদ্যাভূষণ উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় রেমুণার নিকটবর্তী অঞ্চলে আনুমানিক ১৮শ খ্রীঃ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে মাধবসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, পরে সন্ন্যাস লইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হন এবং ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য রচনা করেন। 'পদকৌস্তুভ' তাঁহার অপর ব্যাকরণ। ইহা এবং ব্যাকরণকৌমুদী —দুইই পাণিনীয় সূত্রানুসারে রচিত অর্থাৎ উভয়ত্রই পাণিনির সূত্রাবলী লইয়া নূতন বৃত্তি রচনা করা হইয়াছে। শেষোক্তটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত এবং বালকদের জন্য রচিত।

বালসূরির বালবোধিনী ৭ প্রকরণে বিভক্ত ঃ (১) বিভক্ত্যর্থাকাঙ্ক্ষান্বয়-প্রকরণ, (২) শব্দপ্রকরণ, (৩) অব্যয় প্রকরণ, (৪) বিভক্ত্যর্থপ্রকরণ, (৫) ধাতুপ্রকরণ, (৬) সমাসাদিপঞ্চবৃত্তিপ্রকরণ এবং (৭) সন্ধিপ্রকরণ। সন্ধিপ্রকরণের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে ঃ 'তত্র সূত্রাৎ সমুদ্ধৃত্য কিঞ্চিৎ পাণিনিসম্মতম্। কাব্যশ্লোকপদচ্ছেদে হ্যপযুক্তমিহোচ্যতে।।' এবং সর্ব-শেষে—'বৈয়াকরণসিদ্ধান্তবোধিনী বালবোধিনী'। গ্রন্থকার 'বালশাস্ত্রী' এবং 'বালকবি' নামেও পরিচিত। তাঁহার পিতার নাম শেষ ভট্ট এবং পিতামহ নারায়ণ ভট্ট। তাঞ্জোরের রাজা ২য় শেরফোজির (১৮০০-১৮৩২ খ্রীঃ) রাজ্যকালে বালবোধিনী রচিত বলিয়া অনুমিত। বালসূরির অপর ব্যাকরণ 'বালরঞ্জনী'র পুষ্পিকায় স্পষ্টতঃই বলা হইয়াছে ঃ

> শ্রীমৎতুলজভূপালসূনোঃ শরভভূপতেঃ।
> তুষ্ট্যর্থং বালকৃতিনা রচিতা বালরঞ্জনী।।

শ্লোকোক্ত শরভভূপতিই পূর্বোক্ত শেরফোজি। বালরঞ্জনীর প্রারম্ভে গ্রন্থকার যজ্ঞেশ্বরকে গুরু বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন।

চোক্কনাথের 'শব্দকৌমুদী' পাণিনিসূত্রভিত্তিক রচনা। ইহার ব্যাখ্যা 'শাব্দিকরক্ষা' প্রণয়ন করেন দ্বাদশাহযাজী। তিনি 'শ্রীকৌশিককুলতিলক

সঞ্চারিভাষ্য শ্রীদ্বাদশাহযাজী'র পৌত্র, এবং স্বয়ং 'বালপতগুলি দ্বাদশাহযাজী' বলিয়া অভিহিত।

নারায়ণসুধী-রচিত 'শব্দমঞ্জরী' ব্যাকরণও পাণিনিসূত্রভিত্তিক। তাঞ্জোর জেলার কুম্ভকোনমের নিকটবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামে নারায়ণের জন্ম। খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীয়। তিনি অষ্টাধ্যায়ীর 'শব্দভূষণ' টীকা রচনা করেন।

কোদণ্ডরামের 'শব্দসিদ্ধান্তমঞ্জরী'ও পাণিনি-ভিত্তিক। 'বালানাং পাণিনীয়েঽস্মিন্নবগাহনসিদ্ধয়ে' ইহা রচিত।

এই সব ব্যাকরণের অনেক গ্রন্থই কোনও না কোনও রাজা বা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহাদেরই আদেশে বা অনুরোধে সভাপণ্ডিতগণ-কর্তৃক, অথবা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রয়োজনে সেই সম্প্রদায়ের কোনও আচার্য-কর্তৃক রচিত। নির্দিষ্ট অল্প সময়ের মধ্যে রচিত বলিয়াই হউক কিংবা প্রণেতাদের অপটুতাজনিত অন্য যে কোনও কারণেই হউক, মাত্র কয়েকখানি ব্যতীত এই সব ব্যাকরণের অন্য সবই গুণের দিক্ দিয়া প্রয়োজন মিটাইবার মতো যথেষ্ট উপযোগী হইয়া উঠিতে পারে নাই। কাজেই ইহাদের পঠন-পাঠন একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কিছুকাল গণ্ডীবদ্ধ থাকিয়া ক্রমে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। যেগুলি একেবারেই গ্রন্থকর্তার নিজের বা মনিবের সন্তানদের শিক্ষার জন্যই মাত্র রচিত, তাহাদের, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর, আর বড় একটা প্রয়োজন থাকার কথাও নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে গত কয়েক শত বর্ষ ধরিয়া এই জাতীয় কত যে সঙ্কীর্ণ, সংক্ষিপ্ত তথা প্রাথমিক ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ধারণ করা সাধ্যাতীত। কতকগুলি চিরতরে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কতকগুলি অন্যান্য গ্রন্থমারফৎ এবং কোনও প্রাচীন তালিকায় নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়া রহিয়াছে, আর কতকগুলির হস্তলিখিত পুঁথি প্রাচীন গ্রন্থাদির সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হইয়া ক্বচিৎ কোনও গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণের অপেক্ষায় দিন গণিতেছে। সংখ্যায় অল্প হইলেও যে কয়খানা গুণগতভাবে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও সাধারণ প্রয়োজন সাধনের উপযোগী কেবল তাহারাই উপযুক্ত অনুসন্ধিৎসুর শ্রদ্ধাজড়িত চেষ্টায় কালের করালগ্রাস অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

১ ইঁহার পূর্ণনাম কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতী। সন্ন্যাসী। গোদাবরীতটে কোনও গ্রামে জন্ম। ঋগ্‌বেদী ব্রাহ্মণ। বেদবেদাঙ্গে জ্ঞান লাভের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীবাসী হন। মুঘলসম্রাট্ শাহ্‌জাহানের (১৬২৭-৫৮) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। কাশী ও প্রয়াগ ইঁহার চেষ্টায় জিজিয়াকর-মুক্ত হয়। রচিত গ্রন্থ 'কবীন্দ্রকল্পদ্রুম'। গাইকোয়াড় সংস্কৃত সিরীজ, বরোদা হইতে কবীন্দ্রাচার্য-পুস্তকালয়স্থ গ্রন্থাবলীর মুদ্রিত সূচীপত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

২ দ্রঃ ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ-রচিত 'A History of Indian Logic' (Calcutta 1921), পৃঃ ৩৪৩।

৩ হরিনামামৃত ব্যাকরণের (৩।৩১৫) বৃত্তিভাগে—'প্রাণিতি হে প্রাণ্। কেশববৃত্তৌ তু হেপ্রান ইতি বা' অর্থাৎ কেশবের বৃত্তিতে 'হে প্রাণ্' স্থলে বিকল্পে নত্ব-নির্দেশ করা হইয়াছে।

ভর্তৃহরির গ্রন্থ ও কাশিকাবৃত্তি

খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে মহাপণ্ডিত ভর্তৃহরির জন্ম। অষ্টাধ্যায়ীর কাশিকাবৃত্তির প্রণেতা বৌদ্ধ পণ্ডিত জয়াদিত্যও এই সময়ের লোক। ভর্তৃহরিও বৌদ্ধ সংস্রবমুক্ত নহেন। ৬৫১।৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তাঁহার 'বাক্যপদীয়'—ব্যাকরণদর্শনের এক যুগান্তকারী গ্রন্থ। পাতঞ্জল মহাভাষ্যের ন্যায় এই 'বাক্যপদীয়'ও স্বক্ষেত্রে অদ্বিতীয় গ্রন্থরূপে অদ্যাপি দেদীপ্যমান। শব্দব্রহ্মবাদ বা শব্দাদ্বৈতবাদ তৎপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব।[১] মহাভাষ্যের 'দীপিকা'টীকা এবং ব্যাকরণশিক্ষামূলক 'ভট্টিকাব্য'[২] ও তাঁহার রচনা। এই কাব্যের প্রকৃত নাম 'রাবণবধ' হইলেও বর্তমানে সেই নামের তেমন প্রসিদ্ধি নাই। 'ভাষ্যদীপিকা' অসম্পূর্ণ। তাঁহার আর এক গ্রন্থ 'শব্দধাতুসমীক্ষা' এখন পাওয়া যায় না।

মহর্ষি পতঞ্জলির পর ব্যাকরণ ক্ষেত্রে ভর্তৃহরির মতো এত বড় মাপের প্রতিভা আবির্ভূত হয় নাই বলা চলে। তিনি নিজেও স্বীয় কৃতিত্বের গুরুত্বসম্বন্ধে বেশ সচেতন ছিলেন। মহাভাষ্যের টীকা রচনা করিতে করিতে স্বীয় রচনার মহিমায় গর্বোদ্ধত হইয়া তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ

> অহো ভাষ্যমহো ভাষ্যমহোবয়মহোবয়ম্।
> মামদৃষ্ট্বা গতঃস্বর্গমকৃতার্থঃ পতঞ্জলিঃ।।

ইহার নির্গলিতার্থ—ভর্তৃহরিকে না দেখিয়া অর্থাৎ কিনা তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে অনবহিত থাকিয়া স্বর্গারোহণ করায় ভাষ্যকার পতঞ্জলি অকৃতার্থ রহিয়া গেলেন। এই উক্তিজনিত গুরু-অপরাধেই সেই মহাভাষ্যটীকা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া প্রাচীনদের ধারণা। অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম তিন পাদের ভাষ্য (প্রথম ১৪ আহ্নিক) পর্যন্ত সেই টীকা রচিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে 'ত্রিপাদী' (টীকা) বলা হইত।[৩] চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং (খ্রীঃ ৭ম শতক)-এর বর্ণনা হইতে মনে হয়, ভর্তৃহরির ঐ টীকা সমগ্র মহাভাষ্যের উপরেই প্রণীত হইয়াছিল। ইৎসিং উহাকে ২৫০০০ শ্লোকপরিমিত 'ভর্তৃহরিশাস্ত্র' বলিয়াছেন।

'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' থেকে জানা যায়, বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্তৃহরি স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত হইয়া রাজ্য ছাড়িয়া বিরাগী হন। নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক এবং বৈরাগ্যশতক নামে তিন শত উৎকৃষ্ট

সংস্কৃত শ্লোক তাঁহার নামে প্রচলিত আছে। এই সব শ্লোকের কোন কোনটিতে তীব্র সংসারবৈরাগ্য এবং নারীর প্রতি দুর্বার ঘৃণা ও তজ্জনিত ক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শুনা যায়, এই ভর্তৃহরিই বৈরাগ্যোদয়ের পূর্বে উজ্জয়িনীতে ১৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেখানকার একটা গহ্বরকে দেখাইয়া এখনো লোকে বলে 'ভর্তৃহরিগুম্ফ'। নাথ-সাহিত্যেও এক ভর্তৃহরির সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন কাহিনীতে তাঁহার পিতৃপরিচয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়।

পুরুষোত্তমদেবের ভাষাবৃত্তির উপর সৃষ্টিধরাচার্য-রচিত 'ভাষা-বৃত্ত্যর্থ-বিবৃতি' নাম্নী টীকার শেষে (৮।৪।৬৮) লিখিত আছে ঃ 'ভাগবৃত্তি-র্ভর্তৃহরিণা শ্রীধরসেননরেন্দ্রাদিষ্টা বিরচিতা।' অর্থাৎ রাজা শ্রীধরসেনের আদেশে ভর্তৃহরি-কর্তৃক 'ভাগবৃত্তি' বিরচিত হয়।[৪] আবার ভট্টিকাব্যের রচয়িতাও এক 'বলভীরাজ শ্রীধরসেনে'র উল্লেখ করিয়াছেন।[৫] প্রাচীন সৌরাষ্ট্রে বলভীনগরী অবস্থিত ছিল। ৫০০-৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চারিজন শ্রীধরসেন সেখানে রাজত্ব করেন। বর্তমান গুজরাট প্রদেশের কাথিয়াবাড় অঞ্চলের বল্লভীপুর (Vallabhipur) বোধহয় সেই প্রাচীন বলভী। ইহা একটি প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্ররূপেও তখন বিখ্যাত ছিল। খ্রীঃ ৭ম শতকে ইহা প্রসিদ্ধিতে পূর্বদেশীয় নালন্দার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। নালন্দার তুলনায় এই কেন্দ্রটি অপেক্ষাকৃত বৌদ্ধপ্রভাবমুক্ত ছিল বলিয়া গাঙ্গেয় অঞ্চল থেকেও ব্রাহ্মণগণ এখানে বিদ্যালাভের জন্য পুত্রগণকে প্রেরণ করিতেন। ভর্তৃহরির পক্ষে এই শিক্ষাকেন্দ্রের সহিত যুক্ত থাকা অসম্ভব নয়।

বাক্যপদীয় তিন কাণ্ডে বিভক্ত ঃ (১) আগম বা ব্রহ্মকাণ্ড, (২) বাক্যকাণ্ড এবং (৩) প্রকীর্ণককাণ্ড। প্রথম দুই কাণ্ডে ব্যাকরণশাস্ত্রের মূল ভিত্তি এবং সিদ্ধান্তসমূহ আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রন্থে বা সম্প্রদায়ে প্রকীর্ণ ব্যাকরণ-বিষয়ক সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্বগুলির অবলম্বনে ৩য় কাণ্ডের রচনা। ইহাকে 'পদকাণ্ড'ও বলা হয়, যাহা ১৪টি সমুদ্দেশে বিভক্ত। প্রায় দুই হাজার সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ মূল গ্রন্থের উপর স্বয়ং ভর্তৃহরি যে ব্যাখ্যা রচনা করেন তাহার সম্পূর্ণাংশ পাওয়া যায় নাই। পুণ্যরাজ, হেলারাজ, বৃষভদেব বা হরিবৃষভ এই গ্রন্থের টীকাকার। ইঁহাদের রচনাও পুরাপুরি অবিমিশ্রভাবে পাওয়া যায় নাই। অনেক স্থলে বৃত্তির সহিত টীকা, অথবা একের রচনার সহিত অন্যের রচনা মিশিয়া

গিয়াছে। অনেকের মতে বৃষভদেব বা হরিবৃষভ নাকি ভর্তৃহরিরই নামান্তর।

বাক্যপদীয়ের প্রথম শ্লোকটিতে সমগ্র গ্রন্থের সারসিদ্ধান্ত তথা ভর্তৃহরি-দর্শনের মূল কথা বিবৃত হইয়াছে মনে হয়। শ্লোকটি এইরূপ ঃ

অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।। ১।১।।

অর্থাৎ অনাদি-অনন্ত ব্রহ্ম, যাহা অক্ষর এবং শব্দতত্ত্বস্বরূপ, অর্থরূপে বিবর্তিত হওয়ায় এই জগৎপ্রক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছে।৬ এই প্রসঙ্গে বস্তু বা দ্রব্যের 'পদার্থ' নামটি স্মরণীয়। পদের অর্থটিই দ্রব্য হইয়া উঠে। এই বাক্যপদীয়েই বলা হইয়াছে ঃ 'শব্দেষুচাশ্রিতা শক্তির্বিশ্বস্যাস্য নিবন্ধনী' (১।১১৯) অর্থাৎ শব্দাশ্রিত শক্তিই এই বিশ্বের হেতু বা নিদান।

একাধারে কবি, দার্শনিক এবং বৈয়াকরণ ভর্তৃহরির বিভিন্ন রচনায়, বিবিধ ধর্ম ও দার্শনিক মতের প্রতি তাঁহার অনুরাগের প্রতিফলন দেখিয়া এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, তিনি মূলতঃ অদ্বৈতবাদী হইয়াও ছিলেন সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। তাই টীকাকার পুণ্যরাজ তাঁহাকে 'সর্বসিদ্ধান্ত-সন্দোহসারামৃতময়' বলিয়াছেন। হেলারাজ বাক্যপদীয়ের প্রকীর্ণককাণ্ডের টীকার শেষে তাঁহাকে বলিয়াছেন ঃ 'সমস্তবিদ্যাশ্রীকান্ত'। তাঁহাকে 'অখিলাভিধানবিৎ', 'প্রমাণিতশব্দশাস্ত্র' এবং 'বেদবিদামলঙ্কারভূত' বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন বর্ধমান উপাধ্যায় স্বীয় 'গণরত্নমহোদধি' গ্রন্থে।

ইৎসিং-এর বর্ণনায় আছে, ভর্তৃহরির দেহত্যাগের দশ বৎসর পরে জয়াদিত্যের মৃত্যু হয়। বর্তমান কাশিকাবৃত্তির যুগ্ম কর্তৃত্ব জয়াদিত্য ও বামনে আরোপিত হইলেও জয়াদিত্যই ইহার প্রধান রচয়িতা। ইৎসিং বামনের নাম করেন নাই। তিনি সম্ভবতঃ পরে ইহাতে বৈদিকাংশ যোজনা করিয়া কাশীক্ষেত্রে ইহার সংস্কার সাধন করেন। টীকাকার হরদত্ত মিশ্রের মতে কাশীতে রচিত বলিয়া 'কাশিকা' নাম ঃ'কাশিকেতি দেশতোঽভিধানম্। কাশিযুভবা...কাশিকা।' তিনি কাশিকাকৃৎহিসাবে পূর্বোক্ত দুই জনেরই নাম করিয়াছেন। এক মতে কাশিকার প্রথম পাঁচ অধ্যায় জয়াদিত্যের রচনা এবং বাকী তিন অধ্যায় বামনের। গণরত্ন-মহোদধিতে (১।২) বামনকে 'অবিশ্রান্তবিদ্যাধর ব্যাকরণকর্তা'৭ বলা হইয়াছে। কাশিকাতেও কিন্তু পূর্বোক্ত 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে (৪।৩।৮৮) কথিত আছে ঃ''শব্দার্থসম্বন্ধীয়ং প্রকরণং

বাক্যপদীয়ম্।' ইহার দার্শনিক দিক্‌টা হয়তো বৌদ্ধ পণ্ডিতের মতাদর্শের বিরোধী ছিল।

অষ্টাধ্যায়ীর প্রাচীনা বৃত্তিরূপে এই কাশিকা (অর্থাৎ প্রকাশিকা) এখনও স্বমহিমায় বিদ্যমানা। ইহার অপরাপর আখ্যা—সদ্‌বৃত্তি, মহাবৃত্তি, সতীবৃত্তি। অষ্টাধ্যায়ীর ইহা অপেক্ষা আর কোনও প্রাচীন ব্যাখ্যা (বৃত্তি) বর্তমানে প্রচলিত নাই। ইহা সর্বত্র মহাভাষ্যের অনুসারিণী নয়। অনেক স্থলে উভয়ের মত-পার্থক্যও আছে। ইহার কারণ, পাণিনীয় দুই পৃথক্ ধারা হইতে এই দুই গ্রন্থের উদ্ভব। সম্ভবতঃ এই কারণেই মহাভাষ্যধৃত অষ্টাধ্যায়ীব সূত্রপাঠের সঙ্গে কাশিকাধৃত সূত্রপাঠের কতকগুলি স্থলে (কীলহর্ন্ সাহেবের মতে এইরূপ স্থলের সংখ্যা ৫৮) বৈসাদৃশ্যও লক্ষিত হয়—যাহার মূলে রহিয়াছে যোগবিভাগ (সূত্রঘটিত), সূত্ররূপে বার্ত্তিকের ব্যবহার, সূত্রে নূতন শব্দের সংযোজন এবং মূলসূত্রের শব্দপরিবর্তন। চান্দ্র ব্যাকরণের প্রভাবও কাশিকাতে পড়িয়াছে।

খ্রীঃ ৮ম শতকে ইহার উপর 'কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা' নামে যে টীকা রচিত হয়, তাহার রচয়িতা জিনেন্দ্রবুদ্ধি ছিলেন বৌদ্ধ এবং কাশ্মীরী, মতান্তরে বাঙালী। এই টীকা অতি বৃহৎ এবং সচরাচর 'ন্যাস' বা 'কাশিকান্যাস' নামে কথিত। হরদত্ত (খ্রীঃ ১২শ শতক)-রচিত 'পদমঞ্জরী'—কাশিকার আর এক বিখ্যাত টীকা। হরদত্ত দক্ষিণভারতীয়। পদমঞ্জরীর (১।১।২০, ৬।১।৩৭) বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি 'মহাপদমঞ্জরী' এবং 'পরিভাষাপ্রকরণ' নামক আরও দুই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দুইটিই ব্যাকরণবিষয়ক। কীলহর্নের মতে জিনেন্দ্রবুদ্ধি পদমঞ্জরী থেকে প্রচুর গ্রহণ করিয়াছেন ('freely copied')। এই হিসাবে হরদত্তকে ন্যাসকারের পূর্ববর্তী ধরিতে হয়। ডঃ জেকোবি-র মতে হরদত্ত ৮·৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। আবার 'ভাষ্যব্যাখ্যাপ্রপঞ্চ'কার হরদত্তকে কৈয়টানুসারী লিখিয়াছেন। পদমঞ্জরীতে নাকি কৈয়টের মহাভাষ্যপ্রদীপ থেকে প্রচুর গ্রহণ করা হইয়াছে। এই অবস্থায় হরদত্তকে খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীয় কৈয়টের পরবর্তী হইতে হয়। আবার, ভামহের কাব্যালঙ্কারে এবং বাণভট্টের হর্ষচরিতে যে 'ন্যাসকার' ও 'ন্যাসে'র উল্লেখ আছে, তাহা যদি পূর্বোক্ত ন্যাসকার বা ন্যাসের নির্দেশক হয়, তাহা হইলে জিনেন্দ্রবুদ্ধিকে খ্রীঃ ৮ম শতকেরও অনেক পূর্বগামী বলিতে হয়।

অষ্টাধ্যায়ীর কৌমুদী-সংস্করণ

অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলিকে ভাষাশিক্ষার উপযোগী বিষয়বিন্যাসক্রমে সজ্জিত করিবার প্রচেষ্টাও যে এই যুগেই আরম্ভ হইয়াছিল তাহার প্রথম প্রমাণ ধর্মকীর্তির 'রূপাবতার ব্যাকরণ'। ইহার অধ্যায়গুলির নাম 'অবতার'। প্রথমে সংজ্ঞাবতার, পরে ক্রমে সংহিতাবতার, বিভক্ত্যবতার ইত্যাদি। কিঞ্চিদধিক আড়াই হাজার (২৫১৯) সূত্রে সঙ্কলিত এই ব্যাকরণের দুইটি ভাগ। সঙ্কলন-কাল ১২শ শতকের শেষ বা ১৩শ শতকের প্রারম্ভ। সঙ্কলক প্রধানতঃ কাশিকাবৃত্তির অনুসরণকারী।

এই জাতীয় প্রচেষ্টার পরবর্তী ফল বিমলসরস্বতীর 'রূপমালা ব্যাকরণ', রামচন্দ্রাচার্যের 'প্রক্রিয়াকৌমুদী', নারায়ণভট্টের 'প্রক্রিয়াসর্বস্ব' এবং ভট্টোজিদীক্ষিতের 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী'। রূপমালার রচনাকাল খ্রীঃ ১৪শ শতকের মধ্যভাগ। ইহার প্রকরণগুলির নাম মালা, যেমন—সংজ্ঞামালা, অজন্তমালা ইত্যাদি। রূপাবতার এবং রূপমালার তুলনায় 'প্রক্রিয়াকৌমুদী' (১৫শ শতক) অধিকতর প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক। পরবর্তী সিদ্ধান্তকৌমুদীর পথিকৃৎ এই প্রক্রিয়াকৌমুদী। ইহার একাধিক টীকা বর্তমান। অন্ধ্রপ্রদেশের এক বিখ্যাত পণ্ডিতবংশে প্রক্রিয়া-কৌমুদীকার রামচন্দ্রের জন্ম।

রূপাবতার, রূপমালা এবং প্রক্রিয়াকৌমুদীতে অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্র গৃহীত হয় নাই ; সুবিধামতো অনেক সূত্র বাদ দেওয়া হইয়াছে। ভট্টোজির বৈঃ সিঃ কৌমুদীতে পাণিনির সমস্ত সূত্রই প্রদর্শিত। ইহাই এই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ত্রিমুনি ব্যাকরণের সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য একাধারে ইহাতে সম্মিলিত। প্রক্রিয়াসর্বস্বেও অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্র প্রক্রিয়াবদ্ধরূপে পরিবেষিত হইয়াছে। ২০ খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থের সঙ্কলক নারায়ণভট্ট (১৫৬০-১৬৬৬) ছিলেন মালাবারের (কেরল) চন্দনকবু গ্রামের অধিবাসী। সিদ্ধান্তকৌমুদীর পরে রচিত হইলেও ইহা গুণ-গরিমায় সিদ্ধান্তকৌমুদীকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। বারাণসীর বাসিন্দা মারাঠী ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীধরের ঔরসে ভট্টোজির জন্ম। তাঁহার জীবৎকাল-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও তিনি যে খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকের মধ্যভাগ হইতে ১৭শ শতকের প্রথমপাদ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বৈদান্তিক গুরু অপ্পয়দীক্ষিত (১৫২০-

৯৩) এবং বৈয়াকরণিক গুরু শেষকৃষ্ণাচার্য। ইনি ছিলেন পূর্বোক্ত রামচন্দ্রাচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং প্রক্রিয়াকৌমুদীর 'প্রক্রিয়াপ্রকাশ' টীকার রচয়িতা। ভট্টোজির ভ্রাতা রঙ্গোজিও ছিলেন বড় পণ্ডিত। তৎপুত্র কোণ্ড-ভট্ট 'বৈয়াকরণভূষণ' নামক দাশনিক গ্রন্থের প্রণেতা। মহীশূর রাজ্যের শিমোগ জেলার ইক্কেরির কেলড়ি শাসকদের নিকট ভট্টোজির পরিবার-বর্গ দীর্ঘকাল পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। বারাণসীতে বাস করা সত্ত্বেও দূরবর্তী কেলড়িরাজাদের সহিত তাঁহাদের সংযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল।

ধর্ম, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করা সত্ত্বেও ব্যাকরণে বৈঃ সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রণয়নের দ্বারা ভট্টোজি বৈয়াকরণরূপেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ব্যাকরণক্ষেত্রে সিদ্ধান্তকৌমুদীকে এক যুগান্তকারী গ্রন্থই বলা চলে। ইহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ঃ (১) ইহাতে পাণিনির সমস্ত সূত্র এবং পাণিনীয় ধাতু, গণ, উণাদি এবং লিঙ্গানুশাসন-ও গ্রথিত করা হইয়াছে, (২) ব্যাকরণের জটিল বিষয়গুলির মীমাংসার জন্য ইহাতে ত্রিমুনির যথোত্তর প্রামাণ্য অনুসৃত হইয়াছে, (৩) ইহাতে সুপ্রাচীন বৈয়াকরণদের সিদ্ধান্তসমূহ উদ্ধৃত হওয়ায় ইহা সার্থকনামা গ্রন্থ হইয়াছে এবং (৪) ইহাতে অন্য কোনও ব্যাকরণের অপেক্ষা না রাখিয়া একমাত্র পাণিনীয় ব্যাকরণেরই বিধি-নিষেধের প্রতি কঠোর আনুগত্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও একশ্রেণীর রক্ষণশীল পণ্ডিত অষ্টাধ্যায়ীর ক্রমভঙ্গদোষকে ভাল চোখে দেখেন নাই।[৮] তাঁহাদের মতে ইহার দ্বারা অষ্টাধ্যায়ীর পবিত্র সূত্র পাঠের মহিমার হানি এবং তজ্জন্য মূল রচনার আর্ষ উদ্দেশ্যের ব্যত্যয় ঘটানো হইয়াছে। তাই সিদ্ধান্তকৌমুদীর কোনো কোনো স্থলের আলোচনা ভাল ভাবে বুঝিতে হইলে পরবর্তী সূত্রের এমনকি অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রবিন্যাসের ক্রম-সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

এই সব অসুবিধা সম্বন্ধে অবহিত থাকিয়াও যুগপ্রয়োজনেই ভট্টোজি এই প্রক্রিয়া-রীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন বা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু যুগের আর একটি দাবী যে সরলতা—সেই বিষয়ে তাঁহার সচেতনতার কোনো লক্ষণই চোখে পড়ে না। তাই প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে তো বটেই, অনেক পণ্ডিতের পক্ষেও তাঁহার রচনা দুষ্প্রবেশ্য। কোথাও স্বীয় অভিপ্রায় তিনি এত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাহার ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত কেবল তীক্ষ্ণবুদ্ধি বহুদর্শীরই বোধগম্য। বস্তুতঃ

কলাপ, মুগ্ধবোধাদি অন্য ব্যাকরণলব্ধ প্রাথমিক জ্ঞান এবং ন্যায়দর্শনাদি শাস্ত্রেরও কিছু শিক্ষা ব্যতিরেকে সিদ্ধান্তকৌমুদী অধিগত করা অসম্ভব বলিলে এমন কিছু অত্যুক্তি হয় না। মোট কথা, ইহা যেমনটি হইতে পারিত বা হওয়া উচিত ছিল, ঠিক তেমনটি হইতে পারে নাই। তাই পরে আবার ইহারও সরলীকৃত রূপায়ণ 'লঘুকৌমুদী' প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

ব্যাকরণে ভট্টোজির অন্যান্য গ্রন্থ—শব্দকৌস্তুভ, প্রৌঢ়মনোরমা, ধাতুপাঠনির্ণয়, লিঙ্গানুশাসনবৃত্তি, ক্রিয়াপদনিঘণ্টু প্রভৃতি। ইহাদের প্রথমটি মহাভাষ্যেরই টীকাস্বরূপ। ইহাতে আহ্নিক-অনুযায়ী অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রারম্ভে গ্রন্থকার বলিয়াছেন : 'ফণিভাষিত-ভাষ্যাব্ধেঃ শব্দকৌস্তুভমুদ্ধরে।' বর্তমানে এই গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম আহ্নিক পর্যন্ত মাত্র পাওয়া গেলেও এইরূপ অনুমিত হয় যে ভট্টোজি ইহার রচনা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি ইহার পর এতৎসংক্রান্ত ৭১টি কারিকাও রচনা করিয়াছিলেন—যাহাদের ৩৫টি ভট্টোজির ছাত্র বনমালী মিশ্র-কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়। পরে সমস্ত কারিকার ব্যাখ্যামূলক 'বৈয়াকরণভূষণ' রচনা করেন কোণ্ডভট্ট (বা কৌণ্ডভট্ট)। নাগেশভট্টের ছাত্র কাশীনিবাসী বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে (ইনিও মারাঠী ব্রাহ্মণ) শব্দকৌস্তুভের 'প্রভা' টীকা রচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ প্রৌঢ়মনোরমা—সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকা। এই টীকাতে তিনি স্বীয় ব্যাকরণগুরুর মত খণ্ডন করায় তাঁহার প্রতিবাদে আবার 'মনোরমাখণ্ডন' এবং 'মনোরমাকুচমর্দন' নামে যে দুই গ্রন্থ রচিত হয়, তাঁহাদের রচয়িতা যথাক্রমে শেষচক্রপাণি এবং পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ। ইঁহারা দুইজনই ভট্টোজির গুরুপুত্র শেষবীরেশ্বরের ছাত্র। চক্রপাণির পিতাও এই বীরেশ্বর। অনন্যসাধারণ আলঙ্কারিক পণ্ডিত জগন্নাথ ছিলেন সম্রাট্ শাহ্জাহানের অনুগ্রহভাজন। এক মুসলমান কন্যাকে তিনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, এক বিদ্বৎসভায় ভট্টোজি তাঁহার গুরুর মত খণ্ডন করিয়া জগন্নাথ-কর্তৃক নিন্দিত ও ধিক্কৃত হইলে, ভট্টোজিও তাঁহাকে পূর্বোক্তরূপ মুসলমান-সংস্রবের জন্য ম্লেচ্ছ বলিয়া ভর্ৎসনা করেন। ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া জগন্নাথ ঐরূপ অশালীন নামে কেবল প্রৌঢ়মনোরমার খণ্ডনাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, অধিকন্তু ভট্টোজির দার্শনিক গুরু অপ্পয়দীক্ষিতের 'চিত্রমীমাংসা' গ্রন্থ

খণ্ডন করিয়াও 'চিত্রমীমাংসাখণ্ডন' নামে আর এক গ্রন্থ রচনা করিলেন। শব্দকৌস্তুভের খণ্ডনাত্মক গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করেন বলিয়া শুনা যায়।

ভট্টোজির ব্যাকরণ-সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া তদীয় পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এবং তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যসহ যে বিরাট ব্যাকরণ-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে তাহার প্রভাব এখনও বর্তমান। ইহাকে সংক্ষেপে পাণিনির 'কৌমুদীসম্প্রদায়' বলা হয়। ভট্টোজির দক্ষিণ ভারতীয় ছাত্র বরদরাজ সিদ্ধান্তকৌমুদীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী', 'মধ্যসিদ্ধান্ত-কৌমুদী' এবং 'সারসিদ্ধান্তকৌমুদী' প্রস্তুত করিয়া এই ধারারই পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ভট্টোজির পৌত্র হরিদীক্ষিতের (১৬৩০-১৭০০) ছাত্র নাগেশভট্ট (১৬৫০-১৭৬০) এই ধারার শেষ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তিনিও মারাঠী ব্রাহ্মণ ; সাতারা জেলার তাসগাঁও নামক স্থানে জন্ম। প্রয়াগের নিকটবর্তী (মিরজাপুরের নিকটবর্তী গঙ্গাতীরস্থ সহর) শৃঙ্গবেরপুরের রাজা রামবর্মা ছিলেন তাঁহার শিষ্য। ইঁহারই প্রধান সভাপণ্ডিতরূপে নাগেশ নানা বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা করেন। শেষ বয়সে কাশীধামে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস লইয়া অবস্থানের সময় ১৭৭৫ (?) খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। অন্তরঙ্গ মহলে তিনি নাগোজিভট্ট নামেও পরিচিত। কোনো স্বতন্ত্র ব্যাকরণ রচনা না করিলেও তিনি এই বিষয়ে একাধিক বিশাল গ্রন্থের প্রণেতা। সেই সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত', 'বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখর', 'লঘুশব্দেন্দুশেখর', 'পরিভাষেন্দুশেখর'[৯], 'বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্তমঞ্জূষা', 'বৈয়াকরণসিদ্ধান্তলঘুমঞ্জূষা', 'বৈয়াকরণসিদ্ধান্ত পরমলঘু-মঞ্জূষা' (বা পরমলঘুমঞ্জূষা) এবং 'স্ফোটবাদ'[১০]। ইহাদের প্রথমটি কৈয়ট-কৃত 'মহাভাষ্যপ্রদীপে'র টীকা, দ্বিতীয় ও তৃতীয়খানি দুই-ই বৈঃ সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকা, চতুর্থখানি পাণিনীয়পরিভাষাপাঠের ব্যাখ্যা এবং বাকী কয়খানি ব্যাকরণ দর্শনের গ্রন্থ। ভর্তৃহরির পরে নাগেশই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বৈয়াকরণ। মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতে তাঁহার একটি উক্তি এইরূপ : 'বৈয়াকরণাস্তু শাস্ত্রবলেন তদ্‌বললব্ধযোগেন চ গুহান্ধকারং বিদার্য সর্বং জানাতীতি ভাবঃ।'—অর্থাৎ বৈয়াকরণগণ শাস্ত্রবলের দ্বারা এবং তদ্‌বললব্ধ যোগের দ্বারা গুহান্ধকার বিদারণ করিয়া সব কিছু জানিয়া থাকেন।[১১]

নব দিগন্তের আভাস ও ব্যাকরণ-কৌমুদী

নব দিগন্তের আভাস বলিতে এখানে আমরা ত্রিমুনিব্যাকরণের কঠোর নিয়মানুগ রক্ষণশীলতা হইতে মুক্তির সুস্থ এবং স্বাভাবিক চেষ্টাকেই বুঝিব। পাণিনির পরবর্তী বৈয়াকরণদের মধ্যে কেহই শব্দজ্ঞান বিষয়ে পাণিনি-নিরপেক্ষ বড় রকমের কোনো মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। অবশ্য এইরূপ কিছু করা, আর পাণিনি তথা ত্রিমুনির বিরুদ্ধাচরণ—প্রায় একই কথা। কার্যতঃ ইহাকে 'বলীয়সা স্পর্ধা'ই বলা চলে। ইহার কারণ, সংস্কৃত ভাষার স্বাভাবিক ধারার অবলোপ। পাণিনির সময় হইতেই ইহার সূচনা। আবার তিনিও স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে এই মৃতপ্রায় স্তম্ভিত ভাষার এমন সর্বগ্রাসী ব্যাকরণ রচনা করিলেন যে, তাহার পরে এই বিষয়ে নূতন করিয়া বলিবার মতো প্রায় কিছুই বাকী রহিল না। যে-টুকুও বা অকথিত ছিল (?), কাত্যায়ন-পতঞ্জলি তাহাও বলিয়া দিলেন। ব্যাকরণের এই শাসন বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে ; স্থল-বিশেষে বর্তমানযুগেও ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

কথায় বলে 'বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো'। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই প্রবাদবাক্যেরও তেমন কার্যকারিতা দেখা যায় না। বেদবিরোধী নাস্তিক ধর্ম-বিপ্লবের ফলে যে ভাঙ্গা সংস্কৃত তথা বৌদ্ধ সংস্কৃতের উদ্ভব হয়, কালক্রমে তাহার ধারাও ব্যাকরণের মরুপথে হারাইয়া যায়, কিছু কিছু নূতন অর্থাৎ পাণিনি-বিরুদ্ধ শব্দ ইতস্ততঃ ছড়াইয়া থাকে অর্থাৎ শিক্ষিত মহলেও তাহার ব্যবহার চলিতে থাকে। এই সব শব্দকে ব্যাকরণে গ্রহণের একটা চেষ্টা পরবর্তীকালে দেখা যায়। মধ্য এশিয়াতে আবিষ্কৃত কুমারলাত-রচিত ব্যাকরণের ভগ্নাংশ হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ নাগাদ তিনি তাঁহার ব্যাকরণে বৌদ্ধ সংস্কৃতে ব্যবহৃত পাণিনি-বিরুদ্ধ বহুপ্রচলিত শব্দকে সাধু বলিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টিত ছিলেন। খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীতে চন্দ্রগোমী এবং দেবনন্দী তাঁহাদের ব্যাকরণে পাণিনি-বিরুদ্ধ কতকগুলি শব্দকে সাধু বলিয়া গ্রহণ করেন। ১১শ শতকে ভোজদেবও এই ক্ষেত্রে অনুরূপ চেষ্টার পরিচয় দেন। তাঁহার আগে ৭ম শতকে কুমারিল ভট্ট ত্রিমুনিব্যাকরণের খুব বেশী বিরুদ্ধতা করিয়াও গঠনমূলক কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কারণ তিনি বৈয়াকরণ ছিলেন না। পরে তাঁহার কথা বলিব। ১৬শ/১৭শ

শতাব্দীয় নারায়ণভট্ট—যিনি 'প্রক্রিয়াসর্বস্ব' রচনা করেন তিনি চন্দ্রগোমী ও ভোজদেবের পূর্বোক্ত চেষ্টাকে অকুণ্ঠ প্রশংসা জানাইয়া এই সম্পর্কে 'অপাণিনীয়প্রমাণতা' নামে এক স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে অপাণিনীয় শব্দাবলীর সাধুত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে। 'প্রক্রিয়াসর্বস্বে'ও তাঁহার এই উদার মতের পরিচয় বর্তমান।১২ শুনা যায়, ব্যাকরণে খুব উদারদৃষ্টি অবলম্বনের জন্যই নাকি তাঁহার 'প্রক্রিয়াসর্বস্ব' রক্ষণশীল পণ্ডিতসমাজে সম্যক্ আদৃত হয় নাই।

কুমারিল ভট্ট ছিলেন ত্রিমুনিব্যাকরণ ও তাহার সমর্থকদের ঘোর বিরুদ্ধবাদী। তিনি তাঁহার গ্রন্থাদিতে বিশেষতঃ 'তন্ত্রবার্ত্তিকে' বক্রযুক্তি-সহায়ে প্রায়শঃ এই ব্যাকরণশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের যে প্রবণতা দেখাইয়াছেন তাহাকে ঈর্ষ্যাপ্রসূত অপপ্রচার বলিলেই বোধ হয় ভাল হয়। সাধারণভাবে ব্যাকরণের পক্ষেও তাঁহার উক্তি আছে[১৩]; কিন্তু পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রতি তিনি খড়্গহস্ত। তন্ত্রবার্ত্তিকের ১ম অধ্যায়ের ৩য় পাদে তিনি ত্রিমুনি এবং অন্যান্য বৈয়াকরণদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করিয়া ব্যাকরণাধ্যয়নকে অবৈদিক কার্য বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্বের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন ঃ

> ন চ বেদাঙ্গভাবোঽপি কশ্চিদ্ ব্যাকরণং প্রতি।
> তাদর্থ্যাবয়বাভাবাদ্ বুদ্ধাদিবচনেষ্বিব।।
> শ্রুতিলিঙ্গাদিভিস্তাবৎ তাদর্থ্যং নাস্য গম্যতে।
> অকৃত্রিমস্য বা কশ্চিৎ কৃত্রিমোঽবয়বঃ কথম্।।

তাঁহার মতে বেদরক্ষার্থ বা আমাদের নিত্যব্যবহার্য ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য ব্যাকরণের কোনো প্রয়োজন নাই। মশক, আশ্বলায়ন, নারদ, মনু এবং রাজকুমার পালকাপ্যের মতো প্রাচীন পণ্ডিতগণ পাণিনিসূত্রের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করেন নাই। অন্যত্র লিখিয়াছেন ঃ

> কোঽপ্রত্যক্ষগম্যোঽর্থে শাস্ত্রাৎ তত্ত্বাবধারণম্।
> শাস্ত্রলোকস্বভাবজ্ঞ ঈদৃশং বক্তুমর্হতি।।

এই প্রসঙ্গে তিনি বাক্যপদীয়ের (১।১৩) বচন উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন এবং ভর্তৃহরির 'তত্ত্বাববোধঃ শব্দানাং নাস্তিব্যাকরণাদৃতে' উক্তির পরিবর্তন করিয়া (parody) লিখিয়াছেন ঃ 'তত্ত্বাববোধঃ শব্দানাং নাস্তি শ্রোত্রেন্দ্রিয়াদৃতে!' যে সব শব্দ পাণিনি-ব্যাকরণ-সিদ্ধ নয় তাহাদিগকে অপাণিনীয় বলা চলে, কিন্তু অপশব্দ বলা চলে না,

কুমারিলের মতে ঃ'সূত্রবার্ত্তিকভাষ্যেষু দৃশ্যতে চাপ শব্দনম্। অশ্বারূঢ়াঃ কথং হ্যশ্বান্ বিস্মরেয়ুঃ সচেতনাঃ।। সূত্রেতাবজ্জনিকর্তুঃ প্রকৃতিরিত্যত্র দ্বাবপশব্দৌ...।' অর্থাৎ সূত্রবার্ত্তিক-ভাষ্যেও অপশব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সচেতন অশ্বারোহিগণ কিরূপে অশ্বসমূহ বিস্মৃত হইলেন? অর্থাৎ শব্দের সাধুত্ব-বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়া উপদেষ্টা বৈয়াকরণগণ নিজেরাই যে অপশব্দের প্রয়োগ করিলেন, তাহা সচেতন অশ্বারোহিগণের পক্ষে নিজ নিজ অশ্বগুলিকে ভুলিয়া যাওয়ার মতোই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। যেমন সূত্রে—'জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ' (পা. ১।৪।৩০) এই স্থলে দুইটি অপশব্দ। ...ইত্যাদি।

কুমারিলের এই উক্তির প্রতিবাদে এই যুগের 'ব্যাকরণশিরোমণি' উপাধিধারী টি. বেঙ্কটাচার্য 'শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-ওরিয়েন্ট্যাল ইনষ্টিটিউটের জার্নালে' (In the Journal of S.V. Oriental Institute, Vol.XIV, No.1, January-June, 1953) 'ভট্টকুমারিলপ্রদর্শিতমুনিত্রয়প্রয়োগাঃ' নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়া সর্বশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ঃ

দোষদর্শনতৃষ্ণাচেদভিমানেন দর্শ্যতে।...
সূত্রবার্ত্তিকভাষ্যেষু বস্তুতোনাপশব্দনম্।
মুনিত্রয়প্রয়োগাণাং সাধুত্বং প্রতিপাদিতম্।।

অর্থাৎ অভিমানের বশেই দোষদর্শনের তৃষ্ণা প্রকটিত হইয়াছে।...বস্তুতঃ সূত্রবার্ত্তিকভাষ্যে অপশব্দের প্রয়োগ নাই, (সুতরাং) মুনিত্রয়ের প্রয়োগসমূহের সাধুত্ব প্রতিপাদিত হইল। লোকব্যবহৃত শব্দের প্রসঙ্গে অবশ্যই বলা চলে যে, কাত্যায়ন-পতঞ্জলিও কিন্তু 'লোকবিজ্ঞানাৎ সিদ্ধম্' (মহাভাষ্য ১।১।২১, ১।১।৬৫) বলিয়া লৌকিক প্রয়োগকেই শেষ নিয়ন্তা রূপে স্বীকার করিয়াছেন। ধাতুবিষয়ক গ্রন্থ 'দৈব'র 'পুরুষকার' টীকায় কৃষ্ণলীলাশুক (১২শ/১৩শ শতক) এই লৌকিক প্রয়োগের গুরুত্ব-বিবেচনায় ইহাকে ভগবান্ ('প্রয়োগ এব ভগবান্') বলিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই।

বলা বাহুল্য, এই সবই ব্যাকরণতত্ত্ব, শব্দের সাধুত্ব-অসাধুত্ব প্রভৃতি বিষয়ে কূটতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ বা বিতণ্ডামূলক ; বস্তুতঃ গঠনমূলক কিছুই নয়। সেই কার্যকরী দিক্‌টি 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' রহিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষার শুষ্ক খাতে নূতন সঞ্জীবনী ধারার প্রবাহ তো দূরের কথা, দোর্দণ্ডপ্রতাপ ত্রিমুনিব্যাকরণের প্রভাবকে কিঞ্চিন্মাত্র

প্রতিহত করিবার বা ইহার গণ্ডীর বাহিরে সংস্কৃতের দেহটিকে টানিয়া আনিয়া তাহাতে নূতন শক্তি যোজনার কোনো চেষ্টাই যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয় নাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষীর এই জাতীয় প্রচেষ্টা নিছক বাদ-প্রতিবাদে পর্যবসিত হইয়াছে অথবা বিদ্যুৎচমকের মতো নব দিগন্তের আভাস দিয়া, পরক্ষণে না হউক, অন্ততঃ কিছুকাল পরেও মিলাইয়া গিয়াছে।

নূতনের গ্রহণ ও পুরাতনের বর্জন-বিষয়ে বিশেষ কিছু করিবার বা বলিবার সুযোগ না পাইয়া পরবর্তী বৈয়াকরণদের কেহ বিষয়বিন্যাসে, কেহ বা নূতন নূতন সংজ্ঞার উদ্‌ভাবনে, আবার কেহ বা সূত্রের সরলীকরণ-ইত্যাদিতে নিজেদের প্রতিভানুযায়ী বেশ কিছু অভিনবত্বের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সর্বশেষে সূক্ষ্ম ন্যায়দর্শনের প্রভাবও তাঁহাদের রচনায় আসিয়া সহজ বিষয়কে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। সে যাহাই হউক, মোটামুটি সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়াই ব্যাকরণের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হওয়ায় প্রাচীনের ভিত্তিতে নূতন নূতন ব্যাকরণ রচনার দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধনের পথটিকে সুগম করা ভিন্ন অন্য বড় কিছুই তাঁহাদের করণীয় বলিয়া বিবেচিত বা বোধগম্য হয় নাই। এই কারণে বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের অনুকূলে কত অল্প সময়ে সেই কার্য সমাধা করা যায়, তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেই তাঁহাদের প্রায় সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি নিয়োজিত হইয়াছিল।[১৪] পাণিনি-পরবর্তী ব্যাকরণধারার ইতিহাস বস্তুতঃ সেই প্রচেষ্টারই ইতিহাস, যাহার শেষ পরিণতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো পণ্ডিতদের দ্বারা মাতৃভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য 'ব্যাকরণকৌমুদী' জাতীয় গ্রন্থ রচনায়।

বঙ্গীয় শিক্ষাক্ষেত্রে 'ব্যাকরণকৌমুদী'র স্বরূপ প্রায় সর্বজনবিদিত। তাই ইহার উৎপত্তি বিষয়ে কিছু বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাঙ্‌লা ভাষায় রচিত হইলেও ইহা যে পূর্বকথিত অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণ অপেক্ষা কম কার্যকর হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। বর্তমান সময়েও ব্যাকরণকৌমুদী স্বক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মাতৃভাষায় রচিত হওয়াতে টোলের পণ্ডিত বা অধ্যাপকের সাহায্য ভিন্নই ইহা অধ্যয়ন করা চলে। সংস্কৃত শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা বড়ই সুবিধাজনক ব্যবস্থা। ক্রমে বাঙ্‌লার বাহিরেও এই রীতি অনুসৃত হয়।[১৫] ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অবশ্য অনেক আগেই এই পদ্ধতিতে সংস্কৃত শিক্ষার পুস্তকাদি প্রণয়নে যত্নপর হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার তথা শিক্ষা-সংস্কারের ন্যায়, ব্যাকরণ-সংস্কারের চেষ্টা হইতে ব্যাকরণকৌমুদীর উদ্ভব হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা তাঁহার ঐ শিক্ষা-সংস্কারেরই একটি অবশ্যম্ভূত অমৃত ফল। তাঁহাকে ছাত্রাবস্থায় কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধব্যাকরণ পড়িতে হয়। ইহা ১৮৩০-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এই ব্যাকরণপাঠের স্মৃতি তাঁহার নিকট সুখকর ছিল না। সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিক্ষাসংসদের নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহাতে পাঠ্য বিষয়ের সংস্কার-সম্বন্ধে মতামত দিতে গিয়া তিনি ব্যাকরণ-সম্বন্ধে বলেন যে, বড় বড় টীকা-টিপ্পনীসহ মুগ্ধবোধ এক অসম্পূর্ণ ব্যাকরণ ঃ 'Mugdhabodha, with all its voluminous commentaries...is an incomplete grammar.'[১৬] কাজেই ইহার পাঠে বৃথা পরিশ্রম না করিয়া বাঙ্গালী ছাত্ররা বাঙলা ভাষায় রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িবে এবং সেই সঙ্গে সুনির্বাচিত সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য পড়াইয়া তাহাদের সাহিত্যবোধ জাগাইতে হইবে। পরে আরও উচ্চমানের ব্যাকরণে জ্ঞানলাভের জন্য তাহারা সিদ্ধান্তকৌমুদী পড়িবে কারণ, সমস্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে ইহা সুনিশ্চিত ভাবে শ্রেষ্ঠ এবং এই বিষয়ে সর্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ ঃ'...of all Sanskrit grammars this is decidedly the best and the highest authority on the subject.'[১৭]

সংস্কৃত কলেজ হইতে কৃতবিদ্য হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারের (প্রধান পণ্ডিতের) পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার বাসায় অনেকে সংস্কৃত শিখিতে আসিতেন। তাঁহাদের শিক্ষার জন্য তিনি যে উপায় উদ্ভাবন করেন তাহা কার্যতঃ যথেষ্ট ফলপ্রদ হওয়ায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহাতিশয্যে তাহা লিপিবদ্ধ করা হয়—যাহা হইতে 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' নামে তাঁহার প্রথম ব্যাকরণ-গ্রন্থের প্রকাশ (কলিকাতা, নবেম্বর ১৮৫১)। ইহার সাহায্যে উচ্চ শ্রেণীর কাব্য-নাটক-দর্শনাদিতে অধিকার লাভ অসম্ভব বিবেচনায় তিনি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকরণকৌমুদীর ১ম ভাগ প্রকাশ করেন। ইহার ২য় ভাগও ঐ সময়েই প্রকাশিত হয়। ৩য় ও ৪র্থ ভাগ ছাপা হয় যথাক্রমে ১৮৫৪ ও ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে।

ইহার ৪র্থ ভাগ মুখ্যতঃ সংস্কৃতসূত্রবহুল। অন্য তিন ভাগে পরে পাদটীকায় ঐরূপ সংস্কৃত সূত্র জুড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার কারণ, বাঙ্‌লা সূত্র অপেক্ষা সংস্কৃত সূত্র অভ্যাস করা ও মনে রাখা সহজ। এই ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি পাণিনির অনেক সূত্রকে যথাসাধ্য সহজবোধ্য করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন। কোথাও পাণিনির এক একটি দীর্ঘ সূত্রকে ভাঙ্গিয়া ছোট করিয়াছেন, বা একাধিক ক্ষুদ্র সূত্র রচনা করিয়াছেন, কোথাও বা দুর্বোধ সূত্রের পরিবর্তে সম্পূর্ণ নূতন ও সরল সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে নূতন নূতন সংজ্ঞাসূত্র রচনা করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই।

৪র্থ ভাগের মোট ৮৩০টি সূত্রের মধ্যে ১৬২টি অবিকল পাণিনিসূত্র, ১১টি বার্ত্তিক এবং বাকী ৬৫৭টি সূত্রই ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণচন্দ্র দে উদ্‌ভটসাগর ব্যাকরণকৌমুদীর সম্পাদনা করিবার সময় ইহার ৩য় ভাগে পরস্মৈপদ- ও আত্মনেপদ-বিধানে সংস্কৃত সূত্র জুড়িয়া দেন। গত শতাধিক বৎসরে এই ভাবে নানা সম্পাদকের হাতে পরিবর্ধিত হইয়া ব্যাকরণকৌমুদী বর্তমান বৃহৎ আকারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।[১৮]

সংস্কৃতে অন্য ভাষার ব্যাকরণ

ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার উপর সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের প্রভাব অপরিসীম। ভারতীয় বৈয়াকরণদের মধ্যে প্রাচীন কাল হইতে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, সংস্কৃত ভাষাই সমস্ত ভাষার উৎপত্তিস্থল। প্রাকৃত ভাষার (বররুচি হইতে মার্কণ্ডেয় পর্যন্ত) সমস্ত বৈয়াকরণই 'প্রকৃতি' হইতে 'প্রাকৃত' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিয়াও প্রকৃতি বলিতে সংস্কৃতকেই বুঝিয়াছেন। তাই প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণগুলিতে প্রায়শঃ প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দ সমূহের তুলনা করা এবং কিরূপে সংস্কৃত শব্দ হইতে এক একটি প্রাকৃত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার নির্দেশ দেওয়াই প্রধান কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন, প্রাকৃত 'খম্ভ' শব্দের উৎপত্তি খুঁজিতে গিয়া বৈদিক 'স্কম্ভ' শব্দ পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত 'স্তম্ভ' শব্দের অবতারণা করা হইয়াছে। সদৃশ বৈদিক শব্দ এড়াইয়া, অপেক্ষাকৃত অসদৃশ সংস্কৃত শব্দের অনুচিত আশ্রয় গ্রহণের এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রাকৃত ব্যাকরণে প্রচুর। এক একটি প্রাকৃত শব্দের উৎস-সন্ধানে বৈয়াকরণগণ সর্বতোভাবে তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান প্রয়োগ করিয়াছেন। এই রূপে প্রাকৃত ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের চির-অধীনতাপাশে বদ্ধ থাকায় প্রাকৃত ভাষাকে স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনার কোনো চেষ্টাই ভারতের প্রাচীন পণ্ডিতদের দিক্ হইতে হয় নাই বলা চলে। ফলে একখানা প্রাকৃত ব্যাকরণও প্রাকৃতভাষায় রচিত হয় নাই। এমন কি উহার টীকাটিপ্পনীতেও প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হয় নাই। সর্বত্রই সংস্কৃতের জয়জয়কার।

'বিশ্বভারতীপত্রিকা'তে (১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ, ১৩৬২) প্রকাশিত 'অল্‌বীরূণী ও সংস্কৃত' নামক প্রবন্ধে (পৃঃ ৯১) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ঃ

> অল্‌-বীরূণীর (৯৭৩-১০৪৮ খ্রীঃ আনুমানিক) মৃত্যুর শত বৎসরের মধ্যে, উত্তর ভারতে—সম্ভবতঃ কাশীতে—বসিয়া, লোকভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত শিখাইবার জন্য দামোদর পণ্ডিত নামে এক আচার্য্য 'উক্তিব্যক্তিপ্রকরণ' আখ্যা দিয়া যে একখানি বই লেখেন, তাহাতে তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন ; যেমন

'কৃতপ্রায়শ্চিত্তা পতিতা ব্রাহ্মণী পুনরায় ব্রাহ্মণত্ব ফিরাইয়া পায়', সেইভাবে প্রচলিত অপভ্রংশ ভাষার শব্দ ও রূপ সংস্কৃতে পুনরায় উন্নীত হইতে পারে।

কেবল পালিব্যাকরণের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যতিক্রম দেখা যায়। তবে পালি-বৈয়াকরণগণও যে বিভিন্ন সংস্কৃত ব্যাকরণের নিকট ঋণী ছিলেন তাহার প্রমাণের অভাব নাই। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের ভাষা-তাত্ত্বিক আলোচনা ও গবেষণার ফলে এই জড়তার অবসান ঘটিয়াছে, প্রাকৃতের দুয়ারে চাপানো সংস্কৃতের জগদ্দল পাথর অপসৃত হইয়াছে।

প্রাকৃত ভাষার মতো অন্যান্য অনেক অসংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণও একদা সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। তেলুগু, কানাড়ী, মালয়ালম্, পার্সি এবং কাশ্মীরী ভাষার ব্যাকরণ ইহার নিদর্শনস্থল। বার্নেল সাহেবের মতে দ্রাবীড় ভাষা তামিল ও কানাড়ীর ব্যাকরণ, এবং পালি, বর্মী, সিংহলী ও তিব্বতী ভাষার ব্যাকরণও সংস্কৃত ব্যাকরণের পদ্ধতিতে রচিত এবং এই পদ্ধতিও আবার প্রাচীন ঐন্দ্র ব্যাকরণ-ধারার দান।[১৯]

আন্ধ্র রায়ের সভাপণ্ডিত কণ্ব সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় যে তেলুগু ব্যাকরণ রচনা করেন তাহা বহু পূর্বেই অবলুপ্ত। বর্তমানে এই ভাষার যে প্রাচীনতম ব্যাকরণ পাওয়া যায়, তাহা নন্নপ ভট্ট বা নন্ন্যভট্টারক-কর্তৃক সংস্কৃতে রচিত। গ্রন্থকার দাক্ষিণাত্যের পূর্বাঞ্চলীয় চৌলুক্যরাজ রাজরাজনরেন্দ্রের (১০২২-৬৩) সমকালীন। অহোবিলাচার্য এই ব্যাকরণের বৃত্তি রচনা করেন। অথর্বণাচার্যের 'আথর্বণকারিকা' বা 'ত্রিলিঙ্গ-শব্দানুশাসন', মণ্ডলক্ষ্মী নরসিংহ কবি-রচিত 'আন্ধ্রকৌমুদী', শিষ্ট কৃষ্ণমূর্তিশাস্ত্রীর (১৮০০-৮০) 'হরিকারিকা', ভাগবতুল রামমূর্তিশাস্ত্রীর (১৯শ শতক) 'হরিকারিকাশেষ সর্বস্ব' প্রভৃতি সবই সংস্কৃতে রচিত তেলুগু ব্যাকরণ। আথর্বণকারিকা খ্রীঃ ১২শ শতকের রচনা। আন্ধ্রকৌমুদীর সূত্রসংখ্যা ৪২৬। আথর্বণ, কাণ্ব ও বার্হস্পত্য গ্রন্থের ভিত্তিতে নরসিংহকবি ইহা প্রণয়ন করেন।[২০]

কানাড়ী ভাষার ব্যাকরণ 'কর্ণাটকভাষাভূষণ' এবং 'কর্ণাটকশব্দানুশাসন' যথাক্রমে নাগবর্মা (১০৭০-১১২০) এবং ভট্ট অকলঙ্কদেব-কর্তৃক সংস্কৃতে রচিত। প্রথমখানি অতিশয় জনপ্রিয়। ইহার তিনটি সংস্করণ— জৈন, লিঙ্গায়েৎ ও ব্রাহ্মণ এবং ১০টি বিভাগ ঃ সংজ্ঞা, সন্ধি, বিভক্তি, কারক, শব্দরীতি, সমাস, তদ্ধিত, আখ্যাত, অব্যয় ও নিপাত। অকলঙ্ক

দেবের গ্রন্থ ১৫২৬ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে) সমাপ্ত হয়। ইহা পাণিনি-ব্যাকরণের অনুসরণে রচিত পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ। 'ভাষামঞ্জরী' নামে ইহার বৃত্তিও অকলঙ্কেরই রচনা। তিনিই আবার 'ভাষামঞ্জরী'র উপর 'ভাষামকরন্দ' বা 'মঞ্জরীমকরন্দ' নামে পতঞ্জলির মহাভাষ্যের অনুকরণে সংস্কৃতে আর এক বিশাল ব্যাখ্যাপুস্তক (টীকা) রচনা করেন। অকলঙ্ক জৈনধর্মাবলম্বী।

মালয়ালম্ ব্যাকরণ 'লীলাতিলকম্' সংস্কৃতে রচিত। রচনা-কাল খ্রীঃ ১৪শ শতক। ইহাতে অলঙ্কার-শাস্ত্রের আলোচনাও আছে। আত্তুরকৃষ্ণ পিষ্নারোটি-কর্তৃক মালয়ালম্ ভাষায় অনূদিত এবং সম্পাদিত হইয়া ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিচূড় হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্কৃতে রচিত কাশ্মীরী ব্যাকরণের নাম—'কাশ্মীরশব্দামৃত' বা 'শারদাক্ষেত্রভাষাব্যাকরণ।' ১৯৩২ সংবতে (খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৫) কাশ্মীরের মহারাজা রণবীর সিংহের পোষকতায় ঈশ্বর লৌকিক নামক জনৈক পণ্ডিত এই ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন।

মুসলমান রাজত্বে হিন্দুছাত্রদিগকে পার্সিভাষা শিক্ষা দিবার জন্য সংস্কৃতে একাধিক পার্সি ব্যাকরণ রচিত হয়। এইরূপ দুইখানি পার্সি ব্যাকরণ—(১) বিহারীকৃষ্ণদাস-রচিত 'পারসীকপ্রকাশ' এবং (২) আসামবাসী কবিকর্ণপূর-প্রণীত শ্লোকবদ্ধ পার্সি ব্যাকরণ। প্রথমখানি দিল্লীর বাদশাহ্ আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) আদেশে রচিত। ইহার সর্বশেষ পুষ্পিকায় লিখিত আছে ঃ 'ইতি শ্রীমহীমহেন্দ্র শ্রীমদকবরসাহকারিতে বিহারীকৃষ্ণদাস-বিরচিতে পারসীকপ্রকাশে কৃৎপ্রকরণং সমাপ্তম্।' ইহার ৮ অধ্যায় ঃ সংখ্যাশব্দনির্ণয়, শব্দপ্রকরণ, অব্যয়প্রকরণ, কারকপ্রকরণ, সমাসপ্রকরণ, তদ্ধিতপ্রকরণ, আখ্যাতপ্রকরণ ও কৃৎপ্রকরণ। সূত্রসংখ্যা ৪৮১। শ্লোকবদ্ধ পার্সি ব্যাকরণ সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের (১৬০৫-২৭) সময়ে রচিত। গ্রন্থকার 'কবিকর্ণপূরঃ কামরূপবাসী করণবংশজঃ'। কাজেই তিনি বৈষ্ণব কবিকর্ণপূর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। জাহাঙ্গীরের নির্দেশে বৈয়াকরণ কর্ণপূর এক সংস্কৃত-পার্সি অভিধানও ('সংস্কৃত পারসীক পদ প্রকাশঃ') প্রস্তুত করেন। বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার মাধবপুর গ্রাম-নিবাসী ঘনানন্দ দাস ১৬৮০ শকাব্দে (১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিত্যানন্দকে আরবী ও পার্সি শব্দবিদ্যা শিক্ষা দিতে 'বাক্চাতুর্যতরঙ্গিণী' নামে সংস্কৃতে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাতে

৮টি অধ্যায় এই রূপ: শব্দাদিকোষঃ, লিপিসঙ্কেতঃ, বিভক্তিঃ, বিভক্ত্যর্থ-নিরূপণম্, তদ্ধিতপ্রত্যয়নিরূপণম্, আখ্যাতনিরূপণম্, কৃৎপ্রত্যয়-নিরূপণম্ এবং বংশপ্রশস্তিঃ।

পাণিনির পূর্ববর্তী কোনও ব্যাকরণগ্রন্থই এখন পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে যে সব প্রাচীন সম্প্রদায়ের নামমাত্র সন্ধান মিলে, তাহাদের মধ্যে ঐন্দ্র ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ই ছিল সর্বাধিক প্রভাবশালী। সম্ভবতঃ তাহাই ছিল সংস্কৃতের প্রাচীনতম ব্যাকরণধারা। সরল-স্বাভাবিকতা এবং অকৃত্রিম সংজ্ঞা-সমূহের ব্যবহারই ছিল এই ধারার রচনা-বৈশিষ্ট্য। পাণিনির পূর্বসূরিগণ ইহার দ্বারা কম-বেশী প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। পাণিনিও ইহার দ্বারা কম প্রভাবিত হন নাই, না হইয়া উপায়ও ছিল না, কারণ 'পূর্বব্যাকরণানুসার্যেবোত্তর ব্যাকরণ-নির্মাণম্'। পূর্ববর্তীর প্রভাব পরবর্তীর পক্ষে অপরিহার্য। তথাপি পাণিনি স্বীয় অলৌকিক প্রতিভাবলে প্রত্যক্ষ ভাবে এই মূলধারাটির গতি রোধ করিতে সমর্থ হন। কেবল তাহাই নয়, গঙ্গাধরের মতো তিনি ইহাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া অভিনব উপায়ে যে নূতন প্রবাহের সৃষ্টি করিলেন, পূর্বের তুলনায় তাহা অনেকাংশে কৃত্রিম এবং কঠোর বলিয়া প্রতিভাত হইল। ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের যে উচ্চতম মান ইহার দ্বারা নির্দিষ্ট হইল, তাহা ক্রমে সার্বজনীন আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতে লাগিল। কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি আসিয়া ইহার দুরধিগম্য সুরকে পূর্ববৎ উচ্চ গ্রামেই নিবদ্ধ রাখিতে সাহায্য করিলেন যাহার ফলে ব্যাকরণ-দর্শনের অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'বাক্যপদীয়ে'র আবির্ভাব।

সমাজের উচ্চস্তরের বিদ্বন্মণ্ডলীতে পাণিনিতন্ত্রের অর্থাৎ ঐ উন্নত ব্যাকরণ-বিজ্ঞান ও দর্শনের যথেষ্ট আদর হইলেও সাধারণ ক্ষেত্রে গণপ্রয়োজনে ইহার উপযোগিতা ক্রমেই কমিয়া যাইতে থাকে। যুগের দাবী সহজতর ব্যাকরণের দিকে। গত দুই হাজার বৎসরের ব্যাকরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহার যে বৈশিষ্ট্যটি সর্বপ্রধান বলিয়া মনে হয়, তাহা হইল ব্যাকরণের ঐ যুগোপযোগী সরলীকরণের একটা ক্রমবর্ধমান আগ্রহ। ইহার প্রধান কারণ, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও জনগণের মধ্যে একটা দুরতিক্রম্য ব্যবধানের সৃষ্টি। তাই প্রাচীনতম ঐন্দ্র ব্যাকরণের সেই সরল-স্বাভাবিক ধারাটি পাণিনীয় প্রতিভার দ্বারা কিছুকালের জন্য স্তম্ভিত

হইলেও, প্রয়োজনের তাগিদে তাহা আবার চঞ্চল হইয়া উঠে। অপর দিকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মবিপ্লব ইহাতে যোগাইল প্রচুর শক্তিসাহায্য। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে দাক্ষিণাত্যে সর্ববর্মা কাতন্ত্রব্যাকরণ রচনা করিয়া সেই প্রাচীনধারার পুনরাবৃত্তি করিলেন। শুরু হইল পাণিনিপরবর্তী ব্যাকরণধারার রূপায়ণের যুগ।

সার্ববর্মিক কাতন্ত্র হইতে এই যুগের সূচনা এবং খ্রীঃ ১২শ শতকে রচিত হৈম ব্যাকরণ পর্যন্ত ইহার প্রথম ভাগের বিস্তৃতি। ব্যাকরণের আদিযুগকে পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলি পর্যন্ত চিহ্নিত করিয়া তৎপরবর্তী এই ১২ শত বৎসর ব্যাপী সময়কে ব্যাকরণ-ইতিহাসের মধ্য যুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়কার সারস্বত ক্ষেত্র প্রধানতঃ বেদ-বিরোধী নাস্তিক বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতগণ-কর্তৃক অধ্যুষিত, ফলে এই যুগের ব্যাকরণও মুখ্যতঃ এই দুই সম্প্রদায়ের প্রভাবাক্রান্ত। সর্ববর্মার কাতন্ত্রের প্রায় সমকালীন বৌদ্ধ ইন্দ্রগোমীর ও চন্দ্রকীর্তির ব্যাকরণ—সাম্প্রদায়িক সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রাথমিক নিদর্শন। ইহাদের অপূর্ণতা এবং সংক্ষিপ্ততা হেতু আস্তিক হিন্দুধর্ম ও দর্শনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য উন্নততর ব্যাকরণে শিক্ষালাভ আবশ্যক হওয়ায় পাণিনীয় ব্যাকরণের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত সরল অথচ পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণরচনার চেষ্টা হইতেই প্রায় একই সময়ে (খ্রীঃ ৫ম শতক) বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ে চান্দ্র এবং জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের সৃষ্টি। একই সঙ্গে সারল্য এবং সম্পূর্ণতা—এই মধ্যযুগীয় ব্যাকরণধারার সর্বপ্রধান লক্ষণ। এই কারণে প্রথমে সংক্ষিপ্তাকারে রচিত সার্ববর্মিক কাতন্ত্র ক্রমশঃ বৃহত্তর আকার ধারণ করিয়াছে, ইন্দ্রগোমীপ্রভৃতির ক্ষুদ্র ব্যাকরণ লুপ্ত হইয়াছে এবং যুগের শেষ প্রান্তে রচিত হইয়াছে বিশালকায় 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' এবং 'হৈম' ব্যাকরণ। এই যুগের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ প্রতিভা—বররুচি, চন্দ্রগোমী, ভর্তৃহরি, জয়াদিত্য, দুর্গসিংহ এবং হেমচন্দ্র।

খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ভারতে মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের ঐ মধ্যযুগীয় প্রসার-প্রতিপত্তি ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে থাকে। রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে চলিতে থাকে ইসলাম ধর্মেরও বিস্তার। ফলে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা প্রবল সঙ্ঘাত-জনিত অস্থিরতা দেখা দেয়। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সহজেই বিজাতীয় ভাষার প্রচলন তথা প্রাধান্য ঘটে।

এই অবস্থায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষতঃ ধর্মীয় বাহন সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা-ক্ষেত্রকে সুগম রাখিবার জন্য বৈয়াকরণিক চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাঁহাদের হাতে উপাদানও ছিল প্রচুর। তাই, এই সময়ে এক দিকে পাণিনি এবং অপর দিকে কাতন্ত্রকে ভিত্তি করিয়া এবং অদূরবর্তী সাম্প্রদায়িক ব্যাকরণগুলির বৈশিষ্ট্যকে কতক পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী যতদূর সম্ভব সহজ এবং অল্পসময়সাধ্য ব্যাকরণরচনার যেন একটা প্রতিযোগিতা লাগিয়া গেল। ফলে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ভারতের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে কতকগুলি নূতন ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়। ইহাদের মধ্যে বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ', অনুভূতিস্বরূপাচার্যের 'সারস্বত', পদ্মনাভ দত্তের 'সুপদ্ম' এবং পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশের 'প্রয়োগরত্নমালা' ব্যাকরণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য মহারাষ্ট্রীয় বৈয়াকরণদের হাতে পাণিনীয় ব্যাকরণের যুগোপযোগী প্রক্রিয়াবদ্ধ 'কৌমুদী' সংস্করণ।

খ্রীঃ ১৩শ শতকে রচিত মুগ্ধবোধব্যাকরণ থেকে শুরু করিয়া ১৯শ শতকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'ব্যাকরণকৌমুদী' জাতীয় গ্রন্থরচনার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৭০০ বৎসর ব্যাপী এই বিদেশী শাসনের যুগকে আমরা ব্যাকরণ-ইতিহাসের অন্ত্যযুগ বলিতে পারি। একাধারে সারল্য ও সংক্ষিপ্ততা—এই যুগের ব্যাকরণধারার বিশেষ লক্ষণ। বোপদেব, ভট্টোজি দীক্ষিত এবং নাগেশ ভট্ট—এই যুগের উৎকৃষ্ট বৈয়াকরণ প্রতিভা, সায়ণাচার্য-রচিত 'মাধবীয় ধাতুবৃত্তি'—ব্যাকরণের শ্রেষ্ঠ আনুষঙ্গিক (খিল) গ্রন্থ এবং শ্রীজীবগোস্বামীর 'হরিনামামৃত'—শ্রেষ্ঠ সাম্প্রদায়িক ব্যাকরণ।

এই যুগেরই শেষ ভাগে ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের সবিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়—যাহার ফলশ্রুতি পশ্চিম দেশে সংস্কৃতের প্রচার এবং আধুনিক তুলনামূলক ভাষা- ও ব্যাকরণ-বিদ্যার উদ্ভাবন ।

আদিব্যাকরণাদীনাং প্রামাণ্যং যন্নিবন্ধনম্।
তস্মৈ বিশ্বাত্মনে বৃদ্ধপ্রয়োগব্রহ্মণে নমঃ।।

১ ভারতীয় বৈয়াকরণদের মধ্যে পতঞ্জলিই বোধ হয় সর্বপ্রথম ব্যাকরণবিদ্যাকে স্পষ্টতঃ আধ্যাত্মিকতায় বিমণ্ডিত করিয়া যান। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে এই বিষয়ে তৎপূর্ববর্তীদের প্রচেষ্টার কথা নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। উপনিষদের শব্দব্রহ্মোপাসনাই সম্ভবতঃ এই ক্ষেত্রে পতঞ্জলির চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। পরে ভর্তৃহরি স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যাত্ম জ্ঞান লইয়া এই দিকে আরও অগ্রসর হন। বাক্যপদীয়ের মূল সুরটি যতটা ব্যাকরণ-বিষয়ক ততোধিক আধ্যাত্মিক। এই বিষয়ে ৩য় ও শেষ ব্যক্তি নাগেশ ভট্ট।

২ অনেকের মতে ভট্টিকাব্যের রচয়িতা ভট্টিস্বামী পৃথক্ ব্যক্তি। ব্যাকরণ-শিক্ষা ও পাণিনীয় সূত্রসমূহের উদাহরণ প্রদর্শন এই কাব্যরচনার প্রধান উদ্দেশ্য। তাই ইহাকে 'কাব্য-শাস্ত্র' বলা হয়। কাব্য-শাস্ত্র = কাব্যপ্রধান শাস্ত্র। তাহার বিপরীত শাস্ত্রকাব্য = শাস্ত্রপ্রধান কাব্য। ভট্টিকাব্য এই দুই শ্রেণীর কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে। ক্ষেমেন্দ্র-রচিত 'সুবৃত্ততিলক' নামক অলঙ্কারশাস্ত্রীয় গ্রন্থে ভট্টিকাব্যকে কাব্যশাস্ত্র বলা হইয়াছে ঃ 'শাস্ত্রকাব্যং চতুর্বর্গপ্রায়ং সর্বোপদেশকৃৎ। ভট্টিভৌমক কাব্যাদি কাব্যশাস্ত্রং প্রচক্ষতে।।' ভৌমক কাব্য অর্থাৎ ভীমভট্ট-রচিত 'রাবণার্জুনীয়'ও ভট্টিকাব্যের মতো ব্যাকরণের উদাহরণাত্মক কাব্য। 'দ্বিসন্ধান-কাব্য' এবং 'দ্ব্যাশ্রয়কাব্য'ও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ধনঞ্জয়-রচিত 'রাঘবপাণ্ডবীয়' এবং হলায়ুধের 'কবিরহস্য'—দ্বিসন্ধানকাব্য। হেমচন্দ্র-প্রণীত 'কুমারপালচরিত'কে দ্ব্যাশ্রয়-কাব্য বলা হয়। এই সবের বিশেষত্ব ঐ ভট্টিকাব্যের মতোই। 'কাব্যমীমাংসায়' (৫ম অধ্যায়) রাজশেখর ত্রিবিধ শাস্ত্রকবির কথা বলিয়াছেন ঃ '...তত্র ত্রিধা শাস্ত্রকবিঃ। যঃ শাস্ত্রং বিধত্তে, যশ্চ শাস্ত্রে কাব্যং সংবিধত্তে, যোঽপি কাব্যে শাস্ত্রার্থং বিধত্তে।'

৩ বাক্যপদীয়ের ব্রহ্মকাণ্ডের ভর্তৃহরি-রচিত টীকায় লিখিত 'সংহিতাসূত্রভাষ্য-বিবরণে বহুধা বিচারিতম্' বাক্যের অন্তর্গত 'সংহিতাসূত্র' যদি অষ্টাধ্যায়ীর 'পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা' (১।৪।১০৯) সূত্রের নির্দেশক হয় তবে তাহার মহাভাষ্যটীকা যে অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম তিন পাদের বাহিরেও রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই কারণ ঐ সূত্রটি ৪র্থপাদের ১০৯ নং সূত্র।

৪ সৃষ্টিধরের এই উক্তি আংশিক ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই বৃত্তি অষ্টাধ্যায়ীর উপরে বিমলমতি-কর্তৃক রচিত। সূত্রসমূহের লৌকিক ও বৈদিক ভেদে দুই ভাগে রচিত বলিয়া ইহার 'ভাগবৃত্তি' নাম।

৫ ভট্টিকাব্যের এক পুঁথির (পাণ্ডুলিপির) পুষ্পিকায় ঃ 'ইতি বড়ভীবাস্তব্যশ্রীধরস্বামি-সূনোর্ভট্টিব্রাহ্মণস্য কৃতৌ রাবণবধে মহাকাব্যে...।'

৬ 'নামরূপে ব্যাকরবাণি'—ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।৩।২ ; 'নামরূপে ব্যাকরবাণীতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধা দ্বয়ী সৃষ্টিঃ'—কৌণ্ডভট্ট। ভারতীয় দৃষ্টিতে আগে নাম, পরে রূপ। আগে শব্দ পরে তদনুরূপ সৃষ্টি। শব্দপূর্বা সৃষ্টি। ১।৩।২৮ নং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন ঃ 'কথং পুনরবগম্যতে শব্দাৎ প্রভবতি জগদিতি। প্রত্যক্ষা-নুমানাভ্যাম্। তৌ হি শব্দপূর্বাং সৃষ্টিং দর্শয়তঃ।' তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২।২।৪।২) ঃ 'স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভূমিমসৃজত।' অর্থাৎ ঈশ্বর 'ভূ'শব্দ উচ্চারণ করিয়া মাটি সৃষ্টি করিলেন। বাইবেলেও আছে ঃ 'Let there be light and there was light.'

৭ অন্যত্র ইহার 'বিশ্রান্তবিদ্যাধর' নামও দেখা যায়। বামন ইহার লঘু এবং বৃহৎ দুই রকমের বৃত্তিই রচনা করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ২য়/৩য় শতকে এই ব্যাকরণ রচিত হয় বলিয়া অনুমান।

৮ এইরূপ কিংবদন্তী যে, ভট্টোজি সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রস্তুত করিয়া, পাণিনীয় ক্রমভঙ্গ-হেতু কোনো শিষ্ট-কর্তৃক ইহা স্বীকৃতি পাইবে না এই ভয়ে ভীত হইয়া, ইহার প্রচারের জন্য বারাণসীর তৎকালীন বিশিষ্ট বৈয়াকরণ ও পরিব্রাজক জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে ইহার ব্যাখ্যা রচনা করিতে অনুরোধ জানান। কিন্তু সূত্রাবলীর ক্রমলঙ্ঘনজনিত অপরাধের বা দোষের জন্যই তিনি সেই কার্যে কিছুতেই রাজী হন না। একদা তিনি ভিক্ষায় বাহির হইয়া দীক্ষিতের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে তিনি সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে ভিতরে ডাকিয়া আনিয়া এমন তাড়না করিতে থাকেন যে অগত্যা তিনি বৈঃ সিঃ কৌমুদীর ব্যাখ্যা (টীকা) রচনা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দীক্ষিতের প্রহার হইতে অব্যাহতি পান এবং সিঃ কৌমুদীর (স্বর-বৈদিক প্রক্রিয়াবাদে) 'তত্ত্ববোধিনী' টীকা রচনা করেন। অবশিষ্টাংশের 'সুবোধিনী' টীকা রচনা করেন মৌনী জয়কৃষ্ণ ভট্ট।

৯ খ্রীঃ ১৩শ শতকে রচিত সীরদেবের 'পরিভাষাবৃত্তি'—এই জাতীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

১০ কুমারিল ভট্টের শিষ্য মণ্ডনমিশ্র-রচিত 'স্ফোটসিদ্ধি' নামে এক গ্রন্থ আছে। এই ধরনের অন্যান্য গ্রন্থ—'স্ফোটচন্দ্রিকা', 'স্ফোটতত্ত্বনিরূপণ' এবং 'স্ফোটসিদ্ধি-ন্যায়বিচার'। ইহাদের প্রথম ও দ্বিতীয় খানির রচয়িতা যথাক্রমে কৃষ্ণভট্টমৌনী এবং শেষকৃষ্ণাচার্য। ভরতমিশ্র-রচিত 'স্ফোটসিদ্ধি' নামে আর এক গ্রন্থও আছে। কেশব-কৃত 'স্ফোটপ্রতিষ্ঠা' এবং আপদেব-রচিত 'স্ফোটনিরূপণ'ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

১১ '...Nagojibhatta was a Sastri or Pandit,...a man of very great learning and acuteness, did not care at all for history or had no conception of it, and like other commentators, he often cuts the gordian knot of a difficulty instead of untying it.'—R.G.Bhandarkar

১২ 'বিশ্রান্তস্যাপশব্দত্বং বৃত্ত্যুক্তং নাদ্রিয়ামহে। মুরারিভবভূত্যাদীন্ অপ্রমাণীকরোতি কঃ।।'—প্রক্রিয়াসর্বস্ব। 'পাণিন্যুক্তং প্রমাণং ন তু পুনরপরং চন্দ্রভোজাদি শাস্ত্রং কেঽপ্যাহুস্তল্লঘিষ্ঠং ন খলু বহু বিদামস্তি নির্মূলবাক্যম্। বহ্বঙ্গীকারভেদো ভবতিগুণবশাৎ পাণিনেঃ প্রাক্‌কথং বা পূর্বোক্তং পাণিনিশ্চাপ্যনুবদতি বিরোধেঽপি কল্প্যো বিকল্পঃ।।'—ঐ

বেদান্তদেশিকের তত্ত্বটীকায়ঃ 'নানা ব্যাকরণাভিজ্ঞবহুবিদ্বৎপরিগ্রহে। শব্দা-সাধুত্বমাহর্যে শাব্দিকান্তান্ ন মন্মহে।। বিশিষ্টোক্ত্যনুসারেণ ব্যুৎপত্তিঃ স্মর্যতে বুধৈঃ। অবিগীত প্রয়োগেতুবিগানং নৈব সাম্প্রতম্।।'

১৩ 'তস্মান্ন লোকবেদাভ্যাং কশ্চিদ্ ব্যাকরণাদৃতে। বাচকাননপভ্রষ্টান্ যথা বিজ্ঞাতুমর্হতি।। যথা চ পদ্মরাগাদীন্ কাচস্ফটিকমিশ্রিতান্। পরীক্ষকাবিজানন্তি সাধুত্বমপরে তথা।। যথারত্নপরীক্ষায়াং সাধ্বসাধুত্বলক্ষণম্। তথা ব্যাকরণাৎ সিদ্ধং সাধুশব্দনিরূপণম্।।'—তন্ত্রবার্তিক

'Kumarila permits the incorporation of Dravidian terms, provided that they are given Sanskrit terminations, and names such as [illegible], were freely thus Sanskritized.' —A.B.Keith

১৪ পাণিনীয় সূত্রাদির ব্যাখ্যায় অবশ্য টীকাকারগণ খুব সূক্ষ্মবুদ্ধি ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। এই কার্যে তাঁহারা নিজেদের মতানুযায়ী কোনো কোনো সূত্রের উগ্র সমালোচনাতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কাশিকার পরবর্তী টীকাকারগণ এই বিষয়ে সমধিক অগ্রসর। পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের দ্বারা সমালোচিত হইয়াছেন, আবার সম্ভবস্থলে সেই পরবর্তীরা তৎপরবর্তীদের সমালোচনা হইতেও রেহাই পান নাই। এইরূপে পুরুষানুক্রমে খণ্ডন-মণ্ডন চলিয়াছে। ফলে উচ্চতর ব্যাকরণ-বিদ্যার ক্ষেত্রে একটা জীবন্তভাব পরিলক্ষিত হইত। এখনও কাশীতে এই প্রকারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমালোচনা ও বাদপ্রতিবাদ হইয়া থাকে। এইসব টীকাকারকে 'প্রাচীনতরাঃ', 'প্রাঞ্চঃ', 'নব্যাঃ' এবং 'নব্যতরাঃ'—এই কয় ভাগে ভাগ করা চলে। (১) প্রাচীনতরাঃ—কাশিকান্যাস-প্রণেতা জিনেন্দ্রবুদ্ধি, কাশিকার পদমঞ্জরী টীকার প্রণেতা হরদত্ত মিশ্র এবং মহাভাষ্যপ্রদীপের রচয়িতা কৈয়টাচার্য। প্রথম জন তাঁহার রচনায় প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, সূত্র হইতেই বার্তিকের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে অর্থাৎ তিনি 'সর্বংসূত্রে প্রতিষ্ঠিতম্' বচনে বিশ্বাসী। দ্বিতীয় জন প্রথম জনকে খণ্ডন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তৃতীয় জন মহাভাষ্যের বক্তব্যকে সুষ্ঠু পরিবেষণে চেষ্টিত হইয়াও পরবর্তীদের বিশেষতঃ তাঁহারই টীকাকার নাগেশভট্টের সমালোচনা হইতে রক্ষা পান নাই। (২) প্রাঞ্চঃ—প্রক্রিয়াকৌমুদীর রচয়িতা রামচন্দ্রাচার্য ও তাঁহার টীকাকারগণ এবং বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদীর রচয়িতা ভট্টোজি দীক্ষিত। প্রক্রিয়াসর্বস্বের রচয়িতা নারায়ণভট্টও এই শ্রেণীভুক্ত। ইঁহারা অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রক্রমের ব্যত্যয় ঘটানোর জন্য পরবর্তীদের সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছেন। রামচন্দ্র অন্যব্যাকরণ-স্বীকৃত বহু শব্দকে গ্রহণ করায় ভট্টোজি-কর্তৃক নির্দয়ভাবে তিরস্কৃত হইয়াছেন। প্রঃ কৌমুদীর টীকাকারগণও তাঁহার সমালোচনা হইতে রেহাই পান নাই। কাশিকাকারদ্বয় এবং কাশিকার পূর্বোক্ত টীকাকারদ্বয়ও ভট্টোজির প্রৌঢ়মনোরমায় কঠোরভাবে সমালোচিত। (৩) নব্যাঃ—এই শ্রেণীভুক্তগণ প্রায়শঃ টীকার টীকাকার। মুখ্য উদ্দেশ্য—পূর্বটীকার সমালোচনায় অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রদর্শন। নাগেশভট্ট ইঁহাদের মধ্যমণি এবং কোণ্ডভট্ট ও বৈদ্যনাথপায়গুণ্ডে তাঁহার সহচর। ব্যাকরণ-দর্শনের দিকে ইঁহাদের নূতন করিয়া আলোকপাত সবিশেষ লক্ষণীয়। (৪) নব্যতরাঃ—এই শ্রেণীর টীকা-টিপ্পনীকারদের প্রধান বৈশিষ্ট্য, রচনায় নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচারপদ্ধতির আমদানী করিয়া ইঁহারা বিষয়কে অযথা দুর্বোধ করিয়া ফেলিতেই যেন বদ্ধপরিকর। লেখক যত পরবর্তী অর্থাৎ আধুনিক, তাঁহার রচনাও তত দুষ্প্রবেশ্য। নাগেশভট্টের গ্রন্থাদির টীকা-টিপ্পনী-রচনার মধ্য দিয়া ইঁহাদের কৃতিত্ব মুখ্যতঃ প্রদর্শিত। জটিলতা ও শুষ্কতার প্রাদুর্ভাবে পাণিনীয় ব্যাকরণধারা অত্যাধুনিক কালে ক্রমসঙ্কোচনের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছে। নব্যন্যায়ের দুই বঙ্গীয় প্রবক্তা জগদীশ তর্কালঙ্কার এবং গদাধর ভট্টাচার্য (১৬০৪-১৭০৯) যথাক্রমে 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা' এবং 'ব্যুৎপত্তিবাদ' রচনা করিয়া ব্যাকরণ-বিচারে জটিল নৈয়ায়িক রীতির গোড়াপত্তন করিয়া গিয়াছেন।

১৫ শঙ্কর বলবন্তশাস্ত্রীতলেকর স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য মারাঠী ভাষায় যে সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহা ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে Belgaum (Bombay) হইতে প্রকাশিত হয়।

১৬-১৭ ইংরেজী উদ্ধৃতি বিনয়ঘোষ-রচিত 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (১ম খণ্ড, পৃঃ ৭০-১) হইতে নেওয়া।

১৮ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কৃতিত্বের মূল্যায়ন করিতে তৎকালীন পণ্ডিত রামগতিন্যায়রত্ন (১৮৩১-৯৪) তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে (৩য় সংস্করণ, ১৩১৭, পৃঃ ২৪৫) লিখিয়াছিলেন ঃ 'বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের যে উপক্রমণিকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দেশমধ্যে সাধারণতঃ সংস্কৃত শিক্ষা-বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। পূর্বে অনেক দিন হইতেই ইংরেজি ভাষায় কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই সংস্কৃত শিখিতে অভিলাষ হইত, কিন্তু ইহার দ্বারে যে ভীষণমূর্ত্তি ব্যাকরণ দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে দেখিয়া কেহই নিকটেই ঘেঁসিতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগর সেই পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।' এই উদ্দেশ্যে অবশ্য অনেক আগেই (১৮১৯ খ্রীঃ) মথুরামোহন দত্ত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন এবং ১৮২৪ খ্রীঃ মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য 'ব্যাকরণসার' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহাই বোধ হয় বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ।

১৯ দ্রষ্টব্য—'On the Aindra School of Sanskrit Grammarians' by A. C. Burnell, 1875.

২০ 'আথর্বণানি কাণ্বানি বার্হস্পত্যানি সংবিদন্। কৌমুদীমাস্ত্রশব্দানাং সূত্রাণি চ করোম্যহম্।।'

সাহেবদের ব্যাকরণ-চর্চা

সংস্কৃত ভাষায় রচিত অন্য ভাষার ব্যাকরণের মতো, অন্য ভাষাতেও সংস্কৃতের ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলির মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণকৌমুদীর মতো গ্রন্থের রচনা অবশ্য আধুনিক যুগের ঘটনা। ভারতে ইংরেজ-শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার শিক্ষাবিভাগে যে আমূল পরিবর্তনের, এবং সমৃদ্ধ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যে যে নব জাগরণের সূচনা হয়, উহা তাহারই অদূরবর্তী ফল। তৎপূর্বে ভারতের বাহিরে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তারের মধ্য দিয়া সংস্কৃত এবং পালি ভাষা ও সাহিত্যের সহিত সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের যে পরিচয় ঘটে তাহার প্রভাবে তাহাদের মাতৃভাষাতেও এই দুই ভাষার গ্রন্থাদির অনুবাদ ও সেই সঙ্গে এই দুই ভাষাকে আয়ত্ত করিবার জন্য ব্যাকরণজাতীয় গ্রন্থাদির রচনাও অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। তাই মধ্য এশিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে, তিব্বতে, চীনে, জাপানে ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই ধরনের পুস্তকাদির ন্যূনাধিক সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য ভারত-সীমান্তবর্তী নেপাল, তিব্বত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশেই ইহার প্রাচুর্য লক্ষিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতকের একেবারে শেষ দিকে (১৪৯৮) পর্তুগীজ নাবিকদের দ্বারা ভারতে আসিবার জলপথ আবিষ্কৃত হইবার পর, ইউরোপের অন্যান্য দেশের সহিতও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং অনতিবিলম্বে সেই সব দেশ হইতে খ্রীষ্টান ধর্ম ও সংস্কৃতির বাহকরূপী মিশনারিদেরও এদেশে আগমন ঘটে। ইহাদের মাধ্যমে ইউরোপের সহিত ভারতের একটা সাংস্কৃতিক সংযোগের সূচনা দেখা দেয়—এদেশে ইংরেজ প্রভুত্ব কায়েম হইবার আগেই। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের সহিত সম্যক্ পরিচয়লাভের জন্য এই সব মিশনারি সংস্কৃত ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে এই দেশেই তাঁহাদের দ্বারা ইউরোপীয় ভাষায় একাধিক সংস্কৃত ব্যাকরণও রচিত হয়।

ইতালীদেশীয় পর্যটক Florentine Filippo Sassetti (1540-88)—যিনি ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসিয়া ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতে (গোয়াতে) দেহত্যাগ করেন, সর্বপ্রথম ইতালীয় ভাষা এবং সংস্কৃতের ('lingua Sanscruta') মধ্যে শব্দগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া স্বদেশে যে চিঠি লিখেন, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীর ফ্লোরেন্‌স্ সহরে তাহা মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়। স্পেনের Valladolid সহরে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে F. a. san. Roman তাঁহার 'Historia general de la India Oriental' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৭শ শতকের মধ্য ভাগে মাদ্রাজের Pulicat নামক স্থানে বসবাসকারী আব্রাহাম রজার নামক একজন ওলন্দাজ ধর্মযাজক ডাচ ভাষায় 'Open-Deure tot het verborgen heydendom' (Amsterdam 1651) নামক যে গ্রন্থ লিখিয়া সংস্কৃত ভাষাকে ইউরোপে পরিচিত করিতে সাহায্য করেন, তাহার বাঙ্‌লা তর্জমা দাঁড়ায় 'গুপ্ত বিধর্মিতন্ত্রের দ্বারোন্মোচন' ('Open Door to the Hidden Heathen Wisdom')। ইহাতে ডাচ ভাষায় ভর্তৃহরির ২০০ শ্লোকের অনুবাদ ছিল।

ইউরোপীয় ভাষায় প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রণেতা Heinrich Roth নামক জনৈক জার্মান মিশনারি। ইনি ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে Augsburg-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসিয়া ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা সহরে দেহত্যাগ করেন। সেখানকার Jesuit College-এর প্রধান ছিলেন তিনি। তাঁহার সেই ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় নাই, রোমে পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। তিনি দেবনাগরী বর্ণমালার যে হিসাব দেন, তাহাই এই বর্ণমালার প্রাথমিক নমুনা রূপে ইউরোপে গৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার পরে Johann Ernst Hanxleden নামক জনৈক জেসুইট ফাদার 'Grammatica Granthamia seu Samscrdumica' শীর্ষক যে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন, তাহাও মুদ্রিত হয় নাই। কাহারও মতে ইহাই ইউরোপীয় পণ্ডিত-রচিত প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ। ইনি ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসিয়া দীর্ঘ ৩২ বৎসরাধিক কাল মালাবার মিশনে কাজ করার পর ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহারই গ্রন্থের আংশিক অবলম্বনে Fra Paulino a Sancto Bartholomaeo (1748-1805) নামক আর এক জন (মালাবার উপকূলের) ধর্মযাজক ল্যাটিন ভাষায় দুইখানি সংস্কৃতব্যাকরণ রচনা

করেন। তিনি অষ্ট্রিয়ার অধিবাসী। তাঁহার সন্ন্যাস-পূর্ব নাম ছিল Johann Philip Wesdin. মালাবারে ১৭৭৬ হইতে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিশনের কাজ করিবার পর ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমে তিনি মারা যান। তাঁহার গ্রন্থই ইউরোপীয় ভাষায় রচিত প্রথম মুদ্রিত সংস্কৃত ব্যাকরণ। এই দুই গ্রন্থের নাম 'Sidharubam seu Grammatica Samscredamica, cui accedit Dissertatio Historico critica in linguam samscredamicam, vulgo samscret dictam...' এবং 'Vyacarana, seu Locupletissima Samscredamicae Linguae...' ১৭৯০ এবং ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে রোমে প্রকাশিত। তাঁহার আর এক পুস্তক Dissertatio de antiquitate et affinitate linguage zendicae samscredamicae et germanicae, Padov, 1799.

এই সময়ে ইংরেজদের দৃষ্টিও সংস্কৃতের দিকে (প্রথমে প্রাশাসনিক প্রয়োজনে) আকৃষ্ট হইতে থাকে। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাহায্যে 'বিবাদার্ণবসেতু' নামে এক আইন-পুস্তক সঙ্কলন করান। ইহার N. B. Halhed-কৃত ইংরেজী অনুবাদ 'A Code of Gentoo Law' নামে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। (স্যর) চার্লস্ উইল্‌কিন্‌স্ (১৭৫০-১৮৩৬) নামক জনৈক ইংরেজ ভারতের প্রধান বিদ্যাপীঠ কাশীর পণ্ডিতদের নিকট সংস্কৃত শিখিয়া গীতা ও হিতোপদেশের ইংরেজী অনুবাদ প্রস্তুত করেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গীতার এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহাই ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত এবং মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহার নাম দেওয়া হয় 'The Song of the Adorable One'. হিতোপদেশের অনুবাদ (Friendly Advice) এবং মহাভারতীয় শকুন্তলা-উপাখ্যানের অনুবাদ যথাক্রমে ১৭৮৭ ও ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির Writer-এর চাকুরি লইয়া উইল্‌কিন্‌স্ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন এবং কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পূর্বোক্ত হ্যালহেড্-রচিত বাঙ্‌লা ব্যাকরণ 'A Grammar of the Bengal Language' -এর মুদ্রণের জন্য পঞ্চানন নামক একজন বাঙালী কর্মকারের সহযোগিতায় তিনি (উইল্‌কিন্‌স্) ছেনি দিয়া কাটিয়া নিজ হাতে যে বাঙ্‌লা হরফের ছাপ প্রস্তুত করেন,

তদ্দ্বারা মুদ্রিত হইয়া উক্ত ব্যাকরণ ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর মাষ্টার এণ্ডরুজের ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাই প্রথম মুদ্রিত বাঙ্‌লা বই। কাজেই উইল্‌কিন্‌স্‌ বাঙ্‌লা হরফেরও জন্মদাতা। কেবল তাহাই নয়, ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া তিনি দেবনাগরী হরফও প্রস্তুত করেন এবং স্বগৃহে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ইহার মূলে ছিল—১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তৎকৃত সংস্কৃত ব্যাকরণ 'A Grammar of the Sanskrita Language'-এর সংস্কৃতাংশকে দেবনাগরী অক্ষরে ছাপিবার পরিকল্পনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অগ্নিকাণ্ডে এই ছাপাখানা নষ্ট হইয়া গেলে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে ঐ ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। ইউরোপে ইহাই সর্বপ্রথম দেবনাগরী লিপির ব্যবহার। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকেই পরিচালক করিয়া লণ্ডনে 'India Office Library'র উদ্বোধন করা হয় এবং তিনি ইহার প্রথম গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। তিনি কয়েকটি ভারতীয় খোদিত লেখ-র (Inscription) ইংরেজী অনুবাদও করেন। এই বিষয়েও ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম। ব্যাকরণে তাঁহার অপর গ্রন্থ—'The Radicals (roots) of the Sanskrita Language', London 1815. Theodor Benfey (1809-81) তাঁহাকে '...the father of European Sanskrit studies' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার সহিত তুলনায় ভারতের সংস্কৃত ভাষাকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করিয়া তৎপ্রতি পাশ্চাত্ত্য বুধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ইংরেজ পণ্ডিত স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্‌ (১৭৪৬-৯৪)। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফোর্ট উইলিয়মে সুপ্রিমকোর্টের পিউনিজজের পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন এবং পর বৎসরই সেখানে এই যুগের প্রথম প্রাচ্যবিদ্যাগবেষণা-কেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটি[১] প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তৎকর্তৃক প্রকাশিত (কালিদাসের) ঋতুসংহার (Cycles of Seasons) ইউরোপে মুদ্রিত প্রথম সংস্কৃত গ্রন্থ। কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের তৎকৃত ইংরেজী অনুবাদের অবলম্বনে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে জর্জফর্ষ্টার ইহার জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন। ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য ভাষাতেও ইহা অনূদিত হয়। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জোন্‌স্‌ মানবধর্মশাস্ত্রের (মনুসংহিতার) যে অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহাই পুনরায় জার্মান ভাষায় অনূদিত হয় ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি পার্‌সিভাষার ইতিহাস এবং ব্যাকরণও রচনা করেন। পশ্চিমের

ভাষাগুলির সহিত সংস্কৃতের সাদৃশ্য দেখাইয়া, মূলতঃ একই ভাষা হইতে এই সব ভাষার উৎপত্তি—এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা (দ্রঃ পৃঃ ৪৩৬) তিনিই আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করিয়া যান।২

জোন্‌স্-এর উত্তরসাধকরূপে দেখা দেন হেনরি টমাস্ কোলব্রুক (১৭৬৫-১৮৩৭)। তিনি জোন্‌স্-এর ন্যায় প্রধানতঃ কাব্যগ্রন্থাদির সঙ্কলনেই রত না থাকিয়া সংস্কৃত শব্দকোষ এবং ব্যাকরণাদির সঙ্কলনেও চেষ্টিত হন। জোন্‌স্ ভাষাতত্ত্বের যে ইঙ্গিত দিয়া যান, কোলব্রুক তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই বিষয়ে তাঁহার অন্যতম প্রবন্ধ 'On Sanscrit and Prakrit Languages' ('Asiatick Researches', Vol.VII, 1801) দ্রষ্টব্য। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির Writer রূপেই তিনি (১৭৮২/৮৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ) ভারতে আসেন এবং ক্রমে কলিকাতার উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহাতে সংস্কৃত ভাষার এবং হিন্দু আইনের অবৈতনিক অধ্যাপকের পদও গ্রহণ করেন। অধ্যাপনার সুবিধার জন্য ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে এক সংস্কৃত ব্যাকরণ 'Grammar of the Sanskrit Language' (Vol.I) তৎকর্তৃক রচিত এবং কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় হেমচন্দ্রের 'অভিধান-চিন্তামণি' এবং ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী অনুবাদ সহ অমরকোষ। তাঁহারই আদেশে ('শ্রীমত্তামস হেনৃকঃ কুলবুরুক্ সাহেব দত্তাজ্ঞয়া') ধরণীধর-কর্তৃক আরব্ধ 'বৈয়াকরণসর্বস্ব' নামক যে গ্রন্থ কাশীনাথ (তর্কালঙ্কার) সম্পূর্ণ করেন, তাহা ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়। ইহাতে অষ্টাধ্যায়ীর পাশ্চাত্ত্য-পণ্ডিতগণ-কর্তৃক নির্দিষ্ট দশটি বিভাগ—শিক্ষা, প্রাতিশাখ্য, নিরুক্তি, ফিট্‌সূত্র, সূত্র, কারিকা, পরিভাষা, বার্ত্তিক, ভাষ্য ও ভাষ্যেষ্টি পরিপ্রেক্ষিত হইয়াছে। ব্যাকরণের দার্শনিক এবং ন্যায়শাস্ত্রীয় সমীক্ষা, বৈদিকাংশ এবং প্রত্যাহারাদিও বাদ পড়ে নাই। এক কথায় ইহা পাণিনীয় সম্প্রদায়ে লক্ষিত শব্দশাস্ত্রীয় যাবতীয় ফলশ্রুতির বিশাল ভাণ্ডারস্বরূপ। সম্ভবতঃ এই কাশীনাথই সাহেবদের (বিশেষতঃ উইলিয়ম জোন্‌সের) জন্য 'শব্দসন্দর্ভসিন্ধু' নামক বৃহৎ সংস্কৃতাভিধানও প্রস্তুত করেন। কোলব্রুকের পূর্বোক্ত ব্যাকরণও পাণিনির ভিত্তিতেই রচিত। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে

স্বদেশে ফিরিয়া সেখানেও তিনি নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে 'Royal Asiatic Society of Great Britain' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইহার অন্যতম Director হন। কলিকাতায় থাকাকালীন তিনি এখানকার 'Asiatick Society'রও সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ম্যাক্স্‌মুলার সাহেবের উক্তি : '... the founder and father of true Sanskrit scholarship in Europe.'[৩]

উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর (হুগলী) হইতে যে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেন তাহার নাম 'A Grammar of the Sungskrit Language'। ইহা ছাড়া তিনি বাঙ্‌লা, মারাঠী, পাঞ্জাবী এবং তেলিঙ্গ (Telinga) ভাষারও ব্যাকরণ রচনা করিয়া শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশ করেন। বাঙ্‌লা ও মারাঠী ভাষার অভিধানও তিনি প্রণয়ন করেন। তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণের ভিত্তি বোপদেবের মুগ্ধবোধ। এই কেরী সাহেব ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন এবং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বোক্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সংস্কৃত ও বাঙ্‌লাভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন।

হেন্‌রি পিট্‌স্‌ফর্ষ্টার (১৭৬১-১৮১৫) বা H. P. Forster নামক জনৈক ইংরেজ পণ্ডিত এখানকার ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সহায়তায় 'শব্দসাধন ব্যাকরণ' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা তাঁহার 'Essay on the Principles of Sanskrit Grammar' শীর্ষক বৃহত্তর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। ইহা পাণিনি, কলাপ, মুগ্ধবোধ, নানা কাব্য ও শব্দকোষ প্রভৃতির মূলগ্রন্থ ও তাহাদের বিবিধ বৃত্তি-টীকাদির অবলম্বনে রচিত এবং ইংরেজী বর্ণনাসহ সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয়াদির এক বিরাট প্রদর্শনী বিশেষ। এই গ্রন্থে প্রদর্শিত ধাতুর মোট সংখ্যা ২৫১৫। তিনিই সর্বপ্রথম দুই ভাগে ইংরেজী-বাংলা এবং বাংলা-ইংরেজী শব্দাভিধান রচনা করেন, যাহা ১৭৯৯ ও ১৮০২ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়—A Vocabulary in two parts Eng. and Beng. and vice-versa by H. P. Forster, senior Merchant on the Bengal Establishment.

লণ্ডনে জন্ম। ৭।৮।১৭৮৩ তারিখে কলিকাতায় আসেন, কলিকাতা দেওয়ানি আদালতে রেজিস্ট্রার, পরে জেলা কালেক্টর এবং সর্বশেষে কলিকাতা টাকশালের মাস্টার, গ্রন্থরচনা এবং অনুবাদে সামর্থ্য

সত্ত্বেও ভাগ্য বিপর্যয়ে নাস্তানাবুদ হইয়া দারিদ্র্যের মধ্যে কলিকাতায় মৃত্যু।

হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ (১৭৮৬-১৮৬০) বা H. H. Wilson একাধারে বৈয়াকরণ, কোষকার এবং ঋগ্‌বেদের অনুবাদক। ইংল্যাণ্ডে ডাক্তারী শিক্ষা লাভের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির Asstt. Surgeon-এর পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং এখানকার টাকশালে কর্মগ্রহণ করেন। ক্রমে কোলব্রুকের সাহায্যে এবং উৎসাহে তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষা এবং ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের পদলাভ। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্ম-ব্যপদেশে কাশীতে স্থানান্তরিত হইয়া তিনি সেখানকার সংস্কৃত পণ্ডিতদের সান্নিধ্যে আসেন এবং স্থানীয় সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের কার্যে ব্যাপৃত হন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে সংস্কৃতের জন্য Boden-অধ্যাপক-পদ স্থাপিত হইলে তিনি ঐ পদে বৃত হইয়া ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতা হইতে স্বদেশ যাত্রা করেন। অক্সফোর্ডে তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতার বিষয় ছিল ঃ 'The General Principles of Sanskrit Grammar.' ক্রমে তিনি সেখানকার Royal Asiatic Society-র ফেলো, ডাইরেক্টর এবং সভাপতিও নির্বাচিত হন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের পদও তিনি অলঙ্কৃত করেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণের গ্রন্থ—'An Introduction to the grammar of the Sanskrit Language for the use of early students' প্রকাশিত হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রকাশিত তাঁহার সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের কথা অন্যত্র (পৃঃ ৫৫১) বলা হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের তৎকৃত (ইংরেজী) অনুবাদ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহারই ছাত্র E.B.Cowell এবং W.F.Webster ইহার প্রকাশনার ভার গ্রহণ করেন [Rig-Veda-Samhita, a collection of Ancient Hymns (etc.) translated by H. H. Wilson. Edited by E. B. Cowell and W. F. Webster, London, 1850-88]. Dr. Reinhold Rost উইলসন সাহেবের প্রবন্ধাবলী সংগ্রহপূর্বক তিন খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন ('Essays—analytical, critical and philological, on subjects connected with Sanskrit Literature', collected and edited by R. Rost).

উইলিয়ম ইয়েটস্ (১৭৯২-১৮৪৫) নামক আর এক জন ইংরেজ মনীষী ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে 'A Grammar of the Sanscrit Language' (on a plan similar to that most commonly adopted in the learned languages of the West) নামে এক ব্যাকরণ রচনা করেন। ইহার চারিটি বিভাগ : (১) Orthography (বর্ণ + সন্ধি), (২) Etymology (শব্দ + ধাতু), (৩) Syntax (পদ-ব্যবস্থা) এবং (৪) Prosody (ছন্দঃ)। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য—'A Dictionary in Sanscrit and English, designed for the use of private students and of Indian Colleges and Schools',Calcutta, 1846 ; 'An Introduction to the Bengali Language', 2 vols., Cal. 1847 (edited by J.Wenger) ; হিন্দুস্থানী-ইংরেজী অভিধান এবং 'An Introduction to the Hindusthani Language'. 'Asiatick Researches'-এর ১ম ও ২য় খণ্ডে তাঁহার সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী রহিয়াছে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং মিশনের কর্তৃপক্ষের সহিত মতবিরোধের ফলে তাঁহাকে শিক্ষকতার দ্বারা জীবিকার্জনে বাধ্য হইতে হয়। শিক্ষাবিদ্ হিসাবে তিনি কলিকাতা স্কুলবুকসোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিলাতযাত্রার পথে জাহাজে তাঁহার জীবনান্ত হয়।

M. W. Woollastan-কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় রচিত আর এক সংস্কৃত ব্যাকরণ—'A Practical Grammar of the Sanskrit Language ; including the whole of the Orthography, or the first principles of the grammar, and the permutations of the letters, also a part of etymology embracing the declensions of nouns and pronouns'—যাহা শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইয়া ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।

কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৪৫-৬১) জেমস্ রবার্ট ব্যালেনটাইন (১৮১৩-৬৪) শব্দার্থপ্রদর্শন মূলক 'First Lessons in Sanskrit Grammar, together with an introduction to the Hitopadesa' নামে যে সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাহা কাশীতেই প্রকাশিত হয়। ইহার ১ম খণ্ডের ব্যাকরণাংশে ৩৩টি

lessons এবং ২য় খণ্ডে হিতোপদেশীয় ৩০টি উদ্ধৃতাংশের মূল ও ইংরেজী অনুবাদ বর্তমান। ১৮৬২ হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লণ্ডনে ইহার চারিটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। লখনউ অখিল ভারত সংস্কৃত পরিষৎ ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'Sanskrit First Lessons' নামে ইহার ব্যাকরণাংশ প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যালেনটাইন ইংরেজী অনুবাদসহ বরদ-রাজ-প্রণীত লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী[৪] এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যের নবাহ্নিক[৫] সম্পাদনা করিয়া যথাক্রমে ১৮৪৯ এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মির্জাপুর (উত্তরপ্রদেশ) হইতে প্রকাশ করেন। মহাভাষ্যমুদ্রণের ইহাই সূচনা।

জার্মান পণ্ডিত কীলহর্ণ (Franz Kielhorn 1840-1908) ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে হইতে তাঁহার 'A Grammar of the Sanskrit Language' প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি Deccan College-এ প্রাচ্যভাষার অধ্যাপকের পদে (১৮৬৬-৮১) অধিষ্ঠিত। পরে তিনি জার্মেনির Gottingen বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক হন। তাঁহার প্রধান কীর্তি, পতঞ্জলির মহাভাষ্যের সম্পাদনা। ৩ খণ্ডে, ১৮৮০, ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম প্রকাশ বোম্বে হইতেই। তৎপূর্বে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে Leipzig হইতে তাঁহার সম্পাদনায় শান্তনবের ফিট্‌সূত্র (Cantanava's Phitsutra, mit verschiedenen indischen kommentaren...) এবং বোম্বে হইতে দুই খণ্ডে (১৮৬৮-৭৪) নাগেশ ভট্টের পরিভাষেন্দুশেখর (ইংরেজী অনুবাদসহ) প্রকাশিত হয়। তাঁহার আর এক গ্রন্থ 'Katyayana and Patanjali, their relation to each other and to Panini' (1876)। তাঁহার পূর্বোক্ত ব্যাকরণ পরে জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়া 'Grammatik der Sanskrit Sprache' নামে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রবন্ধাদি রচনা-সমগ্র W. Rau-এর সম্পাদনায় দুইখণ্ডে ১৯৬৯ খ্রীঃ Wiesbaden-এ প্রকাশিত হইয়াছে।

(২)

১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের Royal Library-র গ্রন্থাগারিক Bignon সাহেব ভারতবর্ষ ও ইন্দোচীন হইতে এই দুই দেশের সাহিত্যের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি কিনিতে সচেষ্ট হন। সম্ভবতঃ তাঁহার এই প্রচেষ্টার ফলেই ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে প্রথম ঐতরেয় ব্রাহ্মণসহ ঋগ্‌বেদ প্রেরিত হয় এবং চন্দননগরের শাসনকার্যে নিযুক্ত ফরাসী পণ্ডিত

Pons সাহেব বিভিন্ন বিষয়ে ১৬৮ খানি সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন। তিনি সংস্কৃত জানিতেন এবং সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের ভিত্তিতে ল্যাটিন ভাষায় এক সংস্কৃত ব্যাকরণও রচনা করিয়াছিলেন। তিনি অমরকোষের ল্যাটিন অনুবাদও প্রস্তুত করেন। তৎসংগৃহীত গ্রন্থাবলীর তালিকা ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে ফরাসী ভাষায় আবেস্তা অনূদিত হয় এবং পার্সি অনুবাদের ভিত্তিতে ৫০ খানি উপনিষদের ল্যাটিন অনুবাদও খ্রীঃ ১৯শ শতকের প্রারম্ভে প্রকাশিত হয়। ফরাসী পণ্ডিত Anquetil du Perron-কৃত এই অনুবাদের নাম 'Oupnekhat'। উপনিষদের ইহাই প্রথম ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকুরি-প্রার্থীদের ভারতীয়ভাষা বিশেষতঃ সংস্কৃত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডে হার্টফোর্ড কলেজে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইলে, সেখানকার অন্যতম অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন (১৭৬২-১৮২৪) প্যারিসে সংরক্ষিত পূর্বোক্ত সংস্কৃত পুঁথিগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের জন্য সেখানে যান এবং অনতিবিলম্বে ইংরেজ-ফরাসী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তাঁহাকে সেখানে বেশ কিছু কাল আটক থাকিতে[৬] হয়। এই অবস্থায় তিনি সেখানকার কয়েকজন ফরাসীকে এবং জার্মান কবি Friedrich Schlegel-কে সংস্কৃত শিক্ষা দেন। ইহা ১৮০২/৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তিনি নিজেও পরে (১৮১৫) 'A Treatise on Sanskrit Grammar' নামে এক গ্রন্থ (বা বৃহৎ প্রবন্ধ) রচনা করিয়াছিলেন।

F.von Schlegel (1772-1829) সংস্কৃত চর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে Heidelberg হইতে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Uber die Sprache und weisheit der Indier[৭], Ein Beitrag zur Begrund-ungder Altertumskunde' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের দ্বারা জার্মেনিতে ভারতীয় বিদ্যাচর্চার গোড়াপত্তন হয়। এই গ্রন্থেই তিনিই সর্বপ্রথম তুলনামূলক ব্যাকরণের ('Vergleichende Grammatik' = Comparative grammar) কথা বলেন। তাঁহার সেই বাক্যটির ইংরেজী তর্জমা এই—'Comparative grammar will give us entirely new information on the geneology of languages in exactly the same w--- in which comparative Anatomy has thrown light upon

natural History.' এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জার্মান পণ্ডিতদের মধ্যে ভারতীয় বিদ্যা-বিষয়ে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে তাঁহাদের অনেকেই ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সহকারে কেবল ভারতেরই নয়, পরন্তু সমগ্র প্রাচ্য ভূমিরই প্রাচীন ভাষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগ করিতে থাকেন। Schlegel-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা August Wilhelm von Schlegel (1767-1845) ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মেনির Bonn-বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত সাময়িক পত্র 'Indische Bibliothek'-এর ১ম খণ্ডে গীতার ল্যাটিন অনুবাদ এবং ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎসম্পাদিত রামায়ণের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন।*

তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষার গুরু ছিলেন ফরাসী পণ্ডিত A.L.de Chezy (1773-1832)—যিনি পূর্বোক্ত Pons-রচিত ব্যাকরণ এবং অমরকোষ পড়িয়া সংস্কৃত শিখেন এবং ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে College de France-এর প্রথম সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। প্যারিসের Royal Library-তে রক্ষিত অভিজ্ঞানশকুন্তলের এক বাঙ্‌লা অনুলিপির অবলম্বনে তিনি ফরাসী অনুবাদ এবং মহাভারতের নলোপাখ্যানমূলক পরিশিষ্ট-সহ এই নাটকের যে বিরাট সংস্করণ প্রকাশ করেন তাহা তাঁহাকে বিখ্যাত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার অন্য ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন তুলনামূলকব্যাকরণ- ও ভাষা-বিজ্ঞানের কার্যতঃ প্রতিষ্ঠাতা জার্মান পণ্ডিত Franz Bopp (1791-1867), ঋগ্‌বেদ[৮] ও হরিবংশের ফরাসী অনুবাদক M.A.Langlois এবং ইন্দো-ইরানিয়ান ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা ফরাসী পণ্ডিত Eugene Burnouf (1801-52).

জার্মেনির Mainz সহরে Bopp (বপ্)-এর জন্ম। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তাঁহার যে প্রথম পুস্তক ফ্রাঙ্কফুর্ট্ নগর হইতে প্রকাশিত হয় তাহার নাম—'Uber das Conjugationssystem der Sanskrit sprache, in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen, und germanischen Sprachen.'[৯] ইহাতে গ্রীক, ল্যাটিন, পার্সি ও জার্মান ভাষার সহিত তুলনায় সংস্কৃত ধাতুরূপের প্রকৃতিবিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সব ভাষার ধাতুসমূহের বিশ্লেষণের দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে, এই সমস্ত ধাতুই একই মূল ভাষা হইতে উদ্‌ভূত। ইহার পর ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি

সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন ও টিউটনিক ভাষার ব্যাকরণগুলির এক তুলনামূলক আলোচনা 'Analytical comparison of the Sanskrit, Greek, Latin, and Teutonic Languages' লণ্ডনের 'The Annals of the Oriental Literature' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। পূর্ব পুস্তকে যে আলোচনা ধাতুরূপেই সীমাবদ্ধ ছিল, এই রচনায় তাহা ব্যাকরণের অন্যান্য বিষয়েও প্রসারিত করা হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ব্যাকরণের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে থাকাকালীন তিনি ল্যাটিন ও জার্মান ভাষায় সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের উপর এইসব গ্রন্থ রচনা করেন— 'Grammatica critica Linguae Sanscritae', Berolini, 1827 ; 'Ausfuhrliches Lehrge baude der Sanskrita Sprache', Berlin, 1827 ; 'Glossarium Sanscritum', Berolini, 1830 ; 'Vergleichende zergliederung des Sanskrits (etc.)', Berlin, 1824-33 ; 'Kritische Grammatik der Sanskrita Sprache', Berlin, 1834— ইহা ল্যাটিন ভাষায় রচিত পূর্বোক্ত প্রথম গ্রন্থের জার্মান অনুবাদ। তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি—সংস্কৃত, জেন্দ, আর্মেনীয়, গ্রীক, ল্যাটিন, লিথুয়ানীয়, গথীয়, জার্মান এবং স্লাভ ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা। ছয় খণ্ডে এই গ্রন্থ বার্লিনে (১৮৩৩-৪৯) প্রকাশিত হয়। জার্মান ভাষায় রচিত এই গ্রন্থের নাম 'Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslavischen, Gothischen und Deutschen'. ইহার E.B.Eastwick-কৃত ইংরেজী অনুবাদ 'A Comparative Grammar of the Sanskrit, Zend, Greek, Latin, Lithuanian, Gothic, German and Slavonic Languages' নামে লণ্ডনে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে M.Breal ইহার এক ফরাসী অনুবাদও ৫খণ্ডে প্যারিসে প্রকাশ করেন ('Grammaire comparee des langues Indo-europeennes, comprenant le Sanscrit, le Zend, l'Armenien, le Grec, le Latin...', Paris, 1866-74)। ঐ বই প্রকাশের পর বপ্ সাহেব সমগ্র বিশ্বে তুলনামূলক ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের প্রবর্তক বলিয়া পরিগণিত হন। সংস্কৃত ভাষাকে মানদণ্ড রূপে ধরিয়া ইন্দো-ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষার সহিত ইহার

তুলনামূলক বিচারে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সুদূর গাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে শুরু করিয়া পশ্চিমে সমগ্র ইউরোপব্যাপী যে মানবগোষ্ঠী বিদ্যমান, তাহারা মূলতঃ একই ভাষায় কথা বলে[১০] এবং সেই কারণে আপাতপৃথক্ বিভিন্ন জাতি ভাষা-সূত্রে পরস্পর আত্মীয়তা-বদ্ধ। সংস্কৃতের সহিত এইসব ভাষার নৈকট্য বা সাদৃশ্য বপের একক-প্রচেষ্টাপ্রসূত আবিষ্কার না হইলেও তিনিই পূর্বসূরিদের এতৎসম্পর্কিত মতকে তথ্যগতভাবে প্রমাণিত করিয়া প্রথম তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করেন। তাঁহার আর একটি গ্রন্থ—'Vergleichendes accentuations System nebst einer gedrangten Darstellung der Grammatischen ubereinstimmungen des Sanskrit und Griechischen,' Berlin, 1854—যাহার ইংরেজী অনুবাদ 'A Treatise on the Accent systems in Sanskrit and Greek'—ঐ সময়ই প্রকাশিত হয়। বপের আর এক গ্রন্থ—Glossarium comparativum Linguae Sanscrite,. Edito III, (2 parts), Berlin, 1867.

১৮৩২ খ্রীঃ Chezy-র মৃত্যু হইলে College de France-এ তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হন তাঁহারই ছাত্র Burnouf. তিনি জার্মান পণ্ডিত Friedrich August Rosen-কর্তৃক ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ঋগ্-বেদের ১ম অষ্টকের সাহায্যেই যেসব ছাত্রদিগকে বৈদিক পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন তাঁহাদের অন্যতম জার্মান যুবক Friedrich Max Muller (1823-1900) সায়ণ-ভাষ্য সহ ঋগ্বেদ প্রকাশের সঙ্কল্প করিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ সেই কার্যে প্রয়োজনীয় অর্থদান মঞ্জুর করেন। তাঁহার সম্পাদনায় এই গ্রন্থ ৬খণ্ডে অক্সফোর্ড হইতে (১৮৪৯-৭৪) প্রকাশিত হয়।[১১] তাঁহার সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে বলা হইবে। নরওয়ের অধিবাসী এবং বন্ধু Christian L.Lassen (1800-76)-এর সঙ্গে একযোগে Burnouf প্যারিসে ১৮২৬ ও ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে পালি ভাষা ও ব্যাকরণের উপর যে দুই পুস্তক প্রকাশ করেন তাহাদের নাম—'Essai sur le Pali, ou langue sacree...' এবং 'Observations grammaticales sur quelques passages de l' Essai sur le Pali'. Burnouf-এর একককর্তৃত্বে রচিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ—'De la langue et de la literature Sanscrite', Paris, 1833 এবং Leupol-এর সঙ্গে একযোগে রচিত 'Methode

pour etudier la langue Sanscrite', Paris, 1861. আবেস্তার ভাষার সহিত সংস্কৃতের যোগসূত্র[১২] আবিষ্কারের দ্বারা ইন্দো-ইরানিয়ান ভাষা-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা Burnouf-এর জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তি। তাঁহার অন্যান্য কার্যের মধ্যে আছে—ভাগবতের (৯ম স্কন্ধ পর্যন্ত) ফরাসী অনুবাদ, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে 'Society Asiatique' (the first Oriental Society in Europe)-প্রতিষ্ঠা, 'Introduction a l'histoire du Buddhisme Indien' (Paris, 1844) রচনা এবং সদ্ধর্মপুণ্ডরীকের ফরাসী অনুবাদ। তাঁহার গবেষণা ও তথ্যাবিষ্কারের ফলেই গৌতম বুদ্ধের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রমাণিত হয়।

Burnouf-এর জার্মান ছাত্র Rudolph Roth (1821-95) কার্যতঃ জার্মেনিতে বৈদিক গবেষণা প্রবর্তন করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Zur Literatur und Geschichte des Weda' ('On the Literature and History of the Vedas') প্রকাশিত হয়। তৎসম্পাদিত যাস্কীয় নিরুক্ত, অথর্ববেদসংহিতা এবং (Bohtlingk-এর সহিত একযোগে) 'Sanskrit Worterbuch'-এর কথা অন্যত্র (পৃঃ ৪১৬) বলা হইয়াছে। তাঁহার আর এক রচনা 'Zur Geschichte des Sanskrit Worterbuchs...' (1874)।

(৩)

বস্তুতঃ তুলনামূলক ব্যাকরণ এবং ভাষা-বিজ্ঞানের গবেষণার ইতিহাসে খ্রীঃ ১৯শ শতাব্দীকে স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। ১৮শ শতকে ইহার সূচনা, ১৯শ শতকে ইহার সর্বাঙ্গীন পরিণতি। ২০শ শতকের গোড়ায় ইহার পরিপক্ব অবস্থা। Dane R. Rask (1787-1832), Jacob Grimm (1785-1863), August Friedrich Pott (1802-87), August Schleicher (1821-68), John Beams (1837-1902), Berthold Delbruck (1842-1922), Friedrich Karl Brugmann (1849-1919), O.Schrader (1855-1919) প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্যপণ্ডিতগণের অবদান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আদিম আর্যভাষার শব্দাবলী যে-সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়া কালক্রমে এশিয়া ও ইউরোপের বর্তমান বিভিন্ন দেশী ভাষায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাদের

গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের জন্য ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত Grimm যে প্রণালী উদ্ভাবন করেন, তাহা তাঁহারই নামাঙ্কিত 'Grimm's Law' বলিয়া পরিচিত। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংরেজী ভাষায় 'Indo-European' সংজ্ঞার ব্যবহার চালু হয়। সেইরূপ জার্মান ভাষায় 'indo-germanisch' (Indo-Germanic) সংজ্ঞার ব্যবহার সর্বপ্রথম ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে শুনা গেলেও পূর্বোক্ত Pott সাহেব ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der indo-germanischen Sprachen' (Etymological investigations in the field of the Indo-Germanic languages), Lemgo, 1833-36-গ্রন্থে ইহার প্রথম ব্যবহার করেন। প্রথমে দুইখণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থ পরে (১৮৫৯-৭৬) ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে উচ্চারণ-তত্ত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। Schleicher-রচিত 'Compendium der Vergleichenden Grammatik der indo-germanischen Sprachen' (Weimar, 1861-62)-গ্রন্থে প্রাচীন আর্য ভাষার পটভূমিতে ইন্দো-ইউরোপীয় প্রত্যেক ভাষার সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণের তুলনামূলক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইহার Herbert Bendall-কৃত ইংরেজী অনুবাদ—'A Compendium of the comparative grammar of the Indo-European, Sanskrit, Greek and Latin Languages' (in two parts) London, 1874-77. গ্রন্থকারের মতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির উৎপত্তির মূলে যে প্রাচীন আর্য ভাষা, তাহা হইতে সংস্কৃত ভাষা পৃথক্। তিনি তাঁহার 'Die darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft' (Weimar, 1863)-গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে প্রাণিজগতে প্রয়োগের জন্য উদ্ভাবিত ডারউইন সাহেবের মতবাদ, ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস-পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং প্রাণিজগতের ন্যায় ভাষার জগতেও বিভিন্ন ভাষার মধ্যে আত্মরক্ষা ও বিস্তৃতির জন্য যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা-মূলক দ্বন্দ্ব বর্তমান তাহাতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াছে।

ইংরেজ পণ্ডিত Beams-রচিত গ্রন্থ 'A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India' তিন খণ্ডে লণ্ডন হইতে ১৮৭২-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি প্রথমে পাঞ্জাবে ও পরে

বঙ্গদেশে বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন। তাঁহার অন্য দুই গ্রন্থ—(১) 'Outlines of Indian Philology' (Calcutta 1867) এবং (২) 'A Bengali Grammar' (1891)—যাহা পরে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 'Grammar of the Bengali Language' নামে অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। Leipzig বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক K. Brugmann এবং Delbruck সাহেবের যুগ্মকর্তৃত্বে প্রণীত বিশাল গ্রন্থ 'Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen' ৬খণ্ডে Strassburg হইতে ১৮৮৬-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহার এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'Kurze vergleichende Grammatik der indo-germanischen Sprachen' ১৮৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করা হয়। মূলগ্রন্থের পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত ২য় সংস্করণ তিন ভাগে ৭খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৮৯৭-১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার ইংরেজী অনুবাদ 'Elements of the Comparative Grammar of the Indo- Germanic Languages' (A concise exposition of the history of Sanskrit, Old Iranian [Avestic and Old Persian], Old Armenian, Old Greek, Latin, Umbrian-Samnitic, Old Irish, Gothic, Old High German, Lithuanian and Old Bulgarian) চারিখণ্ডে নিউইয়র্ক হইতে ১৮৮৮-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। অনুবাদক Joseph Wright. পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত সংস্করণের যে ফরাসী অনুবাদ Jules Bloch (1880-1953), A. Cuny এবং A. Ernout—এই তিনজনে মিলিয়া প্রস্তুত করেন তাহা 'Abrege de grammaire comparee des langues indo-europeennes' নামে Paris হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার আগে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পণ্ডিত A. Meillet মূল গ্রন্থের সংশোধন ও পরিপূরণ করিয়া প্যারিসে 'Introduction a'l'etude comparative des langues indo-europeennes' প্রকাশ করেন।

Brugmann-এর গ্রন্থ ইন্দোজার্মান ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণচর্চার এক মহাকোষ বা Encyclopaedia-স্বরূপ। অনুরূপ বিষয়ে তাঁহার আরও গ্রন্থ আছে। এই প্রসঙ্গে, ভলগানদীর অববাহিকায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ব্যবহারকারীদের আদিম বসতিস্থল ছিল বলিয়া মত প্রচার করেন Schrader সাহেব।[১৩] তিনি ছিলেন জার্মেনির Kiel

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক। ভারতে Adyar Library-র কিউরেটরের পদেও তিনি কিছু কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মতে দ্রাবিড় ভাষা উরালিয়ান (Uralian) ভাষাগোষ্ঠীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তাঁহার দুই গ্রন্থ—(১) Sprachvergleichung und Urgeschichte, 1906 এবং (২) 'Reallexikon der indo-germanischen Altertumskunde,' Strassburg,.1901. জার্মানপণ্ডিত Wilhelm von Humboldt (1767-1835) ১৮৩২ খ্রীঃ প্রকাশিত তাঁহার 'Uber die Kawi-Sprache auf der Insel Java'-গ্রন্থে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সংস্কৃতের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেন। এই গ্রন্থই ১৮৩৬ খ্রীঃ Uber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues (On the Variety of human Language structure) নামে প্রকাশিত হয়। নিম্নে আরও কয়েক জন বিখ্যাত গ্রন্থকারের কয়েকটি গ্রন্থের নামমাত্র পরিচয় দেওয়া গেল—C.W.Wall-রচিত 'An essay on the nature, age and origin of the Sanskrit writing and language', Dublin, 1838 ; Niels Ludvig Westergaard-রচিত 'On the Connexion between Sanscrit and Icelandic', London, 1841 ; 'Radices Linguae Sanscritae ad decreta grammaticorum definivit atque copia exemplorum exquisitorum illustravit,' Bonnae, 1841, 'Kortfattet Sanskrit formlaere', Kjobenhavn, 1846 ; G. I. Ascoli-রচিত Studi Orientali e linguistici (3 fasc.), Goriz, 1845-55, 1861, Lezioni di fonologia comparata del sanscrito, del greco e del latino, Tor. 1870—ইঁহার মতে ইরানীভাষা কতকাংশে সংস্কৃত অপেক্ষা বেশী প্রাচীন এবং পরিচ্ছন্ন ; A. Regnier-রচিত 'Etude sur l'idiome des Vedas et les origines de la langue sanscrite', Paris 1855, 'Etudes aur la grammaire Vedique' ; Johannes Schmidt-রচিত Die verwandtschaft sverhaltnisse der indo-germanischen Sprachen ; Weimar, 1872 ; Berthold Delbruck-রচিত 'Ablativ localis Instrumentalis im Altindischen, Lateinischen, Griechischen und Deutschen ...", Berlin, 1867, Der Gebrauch des conjunctivs und optativs im Sanskrit und Griechischen, Halle, 1871 ; August Fick-রচিত 'Worterbuch der indo-germanischen grundsprache in ihrem

Bestande vor der 'volkertrennung', Gottingen, 1868—ইহা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সমূহের তুলনামূলক শব্দাভিধান ; পরবর্তী ৩য় সংস্করণে (১৮৭৪-৭৬) ইহার নাম হয়—'Vergleichendes Worterbuch der indo-germanischen Sprachen...' ; F. Muller (1834-98)-রচিত Grundriss der sprachwissenschaft (Vienna, 1876-৪৪)—এই গ্রন্থে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণাংশ সংগৃহীত এবং এই বিষয়ে একমাত্র অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলিয়া ভাষাতত্ত্বের ছাত্রের নিকট অপরিহার্য ; বহু গ্রন্থের রচয়িতা A.H.Joseph Bergaigne (1838-৪৪)-রচিত 'Manuel pour etudier le Sanscrit Vedique', Paris, 1890 ; 'Inscriptions Sanscrites de Cama' এবং 'Inscriptions Sanscrites du Cambodge'—উভয় গ্রন্থই প্যারিস হইতে ১৮৯৩-এ প্রকাশিত ; জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক Ferdinand de Saussure (1857-1913)-রচিত 'Memoire sur le systeme primitif des voyelles dans les langues indo-europeennes' এবং 'Cours de linguistique generale' যথাক্রমে Leipzig ও Geneva হইতে ১৮৭৮ ও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ; ভাষা-বিজ্ঞানের 'langue' এবং 'parole' সংজ্ঞা দুইটি তাঁহারই আবিষ্কার বলিয়া ইহাদিগকে 'Saussurean terms' বলা হয়—যাহা বিনা-অনুবাদে সর্বভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে[১৪] এবং এইরূপ 'Synchronic' (or descriptive) এবং 'Diachronic' (or historical) শব্দ দুইটিও সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন ; Paul Regnaud-রচিত 'Phonetique historique et comparee du Sanscrit et to Zend', Paris, 1895 ; E. W. Oskar Windisch (1844-1918)-রচিত 'Geschichte der Sanskrit- philologie und indischen Altertumskunde', Leipzig, 1888 ; Alfred Ludwig-রচিত 'Die Genesis der grammatischen Formen des Samskrt und des zeitliche Reihenfolge in der Selbstandigwer dung der indo-europaischen Sprachen', Prag, 1891 ; K. E. Kanga-রচিত 'A practical grammar of the Avesta language compared with Sanskrit', Bombay, 1891 ; কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্দো-ইরানিয়ান ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক A. V. W. Jackson (1862-1937)-রচিত

An Avesta grammar in comparison with Sanskrit, 1892 ; হল্যাণ্ডের আমষ্টারডম্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক C.C.Uhlenbeck-রচিত Handbuch der Indische klankleer in vergelijking met die der indo-germanische stamtaal এবং Kurzge fasstes etymologisches Worterbuch der altindischen Sprache — যথাক্রমে Leiden ও Amsterdam হইতে ১৮৯৪ ও ১৮৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ; প্রথম গ্রন্থের তৎকৃত ইংরেজী অনুবাদ 'A manual of Sanskrit phonetics in comparison with the Indo-Germanic mother language, for the students of Germanic and classical philology'—London, 1898 এবং দ্বিতীয়টি একটি পূর্ণাঙ্গ নির্বচনমূলক শব্দাভিধান ; তাঁহার মতে 'From an Indian dialect of the Veda-period sprang the Samskrtabhasa of Madhyadeca, which some centuries before Christ must have been a living language, be it not in quite the same form as in most of the literary Sanskrit works....this spoken Sanskrit descends from an other Old Indian dialect than that of the Vedic hymns'—Introduction (p.4) to 'A manual of Sanskrit phonetics....' অর্থাৎ বৈদিক যুগের অপর এক অবৈদিক প্রাচীন ভারতীয় ভাষা হইতে (ভারতের) মধ্যদেশীয় সংস্কৃত ভাষার জন্ম—যাহা সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থাদির ভাষা হইতে বিলক্ষণ এবং খ্রীষ্ট জন্মের কয়েক শত বর্ষ পূর্বে কথ্য ভাষা রূপে বর্তমান ছিল ; বহুগ্রন্থকৃৎ H. Hirst-এর 'Indogermanische Grammatik'—সাত খণ্ডে Heidelberg হইতে ১৯২১-৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত ; M. Gatta-রচিত 'Studio morfologico comparato del verbo greco, latino, sanscrito', Trani, 1900 ; প্রথমে প্যারিসে ইন্দো-ইউরোপীয় ষ্টাডিজ-এর ডাইরেকটর এবং পরে College de France-এর অধ্যাপক A. Meillet (1866-1936)-রচিত 'Linguistique historique et linguistique generale', Paris, 1936 ; M. Walleser-প্রণীত 'Zur Aussprache des Sanskrit und Tibetischen', Heid, 1926 ; Hannes Skold-রচিত 'Untersuchungen zur Genesis der altindischen etymologischen literatur', Lund—Leipzig 1928[১৫] ; Alois

Walde (1869-1924)-রচিত 'Vergleichendes Worterbuch der indo-germanischen Sprachen'—ইহা J.Pokorney-কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া যুগপৎ বার্লিন ও লিপজিগ্ হইতে (১৯৩০-৩২) প্রকাশিত হয় ; K.F. Leidecker-রচিত 'Sanskrit : Essentials of Grammar and Language', New York, 1934—এই গ্রন্থে তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপযোগিতা বর্ণিত ; বহু গ্রন্থকৃৎ Franciscus B.J. Kuiper-প্রণীত 'Proto-Munda Words in Sanskrit', Amsterdam, 1948 এবং 'Shortening of Final vowels in the Rig Veda', Do,1955 ; Jan Gonda (1905-)-রচিত 'Remarques sur la place du verbedans la phrase active et moyenne en langue Sanscrite', Utrecht, 1952—এই গ্রন্থে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সমূহের সহিত তুলনামূলক ভাবে সংস্কৃত বাক্যে ক্রিয়াপদের অবস্থিতি লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ—'Sanskrit in Indonesia', Nagpur, 1952, 'The character of the Indo-European moods, with special regard to Greek and Sanskrit', Wiesbaden 1956 এবং 'Four Studies in the Language of the Veda', The Hague, 1959 ; সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Manu Leumann-প্রণীত 'Morphologische Neuerungen im altindischen verbal system'—Amsterdam, 1952.

(৪)

বপের গ্রন্থ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজে প্রাচ্য বিদ্যাসম্বন্ধে একটা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ক্রমে আমেরিকাতেও ইহার প্রভাব পৌঁছে। নবীন গবেষকগণ প্রাচ্য বিদ্যায় শিক্ষালাভ এবং নূতন তথ্যাদি আবিষ্কারের দ্বারা বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিতে আগাইয়া আসেন। বলা বাহুল্য এই গবেষণা কেবল ভাষা ও ব্যাকরণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আমরা অবশ্য প্রসঙ্গানুরোধেই কেবল এই বিষয়ে রচিত গ্রন্থাদিরই নামমাত্র উল্লেখ করিলাম। ইহাদের বেশীর ভাগই জার্মান পণ্ডিতদের দ্বারা জার্মান ভাষাতেই রচিত। এই জন্য জার্মেনিকে বলা হয় 'The Second Home of Sanskrit'—অর্থাৎ

'সংস্কৃতের দ্বিতীয় নিবাস'। জার্মেনির Bonn-কে বলা হয়, 'পাশ্চাত্ত্যের বারাণসী', কারণ, Bonn University সংস্কৃত চর্চায় এবং অধ্যাপনা-গৌরবে একদা সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। সংস্কৃত বিদ্যার অনেক গ্রন্থ এখানে প্রকাশিত হয় এবং প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ বহু পণ্ডিত শিক্ষাসূত্রে এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে ইংরেজ-বাহিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ফরাসী দেশ হইয়া জার্মেনিতে প্রবেশ করে। ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকাতেও সংস্কৃত চর্চার সূচনা হয়। সাহেবদের দেখাদেখি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যেও স্বদেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি একটা নূতন মর্যাদাবোধের সঞ্চার হয়। বলা বাহুল্য, পশ্চিমের পণ্ডিতগণই এশিয়াভূখণ্ডের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের দিকে তাহার উদাসীন উত্তরাধিকারীদের দৃষ্টি নূতন করিয়া ফিরাইয়া আনেন। এই ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানোচিত শিক্ষা এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তাঁহাদের নিকট আমাদের ঋণ অস্বীকার করিলে চলিবে না।

জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার ঐরূপ এক আর্ষপ্রতিভা—যাঁহার নিকট ভারত তথা প্রাচ্য জগতের ঋণ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি প্রথমে ইংরেজী ভাষাতেই যে সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন তাহার নাম 'A Sanskrit Grammar for beginners in Devanagari and Roman letters throughout', London, 1866. ইহার F.Kielhorn and G. Oppert-কৃত জার্মান অনুবাদ 'Sanskrit Grammatik, in Devanagari und Lateinischen buchstaben'—জার্মেনির লিপ্‌জিগ্ হইতে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ম্যাক্সমূলারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি—সায়ণাচার্যের 'মাধবীয় বেদার্থপ্রকাশ' ভাষ্যসহ ঋগ্‌বেদের সম্পাদনা। ইহা তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থানুকূল্যে অক্স্‌ফোর্ড হইতে ৬ খণ্ডে (১৮৪৯-৭৪) প্রকাশিত হয়, ২য় সংস্করণে (১৮৯০-১৯০২) চারি খণ্ডে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ—'A History of Ancient Sanskrit Literature', London, 1859 ; 'Rig Veda Pratisakhya (–Text with German translation)', Leipzig, 1859-60 (ইহা তৎসম্পাদিত গ্রন্থ), 'The Science of Language' (দুই খণ্ডে), London, 1861 and

1863 ; 'Chips from a German Workshop' (চারি খণ্ডে), London, 1867-75 ; 'Introduction to the Science of Religion', London, 1873; 'The Sacred Books of the East' (৫১খণ্ডে), Oxford, 1875-1900 ; 'India : What can it teach us ?', London, 1883 ; 'Biographies of words and the Home of the Aryans', London, 1888.

কবি Wilhelm Muller-এর পুত্র রূপে ৬।১২।১৮২৩ তারিখে জার্মেনির Dessau নগরে ম্যাক্স্ মূলারের জন্ম। Leipzig বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে Ph. D. ডিগ্রীলাভের পর তিনি বার্লিনে ফ্রা. বপের এবং প্যারিসে E.Burnouf-এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে আসেন এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্স্ফোর্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হন। কর্মজীবনে তিনি প্রথমে ইউরোপীয় আধুনিক ভাষাসমূহের ডেপুটি টেইলরিয়ান অধ্যাপক (১৮৫০), পরে ঐ বিষয়ে প্রধান অধ্যাপক (১৮৫৪-৬৮), অক্স্ফোর্ডের বোডেলিয়ান লাইব্রেরীর কিউরেটর (১৮৫৬-৬৩, ১৮৮১-৯৪) এবং অক্স্ফোর্ডের তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রথম অধ্যাপক (১৮৬৮-১৯০০—যদিও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ হইতে তিনি কার্যতঃ অবসর নেন)।

ভাষা-বিজ্ঞানে সংস্কৃতের ভূমিকা এবং ইহার ফলশ্রুতিসম্বন্ধে তাঁহার উক্তি ঃ 'The results of the science of language, which, without the aid of Sanskrit, would never have been obtained, form an essential element of what we call a liberal, that is, an historical education' ('India ; what can it teach us ?') ; 'And what is that higher purpose, which the science of language is meant to serve ? It is to discover the secrets of thought in the labyrinth of language, after the dark chambers of that labyrinth have first been lighted up by the torch of comparative philology.' (—Last Essays) ; 'If history is to teach us anything, it must teach us that there is a continuity which binds together the present and the past, East and West. And no branch of history teaches that lesson more powerfully than the history of language and the history of religion. ' তাঁহার মতে শব্দ চিন্তার

প্রতীক, বস্তুর প্রতীক নয়, এবং মানব-মনের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ যথাযথ ভাবে ভাষার ইতিহাসের মধ্য দিয়াই অনুধাবনীয়। তাঁহার মতে ধাতুসমূহই ভাষা-বিজ্ঞানের সর্বশেষ উপাদান—যাহা আসলে চিন্তারই প্রতীক, কোনো ভাবাবেগ বা প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণজাত নয়। এই ব্যাপারে সংস্কৃত ধাতুর উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য : 'I make bold to say that there are few concepts in English or Latin or Greek that could not be expressed with the words derived from Sanskrit roots. I believe, on the contrary, that the number of roots necessary to account for the whole wealth of the English Dictionary, which is said to amount to 25000 words, is smaller than that of Panini's roots, even after they have been reduced to their proper limits....There is no sentence in English of which every word cannot be traced back to the 800 roots, and every thought to the 121 fundamental concepts which remained after a careful sifting of the materials supplied to us by Panini'—'The Science of Thought.' তিনি নিজের সম্বন্ধে কি সুন্দর ভাবেই না বলিয়াছেন : 'Through the whole of my life, I have cared for truth, not for success. And truth is not our own. We may seek truth, serve truth, love truth ; but truth takes care of herself, and she inspires her true lovers with the same feeling of perfect trust.'

জার্মান পণ্ডিত Theodor Benfey (1809-81)-রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ 'Vollstandige Grammatik der Sanskrit Sprache' লিপ্‌জিগ হইতে ১৮৫২-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্ত্য ভাষায় রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণে বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ যোজনা করেন। সংস্কৃত শব্দাবলীর ব্যাখ্যায় তুলনামূলক শব্দতত্ত্বেরও প্রচুর সাহায্য তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঐ ব্যাকরণের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণও প্রকাশ করেন ('Kurze Sanskrit Grammatik zum Gebrauche fur Anfanger', Leipzig, 1855)। তাঁহার মূলগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ 'A Practical Grammar of the Sanskrit Language for the use of early students' লণ্ডনে ১৮৬৩-

৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'Die Hymnen des Sáma Veda, Herausgegeben', Leipzig, 1848—তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। ইহাতে সাম-বেদের জার্মান অনুবাদও যোজিত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ—'Chrestomathie aus Sanskritwerken', Leipzig, 1853-54 ; 'A Sanskrit-English Dictionary with references to the best editions of Sanskrit authors, and etymologies and comparisons of cognate words, chiefly in Greek, Latin, Gothic, and Anglo-Saxon', London, 1866 ; 'Geschichte der Sprachwissenschaft und Orientalischen Philologie in Deutschland', Munich, 1869—এই গ্রন্থে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে জার্মেনিতে ভাষাতত্ত্ব-গবেষণার ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে ; 'Uber die Entstenhung und Verwendung der im Sanskrit mit r anlautenden Personal-endungen', Gottingen, 1870 ; 'Einleitung in die Grammatik der Vedischen Sprache', I-Der Samhita Text, Gottingen, 1874; 'Vedica und Verwandtes', Strassburg, London, 1874 ; 'Uber einige Worter mit dem Bindevokal I im RgVeda', Gottingen, 1879 ; 'Vedica und Linguistica', Strassburg, 1880 ; 'Behandlung des auslautenden a in na "wie" und na "nicht" im RgVeda mit einigen Bemerkungen Uber die ursprungliche Aussprache und Accentuation der Worter im Veda', Gottingen, 1881 ; 'Kleine sprachwissenschaftliche schriften', Berlin, 1894 এবং 'Kleinere Sanskrit philologische schriften', Berlin, 1894. জার্মেনির গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া সেই সহরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জার্মান পণ্ডিত Otto Nikolaus Bohtlingk (1815–1904)-কর্তৃক সম্পাদিত পাণিনির ব্যাকরণ ('Panini's Acht Bucher, grammatischer Regeln. Herausgegeben und erlautert') Bonn হইতে ১৮৩৯–৪০ খ্রীষ্টাব্দে দুই খণ্ডে বাহির হয়। ইহাতে পাণিনির সূত্রাবলীর সহিত ধরণীধর ও কাশীনাথ-রচিত টীকাও সংযোজিত ছিল। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিপ্‌জিগ হইতে ইহার যে জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন তাহাই ইউরোপীয় ভাষায় পাণিনির প্রথম অনুবাদ। উণাদি প্রত্যয়-

বিষয়ে জার্মান ভাষায় অনুবাদাত্মক তাঁহার অন্য গ্রন্থ—'Die Unadi-Affixe herausgegeben und mit anmerkungen verschiedenen....' ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গ হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার পর বাহির হয় তাঁহার 'Die Deklination im Sanskrit' এবং 'Sanskrit chrestomathie'—দুই-ই সেণ্টপিটার্সবার্গ হইতে যথাক্রমে ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সেখান হইতে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের এক বিশেষ সংস্করণও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তৎসম্পাদিত 'অভিধান চিন্তামণি' ('Hemakandra's Abhidhanakintamani, Ein systematisch angeordnetes synonymisches Lexicon' von Otto Boehtlingk und Charles Rieu)। লিপ্‌জিগ হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তৎসম্পাদিত ও অনূদিত ছান্দোগ্যোপনিষদ্ এবং মাধ্যন্দিনীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আর এক রচনা 'Indische Spruche, Sanskrit und Deutsch' (তিন খণ্ডে, ২য় সংস্করণ, সেণ্টপিটার্সবার্গ, ১৮৭০-৭৩)। তাঁহার সর্বপ্রধান কীর্তি—R. Roth-এর সহিত একত্রে সংস্কৃত-জার্মান অভিধান 'Sanskrit-Worterbuch' (৭খণ্ডে সেণ্টপিটার্সবার্গ হইতে ১৮৫৫-৭৭) বা 'সেণ্টপিটার্সবার্গ ডিক্সনারি'র সঙ্কলন। পরে তিনি ৭খণ্ডে ইহার এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণও প্রকাশ করেন ('Sanskrit Worterbuch, im Kurzerer Fassung,' St. Petersburg, 1878-89)।

সংস্কৃতগতপ্রাণ আর এক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত—বিখ্যাত আভিধানিক স্যর মনিয়র উইলিয়মস্ (১৮১৯-৯৯)। বোম্বের তৎকালীন সার্বেয়ার-জেনারেল কর্নেল মনিয়র উইলিয়মস্ তাঁহার পিতা। সেইখানে ১২।১১। ১৮১৯ তারিখে তাঁহার জন্ম হইলেও অক্সফোর্ডেই তিনি শিক্ষালাভ করেন (অক্সফোর্ডের বি.এ.)। ভারতীয় বিদ্যার শিক্ষার্থী হিসাবে তিনি তিন বার ভারতে আসিয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষায় লেখা তাঁহার তিনখানি সংস্কৃত ব্যাকরণের গ্রন্থ—'An Elementary Grammar of the Sanskrit Language, arranged according to a new theory', London, 1846; 'A Practical Grammar of the Sanskrit Language, arranged with reference to the classical Languages of Europe, for the use of English Students', Oxford, 1857 এবং

'Sanskrit Manual for composition', London, 1862. হিন্দুস্থানী ভাষা ও ব্যাকরণের উপর তাঁহার গ্রন্থ—'An Easy Introduction to the Study of Hindustani' (1859) এবং 'Hindustani Primer'. তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান—'A Sanskrit-English Dictionary, etymologically and philologically arranged with special reference to Greek, Latin, Gothic, German, Anglo-Saxon and the other Indo-European Languages', Oxford, 1888; 2nd edn. (greatly enlarged and improved with the collaboration of E. Leumann, C. Cappeller and other scholars) 1899. ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার ১ম খণ্ড মুদ্রিত হয়। তৎপূর্বেই তাঁহার ইংরেজী- সংস্কৃতাভিধান 'A Dictionary, English and Sanskrit—published under the patronage of the honorable East India Company—২খণ্ডে যথাক্রমে ১৮৫০ ও ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

Oxford-এ তিনি H. H. Wilson-এর ছাত্র ছিলেন। ১৮৪৪–৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেখানকার East India College-এর সংস্কৃত, পার্সি ও হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপনা করেন এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে Boden Chair of Sanskrit–এ অধিষ্ঠিত হন। অক্সফোর্ডে 'Indian Institute'-এর প্রতিষ্ঠা তাঁহার আর এক বিশেষ কীর্তি। দীর্ঘ ২১ বৎসরের চেষ্টায় কেবল সংগৃহীত চাঁদার অর্থে তিনি ইহা গড়িয়া তোলেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ—'Indian Wisdom', London, 1875; 'Hinduism', London, 1877 ; 'The Study of Sanskrit in relation to missionary work in India' এবং 'The Modern India and the Indians', London, 1878. সংস্কৃত ভাষা- ও ব্যাকরণ-সম্বন্ধে তাঁহার নিম্নধৃত উক্তি প্রণিধানযোগ্যঃ'Let us not forget that Sanskrit is as closely allied as Greek to our mother tongue, that its symmetrical grammar is the key to all other grammars, that its system of synthesis is as useful to the mind as the study of geometry and that its literature contains models of true poetry and some of the most remarkable treatises on philosophy, science and ethics that the world has ever produced.

Above all let those who are preparing for an Indian career bear in mind that Sanskrit is the only source of life, health and vigour to all the spoken languages of the Hindus, the only repository of Hindu religions, creeds, customs and observances.'

আমেরিকার প্রথম খ্যাতনামা সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিত William Dwight Whitney (1827-94) সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে[১৬] ইংরেজী ভাষায় যে সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন তাহার নাম 'A Sanskrit Grammar, including both the classical Language, and the older Dialects, of Veda and Brahmana' (Leipzig, 1879). ১৮ অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই গ্রন্থে বৈদিক ভাষার সহিত সংস্কৃতের সম্পর্ক প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহার এক পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহার ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি (১৯৬১) ভারতেও (মতিলাল বারাণসী দাস, দিল্লী) এই গ্রন্থের এক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। হেনরিক জিমার-কৃত ইহার জার্মান অনুবাদও ('Indische Grammatik, umfassend die Klassische Sprache und die alteren Dialekte...' Ausdem englischen ubersetzt von Heinrich Zimmer, Leipzig, 1879) মূল গ্রন্থ প্রকাশের বৎসরেই প্রকাশিত হয়। এই ব্যাকরণের পরিপূরক ধাতুবিষয়ক গ্রন্থ 'The Roots, verbforms, and primary derivatives of the Sanskrit Language' ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হুইট্‌নি লিপ্‌জিগেই প্রকাশ করেন।

আমেরিকার প্রাচীন বনেদী বংশের সন্তান হুইট্‌নি বি. এ. পাশ করার পর বপের সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া এই ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া (১৮৪৯) অধ্যাপক E. E. Salisbury (1814-1901)-র নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পরে বার্লিনে গিয়া ওয়েবার প্রভৃতি জগদ্‌বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিতদের নিকট শিক্ষা লাভান্তে তিনি উক্ত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথমে সংস্কৃতের এবং পরে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক (১৮৫৪-৯৪) নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি জার্মান পণ্ডিত R. Roth-এর সহিত একযোগে বার্লিন হইতে ১৮৫৫/৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অথর্ববেদ-সংহিতা সম্পাদনাপূর্বক প্রকাশ

করেন এবং স্বয়ং দুই খণ্ডে ইহার যে ইংরেজী অনুবাদ প্রস্তুত করেন তাহা C.R.Lanmann-কর্তৃক ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির সহিত আমরণ সংশ্লিষ্ট থাকিয়া হুইট্‌নি প্রথমে ইহার গ্রন্থাগারিক, পরে অন্যতম সম্পাদক এবং সর্বশেষে সভাপতি হন। এই সোসাইটির জার্নালেই ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তৎসম্পাদিত এবং অনূদিত অথর্ববেদপ্রাতিশাখ্য ('The Atharva Veda Praticakhya or Caunakiya Caturadhyayika', Text, Translation and notes, in the Journal of the American Oriental Society, vol. 7, 1862) প্রকাশিত হয়। তাঁহার সম্পাদিত অন্য গ্রন্থ 'The Taittiriya Praticakhya' বাহির হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে।

হুইট্‌নি-রচিত অন্যান্য গ্রন্থ—'Language and the Study of Language' (1867), 'Oriental and Linguistic Studies' (in 2 vols., 1873 + 1874), 'The Life and Growth of Language' (1874), 'Language and its Study' (with special reference to the Indo-European family of Languages) 1876, 'Index of verborum of the Atharva Veda' (1881), 'Max Muller and the Science of Linguistics : A criticism' (1892) এবং 'Languages and Dialects' প্রভৃতি। সেন্টপিটার্সবার্গ অভিধান-রচনাতেও তাঁহার হাত ছিল। তাঁহার মতে ভাষা কতকগুলি ইসারা-ইঙ্গিতের পরিবর্তে আরোপিত শব্দসমষ্টি। অনুকরণ হইতেই ভাষার জন্ম এবং বিস্তৃতি। বৈদিক ভাষার সহিত তুলনামূলক বিচারে তিনি পাণিনির বৈদিক সূত্রাবলীকে একেবারেই অপ্রচুর এবং অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। সিলভাঁ লেভির মতে পাণিনিকে বৈদিক ব্যাকরণের প্রণেতা বলা চলে না।[১৭]

ভারতবিদ্যাপ্রেমিক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একদা বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত অধ্যাপক গোলডষ্টুকার (১৮২১-৭২)। প্রুশিয়ার এক ইহুদী পরিবারে তাঁহার জন্ম। কোনিগস্‌বার্গ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট, প্যারিসে ইউজিন বুর্নুফের (১৮০১-৫২) নিকট তিন বৎসর অধ্যয়নের পর ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে আসিয়া লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে সংস্কৃতের অবৈতনিক অধ্যাপকরূপে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিযুক্ত থাকেন।

তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'Panini : his place in Sanskrit literature' (An investigation of some literary and chronological questions), London, Berlin, 1861. পাণিনির সম্বন্ধে ইহাই সর্বপ্রথম বিস্তৃত আলোচনা। পাণিনির গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁহার একটি অভিমত : 'No work has struck deeper roots than his (Panini's) in the soil of the scientific development of India.'

বর্তমানে গোলড্‌ষ্টুকারের বহু সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বিবেচিত না হইলেও তখনকার পণ্ডিতসমাজে তাঁহার গ্রন্থ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 'সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস'-প্রণেতা রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) ইহার অবলম্বনে 'পাণিনি' নামে বাঙ্‌লা ভাষায় যে ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক তাহা প্রকাশিত হয়। মহাভাষ্যোক্ত (৩।২।১২৩) উদাহরণের সাহায্যে গোলডষ্টুকার-প্রস্তাবিত পতঞ্জলির গ্রন্থরচনা-কালই (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক) রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর অনুরূপ আরও প্রমাণ-বলে সমর্থন করেন। পূর্বোক্ত H. H. Wilson-এর সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের ২য় সংস্করণের (কলিকাতা ১৮৩২) ভিত্তিতে গোলডষ্টুকার আর এক অপেক্ষাকৃত উন্নত ও পরিবর্ধিত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান প্রস্তুত করেন—'A Dictionary, Sanskrit and English, extended and improved from the 2nd edition of the Dictionary of Prof. H. H. Wilson with the sanction and concurrence, together with a supplement, grammatical appendices and an index, serving as an English-Sanskrit Vocabulary', parts I-IV, London, 1856-64. ইহার এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ('Sanskrit and English Dictionary') Ram Jasan-কর্তৃক প্রস্তুত হইয়া যুগপৎ লণ্ডন এবং বারাণসী হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গোলডষ্টুকারের প্রবন্ধাবলী 'Literary Remains of the Late Prof. Theodor Goldstucker' নামে ২ খণ্ডে লণ্ডন হইতে ১৮৭৯ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

জার্মান পণ্ডিত ব্যুলার (Johann Georg Buehler 1837-98) সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য জার্মান ভাষায় 'Leitfaden furden elementar cursus des Sanskrit ; mit ubungs-stucken und zwei glossaren'

(Wien, 1883) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নিউইয়র্কের কলম্বিয়া কলেজের অধ্যাপক এড্‌ওয়ার্ড্ ডিলাভান পেরি (১৮৫৪-১৯৩৮) ইহার 'A Sanskrit Primer' নামে যে ইংরেজী অনুবাদ প্রস্তুত করেন তাহা ১৮৮৬ হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৫০ বৎসরে ১৫ বার মুদ্রিত হয়। হুইট্‌নির ব্যাকরণের প্রভাব এই ইংরেজী পুস্তকে কার্যতঃ স্বীকৃত ঃ '...to attempt a combination of Buehler's practical exercises with Whitney's theory ; and to this end the book has been really rewritten'—Perry. বূ্যলারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি—'ভারতীয় বিদ্যাকোশে'র সম্পাদনা। বিশ্বের ৩০ জন ভারত-তত্ত্ববিশারদের সহায়তায়, ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের তাঁহার সময় পর্যন্ত পরিজ্ঞাত যাবতীয় তথ্যের সমন্বয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ এই মহাকোশের রচনার তিনিই পরিকল্পনা করেন এবং তাঁহারই সম্পাদনায় 'Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Altertumskunde' (অর্থাৎ 'Encyclopaedia of Indo-Aryan Research') নামে ইহার ৯ খণ্ড জার্মেনির Strassburg হইতে J. Trubner-কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বূ্যলারের মৃত্যুর পর তাঁহারই ভূতপূর্ব সহকারী অধ্যাপক কীলহর্ন ইহার অবশিষ্টাংশের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। কীলহর্নের পর লুডার্স এবং ওয়াকারনাগেলের উপর এই কার্যভার অর্পিত হয়। মোট ২১ খণ্ডে ১৮৯৬-১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাকোশ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সম্পাদনা-কালে বূ্যলার ভারতীয় লিপিতত্ত্ব বিষয়ক 'Indische Palaeographie' (Strassburg, 1896) নামক যে নিবন্ধ রচনা করেন তাহার ইংরেজী অনুবাদ 'Indian Palaeography'—Indian Antiquary পত্রিকায় (Vol. xxxiii, 1904) পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি ইহা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত Indian Studies নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যায় (Oct.1959) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই গবেষণা-নিবন্ধে তিনি প্রমাণ করেন যে বেদ-রচনার কালেও ভারতে লিপির প্রচলন ছিল। এই বিষয়ক তাঁহার 'On the Origin of the Indian Brahma Alphabet' (Strassburg, 1898) নামক অন্য পুস্তকে তিনি প্রতিপাদন করেন যে খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ ৮০০ বৎসর পূর্বে ভারতে ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন ছিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গটিনজেন হইতে তাঁহার সম্পাদনায় ধনপালের 'পাইঅলচ্ছী-

নামমালা' নামক প্রাকৃত শব্দকোষ প্রকাশিত হয়। তিনি বিখ্যাত জৈন বৈয়াকরণ হেমচন্দ্রাচার্যের এক উৎকৃষ্ট জীবনীও জার্মান ভাষায় প্রণয়ন করেন—'Uber das Leben des Jaina Monches Hemacandra' (Wien, 1889)—যাহার মণিলাল প্যাটেল-কৃত ইংরেজী অনুবাদ 'The Life of Hemacandracarya' কলিকাতায় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

অক্লান্তকর্মা মনীষী ব্যূলার সাহেব ১৯।৭।১৮৩৭ তারিখে জার্মেনির হ্যানোভার প্রদেশে Borstel গ্রামে এক ধর্মযাজকের পুত্র রূপে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর পূর্বোক্ত Benfey-র নিকট সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণে অনুপ্রাণিত হন। প্যারিস, লণ্ডন ও অক্সফোর্ডে কিছুকাল বিদ্যাচর্চা করিয়া তিনি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন এবং বোম্বের এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ কলেজে প্রাচ্য ভাষার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে মিলাইয়া প্রায় ৫০০০ পুঁথি তৎকর্তৃক সংগৃহীত হয়। ১৮৮০ সনে অবসর গ্রহণপূর্বক ইউরোপে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও প্রাচ্য বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। এখানে সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিক Winternitz (1863-1937) ছিলেন তাঁহার অন্যতম ছাত্র। ৫।৪।১৮৯৮ তারিখে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে দেখা করিতে জুরিখ-যাত্রাপথে কনস্‌টান্স্ হ্রদে একটি নৌকা ভাড়া করিয়া বিহারের সময় দুর্ভাগ্যক্রমে জলমগ্ন হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

হুইট্‌নির ছাত্র এবং প্রথমে বালটিমোর-এ জনস্ হপ্‌কিনস্ এবং পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক চার্লস্ রক্‌ওয়েল ল্যানম্যান্ (১৮৫০-১৯৪১)-রচিত 'A Sanskrit Reader : with Vocabulary and Notes' তিন খণ্ডে বোষ্টন হইতে ১৮৮৪-৮৯ সনে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'Journal of the American Oriental Society'-তে তাঁহার গবেষণামূলক বিশেষ মূল্যবান প্রবন্ধ 'A Statistical Account of Noun-Inflections in the Veda' প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা পরে নিউহেভেন হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'On Noun-Inflections in the Veda' নামে পুস্তকাকারে বাহির হয়। ১৮৮৯ সনে তিনি ভারতে আসিয়া মারাঠী পণ্ডিত ধর্মানন্দ কোশম্বীর নিকট পালিভাষা শিক্ষা করেন এবং ফিরিবার সময় বহু মূল্যবান পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি

সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'Harvard Oriental Series' শীর্ষক গ্রন্থমালা প্রকাশের পরিকল্পনা এবং সম্পাদনা। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অদ্যাবধি ভারতীয় বিদ্যার বহু গ্রন্থ এই সিরীজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী জ্যাকব ওয়াকেরনাগেল (১৮৫৩-১৯৩৮)-কর্তৃক পরিকল্পিত এবং প্রারব্ধ 'Altindische Grammatik'—সংস্কৃতের এক বিরাট পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ। ৪।৫ ভাগে কয়েক খণ্ডে প্রকাশিতব্য এই গ্রন্থে বৈদিক ও তৎপরবর্তী সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ-বর্ণনার প্রতিশ্রুতি বর্তমান। এযাবৎ ইহার তিন ভাগ (মোট ৪ খণ্ড) প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমভাগ (গ্যোটিনজেন ১৮৯৬) এবং ২য় ভাগের ১ম খণ্ড (১৯০৫) একক ওয়াকেরনাগেলের রচনা। ২য় ভাগের ২য় খণ্ড (১৯৫৪) এবং ৩য় ভাগ (১৯২৯-৩০) রচনা করেন তাঁহারই ছাত্র এবং স্থলাভিষিক্ত আলবার্ট ডেবরানার (১৮৮৪-১৯৫৮)। ইহার ৪র্থ ভাগ (ক্রিয়া-বিষয়ক) প্রকাশের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ওয়াকেরনাগেল ছিলেন গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি প্রধানতঃ সুইজারল্যাণ্ডের Basel বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিলেও মধ্যে কয়েক বৎসর গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। তাঁহার ব্যাকরণ-সম্বন্ধে ম্যাকডোনেল সাহেবের উক্তি ঃ 'The first grammar treating Sanskrit from a comparative point of view is the excellent work of Wackernagel.'

বিদেশী বৈয়াকরণদের মধ্যে আর একটি বিখ্যাত নাম আর্থার এন্টোনি ম্যাকডোনেল (১৮৫৪-১৯৩০)। তাঁহার বৈদিক ব্যাকরণ 'Vedic Grammar' ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে Strassburg হইতে প্রকাশিত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বৈদিক ব্যাকরণ-বিষয়ক গবেষণাপ্রসূত যাবতীয় তথ্যের ভিত্তিতে রচিত ইহা এক পূর্ণাঙ্গ বৈদিক ব্যাকরণ। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড হইতে ইহার এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'A Vedic Grammar for Students' প্রকাশিত হয়। পর বৎসর বাহির হয় 'A Vedic Reader for Students.' ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত তৎসঙ্কলিত 'A Sanskrit-English Dictionary, Being a practical handbook with transliteration, accentuation and etymological analysis throughout'-গ্রন্থেও প্রচুর বৈদিক শব্দের অন্তর্ভুক্তি, ইহাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। তাঁহার 'A Sanskrit grammar for

Beginners' লণ্ডনে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ৩য় সংস্করণ (লণ্ডন, ১৯২৭) হইতে ইহার নাম হয় ' A Sanskrit grammar for students'। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয় 'A History of Sanskrit Literature' (London)। তাঁহারই সম্পাদনায় 'Harvard Oriental Series'-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে দুই খণ্ডে সানুবাদ বৃহদ্দেবতা[১৮] প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ষড়্গুরুশিষ্যের বেদার্থদীপিকা-ভাষ্যাংশসহ ঋগ্বেদের কাত্যায়নকৃত সর্বানুক্রমণী প্রকাশ করেন।[১৯] A. B. Keith[২০]-এর সহযোগিতায় ২ খণ্ডে তৎসঙ্কলিত 'Vedic Index of Names and Subjects' (London, 1912—) বৈদিক তথ্যানুসন্ধিৎসুদের অপরিহার্য গ্রন্থ।[২১] তাঁহার 'India's Past ; a survey of her literatures, religions, languages, and antiquities' (Oxford, 1927)-গ্রন্থও কম মূল্যবান নয়।

ভারতে জন্মগ্রহণ করিলেও ম্যাকডোনেল জার্মেনি ও ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অক্স্‌ফোর্ডের এম্. এ. এবং লিপ্‌জিগের Ph.D. অক্স্‌ফোর্ডই তাঁহার কর্মক্ষেত্র। সেখানকার Boden-অধ্যাপকরূপে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দুই বার (১৯০৭/৮ এবং ১৯২২/২৩) ভারতে আসেন। বৈদিক ব্যাকরণই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ইহাতে সমগ্র ঋগ্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ ও যজুর্বেদের বাজসনেয়ি-সংহিতার মন্ত্রভাগ আচরিত হইয়াছে। বাদ পড়িয়াছে—যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতা, মৈত্রায়ণী সংহিতা এবং কাঠকসংহিতার ব্রাহ্মণাত্মক ভাগ। ঋগ্বেদের খিলগ্রন্থাদিতে এবং ব্রাহ্মণ ও সূত্র-সাহিত্যে যেসব মন্ত্রাংশ বা তজ্জাতীয় উপাদান দৃষ্ট হয়, তাহাও এই ব্যাকরণের অংশীভূত করা হইয়াছে। ইহার আট অধ্যায়ে যথাক্রমিক বিষয়-বিন্যাস এইরূপঃ(১) উচ্চারণ, (২) সন্ধি, (৩) স্বর, (৪) প্রাতিপদিক, (৫) সমাস, (৬) শব্দরূপ, (৭) ক্রিয়া এবং (৮) অব্যয়। বৈদিক ব্যাকরণে তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ, প্রথম গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হইলেও তাহাতে অনেক নূতন বিষয় যোজিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে গ্রন্থকারের উক্তি ঃ 'It contains much matter excluded from the "Vedic Grammar"...it adds a full treatment of Vedic Syntax and an account of the Vedic metres...The present work, therefore, constitutes a supplement to, as well as an abridgment of, the

Vedic Grammar, thus in reality setting forth the subject with more complements as a whole, though in a comparatively brief form, than the larger work'—Preface. তবে সহজ শিক্ষার দিক্ দিয়া এই দ্বিতীয় গ্রন্থও যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় তিনি তৃতীয় গ্রন্থ পূর্বোক্ত 'Vedic Reader' প্রকাশ করেন। ইহাতে ৩০টি ঋক্ (মূল), পদপাঠ, রোমান হরফে উহাদের অক্ষরান্তর, অনুবাদ, ব্যাখ্যা-মূলক টিপ্পনী, পরিচায়িকা, শব্দতালিকাপ্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। তিনি নিজেই এই বই-এর মুখবন্ধে লিখিয়াছেন : 'In conjunction with my "Vedic Grammar for Students", the "Reader" aims at supplying all that is required for the complete understanding of the selection without reference to any other book.'

ম্যাক্‌ডোনেলের গ্রন্থই বর্তমানে পৃথিবীতে একমাত্র[২২] স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ বৈদিক ব্যাকরণ। প্রাতিশাখ্যগুলি পূর্ণাঙ্গ বৈদিক ব্যাকরণ নয়। পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীতে যে বৈদিক ব্যাকরণের নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের আনুষঙ্গিক মাত্র। তাঁহার পরে এই বিষয়ে আর কোনো মৌলিক ও ব্যাপক প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না। পূর্বোক্ত বেন্‌ফি এবং হুইট্‌নির গ্রন্থে বৈদিক ব্যাকরণের চর্চাও ঐরূপ আনুষঙ্গিক। এই সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ম্যাক্‌ডোনেল যে বৈদিক ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই এক্ষেত্রে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রূপে দেদীপ্যমান। একজন ইউরোপীয়ের এইরূপ গ্রন্থকর্তৃত্বের দৃষ্টান্ত বৈদিক ভারতের আর্ষ দৃষ্টিতে কেমন দেখায় তাহা এখানকার ম্লেচ্ছ-ভীতিগ্রস্ত আর্যগণই বলিতে পারেন!! লজ্জার বিষয় এই যে, এই যুগে ভারতে এই ধরনের কোনও মৌলিক গ্রন্থ তো রচিত হয়ই নাই, পরন্তু ম্যাক্‌ডোনেলের গ্রন্থের কোনও ভারতীয় ভাষায় অনুবাদও দীর্ঘকাল ঘটিয়া উঠে নাই। সম্প্রতি ইহার সত্যব্রত শাস্ত্রিকৃত হিন্দী অনুবাদ দিল্লীতে প্রকাশিত হইয়াছে বৈদিক ব্যাকরণ নামে। নিম্নে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা- ও ব্যাকরণ-বিষয়ক আরও কিছু গ্রন্থ, গ্রন্থকার এবং প্রকাশের স্থান ও কাল লিখিত হইল :

W.S.Maienskicgo	Grammatyka...Samskrytem (পোলিশ ভাষায় রচিত)	Warszawie, 1828
G.H.F.Nesselmann	De nominibus et verbis cum pronomine interrogativo compositis in lingua Sanscrita Usitatis Dissertatio	Regiom 1838

M.Desgranges—ইনি Chezy-র ছাত্র	Grammaire Sanscrite-Francaise (২ খণ্ডে)[২৩]	Paris, 1845, 1847
Simon Theodor Aufrecht[২৪] (1822-1907)	De accentu compositorum Sanscriticorum (De accentu Sanscritico I)	Bonnac 1847
A. Boller	Ausfuhrliche Sanskrit Grammatik	Wien 1848
F. Baudry	Grammaire Sanscrite (Resume elementaire de la Theorie Formes Grammaticales en Sanscrit)	Paris 1853
A.F.Weber[২৫] (1825-1901)	Verzeichniss der Sanskrit und Prakrit handschriften	Berlin 1853
C. Frechia	Grammatica Sanscrita (দুই খণ্ডে)	Tornio 1856
Dr. Gustav Oppert	Grammaire Sanscrite (?)	Berlin 1859
L. Rodet	Grammaire abregee de la Langue Sanscrite	Paris 1860
Adolf Friedrich Stenzler[২৬] (1807-87)	Elementarbuch der Sanskrit Sprache (Grammatik, Texte und Worterbuch)	Breslau 1868
Carl Gustav Albert Hoefer[২৭]	Kurze elementar Grammatik der Sanskrit Sprache[২৮]	Leipzig 1868
E. Siecke	De genitivi in lingua Sanscritica	Berolini 1869
C. Giussani	Principii della Grammatica Sanscrita	Turin 1870
C. de Harlez	Grammaire pratique de la Langue Sanscrite	Paris 1878
G. Abreu	(1) Principios elementares da grammatica da Lingua Saoskrita (Parte I—Phonologia), (2) Exercicios e primeiras de Samscrito (I–Grammatica e antolojia, II-Vocabulario e notas)	Lisboa 1879 Lisboa 1889, 1898
A. Dutens	Essai sur l'origine des exposants casuels en Sanscrit	Paris 1883
F. L. Pulle	(1) Grammatica Sanscrita, (2) Chrestomazia Sanscrita e Vedica	Tornio 1883 Pad. 1878

August Hijalmar Edgren (1840-1903)		A Compendious Sanskrit Grammar (with a brief sketch of Scenic Prakrit)[২৯]	London 1885
Wilhelm Geiger (1856-1943)		Elementarbuch der Sanskrit Sprache (Grammatik, lesestucke und glossar)[৩০]	Munchen 1888
Victor Henry[৩১]	(1) (2)	Manuel pour etudier le Sanscrit Vedique (Grammaire, Chrestomathie, Lexique) পরবর্তী সংস্করণে ইহার নাম হয়— Manuel de Sanskrit Vedique	Paris 1890 Paris, 1900
Juan Gelabert Gordiola		Manual de lengua Sanskrita : crestomatia y Gramatica	Madrid 1890
Theodor Knauer এবং W. Muller		Manuel pour etudier la Grammaire Sanscrite, Texte et lexique	Pet. 1891
Jacob Samuel Speijer(1849-1913) হল্যাণ্ডের অধিবাসী এবং Leyden বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক।	(1) (2)	Sanskrit Syntax Vedische und Sanskrit Syntax	Leyden,1886 Strassburg 1896.
Albert Thumb (1865-1915)		Handbuch des Sanskrit, mit Texten und glossar,...	Heidelberg 1903
Jules Bloch[৩২] (1880-1953)		La Phrase nominate en Sanskrit	Paris 1906
A. Perez Pimentell G. Thibaut		Fonetica Sanskrita The Elementary Sanskrit Grammar	Madrid 1909 The U of Cal 1911*
Albert Joseph Carnoy		Grammaire elementaire de la Langue Sanscrite, comparee avec celle des langues indo-europeennes	Louvain 1925
Oertel Hanns		The syntax of cases in the narrative and descriptive prose of the Brahmanas	Heidelberg 1926

---

* ইহার পণ্ডিত বহুবল্লভ শাস্ত্রিকৃত বঙ্গানুবাদ (Bengali Edition)ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯১৪ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়।

Louis Renou (1896-1966) প্যারিসের Sorbonne বিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক এবং বৈদিক, সংস্কৃত ও পালি ভাষা ও ব্যাকরণের উপর বহু গ্রন্থের প্রণেতা। প্রথম দুই ভাষার শব্দকোষেরও রচয়িতা তিনি।	(1) Grammaire Sanscrite	Paris, 1930
	(2) Les maitres de la philologie Vedique...	" 1928
	(3) Bibliographie Vedique	" 1931
	(4) Dictionnaire Sanskrit-Francais[৩৩]	" 1931-32
	(5) Etudes de grammaire Sanskrite	" 1936
	(6) Monographies Sanskrites	" 1937
	(7) La Durghata Vrtti de Saranadeva (রোমান হরফে ফরাসী অনুবাদসহ দুই খণ্ডে শরণদেবের দুর্ঘটবৃত্তির সম্পাদনা)	" 1940-54
	(8) Terminologie grammaticale du Sanskrite (I-III)	" 1942
	(9) Litterature Sanskrite	" 1945
	(10) Grammaire Sanskrite elementaire	" 1946
	(11) Les elcoles Vediques et la formation du Veda	" 1947
	(12) La grammaire de Panini (Traduite du Sanskrit) ইহা পাণিনি ব্যাকরণের তৎকৃত ফরাসী অনুবাদ	" 1948-54
	(13) Canon Bouddhique Pali	" 1949
	(14) The future role of Sanskrit (ইহা C. Kunhan Raja-র সঙ্গে একযোগে রচিত)	Madras 1949
	(15) Sanskrit et Culture	Paris 1950
	(16) Grammaire de la langue Vedique	Lyon 1952
	(17) Vocabulaire du ritual Vedique	Paris 1954
	(18) Etudes Vediques et Panineennes, 4V.	" 1955-58
	(19) Histoire de la langue Sanskrite	" 1956
	(20) Etudes sur le vocabulaire du Rgveda	Pondicherry 1958
	(21) Les 'innovations' de la grammaire de Candragomin.....	
Viltore Pisani	(1) Grammatica dell'antico indiano, I-Fonetica, II-Morfologia...	Rome 1929-33
	(2) Study sulla prehistoria della lingue indo-europee...	Rome 1933
	(3) Grammatica Sanscrita, Storica e comparativa	Milan 1943

A. M. Pizzagalli	Elementi di grammatica Sanscrita conexercizi, crestomazia e glossario	Milan 1931
A. Gawronski	(1) Podrecznik Sanskrytu (পোলিশ ভাষায় রচিত); (2) Samskrta-Vyakaranam (Sans. grammar, Texts, glossary)....	Krakow 1932 "
Barend Faddegon	(1) Grammar of the Indeclinables (2) Studies on Panini's grammar	Amsterdam 1936 "
Isidore Dyen	The Sanskrit Indeclinables of the Hindu Grammarians and Lexicographers—এই গ্রন্থে বৈদিক (পাণিনিপূর্ব), পাণিনীয় এবং পাণিনির পরবর্তী বৈয়াকরণদের দ্বারা বিবেচিত অব্যয়সমূহের আলোচনা করা হইয়াছে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে।	Baltimore 1939
O.Nazzari	Elementi di Grammatica Sanscrita	Tornio 1948
Jan Gonda হল্যাণ্ডের Utrecht বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক। 1953	(1) Kurze Elementar Grammatik der Sanskrit Sprache...ইহার ইংরেজী অনুবাদ— (2) 'A concise elementary grammar of the Sanskrit Language...' by Gordon B. Ford. (3) 'Remarks on the Sanskrit Passive' (4) La place de la particule negative 'na' dans la phrase en vieil Indien (5) 'Reflections on the numerals "one" and "two" in ancient Indo-European languages'... (6) ঋগ্বিধানের ইংরেজী অনুবাদ...	Leiden 1948 1966 Leiden 1951 " " Utrecht
Adrian Scharpe ইনি J. Gonda-র ছাত্র এবং বেলজিয়ামের Ghent বিশ্ববিদ্যালয়স্থ Indological Seminar-এর প্রধান।[৩৪]	Precis de grammaire du Sanskrit classique (I)	Lonvain 1945

Calvin Kephart	Sanskrit, its origin, composition and diffusion	Strassburg 1949
Murray B. E. Emeneau ইনি F. Edgerton-এর ছাত্র এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক।	Sanskrit Sandhi and Exercises	Berkeley 1952
Manfred Mayrhofer	Sanskrit Grammatik, mit sprachvergleichenden Er-lauterungen[৩৫]—এই গ্রন্থের G.B. Ford-কৃত ইংরেজী অনুবাদ A Sanskrit Grammar (Alabama, 1972)	Berlin 1953
Franklin Edgerton, Yale বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।	(1) Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar, and Dictionary, and Reader	New Haven 1953
	(2) Buddhist Hybrid Sanskrit : Language and Literature...	Banaras 1954
	(3) Sanskrit historical Phonology: a simplified outline for the use of beginners in Sanskrit...	New Haven 1946
Francisco Rodriguez Adrados	Vedico y Sanscrito classico (Grammatica, Textos, anolados y vocabulario etymologico)	Madrid 1953
P. Hartmann	Nominale Ausdrucks formen im wissenschaftlichen Sanskrit	Heidelberg 1955
O. Fris	Sanskrtska citanka	Prague 1956
Vera Aleksandrovna Kotcherguina	Nachal'nyi kurs Sanskrita	Moskva 1956
Jikai Imazawa জাপানীপণ্ডিত।	A Sanskrit Grammar	Narita 1958
Thomas Simenschy	(1) Grammatica Limbu Sanscrite	Bucuresti 1959
	(2) Grammatica lui Panini, Sintaxa cazurilor...	Bucarest 1957
রুশপণ্ডিত Viacheslav Vsevolodovich Ivanov এবং Vladimir Nikolaevich Toporov.	Sanskrit	Moskva 1960

Nicolas Altuchow	Grammatica Sanscrita elemental	Montevides 1962
M. Judith Tyberg	First Lessons in Sanskrit grammar and readings	Los Angeles 1964
George Cardona[৩৬]	On Haplology in Indo-European —1968 ; Studies in Indian grammarians, I, the method of description reflected in the Sivasutras.	Philadelphia, 1969

সাহেবদের এই ব্যাকরণ-চর্চার বর্ণনাপ্রসঙ্গে তাঁহাদের প্রণীত বিভিন্ন ভাষার কিছু তুলনামূলক ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য এইগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত-ঘেঁষা। বস্তুতঃ সাহেবদের মুখ্য কৃতিত্ব এইখানেই। তাঁহারা ভারতীয়দের মতো শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ রচনা করিতে পারেন নাই বা করেন নাই বটে, কিন্তু সংস্কৃতব্যাকরণের সহায়তায় ভাষাতত্ত্বের আবিষ্কারের দ্বারা ইন্দো-ইউরোপীয় তথা ইন্দো-ইরানীয় জাতিসমূহের মেলবন্ধন ঘটাইয়াছেন। তাহারা যে মূলতঃ একই জাতি এবং একই ভাষা-ভাষী, এইভাবে তাহা প্রমাণিত হওয়ায় বাইবেলের সেই দিব্য বাণীটি মনে পড়ে ঃ 'Behold, the people is one, and they have all one language...' (The Holy Bible, London, p. 14)। আবার কেহ বলেন যে, ঐ ভাষাবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হইয়াছিল এই দেশেই সংস্কৃতের প্রথম বর্ণনামূলক পাণিনির ব্যাকরণের দ্বারা ঃ

> Sanskrit laid the foundation of comparative philology as well as of Descriptive Linguistics, the first descriptive Grammar of a language, being the Sanskrit Grammar of Panini. .–Dr. S.S.Misra (A Comparative Grammar of Sans., Greek and Hittite, Calcutta, 1968, p.3)

ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে সেই সুদূর অতীতের পাণিনি থেকে শুরু করিয়া বর্তমান বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আমরা যে সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন, তাঁহার নাম আব্রাম নোয়াম চম্স্কি (Avram Noam Chomsky)। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম, পেন্‌সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি. এবং ১৯৫৫ খ্রীঃ থেকে Massachusetts Institute of Technology-তে Ferrari P. Ward Chair of Modern

Languages and Linguistics-এ অধিষ্ঠিত'। রচিত গ্রন্থাবলী : Syntactic Structures, The Hague, 1957; Current Issues in Linguistic Theory, The Hague, 1964; Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, 1965; Cartesian Linguistics: A chapter in the History of Rationalist Thought, New York/London, 1966; Topics in the Theory of Generative Grammar, The Hague, 1966; Language and Mind, New York, 1968. ভাষাবিজ্ঞানে চমস্কির অবদানের নূতনত্ব এই যে, তিনি ভাষা ও ব্যাকরণের চিরাচরিত বহিরঙ্গের তথা গঠনমূলক দিকের উপর জোর না দিয়া, তাহার পরিবর্তে উহাদের অন্তরঙ্গ, সৃজনশীল এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক্‌টার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আগেকার ছকে বাঁধা বিবরণমূলক গঠনসর্বস্ব এবং প্রথাগত ব্যাকরণধারার বিরোধী চমস্কির রূপান্তরমূলক সৃজনধর্মী (transformational generative) ব্যাকরণতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, ভাষাবিজ্ঞানের বহির্ভূত চিন্তা-জগতেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, যদিও ঘরে-বাইরে ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনাও বড় কম হয় নাই। তথাপি বক্তার নিজস্ব বাঙ্‌মূর্তির অবাধ প্রকাশ ও তদ্‌গত সৃজনশীলতার স্বতন্ত্র বিচার-বিশ্লেষণ—ভাষা ও ব্যাকরণের যান্ত্রিক বেড়া-জাল থেকে ব্যক্তিচৈতন্যের এক জাতীয় মুক্তিরই একটা দিক্ যেন নির্দেশ করিতেছে। ব্যক্তিমানসের ভাষা-তথা ব্যাকরণ-সামর্থ্য তাহার সহজাত শক্তিবিশেষ।

---

১ ১৫।১।১৭৮৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় 'Asiatick Society' স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানের নাম হয় 'Asiatic Society of Bengal', পরে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই নামের আগে Royal শব্দটি যোগ করা হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা আবার 'Asiatic Society' নামে চলিতে থাকে। ইহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা 'Asiatick Researches: or, Translations of the Society, instituted in Bengal, for inquiring into the History and Antiquities, the Arts, Sciences, and Literature, of Asia'; in 20 volumes, Calcutta, 1788-1839. ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'Asiatick' শব্দের 'k' বর্জন করা হয়।

২ Discourses delivered before the Asiatic Society of Bengal and miscellaneous papers on the religion, poetry, and literature of the nations of India, 2vols., London, 1824—দ্রষ্টব্য।

৩ 'Life of Colebrooke', 'Chips from a German Workshop', Vol. iv, London, 1875.

৪ 'The Laghu Kaumudi—a Sanskrit grammar by Varadaraja, with an English version, commentary and reference, ed. by James Robert Ballantyne, Mirzapore, 1849.'

৫ 'The Mahabhashya with its commentary the Bhashyapradipa and the commentary thereon, the Bhashyapradipoddyota, vol. I, containing the Navahnika with an English version of the opening portion, ed. by J. R. Ballantyne and the pandits of the Benares College, MS. form, Mirzapore, 1856.

৬ মতান্তরে তিনি ভারত হইতে সংস্কৃত শিখিয়া ইংল্যাণ্ডে ফিরিবার পথে প্যারিসে ঐ কারণে আটকা পড়েন।

৭ ইহার ইংরেজী তর্জমা 'On the language and wisdom of the Indians.'

* তাঁহার Reflexions sur l'etude des langues asiatiques (Paris, 1832)-গ্রন্থে সংস্কৃতব্যাকরণ বিষয়ে আলোচনা আছে।

৮ 'Rig-Veda; ou Livre des hymnes traduit du Sanscrit.' তাঁহার আর এক গ্রন্থ 'Monuments litteraires de l'Inde, ou melanges de litterature sanscrite', Paris, 1827.

৯ ইহার ইংরেজী তর্জমা 'On the conjugation system of Sanskrit, in comparison with that of Greek, Latin, Persian and German.'

১০ 'Sanskrit was at one time the only language of the world.'

—Franz Bopp

'Sanskrit is the origin of the modern languages of Europe.'

—M. Dubois

'Sanskrit is a language of unrivalled richness and variety, a language, the parent of all those dialects that Europe has finally called classical.'

—W.C.Taylor

১১ S. T. Aufrecht জার্মেনিতে ঋগ্‌বেদের ২য় সংস্করণ (Die Hymnen des Rigveda, Bonn, 1877) ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১৮৭৯) প্রকাশ করেন। H. Grassmann জার্মান ভাষায় সমগ্র ঋগ্‌বেদের অনুবাদ এবং ঋগ্‌বেদের শব্দাবলীর অভিধান ('Worterbuch zum Rig-Veda'–Leipzig, 1873–list of nominal stems according to alphabetical order of the final letter) প্রকাশ করেন, সামবেদ (Die Hymnen des Sama Veda; Herausgegeben, Leipzig, 1848) প্রকাশ করেন T. Benfey; (পৈপ্পলাদ শাখার) অথর্ববেদ ('Atharva Veda Samhita', Berlin, 1855–56) প্রকাশ করেন R. Roth এবং W. D. Whitney; যজুর্বেদের বাজসনেয়িসংহিতা ('The Vajasaneyi-Samhita in the Madhyamdina Cakha', Berlin and London, 1852) এবং তৈত্তিরীয় সংহিতা (Die Taittiriya Samhita, Herausgegeben, Leipzig, 1871-72) আর মাধ্যন্দিন শাখার শতপথ ব্রাহ্মণ (Berlin and London, 1855) প্রকাশ করেন A. F. Weber (1825–1901) ; Leopold Schroeder প্রকাশ করেন মৈত্রায়ণী ও কাঠক সংহিতা। ইঁহাদের মধ্যে Whitney ভিন্ন আর সকলেই জার্মান পণ্ডিত।

১২ দ্রষ্টব্য : তাঁহার 'Etudes sur la langue et sur les textes zends'-Paris, 1840-50.

১৩ 'Prehistoric antiquities of the Aryan peoples—a manual of comparative philology and the earliest culture, translated by F. B. Jevons, London, 1890.

১৪ Saussure distinguished the linguistic competence of the speaker and the actual phenomena or data of linguistics (utterance), as langue and parole. While parole constitutes the immediately accessible data, the linguist's proper object is the langue of each community, the lexicon, grammar, and phonology implanted in each individual by his upbringing in society and on the basis of which he speaks and understands his language. পারোল ব্যক্তিগত, লাঙ্ সমষ্টিগত ভাষারূপ।

১৫ তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ—'Papers on Panini and Indian Grammar in General'—Lund, 1926 এবং 'The Nirukta : (I) Its place in old Indian literature, (II) Its etymologies'—Lund, 1926.

১৬ 'Among European grammars that of Whitney was the first to attempt a historical treatment of the Vedic and Sanskrit language.'

—Macdonell

১৭ 'His (Panini's) account of the Vedic language, taken as a whole, thus shows many gaps, important matters being often omitted, while trifles are noticed. In this part of his work Panini shows a decided incapacity to master his subjectmatter...'

—Macdonell ('A Sans.Gr. for Students')

বর্তমানে অবশ্য এইরূপ দাবী করা হইতেছে যে, পাণিনির বৈদিক ব্যাকরণ-চর্চা সম্পূর্ণ প্রণালীবদ্ধ এবং বৈদিক সংহিতাসমূহের গভীর জ্ঞান লইয়াই তিনি এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

১৮ 'The Brhad-devata attributed to Caunaka, a summary of the deities and myths of the Rigveda, critically edited in the original Sanskrit with an introduction and seven appendices, and translation into English with critical and illustrative notes, 2vols. (I–Introduction and text and appendices, II– Translation and notes),' Cambridge, 1904.

১৯ Katyayana's Sarvanukramani of the Rigveda with extracts from Sadgurucisya's commentary entitled Vedarthadipika, edited with critical notes and appendices by A.A. Macdonell, Oxford, 1886..

২০ ম্যাকডোনেলের সুযোগ্য ছাত্র Arthur Berriedale Keith (1879–1944)—Regius Prof. of Sanskrit and comparative philology in the University of Edinburgh. তিনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ (বা কৌষিতকি ব্রাহ্মণ), ঐতরেয়ারণ্যক, শাঙ্খায়নারণ্যক প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন—যাহা হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরীজ-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে। তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস এক বিখ্যাত গ্রন্থ।

২১ ইহা অনেকাংশে বৈদিক জীবনীকোষের মতো এবং সংক্ষিপ্ত অথচ খুব মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ।

২২ ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে Lyon হইতে প্রকাশিত Louis Renou-কর্তৃক ফরাসী ভাষায় রচিত বৈদিক ব্যাকরণ 'Grammaire de la langue Vedique'—দ্বিতীয় বৈদিক ব্যাকরণ।

২৩ দুই খণ্ডে মিলিয়া ইহা এক বিরাট গ্রন্থ, পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রথম খণ্ডে XLII + 588 এবং ২য় খণ্ডে 544 ; মোট ২৩৩২টি অনুচ্ছেদ।

২৪ তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Catalogus Catalogorum'—ইহাতে সংস্কৃত পুঁথি ও গ্রন্থকারদের বর্ণানুক্রমিক নামের তালিকা ব্যাপকভাবে বর্ণিত। Leipzig হইতে ১৮৯১–১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩খণ্ডে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তৎসম্পাদিত উণাদিবৃত্তি (উজ্জ্বল দত্তের) Bonn হইতে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং হলায়ুধের 'অভিধানরত্নমালা' লণ্ডন হইতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

২৫ তাঁহার সম্পাদনায় 'কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র' এবং 'সামবেদানুক্রমণিকা' যথাক্রমে ১৮৫৯ এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

২৬ তিনি সুইডেনের অধিবাসী এবং Breslau বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৬৪ ও ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তৎসম্পাদিত আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র এবং গৌতম ধর্মসূত্র প্রকাশিত হয়।

২৭ তাঁহার আর এক গ্রন্থ 'Vom Infinitiv besonders im Sanskrit,' Berlin, 1840. প্রাকৃত ভাষার উপরে তাঁহার গ্রন্থ De Prakrita dialecto, Libriduo, Berolini, 1836.

২৮ Hermann Camillo Kellner (1839–1916)-এর রচনা বলিয়াও অনুরূপ এক গ্রন্থ-নাম পাওয়া যায়।

২৯ এই গ্রন্থ প্রধানতঃ হুইট্‌নির ব্যাকরণের ভিত্তিতে রচিত। গ্রন্থকার আমেরিকার Nebraska বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক ছিলেন।

৩০ পালি ভাষা ও সাহিত্যের উপর তাঁহার গ্রন্থ 'Pali Literatur und Sprache,'Strassburg, 1916 ; ইহার বটকৃষ্ণ ঘোষ-কৃত ইংরেজী অনুবাদ 'Pali literature and language' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৪২ সনে প্রকাশিত হইয়াছে। Geiger ছিলেন জার্মেনির মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক।

৩১ তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ—Precis de grammaire Palie, Paris, 1894 ; Elements de Sanskrit classique, Paris, 1902 ; La Magiedans l'Inde antique, Paris, 1904 ; Les Litteratures d l'Inde—Sanscrit—Pali—Pracrit , Paris, 1904.

৩২ ইনি S. Levi-র ছাত্র এবং প্যারিসের College de France-এর সংস্কৃতাধ্যাপক। তাঁহার অন্য গ্রন্থ—'Structure grammaticale des langues Dravidiennes', Paris, 1946—যাহার ইংরেজী অনুবাদ 'The grammatical structure of Dravidian Languages', Poona হইতে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মারাঠী ভাষার উপরে তাঁহার গ্রন্থ 'La Formation de la Langue Marathi', Paris, 1920. 'Indo-Aryan : From the Vedas to Modern Times'—তাঁহার আর এক গ্রন্থ।

৩৩ ইহা Nadine Stchoupak, L. Nitti Dolci এবং L. Renou—এই তিনজনের রচনা।

৩৪ তাঁহার 'Wezen en wording der klassicke Sanskrit literatur' (1949)-গ্রন্থে গুপ্তযুগের সাহিত্য, কলা ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং তখনকার কথা ও জীবন্ত ভাষারূপে সংস্কৃতের আলোচনা করা হইয়াছে।

৩৫ Mayrhofer-রচিত অন্যান্য গ্রন্থ—'Handbuch das Pali', Heidelberg, 1951 এবং 'Kurzgefabtes etymologisches Worterbuch des altindischen' (a concise etymological Sanskrit Dictionary), Heidelberg, 1953–59.

৩৬ ইদানীন্তন ব্যাকরণ-বিশেষতঃ পাণিনি-গবেষকদের মধ্যে Cardona একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১৯৩৬ খ্রীঃ নিউইয়র্কে জন্ম, Yale বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞানে ডক্টরেট (১৯৬০), ভারতে আসিয়া পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ; তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ—Panini : A Survey of Research, The Hauge, 1976 ; Linguistic Analysis and some Indian traditions, Poona, 1983 ; Panini—His Work and Its Traditions, Vol.I, Delhi 1988.

'Goldstucker has admirably attacked Bohtlingk,
but for Bohtlingk we forget Goldstucker ;
and Whitney has admirably attacked Panini,
but for Panini we forget Whitney.
I adore Bohtlingk because he reveals to us the
spirit of Panini, I adore Panini because he
reveals to us the spirit of India,
I adore India because it reveals to us
the Spirit, the Spirit.'—B. Faddegon ('Studies on Panini's grammar')

The Sanskrit Language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure : more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident ; so strong indeed, that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source, which, perhaps, no longer exists. There is a similar reason, though not quite so forcible, for supposing that both the Gothick and the Celtick, though blended with a very different idiom, had the same origin with the Sanskrit ; and the Old Persian might be added to the same family.... —Sir William Jones,
Asiatick Researches, Vol.I (1788), p.422f.

Modern comparative philology dates from the introduction of Sanskrit as a serious object of study, and from the consequent recognition of the existence of an Indo-European family of languages by Sir William Jones in 1786.—G. A. Grierson (Introduction to his Linguistic Survey of India).

নব্যভারতীয়দের ব্যাকরণ-চর্চা

সংস্কৃতের জ্ঞান-ভাণ্ডার লইয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের গবেষণা, ক্রমে নব্যভারতীয় পণ্ডিতদিগকেও উদ্বুদ্ধ করিতে থাকে। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা প্রচলনের ফলে যে নূতন আলোকের সঞ্চার হয়, তাহাতে সাড়া দিয়া এতদ্দেশীয় একদল অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী ব্যক্তি আগাইয়া আসেন। ইঁহাদের মধ্য হইতে এখানে প্রসঙ্গতঃ এমন কয়েকজনের নাম করা যায়, যাঁহারা গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ লইয়া নানাভাবে, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে, আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছেন, যেমন রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১), রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর (১৮৩৭-১৯২৫), আনন্দরাম বড়ুয়া (১৮৫০-৮৯), কাশীনাথবাপুজী পাঠক (১৮৫০-১৯৩২), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), শ্রীশচন্দ্র বসু (১৮৬১-১৯১৮), সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (১৮৭০-১৯২০), শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী, গুরুপদ হালদার (১৮৭৯-১৯৫৬), শ্রীপাদকৃষ্ণ বেলবলকর (১৮৮০-১৯৬৭), পাণ্ডুরঙ্গদান্দেকর গুণে (১৮৮৪-১৯২২), সিদ্ধেশ্বর বর্মা (১৮৮৭-১৯৮৫), প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৯০-১৯৩৫), রাধাকুমুদ মুখার্জি (১৮৮১-১৯৬৩), দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯০-১৯৫৭), পরশুরামকৃষ্ণ গোড়ে (১৮৯১-১৯৬১), লক্ষ্মণ স্বরূপ (১৮৯৪-১৯৪৬), ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৬১), প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮৯৮-১৯৫৬), সূর্যকান্ত শাস্ত্রী, যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী (১৯০১-৭৪), বিশ্ববন্ধুশাস্ত্রী, ভি.রাঘবন (১৯০৮-...), রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, গজানন-বালকৃষ্ণ পলসুলে, কাশীনাথবাসুদেব অভ্যঙ্কর, কপিলদেব দ্বিবেদীশাস্ত্রী, মঙ্গলদেব শাস্ত্রী, পি. এল.বৈদ্য, সুমিত্রমঙ্গেশ কাত্রে, বটকৃষ্ণ ঘোষ (১৯০৫-৫০), যুধিষ্ঠির মীমাংসক, গণেশশ্রীপাদ (বালশাস্ত্রী) হুপরিকর, বাসুদেবশরণ অগ্রবাল, রামচন্দ্রনারায়ণ দান্দেকর, কে. কুঞ্জুন্নি রাজা, কালীচরণ শাস্ত্রী, চারুদেব শাস্ত্রী, এস্. ডি. যোশী, এস্. আর্. ব্যানার্জী-প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ।

ভারতীয়দের মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যাগবেষণার অন্যতম পথিকৃৎরূপে রাজেন্দ্রলাল মিত্র চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। প্রথমে চিকিৎসাবিদ্যা এবং পরে আইন শিক্ষা করিয়াও মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সহসম্পাদক এবং গ্রন্থাগারিকের কর্মে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে ইহার সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেন (১৮৮৫)। এই কালে তিনি দেশী-বিদেশী নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'Journal of the Asiatic Society of Bengal'-এ শতাধিক প্রবন্ধ লিখেন। সোসাইটি-প্রবর্তিত 'Bibliotheca Indica'-গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত তৎসম্পাদিত তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য (ত্রিভাষ্যরত্নটীকাসহ, ১৮৭২), ক্রমদীশ্বর-কৃত প্রাকৃতব্যাকরণ ও শৌনক-কৃত বৃহদ্দেবতা (১৮৯২) এবং স্বপ্রণীত 'The Antiquities of Orissa' (2 Vols., 1875-80) ও 'The Indo-Aryans' (2 Vols., 1881) বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সংস্কৃত ব্যাকরণের ভিত্তিতে 'ব্যাকরণপ্রবেশ' ('অর্থাৎ বঙ্গভাষার ব্যাকরণের প্রথম উপদেশ') নামে তিনি এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন—যাহা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হয়। সংগৃহীত প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথির তালিকা-রচনা তাঁহার অন্যতম প্রধান কীর্তি। এইসব পুঁথির বিবরণ নিম্ন-লিখিতরূপে গ্রথিত হইয়া প্রকাশিত হয় ঃ

(১) Notices of Sanskrit Manuscripts, First Series, Vols.I-IX, 1870-88 ;

(২) Catalogue of Sanskrit Manuscripts, existing in Oudh, prepared by C. Browning, ed. by R. L. Mitra, 1873-78 ;

(৩) A Report of Sanskrit Manuscripts in Native Libraries, 1875 ;

(৪) A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Asiatic Society of Bengal, Part I- Grammar, 1877 ;

(৫) Report on the operations carried on to the close of the official year 1879-80, for the discovery and preservation of Ancient Sanskrit Manuscripts in the Bengal Provinces, 1880 ;

(৬) A Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of H. H. the Maharaja of Bikaner, 1880 এবং
(৭) The Sanskrit-Buddhist Literature of Nepal, 1882.

রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সময় (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক) নির্ধারণ করিয়া ব্যাকরণ-ইতিহাসে এক বিশেষ কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। এতদ্‌বিষয়ক তাঁহার প্রবন্ধটি ('On the date of Patanjali and the king in whose reign he lived') ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। তাঁহার আগে অধ্যাপক গোলড্‌ষ্টুকার মহাভাষ্যোক্ত (৩।২।১২৩) উদাহরণের প্রমাণ দেখাইয়া খ্রীঃ পূঃ ১৪০-১২০-এর মধ্যবর্তী সময়ে মহাভাষ্যের ঐ অংশের রচনাকাল সাব্যস্ত করেন।

মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতিভাদীপ্ত পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন বলা চলে। রত্নগিরি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে বিখ্যাত নেতা দাদাভাই নৌরজি ছিলেন তাঁহার অন্যতম শিক্ষক। প্রথমে সেখানকার এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ কলেজে কেরাণির চাকুরি লইয়া ভাণ্ডারকর তাঁহার কর্ম-জীবনের সূচনা করেন এবং নিজে নিজে সংস্কৃত শিখিয়া বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৬২ ও ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইংরেজী সাহিত্যেও তিনি এম. এ.। পরে রত্নগিরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, এবং সর্বশেষে পুণা ডেকান কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা-তে অনুষ্ঠিত প্রাচ্য বিদ্বৎ-সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে যোগদান এবং জার্মেনির গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Ph.D. উপাধিলাভ ; ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌ চ্যান্সেলর, বড়লাটের লেজিস্‌লেটিভ্‌ কৌন্সিলের মনোনীত সদস্য, ১৯১৩ সনে K.C.I.E. উপাধিলাভ, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পুণাতে 'Bhandarkar Oriental Research Institute'-এর প্রতিষ্ঠা এবং ১৯২১ সনে বোম্বে-তে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত 'All India Oriental Conference'-এ সভাপতিত্ব। পশ্চিমের তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান- ও অধ্যাপনা-লব্ধ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং ভট্টোজিদীক্ষিতের বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদীর ভিত্তিতে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী তিন ভাগে 'First—, 'Second—, 'Third Book of Sanskrit' (Bombay, 1864-68-?) রচনা করেন। এই গ্রন্থমালার ২য়

গ্রন্থের সংস্কৃত নাম দেওয়া হয় 'সংস্কৃত মন্দিরান্তঃ প্রবেশিকা নাম পাঠাবলিঃ'। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে Indo-Aryan ভাষাসমূহের উপর তিনি যে সাতটি বক্তৃতা দেন, তাহা পরে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে হইতে 'Wilson Philological Lectures on Sanskrit and the derived Languages' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে—'Reports on the Search of Sanskrit Manuscripts' (6 vols., Bombay, 1884), 'The Early History of Dekkan' (Bombay, 1884) এবং 'A Peep into the Early History of India' (Bombay, 1920)। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী, নারায়ণবাপুজী উৎগিকর এবং বাসুদেবগোপাল পরঞ্জপে-কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া 'Collected Works of Sir R. G. Bhandarkar' নামে, পূর্বোক্ত ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ্ ইন্‌ষ্টিটিউট্, পুণা হইতে ১৯২৭-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের অধিবাসী রামদাস সেন (১৮৪৫-৮৭) বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষালাভের পর স্বগৃহে অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষতঃ পুরাতত্ত্বে জ্ঞান অর্জন ও প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন। সরকারী কার্যে বহরমপুরে অবস্থানকারী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয় এবং সেখানে (১৮৭২) প্রকাশিত বঙ্কিম-সম্পাদিত মাসিক-পত্র 'বঙ্গদর্শন'-এ তিনি অধীত বিষয়ে নানা প্রবন্ধ লিখেন। সেই সময়কার অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতেও তাঁহার লেখা বহু প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। এই সব লেখার মধ্যে সংস্কৃত বৈয়াকরণদের কীর্তিকাহিনী লইয়াও প্রচুর আলোচনা আছে। বাঙ্‌লা ভাষায় তাঁহার ইতিহাস-চর্চা জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স্‌মূলারেরও প্রশংসা লাভ করে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রামদাসবাবু ইউরোপ-ভ্রমণে যান। ইটালীর ফ্লোরেনটিনো অ্যাকাডেমি (মতান্তরে ফ্লোরেন্সের অ্যাকাডেমিয়া ওরিয়েন্টাল) তাঁহাকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে। 'ঐতিহাসিকরহস্য' নামে তিন খণ্ডে (১৮৭৪-৭৯) তাঁহার প্রবন্ধাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ভারত-রহস্য' নামক তাঁহার আর এক গ্রন্থ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

ভারতের বিশেষতঃ আসামের গৌরব আনন্দরাম বড়ুয়া আসামের কামরূপ জেলার উত্তর গৌহাটীতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

বিদ্যোৎসাহী পিতার আগ্রহে তিনি অল্প বয়সেই সংস্কৃতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে সমগ্র অমরকোষ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন। এই বয়সেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পাশ করেন। বিবিধ বৃত্তিলাভের পর বিলাত গিয়া ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে I.C.S. এবং পরে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। তিনিই আসামের প্রথম গ্রাজুয়েট, ব্যারিষ্টার এবং সিভিলিয়ান। জেলাশাসকের পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে পক্ষাঘাতরোগে কলিকাতায় তাঁহার কর্মময় জীবনের অবসান হয়। তথাপি এই বয়সেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে এবং ব্যাকরণে তিনি যে কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা গুরুত্বে বড় কম নয়। ১৮৭৭-৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিন খণ্ডে তিনি যে ইংরেজী-সংস্কৃতাভিধান প্রকাশ করেন, তাহাই ভারতীয়দের দ্বারা রচিত এই ধরনের প্রথম গ্রন্থ। এই অভিধানের ২য় ও ৩য় খণ্ডের সহিত যথাক্রমে তাঁহার অপর দুই গ্রন্থ 'Higher Sans. Grammar' এবং 'Ancient Geography of India' যুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ১২ খণ্ডে (প্রতি খণ্ডে ১০০০ পৃষ্ঠা) প্রকাশিতব্য এক বিরাট পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ-সঙ্কলনের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন এবং ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত ভারতীয় প্রাচীন পুঁথিসমূহের জ্ঞানলাভের জন্য দ্বিতীয় বার ইংল্যাণ্ডে যান। পরিকল্পিত গ্রন্থের ১০ম খণ্ড সর্বাগ্রে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। ইহার আলোচ্য বিষয় অলঙ্কার। মূলগ্রন্থের নাম—'A Comprehensive Grammar of the Sanskrit Language, critical, analytical and historical'. এই গ্রন্থের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল (তাঁহারই ভাষায়) '...to simplify the rules of grammar as far as possible, to examine their historical growth, and illustrate them fully from the existing literature, both ancient and modern, and to offer a complete commentary on all the Vedas.' ইহার ৩য় খণ্ডের ১ম ভাগ মুখ্যতঃ শব্দার্থ- বা শব্দকোষসংগ্রহ-মূলক ('A Comprehensive Grammar of the Sans. Language,... and Lexicographical,' vol. III, Letters and their changes, Part I, নানার্থসংগ্রহ, ...Calcutta, 1884)। মুখবন্ধে প্রাচীন শব্দকোষগুলির বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের তথ্যবহুল আলোচনা করা

হইয়াছে। এই গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ড আর প্রকাশিত হয় নাই। পরবর্তী কয়েক বৎসর অর্থাৎ বড়ুয়ার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর, ভোজদেবের সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, অমরকোষ (ক্ষীরস্বামীর টীকাসহ), ধাতুকোষ এবং ধাতুবৃত্তিসার প্রকাশনার ব্যাপারেই ব্যয়িত হয়। তাঁহার আর দুই গ্রন্থ—'Bhavabhuti and his place in Sanskrit Literature' এবং 'A Companion to the Sanskrit-Reading for the Undergraduates of the Calcutta University', Calcutta, 1878. কলিকাতায় Firma KLM Private Ltd.-কর্তৃক ১৯৭৬ খ্রীঃ তাঁহার পূর্বোক্ত ব্যাকরণ (Vol. III, Pt. I) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-চর্চার ক্ষেত্রে কাশীনাথ বাপুজী পাঠক সংক্ষেপে 'কে. বি. পাঠক' নামেই সমধিক পরিচিত। মহীশূর প্রদেশের হুবলীতে বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করিয়া স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় তিনি 'Indian Antiquary'-তে এবং 'Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society'-তে সংস্কৃত সাহিত্য- এবং পুরাতত্ত্ব—বিশেষতঃ জৈন সাহিত্য—সম্পর্কে প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন এবং ক্রমে পূর্বোক্ত ভাণ্ডারকরের সহিত পরিচিত হন। তাঁহারই চেষ্টায় বাপুজী পুণা ডেকান কলেজের প্রাচ্য ভাষা-বিভাগীয় অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃতের অধ্যাপক রূপে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মেনির Tubingen বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে Ph.D. উপাধি দান করে। পূর্বোক্ত দুই পত্রিকা ভিন্ন, 'Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute'-এও তাঁহার অনেক লেখা মুদ্রিত হইয়াছিল। জৈন শাকটায়ন, দেবনন্দী, চন্দ্রগোমী, জিনেন্দ্রবুদ্ধি, জয়াদিত্য, ভর্তৃহরি প্রভৃতি জৈন ও বৌদ্ধ বৈয়াকরণদের জীবন ও গ্রন্থাদির উপর রচিত বিবিধ প্রবন্ধ, তাঁহার রচনাবলীর এক প্রধান অংশ অধিকার করিয়া আছে। এই সব নাস্তিক মতের আচার্যদের প্রতি তাঁহার সমধিক আগ্রহ প্রকাশ পাইলেও গৌণতঃ পাণিনির ব্যাকরণই ছিল সেই আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে প্রকাশিত 'Commemorative Essays presented to Prof. K. B. Pathak...' (1934) নামক সঙ্কলন-গ্রন্থের প্রারম্ভে পাঠকের সমস্ত ইংরেজী প্রবন্ধের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উত্তরসাধক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন নৈহাটীর (২৪ পরগনা জেলা, পশ্চিমবঙ্গ) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের সন্তান। প্রথমে টোলে ও স্কুলে অধ্যয়নের পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইয়া (১৮৬৬) সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন (১৮৭৭) এবং সেখান হইতে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর সরকারী শিক্ষাবিভাগে নানা কর্মে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক (১৮৮৬-৯৪), কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক (১৮৯৫-১৯০০) এবং সর্বশেষে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (১৯০০-১৯০৮) হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই প্রচেষ্টায় প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতে এম. এ. ক্লাস খোলা হয়। রাজেন্দ্রলালের আনুকূল্যে তিনি ১৮৮৫ সনে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সংস্পর্শে আসেন ও ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির Joint Philological Secretary ও ১৯০৭ সনে ইহার আজীবন সহকারী সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ইহার ফেলো (১৯১৯-২০) এবং দুই বার (১৯২০, ১৯২১) সভাপতিও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তিনিই সোসাইটির 'Director of the Operations in Search of Sanskrit Manuscripts'-এর পদে নিযুক্ত হন। তদবধি প্রায় সারাজীবন তিনি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্স্‌ফোর্ড হইতে আগত ম্যাক্‌ডোনেল সাহেবের ভারত-ভ্রমণে হরপ্রসাদকে তাঁহার সাহায্যকারী সঙ্গিরূপে নিযুক্ত করা হয়।

পূর্বোক্ত 'Notices of Sanskrit Manuscripts'-এর ১০ম খণ্ডের ১ম ভাগ (১৮৯০) প্রকাশের পর রাজেন্দ্রলালের দেহত্যাগ হইলে হরপ্রসাদ উহার ২য় ভাগ (১৮৯২) এবং Vol. XI (1895) সম্পাদনাপূর্বক প্রকাশ করেন। ইহার Second Series, Vols. I-IV (1898-1911) ; 'A Catalogue of Palm-leaf and selected paper MSS. belonging to the Darbar Library, Nepal'—Vol. I (1905), Vol. II (1915) ; 'Catalogue of MSS. in the Bishop's College Library, Calcutta' (1915)—তাঁহারই সম্পাদনা-প্রসূত।' পরে তিনি সোসাইটির মোট ১১২৬৪ খানা সংগৃহীত পুঁথির বর্ণনামূলক তালিকা 'A Descriptive Catalogue of the Sans. Manuscripts in

the Collections of the Asiatic Society of Bengal' প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন এবং ইহার ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড (১৯১৭-৩১) প্রকাশ করিয়া স্বর্গত হন। এই তালিকার ৬ষ্ঠ খণ্ডের প্রারম্ভে, তালিকা-ভুক্ত পুঁথির ভিত্তিতে, ব্যাকরণ-শাস্ত্রের যে ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এক কথায় অভূতপূর্ব। বাঙ্‌লা সাহিত্যেও স্মরণীয় বহু পুস্তক এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ বহু প্রবন্ধ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—যাহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং শব্দকোষের ইতিহাস-সংক্রান্ত অনেক উপাদান বিন্যস্ত আছে। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিতও সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সহ-সভাপতি এবং পরে সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁহার সমস্ত বাঙ্‌লা রচনা 'হরপ্রসাদ রচনাবলী' শিরোনামায় দুই খণ্ডে (১৯৫৬, ১৯৬০) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অনিলকুমার কাঞ্জিলাল কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া কলিকাতায় প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্রিমহাশয়ের আর এক গ্রন্থ 'Magadhan Literature', Calcutta, 1923—পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ৬টি বক্তৃতার (১৯২০-২১) সঙ্কলন।

বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বসুর পৈতৃক নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলায় হইলেও তিনি পিতার কর্মস্থল লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানকার সরকারী কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করার পর তাঁহার কর্মবহুল জীবনযাত্রা শুরু হয়। নানা ধর্ম, শাস্ত্র, আইন ও শিক্ষাবিষয়ক বিচিত্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি শাস্ত্রপ্রচারে লেখনী ধারণ করেন। প্রথমে মুনসেফ্ পরে জেলা-জজ। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের ইংরেজী অনুবাদ (১৮৯১) তাঁহার অন্যতম প্রধান কীর্তি। ভট্টোজির বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদীরও তিনি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদের নিজ বাড়ীতে 'পাণিনি-অফিস্' স্থাপনপূর্বক সেখান হইতে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে থাকেন। এই উপলক্ষ্যে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকর্তৃক 'Sacred Books of the Hindus' নামক একটি Series (গ্রন্থমালা) প্রবর্তিত হয়।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের সন্তান মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র (আচার্য) বিদ্যাভূষণের জন্মস্থান বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার বাঁধুলীখালকুলা গ্রাম হইলেও এই বংশের আদি নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে। কেবল সংস্কৃত ও ইংরেজীতেই নয়, পালি, তিব্বতী এবং

জার্মান ভাষাতেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনার (১৮৯৩-১৯০০) পর, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আসেন এবং দুই বৎসর পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত বিভাগে যোগ দিয়া ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক প্রকাশিত 'A History of Indian Logic' তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ। ইহাতে ব্যাকরণের কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্যও আছে। এই গ্রন্থ তাঁহার ডক্টরেট-থিসিস্ 'The Middle Age School of Indian Logic'-এর পরিবর্ধিত রূপ। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই নিবন্ধের জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্বপ্রথম Ph. D. উপাধিলাভ করেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'Grimm's Phonetic Law of the Indo-European Languages', Calcutta 1905. ১৯১১-১২খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় তিব্বতী অনুবাদ সহ তৎসম্পাদিত অমরকোষ প্রকাশিত হয় এবং ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি অমরকোষের সুভূতি-রচিত টীকা অমর-কামধেনু বা কবিকামধেনুর তিব্বতী অনুবাদের কিয়দংশ সম্পাদনাপূর্বক প্রকাশ করেন। ইহার পর ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমণ পূর্ণানন্দের সহিত একযোগে তিনি প্রকাশ করেন পালি ভাষার ব্যাকরণ বালাবতারের ইংরেজী অনুবাদ (১ম খণ্ড)। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল, মহাবোধি সোসাইটি-পত্রিকা, ডন (The Dawn), ইণ্ডিয়ান মিরর এবং ভারতী পত্রিকাতে তিনি পালি ভাষার ইতিহাস, ভারতীয় প্রাচীন বর্ণমালা, বঙ্গীয় বর্ণমালা, সংস্কৃত ব্যাকরণসাহিত্যের ইতিহাস, ভাষা-বিজ্ঞান এবং তিব্বতে রক্ষিত এবং সেখান হইতে সংগৃহীত সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং শব্দকোষ প্রভৃতির বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তি-ভট্টাচার্যের সর্বপ্রধান কীর্তি—বরেন্দ্ররিসার্চ্ সোসাইটি (রাজসাহী) হইতে জিনেন্দ্রবুদ্ধি-রচিত 'ন্যাস' বা 'কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা'র সম্পাদনা ও প্রকাশনা। ব্যাকরণের ইতিহাস-মূলক একটি তথ্যপূর্ণ মুখবন্ধসহ তিন খণ্ডে এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (১৯১৯-২৫)। অষ্টাধ্যায়ীর কাশিকাবৃত্তির উপর রচিত এই গ্রন্থ—সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেও এতদঞ্চলে অর্থাৎ বঙ্গদেশে পাণিনি-ব্যাকরণ-চর্চার নির্দেশক। বাংলার বাহিরে ইহার অন্য কোনো পুঁথি বা অনুলিপি দৃষ্ট না হওয়ায় এবং অবাঙালীদের রচিত গ্রন্থাদিতে ইহার বিশেষ কোনও উল্লেখ না

থাকায়, ইহার প্রচলন যে রচনা-স্থলেই সীমাবদ্ধ ছিল, এইরূপ প্রতীয়মান হয়। ১৯১৮ ও ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশবাবুর সম্পাদনায় যথাক্রমে পুরুষোত্তমদেবের 'ভাষাবৃত্তি' এবং মৈত্রেয়রক্ষিতের 'ধাতুপ্রদীপ' ঐ সোসাইটি হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি 'ধাতুপ্রদীপবিবরণ' নামে এক স্বরচিত টিপ্পনীও ধাতুপ্রদীপের সহিত যোজনা করিয়া দিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাঁহার কর্মক্ষেত্র।

ব্যাকরণের ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে গুরুপদ হালদার একটি স্মরণীয় নাম। দক্ষিণ কলিকাতার কালীঘাট নামক স্থানে, এই পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাঁলিকার 'সেবাইত' হালদার-বংশে তাঁহার জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এল্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্বগৃহে স্বচেষ্টায় সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁহার এই বিদ্যাবত্তা ছিল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিমায় বিকশিত। তৎপ্রণীত গ্রন্থাদিই ইহার প্রমাণ। এই সব গ্রন্থের মধ্যে বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য— তাঁহার 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' (১ম খণ্ড, ১৯৪৩), 'বৈদ্যকবৃত্তান্ত' (১৯৫৪) এবং 'বৃদ্ধত্রয়ী' (১৯৫৫)। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি চরক, সুশ্রুত এবং বাগ্‌ভটের জীবনী মুখ্যতঃ আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে এবং বৈদ্যকবৃত্তান্তে ব্যাকরণ-ইতিহাসের বেশ কিছু উপাদান নিহিত রহিয়াছে। ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। পাণিনির পূর্ববর্তী বৈয়াকরণদের গুণ-কীর্তন মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, পাণিনি এবং তৎপরবর্তী বৈয়াকরণদের সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাপক সমীক্ষার নিদর্শনও এই গ্রন্থের নানা স্থানে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। দীর্ঘ ৫০ বৎসর পরেও ইহার ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় নাই, যদিও পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে শুনিয়াছি। তাহাতে পাণিনি ও তৎপরবর্তীদের কীর্তিকলাপ বর্ণিত হইবার কথা। সে যাহাই হউক, বাঙ্‌লা ভাষায় এই জাতীয় গবেষণা-গ্রন্থের ইহাই প্রথম আবির্ভাব বলিয়া গ্রন্থকার আন্তরিক অভিনন্দনযোগ্য। তাঁহার তথ্য সংগ্রহের তুলনা নাই, সিদ্ধান্তগুলিও প্রণিধানযোগ্য। তবে গ্রন্থ পাণ্ডিত্য ভারাক্রান্ত বলিয়া সাধারণ পাঠকের দুরধিগম্য। স্থল-বিশেষে সহজ বিষয়ও অযথা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। গঠন-সৌকর্যের অভাবে একই বিষয়ের পুনঃপুনঃ অবতারণার ফলে গ্রন্থের আয়তনও হইয়াছে বৃহৎ। তথাপি বিষয়-গুরুত্বে বাঙ্‌লা ভাষায় এই গ্রন্থ অতুলনীয়। আমাদের পথিকৃৎ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ডঃ প্রভাত চন্দ্র চক্রবর্তী প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের উপর গবেষণামূলক নিবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'The Philosophy of Sanskrit Grammar', Calcutta, 1930 এবং 'The Linguistic Speculations of the Hindus', Calcutta, 1933—গ্রন্থ-দুইটির নাম করিতে হয়। ২য়টি তাঁহার P.R.S. এবং ১ম টি Ph. D. পরীক্ষার থিসিস্। ইহা ছাড়া তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় স্ফোটবাদ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতি ব্যাকরণ-সম্পর্কিত নানা বিষয়ের উপর নিবন্ধ লিখিয়া ব্যাকরণ-ইতিহাসের প্রচুর তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। অকালে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু না হইলে, এই ক্ষেত্রে তিনি আরও অবদান রাখিয়া যাইতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার পূর্বোক্ত ১ম গ্রন্থের সারমর্ম, Johann Schropfer-কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রাগ্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে—'Ein Werk uber die Philosophie der Sanskrit Grammatik' (1937)।

শ্রীপাদকৃষ্ণ বেলবলকর (S. K. Belvalkar)-রচিত 'Systems of Sanskrit Grammar' (Poona, 1915)-গ্রন্থ আকারে বৃহৎ না হইলেও, একাধারে বিভিন্ন ব্যাকরণের ইতিহাস-বর্ণনার ইহাই প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা। মহারাষ্ট্রের কোল্হাপুর জেলায় ১২।১২।১৮৮০ তারিখে তাঁহার জন্ম। পুনার ডেকান কলেজের ছাত্র। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী, সংস্কৃত, ইতিহাস এবং রাষ্ট্রনীতির এম. এ.। C.R.Lanmann-এর অধীনে গবেষণা করিয়া হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph.D. প্রথমে ডেকান কলেজ ম্যানাস্ক্রিপ্ট্ লাইব্রেরীর কিউরেটর, পরে সেই কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক, ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা (৬।৭।১৯১৭) এবং কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান। ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে রক্ষিত প্রাচীন পুঁথির বর্ণনামূলক তালিকা ('Descriptive Catalogue of the Govt. Collections of Manuscripts deposited at the B.O.R.I.') তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থটি ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী ভারতীয় বিদ্যাপ্রকাশন থেকে 'An Account of the Different Existing Systems of Sanskrit Grammar' নামে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্যাকরণ-বিদ্যার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সরস আলোচনার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট নাম ডঃ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতার জোড়াসাঁকো-অঞ্চলে তাঁহার জন্ম। মেধাবী ও প্রতিভাধর ছাত্ররূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ববিভাগে একাদিক্রমে ৩৫ বৎসরকাল অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। বেদে ও ব্যাকরণে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল রসাশ্রিত। ইংরেজী, বাঙ্লা ও সংস্কৃতে মোট ৫খানি পত্রিকার তিনি (বিভিন্ন সময়ে) সম্পাদনা করেন। ইহাদের নাম (১) সুরভারতী (বাঙ্লামাসিক), (২) Calcutta Oriental Journal (ইংরেজী মাসিক), (৩) মঞ্জূষা (সংস্কৃত সাপ্তাহিক, পরে মাসিক), (৪) Oriental Literary Digest (পুণা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা) এবং (৫) সংস্কৃত সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা (সংস্কৃত মাসিক)। 'Technical Terms and Technique of Sanskrit Grammar' (Part I, Cal.1948) নামে খ্যাত গ্রন্থটি রচনা করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট্. উপাধি পান। ইহার পরিপূরক স্বরূপ 'Upasarga and other Technical Terms' (Usha Memorial Series, No. 8, Manjusha, March, 1955)—তৎকর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত হয়। বৈদিক সাহিত্য হইতে শুরু করিয়া পাণিনির পূর্ববর্তী, পাণিনীয় এবং পাণিনির পরবর্তী সমগ্র ব্যাকরণ-সাহিত্য মন্থনপূর্বক তিনি এই গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। ব্যাকরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রথমে বৈদিক সাহিত্যে কোন্ অর্থে এবং কি আকারে প্রযুক্ত হইয়া ক্রমে কিভাবে ব্যাকরণে বর্তমান রূপ ও অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। ব্যাকরণগবেষণার ক্ষেত্রে ইহা এক অপরিহার্য আকরগ্রন্থ স্বরূপ। ফরাসী পণ্ডিত L.Renou (1896-1966) অনুরূপ বিষয়ে তিন খণ্ডে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা 'Terminologie grammaticale du Sanskrite' নামে ১৯৪২ সনে প্যারিসে প্রকাশিত হয়। ক্ষিতীশ বাবুর অন্যান্য পুস্তক—'Popular Etymology', 'Greek Proverbs' (Cal. 1953), 'Critical Observations of Ajayapala's Nanarthasamgraha', 'The Sivasutras and the Sans. Alphabet' (প্রবন্ধ), 'শব্দকথা' (প্রথম আশ্বাস, কলিকাতা ২০০৪ সংবৎ), 'ঊষার আলো', 'নক্ষত্রমালা'। তৎসম্পাদিত গ্রন্থ 'চান্দ্রব্যাকরণ' (১ম খণ্ড) পুণা,

১৯৫৩। বিভিন্ন পত্রে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধাবলী গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হওয়া উচিত।

অভ্যঙ্কর-বংশীয় মারাঠী পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কাশীনাথ বাসুদেব এক বিখ্যাত পণ্ডিত বংশের সন্তান। তাঁহার পিতামহ ভাস্কর শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর (১৭৮৫-১৮৭১) নাগেশ-রচিত লঘুশব্দেন্দুশেখরের এক টীকা রচনা করেন। বোম্বের এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ কলেজের অধ্যাপক কীলহর্নসাহেব সাতারাতে এই ভাস্কর শাস্ত্রীর নিকট হইতে ব্যাকরণশাস্ত্রের অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধান করিয়া লইতেন। কাশীনাথের পিতা মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর (১৮৬৩-১৯৪২) পুণার ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে যে সব গ্রন্থ (প্রায় ২৫ খানি) রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে পরিভাষেন্দুশেখরের টীকা 'তত্ত্বাদর্শ' (১৮৮৬), লঘুশব্দেন্দুশেখরের টীকা 'গূঢ়ার্থপ্রকাশ' (১৮৮৮) এবং সমগ্র মহাভাষ্যের মারাঠী অনুবাদ (১৯৩০-৩৮) ব্যাকরণ-বিষয়ক। ৬ ভাগে এই অনুবাদকার্য বিন্যস্ত। কাশীনাথ ইহার ৭ম ভাগ-রূপ যে প্রস্তাবনা-খণ্ড মারাঠী ভাষাতেই রচনা করিয়াছেন, তাহাতে মুখ্যতঃ পাণিনীয় ব্যাকরণের ইতিহাস ও তদানুষঙ্গিক বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। মহাভাষ্যের ৭খণ্ডে গ্রথিত এই মারাঠী অনুবাদ, পুণা ডেকান এডুকেশন সোসাইটি হইতে ১৯৪১-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অন্য কোনও ভারতীয় ভাষায় মহাভাষ্যের এইরূপ পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। কাশীনাথের 'A Dictionary of Sanskrit Grammar' এক অপূর্ব গ্রন্থ। ওরিয়েন্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট, বরোদা হইতে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থে, সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভিন্ন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নামাবলী বর্ণানুক্রমিক সজ্জিত করিয়া আনুষঙ্গিক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহার অপর গ্রন্থ 'পরিভাষা সংগ্রহ'—ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ হইতে ১৯৬৩ সনে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে বিভিন্ন (১৭) ব্যাকরণের পরিভাষাসমূহ আনুষঙ্গিক বৃত্তি-ব্যাখ্যাসহ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে তিনি অভয়নন্দীর বৃত্তির ভিত্তিতে জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের পরিভাষাগুলি সঙ্কলনপূর্বক উহাদের 'জৈনেন্দ্রপরিভাষাবৃত্তি' নামে এক ব্যাখ্যা-গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন।

পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর বর্মা এবং লক্ষ্মণ স্বরূপ উভয়েই নিরুক্তবিশেষজ্ঞ এবং পাঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ৩।১১।১৮৮৭ তারিখে রাওয়ল-

পিণ্ডিতে সিদ্ধেশ্বরের জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থায় রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী থাকাকালীন তিনি লঘুকৌমুদীর Ballantyne-কৃত ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া সংস্কৃতের প্রতি আকৃষ্ট হন, যদিও ইতিহাস ছিল তাঁহার স্নাতকোত্তর পরীক্ষার বিষয়। স্কুলের শিক্ষকরূপে কর্মজীবন শুরু করিয়া পরে তিনি জম্মুর ষ্টেট কলেজ (Prince of Wales College, Jammu and Kashmir State)-এর সংস্কৃতের অধ্যাপক রূপে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। অধ্যাপনাকালে তিনি ভারতসরকারের Language Scholarship পাইয়া ইংল্যাণ্ডে যান এবং সেখানে গবেষণান্তে 'Critical Studies in the Phonetic Observations of Indian Grammarians' (London, 1929) নামক গ্রন্থ রচনার দ্বারা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে D. Lit. উপাধিপ্রাপ্ত হন। তাঁহার 'The Etymologies of Yaska' (Hoshiarpur, 1953) নামক অপর গ্রন্থে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোকে যাস্কীয় নিরুক্তিসমূহের পর্যালোচনা করা হইয়াছে।

উত্তরপ্রদেশের মুজফ্‌ফরনগর জেলার কৈরানাতে লক্ষ্মণ স্বরূপের জন্ম (১৫।১।১৮৯৪) হইলেও, পিতার সঙ্গে তিনি পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন এবং ক্রমে লাহোরের ওরিয়েণ্টাল কলেজ হইতে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, লাহোরের D.A.V.College-এ সংস্কৃতের অধ্যাপনা করার সময় সরকারী বৃত্তি পাইয়া, অক্স্‌ফোর্ডে বিখ্যাত ম্যাক্‌ডোনেল সাহেবের অধীনে ৪ বৎসর (১৯১৬-২০) যাস্কীয় নিরুক্তের উপর গবেষণা চালান। ইংরেজী অনুবাদসহ নিরুক্তের প্রথম critical edition এই গবেষণার ফল। ইহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ মুখবন্ধে এবং শব্দার্থ প্রভৃতিতে তিনি প্রাচীন ভারতীয় এবং গ্রীক অবদানের যে তুলনামূলক আলোচনা করেন, তাহা ভাষা-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। দেশে ফিরিয়া তিনি ১৯২০ সনে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপনায় যোগ দেন এবং ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের ইউনিভার্সিটি ওরিয়েণ্টাল কলেজের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হন। এই পদে তিনিই প্রথম ভারতীয়। তাঁহারই পরামর্শে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গবেষণামূলক প্রবন্ধরচনার ভিত্তিতে সংস্কৃতে M. A. উপাধিদানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলী—

(১) 'An Introduction to Nirukta', Oxford, 1920 (এই গ্রন্থে নিঘণ্টু ও নিরুক্তের কর্তৃত্ব, যাস্কের সময় প্রভৃতি আলোচিত) ;
(২) 'Nirukta, translated into English', London, 1921 (ইহাতে ভাষাতত্ত্বে ভারতীয় এবং গ্রীক অবদানের মূল্যায়ন করা হইয়াছে);
(৩) 'The Nighantu and the Nirukta', Punjab University, Lahore, 1927 (being the first critical edition) ;
(৪) 'Fragments of the commentaries of Skandaswamin and Mahesvara on Nirukta', P.U., Lahore, 1928 (ইহা নিরুক্তের প্রথম অধ্যায়ের টীকাদ্বয়ের প্রথম পর্যালোচনাত্মক সংস্করণ);
(৫) 'Indices and Appendices to Nighantu and Nirukta', P.U., Lahore, 1929 ;
(৬) 'Commentaries of Skandaswamin and Mahesvara on Nirukta', 2 vols., P.U., Lahore, 1931,1934 (ইহাতে নিরুক্তের ২য়-১২শ অধ্যায়ের টীকা মুদ্রিত) ;
(৭) 'Rgarthadipika, on Rgveda Samhita by Mahadeva, son of Sri Venkatarya' (a pre-Sayana and hitherto unpublished commentary) Vols. I-III, Lahore, 1939, 1940, 1943. এই গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ড (৭ম মণ্ডল পর্যন্ত) মুদ্রিত হওয়ার সময় ২৬।১০।১৯৪৬ তারিখে স্বরূপের দেহত্যাগ হয়।

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদের জীবনী এবং রচিত-গ্রন্থাদি লইয়া ইংরেজী এবং বাঙ্‌লা ভাষায় প্রচুর আলোচনা করিয়াছেন। বাঙ্‌লা ভাষায় রচিত তাঁহার 'বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা' এক তথ্যবহুল অপূর্ব গ্রন্থ। ইহা 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান' শীর্ষক গ্রন্থমালার ১ম ভাগ রূপে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ হইতে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি 'রবীন্দ্রপুরস্কার' লাভ করেন। এই গ্রন্থে এবং পূর্বোক্ত প্রবন্ধাদিতে ব্যাকরণ-ইতিহাসের অনেক উপাদান বর্তমান।

পণ্ডিত বটকৃষ্ণ ঘোষ আলোচ্য ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এবং গ্রন্থকার। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অধিবাসী, মিউনিক এবং প্যারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট, প্রথমে ঢাকা ও পরে কলিকাতা

কলিকাতা ও বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত যথাক্রমে 'Sino-Indian Studies' (Quarterly Journal) এবং বিশ্বভারতীপত্রিকার ইংরেজী ও বাঙ্‌লা সংস্করণের তিনি কিছুকাল সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ—'Studies in the Tantras', Part I (Cal. University, 1939), 'India and China', 'A Thousand years of Sino-India Cultural Relations' (1944) এবং 'India and Central Asia' (1955)। এইসব গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত এবং বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থমালায় প্রকাশিত তাঁহার বাঙ্‌লা গ্রন্থ 'ভারত ও চীন' (১৩৫৭), 'ভারত ও ইন্দোচীন' (১৩৫৭), 'ভারত ও মধ্য এশিয়া' (১৩৫৭) এবং 'বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য' (১৩৫৯)।

ডঃ প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ীর জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলায় ২৬।১২।১৯০১ তারিখে। পিতা অভিলাষচন্দ্র সার্বভৌম। রাজসাহীতে তাঁহার টোল ছিল। প্রবোধচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাশ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃতে (১ম শ্রেণীতে ১ম হইয়া) এম. এ. পাশ করেন এবং সেইখানেই সংস্কৃতে অধ্যাপনায় সময় সরকারী বৃত্তি লইয়া ১৯৩০ সনে বিলাত যান। সেখানে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক R. L. Turner-এর ছাত্ররূপে 'The Word-order of Sanskrit and its Later Indo-Aryan Forms' নামক গবেষণা-গ্রন্থ রচনা করিয়া ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে Ph.D. উপাধি পান। এই রচনাটি পরে তৎকর্তৃক 'Studies in the Syntax of Indo-Aryan Prose' নামে রূপান্তরিত হয়। ইংল্যাণ্ড হইতে তিনি জার্মেনিতে যান এবং সেখানে জার্মান পণ্ডিত Bruno Liebich-এর সান্নিধ্যে কীলহর্ণ-সম্পাদিত মহাভাষ্যের ভিত্তিতে যে Concordance : Panini-Patanjali (Mahabhasya) প্রস্তুত করেন তাহা Breslau হইতে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দেশে ফিরিয়া তিনি পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সেখানকার সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ হন, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে আসেন, পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন (১৯৫৪), ১৯৬২তে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত বিভাগের অধ্যক্ষ, এবং ১৯৬৭ সনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে যোগদানের ৪ বৎসর পরে অবসর গ্রহণ

করেন। তৎকৃত অন্যান্য গ্রন্থ—'The Negative Construction in Indo-Aryan' (The Dacca University Studies, Vol. I, No.2, April, 1936) ; পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রীর সহিত একযোগে বঙ্গ ভাষায় রচিত 'পাণিনীয়ম্— A Higher Sanskrit Grammar and Composition,' কলিকাতা, ১৯৫৬ ; (অপ্রকাশিত—) পূর্বোক্ত Ph.D. থিসিস্, The Alphabet in Sanskrit Grammatical Literature, Basic forms of Sanskrit Pronouns এবং Critical Edition of the Kasika, the Commentary of the Astadhyayi (অষ্টাধ্যায়ী)।

কাশীর রামশঙ্কর ভট্টাচার্য পাণিনি-বিশেষজ্ঞ। নানা পত্র-পত্রিকায় বিশেষতঃ 'নাগরীপ্রচারিণী পত্রিকা'তে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধাবলী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হিন্দী, সংস্কৃত এবং ইংরেজী—তিন ভাষাতেই তিনি লিখিয়া থাকেন। 'শ্রীমদ্‌ভগবৎ পাণিনি-সম্মত সূত্রার্থনির্ণয়ঃ' এবং 'গণপাঠালোচনম্' তাঁহার সংস্কৃত রচনা। এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত 'Journal of the Gananath Jha Research Institute' [8 (4), pp. 407-18]-এ প্রকাশিত 'Some principles of tracing pre-Paninian portions in Paninian works'—তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ।

পরশুরামকৃষ্ণ গোড়ে (P.K.Gode) ১১।৭।১৮৯১ তারিখে বোম্বের রত্নগিরি জেলায় মারাঠী করহাড়া ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পুণার ফার্গুসন কলেজের ছাত্র, ইংরেজী ও সংস্কৃতে এম. এ., ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রথমে Asstt. Curator এবং পরে ১৯২১ সন হইতে Curator. বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ভারতীয় বিদ্যার (প্রায় সমস্ত বিভাগেই) তাঁহার যে সব লেখা বাহির হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ 'Thirty years of Historical Research or Bibliography of the published writings of Prof. P. K. Gode' (Poona, 1947)-গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। বরোদা ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতেও তাঁহার প্রবন্ধাবলী 'Studies in Indian Literary History (1916-59)' নামে ৫ খণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে।

লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক প্রকাশিত বাসুদেবশরণ অগ্রবালের 'India as known to Panini' (1953) এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ। পাণিনির সূত্রাবলীতেও যে তাঁহার সমকালীন সামাজিক, আর্থিক, রাজনীতিক, ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কত বিচিত্র উপাদান অনুস্যূত

ছিল এবং তাহাকে যে কত সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত করা যায়, তাহা এই গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বে কল্পনার অতীত ছিল বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আট অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রথম চারি অধ্যায়ের জন্য তাঁহাকে Ph.D. এবং শেষ চারি অধ্যায়ের জন্য D. Lit. উপাধি দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনায় তিনি মহাভাষ্য, মহাভাষ্যপ্রদীপ, মহাভাষ্য-প্রদীপোদ্দ্যোত এবং কাশিকা প্রভৃতি ব্যাখ্যা-পুস্তকের সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণেই গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভাষ্যের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে পাণিনির 'মস্করমস্করিণৌ বেণুপরিব্রাজকয়োঃ' (৬।১।১৫৪) সূত্রের অন্তর্গত 'মস্করী'ই যে গৌতম বুদ্ধের সমকালীন আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক 'মখ্খলী গোসাল', তাহা নির্ধারণপূর্বক তিনি খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতকের শেষার্ধকে পাণিনির অভ্যুদয়-কাল বলিয়া একরূপ নিঃসন্দিগ্ধভাবেই সাব্যস্ত করিয়াছেন।[২] তাঁহার মতে পাটলিপুত্রের রাজা নন্দিবর্ধনের পুত্র মহানন্দ ছিলেন পাণিনির Patron (পোষ্টা)। তাঁহার এই গ্রন্থের অনুকরণে (?) বৈজনাথপুরী 'India in the Time of Patanjali' (Bombay, 1957) নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহা তেমন উচ্চ মানে পৌঁছিতে পারে নাই। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অগ্রবালের লেখা বহু প্রবন্ধ ছড়াইয়া আছে। ইহাদের বেশীর ভাগই ব্যাকরণের বিষয়-সংক্রান্ত। 'The Indian Historical Quarterly' পত্রিকায় (Vol. XXIX, No.1, March, 1953) প্রকাশিত অগ্রবালের 'Geographical Data in Panini'—একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি অষ্টাধ্যায়ীর প্রমাণের ভিত্তিতে দেখাইয়াছেন যে, উত্তরে কম্বোজ (Pamir), দক্ষিণে অশ্মক (on the Godavari), পশ্চিমে সৌবীর (Sind) এবং পূর্বে কলিঙ্গ ও সুরমস্ (আসামের সুরমা উপত্যকা) পর্যন্ত পাণিনির ভৌগোলিক দৃষ্টি প্রসারিত ছিল।

অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের রচনাবলীর মধ্যে নিরুক্তবিষয়ক গবেষণাই বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ইহার সুসম্বদ্ধ ফলশ্রুতি তাঁহার 'Yaska's Nirukta and the Science of Etymology' (Calcutta, 1958) গ্রন্থ। লক্ষ্মণ স্বরূপ এবং সিদ্ধেশ্বর বর্মার নিরুক্তঘটিত আলোচনার পরেও শতাধিক পৃষ্ঠাসম্বলিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এই গ্রন্থ একাধারে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর 'নিটোল' রচনার মৌলিকতা দাবী করিতে পারে। বাক্যপদীয়ের ১ম কাণ্ডের বিষ্ণুবাবুর বঙ্গানুবাদ পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্যপুস্তকপর্ষদ্-কর্তৃক ২খণ্ডে ১৯৮৫ এবং ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

পণ্ডিত এস্. পি. চতুর্বেদী পাণিনি-বিশেষজ্ঞ। তাই তাঁহার প্রায় সমস্ত লেখাই পাণিনি-কেন্দ্রিক। ইঁহাদের মধ্যেকার একটি 'On the technique of anticipation in the application of the Paniniyan sutras' বোম্বে হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

গজানন বালকৃষ্ণ পলসুলে-রচিত 'The Sanskrit Dhatupathas ; a critical study' (Poona, 1961) ধাতুপাঠবিষয়ক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে বিভিন্ন ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ে প্রচলিত ধাতুপাঠের উপজীব্য ধাতুসমূহের এবং তাহাদের অর্থাদির তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার অপর গ্রন্থ 'A Concordance of Sanskrit Dhatupathas' (Poona, 1955)। ৯ খানি ধাতুপাঠের অবলম্বনে রচিত এই গ্রন্থের শেষে ধাতুসমূহের অর্থও দেখানো হইয়াছে। বোপদেব-কৃত ধাতুপাঠ 'কবিকল্পদ্রুমে'র এক পর্যালোচনাত্মক সংস্করণও (পুণা, ১৯৫৪) তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

মঙ্গলদেব শাস্ত্রী বৈদিক প্রাতিশাখ্য সম্বন্ধে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তাঁহার সম্পাদনায় এলাহাবাদ হইতে ৩খণ্ডে (১৯৩১) প্রকাশিত সভাষ্য ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য—এই গ্রন্থের অন্য সমস্ত সংস্করণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্যত্র [Prince of Wales Sarasvati-Bhavan Studies, 5 (d), 7 (e), Benares] তিনি ঋক্-, বাজসনেয়ি-, তৈত্তিরীয়- এবং অথর্ববেদ-প্রাতিশাখ্যের উপাদানগত তুলনামূলক আলোচনাও করিয়াছেন। হিন্দী ভাষায় রচিত তাঁহার 'তুলনামূলক ভাষাশাস্ত্র' ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হয়।

পণ্ডিত সূর্যকান্ত শাস্ত্রীও প্রাতিশাখ্য-বিশেষজ্ঞ। তৎসম্পাদিত (সাম-প্রাতিশাখ্য) 'ঋক্তন্ত্র', 'লঘু ঋক্তন্ত্র সংগ্রহ' এবং 'অথর্বপ্রাতিশাখ্য' লাহোর হইতে যথাক্রমে ১৯৩৩, ১৯৪০ এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁহার আর এক গ্রন্থ 'A Grammatical Dictionary of Sanskrit (Vedic), I—Phonetics'—Delhi, 1953. ইহা Wackernagel-রচিত 'Altindische Grammatik'-এর ১ম খণ্ডের এবং Macdonell-প্রণীত 'Vedic Grammar'-এর প্রথম ৮২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচিত শব্দসমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচী-স্বরূপ। ইহার প্রস্তাবিত

২য় খণ্ড ('The second volume of the dictionary will incorporate all that is covered by the remaining volumes of Wackernagel and the remaining portion of Macdonell'—Preface, p.x) অবশ্য এখনো প্রকাশিত হয় নাই।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেন উভয়েই ভাষাবিজ্ঞানী হইলেও সেনমহাশয়ের 'পিছুটান' অর্থাৎ প্রাচীন ভাষাপ্রীতি অধিকতর স্পষ্ট। চট্টোপাধ্যায়ের লক্ষ্য মুখ্যতঃ আধুনিক ভাষা সমূহের প্রতি নিবদ্ধ বলিয়া তাঁহার সংস্কৃত চর্চা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।৩ তাঁহার রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য—'Sanskrit and the languages of Asia' [Visvabharati Quarterly, 18 (1), pp. 1-14], 'Phonetics in the Study of Classical and Sacred Languages in the East' (paper read at II International Congress of Phonetic Sciences, July, 1935) এবং 'A History of Aryan Speech in India' (Calcutta Review 60, Sept. 1936)। সুকুমারবাবুর প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য রচনা ঃ 'History and Pre-history of Sanskrit', Mysore University, 1958 ; 'Some Indo-Aryan Etymologies', Darbhanga, 1948 ; 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' (কলিকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ)। এই শেষোক্ত গ্রন্থেও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যই পর্যবেক্ষিত। তাঁহার 'ভাষার ইতিবৃত্ত' এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। পাণিনি-বিষয়ে তাঁহার তিনটি বক্তৃতাসম্বলিত পুস্তিকা 'Paninica'—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

হিন্দী ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক। গ্রন্থের নাম 'সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রকা ইতিহাস'। ইহার ১ম ভাগ দিল্লী হইতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে (পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, আজমের, ২০২০ সম্বৎ) এবং ২য় ভাগ,—আজমের, সম্বৎ ২০১৯-এ প্রকাশিত হইয়াছে। রচনা তথ্যসমৃদ্ধ হইলেও, প্রাচীন এবং রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি আনুগত্যহেতু ইহাতে আধুনিক পর্যালোচনা তথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অভাব লক্ষিত হয়। ফলে ইহার গতানুগতিক রচনা-ধারা যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে নাই। তিনি ইহার ৩য় ভাগও প্রকাশ করিবেন বলিয়াছেন। তৎকর্তৃক রচিত, সম্পাদিত এবং অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য বলিয়া প্রচারিত আরও কয়েকটি গ্রন্থ—

'পাণিনিকে সময় বিদ্যমান সংস্কৃত বাঙ্ময়' (আজমের, ১৯৪৯) ; 'শিক্ষাসূত্রাণি (আপিশলি-পাণিনি-চন্দ্রগোমিবিরচিতানি)', আজমের, ১৯৪৯ ; 'ক্ষীরস্বামিকৃত ক্ষীরতরঙ্গিণী' (অমৃতসর,১৯৫৭) ; 'ছন্দঃশাস্ত্রকা ইতিহাস' ; 'শিক্ষাশাস্ত্রকা ইতিহাস' ; 'নিরুক্তশাস্ত্রকা ইতিহাস' ; 'ভাগবৃত্তি সংকলনম্' (আজমের, সম্বৎ ২০১১) ; 'পাণিনীয় গণপাঠকা আদর্শ সংস্করণ' ; 'বৈদিকছন্দোমীমাংসা' ; 'অপাণিনীয় পদসাধুত্বমীমাংসা' ; 'বররুচিকৃত নিরুক্ত-সমুচ্চয়' ; 'দশপাদী উণাদিবৃত্তি' ; 'ঋষিদয়ানন্দকে গ্রন্থোঁকা ইতিহাস' প্রভৃতি। ব্যাকরণ তথা বেদাঙ্গের ইতিবৃত্তরচনার ক্ষেত্রে একক-প্রচেষ্টার এত ব্যাপক প্রতিশ্রুতি কার্যে রূপায়িত হইলে এক বিরল নিদর্শনের সৃষ্টি হইবে। প্রথমোক্ত গ্রন্থের ৩য় ভাগ ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক V. Raghavan-সঙ্কলিত 'New Catalogus Catalogorum—an alphabetical Register of Sanskrit and allied works and authors' (Madras, 1956—)—খণ্ডশঃ প্রকাশিতব্য এক অসাধারণ গ্রন্থনা। এ যাবৎ প্রকাশিত সংস্কৃত এবং তদানুষঙ্গিক অন্য পুঁথিপত্রের যাবতীয় তালিকা এবং মুদ্রিত পুস্তকাবলীর অবলম্বনে সমস্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের নামাবলী বর্ণানুক্রমে সজ্জিত করিয়া এই মহাগ্রন্থ প্রস্তুত করা হইয়াছে। রাঘবনের অপর পুস্তক 'Sanskrit and allied Indological Studies in Europe' (Madras, 1956)—ইউরোপীয় পণ্ডিতদের আধুনিক প্রাচ্য বিদ্যা-গবেষণার সংবাদে পূর্ণ। কে. কুঞ্জুন্নি রাজাও ঐ তালিকার সংকলক।

সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের পঠন-পাঠনের পদ্ধতি লইয়া এযাবৎ যে সব আলোচনা-পুস্তক রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য 'The Problem of Sanskrit teaching' (Kolhapur, 1949)। ইহার প্রণেতা গণেশ শ্রীপাদ (বালশাস্ত্রী) হুপরিকর। গ্রন্থখানি এত উন্নত পর্যায়ের এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে, এই এক গ্রন্থের দ্বারাই তিনি বিখ্যাত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ কালীচরণ শাস্ত্রী পাণিনীয় এবং চান্দ্র ব্যাকরণ-ধারায় বঙ্গদেশের অবদান বর্ণনাপূর্বক তিন খণ্ডে এক বিরাট গ্রন্থরচনার পরিকল্পনা করিয়াছেন। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইহার প্রথম প্রস্তাবনা-খণ্ড 'Bengal's Contribution to Sanskrit Grammar in the Paninian and Candra Systems'

(Part I. General Introduction) নামে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্য দুই খণ্ড এখনো অপ্রকাশিত। ঐ ১ম খণ্ডে মুখ্যতঃ পাণিনিপূর্ব এবং পাণিনীয় ব্যাকরণ-সাহিত্যের একটা সামগ্রিক রূপরেখা নির্দেশ করা হইয়াছে। নূতন কথা প্রায় কিছুই নাই, বরং পর্যালোচনা-সহকারে কোনো কোনো পূর্ব সিদ্ধান্তের খণ্ডন বা তাহার ন্যায্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের প্রকাশ আছে।

প্রাচীন ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হইয়া যাঁহারা ইংরেজ–যুগে শিক্ষা-প্রচারের ক্ষেত্রে আগাইয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বেদাত্মা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর (১৮২৪-৮৩) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। গুজরাটের কাথিয়াবাড়ে এক সম্পন্ন নাগর-ব্রাহ্মণ কুলে তাঁহার জন্ম। সামবেদী ঔদীচ্য ব্রাহ্মণ। প্রাচীন প্রথায় শিক্ষালাভ করিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষায় অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং কঠোর তপস্যাদিও করেন। সন্ন্যাস-গুরু স্বামী বিরজানন্দ সরস্বতীর নিকট তিনি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্বক ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বৈদিক ধর্মপ্রচারের জন্য ভারত-পরিক্রমা শুরু করিয়া কাশীর বিচার-সভায় (১৮৬৯) জয়লাভের (?) পর ভারতবিখ্যাত হন। তিনি ঋগ্‌বেদের ভাষ্য রচনায় মনোনিবেশ করিলেও তাহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১১২টি ব্যাকরণ-পরিভাষা এবং মহাভাষ্যের কিছু কিছু বাক্যসহ তিনি পাণিনির সূত্রপাঠকে নূতন করিয়া সাজান এবং হিন্দী ভাষায় সূত্রার্থ দেন। এই সবই তাঁহার 'বেদাঙ্গপ্রকাশে' (১৮৮২) দ্রষ্টব্য। ভট্টোজি দীক্ষিতের 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী'তে অনুসৃত বিষয়-বিন্যাসের অনুকরণ করিয়াও তিনি তাহাতে বৈদিক প্রক্রিয়ার স্থানগত প্রাধান্য-হীনতার সমালোচনা করেন। তাঁহার মতে মাত্র তিন বৎসরে সমগ্র ব্যাকরণশাস্ত্র অধিগত করা চলে, সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রৌঢ়মনোরমা এবং নাগেশভট্টের শেখরাদি গ্রন্থ ব্যাকরণকে কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাকরণের আর্ষধারা অর্থাৎ অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রধারাই অনুসরণীয় বলিয়া অভিমত দান করিয়া এবং 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র সূত্র-বিন্যাসকে শ্রমসাধ্য ও কৃত্রিম বলিয়া মন্তব্য করিয়াও কার্যতঃ তিনি কিন্তু বেদাঙ্গপ্রকাশে 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র বিষয়-বিন্যাসেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তিনি পৃথক্‌ভাবে অষ্টাধ্যায়ীর এক অসম্পূর্ণ (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত) ভাষ্যও রচনা করেন। ১৯৩৬ সংবতে

তিনি কোনও প্রাচীন তর্জমার[৪] আধারে প্রাপ্ত পাণিনীয় শিক্ষাসূত্রসমূহের এক সঙ্কলন 'বর্ণোচ্চারণশিক্ষা' নাম দিয়া হিন্দী অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়া যান। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে (মাঘ, ১৯৩৯ সংবৎ) তিনি উণাদিবৃত্তি রচনা সমাপ্ত করেন। অন্যান্য উণাদিবৃত্তির তুলনায় ইহার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে প্রত্যেক শব্দের যৌগিক ও রূঢ়ার্থ পৃথক্‌ভাবে প্রদর্শিত, যেমন 'করোতীতি কারুঃ, কর্তা, শিল্পী বা ; বাতি গচ্ছতি জানাতি বেত্তি বায়ুঃ, পবনঃ, পরমেশ্বরো বা' ইত্যাদি। অন্য সকল উণাদি-বৃত্তিতে উণাদিপ্রত্যয়ান্ত শব্দ সমূহের কেবল রূঢ়ার্থই প্রদর্শিত হইয়াছে।

অনুরূপ ক্ষেত্রে আর একটি নাম সত্যব্রত সামশ্রমী (১৮৪৬-১৯১১)। বাঙালী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের সন্তান। জন্মস্থান পাটনা। পিতার জন্মও সেখানে। পূর্বনিবাস—পশ্চিমবঙ্গের কালনার ধাত্রী গ্রামে (ধাই গাঁ)। ৫ বৎসর বয়সের বালক স্বীয় সত্যানুরাগের জন্য পিতার নিকট 'সত্যব্রত' আখ্যা লাভ করেন। কাশীধামে 'সরস্বতী মঠে' নানা শাস্ত্রে বিশেষতঃ বৈদিক সাহিত্যে জ্ঞান লাভের পর ভারত-পর্যটন কালে তিনি সামতন্ত্রের উপর অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়া বুন্দি-রাজের নিকট 'সামশ্রমী' উপাধি লাভ করেন। বঙ্গদেশে বেদপ্রচারই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র সামবেদ এবং যজুর্বেদ, ইহাদের প্রাতিশাখ্য এবং ব্রাহ্মণাদি সহ প্রায় ১৫ খানি গ্রন্থকে ভাষ্য- ও বঙ্গানুবাদ-সম্বলিত করিয়া প্রকাশ করেন। নানা সম্মানের মধ্যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদবিভাগে বক্তার এবং পরে এই বিভাগের রীডারের (Reader) পদ প্রাপ্ত হন। 'ঊষা' এবং 'প্রত্নকম্রনন্দিনী' নামে দুই পত্রিকার প্রকাশনা এবং ইহাদের মধ্য দিয়া বৈদিক সাহিত্য প্রচারই ছিল তাঁহার পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের একটি প্রধান দিক্। এই দুই পত্রিকায় কিঞ্চিদধিক ৫৭ খানি বৈদিক গ্রন্থ তাঁহার সুযোগ্য সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। রচিত গ্রন্থ—'ঐতরেয়ালোচনম্' এবং 'নিরুক্তালোচনম্' (কলিকাতা ১৮৯০)। দুই গ্রন্থই সংস্কৃতে রচিত। শেষোক্ত গ্রন্থে নিরুক্তকার যাস্কের এবং বৈয়াকরণ পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলির গ্রন্থ ও জীবনীর আলোচনা অতি সহজ সংস্কৃতে করা হইয়াছে। তৎপূর্ববর্তীদের কথাও আছে। এই গ্রন্থে তিনি পাণিনিকে যাস্কের পূর্ববর্তী প্রমাণ করিতে যে প্রয়াস স্বীকার করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় হইলেও তাঁহার ঐ মত এখন অচল।

কপিলদেব দ্বিবেদী শাস্ত্রী হিন্দী ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের গণপাঠের উপর এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন—'সংস্কৃত ব্যাকরণমে গণপাঠকী পরম্পরা ঔর আচার্য পাণিনি' (আজমের,. ২০১৮ সংবৎ)। তাঁহার অপর গ্রন্থ 'অর্থবিজ্ঞান ঔর ব্যাকরণদর্শন' (এলাহাবাদ, ১৯৫১)।

ইদানীং উত্তর ভারতে বৈয়াকরণ হিসাবে খুব নাম ডাক চারুদেব শাস্ত্রীর। তিনি ৫ খণ্ডে 'ব্যাকরণ চন্দ্রোদয়' নামে এক বিশাল ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। মহাভাষ্যের কিয়দংশের হিন্দী অনুবাদ এবং 'Panini Reinterpreted' নামক ইংরেজী গ্রন্থ রচনা করিয়া বিদ্বৎমহলে যথেষ্ট সাড়া জাগাইয়াছেন।[৫]

পাণিনির সংস্কারমুক্ত কঠোর সমালোচকরূপে অগ্রসর আধুনিক পণ্ডিতদের অন্যতম শিবরাম দত্তাত্রেয় যোশী (S.D.J.) বুদ্ধিপ্রাখর্যে ব্যাকরণের ভিত্তিটাকেই যেন নাড়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন বলা চলে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর গঠন, রচনা-কৌশল ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি এমন সব ত্রুটি ও সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন, যাহার যৌক্তিকতা প্রাচীনপন্থীদের বিপাকে ফেলিতে যথেষ্ট। Saroja Bhate-র সঙ্গে এক-যোগে রচিত তাঁহার গ্রন্থ The Fundamentals of Anuvrtti ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পুণা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপূর্বে পুণা থেকে তাঁহারই সম্পাদনায় কৌণ্ডভট্টের স্ফোটনির্ণয় (The Sphotanirnaya of Kaunda Bhatta) তৎকৃত ইংরেজী অনুবাদসহ ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় মহাভাষ্যের অংশবিশেষের ইংরেজী অনুবাদ—Patanjali's Vyakarana Mahabhasya : Samarthahnika (P. 2.1.1.) ed. with translation and Explanatory Notes, Poona, 1968 ; পরে মহাভাষ্যের অন্যান্য অংশও অনুরূপ ভাবে এবং কিছু আবার J.A.F. Roodbergen-এর সহকারিত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। যোশীজীর অন্যান্য কিছু রচনা—Word-Integrity and Syntactic Analysis, Pune 1968 ; The Functions of Asiddhatva and sthanivadbhava in Panini's Astadhyayi, Pune, 1982 ; (Saroja Bhate-র সঙ্গে একত্রে) The Role of the Particle ca (চ) in the Interpretation of the Astadhyayi (published as an article...), University of Poona, Pune, 1983 ; Proceedings of the International Seminar on Studies in the

Astadhyayi of Panini (held in July, 1981), Edited by S. D. Joshi and S. D. Laddu, University of Poona, Pune, July, 1983 ; যোশীজীর একক সম্পাদনায় ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে, Paul Kiparsky-রচিত Panini as a Variationist গ্রন্থ, পুণা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হইয়াছে। ত্রিমুনিব্যাকরণে প্রাকৃত ভাষার প্রভাবের জন্য দ্রঃ S. D. Laddu's (1978) 'Prakritic Influence Revealed in the works of Panini, Katyayana and Patanjali', Proceedings of the Seminar on Prakrit Studies, L.D.Institute, Ahmedabad, pp. 88-100.

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাকৃত ভাষা-বিশেষজ্ঞ ও গ্রন্থকার।

---

১ সেখানে তিনি এমনও বলিতে সাহস করিয়াছেন যে পাণিনি সম্ভবতঃ না বুঝিয়াই অষ্টাধ্যায়ীর বৈদিকাংশে ঋক্প্রাতিশাখ্য হইতে টুকিয়াছেন—'Panini has not only copied the Rkpratisakhya, but he has copied it mechanically, perhaps without even understanding what he was quoting.' (p. 670) এই প্রসঙ্গে Indian Culture পত্রিকায় (Vol. IV. No. 4, April 1938, pp. 387-99) তাঁহার 'Thieme and Panini' প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য।

২ ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর এবং ম্যাকডোনেল-এর মতেও পাণিনি খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীয়।

৩ তিনি বাঙ্‌লা ভাষার স্বরধ্বনি-ঘটিত চারি প্রকার পরিবর্তন-রীতির জন্য যে সংজ্ঞাগুলির নির্দেশ করিয়াছেন তাহা বাঙ্‌লা ব্যাকরণ সমূহে গৃহীত হইয়াছে—(১) স্বরসঙ্গতি (Vocalic harmony বা Harmonic sequence, (২) অপিনিহিতি (Epenthesis), (৩) অভিশ্রুতি (Umlaut অথবা Vowel mutation) এবং (৪) অপশ্রুতি (Ablaut অথবা Vowel alterance অথবা Apophony)।

৪ যুধিষ্ঠির মীমাংসকের মতে এই তর্জমাই পাণিনি- রচিত মূল সূত্রাত্মক শিক্ষাগ্রন্থ। বর্তমানে 'পাণিনীয়শিক্ষা' নামে প্রচলিত শ্লোকাত্মক শিক্ষা অর্বাচীন এবং পূর্বেরটির তুলনায় কৃত্রিম।

৫ তাঁহার আর এক গ্রন্থ 'শব্দাপশব্দবিবেকঃ'। ইহা মূলতঃ শরণদেবের দুর্ঘটবৃত্তির পরিপূরক হইলেও, ১০ বিভাগে ও ৩৮ উপবিভাগে বিন্যস্ত এক বৃহত্তর রচনা। প্রারম্ভে ঃ

ইহার্বাচাং প্রণেতৄণাং সংগৃহীতাদুরুক্তয়ঃ।
ক্রিয়াভ্যঃ প্রচরন্তীভ্যঃ ক্বচিৎ প্রাচাং পরীক্ষিতাঃ।।

প্রাকৃত ভাষা ও ব্যাকরণ

শিষ্ট ভাষার রূপ-পরিবর্তনের আভাস ব্যাকরণ-মহাভাষ্যে স্পষ্ট। সেখানে (পস্‌পশাহ্নিকে) সাধু শব্দের অপভ্রংশ, বৈয়াকরণ ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথনে সূতকর্তৃক অসংস্কৃত শব্দের ব্যবহার, ম্লেচ্ছ ভাষা এবং অপভাষার দোষক্রটির বর্ণনা, শিষ্টানুকরণ, সাধুশব্দপ্রয়োগ-জনিত ফলশ্রুতি এবং সর্বোপরি ব্যাকরণ অধ্যয়নের ১৮টি প্রয়োজনের উল্লেখ প্রভৃতির মধ্য দিয়া ঐ পরিবর্তনের কথাই প্রকারান্তরে সূচিত বা স্বীকৃত হইয়াছে।

মহাভাষ্যকারের পূর্ববর্তী মৌর্যবংশীয় রাজাদের বৌদ্ধধর্মানুরক্তির ফলে প্রাকৃত ভাষাগুলি রাজানুগ্রহলাভে সমর্থ হয়। অশোকের শিলালিপিগুলির ভাষা ইহার প্রমাণ। তৎপূর্ববর্তী নন্দবংশীয় রাজাদের আমলে পাণিনি ও কাত্যায়নের অভ্যুদয়। তাহারও পূর্বে শিশুনাগবংশীয় রাজা বিম্বিসারের সময়ে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। তিনি সর্ব-সাধারণের মুখের ভাষায় স্বীয় ধর্মমত প্রচার করিয়া সর্বপ্রথম জনগণের কথ্য ভাষাকে মর্যাদা দান করেন। সেই সময় হইতে প্রাকৃত অর্থাৎ সর্ব-সাধারণের ভাষার যে দীর্ঘকালব্যাপী জাগরণ, তাহার বিশেষ কোনও বর্ণনা রক্ষণশীল সংস্কৃত শাস্ত্রকারগণ প্রদান করেন নাই। 'অসাধু' বলিয়া তাঁহারা ইহাকে ঘৃণাভরে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। পাণিনি-কাত্যায়ন এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। তবে মৌর্যযুগের বৌদ্ধপ্রভাবের ফলে প্রাকৃতের যে প্রসার-প্রতিপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক সুঙ্গবংশীয় শাসনের সময় (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক) রক্ষণশীল ঐতিহ্যের সমর্থক মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির নিকট তাহা একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিবার মতো ছিল না। তাই তাঁহার রচনায় একটা ভাষা-সমস্যার আভাস ও সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার গণ্ডীবদ্ধতার সূচনা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সোজাসুজি সাধুশব্দকে প্রকৃতি না বলিয়া, তিনি যখন 'ন চাপশব্দঃ প্রকৃতিঃ। ন হ্যপশব্দা উপদিশ্যন্তে' (মহাভাষ্য ১।১।১ম আহ্নিক) ইত্যাদি নেতিবাচক বাক্যের অবতারণা করেন, তখনই সেই সমস্যার জটিল দিক্‌টা ধরা পড়ে। নাট্যশাস্ত্রে এবং পরবর্তী কালের অলঙ্কার শাস্ত্রগুলিতে ভাষাপ্রসঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সহিত অন্যান্য ভাষার উল্লেখ থাকিলেও, উহাদের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রায়

কোন চেষ্টারই সন্ধান পাওয়া যায় না। এমন কি প্রাকৃত ভাষার বৈয়াকরণগণও এই বিষয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার সার্থক পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহারা প্রায় সকলেই গতানুগতিক ধারায় সংস্কৃতকে মূল বা প্রকৃতিরূপে গণ্য করিয়া, প্রাকৃত ভাষাগুলিকে ঐ সংস্কৃতেরই বিকৃতি বা অপভ্রষ্ট-রূপ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

তবে বিপরীত অর্থাৎ সংস্কৃতের মোহমুক্ত চিন্তারও যে একেবারেই সন্ধান মেলে না এমন নয়। খ্রীঃ ৭ম/৮ম শতাব্দীয় বাক্‌পতিরাজ তাঁহার 'গৌড়বহো' (গৌড়বধ) নামক প্রাকৃত মহাকাব্যে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যেমন জল সমুদ্র হইতে নির্গত হইয়া আবার সমুদ্রেই ফিরিয়া আসে, সেইরূপ সমস্ত ভাষাই প্রাকৃত ভাষা হইতে বহির্গত হইয়া তাহাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে—'সয়লাও ইমং বায়া বিসংতি এত্তো যনেংতি বায়াও। এংতি সমুদ্দং চিয়নেংতি সায়রাওচ্চিয় জলাইং।।' ৯৩।। অর্থাৎ 'সকলা ইমং বাচো বিশন্তি ইতশ্চ নির্যান্তি বাচঃ। আগচ্ছন্তি সমুদ্রমিব নির্গচ্ছন্তি সাগরাদিব জলানি।।' ৯ম/১০ম শতাব্দীয় রাজশেখর 'বালরামায়ণ' নাটকে লাট দেশের 'লাটীয়া' প্রাকৃতকে সংস্কৃতের যোনি বা উৎস বলিয়াছেন ঃ 'যদ্‌ যোনিঃ কিল সংস্কৃতস্য...' (১০।৪৮)। পালি ব্যাকরণের প্রণেতা কচ্চায়ন (কাত্যায়ন) পালি ভাষাকে সকল ভাষার মূল বলিয়াছেন। তাঁহার মতে কল্পারম্ভে ব্রাহ্মণ এবং অন্য বর্ণের ইহাই মাতৃভাষা ছিল ঃ 'সা মাগধী মূল ভাসা নরা যা আদিকপ্পিকা। ব্রহ্মাণো চস্‌সুতালাপা সম্‌বুদ্ধা চাপি ভাসরে।।' ১১শ শতাব্দীতে জৈন পণ্ডিত নমিসাধু রুদ্রট-রচিত কাব্যালঙ্কারের (২।১২) ব্যাখ্যায় প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে যেন সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

> প্রাকৃতেতি। সকলজগজ্জন্তূনাং ব্যাকরণাদিভিরনাহতসংস্কারঃ সহজো বচনব্যাপারঃ প্রকৃতিঃ। তত্রভবং সৈব বা প্রাকৃতম্‌। 'আরিসবয়ণে সিদ্ধং দেবানাং অদ্ধমাগহা বাণী' ইত্যাদি বচনাদ্‌ বা প্রাক্‌ পূর্বকৃতং প্রাকৃতং বালমহিলাদিসুবোধং সকলভাষা-নিবন্ধনভূতং বচনমুচ্যতে। মেঘনির্মুক্তজলমিবৈকস্বরূপং তদেব চ দেশবিশেষাৎ সংস্কারকরণাচ্চ সমাসাদিতং বিশেষং সৎ সংস্কৃতাদ্যুত্ত-রবিভেদানাপ্নোতি। অতএব শাস্ত্রকৃতা (রুদ্রটেন) প্রাকৃতমাদৌ

নির্দিষ্টং তদনু সংস্কৃতাদীনি। পাণিন্যাদিব্যাকরণোদিতশব্দলক্ষণেন সংস্করণাৎ সংস্কৃতমুচ্যতে।

অর্থাৎ প্রাণিগণের ব্যাকরণ-সংস্কারবর্জিত সহজ ও স্বাভাবিক বাগ্‌ব্যাপারই প্রকৃতি (বা মূল)। এই প্রকৃতি হইতেই প্রাকৃত ভাষা। প্রাক্ অর্থাৎ পূর্বে কৃত প্রাকৃত। ইহা বালক ও মহিলাদি সকলেরই অনায়াস-বোধগম্য এবং অন্য সমস্ত ভাষার উৎস। মেঘমুক্ত জলের ন্যায় একস্বরূপ এই ভাষাই দেশভেদে এবং সংস্কারাদিদ্বারা সংস্কৃত প্রভৃতি নানা রূপ ধারণ করে। তাই শাস্ত্রকার (রুদ্রট) প্রথমে প্রাকৃতের এবং পরে সংস্কৃত প্রভৃতি অন্যান্য ভাষার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণের দ্বারা সংস্কৃত বলিয়া এই ভাষার নাম সংস্কৃত হইয়াছে। মেদিনিকরও তাঁহার শব্দকোষে সংস্কৃতকে 'লক্ষণোপেত' বলিয়াছেন। লক্ষণ = ব্যাকরণসূত্র। 'প্রাকৃত্যা স্বভাবেন সিদ্ধমিতি প্রাকৃতম্' অথবা 'প্রাকৃতজনানাং ভাষা প্রাকৃতম্' এইরূপ সত্যাশ্রয়ী বাক্য বৈয়াকরণদের লেখনীতে কদাচিৎ ধরা দেয়। খ্রীঃ ১২শ শতকে ব্যাকরণাচার্য হেমচন্দ্র এই বিষয়ে কতকটা গতানুগতিকতা-বিরোধী মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার 'কাব্যানুশাসন' এবং 'দেশী নামমালা'র প্রারম্ভে ইহার সন্ধান মেলে। সেখানে তিনি 'জৈনী ভাষা' অর্ধমাগধী প্রাকৃতকে 'অকৃত্রিমস্বাদুপদা,' 'সর্বভাষাপরিণতা,' 'আস্‌সভাষাপরিণামিনী' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। প্র+অকৃত=প্রাকৃত, এইরূপ মতও আছে। 'প্রাকৃতং প্রকৃষ্টম্ অকৃতম্ অকার্যং যস্য'—শব্দকল্পদ্রুম। মোট কথা, সংস্কৃতের বিপরীতার্থ সূচক প্রাকৃত। 'প্রাকৃতমবিকারম্'—ভাবপ্রকাশ। প্রাকৃত-মাতৃভাষা (Mother tongue) এবং সংস্কৃত—পিতৃভাষা (Father tongue)। 'কর্পূর মঞ্জরী'তে (পৃঃ ৮—৯) রাজশেখর সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে, নর ও নারীর মতো ভেদ কল্পনা করিয়াছেন। সংক্ষিপ্তসার - প্রাকৃতপাদের ৪।৩৫ নং সূত্রের টীকায় নারায়ণ বিদ্যাবিনোদ লিখিয়াছেন ঃ 'কেচিদাহুঃ প্রাকৃতং ত্রিবিধং জ্ঞেয়মনুকারি বিকারি চ। দেশীয়মিতি শব্দৈজ্ঞৈঃ প্রয়োগো দৃশ্যতে বহু।। অনুকারি সংস্কৃতসদৃশং বিকারি লক্ষণসিদ্ধং দেশীয়ং মোরট্‌ঠাদিদেশপ্রসিদ্ধম্।'

(২)

দেশ- বা অঞ্চল-ভেদে প্রাকৃত ভাষা নানা রকমের। নামগুলিও প্রায়ই দেশসূচক। ইহাদের মধ্যে ছয়টি 'যড়ভাষা' আখ্যায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ঃ ১। মহারাষ্ট্রী বা মাহারাষ্ট্রী, ২। মাগধী, ৩। পৈশাচী, ৪। শৌরসেনী বা শূরসেনী, ৫। চূলিকা পৈশাচী এবং ৬। অপভ্রংশ। দণ্ডীর কাব্যাদর্শে (১।১৪) মহারাষ্ট্রীকে 'প্রকৃষ্ট প্রাকৃত' বলা হইয়াছে ঃ 'মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।'

অপভ্রংশ বলিয়া সুনির্দিষ্ট কোনো ভাষা নাই। দণ্ডীর মতে কাব্যসমূহে আভীরাদি পশুপালকদের ভাষা এবং ব্যাকরণশাস্ত্রের বিচারে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষাই অপভ্রংশ বা অপভ্রংশজাত। দেশভেদে ইহার নানা রূপ পরিলক্ষিত হয় ঃ '...দেশবিশেষাদপভ্রংশঃ'—কাব্যালঙ্কার। ২৭ রকম অপভ্রংশের নাম শুনা যায় ঃ ব্রাচণ্ড (ব্রাচড়), লাট, বৈদর্ভ, নাগর, উপনাগর, বার্বর, আবন্ত্য, পাঞ্চাল, টাক্ক, মালব, কৈকেয়, গৌড়, উড্র, দৈব, পাশ্চাত্ত্য, পাণ্ড্য, কৌন্তল, সিংহল, কলিঙ্গ, প্রাচ্য, কার্ণাট, কাঞ্চ, দ্রাবিড়, গৌর্জর, আভীর, মধ্যদেশীয় এবং বৈড়াল। লাটী, বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, টাক্কী ইত্যাদি নামান্তরও দৃষ্ট হয়। দেশী ভাষাগুলির সহিত সাদৃশ্যবশতঃ এবং নাটকাদিতে ব্যবহৃত না হওয়ায় প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ প্রায়শঃ অপভ্রংশকে পরিহার করিয়াছেন। অনেকে অপভ্রংশকে প্রাকৃত রূপেই গণ্য করেন নাই। এই প্রাকৃত অবশ্য সাহিত্যের প্রাকৃত। বৈয়াকরণগণ যেসব প্রাকৃতের আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের সবকয়টিই সাহিত্যাশ্রয়ী। আসলে কথ্য প্রাকৃতই অপভ্রংশ এবং দেশ-ভেদে ইহার সাহিত্যে উন্নীত রূপগুলিই বিভিন্ন নামে টিকিয়া আছে। হেমচন্দ্র 'দেশীনামমালা'য় (১।৩৭) অপভ্রংশের স্বরূপ বর্ণনায় ইহাকে 'প্রাকৃতমপভ্রষ্টমিব রূপম্' বলিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় তাঁহার 'প্রাকৃতসর্বস্ব' ব্যাকরণে আভীরদের ভাষাকে অপভ্রংশ না বলিয়া বিভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। রামচন্দ্র তর্কবাগীশের মতে অপভ্রংশকে বিভাষার অন্তর্ভুক্ত করা অনুচিত এবং সর্বসাধারণের কথিত ভাষাই অপভ্রংশরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত, যেমন সাহিত্যের ভাষারূপে মাগধী একটি ভাষা, কিন্তু কথ্য ভাষারূপে ইহা অপভ্রংশ। রবিকরের মতে অপভ্রংশ দুই রকমের ঃ (১) প্রাকৃতভিত্তিক এবং (২) দেশভাষা।

প্রধানতঃ আলঙ্কারিকগণই অপভ্রংশ লইয়া বেশী আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহার নিদর্শনও রাখিয়া গিয়াছেন। বাগ্‌ভটালঙ্কারে (২।৩) কথ্য দেশী ভাষাকেই অপভ্রংশ বলা হইয়াছে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শে (১।৩২) অপভ্রংশ ও মিশ্রভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থাদির কথা আছে। ছন্দোগ্রন্থ 'প্রাকৃত পৈঙ্গল'— প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ছন্দের উপর রচিত। লক্ষ্মীনাথ ভট্ট ইহাকে 'অবহট্‌ঠ (অপভ্রষ্ট) ভাষা' বলিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকের চতুর্থাঙ্কের প্রাকৃত, অপভ্রংশের নিদর্শনরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দোহাচ্ছন্দে নিবদ্ধ ৭৭ শ্লোকাত্মক 'বৈরাগ্যসার' কাব্য সুপ্রভাচার্য-কর্তৃক অপভ্রংশে রচিত, রচনাকাল খ্রীঃ ১৭৭০।৭১ অব্দ।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র এবং প্রাকৃতব্যাকরণ-সমূহের সূত্র ও বৃত্তিভাগ হইতে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন ভাষার নাট্য-ব্যবহার ও স্বরূপ বর্ণনার কিছু নমুনা দেওয়া গেল ঃ

অতিভাষা— 'অতিভাষা তু দেবানাম্'—ভরতের নাট্যশাস্ত্র ১৭।২৮

অবন্তী— 'ধূর্তানামপ্যবন্তিজা'—ভ. না. ১৭।৫২,
'অথাবন্তী মহারাষ্ট্রীশৌরসেন্যোরৈক্যম্'—প্রাকৃতানুশাসন ১১।১

অর্ধমাগধী— 'চেটানাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠিনাংচার্ধমাগধী'—ভ. না. ১৭। ৫১
'মহারাষ্ট্রীমিশ্রার্ধমাগধী'—সংক্ষিপ্তসার ৫।৯৫

আভীর বা আভীরী— 'গজাশ্বাজীবিকোষ্ট্রাদিঘোষস্থাননিবাসিনাম্।
আভীরোক্তিঃ শাবরী চ...।।'—ভ. না. ১৭।৫৬
'ভট্টাদিবহুলা আভীরী'—প্রাকৃতসর্বস্ব (১৮।১২) বৃত্তি

আর্যভাষা— 'আর্যভাষা তু ভূভুজাম্'—ভ. না. ১৭।২৮

ওড্রী বা ঔট্রী— 'ইকারোকারপ্রায়া ওড্রী...'—প্রাকৃতানুশাসন ১৮।১৮
'ঈকারোকারবহুলা ঔট্রী'—প্রাকৃতসর্বস্ব (১৮।১২) বৃত্তি

উপনাগর বা উপনাগরক-- 'অথোপনাগরকং দ্বয়োঃ সাঙ্কর্যাৎ'—প্রাকৃতানুশাসন ১৮।১৪
[দ্বয়োঃ = নাগরক-ব্রাচড়কয়োঃ]

কাঞ্চী— 'এওবহুলা কাঞ্চী'—প্রাকৃতসর্বস্ব (১৮।১২) বৃত্তি
কার্ণাটী— 'বর্ণবিপর্যয়াৎ কার্ণাটী'—ঐ
কালিঙ্গী— 'হিংযুক্তা কালিঙ্গী'—ঐ
কৈকেয় বা
কৈকেয়ী— 'সবীপ্সাপ্রায়া কৈকেয়ী'—প্রা...ন ১৮।১৯
'সবীপ্সা কৈকেয়ী'—প্রা. সর্বস্ব (১৮।১২) বৃত্তি
কৌন্তলী— 'ডকারবহুলা কৌন্তলী'—ঐ
গৌড়ী— 'বহুসমাসা গৌড়ী'—প্রা...ন ১৮।২০
'সমাসাঢ্যা গৌড়ী'—প্রা. সর্ব...(১৮।১২) বৃত্তি
গৌর্জরী— 'সংস্কৃতাঢ্যা গৌর্জরী'—ঐ
চাণ্ডালী— 'চাণ্ডালী পুক্কসাদিষু'—ভ. না. ১৭।৫৪
'অথ চাণ্ডালী মাগধীবিকৃতিঃ'—প্রা...ন ১৪।১
জাতিভাষা— 'দ্বিবিধা জাতিভাষা চ প্রয়োগে সমুদাহৃতা।। ম্লেচ্ছশব্দোপচারা চ ভারতং বর্ষমাশ্রিতা।... জাতিভাষাশ্রয়ং পাঠ্যং দ্বিবিধং সমুদাহৃতম্। প্রাকৃতং সংস্কৃতং চৈব চাতুর্বর্ণ্যসমাশ্রয়ম্।।'—ভ.না.১৭।২৯-৩২
টক্ক বা টক্কী—'অথ টক্কদেশীয়া বিভাষা সংস্কৃতশৌরসেন্যোঃ'—প্রা...ন ১৬।১
'প্রযুজ্যতে নাটকাদৌ দ্যূতাদিব্যবহারিভিঃ। বণিগ্ভির্হীনদেহৈশ্চ তদাহুষ্টক্কভাষিতম্।। টক্কদেশীয় ভাষায়াং দৃশ্যতে দ্রাবিড়ী তথা। তত্র চায়ং বিশেষোঽস্তি দ্রবিড়ৈরাদ্রিতা পরম্।।'—প্রাকৃতসর্বস্ব ১৬।১-২
দাক্ষিণাত্যা— 'যোধনাগরকাদীনাং দাক্ষিণাত্যাথ দীব্যতাম্'—ভ.না.১৭।৫৩
'দাক্ষিণাত্যপদসম্বলিতং যৎ সংস্কৃতাদিভিরভিচ্ছুরিতংচ। স্বাদুসারমমৃতাদপি কাব্যং দাক্ষিণাত্যমিতি তৎকথয়ন্তি।।'—প্রাকৃতকল্পতরু ২।২।৩২
'দাক্ষিণাত্যপদাবলম্বি সংস্কৃতাঙ্গং বিজৃম্ভিতম্। কাব্যং পীযূষনিঃস্যন্দি দাক্ষিণাত্যমিতীরিতম্।।'—প্রাকৃতসর্বস্ব (১২।৩৮) বৃত্তি
দ্রাবিড় বা দ্রাবিড়ী—'দ্রামিড়ী বনচারিষু'—ভ. না. ১৭।৫৬
'রেফব্যত্যয়েন দ্রাবিড়ী'—প্রা. সর্বস্ব (১৮।১২) বৃত্তি

নাগর বা নাগরক—	'নাগরকঃ' (অপভ্রংশঃ)—প্রা...ন ১৭।১
পাঞ্চাল বা পাঞ্চালী—	'সূক্ষ্মন্তরাস্তু পাঞ্চালাদয়ো লোকতঃ'—প্রা...ন ১৮।১৫ 'বাদীবহুলা পাঞ্চালী'—প্রা...স্ব (১৮।১২) বৃত্তি
পাশ্চাত্ত্যা—	'রলহভ্যাং ব্যত্যয়েন পাশ্চাত্ত্যা'—ঐ
পৈশাচিক—	কৈকেয়পৈশাচী, শৌরসেনপৈশাচী ও পাঞ্চালপৈশাচী (প্রাকৃতসর্বস্ব ১৯।১—২০।১৮) ; কৈকেয়পৈশাচী—'সংস্কৃতশৌরসেন্যোর্বিকৃতিঃ'—ঐ ১৯।৩
প্রাচ্যা—	'প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাম্'—ভ. না. ১৭।৫২ '...লোকোক্তয়ো বহুলম্। শেষে শৌরসেনী'—প্রা...ন ১০।১৩-৪ 'পূর্বাপরহতংক্বাপি ক্বচিচ্ছেকোক্তিসুন্দরম্। গ্রাম্যাভ্যামুপমোক্তিভ্যাং যুক্তং বক্তি বিদূষকঃ।।'—প্রা. সর্বস্বে (১০।১) উদ্ধৃত। 'প্রাচ্যা তদ্দেশীয়ভাষাঢ্যা'—ঐ(১৮।১২) বৃত্তি
পাণ্ড্যা—	'একারিণী চ পাণ্ড্যা'—ঐ
বাহ্লীক—	'বাহ্লীকভাষোদীচ্যানাংখসানাং চ স্বদেশজা'—ভ. না. ১৭।৫৩
বিভাষা—	'শকারাভীরচণ্ডালশবরদ্রবিড়ান্ধ্রজাঃ। হীনা বনেচরাণাং চ বিভাষা নাটকে স্মৃতাঃ।।'—ঐ ১৭।৫০
বৈতালিকী—	'ঢ়কারবহুলা বৈতালিকী'—প্রা...সর্বস্ব (১৮।১২) বৃত্তি
বৈদর্ভী—	'উল্লপ্রায়া বৈদর্ভী' —প্রা...ন ১৮।১৬, প্রা...সর্বস্ব (১৮।১২) বৃত্তি
ব্রাচট বা ব্রাচড়ক—	'ব্রাচটাদিরপভ্রংশভেদঃ'—সংক্ষিপ্তসার (৫।৬৬) বৃত্তি
ভাষা—	'মাগধ্যবন্তিজা প্রাচ্যা শৌরসেন্যর্ধমাগধী। বাহ্লীকা দাক্ষিণাত্যা চ সপ্ত ভাষাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।'—ভ. না. ১৭।৪৯ '...টক্কবর্বরকুন্তলপাণ্ড্যসিংঘলাদিভাষা...' প্রা...ন ১৮।২১

'শকাভীরদ্রাবিড়োড্রাবন্ত্যাবন্তিশ্রাবন্তিপ্রাচ্যশৌরসেনীবাহ্লিকী-দাক্ষিণাত্যাদি ভাষাভেদাশ্চ নাটকাদৌ পাত্রভেদে চ।'—সংক্ষিপ্তসার (৫।৯৬) বৃত্তি

'ন বর্বর কিরাতান্ধ্রদ্রমিলাদ্যাসু জাতিষু।
নাট্যপ্রয়োগে কর্তব্যং কাব্যং ভাষাসমাশ্রিতম্।।'—ভ. না. ১৭।৫৮

মধ্যদেশীয়— 'মধ্যদেশীয়া তদ্দেশীয়াঢ্যা'—প্রা. সর্বস্ব (১৮।১২) বৃত্তি

মাগধী— 'মাগধী তু নরেন্দ্রাণামন্তঃপুরসমাশ্রয়া।...সুরঙ্গখনকাদীনাং সন্ধিকারাশ্বরক্ষতাম্। ব্যসনে নায়কানাং চাপ্যাত্মরক্ষাসু মাগধী।।'—ভ. না. ১৭।৫১, ৫৭

'অথ মাগধী শৌরসেনীতঃ প্রায়ঃ'—প্রা...ন ১২।১

মালবী— 'তুবহুলা মালবী'—প্রা. সর্বস্ব (১৮।১২) বৃত্তি

যোন্যন্তরী ভাষা—'অথ যোন্যন্তরী ভাষা গ্রাম্যারণ্যপশূদ্ভবা। নানাবিহঙ্গ-জাচৈব...।।'—ভ. না. ১৭।৩০

লাটী— 'সম্বোধনাঢ্যালাটী'—প্রা...ন ১৮।১৭, প্রা...সর্বস্ব (১৮।১২) বৃত্তি

শকারী বা শাকারী— 'শকারঘোষকাদীনাং তৎস্বভাবশ্চ যো গণঃ। শকারভাষা যোক্তব্যা...অঙ্গারকারব্যাধানাং কাষ্ঠযন্ত্রোপজীবিনাম্। যোজ্যা শকারভাষা তু কিঞ্চিদ্‌বানৌকসী তথা।।'—ভ. না. ১৭।৫৪, ৫৫

'অথ শাকারী বিভাষাবিশেষো মাগধ্যাঃ'—প্রা...ন ১৩।১

'অপার্থম্ অক্রমংব্যর্থং পুনরুক্তং হতোপমম্।
ন্যায়কার্যাদিবাহ্যঞ্চ শকারবচনং ভবেৎ।।'—ঐ ১৩।১৩

শবরী বা শাবরী—'শবরী মহারাষ্ট্রীয় নীচ জাতিভেদঃ'—সংক্ষিপ্তসার (৫।৯৬) টীকা ; 'শাবরী চ মাগধীবিশেষশ্চ প্রকৃত্যা'—প্রা...ন ১৫।১

শৌরসেনী— 'নায়িকানাং সখীনাংচ শৌরসেন্যবিরোধিনী'—ভ.না.১৭।৫২

'অথ শৌরসেনী। সংস্কৃতানুগমাদ্ বহুলম্। শেষে মহারাষ্ট্রী।'—প্রা...ন ৯।১-৩

সৈংহলী— 'যুক্তাঢ্যা সৈংহলী'—প্রা...সর্বস্ব (১৮।১২) বৃত্তি

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকাশ্রিত ভাষাবিধান-সম্পর্কে সর্বশেষে ভাষাসমূহের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য উপদিষ্ট হইয়াছে অতি সংক্ষেপে ও স্থূলভাবে ঃ

গঙ্গাসাগরমধ্যে তু যে দেশাঃ সংপ্রকীর্তিতাঃ।
একারবহুলাং ভাষাং তেষু তজ্জ্ঞঃ প্রযোজয়েৎ।।
বিন্ধ্যসাগরমধ্যে তু যে দেশাঃ শ্রুতিমাগতাঃ।
নকারবহুলাং তেষু ভাষাং তজ্জ্ঞঃ প্রযোজয়েৎ।।
সুরাষ্ট্রাবন্তি দেশেষু বেত্রবত্যুত্তরেষু চ।
যে দেশাস্তেষু কুর্বীত চকারপ্রায়সংশ্রয়াম্।।
হিমবৎসিন্ধুসৌবীরান্ যে জনাঃ সমুপশ্রিতাঃ।
উকারবহুলাং তজ্জ্ঞস্তেষু ভাষাং প্রযোজ্য়েৎ।।
চর্মণ্বতীনদীতীরে যে চার্বুদসমাশ্রয়াঃ।
ওকারবহুলাং নিত্যং তেষু ভাষাং প্রযোজয়েৎ।।
এবং ভাষাবিধানং তু কর্তব্যং নাটকাশ্রয়ম্।
অথ নোক্তংময়া যচ্চ লোকাদ্‌গ্রাহ্যং বুধৈস্তু তৎ।। ভ.না.
১৭।৫৯–৬৪।।

ভরত খ্রীষ্টীয় ১ম শতকে আবির্ভূত বলিয়া অনুমিত, যদিও এই বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। তাঁহার পরে বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশ (খ্রীঃ ৫ম শতক) এবং হেমচন্দ্র সূরির (খ্রীঃ ১২শ শতক) প্রাকৃতাধ্যায়। ইঁহাদের মধ্যবর্তী মালবরাজ ভোজদেবও (খ্রীঃ ১১শ শতক) প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা করেন বলিয়া লক্ষ্মীধরের ষড়্ভাষাচন্দ্রিকাতে উল্লেখ আছে। L. Nitti-Dolci তাঁহার প্রাকৃত বৈয়াকরণদের ইতিহাসে (১৯৩৮) রোমান হরফে ভরতের প্রাকৃত ভাষালক্ষণ (ফরাসী অনুবাদ সহ) এবং P.L. Vaidya তৎসম্পাদিত ত্রিবিক্রমের প্রাকৃতশব্দানুশাসনের পরিশিষ্টে ইংরেজী অনুবাদ সহ 'ভরতমুনিনিবদ্ধং প্রাকৃতভাষাণাং স্বরূপম্' প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩)

অদ্যাবধি প্রাকৃত ভাষার যেসব ব্যাকরণ পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে বররুচি-প্রণীত 'প্রাকৃতপ্রকাশ' প্রাচীনতম। বররুচির আগেও যে একাধিক প্রাকৃত বৈয়াকরণ গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সেইসব এখন নামমাত্রে পর্যবসিত, কিছু কিছু উদ্ধৃতি,

অন্ধকারে বিদ্যুৎচমকের মতো গবেষকের সবিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাণিনিরও পূর্ববর্তী আচার্য শাকল্য, মাণ্ডব্য, কোহল, কপিল, এমন কি স্বয়ং পাণিনিও প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিভাত। মার্কণ্ডেয়-রচিত 'প্রাকৃত সর্বস্বে' (৫।৯৬, ৯।১০৯, ৫।৩০বৃত্তি) শাকল্যের, রামচন্দ্র তর্কবাগীশের 'প্রাকৃতকল্পতরু'তে (১।৫।১৯,২৩, ১।৬।২৫, ১।৭।১৪, ১।৮।১৪, ১।৮।১ বৃত্তি, ১।৮।৪২, ২।১। ২৫) শাকল্য, মাণ্ডব্য ও কাত্যায়নের এবং পুরুষোত্তমের 'প্রাকৃতানুশাসনে' (৬।১৪) শাকল্যের মতোল্লেখ দেখা যায়। প্রাকৃত সর্বস্বে (১২।১) এবং প্রাকৃতকল্পতরুতে (২।১।২৮) কোহল এবং কপিলের মত উল্লিখিত হইয়াছে।[১] পাণিনির 'প্রাকৃতলক্ষণে'র কথা বলিয়াছেন মলয়গিরি এবং কেদার ভট্ট। 'সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি'র টীকায় মলয়গিরি লিখিয়াছেন : 'প্রাকৃতে হি লিঙ্গং ব্যভিচারি। যদাহ্ পাণিনিঃ স্ব প্রাকৃতলক্ষণে লিঙ্গং ব্যভিচার্যপীতি।' কেদার ভট্ট : 'পাণিনির্ভগবান্ প্রকৃতলক্ষণমপি বক্তি সংস্কৃতাদন্যদ্ দীর্ঘাক্ষরঞ্চ কুত্রচিদেকাং মাত্রামুপৈতি' (কবিকণ্ঠপাশ)। চণ্ড-কৃত 'প্রাকৃতলক্ষণ'কে কেহ কেহ খ্রীঃ ৩য় শতাব্দীর অনুমান করিয়াছেন। এই অনুমান সত্য হইলে পাণিনির গ্রন্থ চণ্ডের ৭ শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়া থাকিবে।

প্রাকৃত বৈয়াকরণদের এক বিশিষ্ট সম্প্রদায় আবার রামায়ণ-কার বাল্মীকিকে প্রাকৃত ব্যাকরণের আদি সূত্রকার বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। বাল্মীকির নামে আরোপিত প্রাকৃত সূত্রের হস্তলিখিত পুঁথিও একাধিক স্থলে[২] পাওয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ-অঞ্চলে প্রাপ্ত এইরূপ এক পুঁথির সূত্রবিন্যাসক্রম, ত্রিবিক্রম-প্রণীত 'প্রাকৃত শব্দানুশাসনে' অনুসৃত সূত্রক্রমের অনুরূপ। তিনি ইহার ব্যাখ্যারম্ভে লিখিয়াছেন—'বৃত্তির্যথাসিদ্ধ্যৈ ত্রিবিক্রমেণাগমক্রমাৎ ক্রিয়তে' অর্থাৎ পরম্পরাপ্রাপ্ত সূত্রক্রমানুসারে তাঁহার এই ব্যাখ্যাকার্য ; 'আগমক্রমাৎ' = 'পরম্পরাপ্রাপ্তসূত্রক্রমাৎ'। 'ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা'তে লক্ষ্মীধর ঐ সূত্রগুলিকে বাল্মীকিকৃত ধরিয়া লইয়া স্পষ্টতঃই লিখিয়াছেন : 'বাল্মীকির্মূলসূত্রকৃৎ'। তবে তাঁহার এবং সিংহরাজের গ্রন্থে কিন্তু পূর্বোক্ত সূত্রক্রমের ব্যতিক্রম ঘটানো হইয়াছে।

খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর (মতান্তরে ১৭শ/১৮শ শতক) বালসরস্বতী[৩] 'ষড়্ভাষাবিবরণে' বাল্মীকির সূত্রকারত্ব স্বীকার করিয়া জোরের সহিত লিখিয়াছেন :

'বাল্মীকিং সূত্রকারঞ্চ বৃত্তিকারং ত্রিবিক্রমম্। বন্দামহে মহাচার্যান্ হেমচন্দ্রাদিকানপি।। ভাষাণাং প্রাকৃতাদীনাং বাল্মীকির্মূলসূত্রকৃৎ।'... এবং 'ভগবতা বাল্মীকিনা নিবদ্ধলক্ষণং সর্বদেশপ্রসিদ্ধ-ব্যামিশ্রকোপকারি প্রাকৃতং নাপভ্রংশঃ সংস্কৃততুল্যমেব।'

'শম্ভুরহস্য' নামক গ্রন্থের ২৬৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে ঃ

কো বিনিন্দেদিমাং ভাষাং ভারতীমুগ্ধভাষিতাম্।
যস্যাঃ প্রচেতসঃ পুত্রোব্যাকর্তা ভগবানৃষিঃ।।
গার্গ্যগালবশাকল্য পাণিন্যাদ্যা যথর্ষয়ঃ।
শব্দরাশেঃ সংস্কৃতস্য ব্যাকর্তারো মহত্তমাঃ।।
তথৈব প্রাকৃতাদীনাং ষড়্ভাষাণাং মহামুনিঃ।
আদিকাব্যকৃদাচার্যো ব্যাকর্তা লোকবিশ্রুতঃ।।
যথৈব রামচরিতং সংস্কৃতং তেন নির্মিতম্।
তথৈব প্রাকৃতেনাপি নির্মিতং হি সতাং মুদে।।
পাণিন্যাদ্যৈঃ শিক্ষিতত্বাৎ সংস্কৃতী স্যাদ্ যথোত্তমা।
প্রাচেতসা ব্যাকৃতত্বাৎ প্রাকৃত্যপি তথোত্তমা।।
প্রাকৃতং চার্ষমেবেদং যদ্ধি বাল্মীকিশিক্ষিতম্।
তদনার্ষং বদেদ্ যো বৈ প্রাকৃতঃ স্যাৎ স এব হি।।

২৬৭।১৩–১৬,১৯,২৪।।

বাল্মীকির নামে প্রচার করা হইলেও ঐ সূত্রগুলি যথার্থই তাঁহার রচনা কিনা সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, এই জাতীয় প্রচার, অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের ব্যাপার। বররুচি হইতে আরম্ভ করিয়া আচার্য হেমচন্দ্র অথবা সংক্ষিপ্তসারকৃৎ ক্রমদীশ্বর পর্যন্ত কেহই এই ক্ষেত্রে বাল্মীকির কোনও সংস্রবের উল্লেখ করেন নাই। ঘটনা সত্য হইলে, প্রাকৃত ব্যাকরণের ক্ষেত্রে এইরূপ মহা গৌরবের বিষয়ে তাঁহারা একেবারেই নীরব থাকিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, হৈম প্রাকৃতব্যাকরণের সূত্রাবলীর তুলনায়, বাল্মীকির তথাকথিত সূত্রসমূহে অধিকতর পারিভাষিক সৌকর্য এবং তজ্জনিত সংক্ষিপ্ততা লক্ষিত হওয়ায়, এইরূপ মনে করা অনুচিত নয় যে, হেমচন্দ্রের (খ্রীঃ ১২শ শতক) পরবর্তী কোনও ব্যক্তি ঐ সূত্রগুলি রচনা করিয়া, উহাদের আর্ষত্ব প্রতিপাদনের জন্য বাল্মীকির কর্তৃত্ব টানিয়া আনিয়াছেন, কারণ প্রাকৃতের প্রতি একটা হীন দৃষ্টি চিরকালই শিক্ষিত

সমাজে বর্তমান ছিল। শম্ভুরহস্যের পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকাবলীর বক্তব্যে তাহার প্রতিক্রিয়া সূচিত। ডঃ এ.এন. উপাধ্যে 'Valmikisutra : A myth' এবং 'Once again, Valmikisutra : A Myth' (Bharatiya Vidya, Vol. II, ii,1946, pp.160–72 এবং Vol. XV. iii, 1956, pp.28–31) শীর্ষক প্রবন্ধে ঐসব সূত্রে বাল্মীকির কর্তৃত্ব নস্যাৎ করিয়াছেন। তাঁহার মতে শম্ভুরহস্যের রচনাকাল খ্রীঃ ১৪শ শতকের পূর্বে নয়। ভট্টনাথ স্বামিন্ এবং ডঃ টি.কে. লাড্ডুর মতে ত্রিবিক্রমই ঐসব সূত্রের রচয়িতা এবং বৃত্তিকার। আধুনিক অন্য পণ্ডিতদের মধ্যে Eugen Hultzsch (1857–1927); কে.পি. ত্রিবেদী, টি.টি. শ্রীনিবাস গোপালাচার্য এবং L. Nitti-Dolci বাল্মীকির কর্তৃত্বের পক্ষপাতী।

প্রাকৃতপ্রকাশের রচয়িতা বররুচিই পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের বার্ত্তিক-প্রণেতা বররুচি কাত্যায়ন কিনা এবং প্রাকৃতপ্রকাশের ছন্দোবদ্ধ বৃত্তি 'প্রাকৃতমঞ্জরী'ও কাত্যায়ন-রচিত কিনা ইত্যাকার সন্দেহ-সমস্যা অনেক দিনের। জার্মান পণ্ডিত R. Pischel (1856–1909) প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসরণে বার্ত্তিককার কাত্যায়নের প্রাকৃতব্যাকরণ-কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং অপ্পয় দীক্ষিত-কর্তৃক 'প্রাকৃতমণিদীপে' (৫) 'বাররুচা গ্রন্থাঃ' কথার অব্যবহিত পরেই আকরগ্রন্থরূপে উল্লিখিত 'বার্ত্তিকবর্ণভাষ্য'কে কাত্যায়ন-প্রণীত কোনও প্রাকৃতব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[৪] 'প্রাকৃতমঞ্জরী'তে কাত্যায়নের 'মহাকবি' আখ্যা দেখিয়া পাতঞ্জল মহাভাষ্যের (৪।৩।১০১) 'বাররুচং কাব্যম্' উদাহরণ মনে পড়ে। ইহা সত্ত্বেও ফরাসী বিদুষী পূর্বোক্তা Nitti-Dolci তাঁহার 'Les Grammairiens Prakrits' (Paris, 1938) গ্রন্থে[৫] প্রায় সন্দেহাতীত রূপেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, খ্রীঃ ১ম শতাব্দীতে রচিত হালের গাথা সপ্তশতীর ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হইতেই প্রাকৃতপ্রকাশ রচিত ; বিক্রমাদিত্য ২য় চন্দ্রগুপ্তের (৩৭৬–৪১৪খ্রীঃ) 'ধন্বন্তরিক্ষপণকা'দি নবরত্নের অন্যতম ছিলেন এই বররুচি, যিনি কাতন্ত্রব্যাকরণের আদ্যাবৃত্তি 'চৈত্রকূটী'ও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বার্ত্তিক-প্রণেতা বররুচি কাত্যায়ন (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতক) অবশ্য সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি, উভয় বররুচির মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় ৭০০ বৎসর।

(৪)

বর্তমানে প্রচলিত 'প্রাকৃতপ্রকাশ' ব্যাকরণের ১২টি পরিচ্ছেদের শেষ তিন পরিচ্ছেদ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমিত। প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যে একমাত্র ভামহ ব্যতীত আর কেহই ৯ (মূলতঃ ৮) পরিচ্ছেদ ছাড়াইয়া যান নাই ; ভামহের টীকাও ১১শ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তৃত, শেষ পরিচ্ছেদের টীকা অনুপস্থিত। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, বররুচি এবং ভামহের মধ্যবর্তী সময়ে ১০ম ও ১১শ পরিচ্ছেদ এবং ভামহের পরে ১২শ পরিচ্ছেদ যুক্ত করা হয়। আমাদের বিবেচনায়, ভামহের টীকার ঐ ১০ম ও ১১শ পরিচ্ছেদের মৌলিকতাও সন্দেহাতীত নয়, কারণ ভামহের পরবর্তী টীকাকারগণ নিজেদের রচনায় ভামহের রচনার সহায়তা কম-বেশী গ্রহণ করিয়াও কেহই ঐ ১০ম ও ১১শ পরিচ্ছেদ স্পর্শ করেন নাই। মূল গ্রন্থ অজ্‌বিধি, অযুক্তবিধি, সংযুক্তবিধি, সংকীর্ণবিধি, সুব্‌বিধি, তিঙ্‌বিধি, ধাতুবিধি ও নিপাতবিধি—এই ৮ ভাগে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; সুব্‌বিধিকে 'সুবন্তবিশেষ্য' এবং 'সুবন্তসর্বনাম' এই দুই ভাগে ধরিয়া পরিচ্ছেদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯। বসন্তরাজের 'প্রাকৃতসঞ্জিবনী' টীকায় ঐ প্রধান ৮ পরিচ্ছেদেরই কেবল উল্লেখ আছে ঃ

অজ্‌বিধিরযুক্তবিধিঃ সংযুক্তবিধিস্ততস্তু সংকীর্ণঃ।
সুপ্‌তিঙ্‌ধাতুনিপাতজবিধয়োঽষ্টাবিহপরিচ্ছেদাঃ।।

এই ৮(৯) পরিচ্ছেদে মোট ৪২৭টি সূত্রে মহারাষ্ট্রী বা মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত আচরিত হইয়াছে ; পরবর্তী তিন পরিচ্ছেদের বিষয় যথাক্রমে পৈশাচী, মাগধী এবং শৌরসেনী প্রাকৃতভাষা। ইংরেজ পণ্ডিত E.B.Cowell (1826–1903)-সম্পাদিত প্রাকৃতপ্রকাশের (Hertford, 1854) সংস্করণে সমগ্র ১২ পরিচ্ছেদই মুদ্রিত হইয়াছে, অন্যত্র কেবল ৮(৯) পরিচ্ছেদ।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী এবং অমরসিংহের নামলিঙ্গানুশাসন বা অমর-কোষের মতো, বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশেরও এক অনন্যগুরুত্ব রহিয়াছে, কারণ, ইহার ক্ষেত্রেও প্রথম দুইটির মতো, পূর্ববর্তী সমজাতীয় আর কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। প্রাকৃতপ্রকাশের এযাবৎ যে ৫।৬ খানা বৃত্তি বা ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে ভামহ-রচিত 'মনোরমা' সর্বাধিক প্রাচীন, খ্রীঃ ৭ম/৮ম শতাব্দীয় এবং সংক্ষিপ্ত। ভামহ

কাশ্মীরী পণ্ডিত। অন্য বৃত্তিগুলি : 'প্রাকৃতমঞ্জরী,' বসন্তরাজ প্রণীত 'প্রাকৃতসঞ্জীবনী,' সদানন্দের রচনা 'সুবোধিনী,' রামপাণিবাদ-প্রণীত প্রাকৃতপ্রকাশবৃত্তি এবং নারায়ণ বিদ্যাবিনোদকৃত প্রাকৃতপাদটীকা (?)। ইঁহারা সকলেই, ভামহ বাদে, মূলগ্রন্থের অষ্টপরিচ্ছেদবাদী। প্রাকৃতমঞ্জরী পদ্যে রচিত ; রচয়িতার নাম না পাওয়া গেলেও, তিনি যে দক্ষিণ ভারতীয় এবং ভামহের পরবর্তী তাহা এই গ্রন্থেই পরিস্ফুট। সঞ্জীবনী এবং সুবোধিনী উভয়ই ভামহবৃত্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; সুবোধিনীতে সঞ্জীবনীর অনুসরণ করা হইয়াছে। ভামহের ভিত্তিতে রচিত হইলেও, রামপাণির বৃত্তিতে বিখ্যাত প্রাকৃত গ্রন্থাদি হইতে উদাহরণাদি প্রদর্শিত হওয়ায় ইহা খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার মতে প্রাকৃত কোনও ভাষা নয়, সংস্কৃতের বিকৃতি মাত্র ; সংস্কৃত শব্দ কিভাবে প্রাকৃত শব্দে রূপান্তরিত হয়, তাহা দেখাইবার জন্য সূত্ররচনাতেই, তাঁহার মতে প্রাকৃতব্যাকরণের সার্থকতা এবং তৎসম, তদ্ভব ও দেশী এই তিন রকমের মাত্র প্রাকৃত শব্দ। Adyar Library, Madras হইতে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সি. কুনহান রাজা এবং কে. রামকৃষ্ণশর্মার সম্পাদিত রামপাণিবাদের ব্যাখ্যাসহ প্রাকৃতপ্রকাশের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সম্পাদকদ্বয় প্রসঙ্গতঃ পাণিবাদকে খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীয় এবং দক্ষিণভারতীয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। Pischel-এর মতে বসন্তরাজ খ্রীঃ ১৪শ/১৫শ শতাব্দীয়। হেমচন্দ্র দেশীনামমালায় (৮।৩৯) ভামহের নাম করিয়াছেন। ডঃ সত্যরঞ্জন ব্যানার্জি-সম্পাদিত নারায়ণ বিদ্যাবিনোদের টীকাসহ প্রাকৃতপ্রকাশ ১৯৭৫ খ্রীঃ কলিকাতায় প্রকাশিত হওয়ায় প্রমাণিত (?) হইয়াছে যে, বিদ্যাবিনোদ স্বয়ং সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের ছাত্র হইয়াও (সংক্ষিপ্তসারের প্রাকৃতাধ্যায়ের পরিবর্তে) বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশের উপর টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন।[৬] সত্যবাবুর মতে এই টীকা বসন্তরাজের প্রাকৃত-সঞ্জীবনীর ভিত্তিতে রচিত। বিদ্যাবিনোদ স্বীয় টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :

> পূর্বগ্রামিকুলে কলানিধিনিভশ্ছত্রী সুমেরুঃ স্থিতো ভ্রাতা তস্য জটাধরো দ্বিজবরোবাণেশ্বরস্তৎসুতঃ। তৎপুত্রঃ প্রথিতোঽভবৎ কবিবরো নারায়ণো নামতস্তেনেদং ক্রিয়তে সুখায় বিদুষাং যৎ (সৎ ?) প্রাকৃতং লক্ষণম্।। কৃতিনা যৎ কৃতং পূর্বং তন্নিরস্তং দুরাত্মনা। ইদানীং তৎ সমুদ্ধৃত্য সংক্ষেপেণোচ্যতে ময়া।।

নারায়ণ বিদ্যাবিনোদ অমরকোষের 'শব্দার্থসন্দীপিকা' নামে যে টীকা রচনা করেন, তাহার প্রারম্ভেও উপরের 'পূর্বগ্রামি...' ইত্যাদি শ্লোকটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়। সে যাহাই হউক, R. Pischel উদ্ধৃত শ্লোক-দুইটির পরিপ্রেক্ষিতে এমন সিদ্ধান্ত করেন যে, পূর্বে নারায়ণ যে বৃহদ্‌গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কোনও দুরাত্মার হস্তে নষ্ট হওয়ায়, উহারই সারসংগ্রহপূর্বক তিনি সংক্ষিপ্তাকারে এই পুস্তক প্রণয়ন করেন।[৭] সত্যবাবুর মতে পূর্বোক্ত বসন্তরাজের প্রাকৃতসঞ্জীবনীকে উপলক্ষ্য করিয়াই নারায়ণ 'কৃতিনা যৎ কৃতং পূর্বং' বলিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ইহা একরূপ কষ্টকল্পনা মাত্র। [এই প্রাকৃতসঞ্জীবনী ও সুবোধিনী সহ প্রাকৃতপ্রকাশ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বটুকনাথ শর্মা ও বলদেব উপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বারাণসীতে প্রকাশিত হইয়াছে] 'কৃতিনা'= ক্রমদীশ্বরেণ; সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের শেষে ইহার রচয়িতা ক্রমদীশ্বরের পরিচয় জ্ঞাপক যে শ্লোকটি পাওয়া যায়, তাহার শেষে তাঁহাকে 'কৃতী'ও বলা হইয়াছে :

বিদ্যাতপোঽর্থিবাদীন্দ্রঃ পূর্বগ্রামিদ্বিজঃ কবিঃ।
চক্রপাণিসূতো জ্যায়ান্ নপ্তাসৌ শ্রীপতেঃ কৃতী।।

ব্যাকরণের সূত্রকারকে 'কৃতী' বলিবার প্রথা আছে। কলাপ ব্যাকরণের কৃদ্‌বৃত্তির প্রারম্ভে সর্ববর্মাচার্যকে কৃতী বলা হইয়াছে : 'কৃতিনা (সর্ববর্মণা) ন কৃতাঃ কৃতঃ।' ক্রমদীশ্বর-কর্তৃক 'সর্বভাষাসু লক্ষণং সংক্ষিপ্তসারং...' ব্যাকরণ যে একদা দুর্জনের হাতে পড়িয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সেই কাহিনীই ঐ 'কৃতিনা যৎ কৃতং পূর্বং...' ইত্যাদি শ্লোকে উপলক্ষিত হইয়া থাকিবে। তা'ছাড়া, বিদ্যাবিনোদ তাঁর প্রারম্ভিক শ্লোক দুইটির কোথাও বৃত্তি বা টীকা রচনার কথা বলেন নাই, ব্যক্ত করিয়াছেন প্রাকৃত লক্ষণ (= সূত্র) রচনার সঙ্কল্প ['...তেনেদং ক্রিয়তে সুখায় বিদুষাং যৎ (?) প্রাকৃতং লক্ষণম্।।' 'যৎ' স্থলে 'সৎ' হওয়া উচিত, নতুবা অর্থগত সঙ্গতি রক্ষা হয় না, অধিকন্তু 'সৎ' ও 'নিরস্ত' শব্দ মূলতঃ একই অস্ ধাতুজ।]। গ্রন্থের 'প্রাকৃতপাদটীকা' নামটিও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশ স্বয়ংসম্পূর্ণ একক গ্রন্থ, অন্য কোনও বৃহত্তর বা প্রকীর্ণ গ্রন্থের অংশ, পাদ বা অধ্যায় নয়। পরন্তু, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সর্বশেষ ৮ম পাদ—প্রাকৃতপাদ নামেই অভিহিত। সংক্ষিপ্তসারের নমস্কারশ্লোকের টীকায় গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন :

'...সর্বভাষাপ্রধানত্বাৎ প্রথমং সপ্তভিঃ পাদৈঃ সংস্কৃত ভাষা লক্ষণানি... সমাপ্যাষ্টমেন পাদেন প্রাকৃতাদিভাষালক্ষণানি বিরচিতবান্' (ক্রমদীশ্বরঃ)। নারায়ণ বিদ্যাবিনোদের প্রাকৃতপাদটীকা নামতঃ এবং উদ্দেশতঃ সংক্ষিপ্তসারান্তর্গত সেই প্রাকৃতপাদেরই টীকা, যাহা তিনি নষ্টপ্রায় উক্ত প্রাকৃতপাদেরই সারোদ্ধার করিয়া প্রাকৃতপ্রকাশের সহায়ে এবং উহারই আধারে প্রস্তুত করেন, ফলে তাঁহার গ্রন্থের সূত্রাংশের সহিত প্রাকৃতপ্রকাশের সূত্রপাঠের সাদৃশ্য অধিকতর প্রকট।[৮] তাঁহার 'সংক্ষেপেণোচ্যতে ময়া' উক্তি হইতে প্রতীয়মান হয়, সংক্ষিপ্তসারের প্রাকৃতাংশের রচনা তাঁহার রচনার তুলনায় আরও বিস্তৃত ছিল, অন্ততঃ তিনি সেইরূপই মনে করিতেন। তিনি টীকায় যেসব পূর্বাচার্যের মতোল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন—বররুচি (২।৭, ৩০, ৪।১৬, ৫।৪৭, ৫২, ৫৬, ৬।৫, ২০, ৮।১২), শাকটায়ন (৪।১৮, ২৩, ৫।৪৪, ৫৬), বামন (৪।২৫, ৫।৪৩, ৬।৪, ১৮, ৭।১৭), কাত্যায়ন (৫।১২, ৪৪, ৫৬, ৬১, ৬।২১), জিনেন্দ্র (৫।৫৯) ও মৈত্রেয় (৫।৯৬) এবং যেসব গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে আছে ভাগবৃত্তি (৫।৫৭), ভাষ্য (৫।৬০), কাতন্ত্র (৬।১২)ও কাশিকাবৃত্তি (৫।৬২, ৭৯)। নামোল্লেখ না করিয়াও অবশ্য অনেকের মত উদ্ধার করা হইয়াছে। খ্রীঃ ১৫শ শতক সম্ভবতঃ তাঁহার আবির্ভাব-কাল। মতান্তরে তিনি খ্রীঃ ১৬শ/১৭শ শতাব্দীয়।

ক্রমদীশ্বর-প্রণীত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের প্রথম ৭ পাদে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ এবং শেষ ৮ম পাদে প্রাকৃত ব্যাকরণ সূত্রিত হইয়াছে। এই পাদের বিষয়-বিন্যাস—স্বরকার্য, হল্‌কার্য, সুবন্তকার্য, তিঙন্তকার্য, অপভ্রংশারম্ভ এবং ছন্দঃকার্য ; রচনাকাল খুব সম্ভব খ্রীঃ ১২শ শতক। (এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পূর্ববর্তী 'সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণ' নিবন্ধে দ্রষ্টব্য।) তাঁহার প্রাকৃতপাদ রচনায় বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশের প্রভাব প্রচুর। এই বিষয়ে কাওয়েল সাহেবের অভিমত ঃ

> As this work isof great value in correcting Vararuchi's text, it is with no small pleasure that I have seen among the publications of the Bengal Asiatic Society, which are announced as in progress, an edition of the Prakrt portion, by Babu Rajendralala Mitra. Probably no

other grammar could be of the use, which this promises to be, in correcting and elucidating Vararuchi ; as Kramadisvara has followed his method so much more closely than any other grammarian, whose works have come under my knowledge. –Preface to the Prakrta Prakasa... of Vararuchi, pp. x-xi (Oxford, Dec. 1853).

প্রাকৃতপাদের অপভ্রংশভাগের একাধিক সূত্রে ও বৃত্তিতে কয়েকটি প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ—ব্রাচট (৫।৬৬), 'ব্রাচটাদিরপভ্রংশভেদঃ' (ঐ বৃত্তি); নাগর (৫।৬৭), 'স প্রাকৃতমিশ্র উপনাগরে গাথাদৌ মহারাষ্ট্র্যাং চ' (ঐ বৃত্তি); মাগধী (৫।৮৩) ; পৈশাচিক (৫।৯৩) ; 'মহারাষ্ট্রীমিশ্রার্ধমাগধী' (৫।৯৫) ; 'শবরে সোরেত্বম্' (৫।৯৬)—'এশে মেশে ইত্যাদি কথঞ্চিদ্ ভেদা মহারাষ্ট্র্যাদেঃ। শকাভীরদ্রাবিড়োড্রাবন্ত্যাবন্তি-শ্রাবন্তিপ্রাচ্যশৌরসেনীবাহ্লিকীদাক্ষিণাত্যাদিভাষাভেদাশ্চ নাটকাদৌ পাত্রভেদে চ।'—ঐ বৃত্তি ; ইহার টীকায় লিখিত হইয়াছে ঃ '...শবরী মহারাষ্ট্রীয়নী চ জাতিভেদঃ।' এই পরিচ্ছেদে ৫০টি দেশোক্তি (যেমন–'হোই বঠঠই পর্যাপ্তৌ,' 'পহিল প্রথমে,' 'কড়মড় উদ্বেগে' প্রভৃতি), ৪র্থ পরিচ্ছেদে ১৯টি নিপাতসূত্র (যেমন 'ও পশ্চাত্তাপ-সূচনারোপণ-বিতর্কেষু', 'কীস-কীণৌ প্রশ্নে', 'থু কুৎসায়াম্' প্রভৃতি) এবং ৪।৪৪ সূত্রের বৃত্তিভাগে 'ঘূর্ণ ঘোণ', 'ত্বরা তুবর' ইত্যাদি ৪৭টি প্রাকৃত ধাত্বাদেশ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্ত বৃত্তি ভিন্ন ইহার উপরে জুমরনন্দীর 'রসবতী' এবং চণ্ডীদেব শর্মার 'প্রাকৃতদীপিকা' টীকা।[৯] গোয়ীচন্দ্রও সমগ্র সংক্ষিপ্তসারের টীকা রচনা করেন বলিয়া প্রতীয়মান। এইসব ব্যাখ্যা সর্বাংশে সুলভ নয়। কলিকাতায় মুদ্রিত সংক্ষিপ্তসারের প্রাকৃতপাদে যে সংক্ষিপ্ত বৃত্তি বা ব্যাখ্যা যোজিত হইয়াছে তাহার কর্তৃত্ব সন্দেহাতীত নয়।

সংক্ষিপ্তসারের ন্যায় হৈম ব্যাকরণের ৮ম অধ্যায়ও প্রাকৃত ব্যাকরণ। শ্বেতাম্বর জৈনাচার্য হেমচন্দ্র সূরি (খ্রীঃ ১০৮৮-১১৭২) ইহার রচয়িতা। গ্রন্থের পূর্ণ নাম 'সিদ্ধহেমচন্দ্রাভিধস্বোপজ্ঞ শব্দানুশাসন' বা 'সিদ্ধহেমশব্দানুশাসন'—যাহাকে অতি সংক্ষেপে হৈম ব্যাকরণ বলা হয়। এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণের জন্য পূর্ববর্তী নিবন্ধ 'হেমচন্দ্র সূরি

ও হৈম ব্যাকরণ' দ্রষ্টব্য। গ্রন্থের প্রথম ৭ অধ্যায়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং ৮ম অধ্যায়ে মুখ্যতঃ ৭টি প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সাত ভাষা ক্রমান্বয়ে : (১) প্রাকৃত (মাহারাষ্ট্রী), (২) শৌরসেনী, (৩) মাগধী, (৪) পৈশাচী, (৫) চূলিকা পৈশাচী, (৬) অপভ্রংশ এবং (৭) আর্ষ (অর্ধমাগধী)। ১ম ও ২য়টির সঙ্গে যথাক্রমে জৈন মাহারাষ্ট্রী এবং জৈন শৌরসেনীও স্থান পাইয়াছে। মাহারাষ্ট্রীর নামোল্লেখ না করিয়াও হেমচন্দ্র 'প্রাকৃত' নামের আড়ালে প্রকৃতপক্ষে ১ম হইতে ৪র্থ পাদের ২৫৯ সূত্র পর্যন্ত ঐ ভাষারই বর্ণনা দিয়াছেন। মোট চারি পাদে সূত্রসংখ্যা যথাক্রমে ২৭১, ২১৭, ১৮০ এবং ৪৪৫; প্রথমে প্রাকৃত ভাষা (principal Prakrt) এবং চতুর্থ পাদের শেষার্ধে অন্য ভাষাগুলির ব্যাকরণ সূত্রিত হইয়াছে। প্রথম সূত্র 'বহুলম্' এবং পরবর্তী সূত্র 'আর্ষম্'। হেমচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার সমগ্র ব্যাকরণের বৃহৎ ও লঘু-ভেদে যে দুই বৃত্তি রচনা করেন, তাহাতে বলা বাহুল্য প্রাকৃতাংশের বৃত্তিও আছে। লঘুবৃত্তির নাম 'প্রকাশিকা'। ইহার উপর উদয়সৌভাগ্য গণি 'ব্যুৎপত্তিদীপিকা' টীকা প্রণয়ন করেন। ইহাকে 'হৈম প্রাকৃত ঢুণ্টিকা'ও বলা হয়। হৈমপ্রাকৃতাংশের আর এক টীকা 'প্রাকৃত প্রবোধ' বা 'প্রাকৃতদীপিকা' রচনা করেন নরেন্দ্রচন্দ্র বা নরচন্দ্র সূরি খ্রীঃ ১৬শ শতকে। প্রথমে R. Pischel দুইখণ্ডে (Halle, 1877, 1880) এবং পরে P. L. Vaidya হৈম 'প্রকাশিকা' সহ এই প্রাকৃত ব্যাকরণ সম্পাদনাপূর্বক ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে পুণাতে প্রকাশ করেন।

(৫)

ত্রিবিক্রমদেব-প্রণীত 'প্রাকৃতশব্দানুশাসন' তিন অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রতি অধ্যায়ে ৪ পাদ। মোট সূত্রসংখ্যা ১০৩৬, মতান্তরে ১০৮৫। আর্ষ বাদে হৈম ব্যাকরণের মাহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রধান ৬টি ভাষাই ইহারও আলোচ্য বিষয়। ত্রিবিক্রমের 'সপ্রত্যয়প্রকৃতিসিদ্ধমদীর্ঘসূত্রসৎকারকং ...শব্দানুশাসনমিদম্' ইত্যাদি উক্তিতে অল্প সূত্র সমন্বিত ব্যাকরণ রচনার অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি স্বীয় বংশপরিচয় ও ব্যাকরণ বিষয়ক সংবাদ এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

শ্রুতভর্তুরর্হনন্দিত্রৈবিদ্যমুনেঃ পদাম্বুজভ্রমরঃ।
শ্রীবাণসুকুলকমলদ্যুমণেরাদিত্যবর্মণঃ পৌত্রঃ।।

শ্রীমল্লিনাথপুত্রোলক্ষ্মীগর্ভামৃতাম্বুধিসুধাংশুঃ।
ভামস্য বৃত্তবিদ্যাধাম্নো ভ্রাতা ত্রিবিক্রমঃ সুকবিঃ।।
শ্রীবীরসেন জিনসেনাচার্যাদিবচঃ পয়োধিপূরাৎ কতিচিৎ।
প্রাকৃতপদরত্নানি প্রকৃতি কৃতি সুকৃতি ভূষণায় চিনোতি।।
অনল্পার্থঃ সুখোচ্চারঃ শব্দঃ সাহিত্যজীবিতম্।
স চ প্রাকৃতমেবেতি মতং সূত্রানুবর্তিনাম্।।
প্রাকৃতং তৎসমং দেশ্যং তদ্ভবং চ্যেত্যতস্ত্রিধা।
তৎসমং সংস্কৃতসমং নেয়ং সংস্কৃতলক্ষণা।।
দেশ্যমার্ষং চ রূঢ়ত্বাৎ স্বতন্ত্রত্বাচ্চ ভূয়সা।
লক্ষ্ম নাপেক্ষতে তস্য সম্প্রদায়ো হি বোধকঃ।।
প্রকৃতেঃ সংস্কৃতাৎ সাধ্যমানাৎ সিদ্ধাচ্চ যদ্ভবেৎ।
প্রাকৃতস্যাস্য লক্ষ্যানুরোধি লক্ষ্ম প্রচক্ষ্মহে।।
প্রাকৃতপদার্থসার্থপ্রাপ্ত্যৈ নিজসূত্রমার্গমনুজিগমিষতাম্।
বৃত্তির্যথার্থসিদ্ধ্যৈ ত্রিবিক্রমেণাগমক্রমাৎ ক্রিয়তে।।
তদ্ভব তৎসম দেশ্য প্রাকৃতরূপাণি পশ্যতাং বিদুষাম্।
দর্পণতি যেয়মবনৌ বৃত্তিস্ত্রৈবিক্রমী জয়তি।।
প্রাকৃতরূপাণি যথা প্রাচ্যৈরাহেমচন্দ্রাচার্যাৎ।
বিবৃতানি তথা তানি প্রতিবিম্বন্তীহ সর্বাণি।। ২-১১।।

ত্রিবিক্রম ছিলেন বাণবংশসম্ভূত ; পিতামহ আদিত্যবর্মা, পিতা মল্লিনাথ এবং মাতা লক্ষ্মী। জৈন সন্ন্যাসী অর্হনন্দী ছিলেন তাঁহার শিক্ষাগুরু। তিনি নিজেকে সুকবিও বলিয়াছেন যদিও তাঁহার কোনো কাব্যগ্রন্থ এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। ধর্মবিশ্বাসে তিনি জৈন দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া প্রতিভাত। দক্ষিণভারত, বিশেষতঃ অন্ধ্রদেশ তাঁহার জন্মভূমি ছিল বলিয়া মনে হয়। খুব সম্ভব খ্রীঃ ১৩শ শতক তাঁহার অভ্যুদয়কাল। উল্লিখিত 'প্রাকৃতপদার্থ...' ইত্যাদি শ্লোকে কিন্তু তৎকর্তৃক নিজসূত্রের বৃত্তিরচনার কথা বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা 'বাল্মীকিকৃত সূত্রের ত্রিবিক্রমপ্রণীত বৃত্তি' ইত্যাকার ভ্রান্তির নিরসন হওয়া উচিত, যদিও 'আগমক্রমাৎ' কথায় তৎপূর্ববর্তী প্রাকৃতশাস্ত্রের আনুগত্য স্বীকৃত হইয়াছে। সর্বশেষ শ্লোকে তিনি আচার্য হেমচন্দ্র পর্যন্ত সমস্ত পূর্বসূরির নিকটই এতৎসম্পর্কিত সাহায্য গ্রহণের কথা স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন।

গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে ত্রিবিক্রম হেমচন্দ্রের নিকটই সর্বাধিক ঋণী। প্রায় ১০০ সূত্র আক্ষরিক ভাবে হৈম সূত্রাবলীর অনুরূপ। আলোচিত বিষয়ের দিক হইতেও উভয়ের গ্রন্থ প্রায় এক। অপভ্রংশভাগের সমস্ত উদাহরণই হৈম ব্যাকরণ হইতে গৃহীত। দুই বা ততোধিক হৈম সূত্রকে এক সূত্রে পরিণত করিয়া ত্রিবিক্রম তাঁহার সূত্রসংখ্যা কিছু কমাইতে সমর্থ হইলেও ঐকাক্ষরিক সংজ্ঞা (যেমন 'হ্রস্ব' স্থলে 'হ', 'দীর্ঘ' স্থলে 'দি', 'সমাসে'র স্থলে 'স', 'গণ' স্থলে 'গ' প্রভৃতি) ব্যবহারের দ্বারা এবং কয়েক স্থলে হৈম শব্দবিন্যাসের বা আদেশের হেরফের ঘটাইয়া স্বীয় সূত্রাবলীকে অধিকতর দুর্বোধ করিয়া তুলিয়াছেন। ফলে তাঁহার ব্যাকরণ হৈম ব্যাকরণাপেক্ষা অধিকতর কার্যোপযোগী হইতে পারে নাই। হৈম দেশী নামমালা-বহির্ভূত কয়েকটি শব্দের সন্ধান মাত্র ত্রিবিক্রমের দেশী শব্দের তালিকায় (১।৪।১২১) পাওয়া গিয়াছে। ইদানীং ত্রিবিক্রমের সূত্রগুলিকে কারিকাবদ্ধ দেখানোর যে প্রয়াস লক্ষিত হয়, তাহা একেবারেই কৃত্রিম। স্বোপজ্ঞবৃত্তিযুক্ত এই ব্যাকরণের এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ, ডঃ পরশুরাম বৈদ্যের (Dr. P.L.Vaidya) সম্পাদনায় জীবরাজ জৈনগ্রন্থমালার ৪র্থ গ্রন্থরূপে, জৈন সংস্কৃতি-সংরক্ষক সঙ্ঘ, শোলাপুর (মহারাষ্ট্র) হইতে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার আগে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ত্রিবিক্রমের সূত্রপাঠ চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ (বারাণসী) হইতে প্রকাশিত হয় ; তাহারও আগে T. K. Laddu প্রকাশ করেন Prolegomena zu Trivikrama Prakrit Grammatik, Halle, 1912.

ত্রিবিক্রমের মাত্র ৫৭৫টি সূত্রকে, সংজ্ঞা, পরিভাষা, সংহিতা (সন্ধি), সুবন্ত, তিঙন্ত ও শৌরসেন্যাদি ছয় বিভাগে সজ্জিত করিয়া, সমুদ্রবন্ধ যজ্বার পুত্র সিংহরাজ 'প্রাকৃতরূপাবতার' প্রণয়ন করেন। খ্রীঃ ১৪শ শতক ইহার রচনাকাল বলিয়া অনুমিত। ইহার E. Hultzsch-সম্পাদিত সংস্করণ, লণ্ডন হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

লক্ষ্মীধরের 'ষড্‌ভাষাচন্দ্রিকা'তে ত্রিবিক্রমের ৯৯৪টি সূত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেও মৌলিক সূত্রবিন্যাস রক্ষিত হয় নাই ; সংজ্ঞা-সন্ধি-শব্দ-ধাতু ইত্যাদিক্রমেই বিষয়বিন্যাস। বৃত্তিতে ত্রিবিক্রমের ব্যাখ্যাই অবলম্বিত হইয়াছে। গণের পূর্ণ তালিকা এবং দেশ্য শব্দ সহ নিপাতগুলিও প্রদর্শিত হওয়ায় এবং ত্রিবিক্রম, হেমচন্দ্র, ভামহ

প্রভৃতির কৃতিত্বের সুষ্ঠু পর্যালোচনার পর রচিত হওয়ায়, এই গ্রন্থ কার্যতঃ পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। গ্রন্থারম্ভে বলা হইয়াছে ঃ

বাগ্‌দেবী জননী যেষাং বাল্মীকির্মূলসূত্রকৃৎ।
ভাষাপ্রয়োগজ্ঞেয়াস্তে ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকাধ্বনা।।
বৃত্তিং ত্রৈবিক্রমীং গূঢ়াং ব্যাচিখ্যাসন্তি যে বুধাঃ।
ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকা তৈস্তদ্‌ব্যাখ্যারূপা বিলোক্যতাম্‌।।
ত্রৈবিক্রমং হৈমচন্দ্রং গুরোর্জ্ঞাত্বা চ ভামহম্‌।
কবিসৌখ্যায় তৎসর্বমত্র সংক্ষিপ্যতে ময়া।।

ষড়্‌ভাষা ঃ মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, চূলিকাপৈশাচী ও অপভ্রংশ। 'বৃত্তিং ত্রৈবিক্রমীং...' ইত্যাদি শ্লোকে ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকাকে ত্রিবিক্রমকৃত বৃত্তির ব্যাখ্যারূপা বলা হইয়াছে। কে. পি. ত্রিবেদীর সম্পাদিত ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকা বোম্বে হইতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

অন্ধ্রদেশে কৃষ্ণানদীর তীরবর্তী অঞ্চলে চরকূরিবংশে কাশ্যপগোত্রে লক্ষ্মীধরের জন্ম। পিতা যজ্ঞেশ্বর, পিতামহ তিম্ময়, মাতা সর্বাম্বিকা। বেঙ্কটপ্রভু ইঁহাদের গৃহদেবতা। চারি ভ্রাতার মধ্যে লক্ষ্মীধর দ্বিতীয়। তাঁহার নামান্তর লক্ষ্মণ সূরি। অগ্রজ কৌণ্ডভট্ট ছিলেন তাঁহার শিক্ষাগুরু। লক্ষ্মীধর গীতগোবিন্দের টীকা 'শ্রুতিরঞ্জনী', 'স্বরমঞ্জরী' প্রভৃতি আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং পরিণত বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রামানন্দাশ্রম নামে অভিহিত হন। কৃষ্ণাশ্রম ছিলেন তাঁহার সন্ন্যাস-গুরু। সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি 'অনর্ঘরাঘবে'র ব্যাখ্যা 'ইষ্টার্থকল্পবল্লরী' এবং 'প্রসন্নরাঘব' গ্রন্থেরও ব্যাখ্যা রচনা করেন। তাঁহার সময় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া না গেলেও, খ্রীঃ ১৫শ/১৬শ শতাব্দীয় মল্লিনাথের পুত্র কুমারস্বামি-কর্তৃক 'রত্নাপণ'-এ তিনি উল্লিখিত হওয়ায় তাঁহাকে খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীয় বা তৎপূর্ববর্তী বলিয়া অনুমান করা চলে। ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকার উপোদ্‌ঘাতে প্রাকৃত ব্যাকরণের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে ঃ

সিদ্ধিঃ সংস্কৃত শব্দানাং ভবেৎ পঞ্চাশদক্ষরৈঃ।
প্রাকৃতানাং তু সিদ্ধিঃ স্যাৎ তৈশ্চত্বারিংশদক্ষরৈঃ।।
ঋ ঌ বর্ণৌ বিনৈকারৌকারাভ্যাং চ দশ স্বরাঃ।
শষাবসংযুক্তঙঞৌ বিনৈবান্যে হলো মতাঃ।।

প্রাকৃতে ন দ্বিবচনং সুপ্‌তিঙাং চোপপদ্যতে।
যস্মাদ্ দ্বিবচনস্থানে বহুত্বং সূত্র চোদিতম্।।
হলন্ততা নাস্ত্যহলাং সূত্রৈর্লোপানুশাসনাৎ।
লিঙ্গানাং বৈপরীত্যং চ সংস্কৃতাৎ প্রাকৃতে ভবেৎ।।
দ্বিতীয়া-দিবিভক্তীনাং স্থানে ষষ্ঠী ক্বচিদ্‌ভবেৎ।
চতুর্থ্যা অপি ষষ্ঠী স্যান্নিত্যমেকবহুত্বয়োঃ।।
তাদর্থ্যে তু চতুর্থ্যাঃ স্যাদেকত্বে সা বিকল্পিতা।
বধাৎপরস্য ঙেঃ স্থানে ষষ্ঠী ডায়ি চ যা ভবেৎ।
দ্বিতীয়া সপ্তমী স্থানে কুত্রচিৎ সূত্র চোদিতা।
নিয়মো নাত্মনেভাষা পরস্মৈপদিনোরিহ।।
শবাদিপ্রত্যয়ানাং তু প্রয়োগো নাত্র সম্মতঃ।
এতৎ সর্বং বহূন্ গ্রন্থান্ সূত্রাণ্যালোচ্য নিশ্চিতম্।।
ত্রিবিধা প্রাকৃতী ভাষা ভবেদ্দেশ্যা চ তৎসমা।
তদ্‌ভবা চ ভবেদ্ দেশ্যা তন্ত্রলক্ষণমন্তরা।।
তৎসমা সংস্কৃতসমা নেয়া সংস্কৃত বর্ত্মনা।
তদ্‌ভবা সংস্কৃতভবা সিদ্ধা সাধ্যেতি সা দ্বিধা।।
দ্বিবিধায়াশ্চ সিদ্ধ্যর্থং প্রাকৃতং লক্ষণং মতম্ ।।

অপ্পয় দীক্ষিত ত্রিবিক্রমের ঐ গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেন। অপ্পয়ের ‘প্রাকৃতমণিদীপ’ এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ। এই অপ্পয় (বা অপ্পয্য) দীক্ষিত ছিলেন ১ম অপ্পয় দীক্ষিতের (১৫২০-৯৩, মতান্তরে ১৫৫০-১৬২২ খ্রীঃ) পৌত্র, নারায়ণ দীক্ষিতের পুত্র এবং পিতৃব্য ২য় অপ্পয় দীক্ষিতের দত্তকপুত্র। প্রাকৃতমণিদীপের পুষ্পিকা হইতে জানা যায়, (মাদুরার) রাজা চোক্কনাথ নায়কের (১৬৫৯-৮২ খ্রীঃ) সচিব চিন্নবোম্মের অনুরোধে (‘...চোক্কনাথভূপপ্রিয় সচিব...চিন্নবোম্ম...প্রেরিতেন...’) প্রাকৃতমণিদীপ রচিত হয়। আবার এই চিন বা চিন্ন বোম্মের নামেও ‘প্রাকৃতমণিদীপিকা’ নামে এক সংক্ষিপ্ত প্রাকৃত ব্যাকরণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ত্রিবিক্রম, হেমচন্দ্র, ভোজ, বররুচি, পুষ্পবননাথ, অপ্পযজ্বন্ এবং লক্ষ্মীধরের উল্লেখ আছে ঃ

যে ত্রিবিক্রমদেবেন হেমচন্দ্রেণ চেরিতাঃ।
লক্ষ্মীধরেণ যে গ্রন্থা ভোজেন চ মহীক্ষিতা।।

যে পুষ্পবননাথেন যে বা বাররুচা অপি।
বার্ত্তিকার্ণবভাষ্যাদ্যা অপ্পযজ্বকৃতাশ্চ যে।।
তে বিস্তৃতত্বাৎ প্রায়েণ সংক্ষেপরুচিভির্জনৈঃ।
অগৃহীতা বিলম্বন্তে সন্ধ্যার্ককিরণা ইব।।
অতঃ প্রাকৃতশব্দানামন্ধে তমসি মজ্জতাম্।
প্রকাশনায় ক্রিয়তে সংক্ষিপ্তা মণিদীপিকা।।

ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয়, মণিদীপিকা পূর্বোক্ত মণিদীপেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। টি.টি. শ্রীনিবাস গোপালাচার্য স্বরচিত 'প্রাকৃতমণিদীপদীধিতি' টীকাসহ প্রাকৃতমণিদীপ সম্পাদনাপূর্বক (ORI-Publications, Sans. Series No. 92) মহীশূর হইতে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছেন।

(৬)

মার্কণ্ডেয়-প্রণীত 'প্রাকৃতসর্বস্ব' আর্যাচ্ছন্দে রচিত। মার্কণ্ডেয় স্বয়ং ইহার বৃত্তিকার। সমগ্র ব্যাকরণ ২০ পাদে বিভক্ত। প্রথম ৮পাদে মাহারাষ্ট্রী, ৯ম পাদে (৯ প্রকরণে বিভক্ত) শৌরসেনী, ১০ম পাদে প্রাচ্যা, ১১শ পাদে আবন্তী ও বাহ্লীকী এবং ১২শ পাদে মাগধী ও অর্ধমাগধী 'ভাষাবিবেচন'। পরে ১৩শ-১৬শ পাদে বিভাষা, ১৭শ ও ১৮শ পাদে অপভ্রংশ এবং ১৯শ ও ২০শ পাদে পৈশাচী লক্ষিত হইয়াছে। এই ব্যাকরণে ভাষা, বিভাষা, অপভ্রংশ ও পৈশাচী—এই চারি প্রধান বিভাগের প্রথমটির অন্তর্গত মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, প্রাচ্যা, অবন্তী ও মাগধী ; বিভাষায় ধরা হইয়াছে—শাকারী, চাণ্ডালী, শাবরী, আভীরিকী ও টাক্কী এই পাঁচ ভাষাকে ; অপভ্রংশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে নাগর, ব্রাচড় এবং ঔপনাগর-কে ; পৈশাচীকে দেখানো হইয়াছে কেকয়পৈশাচিকী, শৌরসেনী পৈশাচিকী এবং পাঞ্চালপৈশাচিকী—এই তিন ভাগে ; অর্ধমাগধীকে মাগধীর এবং বাহ্লীকীকে অবন্তির অন্তর্গত করিয়াছেন। ২৭টি অপভ্রংশ এবং ১১টি পৈশাচী—পূর্বোক্ত শেষ তিন প্রধান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

মার্কণ্ডেয়ই সম্ভবতঃ প্রাকৃতব্যাকরণে সর্বাধিক ভাষার অবতারণা করিয়াছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও (১৭।৬-২৩) অবশ্য প্রধান প্রাকৃত ভাষাগুলির অতিরিক্ত আরও কয়েকটি ভাষার উল্লেখ দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় এই বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে ভরতের অনুসরণ করিয়া

থাকিবেন। প্রাকৃতসর্বস্বে উল্লিখিত পূর্বাচার্যদের মধ্যে আছেন--বররুচি, শাকল্য, ভরত, কপিল, পিঙ্গল, বাক্‌পতিরাজ, কোহল, ভামহ, ভোজদেব, দণ্ডী, হরিশ্চন্দ্র, অনিরুদ্ধ ভট্ট, রাজশেখর এবং বসন্তরাজ। খ্রীঃ ১২শ শতকে পুরুষোত্তম স্বীয় প্রাকৃতানুশাসনে (১৬।১০) হরিশ্চন্দ্রের মতোল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'হরিশ্চন্দ্রস্ত্বিমাংটক্কভাষামপভ্রংশমিচ্ছতি ন প্রাকৃতম্।' বসন্তরাজের পূর্বোক্ত 'প্রাকৃতসঞ্জীবনী' টীকা, তথ্য-বহুল রচনার জন্য একদা স্বতন্ত্র ব্যাকরণের মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। কর্পূরমঞ্জরীর টীকায় বাসুদেব প্রাকৃতসঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন ঃ 'তদুক্তংপ্রাকৃতসঞ্জীবন্যাং প্রাকৃতস্য তু সর্বমেব সংস্কৃতং যোনিঃ।' মার্কণ্ডেয় উড়িষ্যার অধিবাসী। সেখানে খ্রীঃ ১৭শ শতকে রাজা মুকুন্দদেবের শাসনকালে ('...মুকুন্দদেব নৃপতৌ... শাসত্যুৎকলমেদিনীং...') প্রাকৃতসর্বস্ব প্রণীত হয়। এস্. পি. ভি. ভট্টনাথস্বামীর সম্পাদনায় ১৯১২ খ্রীঃ ভিজাগাপটনম্ হইতে, এবং কে. সি. আচার্য-কর্তৃক ১৯৬৮ খ্রীঃ এই গ্রন্থ মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়ের অপর গ্রন্থ 'বিলাসবতী সট্টক', যাহা হইতে তিনি প্রাকৃতসর্বস্বের বৃত্তিতে (৫।১৩১) উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের বিখ্যাত টীকাকার রামচন্দ্র তর্কবাগীশ 'প্রাকৃতকল্পতরু' নামে প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। ইহা লঙ্কেশ্বর-রচিত 'প্রাকৃতকামধেনু' নামক ব্যাকরণের অবলম্বনে রচিত। প্রাকৃতকামধেনুকে 'প্রাকৃতলঙ্কেশ্বর'ও বলা হয়। প্রাকৃতকল্পতরু ছন্দোবদ্ধ। ইহার প্রধান তিনটি বিভাগের নাম এক একটি শাখা। প্রতি শাখা কয়েকটি স্তবকে এবং প্রতি স্তবক কয়েকটি কুসুমে বিভক্ত বা বিন্যস্ত। কল্পতরু—শাখা—স্তবক—কুসুম ইত্যাদিক্রমে নামকরণ কবি-কল্পনা সূচক। তর্কবাগীশ মহোদয় কলিকাতা নগরীর উত্তর দিগ্‌বর্তী আড়িয়াদহের ঘোষালদের পূর্বপুরুষ। খ্রীঃ ১৬শ শতকের শেষ ভাগে অথবা ১৭শ শতকের প্রারম্ভে বিদ্যমান থাকিয়া গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভাষা বিভাগে মার্কণ্ডেয় তাঁহার অনুসরণকারী। তিন শাখার ১ম শাখায় মাহারাষ্ট্রী, ২য় শাখায় শৌরসেনী, প্রাচ্যা, আবন্তী, বাহ্লীকী, মাগধী, অর্ধমাগধী; দাক্ষিণাত্যা এবং বিভাষায়—শাকারিকী, চাণ্ডালিকা, শাবরী, আভীরিকা এবং টাক্কী প্রভৃতির বিবেচনা আছে। টাক্কী শৌরসেনীর বিকৃতি এবং তৎপূর্ব্ববর্তী চারিটি আবার মাগধীর বিকৃতি।

৩য় শাখায় অপভ্রংশ এবং পৈশাচিক আলোচিত। অপভ্রংশের মধ্যে আছে টাক্কী, সৈন্ধব, পাঞ্চালী, মাল্বা, বৈদর্ভী, লাটী, ঔড্রী, কৈকেয়ী, গৌরী, কৌন্তলা, পাণ্ড্যা, সৈংহল, কালিঙ্গ, প্রাচ্যা, আভিরিকা, কার্ণাটি, মধ্যদেশীয়, গৌর্জর, দ্রাবিড়, পাশ্চাত্ত্যা, বৈতালিক এবং কাঞ্চী। পৈশাচিকে শুদ্ধ (কৈকেয়, শৌরসেন প্রভৃতি) এবং সঙ্কীর্ণ (শুদ্ধ ও অশুদ্ধ) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে L. Nitti Dolci-র সম্পাদনায় প্রাকৃতকল্পতরুর ১ম শাখা (প্রথম ৯স্তবক, ৮ম স্তবক বাদে) প্রকাশিত হয় (Edition de la Premier Sakha du Prakrtakalpataru des Ramasarman, Paris, 1939)। পরে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা হইতে এম্. এম্. ঘোষের সম্পাদনায় প্রাকৃতকল্পতরুর যে সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহার পরিশিষ্টভাগে পুরুষোত্তমের প্রাকৃতানুশাসন, লঙ্কেশ্বরের প্রাকৃতকামধেনু এবং বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ হইতে 'প্রাকৃতলক্ষণ' মুদ্রিত হইয়াছে।

'শব্দচিন্তামণি' নামক প্রাকৃত ব্যাকরণের রচয়িতা শুভচন্দ্র ছিলেন দিগম্বর জৈনাচার্য এবং খ্রীঃ ১৫শ/১৬শ শতাব্দীয়। তাঁহার গুরু বিজয়কীর্তি এবং মহাগুরু জ্ঞানভূষণ। ইঁহারা মূলসঙ্ঘ বা নন্দিসঙ্ঘের আচার্য। শুভচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার ব্যাকরণের বৃত্তিকার। ইহাতে অধ্যায়-সংখ্যা ৩, প্রতি অধ্যায়ে ৪ পাদ এবং সূত্রসংখ্যা মোট ১২২৪। মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, চূলিকাপৈশাচী, অপভ্রংশ এবং ধাত্বাদেশ প্রধান আচরণীয় বিষয়। হেমচন্দ্রের এবং ত্রিবিক্রমের ব্যাকরণ অবলম্বনে রচিত হইলেও এই ব্যাকরণে সূত্ররচনায় নূতন সংজ্ঞা সমূহের ব্যবহার-দ্বারা কিছু নূতনত্বের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ফলে সূত্রগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ছাত্রদের পক্ষে মুখস্থ করা সহজতর হইয়াছে। তা'ছাড়া ঐ দুই ব্যাকরণের বৃত্তিঘটিত অনেক উপাদানই শুভচন্দ্রের সূত্রাংশে স্থান পাইয়াছে। ১৫১৬-৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে এই ব্যাকরণ রচিত হয়। 'অপশব্দখণ্ডন' নামে তিনি অন্য গ্রন্থও রচনা করেন।

শ্রুতসাগরের প্রাকৃত ব্যাকরণ ঔদার্যচিন্তামণি রচিত হয় খ্রীঃ১৫শ শতকের শেষে অথবা ১৬শ শতকের প্রথমে। ইহার অধ্যায়-সংখ্যা ৬ এবং সূত্রপাঠ হৈমসূত্রপাঠের খুব নিকটবর্তী। ইহাতে ত্রিবিক্রম বা

শুভচন্দ্রের মতো বিশেষ সংজ্ঞার ব্যবহার করা হয় নাই। (দ্রঃ S. P. V. Ranganathaswami, Literary Wealth of India, Search for Prakrit Manuscripts, Srutasagara—Audaryacintamani, Vizagapatnam, 1910)

আরও কতকগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণের নাম পাওয়া যায়, যেমন ঃ প্রাকৃতকৌমুদী, সমন্তভদ্রের প্রাকৃতব্যাকরণ, কৃষ্ণপণ্ডিত বা শেষকৃষ্ণ-রচিত প্রাকৃতচন্দ্রিকা, বামনাচার্যের প্রাকৃতচন্দ্রিকা, রঘুনাথ শর্মার প্রাকৃতানন্দ, নরসিংহ-প্রণীত প্রাকৃত শব্দ প্রদীপিকা, চন্দ্র-রচিত প্রাকৃত ভাষান্তরবিধান, প্রাকৃতষড়াধ্যায়ী, প্রাকৃতসংস্কার, প্রাকৃতরহস্য বা ষড়্ভাষাবার্ত্তিক, প্রাকৃতভাষাপ্রক্রিয়া, প্রাকৃতনামলিঙ্গানুশাসন (প্রাকৃত-শব্দকোষ), প্রাকৃতশব্দরূপাবলী—রামচন্দ্রদীননাথ শাস্ত্রি-রচিত এবং ১৯০৫ খ্রীঃ আমেদাবাদে প্রকাশিত, প্রাকৃতশব্দরূপাবলী—প্রতাপবিজয়-প্রণীত ও ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদ হইতে প্রকাশিত, সিংহদেব গণির প্রাকৃতলক্ষণ [বাগ্‌ভটালঙ্কারের (২।২-৩) টীকায় উল্লিখিত], দুর্গণাচার্যের ষড়্ভাষারূপমালিকা, নাগোবাকৃত ষড়্ভাষাসুবন্তরূপাদর্শ (তাঞ্জোরের তুলজীর জন্য রচিত), ভামকবির ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা, ষড়্ভাষামঞ্জরী, ষড়্ভাষাবিবরণ, দেশীপ্রসিদ্ধ, দেশীপ্রকাশ (মৃচ্ছকটিকের টীকায় পৃথ্বীধর-কর্তৃক উদ্ধৃত), প্রাকৃতসারোদ্ধারবৃত্তি, পুষ্পবননাথের প্রাকৃতব্যাকরণ, ষড়্ভাষাবিচার, ষড়্ভাষা শব্দমঞ্জরী, প্রাকৃতকল্পলতিকা, কাত্যায়নের বার্ত্তিকার্ণবভাষ্য (?), ভাষাভেদ (চন্দ্রশেখর-কর্তৃক শকুন্তলার টীকায় উদ্ধৃত), চন্দ্রশেখর-রচিত ভাষার্ণব, ষড়্(?) ভাষাবিবেচন, নারায়ণ-প্রণীত ভারতমঞ্জরী (পাঁচ আশ্বাসে নিবন্ধ পদ্য), ভাণ্ডীর ভাষাব্যাকরণ—ইহার টীকা ভাষামঞ্জরীর রচয়িতা বাগীশ্বর।

সমন্তভদ্রের ব্যাকরণকে 'প্রাকৃতশব্দসাধন' (...শাসন?) বলা হইয়াছে ঃ 'বক্ষ্যে সমন্তভদ্রোঽহং প্রাকৃতং শব্দসাধনম্।' ইহা হৈম প্রাকৃত ব্যাকরণের প্রায় অবিকল অনুকৃতি। লক্ষ্মীধর 'ষড়্ভাষা রূপমালিকা'কৃদ্ দুর্গণাচার্যের নাম করিয়াছেন। ষড়্ভাষাবিচারে সংস্কৃত সহ পাঁচটি প্রাকৃত ভাষার বিবেচনা আছে। প্রাকৃতানন্দ—বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশের সূত্রাবলীকে নূতন ভাবে বিন্যস্ত করিয়া রচিত কৌমুদী-জাতীয় গ্রন্থ, জিনবিজয় মুনির সম্পাদনায় ১৯৫৪ (১৯৬২?) খ্রীষ্টাব্দে যোধপুর (রাজস্থান) হইতে প্রকাশিত (শেষ তিন পরিচ্ছেদ বাদ)। নরসিংহের

প্রাকৃতশব্দপ্রদীপিকা—ত্রিবিক্রমের প্রাকৃতসর্বস্বের সূত্রসমবায়ে গঠিত। এই নরসিংহ বা নৃসিংহ ছিলেন প্রাকৃতচন্দ্রিকাকৃৎ কৃষ্ণপণ্ডিতের শিক্ষাগুরু। কৃষ্ণপণ্ডিতের গ্রন্থ পদ্যে রচিত, ব্যাখ্যা গদ্যাত্মক। অপর 'প্রাকৃতচন্দ্রিকা'-প্রণেতা বামনাচার্য নিজেকে 'করঞ্জকবিসার্বভৌম' বলিয়াছেন। তিনি প্রাকৃতপৈঙ্গলের এক টীকাও রচনা করেন। চন্দ্রশেখরের ভাষার্ণব প্রাকৃত ব্যাকরণ বলিয়া অনুমিত। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের টীকায় চন্দ্রশেখর 'প্রাকৃত সাহিত্যরত্নাকর' এবং 'ভাষাভেদ' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভাষাভেদও সম্ভবতঃ প্রাকৃতব্যাকরণ। মৃচ্ছকটিকের (১৪।৫) টীকায় পৃথ্বীধর যে 'দেশীপ্রকাশ' হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহাও কোন প্রাকৃত ব্যাকরণ বলিয়া অনুমিত। হৈম ও সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের অনুকরণে হরিনামামৃতব্যাকরণের শেষেও 'প্রাকৃতপাদ'-যোজনার অক্ষম প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ইহার অকিঞ্চিৎকর উপাদানের প্রতি ডঃ সত্যরঞ্জন ব্যানার্জি সর্বপ্রথম আলোকপাত করেন তাঁহার 'A Skeleton Grammar of Prakrit attributed to Jiva Gosvami' প্রবন্ধে (Bulletin of the Calcutta Philological Society, Vol. IV, 1963, pp. 10-31)।

(৭)

এই সব প্রাকৃত ব্যাকরণই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। টীকা-টিপ্পনী, বৃত্তিব্যাখ্যাদিও তাহাই। তা'ছাড়া ইহাদের রচনা-পদ্ধতিতে এবং বিষয়-বিন্যাসাদির ক্ষেত্রেও সংস্কৃত ব্যাকরণেরই অনুসরণ বা অনুকরণ দেদীপ্যমান। এমন কি সর্বশেষে 'শেষঃ সংস্কৃতাৎ' বা 'শেষাঃ সংস্কৃতবৎ' সূত্রনির্দেশদ্বারা, আলোচিত বিষয়ের অতিরিক্ত বা অবশিষ্টাংশের জন্য সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণেরই আশ্রয় বা সাহায্য লইতে বলা হইয়াছে ঃ

> কৃত্তদ্ধিতসমাসাদিঃ শেষো গম্যতে সংস্কৃতাৎ। উক্তলক্ষণবৃত্ত্যৈব তৎ সর্বং পরিকল্প্যতাম্।।—প্রাকৃতমঞ্জরী, এবং সুপ্‌তিঙ্‌কৃত্তদ্ধিতসমাস-প্রত্যাহার-কারক-লিঙ্গসংখ্যাদয়োঽত্র নোক্তাস্তে সংস্কৃতং সমীক্ষ্যাবগন্তব্যাঃ। সংস্কৃতানুসারেণ প্রবর্তনীয়া ইতি যাবৎ। উক্তংচ প্রাকৃতং সংস্কৃতযোনীতি। সংস্কৃতং তু পাণিন্যাদিমুনিপ্রণীত-শাস্ত্রসিদ্ধম্।—নারায়ণবিদ্যাবিনোদটীকা (৮।১৯)।

প্রাকৃতের উৎপত্তি তথা সংজ্ঞা (definition) নির্দেশেও বৈয়াকরণগণ সংস্কৃতের প্রতি চিরাচরিত পক্ষপাতিত্বকেই প্রশ্রয় দিয়াছেন। উপরোক্ত 'প্রাকৃতং সংস্কৃতযোনি' অথবা 'প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্। তত্রভবং তত আগতং বা প্রাকৃতম্' অর্থাৎ প্রকৃতি বা মূল সংস্কৃত, তদ্‌ভব বা তাহা হইতে আগত (বা অশুদ্ধ উচ্চারণে বিকৃত) ভাষাই প্রাকৃত—এইরূপ ধরিয়া লইয়া, ঐরূপ এক একটা গামুলি বা সহজসাধ্য সংজ্ঞা নির্দেশের দ্বারা কাজ চালানোই যেন তাঁহাদের সহজাত অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাদের প্রায় কেহই প্রাকৃতের যথার্থ উৎপত্তিক্ষেত্র সম্বন্ধে সচেতন বা অবহিত ছিলেন না। প্রকৃতির সহজ অর্থ যে স্বভাব বা 'গণসাধারণ' এবং প্রাকৃত অর্থে যে সর্বসাধারণের স্বাভাবিক ভাষা—যাহা সংস্কৃত ভাষার সমান্তরাল ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং যাহার সাহিত্যসম্ভারও (= লোকসাহিত্য) একেবারেই নগণ্য ছিল না, তাহা যথাযথ না বুঝিয়া, উহার মূলে নির্ব্বিবাদে সংস্কৃতকে উপস্থাপিত করিয়া, তাঁহারা যে একটি অতি জটিল সমস্যার পাশ কাটাইয়া নিষ্কৃতিলাভেই সন্তুষ্ট বা আত্মতুষ্ট ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আসলে প্রাকৃতের শতকরা ৯৫টি শব্দ মূলতঃ সংস্কৃতসদৃশ হইলেও (যাহার ফলে, সংস্কৃতই প্রাকৃতের মূল, এই ভ্রান্তি) যে সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের উৎপত্তি প্রমাণিত হয় না, বরং ঐ কারণেই এবং বাকী শতকরা ৫টি বিসদৃশ শব্দ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষা মূলতঃ একই সাধারণ ভাষার দুই বিভিন্ন শাখা মাত্র, যাহার মধ্যে আবার সংস্কৃতটিই অপেক্ষাকৃত কৃত্রিম—এই সত্যে পূর্বোক্ত পণ্ডিতদের কেহই পৌঁছিতে পারেন নাই। তাঁহারা সর্বত্রই প্রাকৃত শব্দের তদ্‌ভবত্ব অর্থাৎ সংস্কৃতভবত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন বা লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী ব্যাকরণ রচনা করিয়া কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন। এমতাবস্থায় প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতের উৎপত্তিকল্পনা যে কত সুদূরপরাহত তাহা বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।

খ্রীঃ ১২শ শতকের জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র প্রাকৃতের উৎপত্তি ও গতিপ্রকৃতির যথার্থতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সচেতন ছিলেন বলিয়া মনে হয়। অপর সকলেই সংস্কৃতের 'চোখ-ঝলসানো' অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে মুগ্ধ। তাঁহারা সংস্কৃতের আদর্শে যেসব প্রাকৃত ভাষার লক্ষণাবলী প্রদর্শন করিয়াছেন, বাস্তবিক পক্ষে সেইগুলিকেও সাহিত্যের প্রাকৃত ভিন্ন

জনগণের কথ্য প্রাকৃত বলা চলে না। হেমচন্দ্র স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন (২।১৭৪) যে, যে-সব শব্দ পূর্ববর্তী কবিদের দ্বারা অব্যবহৃত, তাহা প্রাকৃত ব্যাকরণের বিষয়ীভূত নয় বলিয়া পরিত্যাজ্য। সাহিত্যের এই প্রাকৃতও সংস্কৃতের মতো উহারই ছাঁচে ঢালা এক ধরনের কৃত্রিম ভাষা। সংস্কৃতের কৃত্রিমতা অবশ্য ব্যাকরণসঞ্জাত।

মরুভূমিতে বিরল মরূদ্যানের ন্যায়, বর্তমানে দুর্লভ হইলেও প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রাকৃতব্যাকরণও যে একদা ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। দশবৈকালিক সূত্রের টীকায় মলয়গিরি-কর্তৃক উদ্ধৃত 'ছট্ঠী বিভত্তীএ ভণ্ণই চউত্থী' বোধ হয় সেইরূপ প্রাকৃতব্যাকরণেরই সূত্র। অন্যত্রও এই উদ্ধৃতি চোখে পড়ে। আবশ্যকসূত্রের টীকায় হরিভদ্র এতৎসম্পর্কিত সম্পূর্ণ শ্লোকটিই উদ্ধার করিয়াছেন ঃ 'বহুবয়ণেণ দুবযণং ছট্ঠী বিভত্তীএ ভণ্ণই চউত্থী। জহ্হত্থা তহ পায়া ন মোত্থু দেবাহি দেবাণং।।' ইহার প্রথম লাইনের বক্তব্য প্রাকৃতপ্রকাশের ৭।৬৩-৪ এবং হেমচন্দ্রের প্রাকৃতাধ্যায়ের ৩।১৩০-৩১ সূত্রের বক্তব্যের অনুরূপ। দ্বিতীয় লাইনে উহাদের উদাহরণ প্রদর্শিত। লক্ষণীয়, উভয়েই জৈন পণ্ডিত এবং তাঁহাদের ধর্মীয় সাহিত্যই এই জাতীয় নিদর্শনের উৎস। পালি ভাষার ব্যাকরণগুলি কিন্তু সবই পালি ভাষায় রচিত এবং প্রাকৃত বৈয়াকরণদের কেহই পালিকে প্রাকৃতভাষারূপে গ্রহণ করেন নাই।

(৮)

আধুনিক যুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের দৌলতে, তুলনামূলক ব্যাকরণ- তথা ভাষা-বিজ্ঞানের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে, প্রাকৃত ভাষা ও তাহার সাহিত্য-সম্ভারের প্রতিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহাদের আদর্শে ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিতগণও সংস্কৃতের সঙ্গে পালি ও প্রাকৃতের আলোচনা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। বলা বাহুল্য ইঁহাদের প্রায় সকলেই আধুনিক পশ্চিমী শিক্ষাধারার সঙ্গে কম-বেশী সংযুক্ত।

ইউরোপে জার্মেনিতে প্রথম প্রাকৃত-চর্চার সূত্রপাত; ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন হইতে প্রকাশিত ল্যাটিন ভাষায় রচিত 'De Prakrita dialecto libri duo' (Berolini, 1836) ইহার প্রমাণ ; রচয়িতা Hoefer Carl Gustav Albert. তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণেও একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

ইহার পরেই নাম করিতে হয় Christian L. Lassen (1800-1876)-রচিত 'Institutiones linguae Pracriticae' নামক গ্রন্থের। ইহাও ল্যাটিনে রচিত এবং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মেনির Bonnae (Bonn) হইতে প্রকাশিত। পরবর্তী গবেষণাক্ষেত্রে এই গ্রন্থ খুব প্রভাব বিস্তার করে। Lassen-রচিত অন্যান্য গ্রন্থ ঃ 'Anthologia Sanscritica glossario instructa' (Bonnae, 1838) এবং 'Indische Altertumskunde' (4vols., Bonnae, 1843-44 ; Leipzig, 1847-61)। এই শেষোক্ত গ্রন্থে তৎপূর্ববর্তী ৬০ বৎসর ব্যাপী ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের যাবতীয় গবেষণার পর্যালোচনা রহিয়াছে। Bonn হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় প্রাকৃত ধাতুবিষয়ক গ্রন্থ 'Die Radices Pracriticae' ; ইহার রচয়িতা Nicolaus Delius. Friedrich Haag (1846–1914)-রচিত 'Vergleichung des Prakrit mit der Romanischen Sprachen' (Zurich, 1869) পুস্তকে বিভিন্ন ভাষার কতকগুলি উচ্চারণগত সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনা করা হইয়াছে।

ইংরেজ পণ্ডিত কাওয়েল—Edward Byles Cowell (1826–1903)—১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশ (পাঠভেদ, ভামহের মনোরমা-টীকা এবং ইংরেজী অনুবাদ সহ) প্রকাশ করেন (The Prakrta-Prakasa or The Prakrt Grammar of Vararuci, with the commentary Manorama of Bhamaha—edited by E.B. Cowell with notes and English translation and index of Prakrt words, printed for the first time, Hertford, 1854)। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে ইহার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে রামশাস্ত্রী তৈলঙ্গ ইহার পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করেন। পরে ক্রমান্বয়ে কলিকাতা (১৯১২, ১৯১৯, ১৯২২, ১৯৬২), বারাণসী (১৯২৭), পুনা (১৯৩১) এবং আদিয়ার (মাদ্রাজ) হইতে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাকৃতপ্রকাশের বিভিন্ন সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হইতে থাকে। কলিকাতায় (১৯২২) ইহার বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে কাওয়েলের আর এক গ্রন্থ 'A Short Introduction to the Ordinary Prakrt of the Sanskrit Dramas, with the Grammar and a list of common irregular Prakrt words' প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত

প্রাকৃতের উপর রচিত এই গ্রন্থের ভিত্তিও ঐ প্রাকৃতপ্রকাশই। কাওয়েল ইংল্যাণ্ডে হোরেস উইলসন্-এর ছাত্র ছিলেন। ভারতে আসিয়া তিনি প্রথমে (১৮৫৬) কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক, পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৫৯–৬৪) এবং সর্বশেষে বিলাতের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক হন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তাঁহারই পরামর্শে, এই কলেজের ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতির উপর সরকার 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী' প্রকাশের ভার অর্পণ করেন। ফলে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তারানাথের 'সরলা' টীকা সহ সিদ্ধান্ত কৌমুদীর পূর্বার্ধ কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।

বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে প্রাকৃত ভাষা ও ব্যাকরণে সর্বাধিক নামকরা লেখক ও গবেষক জার্মান অধ্যাপক Richard Pischel (1849–1908)। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'De grammaticis Pracriticis' (Vratislaviae, 1874)। ইহার পর তাঁহার সম্পাদনায় Halle হইতে ১৮৭৭ ও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে দুইখণ্ডে জার্মান অনুবাদসহ প্রকাশিত হয় হৈম প্রাকৃত ব্যাকরণ। তাঁহার ও J.G. Buehler (1837–98)-এর যুগ্ম সম্পাদনায় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে হইতে প্রকাশিত হয় হেমচন্দ্রের 'দেশীনামমালা'। তাঁহার (Pischel) বিখ্যাত গ্রন্থ 'Grammatik der Prakrit Sprachen' (Strassburg, 1900) বর্ণনামূলক, এবং ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া দুর্বল হইলেও, পূর্বোক্ত Lassen-এর গ্রন্থের পরে এই গ্রন্থই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। ইহাতে একাধারে, তাঁহার সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত সমস্ত প্রাকৃতের আলোচনা বর্তমান। Lassen-এর অপরিজ্ঞাত বহু প্রাকৃতও এই গ্রন্থে স্থান পাওয়ায় ইহা এই দিক্ দিয়া তাঁহার গ্রন্থকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সুভদ্র ঝা ইহার যে ইংরেজী অনুবাদ করেন তাহা দিল্লী হইতে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'Comparative Grammar of the Prakrit Languages' নামে প্রকাশিত হয়। হেমচন্দ্র যোশীকৃত ইহার হিন্দী অনুবাদ ১৯৫৮ খ্রীঃ পাটনায় প্রকাশিত হইয়াছে। হৈম ব্যাকরণ-ভিত্তিক অপভ্রংশের উপরে Pischel-এর গ্রন্থ 'Materialien zur kenntnis des Apabhramsa—Ein Nachtrag zur Grammatik der Prakrit Sprachen' (Berlin, 1902). এই গ্রন্থে উদয়সৌভাগ্য গণির সংস্কৃত টীকাসহ হৈম প্রাকৃত ব্যাকরণের স্বোপজ্ঞ বৃত্তিস্থ

অপভ্রংশ-কারিকা-সমূহ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে আছে ঐসব কারিকার জার্মান অনুবাদ। অপর জার্মান পণ্ডিত Karl Friedrich Geldner (1853–1929)-এর সহিত একযোগে তিনি তিন খণ্ডে Vedische Studien (Stuttg. 1889–92–1901) প্রস্তুত করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণেও জার্মান ভাষায় রচিত তাঁহাদের গ্রন্থ আছে। জার্মান পণ্ডিত Eduard Muller জৈন প্রাকৃতের উপর যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহার নাম 'Beitrage zur Grammatik des Jaina-Prakrit' (Berlin, 1876)।

ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত August Friedrich Rudolf Hoernle (1841–1919) জাতিতে জার্মান হইলেও ভারতে জন্মিয়া 'British Indologist' রূপে পরিগণিত হন এবং ইংরেজীতেই গ্রন্থাদি রচনা করেন। প্রথমে তিনি কলিকাতা মুসলিম কলেজে দীর্ঘ ২৮ বৎসর (১৮৭১–৯৯) অধ্যক্ষতা করার পর বিলাতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ বৎসর (১৯০০–১৯১৮) অধ্যাপনা করেন। মধ্যএশিয়া, খোটান এবং তুর্কিস্তান হইতে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও তাহাদের বর্ণনাত্মক রিপোর্ট- বা পুস্তক-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সম্পাদনায়, কলিকাতায় প্রথম চণ্ডের 'প্রাকৃতলক্ষণ' ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ('The Prakrita Lakshanam or Chanda's Grammar of the Ancient [আর্ষ] Prakrt,' Part I—Text with critical introduction and indexes, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1880)। চণ্ডের এই গ্রন্থ—বিভক্তি বিধান, স্বরবিধান, ব্যঞ্জনবিধান এবং ভাষান্তরবিধান—এই চারি ভাগে মোট ৯৯ সূত্রে গ্রথিত। তিনি জৈন পণ্ডিত। তাঁহার ব্যাকরণে প্রধানতঃ মাহারাষ্ট্রী আলোচিত হইলেও আর্ষ (২।১৩), অপভ্রংশ (৩।৩৭), পৈশাচিকী (৩।৩৮), মাগধিকা (৩।৩৯), শৌরসেনী (৩।৩৯) এবং ভাষান্তর বিধানে মাহারাষ্ট্রী, জৈন মাহারাষ্ট্রী, অর্ধমাগধী এবং জৈন শৌরসেনীর কথা আছে। হোর্নেলের পরে রেবতীকান্ত ভট্টাচার্যের এবং মুনিরাজ শ্রীদর্শন বিজয়জীর সম্পাদনায় যথাক্রমে কলিকাতায় ও গুজরাটে ১৯২৩ ও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। হোর্নেলের অন্যান্য রচনা : 'Three further collections of ancient Manuscripts from Central Asia', Calcutta, 1897; 'A Note on some block-prints from

Khotan...', Calcutta, 1898; 'A Report on the British Collection of Antiquities from Central Asia', Calcutta, 1899 ; 'A Collection of Antiquities from Central Asia', Calcutta 1899 এবং 'Manuscript– Remains of Buddhist Literature found in Eastern Turkestan', Oxford, 1916.

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হৃষীকেশ শাস্ত্রী 'A Prakrita Grammar with English translation' নামে ইউরোপীয় ধাঁচে বিভিন্ন প্রাকৃতের সমন্বয়ে এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় প্রকাশ করেন। প্রাকৃত ব্যাকরণের বিভিন্ন পুঁথি এবং 'প্রাকৃতকল্পলতিকা' নামক এক অজ্ঞাত গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত এই পুস্তকে, ঐসব পুঁথিপত্রের বহু ভ্রান্তি অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। সূক্ষ্ম বিচারণা ব্যতীত, প্রাপ্ত উপাদানের অবাধ গ্রহণের ফলে এই গ্রন্থ যথেষ্ট ব্যবহারযোগ্য হয় নাই। শাস্ত্রিমহাশয় (১৮৪৮–১৯১৩) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগণা জেলার ভট্টপল্লীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথমে স্থানীয় টোলে নানা শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া পরে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন, লাহোরে গিয়া 'বিশারদ' এবং 'শাস্ত্রী' উপাধি পান, সেখানকার ওরিয়েন্টাল কলেজে এবং পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনাও করেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তৎকৃত বঙ্গানুবাদসহ কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। সুপদ্ম ব্যাকরণের টীকা এবং হিন্দী ভাষার এক ব্যাকরণও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত মাসিক 'বিদ্যোদয়ঃ' পত্রের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন তিনি।[১০] তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণ ১৯০০ খ্রীঃ কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।

জার্মান পণ্ডিত Hermann Jacobi মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের (মূল ও শব্দাবলী সঙ্কলনপূর্বক) 'Ausgewahlte Erzahlungen in Maharastri Grammatik' নামে যে গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে Leipzig হইতে তাহা প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই সম্পাদনায় মিউনিক হইতে ধনপালের 'ভবিষ্যৎকথা'র জার্মান অনুবাদ 'Bhavi-sattakaha von Dhanapala' প্রকাশিত হইয়াছিল। Theodor Bloch-রচিত 'Vararuci und Hemacandra, eine beitrage zur Kritik und gescheichte der Prakrit Grammatik' (inaugural dissertation zur erlangung der doktorwurde der Philosophischen Fakultat der Universitat Leipzig, 1893)-গ্রন্থে (ইহা তাঁহার ডক্টরেট ডিগ্রির

গবেষণাপত্র) প্রাকৃতব্যাকরণের ইতিহাস এবং সমালোচনার মাধ্যমে বররুচি ও হেমচন্দ্রের অবদান পর্যালোচিত হইয়াছে। Alfred Cooper Woolner (1878–1936)-রচিত 'An Introduction to Prakrit' (Lahore, 1917) একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ : 'প্রাকৃতপ্রবেশিকা' (লাহোর, ১৯৩৩), 'Manual of Comparative Philology' (Lahore, 1937) এবং 'Languages in History of Politics' (London, 1938)। তাঁহার প্রথম গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ : 'প্রাকৃত উপক্রমণিকা,' অনুবাদক ডঃ সুশীলকুমার দে। অধুনাপ্রচলিত ভারতীয় ভাষাবিভাগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক (I.C.S. officer) Sir George Abraham Grierson (1851–1941) প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রাকৃত-বৈয়াকরণদের মতানুসরণে 'The Prakrit Dhatvadesas'(Calcutta, 1924) প্রস্তুত করেন (দ্রঃ Memoirs, Asiatic Society of Bengal, Vol. viii, No. 2, pp. 77–172)। ঐ রচনার পূর্ণ নাম 'The Prakrit Dhatvadesas, according to the Western and the Eastern Schools of Prakrit Grammarians'. ইহাতে ১৫৯০টি প্রাকৃতধাত্বাদেশ সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রীয়ার্সনের মতে বররুচি, ভামহ, বসন্তরাজ, ক্রমদীশ্বর, রামচন্দ্র তর্কবাগীশ, মার্কণ্ডেয়, রাবণ লঙ্কেশ্বর প্রাচ্য বা পূর্বভারতীয় এবং হেমচন্দ্র, ত্রিবিক্রম, সিংহরাজ ও লক্ষ্মীধর প্রতীচ্য বা পশ্চিম ভারতীয় ধারার প্রাকৃত বৈয়াকরণ। ডঃ সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহাদের সঙ্গে শাকল্য, মাণ্ডব্য, কোহল, কপিল, ভরত, কাত্যায়ন(?), সদানন্দ, নারায়ণ বিদ্যাবিনোদ, রামপাণিবাদ, রঘুনাথ, পুরুষোত্তম ও জীব গোস্বামীকে পূর্বভাগে এবং বাল্মীকি, নমিসাধু, উদয়সৌভাগ্য গণি, নর (নরেন্দ্র) চন্দ্র সূরি, সিংহদেব গণি, নরসিংহ, অপ্পয় দীক্ষিত, বালসরস্বতী, শুভচন্দ্র এবং শ্রুতসাগরকে পশ্চিম ভাগে জুড়িয়া দিয়াছেন (দ্রঃ 'The Eastern School of Prakrit Grammarians' by Dr. S.R. Banerjee, Calcutta, 1977, p. 5) গ্রীয়ার্সনের প্রধান গ্রন্থ (magnum opus)—যাহার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন —সেই মহাগ্রন্থ 'Linguistic Survey of India' (Calcutta, 1903–28) ১১ খণ্ডে বিভক্ত—যাহাতে ১৭৯টি ভাষা এবং ৫৪৪টি উপভাষা (dialects) বর্ণিত এবং আলোচিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের উপরে রচিত তাঁহার 'Remarks

on the Sanskrit Passive' (Leiden, 1951) গ্রন্থে, সংস্কৃত কর্মবাচ্যের ইতিহাস ও ক্রম-পরিণতি বিষয়ে আলোচনা বর্তমান। L. Alsdorf-রচিত Apabhramsa Studien' ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মেনির লাইপজিগ হইতে প্রকাশিত হয়। Madhukar Anant Mehendale-প্রণীত 'Historical Grammar of inscriptional Prakrits' (Poona, 1948) একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ঐ একই বৎসরে তদ্‌দৃশবিষয়ে প্রকাশিত তাঁহার অপর গ্রন্থ 'Asokan Inscriptions in India'।

পূর্বোক্ত লঙ্কেশ্বরের মূল গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। রামচন্দ্র তর্কবাগীশ ীয় প্রাকৃতকল্পতরুতে লিখিয়াছেন ঃ 'এতাসু লঙ্কেশ্বরভাষিতাসু ভাষাসু কৌতূহলশালিনো যে। তেষাং প্রমোদায় কৃতির্মমৈষা...' ইত্যাদি। প্রাকৃত ঙ্কেশ্বরের ('প্রাকৃতকামধেনুকা' নামও দেখা যায়) অতিসংক্ষিপ্ত, মাত্র ৬ সূত্রাত্মক এক অর্বাচীন সংস্করণ—যাহা প্রথমে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে New Indian Antiquary'-পত্রিকায় (Vol. viii, pp. 37–9) প্রকাশিত য়; M.M. Ghosh এবং S.R. Banerjee যথাক্রমে ১৯৫৪ এবং ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজেদের সম্পাদিত এবং রচিত গ্রন্থের পরিশিষ্টে কাশ করিয়াছেন। 'বিদ্যাভক্ত শ্রীরাবণকৃত' এই পুস্তকের প্রথমে স্তরাদ্ গদিতং পূর্বং সংক্ষেপাদধুনোচ্যতে' উক্তি লক্ষণীয়।

খ্রীঃ ১২শ শতকে বঙ্গীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত পুরুষোত্তম ২০ অধ্যায়ে যে াকৃতানুশাসন' রচনা করেন, তাহার সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই; ৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে ফরাসী বিদুষী Luigia Nitti-Dolci-র ম্পাদনায় ইহার ৩য় অধ্যায়ের মধ্যভাগ হইতে ২০শ অধ্যায় পর্যন্ত প্রথম মুদ্রিতাকারে (Le Prakrtanusasana de Purusottama, ite, traduit et annote par Luigia Nitti-Dolci, Paris, 1938, pp. vii+141) প্রকাশের পর, কলিকাতায় পূর্বোক্ত ঘোষ এবং ব্যানার্জি াশয়দ্বয় নিজেদের গ্রন্থের পরিশিষ্টেও ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষা, গষা ও অপভ্রংশ মিলাইয়া অন্ততঃ ২৫টি ভাষার সৌত্র নির্দেশ এই করণে দৃষ্ট হয়—মহারাষ্ট্রী (১ম–৮ম অধ্যায়), শৌরসেনী (৯ম ্যায়), প্রাচ্যা (১০ম অঃ), আবন্তী (১১শ অঃ), মাগধী (১২শ অঃ), গরী (১৩শ অঃ), চাণ্ডালী (১৪শ অঃ), শাবরী (১৫শ অঃ), টক্কী ৬শ অঃ), নাগরকাপভ্রংশ (১৭শ অঃ), ব্রাচড়কাপভ্রংশ, উপনাগরক,

পাঞ্চালিবৈদর্ভী ও কৈকেয়পৈশাচিকঃ (১৯শ অঃ) এবং শৌরসেন পৈশাচিক ও পাঞ্চালপৈশাচিক (২০শ অধ্যায়)।

মধ্যদেশীয় প্রাকৃতই শৌরসেনী, ইহা পৌরাণিক সংস্কৃতের খুব নিকটবর্তী। এই সংস্কৃত, সমসাময়িক প্রাকৃত ভাষাগুলিকে সাহায্য করিয়াছে, যেমন পালি সাহায্যকারী মাগধীর ক্ষেত্রে। সংস্কৃতের গণ্ডীচ্যুত এবং সাহিত্যের প্রাকৃত হইতে বিলক্ষণ, কথ্য ভাষাই অপভ্রংশ। ইহাতে আর্য-অনার্য উভয়ের ভাষাই অনুসৃত হইয়া আছে। ভারতীয় ভাষাবিবর্তনধারায়, প্রাকৃত ও আধুনিক ভাষার মধ্যবর্তী এই অপভ্রংশ। বররুচি অপভ্রংশের নাম না করিলেও তৎপরবর্তী প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ অপভ্রংশকে একটি স্বতন্ত্র প্রাকৃত ভাষা অর্থেই গ্রহণ করিয়া এবং 'নাগরক অপভ্রংশকে মুখ্য ধরিয়া অপভ্রংশের আলোচনা করিয়াছেন' এবং ইহার আঞ্চলিক বিভাষা (দুই ভাষার লক্ষণবিশিষ্ট মিশ্রভাষা) সমূহের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন-রচিত 'ভাষার ইতিবৃত্ত' নামক বাংলা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

রত্নচন্দ্র মহারাজকৃত 'জৈনসিদ্ধান্তকৌমুদী'—আধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ অর্ধমাগধী প্রাকৃত ব্যাকরণ। ইহার বৃত্তিও তাঁহার রচনা। এই ব্যাকরণে তৎপ্রণীত আনুষঙ্গিক গ্রন্থ—অর্ধমাগধীধাতুরূপাবলী (বিকানির, ১৯২৮)।

---

১ 'কপিলস্য তব্যক্তয়োগহিং স্যাৎ' (প্রাকৃত কল্পতরু ২।১।২৮) এবং 'রাক্ষসভিক্ষুক্ষপণক চেটাদ্যা মাগধীং প্রাহরিতি কোহলঃ' (প্রাকৃত সর্বস্ব ১২।১)।

২ বাল্মীকিসূত্রম্—Govt. Oriental Mss. Library, Madras, Vol. III, 1906–Manuscript No. 1548; Cat. Catalogorum I, 361; India Office Catalogue Nos. 5125–8; বৃন্দাবনে প্রাপ্ত প্রাকৃতকামধেনু-র পুঁথিতে 'প্রাকৃতেঽস্মিন্ হেবধাশ্চ দর্শনে ইতি বাল্মীকিতন্ত্রে' লক্ষণীয়।

৩ তাঁহার প্রকৃত নাম বেঙ্কটকৃষ্ণ কবি, অন্ধ্রপ্রদেশের এড়প্পল্লিগ্রামে (PIN 503202) জন্ম, পিতা কৃষ্ণদেব, পিতামহ ধৈরন ; 'বালসরস্বতী' এবং 'বাগনুশাসন' তাঁহার উপাধি। তেলুগুকবি। তাঁহার 'ষড়্ভাষাবিবরণ' ব্যাকরণ, ক্রমান্বয়ে সংজ্ঞা, সন্ধি, সুবন্তাধিকার, তদ্ধিতপ্রক্রিয়া এবং তিঙন্ত এই পাঁচ প্রকরণে গ্রথিত।

৪ Comparative Grammar of the Prakrit Languages—translated from German by Sri Subhadra Jha, p. 37

৫ ইহার ইংরেজী অনুবাদ 'The Prakrit Grammarians' (Delhi, 1972), অনুবাদক P.Jha (প্রভাকর ঝা)।

৬ The Prakrtaprakasa of Vararuci (Text edited for the first time with a new commentary entitled Prakrtapadatika by Narayana Vidyavinoda... together with an elaborate introduction...) by Satya Ranjan Banerjee..., Calcutta, 1975. ইহার পূর্বে, কলিকাতা সংস্কৃতসাহিত্য পরিষৎপত্রিকায় (৪৬ বর্ষের ১০ম সংখ্যা হইতে) তৎসম্পাদিত ঐ টীকা সহ প্রাকৃতপ্রকাশ প্রকাশিত হইয়াছিল।

৭ Comparative Grammar...translated by S. Jha, p. 44.

৮ সমগ্র প্রাকৃতপ্রকাশের মোট সূত্রসংখ্যা =৪২৭+ শেষ তিন পরিচ্ছেদের ৬৩ = ৪৯০। নারায়ণ বিদ্যাবিনোদের টীকায় ধৃত মোট সূত্রসংখ্যা=৪২৫। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের প্রাকৃতপাদের মোট সূত্রসংখ্যা ৪৮৬। প্রথম দুই ক্ষেত্রে সূত্রঘটিত তুলনামূলক বিচারে (স্থূলতঃ) দেখা যায়, পারস্পরিক অক্ষরগত অবিকল সূত্রসংখ্যা ২১৫, আংশিক পার্থক্যযুক্ত সূত্রসংখ্যা ১৭৬, বররুচির দুইসূত্রের স্থলে নারায়ণের এক সূত্র রচনার স্থল ৭, বররুচির সূত্রপাঠের বহির্ভূত নারায়ণ-রচিত অতিরিক্ত সূত্র ২৭ এবং ঐরূপ বররুচির অতিরিক্ত সূত্রসংখ্যা ২২। অন্ততঃ ২৫টি সূত্র তিন ক্ষেত্রেই (বররুচি, নারায়ণ ও সংক্ষিপ্তসার) অবিকল এক বা সমান, অন্ততঃ ৩০টি সূত্র প্রায় অবিকল বা সদৃশ, নারায়ণের (অন্ততঃ) ১৬টি সূত্রের (১।১, ৩৬, ২।২৭, ৩।১৯, ২৭, ৪।২৪, ৫।৯, ৫।৩৮, ৬।৩, ৭।১৮, ২০, ৫৮, ৫৯, ৬৬, ৬৭, ৭৫) গঠনে প্রাকৃতপ্রকাশের অপেক্ষা সংক্ষিপ্তসারের প্রভাব অধিকতর প্রকট, কোথাও (৩।২৭, ৪।২৪, ৫।৯, ৭।২০, ৫৮) তিনি অবিকল সংক্ষিপ্তসারের সূত্রই গ্রহণ করিয়াছেন; কতকগুলির (৬।১, ২, ১৮, ৭। ৫১) ক্ষেত্রে উভয় দিকের অনুরূপ সূত্রের সাহায্যই গ্রহণ করিয়াছেন; প্রাকৃতপ্রকাশের কয়েকটি সূত্রের (যেমন ১।৪১, ৬।৯, ১৫, ২৮) সহিত নারায়ণের সূত্রাপেক্ষা সংক্ষিপ্তসার-সূত্রের সাদৃশ্য বেশী, কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রাকৃতপ্রকাশ তথা নারায়ণের একাধিক সূত্রকে (যেমন ১।৩৯, ৪০ ; ২।১০, ১১ ; ২।১৩, ১৪ ; ২।৪৪, ৪৫ ; ৩।৩৫, ৩৬ ; ৬।৫৪, ৫৫) সংক্ষিপ্তসারে এক একটি সূত্রে পরিণত করা হইয়াছে ; প্রাকৃতপ্রকাশের ১০ম–১২শ পরিচ্ছেদের কতকগুলি সূত্র (১০।১৪, ১১।৩, ৬, ১২, ১৩, ১৬, ১২।৭, ৯, ১০, ১৬, ২৩) সংক্ষিপ্তসারসূত্রের সহিত তুলনায় কোথাও এক বা অনুরূপ। বলা বাহুল্য উল্লিখিত তিনটি সূত্রপাঠের মধ্যে প্রাকৃতপ্রকাশের নিকট যেমন ঋণী সংক্ষিপ্তসারের সূত্রপাঠ, তেমন ঋণী বিদ্যাবিনোদের সূত্রপাঠ অপর দুইটির নিকট; কোন দুইটিই অবিকল একরূপ নয়।

৯ তাঁহার এই টীকার পূর্ণগ্রন্থ সুলভ নয়। ইহার কিয়দংশ মাত্র ডঃ সত্যরঞ্জন ব্যানার্জী সম্পাদিত এবং প্রাকৃতগ্রন্থপরিষৎ (Prakrit Text Society), আমেদাবাদ—৩৮০০০৯ হইতে ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Prakrtadhyaya by Kramadisvara' পুস্তকে যোজিত হইয়াছে। টীকার প্রারম্ভে : 'শোভাকরকুলোদ্ভূত-শ্রীচণ্ডীদেব শর্মণা। ক্রিয়তেহষ্টমপাদস্য টীকা প্রাকৃতদীপিকা।।'

১০ ভারতীয় পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত প্রাকৃতব্যাকরণের আরও কয়েকটি গ্রন্থ : 'An Epitome of Prakrit Grammar' by Laksman Sastri, Tanjore, 1904;

'Prakrit Grammar' By M.P. Misra, Chaukhamba Vidya Bhavan, Varanasi, 1960; 'A Grammar of the Prakrit Language' by D.C. Sircar, University of Calcutta, Calcutta 1943; 'Historical Grammar of Apabhramsa' by G.V. Tagore, Poona, 1948; 'Studies in the Apabhramsa texts of the Dakarnava' by N. Choudhuri, Calcutta, 1940 এবং মাগধী ও অর্ধমাগধীর উপর রচিত—'The Evolution of Magadhi' by A.P. Banerjee, Sastri, Oxford, 1922; 'Ardha-Magadhi Reader' by Banarasi Das Jain, Punjab University Oriental Publications, Lahore, 1923; 'A Manual of Ardhamagadhi Grammar' by P.L. Vaidya, Poona, 1934; 'Ardhamagadhi Grammar for Beginners' by Brajalal Mohanlal Shah, Ahmedabad; 'A Study of Ardhamagadhi Grammar' by H.B. Gandhi, Surat, 1938; 'An Introduction to Ardhamagadhi' by A.M. Ghatage, Kolhapur, 1938; অর্ধমাগধীর পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ 'জৈন সিদ্ধান্তকৌমুদী'—'শতাবধানি-জৈনমুনি শ্রীশ্রীরত্নচন্দ্র মহারাজকৃতয়া স্বোপজ্ঞবৃত্ত্যা, সূত্রপাঠেন সূত্রানুক্রমণিকয়া চ সহিতা' (লাহোর, ১৯৩৮), ইহার বৃত্তি কিন্তু সংস্কৃতে রচিত; 'অর্ধমাগধী ধাতুরূপাবলী' (বিকানির, ১৯২৮)ও তাঁহারই রচনা। জৈন ধর্মশাস্ত্র, এই জৈন অর্ধমাগধীতে বিধৃত হইলেও, ইহা অর্ধমাগধী প্রাকৃত হইতে বিলক্ষণ, যেমন বৌদ্ধ মাগধী বা পালি ভাষা, মাগধী প্রাকৃত হইতে বহুলাংশে পৃথক্। এই বিষয়ে এই গ্রন্থের 'পালিভাষা ও ব্যাকরণ' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য। পণ্ডিত মনিয়র উইলিয়মস্-এর প্রাসঙ্গিক উক্তি :

The earlier form of the ancient spoken language, called Pali or Magadhi, has a grammar and extensive literature of its own...Pali was introduced into Ceylon by Buddhist missionaries from Magadha when Buddhism began to spread, and is now the sacred language of Ceylon and Burmah, in which all their Buddhist literature is written. Singularly enough, it found a kindred dialect established in Ceylon, which had developed into the present Sinhalese. Pali is closely connected with, and was probably preceded by the language of the Rock Inscriptions of the second and third centuries B.C. The language of the Gathas, as found in the Lalitavistara of the Northern Buddhists of Nepal, is thought by some to be a still earlier form of the spoken language; so that four separate stages of Prakrit using that term generally for the spoken languages of the people which preceded the modern vernaculars, can be traced : 1. the Gathas, 2. the Inscriptions, 3. the Pali, 4.the Prakrit of the plays.—Introduction to his 'Indian Wisdom' (2nd ed. pp. xxix–xxx, F. Note)

পালিভাষা ও ব্যাকরণ

বৌদ্ধ ত্রিপিটকের ভাষা পালি। এই ভাষাতেই বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাই অবিকল ত্রিপিটকে গ্রথিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। হিন্দুদের নিকট বেদ যেমন পবিত্র, বৌদ্ধদের নিকট এই ত্রিপিটক সেইরূপ। বুদ্ধদেবের সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ৫৬৬–৪৮৬) উত্তর-পূর্ব ভারতে বিশেষতঃ মগধে সর্বসাধারণের ভাষা ছিল পালি। তাই তিনি সর্বজনবোধ্য এই ভাষাতেই তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। ত্রিপিটকের অন্যতম বিনয়পিটকে (চুল্লবগ্‌গ ৫।৩৩) কথিত আছে যে বৌদ্ধ বাণীর পবিত্রতা রক্ষার জন্য উহাকে সংস্কৃতে অনূদিত করিবার প্রস্তাব, বুদ্ধ-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। যমেল ও উতেকূল নামক দুই ব্রাহ্মণ ভ্রাতা বৌদ্ধ ভিক্ষু হওয়ার পর এক দিন বুদ্ধের নিকট এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে, যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন নাম, গোত্র ও জাতিকুলের প্রব্রজিত ভিক্ষুগণ ('...ভিক্‌খু নানা নামা নানা গোত্তা নানা জচ্চা নানা কুলা পব্‌বজিতা') তাহাদের নিজেদের ভাষায় (?) বুদ্ধ-বচনকে দূষিত করিতেছে ('তে সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং দুসেন্তি') সেই জন্য তাঁহারা উহাকে ছন্দে (= বেদভাষায় তথা সংস্কৃতে) আরোপিত করিতে চাহেন ('...বুদ্ধবচনং ছন্দসো আরোপেমি')। ইহা শুনিয়া বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলেন যে, বুদ্ধবচনকে ছন্দে আরোপিত করিবার প্রয়োজন নাই ; যে করিবে তাহার দুষ্কৃত নামক অপরাধ হইবে। ইহাকে নিজের ভাষাতেই গ্রহণ করিতে হইবে— ইহাই তাঁহার অনুজ্ঞা ('অনুজানামি, ভিক্‌খবে, সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়া পুণিতুন্তি')। ব্যাখ্যাকার বুদ্ধঘোষ (খ্রীঃ ৫ম শতক) 'সকায় নিরুত্তিয়া' অর্থে বৌদ্ধ মাগধী (অর্থাৎ পালি) ভাষা বুঝিয়াছেন। কেহ কেহ উহার অর্থ ভিক্ষুদের নিজ নিজ মাতৃভাষা বলিয়া অনুমান করিলেও, বুদ্ধঘোষের অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

এই ভাষার পালি-নামকরণ, অনেক পরের ঘটনা। সম্ভবতঃ বুদ্ধঘোষের অত্থকথা বা অট্‌ঠকথাতেই পালি শব্দের প্রথম সন্ধান মিলে। ইহার উৎপত্তি এবং অর্থ লইয়া আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতবিরোধও বড় কম নয়। বৌদ্ধ ঐতিহ্যানুসারে ইহাকে মাগধী 'মাগধা নিরুত্তি' বা 'মাগধিক ভাসা' বলা হইত। বুদ্ধঘোষের (পালিতে

'বুদ্ধঘোস') কথায়–'এথ সকা নিরুত্তি নাম সম্মাসং বুদ্ধেন বুত্তপ্পকারো মাগধিকো বোহারো' (চুল্লবগ্‌গ ৫।৩৩।১ টীকা)। কচ্চায়নব্যাকরণের ভূমিকায় ইহাকে বলা হইয়াছে 'মূল ভাসা'—'সা মাগধী মূলভাসা নরাযাযাদিকপ্পিকা। ব্রহ্মাণো চস্‌সুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে।।' পয়োগ সিদ্ধি, মহারূপসিদ্ধি প্রভৃতি একাধিক পালিব্যাকরণ গ্রন্থে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ—সৃষ্টির প্রারম্ভে নবজাতক মানুষের মূল ভাষাই মাগধী। বিভিন্ন ব্রহ্মা, নবজাত শিশুগণ এবং বুদ্ধগণ এই ভাষায় কথা বলিতেন। মোগ্‌গল্লান তাঁহার পালিব্যাকরণের প্রারম্ভে ইহাকে (অর্থাৎ এই ব্যাকরণকে)-'মাগধং সদ্দলক্‌খণং' বলিয়াছেন।

এই 'মাগধী' কিন্তু, মাগধী প্রাকৃত হইতে বহুলাংশে পৃথক। ইহাকে বৌদ্ধ মাগধী বলা চলে—যাহা অন্য সমস্ত প্রাকৃতের তুলনায় প্রাচীনতম। বলা বাহুল্য, ইহাও এক প্রকার প্রাকৃতই। আধুনিক পণ্ডিতগণের কেহ কেহ ইহাকে পূর্বভারতীয় অর্ধমাগধী প্রাকৃত, আবার কেহ বা জৈন অর্ধমাগধী হইতে সমুৎপন্ন বলিয়াছেন। কেহ ইহার সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াছেন বিন্ধ্যদেশীয় পৈশাচী প্রাকৃতের সহিত, কেহ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের পৈশাচীর সহিত, কেহ বা শৌরসেনী প্রাকৃতের সহিত।

পালি-শব্দের মৌলিক অর্থ লইয়াও বিভিন্ন মত রহিয়াছে। কেহ বলেন পল্লীর ভাষা বুঝাইতে, পল্লী শব্দ হইতে পালি শব্দের আগমন ঘটিয়াছে। কাহারও মতে ইহার মূলে রহিয়াছে 'পাঠ' শব্দ। থেরীগাথার (৬১) টীকা 'পরমত্থদীপনী'তে ইহার সমর্থন আছে। ত্রিপিটকের পন্তি (পঙ্‌ক্তি) হইতে পত্তি >পট্টি >পলি >পালি আসিয়াছে। এই মত সমধিক প্রবল। পন্তির মতো 'তন্তি' শব্দও পালি-বাচক। ইহাও মূল শাস্ত্রের বচন-পঙ্‌ক্তি বুঝাইত। পালিশব্দাভিধান 'অভিধানপ্পদীপিকা'য় লিখিত আছে ঃ 'সেতুস্মিং তন্তিপন্তীষু নারিয়ং পালি কথ্যতে' (৯৯৯)। একমতে 'পরিয়ায়' (পলিয়ায়) শব্দ হইতে পালি-র জন্ম। উহার অর্থ বুদ্ধবচন বা উপদেশ। উক্ত অভিধানের টীকায় বলা হইয়াছে—'পা রক্‌খনে লিপাতি রক্ষতীতি পালি' বা 'সদ্দত্থং পালেতীতি পালি।' অর্থাৎ শব্দ ও অর্থকে পালন (রক্ষা) করে বলিয়া পালি।

সংস্কৃত গ্রন্থাদিতেও পালি শব্দ দৃষ্ট হয়। পাণিনীয় গণপাঠে রাজদন্তাদিগণে (২।২।৩১) 'গোপালিধানপুলাসম্'-এর অন্তর্গত পালিশব্দ

লক্ষণীয়। মহাভারতে, রাজতরঙ্গিণীতে (৫।১০৬), হর্ষচরিতে, উজ্জ্বলদত্তের উণাদিবৃত্তিতে, সুশ্রুতে, গীতগোবিন্দে (৬।১০)—'বিপুলপুলকপালিঃ', অমরকোষে (ক্ষত্রিয়বর্গ ৯৩), মেদিনীকোষে (শব্দবর্গ৩০), ত্রিকাণ্ডকোষে (নানার্থ বর্গ ৩৯৯), ধনঞ্জয়নিঘণ্টু, হলায়ুধকোষ (৬৭৬), অজয়পালনিঘণ্টু, রাঘবকৃত নানার্থমঞ্জরী, সাহজীর শব্দরত্নসমন্বয়কোষ, ইরুগপদণ্ডনাথের 'নানার্থরত্নমালা', মহীধরের অনেকার্থতিলক, ত্র্যম্বকমিশ্রকৃত 'বিশেষামৃত' কোষে 'পালি' শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। এইসব স্থলে ইহার অন্যান্য অনেক অর্থের মধ্যে পঙ্‌ক্তি অর্থও দেখানো হইয়াছে। এই পঙ্‌ক্তি অবশ্য বুদ্ধবচন। উল্লিখিত কোষ সমূহের টীকাগুলিতেও 'পাল রক্ষণে' এবং 'পাল্যতে পালিঃ' ইত্যাদি ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত। রক্ষার্থে 'পা' ধাতুর উত্তর উণাদিপ্রত্যয় 'লি' প্রয়োগে পালি শব্দের জন্ম। মোটকথা, যে ভাষায় বুদ্ধবচন রক্ষিত বা পালিত তাহাই পালি ভাষা। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'সাসনবংস' নামক পালিগ্রন্থে 'পালিভাসা'র প্রয়োগ দেখা যায়।

(২)

পালিব্যাকরণের যে পাঁচটি ধারার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে 'বোধিসত্ত' এবং 'সব্বগুণাকর' এখন অবলুপ্ত। অপর তিন ধারা 'কচ্চায়ন,' 'মোগ্‌গল্লান' এবং 'সদ্দনীতি' এখনও প্রচলিত আছে। কচ্চায়ন অর্থাৎ কাত্যায়ন। তাঁহার নামেই তৎপ্রণীত ব্যাকরণের পরিচয়। ইহার ৮ অধ্যায়ে ক্রমান্বয়ে সন্ধি, নাম (শব্দ), কারক, সমাস, তদ্ধিত, আখ্যাত (ক্রিয়া), কৃৎ ও উণাদি প্রত্যয় আলোচিত। মোট ২৩ পরিচ্ছেদ ; সূত্রসংখ্যা মোট ৬৭৫। এই সংখ্যা কোথাও ৬৭২ এবং কোথাও বা ৭১০ (ন্যাসে) দৃষ্ট হয়। যোগবিভাগের দ্বারা এই সংখ্যাবৃদ্ধি। বহু সূত্র পাণিনীয় তথা কাতন্ত্রিক সূত্রাবলীর অনুবাদ স্বরূপ। স্থলবিশেষে পাণিনির সূত্র অবিকল গৃহীত হইয়াছে, যেমন—'অপাদানে পঞ্চমী' (পা. ২।৩।২৮)। তবে তুলনামূলক বিচারে পাণিনি অপেক্ষা কাতন্ত্রের প্রভাবই কচ্চায়নে অধিকতর প্রতিভাত। ব্যাকরণের সূত্র-বৃত্তি-উদাহরণ সবই কচ্চায়ন-গ্রথিত। আবার এমনও শুনা যায়—'কচ্চানেন কতো যোগো বুত্তি চ সংঘনন্দিনো। পয়োগো ব্রহ্মদত্তেন ন্যাসো বিমলবুদ্ধিনা।।'—কচ্চায়নভেদ টীকা। অর্থাৎ এই ব্যাকরণের মূল সূত্রাংশ কচ্চায়নকৃত, বৃত্তি সংঘনন্দীর, উদাহরণ ব্রহ্মদত্তের এবং ন্যাস

বিমলবুদ্ধির রচনা। আবার ঐ কচ্চায়নভেদ টীকাতেই অন্যত্র, এই সবই কচ্চায়ন-রচিত বলা হইয়াছে। প্রথম সূত্র 'অত্থো অক্খরসঞ্ঞাতো' নাকি বুদ্ধদেবেরই উক্তি। ইহার অর্থ—অক্ষরের দ্বারাই অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে। এই খবরটিও ঐ কচ্চায়নভেদ টীকার।

বৌদ্ধ ঐতিহ্যানুসারে বুদ্ধশিষ্য মহাকচ্চায়ন এই ব্যাকরণের রচয়িতা। ঐতিহাসিক বিচারে এই মত ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত। বুদ্ধশিষ্য কচ্চায়ন বা পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিককার বররুচি কাত্যায়ন হইতে, পালি-বৈয়াকরণ কচ্চায়ন ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীয় বুদ্ধঘোষের, এমন কি ৭ম শতাব্দীয় কাশিকাবৃত্তিপ্রণেতারও পরবর্তী বলিয়া অনুমিত। কচ্চায়নব্যাকরণ বা কচ্চায়নগন্ধ ভিন্ন, চুল্লনিরুত্তিগন্ধ, মহানিরুত্তিগন্ধ, বণ্ণনীতিগন্ধ, সুসন্ধিকপ্প প্রভৃতি ব্যাকরণগ্রন্থের কর্তৃত্বও কচ্চায়নে আরোপিত। অঙ্গুত্তরটীকায় লিখিত আছে ঃ 'কচ্চায়নত্থেরো পুব্বপত্থনাবসেন কচ্চায়নপ্পকরণং মহানিরুত্তিপ্পকরণং নেত্তিপ্পকরণঞ্চেতি পকরণত্তয়ং সংঘমজ্ঝে পকাসেসি।'

কচ্চায়নব্যাকরণের প্রধান দুর্বলতা ইহার সংস্কৃতানুগত্য। ইহা বড় বেশী কাতন্ত্র ও পাণিনিব্যাকরণের প্রভাবাধীন, অথচ সংস্কৃতের সহিত পালির ঐতিহাসিক সম্বন্ধ-বিষয়ে উদাসীন। ভাষাতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পালিভাষার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ইহাতে উপেক্ষিত। এই সব কারণে এবং পালির কথ্য রূপ (বা অবস্থা) হইতে সরিয়া পরবর্তী পালি সাহিত্য-লব্ধ উপাদানের ভিত্তিতে রচিত হওয়ায়, পালিব্যাকরণও প্রাকৃতব্যাকরণের মতো মৌলিকতাবর্জিত।

বিমলবুদ্ধির ন্যাসকে কচ্চায়নন্যাস বা মুখমত্তদীপনী বলা হয়। ইনি সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশীয় এবং খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীয়। ন্যাসের এক টীকাও ইনি রচনা করেন। ন্যাসের অপর টীকা ন্যাসপ্পদীপ রচনা করেন ছপট বা ছপড়। কচ্চায়নসুত্তনিদ্দেশ এবং সম্মোহবিঘাতনী গ্রন্থ-দুইটিও ছপট-রচিত। প্রথমটি রচিত হয় ১১৮১ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়টি উহার ব্যাখ্যাস্থানীয় বলিয়া অনুমিত। ছপট ব্রহ্মদেশের অধিবাসী, সিংহলে গিয়া কৃতবিদ্য হন। ১৩শ শতকের প্রথম দিকেও তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। খ্রীঃ ১৭শ শতকে দাথনাগ রাজগুরু ন্যাসের নিরুত্তিসারমঞ্জুসা নামে টীকা রচনা করেন। মুখমত্তসার এবং মুখমত্তসার-টীকাও সম্ভবতঃ ঐ ন্যাসসংক্রান্ত গ্রন্থ।

কচ্চায়নের সংক্ষিপ্তসার বালাবতার সচরাচর-প্রচলিত পালিব্যাকরণ। ইহা পাণিনীয় লঘুকৌমুদীস্থানীয়, বিষয়-বিন্যাসে মূল ব্যাকরণ হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্। ইহাতে প্রথমে সন্ধি এবং পরে ক্রমে নাম, সমাস, তদ্ধিত, আখ্যাত, কৃৎ, উণাদি, কারক ও বিভক্তিভেদ। খ্রীঃ ১৪শ শতকে ধর্মকীর্তি (সদ্ধম্মকিত্তি) ৭ অধ্যায়ে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মদেশে এবং থাইল্যাণ্ডে ইহার বহুল প্রচলন। সিংহলী ও পালিভাষায় রচিত ইহার একাধিক টীকা আছে। এক টীকাকারের নাম উত্তম। সিংহলের মহাথের সুমঙ্গল-রচিত টীকা পালিভাষায় রচিত। এই টীকা সহ তৎসম্পাদিত বালাবতার ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বোতে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে এই কলম্বোতেই ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে Don Andris de Silva Batuvantudave Pandit-কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া বালাবতার প্রথম মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। Lionel Lee বালাবতারের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন The Orientalist পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৫ ও মার্চ, ১৮৮৭)। তিনি এই অনুবাদকার্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৯১৬ খ্রীঃ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং সমণ পুন্নানন্দ স্বামীর যুগ্ম সম্পাদনায় ইংরেজী অনুবাদসহ বালাবতারের ১ম খণ্ড কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।

কচ্চায়নের সারসংগ্রহপূর্বক রচিত অপর ব্যাকরণগ্রন্থ রূপসিদ্ধি বা পদরূপসিদ্ধি। সিংহলবাসী বুদ্ধপ্পিয় দীপঙ্কর ইহার প্রণেতা। সন্ধি, নাম, কারক, সমাস, তদ্ধিত, আখ্যাত ও কৃৎ—এই ৭ কাণ্ডে গ্রথিত এই রচনা। ৭ম কাণ্ডে কৃৎ-এর সহিত উণাদিও প্রদর্শিত হইয়াছে। খুব সম্ভব ইহা বালাবতারের পূর্বে রচিত এবং সেই কারণে প্রাঞ্জলতায় ও কার্যোপযোগিতায় উহা অপেক্ষা হীন। এই দীপঙ্কর চোলদেশীয় এবং খ্রীঃ ১৩শ/১৪শ শতাব্দীয়। সিংহলে গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। সেখানে বনবাসী সম্প্রদায়ের আনন্দবনরতন থের ছিলেন তাঁহার বিদ্যাগুরু। ইনি পিয়দস্সীর পদসাধন নামক পালিব্যাকরণের অনুবাদ করেন সিংহলী ভাষায়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যের মতো রূপসিদ্ধিকে 'মহারূপসিদ্ধি' বলা হয়—যাহা এই গ্রন্থের গাম্ভীর্য ও মাহাত্ম্যের পরিচায়ক। দীপঙ্কর স্বয়ং ইহার এক টীকা রচনা করেন, নাম—রূপসিদ্ধি-অত্থকথা। তাঁহার অপর গ্রন্থ 'পজ্জমধু'—ব্যাকরণগ্রন্থ নয়, বুদ্ধদেবের রূপ ও প্রজ্ঞার বর্ণনামূলক ১০৪টি শ্লোকে নিবদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। রূপসিদ্ধিনিস্সয়—আর এক টীকা।

দক্ষিণ সিংহলের 'বালাদিচ্চ' বিহারের অধ্যক্ষরূপে দীপঙ্করের শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে Allust Grunwedel বার্লিন হইতে রূপসিদ্ধির এক জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন।

কচ্চায়নব্যাকরণের ভিত্তিতে রচিত ৫৬৮ শ্লোকে নিবদ্ধ এক কারিকাগ্রন্থ আছে। 'সদ্দকারিকা' বোধ হয় ইহারই নামান্তর। খ্রীঃ ১১শ শতকে ব্রহ্মদেশের ধম্মসেনাপতি ইহার প্রণেতা। ইহার টীকাও তাঁহারই রচনা। কচ্চায়ননিদ্দেস, কচ্চায়ননিস্‌সয়, কচ্চায়নপদবিগ্‌গহ, কচ্চায়ন-রূপাবতার, কচ্চায়নসদ্দাবতার, কচ্চায়নসার প্রভৃতি গ্রন্থ কচ্চায়ন-ব্যাকরণের সহিত মুখ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট। কচ্চায়নসার এবং কচ্চায়নভেদ যথা-ক্রমে ৭২ এবং ১৭৮শ্লোকে নিবদ্ধ পুস্তক। ইহাদের রচয়িতা মহাযস, ব্রহ্মের থাটোন-নিবাসী। তাঁহাকে রস, রস্‌স, ধম্মানন্দ প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়। খ্রীঃ ১৪শ শতকে তাঁহার অভ্যুদয়। কচ্চায়নভেদের দুই টীকা—কচ্চায়নভেদমহাটীকা এবং সারত্থবিকাসিনী। শেষোক্ত টীকার রচয়িতা অরিয়ালংকার। রচনাকাল ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ। মহাটীকা রচনা করেন উত্তম সিক্‌খ। এক তিপিটকালংকার আবার এই মহাটীকার উপরে এক টীকা রচনা করেন। কচ্চায়নসারের নানা টীকার মধ্যে মহাযস-রচিত টীকার নাম কচ্চায়নসারপুরাণটীকা। আর এক টীকা সম্মোহবিনাসিনী—যাহার নামান্তর কচ্চায়নসার-অভিনবটীকা। ইহার প্রণেতা পেগানের সদ্ধম্মবিলাস। আর এক টীকার নাম যোজনা। কচ্চায়নসারবিবরণ, কচ্চায়নসারনিস্‌সয় প্রভৃতি নামেও টীকা ছিল।

কচ্চায়নবণ্ণনা—কচ্চায়নব্যাকরণের সন্ধিকপ্পের উপর রচিত ; রচয়িতার নাম থের মহাবিজিতাবী, রচনাকাল খ্রীঃ ১৭শ শতক, রচনাস্থান ব্রহ্মদেশ। এই গ্রন্থে কচ্চায়ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বৈয়াকরণদের মতামতের দোষগুণ বিচার করা হইয়াছে। এই গ্রন্থকারের অপর রচনা 'বাচকোপদেস' গদ্যপদ্যাত্মক। এই গ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্রীয় পরিপ্রেক্ষায় পালিব্যাকরণের বিষয়গুলি বিবেচিত হইয়াছে। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহার এক টীকা রচিত হয়। সন্ধিকপ্পের টীকা যোজনা বা সন্ধিরূপদীপনী। সন্ধিকপ্পকে সুসন্ধিকপ্পও বলা হয় এবং ইহার ভিত্তিতেই কচ্চায়নব্যাকরণ বা কচ্চায়নগন্ধ বা কচ্চায়নপ্পকরণ রচিত বলিয়া কথিত। কচ্চায়নপ্পকরণের এক টীকার নাম গন্ধমরণ (?)। রূপসিদ্ধির প্রারম্ভে 'কচ্চায়নবণ্ণনা' নামে আর এক প্রাচীনতর গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

কচ্চায়নভেদমঞ্জুসা—থের সীলবংস-রচিত। কচ্চায়নভেদপাঠ, কচ্চায়নভেদনিস্‌সয়, কচ্চায়নভেদদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থনামও দৃষ্ট হয়। কচ্চায়নভেদপ্পকরণ—কচ্চায়নভেদেরই নামান্তর। কচ্চায়নব্যাকরণের প্রারম্ভিক শ্লোকদ্বয়ের উপর রচিত 'কচ্চায়নবণ্ণনা চক্‌কক্যন' নামক গ্রন্থ। বিশুদ্ধাচার নামক জনৈক বৌদ্ধ পণ্ডিত ইহার রচয়িতা। তাঁহার অপর গ্রন্থ ধাত্বত্থসংগ্রহ। ইহাতে পালিভাষার ধাতুগুলিকে বর্ণানুক্রমে তালিকাভুক্ত করিয়া অর্থসহ দেখানো হইয়াছে শ্লোকের মাধ্যমে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়।

এই সম্প্রদায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'সম্বন্ধচিন্তা' রচিত হয় ১২শ শতকে সিংহলে সংঘরক্‌খিত-কর্তৃক। পেগানের থের অভয় ইহার টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার অপর গ্রন্থ 'মহাটীকা' যেই 'সদ্দত্থভেদচিন্তা'র উপর রচিত, তাহার প্রণেতা সদ্ধম্মসিরি খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীয় এবং ব্রহ্মের অরিমদ্দনের অধিবাসী। থের অভয়ও তাঁহার সমকালীন।

সদ্দত্থভেদচিন্তা—অংশতঃ কচ্চায়নের ব্যাকরণ এবং অংশতঃ সংস্কৃতব্যাকরণের ভিত্তিতে রচিত। এক মতে ইহার রচনাকাল খ্রীঃ ১২শ শতকের শেষভাগ। ইহাও পদ্যময়। সদ্দত্থভেদচিন্তানিস্‌সয় বোধ হয় ঐ মহাটীকারই নাম।

ব্রহ্মের অরিমদ্দনের রাজা ক্যচ্চা (বা কোচ্চ্যা বা ক্যস্ব) স্বয়ং এবং মতান্তরে তাঁহার গুরু, কচ্চায়নের ভিত্তিতে সদ্দবিন্দু এবং পরমত্থবিন্দু নামক দুই ব্যাকরণগ্রন্থ প্রস্তুত করেন। প্রথমটির পরিমাণ মাত্র ২০টি কারিকা ; ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রচিত হয়। তাঁহার কন্যাও বিভত্তত্থপ্পকরণ নামে ৩৭টি শ্লোকে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই জাতীয় আর এক পুস্তক 'বিভত্তিকথাবণ্ণনা'। সদ্দবিন্দুর টীকা 'লীনত্থবিসোধনী' বা 'লীনত্থসূদনী' প্রণীত হয় পেগানের নাণবিলাস-কর্তৃক খ্রীঃ ১৬শ শতকের শেষ ভাগে। অপরটীকা 'সদ্দবিন্দু বিনিচ্ছিয়' প্রণয়ন করেন সিরি সদ্ধম্মকিত্তি মহাফুস্‌সদেব। পরমত্থবিন্দুর এক টীকা পেগানে থের মহাকস্‌সপ-কর্তৃক রচিত। বিভত্তত্থপ্পকরণের টীকা 'বিভত্তত্থদীপনী'। কচ্চায়নের রচনা বলিয়া কথিত চুল্লনিরুত্তির উপর অভিনবচুল্লনিরুত্তি রচনা করেন সিরি সদ্ধম্মালংকার। ইহাতে কচ্চায়নসূত্রাবলীর ব্যতিক্রমবিষয়ক পর্যালোচনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অপর দুই টীকা চুল্লসন্ধিবিসোধন এবং চুল্লনিরুত্তিমঞ্জুসা।

কচ্চায়ন ধাতুমঞ্জুসা—থের সীলবংস-রচিত, কচ্চায়নব্যাকরণানুসারী পদ্যবন্ধ ধাতুপাঠ। এই রচনায় পাণিনীয় ধাতুপাঠ তথা বোপদেবকৃত কবিকল্পদ্রুমের প্রভাব পড়িয়াছে। শ্লোকসংখ্যা ১৫০। সীলবংস ছিলেন সিংহলের কুরুঙ্গলের (Karunegala) নিকটবর্তী যকখদ্দিলেন (বর্তমান যক্ দেস্সাগল) বিহারের ভিক্ষু। ধাতুমঞ্জুসার ব্যাখ্যাগ্রন্থও আছে। ১৮৭২ খ্রীঃ কলম্বোতে দেবরকখিতের সম্পাদনায় এই ধাতুপাঠ প্রকাশিত হয়।

ব্রহ্মের রাজা কিত্তিসীহসূরের পোষকতায় নাগিত বা খণ্টকখিপ নাগিত ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সদ্দসারত্থজালিনী নামে ৫১৬ শ্লোকাত্মক এক পালিব্যাকরণ রচনা করেন। বিষয়বিন্যাস কচ্চায়নব্যাকরণের ন্যায়। ব্যাকরণের দার্শনিক পর্যালোচনা ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার এক টীকার নাম সারমঞ্জুসা, আর এক টীকা রচনা করেন পেগানের বেপুল্লবুদ্ধি।

খ্রীঃ ১৬৫৬ নাগাদ সদ্ধম্মপাল বা সদ্ধম্মগুরু-কর্তৃক সদ্দবুত্তি (শব্দবৃত্তি) বা সদ্দবুত্তিপকাসক পেগানে (?) রচিত হয়। তাঁহার আর এক গ্রন্থ 'নিরুত্তিসারমঞ্জুসা'। ইহা কচ্চায়নে আরোপিত নিরুত্তির টীকা। সদ্দবুত্তির এক টীকাকার সারিপুত্ত বা সারিপুত্তর। আর এক টীকাকারের নাম জাগর। সদ্দবুত্তিবিবরণ নামেও এক টীকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পেগানে রচিত 'সম্বন্ধমালিনী-ও ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ। এই পেগানেই খ্রীঃ ১৪শ শতকে মঙ্গল-কর্তৃক 'গন্ধত্থি' বা 'গন্ধট্ঠি' নামে আর এক ব্যাকরণবিষয়ক গ্রন্থ প্রণীত হয়। এই শতকেরই প্রথম ভাগে সদ্ধম্মঞান 'বিভত্তত্থ' রচনা করেন। ইনি অন্যান্য অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। পালি ভাষায় কাতন্ত্রব্যাকরণের অনুবাদও করেন ইনি।

আর এক পালিব্যাকরণ মুখমত্তসার। সাগর বা গুণসাগর ইহার প্রণেতা। রাজা ক্যচ্বার গুরু সংঘরাজের অনুরোধে সাগর স্বয়ং ইহার এক টীকাও রচনা করেন। গন্ধাভরণ (বা গন্থাভরণ বা গণ্ডাভরণ) অরিয়বংস-রচিত ব্যাকরণ। ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত হয়। অরিয়বংস পেগানের অধিবাসী এবং ছপটশাখাভুক্ত। পণ্ডিত থের য়েদিন ছিলেন তাঁহার বিদ্যাগুরু। গন্ধাভরণের এক টীকা আছে। ব্রহ্মের সুবণ্ণরাসি ১৫৮৪ খ্রীঃ নাগাদ ইহা রচনা করেন। অরিয়বংসের ছাত্র সদ্ধম্মকিত্তি ১৪৬৫ খ্রীঃ পালি 'একাক্খর কোস' প্রস্তুত করেন।

খ্রীঃ ১৭শ শতকে থের জম্বুধজ বা জম্বুদীপধজ 'নিরুত্তিসংগহ' এবং 'সর্বজ্ঞানন্যায়দীপনী' রচনা করেন। প্রথমটি ব্যাকরণ এবং দ্বিতীয়টি ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থ। ইহাকে 'সর্বজ্ঞন্যায়দীপনী'ও বলা হয়। রূপভেদ-পকাসনী এবং 'সংবণ্ণনানয়দীপনী' (১৬৫১ খ্রীঃ) নামে আরও দুই গ্রন্থ তাঁহার নামে পাওয়া যায়। শেষোক্তটিরই সংস্কৃতরূপ বোধ হয় পূর্বোক্ত সর্বজ্ঞানন্যায়দীপনী।

জগরভিধজ-রচিত নবনিয়মদীপনী এবং সদ্দমেধনী ১৯শ শতকের শেষভাগের গ্রন্থ। প্রথমটিতে ২৫৪টি সূত্রে পালিব্যাকরণ এবং দ্বিতীয়টিতে পালিব্যাকরণের বিভিন্ন সংজ্ঞা আলোচিত হইয়াছে। আধুনিক যুগে পণ্ডিত ভিক্ষু লেদি হ্সয়দ (Ledi Hsayadaw)-রচিত নিরুত্তিদীপনী এবং সদ্দসংখেপ, তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের সহিত রেঙ্গুনে ১৯০৫ ও ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। দুইটিই পালিব্যাকরণ। দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। এই সবই অল্প-বিস্তর কচ্চায়নব্যাকরণের উপর নির্ভরশীল।

(৩)

মোগ্গল্লান ব্যাকরণের রচয়িতা বৌদ্ধগুরু মৌদ্গল্যায়ন। মোগ্গল্লায়নও বলা হয়। এই ব্যাকরণের নামান্তর 'সদ্দলক্খণ'। সিংহলের অনুরাধাপুরে থুপারাম বিহারে সংঘরাজ বা প্রধানপুরোহিতের পদে (খ্রীঃ ১২শ শতক) অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। তাঁহার ব্যাকরণের সূত্রসংখ্যা মোট ৮১০ (কোথাও ৮১৭)। বিষয়বিন্যাসে কচ্চায়নের সহিত পার্থক্য রহিয়াছে। ইহার প্রথমে সন্ধি, পরে সি-আদি, সমাস, নাদি, খাদি ও ত্যাদি এই ছয়ভাগ। ইহার বৃত্তি ও তদুপরি 'পঞ্চিকা' অর্থাৎ মোগ্গল্লান-পঞ্চিকা নামে টীকা (বা পঞ্জিকা)ও তাঁহারই রচনা। মূলগ্রন্থের সহিত গণপাঠ, ধাতুপাঠ এবং উণাদিসূত্রবৃত্তি পরিশিষ্টরূপে যুক্ত। গ্রন্থশেষে বলা হইয়াছে : 'সুত্তধাতুগণোন্বাদিনামলিঙ্গানুশাসনং। যস্স তিট্ঠতি জিহ্বগ্গে সো ব্যাকরণকেসরী।।' ইহা সংস্কৃত শ্লোকের পালিরূপ।

প্রভাবের দিক্ দিয়া এই ব্যাকরণ পাণিনি, কাতন্ত্র এবং চান্দ্রব্যাকরণের অনুগত। কচ্চায়নের তুলনায় ইহা সমধিক উন্নত। ইহাতে পালিভাষাগত উপাদানসমূহের অধিকতর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এবং ভাষার

প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ব্যাপকতর পর্যবেক্ষণ বর্তমান। তথাপি ইহাও ব্যাকরণের পূর্বকথিত 'মামুলি' দোষ হইতে মুক্ত নয়। সংজ্ঞাব্যবহারেও কচ্চায়নের সহিত এই ব্যাকরণের পার্থক্য রহিয়াছে। অমরকোষের অনুকরণে রচিত বিখ্যাত পালিশব্দকোষ 'অভিধানপ্পদীপিকা'র সংকলয়িতাও মোগ্‌গল্লায়ন। তবে বৈয়াকরণ মোগ্‌গল্লায়নই কোষকার কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। কোষকার ছিলেন পুলথিপুরের জেতবন বিহারের ভিক্ষু। দুই জন একই সময়ে বর্তমান ছিলেন এবং উভয়েই লঙ্কাধিপতি ১ম পরাক্রমবাহুর (১১৫৩-৮৬ খ্রীঃ) উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১২০৩ শ্লোকে নিবদ্ধ ঐ অভিধানে পর্যায়, নানার্থ এবং অব্যয় এই তিন ভাগ। খ্রীঃ ১৪শ শতকের মধ্য ভাগে ইহার টীকা রচিত হয়।

'পদসাধন'—মোগ্গল্লানব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত রূপ। ইহা পূর্বোক্ত বালাবতারের আদর্শে মোগ্‌গল্লান-শিষ্য পিয়দস্‌সী-কর্তৃক রচিত। পদসাধনের টীকা 'বুদ্ধিপ্পসাদনী' প্রণয়ন করেন ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিখগামের থের শ্রীরাহুল। ইনি বাচিস্‌সর উপাধিযুক্ত এবং সিংহলী সাহিত্যে পরিচিত। কচ্চায়নব্যাকরণের রূপসিদ্ধির মতো, এই সম্প্রদায়ের 'পয়োগসিদ্ধি' ; ইহার রচয়িতা বনরত্নমেধঙ্কর খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীয়। পূর্বোক্ত পরাক্রমবাহুর পুত্র ভুবনেকবাহুর রাজ্যকালে তিনি বর্তমান ছিলেন। পূর্বোক্ত রাহুল-কর্তৃক আংশিক পালি এবং আংশিক সিংহলী ভাষায় প্রণীত 'মোগ্‌গল্লানপঞ্চিকাপদীপ'—মোগ্‌গল্লানকৃত অধুনালুপ্ত পঞ্চিকার টীকা। ইহা পালিব্যাকরণ-বিষয়ক সর্বাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এই গ্রন্থে কমপক্ষে ৫০টি ব্যাকরণ গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। বাচিস্‌সরের মতো 'ষড়্‌ভাষাপরমেশ্বর'ও তাঁহার আর এক উপাধি। এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ সংঘরাজ সারিপুত্তকৃত পদাবতার, সংঘরাজ সংঘরক্‌খিত মহাথের-রচিত সুসদ্দসিদ্ধি, অজ্ঞাত-কর্তৃক গদ্যগ্রন্থ ধাতুপাঠ ; হিন্দীভাষায় ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ-রচিত পালিমহাব্যাকরণ। ৬ কাণ্ডে এবং ৩৩ পাঠে নিবদ্ধ এই গ্রন্থ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ কৌমুদীজাতীয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মহাবোধিসভা, সারনাথ, বনারস হইতে ইহা সর্বপ্রথম মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থশেষে পরিশিষ্টভাগে মোগ্‌গল্লান সূত্রপাঠ, ধাতুপাঠ, গণপাঠ, সমাস-স্ত্রীপ্রত্যয়-সমাসান্ততদ্ধিত, কৃদন্তপ্রত্যয়াদি এবং উণাদি-সিদ্ধ-শব্দতালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

(৪)

পালি ব্যাকরণের প্রধান ত্রিধারার মধ্যে 'সদ্দনীতি' (শব্দনীতি) সবিশেষ উন্নত এবং বিস্তৃত। বিষয়বস্তুর দিক্ দিয়া ইহা সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ। ব্রহ্মদেশের পেগানে ইহার অভ্যুদয়। ১১৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাথের অগ্গবংস বা অগ্গপণ্ডিত ত্রিপিটকের 'সদ্দনীতি' নামে এই ব্যাকরণ রচনা করেন। পেগানের রাজা নরপতি সিথুর (১১৬৭-১২০২) শিক্ষক ছিলেন এই অগ্রপণ্ডিত (Aggapandita III of Burma)। ব্যাকরণ রচনার কয়েক বৎসর পরে থের উত্তরাজীব ইহার কথা সিংহলে প্রচার করেন।

সদ্দনীতির সূত্রসংখ্যা মোট ১৩৯১। সর্বমোট ২৭ পরিচ্ছেদ। প্রথম ১-১৮ পরিচ্ছেদ এবং পরবর্তী ৯ পরিচ্ছেদ যথাক্রমে মহাসদ্দনীতি এবং চুল্লসদ্দনীতি নামে অভিহিত। তা'ছাড়া, পদমালা, ধাতুমালা ও সুত্তমালা—এই তিনটি বিভাগ এই ব্যাকরণের। কচ্চায়ন সম্প্রদায়ের গ্রন্থ-ভিত্তিতে রচিত হইলেও, ভাষা ও রচনাশৈলীর মৌলিকতায় ইহা এক নূতন শাখাসম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। উত্তরাজীবের নিকট শুনিয়া সিংহলের কয়েকজন পণ্ডিত ব্রহ্মদেশে আসিয়া তাঁহার কথার সত্যতা পরীক্ষা করেন এবং বুঝিতে পারেন যে, বাস্তবিক সদ্দনীতির মতো ব্যাকরণ তখন সিংহলে ছিল না। মোগ্গল্লানব্যাকরণ ইহার পরে রচিত বলিয়া অনুমিত। সদ্দনীতিতেও পাণিনিপ্রভৃতির উপাদান ব্যবহৃত হইয়াছে। সদ্দনীতিপকরণ, সদ্দনীতি নিস্সয় এবং ধাত্বত্থদীপনী—এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থে, সদ্দনীতির ধাতুমালা-ভাগে বর্ণিত ধাতুসমূহ, শ্লোকবদ্ধভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার প্রণেতা বর্মী ভিক্ষু হিঙ্গুলবল জিনরতন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বোতে অরুগড় সীলানন্দ থের-কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া 'মহাসদ্দনীতি' প্রকাশিত হয় [The Mahasaddaniti—an advanced grammar of the Pali language by Aggavamsa mahathera (Aggapandita III of Burma) revised and edited by Aruggda Seelananda Thera, Colombo 1909]। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের অক্স্ফোর্ড (?) হইতে Helmer Smith[১]-এর সম্পাদনায় রোমান হরফে ইহার আর এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে (Saddaniti ; la grammaire Palie d' Aggavamsa, par Helmer Smith, 3 parts, Lund 1928, 1929, 1930)।

পালিভাষার অন্যান্য ব্যাকরণগ্রন্থ ঃ লিঙ্গত্থবিবরণ—সুভূতচন্দন-রচিত ; ইহার দুই টীকা 'লিঙ্গত্থবিবরণপ্পকাস' এবং 'লিঙ্গত্থবিবরণটীকা' যথাক্রমে ঞাণসাগর ও উত্তমের রচনা ; আর এক টীকা 'লিঙ্গত্থ বিবরণ বিনিচ্ছয়' অজ্ঞাত-কর্তৃক। বাচবাচক বা বচ্চবাচক—ইহার রচয়িতা সামনের ধম্মদস্সী। ইনি ব্রহ্মের অরিমদ্দনের (Pagan) অধিবাসী। বচ্চবাচক ১০০ শ্লোকের সমষ্টি এবং সম্ভবতঃ খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীয়। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ব্রহ্মের ক্ষেমাবতার বিহারের ভিক্ষু সদ্ধম্মনন্দী ইহার এক টীকা রচনা করেন। বচ্চবাচকটীকা, বচ্চবাচকবণ্ণনা এবং বচ্চবাচকদীপনী—ইহার ব্যাখ্যাপুস্তক। পদাবহামহাচকক, গাদি (মোগ্গল্লান)—মোগ্গল্লানব্যাকরণের ভিত্তিতে সংঘরক্খিত-প্রণীত লিঙ্গবিষয়ক গ্রন্থ, কটচা (কৃৎচক্র?), মহাকা-(কপ্প বা কচ্চায়ন?), বালত্তজন (?), অক্খর সম্মোহচ্ছেদনী—ইহা শব্দের তথা অক্ষরের (Syllables) বিশ্লেষণমূলক পুস্তক, অক্খরভাবনী, অক্খরমালা, অক্খরবণ্ণনটীকা, পঞ্ঞাসামীর অক্খরবিসোধনী, সমাসতদ্ধিতদীপনী, বালপ্পবোধন, ইহার টীকা বালপ্পবোধনপ্রভত্তিকরণ, পকিন্নকনিকায়, সদ্দকলিকা, সদ্দবিনিচ্ছিয়, সুধীরমুখমণ্ডন, গূলত্থদীপনী, নয়লক্খণবিভাবনী, কারকপুপ্ফমঞ্জরী প্রভৃতি পালিব্যাকরণসংক্রান্তগ্রন্থ। অক্খরমালার রচয়িতা সিংহলী নাগসেন খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীয়। ইহা পালি-সিংহলী অক্ষরমালা। অক্ষরবণ্ণনটীকার মূল পালিভাষায় এবং টীকা বর্মীভাষায় লিখিত। কারকপুপ্ফমঞ্জরীর প্রণেতা কাণ্ডির (Kandy) অত্তরাগম বণ্ডার রাজগুরু। ব্রহ্মের রাজা কীর্তিশ্রীরাজসিংহের (১৭৪৭-৮০ খ্রীঃ) রাজ্যকালে ইহা রচিত হয়। রাজগুরুর অপর গ্রন্থ সুধীরমুখমণ্ডন পালিসমাসবিষয়ক। অজ্ঞাত-কর্তৃক বালপ্পবোধনের রচনাকাল ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ ; ইহার টীকাকারের নামও জানা যায় নাই। নয়লক্খণবিভাবনী রচিত হয় ১৮শ শতকের শেষার্ধে, রচয়িতা ব্রহ্মের ভিক্ষু বিচিত্তাচার। চুল্লবুদ্ধ বা চুল্লবিমলবুদ্ধি বা চুল্লবজিরবুদ্ধির নামে এক অত্থব্যাখ্যান বা অত্থব্যাখ্যা পুস্তকের নামমাত্র সন্ধান পাওয়া যায়।

এইসব গ্রন্থের অধিক সংখ্যকই ব্রহ্মদেশে রচিত। ইহা একটি লক্ষণীয় বিষয়। ভারত হইতে বিতাড়িত বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান আশ্রয়স্থল হয় পূর্বে ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণে সিংহল। ইহাদের প্রাচীন নাম যথাক্রমে সুবর্ণদ্বীপ এবং তাম্রদ্বীপ।[২] বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

(৯৮০–১০৫৩ খ্রীঃ) সুবর্ণদ্বীপে (= Thaton-এ) গিয়া আচার্য চন্দ্রকীর্তির নিকট ১২ বৎসর বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পালিব্যাকরণের তিন স্তম্ভ কচ্চায়ন, সদ্দনীতি এবং মোগ্‌গল্লান—যথাক্রমে ভারত, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলের অবদান। উত্তরে তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে এই ধরনের মৌলিক গ্রন্থ খুব কমই রচিত হইয়াছে ; সেখানে ভারতীয় গ্রন্থরাজির ভাষান্তরিত রূপেরই সমধিক প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। পূর্বোক্ত গ্রন্থাবলীর অনেক নামই ব্রহ্মদেশের ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দীয় উৎকীর্ণ লিপি হইতে সংগৃহীত।৩

(৫)

আধুনিক যুগে বাংলা, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় অনেক পালিব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। ইহাদের নিজস্ব মৌলিকতা প্রায় কিছুই নাই বলা চলে। সবই প্রাচীন গ্রন্থের অবলম্বনে সহজে পালিভাষা শিক্ষার উপযোগী করিয়া রচিত। বাংলা ভাষায় রচিত পালিব্যাকরণসমূহের মধ্যে বিধুশেখর শাস্ত্রীর (১২৮৫-১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) পালিপ্রকাশ (কলিকাতা ১৩১৮, ২য় মুদ্রণ ১৩৫৮) সবিশেষ উল্লেখ্য। ইহার ৭টি বিভাগ ক্রমান্বয়ে ঃ সাধারণকল্প, সন্ধিকল্প, নামকল্প, আখ্যাতকল্প, সঙ্কীর্ণকল্প, পালিপাঠাবলী এবং শব্দকোষ। এই জাতীয় তাহার অপরগ্রন্থ ভোটপ্রকাশ। বহু গ্রন্থের রচয়িতা শাস্ত্রিমহাশয়ের জন্ম মালদহ জিলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামে (রাঢ়ীশ্রেণীয় ভট্টাচার্য বংশে) হইলেও তাহার প্রধান শিক্ষাস্থল কাশী এবং কর্মস্থল শান্তিনিকেতন—বিশ্বভারতী। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বো হইতে প্রকাশিত Rev. Benjamin Clough-রচিত 'A Compendious Pali Grammar with a copious Vocabulary in the same Language' নামক গ্রন্থই বোধ হয় ইউরোপীয় ভাষায় রচিত প্রথম পালি ব্যাকরণ। ফরাসী পণ্ডিত Eugene Burnouf (1801-52) নরওয়ের Christian Lassen (1800-76)-এর সঙ্গে একত্রে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস হইতে Essai sur le Pali নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং পরবৎসর সেখান হইতেই বুর্নুফের 'Observations grammaticales sur quelques passages de l'Essai sur le Pali de Burnouf et Lassen' প্রকাশিত হয়। তিনি প্রমাণ

করেন যে সিংহল, ব্রহ্ম এবং শ্যামদেশের (থাইল্যাণ্ড) ধর্মশাস্ত্রে ব্যবহৃত পালিভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। তিনি একটি পালিব্যাকরণ এবং পালি অভিধানও রচনা করেন। তৎপ্রণীত 'Introduction a l'Histoire du Bouddhisme Indien' (Paris 1844) গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের কাল সঠিক নিরূপিত হইয়াছে। প্যারিসের College de France-এর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন এই বুর্নুফ্‌সাহেব। মাত্র ২২ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার ঐ Essay on Pali রচনা করেন। বেদ, ভাগবত এবং ইরানী ভাষার উপরেও তাঁহার গ্রন্থাদি আছে। পাশ্চাত্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ সর্বপ্রথম ঐ College de France-এই (১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে) স্থাপিত হয় এবং এই পদের প্রথম অধ্যাপক A.L.Chezy-র পরে, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বুর্নুফ্‌ এই পদে বৃত হইয়া আমৃত্যু অধিষ্ঠিত থাকেন। বিখ্যাত প্রাচ্যপ্রেমী পণ্ডিত ম্যাক্স্‌ মূলার ছিলেন তাঁহার অন্যতম ছাত্র। জার্মানির বন (Bonn) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক A. W. Schlegel-এর ছাত্র Lassen, পরে গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হন। ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁহাকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়। প্রাকৃতের উপরে তাঁহার গ্রন্থের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার আর এক গ্রন্থ Anthlogia Sanscritica glossario instructa, Bonnae, 1838.

ইহার পরে উল্লেখ্য গ্রন্থ Buddhism : its origin ; history ; and doctrines : Scriptures ; and their Language, the Pali, Colombo, 1832, by James D'Alwis ; তাঁহার 'An Introduction to Kachchayana's grammar of the Pali language' যুগপৎ কলম্বো এবং লণ্ডন হইতে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (পৃঃ i—cxxxvi পর্যন্ত Introduction, পৃঃ ১-১২৮ কচ্চায়নের ব্যাকরণ এবং পরে আবার i-xvi পৃঃ পর্যন্ত Pali-text)। ইহার পরে নাম করিতে হয় জার্মান পণ্ডিত Dr.Fr. Muller (1834-98)-এর 'Beitrage zur Kenntnis der Pali sprache' নামক গ্রন্থের, যাহা Wien হইতে ক্রমান্বয়ে তিন খণ্ডে ১৮৬৭, ১৮৬৮, এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্যারিসে কচ্চায়ন ব্যাকরণের ফরাসী অনুবাদ (Kaccayana et la Litterature Grammaticale du Pali. Ire Partie. Grammaire Palie de Kaccayana, Sutras et commentaire, publies avee une tradution

et des notes par E. Senart, Paris, 1871) প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ; অনুবাদক Emile Charles Marie Senart (1847-1928)। প্রথমে ইহা সেখানকার Journal Asiatique (Mars—Avril, Mai—Juin, 1871)-এ প্রকাশিত হইয়াছিল 'Kaccayanappakaranam' নামে। তৎপূর্বে ব্রহ্মদেশের টোঙ্গুতে ফ্রান্সিস্ ম্যাসন্ কচ্চায়নের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে (Kachchayano's Pali grammar, translated and arranged on European models by Francis Mason, Toungoo, 1868)। তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় The Pali text of Kachchayano's Grammar, Toungoo, 1870.

প্রাচ্যবিদ্যাপ্রেমিক রাশিয়ান পণ্ডিত Ivan Pavlovich Minayeff (1840-90)-কর্তৃক রুশ ভাষায় রচিত 'Ocherk fonetiki i morfologie yazika Pali' (Essays on the Phonetics and Morphology of the Pali Language) গ্রন্থ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে St. Petersburg (বর্তমান লেনিনগ্রাড) হইতে প্রকাশিত হয়। বুদ্ধপ্রিয় দীপঙ্কর-প্রণীত পালিব্যাকরণ রূপসিদ্ধির উপাদানের ভিত্তিতে মিনায়েফ্ তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার M. Stanislas Guard-কৃত ফরাসী অনুবাদ Grammaire Palie, Esquisse d'une Phonetique et d'une morphologie de la langue Pali প্যারিসে প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই অনুবাদের ভিত্তিতে Charles George Adams উহার যে ইংরেজী অনুবাদ প্রস্তুত করেন, তাহা 'Pali Grammar, A phonutic and Morphological sketch of the Pali Language with an Introductory Essay on its form and character' নামে রেঙ্গুন হইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ পায়। মিনায়েফ্ জার্মেনিতে Weber এবং Benfey-র নিকট সংস্কৃতে শিক্ষালাভের পর, লণ্ডন ব্রিটিশ মিউজিয়মে এবং প্যারিস জাতীয় গ্রন্থাগারে কিছুকাল কাজ করেন এবং শেষে পিটার্স্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্যের রীডার এবং পরে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর তুলনামূলক ব্যাকরণবিভাগের রীডার এবং অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পূর্বোক্ত গ্রন্থ লিখিয়া তিনি সেখান হইতে ডক্টরেট্ উপাধি লাভ করেন। তিন বার (১৮৭৪-৭৫, ১৮৮০,১৮৮৫-৮৬) তিনি ভারত ভ্রমণে আসেন, প্রথম বারে সিংহলে ও নেপালে এবং তৃতীয় বারে ব্রহ্মদেশেও যান। পিটার্স্‌বার্গেই ৫০ বৎসর বয়সে

যক্ষ্মারোগে চিরকুমার এই অধ্যাপকের জীবনাবসান হয়। ভারতীয় ইতিহাস (?) এবং বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির উপরেও রুশভাষায় তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত বিষয়ে পিটার্সবার্গে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহার ইংরেজী অনুবাদ 'Buddhism : Investigations and Materials' এবং ফরাসী অনুবাদ 'Recherches sur le Buddhisme' (traduit du Russe par R. H. Assier de Pompignan, Paris 1894)। সংস্কৃত ব্যাকরণেও তাঁহার গ্রন্থ আছে—'Declensions and conjugations of Sanskrit grammar' (Original in Russian and published in 1889 in lithograph)।

Namamala or a work on Pali Grammar by Waskadwe Subhuti, Ceylon, 1871 ; তাঁহার সম্পাদনায় অভিধানপ্পদীপিকা (ইংরেজী ও সিংহলী ব্যাখ্যা সহ) কলম্বো হইতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ; ভদন্ত সরণঙ্কর সংঘরাজকৃত 'রূপমালা বণ্ণনা' ; Pali Miscellany (Vol. I), London, 1879 by V. Trenckner; Beitrage zur Pali Grammatik (by) Ernst Kuhn, Berlin, 1875 ; Die Flexion des Pali in ihrem verhaltnis zum Sanskrit (by) A. Torp Christiania, 1881 ; Hand book of Pali by O. Frankfurter, London and Edinburg, 1883 ; A Simplified Grammar of the Pali Language by Eduard Muller, London, 1884 ; তাঁহার লেখা নিবন্ধ 'A Glossary of Pali Proper Names' প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে Journal of the Pali Text Society (JPTS)তে ; Precis de Grammaire Palie, accompagne d'un choix de textes gradues (by) Victor Henry, Paris, 1894 ; Pali Grammar by Henry H. Tilbe (1859-1935), Rangoon, 1899 ; তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ—Pali First Lessons, Rangoon, 1902 এবং Pali Buddhism, Rangoon, 1900 ; A Grammar of the Pali Language by Tha Do Oung, Akyab, 1899-1902 ; চারিখণ্ডে বিভক্ত ইহা এক বিরাট গ্রন্থ ; ১ম খণ্ডে সন্ধি, নাম, কারক ও সমাস, ২য় খণ্ডে তদ্ধিত, কৃৎ, উণাদি, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, ৩য় খণ্ডে পালিশব্দকোষ এবং ৪র্থ খণ্ডে ছন্দোঽলঙ্কার এবং শব্দব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে ; ধাত্বত্থদীপক (পালিপদ্যে

পালিধাতুসমূহের অর্থবর্ণনা)—অগ্‌গ ধম্মালঙ্কার-কর্তৃক বর্মীভাষায় রচিত এই গ্রন্থ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুনে প্রকাশিত হয় ; A Pali Chrestomathy, with notes and glossary giving Sanskrit and Chinese equivalents by J. Takakusu, Tokyo, 1900 ; 'খাদি-মোগ্‌গল্লান'-সংঘরক্‌খিতের এই গ্রন্থ বর্মী টীকাসহ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুনে প্রকাশিত ; A Pali Reader with Notes and Glossary (in two parts) by Dines Andersen, Copenhagen, London and Leipzig, 1901; Pali und Sanskrit in ihrem historischen und geographischen Verhaltnis auf Grund der Inschriften und Munzen dargest (by) R.O.Franke, Strassburg, 1902 ; তাঁহার সম্পাদিত ও প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ ঃ Pali Grammatik und Lexikographie (Strassburg, 1902), পালিনামমালা (Ceylon, 1871), সটীক এবং সানুবাদ (জার্মান) হৈম লিঙ্গানুশাসন (Gottingen, 1886), শাকটায়ন-হর্ষবর্ধন-বররুচির লিঙ্গানুশাসন (যক্ষবর্মার এবং শবরস্বামীর টীকাদ্বয়ের অংশবিশেষসহ) (Kiel, 1890) এবং সটীক ও সানুবাদ (জার্মান) সর্বসম্মতশিক্ষা (Gottingen, 1886) ; James Gray-রচিত প্রাথমিক পালিব্যাকরণ Elementary Pali Grammar or First Pali Course, Calcutta 1904, এবং ঐ Second Pali Course, Calcutta 1905 এবং First Pali selectus or companion Reader to the Pali course, Calcutta 1905 ; রেঙ্গুনে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বর্মীটীকাসহ মহারূপসিদ্ধি ; A practical grammar of the Pali language by Charles Duroiselle, Rangoon, 1906 ; Uber den sprachlichen charakter des Pali (by) E. Windisch, Paris, 1906 ; Pali-miszellen (by) Karl Ferdinand Johansson (1860-1926), Breslau, 1911 ; Elementar Grammatik der Pali Sprache (by) K. Seidenstucker, Leipzig, 1916 ; শ্রীবুদ্ধদত্ত স্থবির রচিত The New Pali Course (Part-I), Colombo, 1937 ; তাঁহার অন্য গ্রন্থ—The Higher Pali Course for advanced students, Colombo, 1951 এবং A Concise Pali-English Dictionary, Colombo, 2nd edn., 1957 ; Reader of the Pali language by K. Mizuno, Tokyo, 1956 ; A Manual of Pali by C. V. Joshi ; Introduction

to Pali by A. Kennedy Warder, London, 1963 ; কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Anomadarshi Barua (Bhikshu)-রচিত এবং ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচ্যভারতীপ্রকাশন, বারাণসী হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ Introduction to Pali ; ইহার ভিত্তি কচ্চায়নের ব্যাকরণ।

'Every language has numerous dialects ; what may not be correct in the standard or "learned" speech, may be quite acceptable in a "vulgar" dialect.And what is vulgar to-day may become perfectly "correct" to-morrow. ...Words and forms and phrases which are not recognised by our grammatical text books, may find a place in standard grammars of the future if only a great and popular writer once uses them. In short, there is nothing "ungrammatical" in language, only some forms and constructions are "unrecognised" till some great person uses them.'—I. J. S. Taraporewala.

'Helmer Smith is a great Pali scholar, the animator and chief collaborator of the Critical Pali Dictionary, Copenhagen ; he has compiled Indices, Terminology, Bibliography, Concordances etc. forming the Epilegomena to Vol. I of the Dictionary (1948).'

বর্তমান নাম যথাক্রমে মায়ানমার এবং শ্রীলঙ্কা।

'There are some books of Pali-grammar mentioned in the list copied from the inscription dated 1442 A.D., dedicated on the Order by the Governor of Taungdwin and his wife, and collected by Forchhammer at Pagan.'—Mabel Haynes Bode ('The Pali Literature of Burma', London 1909)

সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দকোষ বা অভিধানের কথা

শব্দের অর্থ নির্দেশ করাই শব্দকোষ বা অভিধানের মুখ্য কর্ম। তাই ইহাকে শব্দার্থশাস্ত্র বা সংক্ষেপে অর্থশাস্ত্রও বলা যাইতে পারে। পূর্বমীমাংসায় ভগবান্ জৈমিনি 'তদর্থশাস্ত্রাৎ' (১।২।৩১) সূত্রে এই অর্থশাস্ত্রের কথাই বলিয়াছেন। সায়ণাচার্যকৃত 'ঋগ্‌বেদভাষ্যোপক্রমণিকা'য় সূত্রটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মন্ত্রার্থবর্ণনাত্মক ব্রাহ্মণবাক্য তথা ব্রাহ্মণকে অর্থশাস্ত্র বলা হইয়াছে। দুর্গাচার্য নিরুক্তের (২।২) বৃত্তিতে নিরুক্ত- ও ব্যাকরণ-বিহিত অর্থসাধনোপায়ের দ্বারা নির্ণীত অর্থের প্রাধান্য সূচনা করিতে এই দুই শাস্ত্রের উদ্দেশে 'অর্থ-লক্ষণ-শাস্ত্র' পদের ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে অর্থশাস্ত্র = নিরুক্ত এবং লক্ষণশাস্ত্র = ব্যাকরণ।

অর্থ বা বক্তব্য বা বক্তার অভিপ্রায় অপরের নিকট ব্যক্ত করা যেমন, অপরের পক্ষে তাহা বুঝিয়া লওয়াও তেমনই এক সমস্যা-বিশেষ। ইহার সমাধানের উদ্দেশ্যেই শব্দবিদ্যা তথা শব্দশাস্ত্রের সৃষ্টি। অর্থশাস্ত্র তাহার একদেশ মাত্র। সামগ্রিক দৃষ্টিতে বৈদিক ষড়ঙ্গেরও উহাই উদ্দেশ্য। স্বর বা ধ্বনি, শব্দ এবং অর্থ এই তিনের সমন্বয়ে শব্দবিদ্যার স্বাভাবিক ক্ষেত্র প্রসারিত হইলেও পরে ইহাদের অবলম্বনে যে পৃথক তিনটি শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারা হইল যথাক্রমে শিক্ষা, ব্যাকরণ ও নিরুক্ত। বেদের পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ-ভাগের মধ্য দিয়াই ইহাদের সূচনা। ব্রাহ্মণ-সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া পরিগণিত ঐ-তরেয় ব্রাহ্মণে, যাস্কীয় নিরুক্তে কথিত বহু রীতি-পদ্ধতির পূর্বাভাস বর্তমান।

শব্দের সহিত অর্থের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের ন্যায়, ব্যাকরণের সহিত নিরুক্তের সম্বন্ধও বড় ঘনিষ্ঠ। ইহাদের একটিকে অপরটির পরিপূরক বলা চলে। প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি নির্দেশের দ্বারা শব্দের সাধুত্ব নির্ণয়ই ব্যাকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও ইহার মূলে শব্দার্থ-নির্ধারণের প্রেরণা বর্তমান। বেদার্থবোধের জন্যই যে ব্যাকরণ প্রভৃতি ষড়ঙ্গের প্রবৃত্তি তাহা আগেই দেখানো হইয়াছে। মহাভাষ্যের পস্‌পশাহ্নিকে পতঞ্জলি :

> রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। লোপাগমবর্ণবিকারজ্ঞো হি সম্যগ্ বেদান্ পরিপালয়িষ্যতি বেদার্থং চাধ্যবসতি। ...অবিজ্ঞাতার্থকং মাধিগীষ্ম হি ইত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।

—অর্থাৎ বেদরক্ষার জন্য ব্যাকরণ অধ্যেয়। লোপাগমবর্ণবিকার-জানা ব্যক্তিই ঠিক ঠিক বেদ পরিপালন করিবেন, কারণ তিনি বেদার্থ জানেন। অর্থ না জানিয়া যাহাতে অধ্যয়ন করিতে না হয়, সেই জন্যই ব্যাকরণ পাঠ আবশ্যক। পতঞ্জলির এই উক্তির দ্বারা ব্যাকরণের অর্থবোধকতা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। যোগদর্শনের ১।২।৩৮ এবং ১।২। ৪৯ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ঋগ্‌ভাষ্যোপক্রমণিকায় সায়ণাচার্য ঃ 'কেষাঞ্চিন্মন্ত্রাণামর্থো বিজ্ঞাতুং ন শক্যতে। ...ননু, ঈদৃশানামর্থবোধায়ৈব নিগম-নিরুক্ত-ব্যাকরণানি প্রবৃত্তানি' এবং 'বিদ্যমান এবার্থঃ প্রমাদালস্যাদিভির্ন জ্ঞায়তে। তেষাং নিগম-নিরুক্তব্যাকরণবশেন ধাতুতোঽর্থঃ পরিকল্পয়িতব্যঃ।' ইহা ছাড়া উক্ত গ্রন্থেই (ঋ. ভা. উপ.) সায়ণ-কর্তৃক ব্যাকরণের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইয়াছে ঃ 'ব্যাকরণমপি প্রকৃতিপ্রত্যয়াদ্যুপদেশেন পদস্বরূপতদর্থ নিশ্চয়ায়-উপযুজ্যতে।' নিরুক্তকার যাস্ক নিরুক্তের উপযোগিতা বর্ণনা করিতে বসিয়া, ইহাকে ব্যাকরণের পূর্ণতা-সাধক বলিয়াছেন ঃ 'অথাপীদমন্তরেণ মন্ত্রেষ্বর্থপ্রত্যয়ো ন বিদ্যতে। অর্থমপ্রতিয়তো নাত্যন্তং স্বরসংস্কারোদ্দেশঃ। তদিদংবিদ্যাস্থানং ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যম্। স্বার্থসাধকঞ্চ।'—নিরুক্ত ১।১৫।। ইহার অর্থ—নিরুক্তশাস্ত্র ভিন্ন বেদমন্ত্রের অর্থবোধ হয় না এবং অর্থবোধ না জন্মিলে স্বর ও সংস্কারের অর্থাৎ মন্ত্রস্থ পদসমূহের উদাত্তাদিস্বর ও ব্যাকরণ-সম্মত ব্যুৎপত্তির নিশ্চিত উদ্দেশ বা নির্ণয় করা যায় না। তাই নিরুক্ত বিদ্যাস্থান বা জ্ঞানলাভের উপায়, ব্যাকরণের সম্পূর্ণতা-সাধক এবং বেদার্থপ্রতিপাদন রূপ স্বার্থেরও সাধক।[১] উদ্ধৃতাংশের ব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য নিরুক্তের জ্ঞান ব্যতিরেকে ব্যাকরণকে 'অপরিসমাপ্ত' বলিয়া পরিশেষে নিরুক্তকে স্বতন্ত্র বিদ্যাস্থানরূপে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

> ব্যাকরণে হি স্বরসংস্কারৌ চিন্ত্যেতে। তস্মাদপরিসমাপ্তমেবতাবদ্ ব্যাকরণং যাবন্নিরুক্তং নাধিগতমিতি।... স্বতন্ত্রমেবেদং বিদ্যাস্থানমর্থনির্বচনম্।

যাস্ক নিরুক্তের অন্যত্র (২।৩) 'নাবৈয়াকরণায়' বলিয়া অবৈয়াকরণের নিকট শব্দের নির্বচন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, নিরুক্তের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তৎপূর্বে ব্যাকরণ-বিদ্যায় নিষ্ণাত হইতে হইবে। আবার 'নানিরুক্তবিদ্‌ব্যাকুর্যাৎ' এইরূপও শুনা যায়, অর্থাৎ কিনা, নিরুক্তের জ্ঞান লাভ না করিয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিবে না অর্থাৎ করিতে চেষ্টা করিবে না। সে যাহাই হউক, নিরুক্তের

কার্য—শব্দের মুখ্য রূপ হইতে অর্থাদেশন। 'অর্থপ্রধানং নিরুক্তম্'— দুর্গবৃত্তি (২।২)।

(২)

আপাতদৃষ্টিতে আগে শব্দ পরে তাহার অর্থ, অথবা শব্দ হইতে অর্থের উৎপত্তি এইরূপ প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই ব্যবহারিক এবং বাহ্যিক দৃষ্টি অভ্রান্ত নয়। আসলে আগে অর্থ, পরে তৎপ্রতিপাদক শব্দ। মহাভাষ্যকার শব্দকে 'অর্থনিমিত্তক' বলিয়াছেন ঃ 'অর্থনিমিত্তক-এব শব্দঃ' (মহাভাষ্য ১।১।১)। ইহার ব্যাখ্যায় কৈয়ট ঃ 'অর্থ এব শব্দস্য প্রযোজকস্তৎপ্রতিপাদনায় শব্দপ্রয়োগঃ।' মানুষ তাহার মনোগত অভিপ্রায় অথবা ভাবকল্পনা প্রকাশ করিতে গিয়া বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে যে বর্ণাত্মক ধ্বনির সৃষ্টি করে তাহাই শব্দ বা শব্দাংশ। কাজেই অর্থবাহকশব্দ, শব্দের বাহক অর্থ নয়। অর্থই শব্দের প্রাণ। প্রাণহীন দেহের ন্যায় অর্থহীন শব্দ অসার, নিরর্থক। শব্দ নাম, অর্থ নামী। তাই পদার্থ বলিলে কোনও বস্তুকে বুঝায়। নিরুক্তে (১।২০) অর্থকে বাক্যের বা কথার পুষ্পফল বলা হইয়াছে ঃ 'অর্থং বাচঃ পুষ্পফলমাহ।' একই অর্থ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়। এমন কোনও শব্দ প্রায় নাই যাহার কোনও অর্থ হয় না, অথচ এমন অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা আত্মিক উপলব্ধি বা অনুভূতি থাকিতে পারে, যাহার শব্দরূপ প্রায় অসম্ভব।[২] কাজেই শব্দের তুলনায় অর্থ ব্যাপকতর। কেবল তাহাই নয়, অর্থ চিরস্থায়ী বা শাশ্বতও। যুগে যুগে অর্থবাচক শব্দের পরিবর্তন ঘটিলেও বাচ্যার্থের স্বরূপতঃ পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নাই। অর্থের এই ব্যাপকতাশ্রয়ী শাশ্বত চরিত্রটিকে অবলম্বন করিয়াই বৈয়াকরণ ক্রমে স্ফোট বা শব্দব্রহ্মের আবিষ্কারের দ্বারা ব্যাকরণকে দর্শনে উন্নীত করিয়াছেন।

শব্দার্থের পারস্পরিক সম্বন্ধকে 'সিদ্ধ', 'নিত্য', 'ঔৎপত্তিক' অথবা 'একই আত্মার দুই পৃথক্‌স্থিত ভেদ'[৩] ইত্যাদি যাহাই বলা হউক না কেন, শব্দার্থের ঐকানুগত্য কিন্তু নিত্য নয়। অর্থাৎ একই শব্দ চিরকাল একই অর্থ প্রকাশ করিতে থাকিবে এমন কথা বলা চলে না। শব্দের একদা-নির্দিষ্ট অর্থও কালক্রমে আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে অন্য শব্দকে আশ্রয় করিতে পারে। কাজেই শব্দের কোনো চিরস্থির নিশ্চিত অর্থ

নাই। আবার একই শব্দের একাধিক অর্থও দৃষ্ট হয়। ইহার মূলে রহিয়াছে দৃষ্টি ও কালের পার্থক্য।[8] একই দৃশ্য বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। দ্রষ্টা বা শ্রোতা নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি অনুসারে দৃষ্ট বস্তুর বা শ্রুত শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে।[৫] তারপর ব্যবহারের কৌশলে বা প্রয়োগ-নৈপুণ্যে শব্দের মুখ্যার্থের যে সাময়িক পরিবর্তন ঘটে, ক্ষেত্র-বিশেষে নানা কারণে তাহাও স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়।

এই সব কথা সাধু-অসাধুভেদে সমস্ত শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কারণ এই উভয় প্রকার শব্দের দ্বারাই সমান অর্থবোধ হইয়া থাকে ঃ 'সমানায়ামর্থাবগতৌ শব্দেন চাপশব্দেন'—কাত্যায়নবার্ত্তিক। ইহার পরেই রক্ষণশীলতার আশ্রয় লইয়া বলা হইয়াছে—'শব্দেনৈবার্থোঽভিধেয় ইতি নিয়মঃ' অর্থাৎ সাধু-অসাধু ভেদে উভয় শব্দই সমান অর্থজ্ঞাপক হইলেও সাধুশব্দের দ্বারা অর্থপ্রকাশ করাই বিধেয়, কারণ তাহাতেই ধর্ম লাভ হইয়া থাকে ঃ 'তত্র জ্ঞানপূর্বকে প্রয়োগে ধর্মঃ'—ঐ। পতঞ্জলিও এই মতেরই পক্ষপাতী। প্রকৃতিপ্রত্যয়-সাধিত সাধু শব্দেরই কেবল অর্থবত্তা স্বীকার্য—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় (দ্রঃ মহাভাষ্য ৫।১।২২)। কুমারিল ভট্ট তন্ত্রবার্ত্তিকে (১।৩।১০) লিখিয়াছেন ঃ 'যে শব্দা ন প্রসিদ্ধাঃ স্যুরার্যাবর্তনিবাসিনাম্। তেষাং ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধোঽর্থো গ্রাহ্যো নেতি বিচিন্ত্যতে।।' ইহার দ্বারা পূর্বোক্ত সাধুশব্দেরই অর্থ গ্রহণীয় বলিয়া প্রকারান্তরে ধ্বনিত হইয়াছে।

কাজেই কঠোর শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে ও রীতি-অনুসারে নিরুক্তাদি গ্রন্থে, ব্যাকরণ-শাসিত সাধু শব্দ সমূহেরই কেবল অর্থপ্রদর্শন কর্তব্য। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যমীমাংসায় (৬ষ্ঠ অধ্যায়) রাজশেখর লিখিয়াছেন—'ব্যাকরণ-স্মৃতিনির্ণীতঃ শব্দো নিরুক্তনিঘণ্ট্বাদিভিনির্দিষ্ট-স্তদভিধেয়োঽর্থস্তৌ-পদম্'—অর্থাৎ ব্যাকরণ-নির্ণীত শব্দ এবং তাহার নিরুক্ত-নিঘণ্ট্বাদি-নির্দিষ্ট অর্থ—এই দুই-এর সমবায়ে পদ।

একটা বড় অসুবিধা এই যে, শব্দসমূহের সাধুত্বের নিয়ামক যে ব্যাকরণ-নির্দিষ্ট ব্যুৎপত্তি, তাহার সহিত উহাদের প্রচলিত অর্থের প্রায়ই সামঞ্জস্য ঘটিতে দেখা যায় না। তাই বৈয়াকরণগণ বলেন যে শব্দের ব্যুৎপত্তি-নিমিত্ত এবং প্রবৃত্তিনিমিত্ত সর্বথা এক নয় বা এক হইতে বাধ্য নয়। ইহার মূলে যে কারণ, তাহার ইঙ্গিত আমরা পূর্বেই দিয়া আসিয়াছি। শব্দের ব্যুৎপত্তি-কল্পনায় বৈয়াকরণদের একচ্ছত্র আধিপত্য

থাকিলেও তাহার আর্থিক নিয়ন্ত্রণে তাঁহারা অসমর্থ, কারণ সেখানে লৌকিক ব্যবহারই বলবান্। ব্যবহার-স্রোতে শাস্ত্র-বন্ধন ছিন্ন হয়, শব্দের ব্যুৎপত্তি-ঘটিত অর্থ, স্থল-বিশেষে, উহার লোকব্যবহৃত অর্থ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। তাই শব্দের অর্থাদেশন ব্যাকরণের মুখ্য কর্ম নয়, ব্যাকরণ সেই কর্মের সহায়কমাত্র। তাই পতঞ্জলির সমীক্ষায় 'ইহ চ ব্যাকরণে শব্দে কার্যস্য সম্ভবঃ। অর্থে অসম্ভবঃ' (মহাভাষ্য ১।১।৬৮)। ব্যাকরণের প্রধান লক্ষ্য শব্দের আকৃতি বা গঠনের (formation) দিকে-—যাহার ভিত্তিতে নিরুক্তবেদাঙ্গ শব্দের অর্থ নির্দেশ করিয়া থাকে। নিরুক্তের মুখ্য কর্ম—অর্থ বলিয়া দেওয়া বা 'নির্বচন' করা। এই 'নির্বচন' হইতে 'নিরুক্ত' শব্দের উদ্ভব। এক শব্দের বিভিন্ন অর্থ থাকিলে, সেই শব্দের কোন্ কোন্ নির্বচনের সহিত ঐসব অর্থের সামঞ্জস্য বিদ্যমান—তাহা দেখানোর নামই শব্দের অর্থ-নিরুক্তি এবং যেই শাস্ত্রে সেই নিরুক্তি বর্ণিত বা দর্শিত হয় তাহাই নিরুক্ত—ষড়্বেদাঙ্গের অন্যতম। এক অর্থ হইতে কি রূপে অন্য অর্থের উৎপত্তি হয় তাহা প্রদর্শন করাও নিরুক্তের কাজ। এই কাজে অভিনব নির্বচন-কল্পনারও প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে। শাব্দিক বিশ্লেষণে নৈরুক্তগণ প্রত্যয়ের উল্লেখ না করিতেও পারেন, কিন্তু বৈয়াকরণদের পক্ষে প্রত্যয় অপরিহার্য। এক হিসেবে নিরুক্ত শব্দার্থ-বিজ্ঞান বা শব্দার্থশাস্ত্র।

(৩)

শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে কেবল ব্যাকরণ-শাসিত সাধু শব্দ সমূহেরই অর্থাদির বর্ণনা কোষাভিধানের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই আদর্শে অবিচল থাকা কোষকার বা আভিধানিকের পক্ষে অতি দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। তাঁহাকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ শব্দের সাধুত্বনির্ণয়ে কল্পিত উপায়ের অনিশ্চয়তা। এমন অনেক শব্দ দেখা যায় যাহারা এক ব্যাকরণ মতে সাধু, কিন্তু অন্য ব্যাকরণ মতে অসাধু বা অশুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ একই শব্দ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অর্থে প্রচলিত। তৃতীয়তঃ কবি-সাহিত্যিকগণ এমন অনেক শব্দের প্রয়োগ করেন যেগুলি সর্বথা ব্যাকরণসিদ্ধ নয় বা সর্ববাদিসম্মত নয়। অথচ ব্যাকরণের দোহাই দিয়া সেই সব শব্দকে একেবারেই অগ্রাহ্য করা চলে না। চতুর্থতঃ কোনো কোনো শব্দ কোনো কোনো

অর্থে সাধু, কিন্তু অন্য অর্থে অসাধু। তাই অনেক অপভ্রষ্ট শব্দও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের কৌশলে, বিশেষ বিশেষ অর্থে সাধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যেমন 'গাবী' শব্দ। একদা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি গো-অর্থে গাবী শব্দকে অপভ্রষ্ট বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে শব্দবিলাসীদের বুদ্ধি-কৌশলে, গাবী শব্দও সাধু বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।[৬] কাজেই অনেক অপভ্রংশের সাধুত্ব বা অসাধুত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়-সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। ইহা লক্ষ্য করিয়া পুণ্যরাজের মন্তব্য : 'ন তেষাং নিয়তং সাধুত্বমসাধুত্বং বা ব্যবস্থিতমিতি।' এই প্রসঙ্গে তত্ত্বচিন্তামণিতে গঙ্গেশ-কর্তৃক নির্দিষ্ট সাধুত্বের সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা গেল। তাঁহার মতে :

> পদস্য সাধুত্বং বৃত্তিরেব। বৃত্তিশ্চ শাব্দবোধহেতু-
> পদার্থোপস্থিত্যনুকূল-পদপদার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ

—অর্থাৎ পদের সাধুত্ব এক ধরনের বৃত্তি—যাহাকে বলা চলে কোনো পদার্থের শাব্দবোধ জন্মাইতে শ্রোতার মনে সেই পদার্থের উপস্থিতির অনুকূল যে পদ ও পদার্থ তদুভয়ের সম্বন্ধ। সোজা কথায় ইহার মোটামুটি অর্থ দাঁড়ায়—নির্দিষ্ট কিছুর ধারণার উপযোগী অর্থবহ পদেরই সাধুত্ব স্বীকার করা উচিত।

এইরূপ নানা সমস্যার মধ্য দিয়া উহাদের যথাসাধ্য সমাধান-পূর্বক কোষকারকে অগ্রসর হইতে হয়। এই কারণে বিভিন্ন কোষের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে বিশেষতঃ শব্দনির্বাচনে ও অর্থকথনে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। অথচ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শব্দাভিধানের উপযোগিতা যে কত বেশী তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। মহাপণ্ডিতকেও সময়ে শব্দকোষের উপর নির্ভরশীল হইতে হয়। তাই কথিত আছে :

> কোষশ্চৈব মহীপানাং কোষশ্চ বিদুষামপি।
> উপযোগো মহান্ যস্মাৎ ক্লেশস্তেন বিনাভবেৎ।।

এই শ্লোকে, রাজাদের নিকট রাজকোষের[৭] ন্যায়, পণ্ডিতদের নিকট শব্দকোষের উপযোগিতা সমান গুরুত্বপূর্ণ বলা হইয়াছে। প্রাচীনগণ শব্দার্থনির্ণয়ের ব্যাপারে ব্যাকরণাদির সহিত কোষের প্রামাণ্যও স্বীকার করিয়াছেন :

> শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান-কোশাপ্ত বাক্যাদ্ ব্যবহারতশ্চ। বাক্যস্য
> শেষাদ্ বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ।।

—ভাষাপরিচ্ছেদের (৮১) টীকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলীধৃতবচন ; অর্থাৎ ব্যাকরণ, উপমান (তুলনা), কোষ, আপ্তবাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবৃতি বা বিবরণ এবং অন্যপদের সান্নিধ্য হইতে সিদ্ধপদের শক্তি (তাৎপর্যজ্ঞাপক সঙ্কেত) গ্রহণীয়, বৃদ্ধগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। শক্তিগ্রহ = শব্দার্থবোধ। জগদীশ তর্কালঙ্কার-রচিত 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা'র (নামপ্রকরণ, ২০) 'রামভদ্রী' ও 'কৃষ্ণকান্তী' টীকায় ঐ শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

গহন শব্দারণ্যে কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া কোষকারগণ শব্দার্থজ্ঞাপনে প্রয়াসী হইতেন, উপরের শ্লোকটিতে যেন সেই পথেরই নির্দেশ বর্তমান। অন্যান্য নানা উপায়সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এই কার্যে বৃদ্ধ বা আপ্তদের ব্যবহারই যুগে যুগে সর্বাধিক প্রামাণিক ও সাহায্যকারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইঁহারা ছিলেন যথার্থ জ্ঞানান্বেষী, সত্যদ্রষ্টা ঋষি বা ঋষিকল্প ব্যক্তি। অনাদিকাল হইতে সর্বশাস্ত্রে ইঁহাদের প্রামাণ্য নির্বিবাদে স্বীকৃত। মহাভাষ্যে (৬।৩।১০৯) ইঁহাদিগকেই 'শিষ্ট' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অর্থ বাচ্য, শব্দ বাচক। এই দুই বাচ্য-বাচকরূপ ভাবের মূলে নৈয়ায়িকগণ তৃতীয় আর একটি ভাবের কল্পনা করিয়াছেন —যাহাকে শব্দের শক্তি, সঙ্কেত বা বৃত্তি বলা হয়। তাঁহাদের মতে অর্থবোধে পদ-পদার্থের সম্বন্ধই শক্তি। ইহাকে শব্দশক্তিবাদ বলা যায়। 'এই শব্দে এই অর্থ বোদ্ধব্য' এইরূপ সঙ্কেত বা ইচ্ছাকে তাঁহারা 'অনাদি' বা 'ঈশ্বরেচ্ছা' বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

শব্দের অর্থ ত্রিবিধ—বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থ। এই তিন রকমের অর্থ যথাক্রমে অভিধা, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা—এই তিন প্রকার শব্দ-শক্তির সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অভিধার দ্বারা বাচ্যার্থ অভিহিত হয়, লক্ষণার দ্বারা লক্ষ্যার্থ লক্ষিত হয় এবং ব্যঞ্জনার দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থ ব্যঞ্জিত হয়। এই তিন শব্দ-শক্তিকে তিন উপাধিও বলা হয় এবং তদনুসারে এই তিন উপাধিবিশিষ্ট শব্দ যথাক্রমে বাচক, লক্ষ্যক এবং ব্যঞ্জক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এই কয় প্রকার শব্দ ও অর্থের মধ্যে 'অভিধোপাধিক বাচক' শব্দ, এবং তাহার 'অভিধা-বোধ্য' বাচ্যার্থই কোষাভিধানের আলোচ্য বিষয়। এক কথায়, শব্দের মুখ্যার্থই অভিধানে বর্ণিত হইয়া থাকে। শব্দের উচ্চারণ-মাত্র উহার যে অনায়াস-লভ্য সহজ তথা প্রসিদ্ধ অর্থের বোধ হয়, তাহাই সেই শব্দের

মুখ্যার্থ। ইহাকে আলঙ্কারিকগণ 'সাক্ষাৎসঙ্কেতিত অর্থ' বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত বৃদ্ধ, আপ্ত বা শিষ্টগণ এই অর্থেরই সঙ্কেত দিয়া থাকেন।

(৪)

'অভিধা' এবং 'অভিধান' শব্দ দুইটি একই 'ধা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই ধাতুর অর্থ রক্ষা, প্রতিপাদন, উৎপাদন ও বহন ইত্যাদি। 'অভিধীয়তে অনেন' ইত্যাদি নির্বচনের পরিপ্রেক্ষিতে, যাহার দ্বারা শব্দার্থ অভিহিত হয় তাহাকে অভিধান বলা হয়। অভিধা এবং অভিধানের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'নাম' এবং 'কথন'। অমর সিংহাদি প্রাচীন কোষকারগণ এই অর্থেই শব্দ দুইটির ব্যবহার করিয়াছেন। দুই-ই বাচক শব্দেরও বোধক : '...অভিধাভিধানংবাচকে' (-ত্রিকাণ্ডশেষ)।

'অভিধান' শব্দের 'নাম' ও 'কথন' অর্থ হইতেই যে ক্রমে শব্দসংগ্রাহক ও শব্দার্থজ্ঞাপক গ্রন্থের নামও 'অভিধান' হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে গ্রন্থে নাম-সমূহ বর্ণিত হয় বা অভিহিত হয় তাহাই অভিধান। পূর্বে সাধারণ ভাবে শব্দ বুঝাইতে 'নাম'-শব্দ ব্যবহৃত হইত। নিরুক্ত, বৃহদ্দেবতা, গোপথব্রাহ্মণ, প্রাতিশাখ্যসমূহ এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইহার নিদর্শন আছে। পাণিনি ইহাকে 'প্রাতিপদিক' (১।২। ৪৫) বলিয়াছেন ; চান্দ্রব্যাকরণে এই জন্য 'শব্দ' ব্যবহৃত হইয়াছে এবং কাতন্ত্রব্যাকরণে গৃহীত হইয়াছে 'লিঙ্গ'-সংজ্ঞা : 'ধাতুবিভক্তিবর্জ-মর্থবল্লিঙ্গম্' (২।১।১)। এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানে 'নাম (ন্)' শব্দের অর্থ-বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে :

> তচ্চ স্যাদিবিভক্ত্যর্হঃ শব্দঃ। তত্তু পঞ্চবিধং যথা—
> 'উণাদ্যন্তং কৃদন্তঞ্চ তদ্ধিতান্তং সমাসজম্।
> শব্দানুকরণঞ্চৈব নাম পঞ্চবিধং স্মৃতম্।।' ইতি গোয়ীচন্দ্রঃ।

ইহার অর্থ : সি-আদি বিভক্তির প্রয়োগযোগ্য নামই শব্দ। তাহা পঞ্চবিধ : উণাদ্যন্ত, কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত, সমাসজাত এবং শব্দানুকরণ-ঘটিত 'কাক' প্রভৃতি শব্দ। নাম-মাত্রই শব্দ। জাতি, দ্রব্য, গুণ এবং ক্রিয়া ভেদে কোনো কিছুর বাচন বা কথনই উহার জন্য নির্দিষ্ট নামটির কার্য। আর এই নামটি একটি বর্ণাত্মক অর্থবহ শব্দ বা ধ্বনি ব্যতীত আর কিছু নয়। তবে নাম মাত্রই শব্দ হইলেও শব্দমাত্রই কিন্তু নাম নয়। তাই অতি প্রাচীন কালেই শব্দ সমূহকে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও

নিপাত এই চারি শ্রেণীতে পৃথক্ করিয়া দেখানো হইয়াছে। শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কোনো কিছুর অস্তিত্ব-, সত্তা- বা দ্রব্য-বোধ জন্মিলেই বুঝিতে হইবে সেই শব্দটি একটি নাম (ইংরেজীতে 'Noun') বা তদ্বাচক শব্দ। এই নাম (বা শব্দ) সমূহকে অর্থজ্ঞাপক পর্যায়ভুক্ত করিয়া, উহাদের লিঙ্গনির্দেশের উদ্দেশ্যে একত্রে শ্রেণীবদ্ধ দেখানো হইয়াছে পূর্বোক্ত অমরকোষে। এই কারণে এই শব্দকোষের 'নামলিঙ্গানুশাসন' নামকরণ সার্থক। কেশব-রচিত 'কল্পদ্রুকোশে' বৈদিক শব্দকোষ 'নিঘণ্টু'কে বলা হইয়াছে 'নামসংগ্রহ'—'নিঘণ্টুর্নামসংগ্রহঃ' (ব্রহ্মকাণ্ড, ৫২)।

মম্মটাচার্য স্বরচিত 'কাব্যপ্রকাশে'র (১।৩) টীকায় শাস্ত্রের উদাহরণ দিতে গিয়া ছন্দোব্যাকরণাদির সহিত কোষ এবং অভিধানেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাকরণকে যেমন বলা হয় 'শব্দানুশাসন', কোষকেও কেহ কেহ তেমন 'নামানুশাসন' বা 'নামশাসন' বলিয়াছেন। কোষকারদের মধ্যে সম্ভবতঃ ধরণীদাসই সর্বপ্রথম কোষের অন্যতম অর্থরূপে 'পদার্থে'র উল্লেখ করেন। তাঁহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী বা সমকালীন মেদিনীকর কোষের বিভিন্ন অর্থের শেষে 'শব্দাদিসংগ্রহঃ' পদটি যোজনা করিয়াছেন। অমর-টীকা 'ত্রিকাণ্ডচিন্তামণি'-তে উদ্ধৃত 'শব্দার্ণব'-কোষের একটি শ্লোকেও কোষকে 'শব্দের সংগ্রহ' ('কোষঃ শব্দস্য সংগ্রহঃ') বলা হইয়াছে। শব্দার্ণবের প্রণেতা বাচস্পতি সম্ভবতঃ অমরসিংহেরও পূর্ববর্তী। এই অনুমান সত্য হইলে, 'শব্দসংগ্রহ' বুঝাইতে কোষের ব্যবহার অতি প্রাচীন।

শব্দকোষ বুঝাইতে 'অভিধান' শব্দের ব্যবহার খুব প্রাচীন নয়। 'শব্দকল্পদ্রুম,' 'বাচস্পত্য' প্রভৃতি আধুনিক অভিধানগুলিতেই এই মর্মে শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। শব্দকল্পদ্রুমে অভিধানের অন্যতম অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে—'শব্দকোষঃ'। খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীতে রচিত 'অভিধান-চিন্তামণি' এবং 'অভিধানরত্নমালা'র অভিধান শব্দের অর্থ নাম বা শব্দ। প্রাচীন বৈদিক নিঘণ্টুর অনুকরণে পরবর্তী সময়ে কোষকারদের কেহ কেহ স্বরচিত গ্রন্থের নামকরণে 'নিঘণ্টু' শব্দেরও ব্যবহার করিয়াছেন। অভিধান- বা শব্দকোষ-রচনা, ৬৪ কলার অন্যতম (৫৪ নং কলা) রূপে পরিগণিত।

(৫)

অর্থের ভিত্তিতে মহাভাষ্যে (১।৩।১) শব্দরাশিকে 'একার্থ' এবং 'বহ্বর্থ' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ 'বহবো হি শব্দা একার্থাভবন্তি।...একশ্চ শব্দো বহ্বর্থঃ।' কতকগুলি শব্দের একটি (Single) অর্থ, আবার কোনো কোনো শব্দের বহু অর্থ। একার্থবাচক শব্দগুলিকে সমার্থক শব্দ-পর্যায়ে বিন্যস্ত করিয়া যে অভিধান রচিত হয় তাহাকে পর্যায়-শব্দকোষ (Synonymous Lexicon) বলে। পর্যায় শব্দের অর্থ ক্রম বা অনুক্রম ঃ 'পর্যায়োঽনুক্রমঃ ক্রমঃ' (অভিধানচিন্তামণি ৬।১৩৯)। 'মাধবনিদানে'র 'মধুকোষ'টীকায় (১।৫) বিজয়রক্ষিত লিখিয়াছেন—'ক্রমেণৈকার্থবাচকাঃ শব্দাঃ পরস্পরং পর্যায়া উচ্যন্তে' ; যেমন অমরকোষের 'অমরা নির্জরা দেবাস্ত্রিদশা বিবুধাঃ সুরাঃ। সুপর্বাণঃ সুমনসস্ত্রিদিবেশা দিবৌকশঃ।।' (১।১।৭) শ্লোকে ক্রমান্বয়ে বর্ণিত অমর, নির্জর, দেব, ত্রিদশ, বিবুধ ইত্যাদি শব্দগুলি (এক) দেবার্থ বাচক বলিয়া, এক পর্যায়ভুক্ত বা সমার্থক। কেশবের কল্পদ্রুকোশে কেবল পর্যায়-বদ্ধ শব্দসমূহই প্রদর্শিত হইয়াছে।

যে শব্দের বহু অর্থ, তাহাকে বহ্বর্থ বা নানার্থ শব্দ বলে, যেমন অক্ষ শব্দ। ইহার বহু প্রকারের অর্থ হয় এবং সেই সব অর্থের মধ্যে তেমন কোনো যোগ বা সম্পর্কও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেশব স্বামীর 'নানার্থার্ণব সংক্ষেপে' (এই কোষে কেবল নানার্থশব্দসমূহই বর্ণিত) অক্ষশব্দের অর্থবর্ণনা ঃ

> অক্ষঃ পুমানামলকে দ্যূতভেদে বিভীতকে।
>
> আধারে ব্যবহারে চ শকটে চ বরাটকে।।
>
> রথাদিচক্রে কর্ষাখ্যমানদ্যূতশলাকয়োঃ।
>
> চতুঃশতাঙ্গুলে মানবিশেষে চ রথাদিনঃ।।—(দ্ব্যক্ষরকাণ্ড, ১৭-১৮)

এই শ্লোকদ্বয়ে কথিত সপ্তম্যন্ত সমস্ত পদই অক্ষশব্দের এক একটি অর্থ। এই রূপ বহু অর্থের বাচক শব্দসমূহ যে কোষে সংগৃহীত হয় তাহাকে নানার্থশব্দকোষ (Homonymous Lexicon) বলা হয়। বিখ্যাত 'মেদিনীকোষ'—এই জাতীয় আর একটি শব্দকোষ। কোনো কোষে একার্থ ও নানার্থ উভয়বিধ শব্দেরই সমাবেশ দেখা যায়, যেমন অমরকোষে।

শব্দ অসংখ্য, বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষায়। ধাতুর সহিত উপসর্গ ও প্রত্যয়াদির অবাধ সংযোজনের দ্বারা ইচ্ছামত শব্দ গঠনের প্রচুর অবকাশ এই ভাষায় বিদ্যমান। আবার নঞ্‌যোগে প্রত্যেক শব্দকে আরও একটি শব্দে পরিণত করা যায়, যেমন আচার—অনাচার, শুভ—অশুভ ইত্যাদি।

অর্থের ভিত্তিতে শব্দসমূহকে রূঢ়, লক্ষ্যক, যোগরূঢ়, যৌগিক, রূঢ়যৌগিক এবং পারিভাষিক—এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ইহাদের মধ্যে লক্ষ্যক এবং পারিভাষিক শব্দ ভিন্ন অন্য সব শ্রেণীর শব্দই মুখ্যার্থপ্রধান। শব্দের মুখ্য বা প্রসিদ্ধ অর্থের জ্ঞাপনই কোষ বা অভিধানের উদ্দেশ্য বলিয়া, লক্ষ্যক বা পারিভাষিক শব্দের সহিত ইহার কোনো সম্বন্ধ নাই। ব্যাকরণ-বেদ্য বলিয়া যৌগিক শব্দগুলিও কোষকার পরিহার করেন। 'যোগলভ্যার্থমাত্রস্য বোধকং নাম যৌগিকম্।' যোগ-অর্থে প্রকৃতি-প্রত্যয়ের যোগ। কেবল এই যোগ-লব্ধ অর্থের জ্ঞাপক বলিয়া পাচক, পাঠক, দৃষ্ট, গণ্য প্রভৃতি শব্দকে ব্যাকরণের তত্ত্বাবধানে ফেলিয়া কোষকারগণ বিপুল পরিশ্রম হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, শব্দসংখ্যা অনেক কমিয়াছে। অবশিষ্ট রূঢ়, যোগরূঢ় এবং রূঢ়যৌগিক, বিশেষতঃ রূঢ়শব্দাবলীই কোষে সংগৃহীত হইয়া থাকে। আধুনিক শব্দাভিধানসমূহে অনেক যৌগিক শব্দেরও অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে।

যেসব শব্দ ব্যুৎপত্তি-নিরপেক্ষ কোনও বিশেষ অর্থে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহারাই রূঢ়শব্দ, যেমন গো, ঘট, বৃক্ষ প্রভৃতি। বৈয়াকরণগণ এই জাতীয় শব্দের ব্যুৎপাদক কোনো প্রশস্ত পদ্ধতি রচনা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই জন্য সচরাচর ব্যুৎপত্তিরহিত শব্দকে রূঢ় বলা হইয়া থাকে ঃ 'ব্যুৎপত্তিরহিতাঃ শব্দারূঢ়া আখণ্ডলাদয়ঃ' (—অভিধানচিন্তামণি)।

সাঙ্কেতিক নামকে 'সংজ্ঞা' বলা হয় ঃ 'রূঢ়ংসঙ্কেতবন্নাম সৈব সংজ্ঞেতি কীর্ত্যতে' ('শব্দশক্তিপ্রকাশিকা' ১৭)। নৈমিত্তিকী, পারিভাষিকী ও ঔপাধিকী-ভেদে এই সংজ্ঞা তিন প্রকার নির্দিষ্ট হইয়াছে। জাতিকে নিমিত্ত করিয়া তদধীন অর্থের প্রকাশক শব্দই নৈমিত্তিক, যেমন গো, অশ্ব প্রভৃতি শব্দ। ইহাতে প্রথমে গোত্বাদিরূপ সাধারণ ধর্মের জ্ঞান জন্মাইয়া পরে কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উহার আরোপের দ্বারা বিশিষ্টের জ্ঞান উৎপন্ন করা হয়। ব্যক্তির জ্ঞান এক্ষেত্রে জাতির জ্ঞানের অপেক্ষা

রাখে। অনুগত উপাধিতে সীমিত-সঙ্কেতবতী সংজ্ঞাই ঔপাধিকী। উপাধি=অন্যব্যাবর্তক বিশেষ ধর্ম। ইহার শক্তি রূঢ়শব্দনিষ্ঠা। বস্তুর পরিবর্তে তাহার ধর্মেই ইহার সঙ্কেত[৮] গৃহীত হইয়া থাকে, যেমন ভূত, দূত প্রভৃতি শব্দ। পারিভাষিক সংজ্ঞার উপযোগিতা কেবল সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রাদিতেই সীমাবদ্ধ।

কোনো শব্দ কোনো নির্দিষ্ট অর্থে কিভাবে রূঢ় হইল, তাহার মূলানুসন্ধান এক সমস্যা-সঙ্কুল ব্যাপার। এই ক্ষেত্রে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আরোপ না করিয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই পর্যন্ত দেখা যায় যে, ইহার মূলে রহিয়াছে লোকব্যবহার, বিশেষতঃ শিষ্ট ব্যবহার। ধাতুবিষয়ক গ্রন্থ 'দৈব'র 'পুরুষকার'-টীকায় কৃষ্ণলীলাশুক লৌকিক প্রয়োগকেই ভগবান্ ('প্রয়োগ এব ভগবান্') বলিয়াছেন। শব্দের লক্ষ্যার্থও কালক্রমে স্থায়ী হইয়া রূঢ়ার্থে পরিণত হয় এবং ফলে উহার ব্যুৎপত্তিগত মুখ্যার্থ লোপ পায়। এই কারণে 'লক্ষণা'কে 'জহৎস্বার্থা' অর্থাৎ স্বার্থহীনা বলা হইয়া থাকে। এই ধরনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'কুশল' এবং 'প্রবীণ' শব্দ। একদা এই শব্দ-দুইটি যথাক্রমে কুশ-সংগ্রাহক এবং বীণাবাদনদক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হইত। এই দুই কার্যেই নৈপুণ্য আবশ্যক। তাই শব্দ-দুইটি ক্রমে তাহাদের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া নিপুণ, কৃতী, অভিজ্ঞ প্রভৃতি লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিয়াছে। বলা বাহুল্য লৌকিক ব্যবহারই এই সব কিছুর নিয়ন্তা।

শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়ঘটনাকে বলা হয় 'অবয়বশক্তি'। ইহাকে 'ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত'ও বলা হয়। শব্দের অর্থশক্তিকে বলা হয় 'প্রবৃত্তি-নিমিত্ত'। রূঢ়শব্দের ক্ষেত্রে উহার অর্থ বা প্রবৃত্তিনিমিত্ত, অবয়বশক্তি বা ব্যুৎপত্তিনিমিত্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায়, যে প্রসিদ্ধির দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ উহার অর্থবোধ ঘটে, তাহাকে বলা হয় সমুদায়-শক্তি। যেসব শব্দের রূঢ়ার্থের সহিত উহাদের যৌগিক অর্থের বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মূলতঃ কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকে, সেই সব শব্দকে বলা হয় যোগরূঢ়। এই ধরনের শব্দের অর্থব্যাপারে অবয়বশক্তি ও সমুদায়শক্তি, এই দুই-এরই অল্পাধিক ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, যেমন 'পঙ্কজ' শব্দ। ইহা অবয়বশক্তির দ্বারা পঙ্কজমাত্রেরই (যাহা পঙ্কে জন্মে এমন সব কিছুর) বোধক হইয়াও, সমুদায়শক্তিতে পদ্ম অর্থে রূঢ়। যে-সব শব্দের ব্যুৎপত্তিনিমিত্তের সহিত প্রবৃত্তিনিমিত্তের কিছুমাত্র সম্বন্ধ

থাকে না, সেই সব শব্দকে বলা হয় রূঢ়যৌগিক। যেমন 'মণ্ডপ' শব্দ। ইহার ব্যুৎপত্তিঘটিত অর্থ 'মণ্ডপায়ী'র সহিত প্রসিদ্ধার্থ গৃহ বা দেবগৃহের কোনো সম্বন্ধ নাই। তবে মণ্ড শব্দের ভূষা অর্থ ধরিয়া তাহার রক্ষক বা আশ্রয় অর্থে (মণ্ডংপাতি রক্ষতি ইতি) মণ্ডপ শব্দ যৌগিক।

(৬)

এযাবৎ যেসব শব্দকোষ পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে 'নিঘণ্টু'ই প্রাচীনতম। ইহা মুখ্যতঃ বৈদিক শব্দের কোষ। বৈদিক মন্ত্র হইতে শব্দ চয়ন করিয়া এই কোষে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই সংগ্রহের প্রত্যেক শব্দই নিঘণ্টু। নিগূঢ়ার্থ নিঘণ্টুসমূহ পরিজ্ঞাত হইলে তাহারাই মন্ত্রের অর্থ নিশ্চিত ভাবে জানাইয়া দেয়। 'নিগন্তু' হইতে 'নিঘণ্টু'। 'নিশ্চয়েন (অর্থান্) গময়ন্তীতি (নি—গম্ + তুঃ =) নিগন্তুঃ'। এককথায়, এই কার্যকে বলে 'নিগমন' অর্থাৎ মন্ত্রার্থের বোধ করাইয়া দেওয়া। নিঘণ্টু আরও যে দুইটি কার্যের দ্যোতক তাহা হইল (১) সমাহরণ এবং (২) সমাহনন (শ্রেণীবদ্ধকরণ)। ইহাদের প্রকৃতিঘটিত 'নিহর্তুঃ' (=নি—হৃ+তুঃ) এবং 'নিহন্তুঃ' (=নি—হন্+তুঃ) শব্দ দুইটিরও বিকৃত রূপ ঐ নিঘণ্টু। সর্বত্রই বর্ণ-বিকার ঘটিয়াছে—যাহা বর্ণাগমাদি পঞ্চবিধ নিরুক্তের অন্যতম। কাজেই নিঘণ্টুর তিনটি অর্থ (১) সমাহরণ, (২) সমাহনন এবং (৩) নিগমন অর্থাৎ কিনা বৈদিক মন্ত্র হইতে শব্দসমূহের আহরণ, শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং অর্থকথন। নিপূর্বক (চুরাদিগণীয়) ঘটি ধাতু হইতেও নিঘণ্টুশব্দ উৎপন্ন হইতে পারে। তাই হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ

অর্থান্ নিঘণ্টয়ত্যস্মাদ্ নিঘণ্টুঃ পরিকীর্তিতঃ।

'গৌঃ' হইতে শুরু করিয়া 'দেবপত্নী' পর্যন্ত, কিঞ্চিদধিক সাড়ে সতের শত শব্দ, নিঘণ্টুর পাঁচ অধ্যায়ে ৭৮-অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত। এই পাঁচ অধ্যায়কে আবার তিন কাণ্ডেও ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম তিন অধ্যায়ের নাম নৈঘণ্টুক কাণ্ড এবং পরবর্তী দুই অধ্যায় যথাক্রমে নৈগম কাণ্ড এবং দৈবতকাণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। নৈগম কাণ্ডকে ঐকপদিক কাণ্ডও বলা হয়। প্রথম অধ্যায়ে পৃথিব্যাদি লোক, দিক্, কাল প্রভৃতি বিষয়ক নাম, দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনুষ্য ও তদ্‌বিষয়ক নাম, তৃতীয়ে—পূর্ববর্তী দুই অধ্যায়ে বর্ণিত দ্রব্যাদির বহুত্ব-হ্রস্বত্বাদি ধর্মবিষয়ক নামসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। বেদে বা নিগমে প্রায়শঃ বর্তমান এমন

শব্দসমূহের উপদেশহেতু চতুর্থ অধ্যায়ের বা ২য় কাণ্ডের নৈগমত্ব। পঞ্চম অধ্যায়ের বা ৩য় কাণ্ডের দৈবতত্ত্বের মূলে—এই অধ্যায়ে দেবতানামসমূহের বর্ণনা।

এই সব নাম বা শব্দের পৃথক্ ভাবে কোনও অর্থ প্রদর্শিত হয় নাই। অনেকার্থক শব্দগুলিকে সমার্থক শব্দ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখানো হইয়াছে। শব্দগুলিকে প্রধানতঃ প্রথমা বিভক্তিতে একবচনান্ত করিয়া বর্ণনা করায় উহাদের লিঙ্গবোধে কোনো জটিলতার অবকাশ থাকে নাই। ধাতুগুলিকে প্রায়শঃ 'লট্'-এ ১ম পুরুষের এক বচনে 'তি' বা 'তে' বিভক্ত্যন্ত করিয়া দেখানো হইয়াছে। একই অর্থের বাচক বিভিন্ন শব্দকে ক্রমান্বয়ে (অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে) উপস্থাপিত করিয়া পরে তাহারা কোন্ বিষয়ের নাম বা কোন্ অর্থের বাচক তাহা বলিয়া দেওয়ায়; তাহাদের সাধারণ অর্থ বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।

কিছু কিছু অবৈদিক উপাদান-সত্ত্বেও মুখ্যতঃ বৈদিক শব্দের সংগ্রহ বলিয়া নিঘণ্টুকে বেদের মর্যাদা দেওয়া হয়। নিরুক্তের প্রারম্ভে যাস্ক নিঘণ্টুকে 'সমাম্নায়' বলিয়াছেন। এই নিরুক্তই নিঘণ্টুর প্রাচীনতম ভাষ্য এবং নিরুক্তকার যাস্কই বর্তমান নিঘণ্টুরও সঙ্কলয়িতা। তাঁহার পূর্বে মহর্ষি কাশ্যপ, শাকপূণি প্রভৃতি আরও অনেকে একাধিক নিঘণ্টু রচনা করিয়াছিলেন। কৌৎসব্য-রচিত অপর এক নিঘণ্টুও পাওয়া যায়। ইহা ৭৮ খানি অথর্বপরিশিষ্টের অন্তর্গত ৪৮ নং গ্রন্থ।[৯] নিরুক্তের (১।১৩, ১।২০) বৃত্তিতে দুর্গাচার্য এক এক বেদাঙ্গের অনেক প্রভেদের উদাহরণ-স্বরূপ চতুর্দশ নিরুক্ত এবং অষ্ট ব্যাকরণের কথা লিখিয়াছেন যদিও তিনি এই সকলের বা ইহাদের রচয়িতাদের নামোল্লেখ করেন নাই। এই চৌদ্দ নিরুক্তের মূলে চৌদ্দখানা নিঘণ্টু থাকাও অসম্ভব নয়। যাস্কের 'তান্যপ্যেকে সমামনন্তি' (নিরুক্ত ৭।১৩) উক্তি হইতেও প্রমাণিত হয় যে, তিনি একাধিক নিঘণ্টুকারের রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন। বেদ হইতে সংগৃহীত বলিয়া নিঘণ্টুর ছন্দোধর্মিত্ব-হেতু প্রথম হইতে ইহার ব্যাখ্যানভূত নিরুক্তই অন্যতম বেদাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। পরে অবশ্য কেহ কেহ ব্যাপক অর্থে নিঘণ্টুকেও নিরুক্ত-বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।[১০]

'যাস্ক' একটি গোত্রনাম। 'যস্ক' হইতে যাস্ক। পাণিনি সাক্ষাৎ ভাবে যাস্ক-র উল্লেখ না করিলেও তন্মূলক 'যস্ক'শব্দের যোগে সূত্র রচনা

করিয়াছেন ঃ 'যস্কাদিভ্যো গোত্রে' (২।৪।৬৩)। ইহাতে যস্ক গোত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া 'শিবাদিভ্যোঽণ্' (৪।১।১১২) এই সূত্রের শিবাদিগণেও যস্কশব্দ উপস্থিত। এই সূত্রানুসারে অপত্যার্থে যস্ক শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় করিয়া যাস্ক শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে। কাজেই সূত্র দুইটির নির্দেশমত যস্কগোত্রীয় বা যস্কবংশীয় যে কোনো ব্যক্তিই যাস্ক নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। তাই বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বহু স্থলে যাস্কের উল্লেখ[১১] থাকিলেও সর্বত্রই এই নামে যে একই ব্যক্তি লক্ষিত হইয়াছেন তাহা বলা যায় না। 'তৈত্তিরীয়কাণ্ডানুক্রমণিকা'তে (৩।২৫) যাস্কের 'পৈঙ্গি' আখ্যা পাওয়া যায়। বেদের ব্রাহ্মণভাগে 'পৈঙ্গ্য' নামক এক প্রাচীন ঋষির নাম ও মতের উল্লেখ আছে। এই পৈঙ্গ্য হইতে যাস্কপৈঙ্গির উদ্ভব কিনা কে বলিবে? মহাভারতে শান্তি পর্বে (মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায়, ২৫৮-৫৯) নিরুক্তকার যাস্কের স্পষ্ট উল্লেখ বর্তমান।

নিরুক্তে পাণিনির উল্লেখ নাই। সেখানে শাকটায়ন, গার্গ্য, গালব প্রভৃতি যেসব আচার্যের নাম আছে তাঁহাদের অনেকেই কিন্তু পাণিনি-কর্তৃক অনুস্মৃত হইয়াছেন। আবার যেই শৌনক স্বীয় বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে যাস্কের নাম (২০বার) করিয়াছেন, সেই (?) শৌনকও পাণিনি-সূত্রে (৪।৩।১০৬) উল্লিখিত। অবশ্য উভয় শৌনকই এক ব্যক্তি কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। তথাপি এইসব প্রমাণের ভিত্তিতে নিরুক্তকার যাস্ক, পাণিনির পূর্ববর্তী এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীয় বলিয়া অনুমিত।

নিরুক্তের ১২টি অধ্যায় এবং ২টি পরিশিষ্ট। কাহারও মতে একই পরিশিষ্ট দুই অধ্যায়ে বিভক্ত। অর্বাচীন কালের যোজনা বলিয়া অনেকে এই পরিশিষ্টের নিরুক্তত্ব স্বীকার করেন নাই। নিরুক্তের প্রথম ছয় অধ্যায় 'পূর্বষট্ক' এবং শেষ ছয় অধ্যায় 'উত্তরষট্ক' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই দুই ষট্কে মোট ৫৭পাদ, ৪৫০ কাণ্ড। প্রতি অধ্যায়ে পাদসংখ্যা ৩হইতে ৭ পর্যন্ত। নিঘণ্টুকোষের তিন কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে নিরুক্তের প্রথম তিন অধ্যায়কে নৈঘণ্টুক কাণ্ড, পরবর্তী তিন অধ্যায়কে নৈগম কাণ্ড এবং শেষ ছয় অধ্যায়কে দৈবতকাণ্ড বলা হয়।

নির্‌পূর্বক বচ্‌ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয়যোগে 'নিরুক্ত' শব্দ সাধিত। নিঃশেষ বা নিরতিশয় বচন বা কথনই নিরুক্তের কাজ। এক একটি পদের সম্ভাবিত অবয়বার্থ নিঃশেষে (অর্থাৎ সম্পূর্ণতঃ, কিছু বাকী না

রাখিয়া নিশ্চিতভাবে) বলিয়া দেয় নিরুক্ত।[১২] এইরূপ অর্থ-কথন প্রক্রিয়াকেই বলা হয় নির্বচন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সর্বশেষ তন্ত্রযুক্তি নামক ১৫শ অধিকরণে নির্বচনের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—'গুণতঃ শব্দনিষ্পত্তির্নির্বচনম্' অর্থাৎ অন্তর্নিহিত গুণের (অর্থের) দ্বারা কোনো শব্দের নিষ্পত্তি দেখানোর নাম নির্বচন। এই কৌটিল্য-বাক্যের টীকায় গণপতি শাস্ত্রী ঃ 'অর্থান্বয়েন শব্দস্য প্রবৃত্তির্নির্বচনম্।' এইখানেই ব্যাকরণের 'ব্যুৎপত্তি' হইতে, নিরুক্তের 'নির্বচন'-এর পার্থক্য। প্রথমটি মুখ্যতঃ শব্দার্থনিরপেক্ষ এবং দ্বিতীয়টি শব্দার্থসাপেক্ষ। ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মের প্রয়োগে যেসব দুরূহ বা লুপ্তপ্রায় শব্দের অর্থনির্ণয় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই সব শব্দের নির্বচন বা নিরুক্তি প্রদর্শন নিরুক্তের অন্যতম প্রধান কার্য। স্বর ও সংস্কার, অর্থসামান্য, অক্ষরসামান্য, বর্ণ-সামান্য, বিভক্তিবিপরিণাম, লোপ, বিকার, বিপর্যয়, বর্ণোপজন বা বর্ণাগম এবং সম্প্রসারণাদির আশ্রয়ে একপদবিশিষ্ট ও অনেকপদবিশিষ্ট, কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত এবং সমাসান্ত[১৩] পদসমূহের নির্বচনের উপায় নিরুক্তের ২য় অধ্যায়ের প্রথমে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকলের অনুসরণে ব্যাকরণেও পঞ্চবিধ নিরুক্ত স্বীকৃত হইয়াছে ঃ

> বর্ণাগমো বর্ণবিপর্যয়শ্চ দ্বৌচাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।
> ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্।।
>
> —বাক্যপদীয় (?)

বর্ণাগম, বর্ণবিপর্যয়, বর্ণবিকার, বর্ণনাশ এবং ধাত্বর্থসম্বন্ধ—এই পাঁচ রকমের নিরুক্ত, অর্থাৎ নিরুক্তির উপায় বা কৌশল। ইহাদের প্রথম চারিটির উদাহরণ যথাক্রমে গবেন্দ্র, সিংহ, ষোড়শ এবং পৃষোদর শব্দ। পাণিনি তাঁহার 'পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টম্' (৬।৩।১০৯) সূত্রদ্বারা নিরুক্তির প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন।[১৪]

পাণিনীয় শিক্ষায় বেদের অঙ্গবিচারে নিরুক্তকে বলা হইয়াছে বেদের কর্ণ ঃ 'নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে'। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে নিরুক্তকে বরুণ দেবতার সহিত তুলনা করা হইয়াছে ঃ 'নিরুক্তং বরুণঃ প্রভুঃ।' দুর্গাচার্য অর্থকে প্রধান ও মুখ্য জ্ঞাতব্য রূপে ধরিয়া তদজ্ঞাপকনিরুক্তকে ষড়ঙ্গের এমন কি সর্বশাস্ত্রের মধ্যে প্রধান বলিয়াছেন। অর্থই প্রধান। ইহাই শব্দের আত্মা। ইহারই আবিষ্কারে অভিনিবিষ্ট থাকার জন্য নিরুক্তবেদাঙ্গের সর্বাধিক গুরুত্ব। অর্থপরিজ্ঞান-শাস্ত্ররূপে নিরুক্ত ক্রমে

ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ অখিল পুরুষার্থ লাভেরও সহায়ক বা কারণ হইয়া থাকে—ইহাই দুর্গাচার্যের অভিমত।

যাস্ক নিঘণ্টুকোষের সমস্তশব্দের নির্বচন দেখান নাই। নৈগম ও দৈবতকাণ্ডের প্রত্যেক পদের নির্বচন করিলেও নৈঘণ্টুক কাণ্ডের মোট ১৩৪১টি শব্দের মধ্য হইতে মাত্র ১২২টির নির্বচন দেখাইয়াছেন। অথচ তিনি নিঘণ্টু-বহির্ভূত ২২৭টি শব্দ, নিরুক্তের প্রথম তিন অধ্যায়ে আলোচনার জন্য গ্রহণ করিয়াছেন। মন্ত্রগত পদ ব্যতীত বহু লৌকিক শব্দও নিরুক্ত হইয়াছে, যেমন গো শব্দের নির্বচনপ্রসঙ্গে 'পয়স্' এবং 'ক্ষীর' শব্দ। নিঘণ্টুর অপর ব্যাখ্যাতা দেবরাজ যজ্বার মতে, নিঘণ্টুর অনালোচিত শব্দগুলি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য বলিয়া এবং তাহাদের আলোচনায় নিরুক্তের কলেবর অতিশয় বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া, যাস্ক সেই সব পরিহার করিয়াছেন। কাজেই দেখা যাইতেছে, তিনি অপেক্ষাকৃত কঠিন শব্দগুলির নির্বচনকার্যে সর্বাধিক ব্যস্ত থাকিয়া উহাদের যথাসম্ভব নির্ভুল নিরুক্তি প্রদানের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাই এই বিষয়ে বর্তমানে তাঁহার কিছু কিছু ত্রুটি লক্ষিত হইলেও তাহাকে বড় করিয়া না দেখাই ভাল। এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আধুনিক পণ্ডিতদের বিচারে যাস্কীয় নিরুক্তে প্রদর্শিত বেশীর ভাগ নির্বচনেই নানাবিধ ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে। এই বিষয়ে সবিশেষ জানিতে হইলে ডঃ সিদ্ধেশ্বর বর্মার 'The Etymologies of Yaska' (Hoshiarpur, 1953) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

নানা শাস্ত্রে, বিশেষ করিয়া ব্যাকরণে গভীর পাণ্ডিত্য লইয়া, শব্দের প্রয়োগ-পরিবেশ-বিচারপূর্বক যতদূর সম্ভব যুক্তিসিদ্ধ উপায়ে শব্দের নির্বচন করিতে হয়। এই কার্যে ধরাবাঁধা কোনো সাধারণ গাণিতিক পদ্ধতি নাই। অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং যুক্তিযুক্ত অনুমানই সর্বপ্রধান অবলম্বন। তাই অনেকে নিরুক্তশাস্ত্রকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত বলিয়া স্বীকারে পরাঙ্‌মুখ। বিজ্ঞানোচিত সর্বতোগ্রাহ্য বা সর্বতঃ প্রযুক্তব্য কোনও সাধারণ পদ্ধতিতে প্রাচীন নৈরুক্তগণ পৌঁছিতে পারেন নাই। বর্তমানেও যে এই বিদ্যা (Etymology) স্বয়ংসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকস্তরে উঠিতে পারিয়াছে এমন বলা চলে না। তবে প্রাচীন সময়ের তুলনায় এই যুগে ব্যাপকতর ঐতিহাসিক দৃষ্টি এবং তুলনা-মূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রভাবে এক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে বা অগ্রসর হইবার অবকাশ ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই।

(৭)

যাস্কীয় নিরুক্তের ভিত্তিতে বররুচি 'নিরুক্তসমুচ্চয়'[১৫] নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার প্রারম্ভিক এবং সর্বশেষ বর্ণনা হইতে জানা যায়, গ্রন্থকার ১৫০০ শ্লোক-পরিমিত এই গ্রন্থের চারিকল্পে ১০০ ঋকের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, যদিও গণনায় পাওয়া যায় ১০২টি। ১ম কল্পে সোদাহরণ ব্যাখ্যান-রীতি, ২য় কল্পে নিত্যকর্মে ব্যবহৃত মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা, ৩য় কল্পে দর্শপূর্ণমাসে ব্যবহৃত মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা এবং ৪র্থ কল্পে এক একটি করিয়া প্রৈষ, আহ্বান, স্তুতি, নিন্দা, সংখ্যা, আশিস্, কর্ম্ম ইত্যাদি ৩১ রকম মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

কেরলের অধিবাসী গার্গ্যবংশীয় কীরশর্ম্মার পুত্র নীলকণ্ঠ যজ্বা সন্ন্যাস-আশ্রমে 'পদ্ম' নাম ধারণপূর্বক 'নিরুক্তশ্লোকবার্তিক' নামে আর এক গ্রন্থ রচনা করেন।[১৬] নিরুক্তের দুর্গবৃত্তিতে এবং মণ্ডনমিশ্রকৃত স্ফোটসিদ্ধির 'গোপালিকা'[১৭] টীকায় যে নিরুক্তবার্ত্তিকের নাম ও উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, তাহা সম্ভবতঃ এই গ্রন্থেরই।

নিরুক্তের বিভিন্ন বৃত্তি বা টীকা ঃ (১) স্কন্দস্বামীর নিরুক্তটীকা, (২) দুর্গাচার্যকৃত 'ঋজ্বর্থা' বৃত্তি এবং (৩) মহেশ্বর-রচিত 'নিরুক্তভাষ্য-টীকা'। ইহাদের ১ম এবং ৩য়খানি এমন ভাবে মিশিয়া আছে যে, তাহা হইতে কোন্ অংশ কাহার রচনা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। কেহ বলেন, স্কন্দস্বামী ছিলেন মহেশ্বরের গুরু এবং উভয়ে মিলিয়া নিরুক্ত-ভাষ্যটীকা রচনা করেন। এই টীকায় নিরুক্তের টীকাকার বর্বরস্বামীর উল্লেখ আছে। ঋজ্বর্থাবৃত্তি অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে প্রতিটি পদের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। রচয়িতা দুর্গাচার্য জম্বূমার্গস্থ কোনো আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী ছিলেন। জম্বূমার্গ একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। পশ্চিম ভারতে নর্মদার পশ্চিম তীরে ইহার অবস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। বাঙালী পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী (১৮৪৬–১৯১১) সংস্কৃত ভাষায় যে 'নিরুক্তালোচনম্' গ্রন্থ (কলিকাতা, ১৮৯০) রচনা করেন, তাহাতে পাণিনিকে যাস্কের পূর্ববর্ত্তী প্রমাণ করিতে তিনি যে প্রয়াস স্বীকার করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় হইলেও তাঁহার সেই মত এখন অচল। মিথিলার মুকুন্দশর্ম্মা নিরুক্তের প্রথম সাত পাদের উপর 'নিরুক্তলঘুবৃত্তি' নামে যে সরল ও সোদাহরণ টীকা রচনা করেন, তাহাকে 'সপ্তপাদী'ও বলা হয়। পরে ইহাকে ১৩শ অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা হইয়াছে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে

ইহার রচনারম্ভ, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্তি। নিরুক্তের অত্যাধুনিক টিপ্পনীকারদের মধ্যে দাধিমথশিবদত্ত শর্মা এবং বৈজনাথ কাশীনাথের নাম উল্লেখ্য। নিরুক্ত-গবেষণার ক্ষেত্রে দুইটি বিখ্যাত নাম : (১) লক্ষ্মণ স্বরূপ এবং (২) সিদ্ধেশ্বর বর্মা। ইঁহাদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। লক্ষ্মণস্বরূপ সম্পাদিত এবং ইংরেজী ভাষায় অনূদিত (নিঘণ্টুসহ) নিরুক্তই এই গ্রন্থের সর্বাধিক আদৃত এবং প্রামাণিক সংস্করণ। তিনি স্কন্দস্বামীর এবং মহেশ্বরের নিরুক্তটীকাদ্বয়ও সুষ্ঠুসম্পাদনাপূর্বক প্রকাশ করিয়াছেন।

নিঘণ্টুর আর এক ব্যাখ্যাতা দেবরাজ যজ্বা। দক্ষিণভারতের অধিবাসী তিনি। তাঁহার ব্যাখ্যার নাম 'নৈঘণ্টুককাণ্ডনির্বচন'। খ্রীঃ ১২শ শতকের প্রারম্ভে (অন্ততঃ প্রথমার্ধে) ইহা রচিত হয়। নৈঘণ্টুককাণ্ডস্থ এবং যাস্ক-কর্তৃক অনালোচিত শব্দসমূহের নির্বচন প্রদর্শনই এই ব্যাখ্যা রচনার প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেই জন্যই ইহার ঐরূপ নামকরণ। গ্রন্থারম্ভে দেবরাজের উক্তি হইতে জানা যায়, তিনি নিঘণ্টুর ক্ষীরস্বামি-অনন্তাচার্যাদি-প্রণীত ব্যাখ্যাও দেখিয়াছিলেন।

সোমেশ্বর-রচিত 'শ্রুতিশব্দার্থনিঘণ্টু' বা 'শ্রুতশব্দাথনিঘণ্টু' এক বৈদিক শব্দকোষ। ইহার প্রারম্ভে বলা হইয়াছে, নিঘণ্টুতে এবং জ্ঞান-কোষে যাহা বলা হয় নাই বা সহজ করিয়া ব্যাখ্যাত হয় নাই এমন সব বৈদিক শব্দের অর্থ ও লিঙ্গাদির বর্ণনা করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। ইহা হইতে জানা গেল, অধুনা-লুপ্ত জ্ঞানকোষেও বৈদিক শব্দাবলীই বিন্যস্ত ছিল। খ্রীঃ ১৭শ শতকের শেষ দিকে ভাস্কর রায় নিরুক্তের ব্যাখ্যাবলম্বনে বৈদিক নিঘণ্টুসমূহকে শ্লোকবদ্ধ করিয়া আর এক কোষ রচনা করেন। অমরাদি লৌকিক শব্দকোষে বৈদিকাংশের অভাব পূরণ করা, এই রচনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। নারায়ণ যজ্বা ইহার এক টীকা রচনা করেন। জম্মুর শ্রীরঘুনাথ-সংস্কৃত-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক রামপ্রপন্ন শাস্ত্রী এবং জয়পুররাজ-সভার প্রধান পণ্ডিত মধুসূদন বিদ্যাবাচস্পতি, নিঘণ্টুর শব্দাবলীকে কারিকাবদ্ধ করিয়া পৃথক্‌ভাবে যথাক্রমে 'শ্লোকসমাম্নায়' এবং 'সরস্বতীমালিকা' নামে দুই বৈদিক কোষ প্রস্তুত করেন। সহজ অভ্যাসের উদ্দেশ্যে শব্দাবলীর পৌর্বাপর্য রক্ষা করিতে গিয়া প্রথমটির রচনা সর্বত্র যথেষ্ট সুষ্ঠু করা সম্ভবপর হয় নাই। শাস্ত্রিমহাশয় নিরুক্তের প্রথম চারি অধ্যায় ও ৭ম অধ্যায়ের উপর

প্রপন্নালোক নামে এক টীকাও রচনা করেন (১৯১১)। ইহা শ্লোকসমাম্নায় সহ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। নিঘণ্টুর শব্দক্রম-রক্ষার চেষ্টা পরিহার করায় সরস্বতীমালিকার রচনা অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু এবং শ্রুতিমধুর হইয়াছে। ১০বর্গে বিভক্ত এই গ্রন্থ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরে প্রকাশিত হয়।

ইদানীন্তনকালে বহু পাশ্চাত্ত্য এবং ভারতীয় পণ্ডিত ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বৈদিক শব্দসমূহের সংগ্রহ এবং অর্থনির্ণয়ের চেষ্টাও করিয়াছেন। অর্থনির্ণয় অপেক্ষা শব্দসংগ্রহের চেষ্টাই এযাবৎ বেশী হইয়াছে বলা চলে। অবশ্য আগে শব্দ আহরণের কার্য সমাধা হইলেই পরে উহার অর্থ জ্ঞাপনের কথা উঠে। ১৮৭২ ও ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্সমূলার সাহেব তৎসম্পাদিত ঋগ্‌বেদের পরিশিষ্টরূপে গ্রন্থের অন্তর্গত শব্দসমূহের দুইটি তালিকা প্রকাশ করেন। এই সময়ে প্রকাশিত গ্রাসম্যান সাহেবের 'Worterbuch zum Rgveda' (Leipzig, 1873) নামক অভিধান উল্লেখযোগ্য।সমগ্র ঋগ্‌বেদের শব্দগুলিকে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত করিয়া দুই খণ্ডে এই গ্রন্থ রচিত। শৌনকীয় অথর্ববেদসংহিতার W.D. Whitney-কৃত 'Index Verborum' (1881) সুষ্ঠু প্রচেষ্টার ফল। ইহার পরে উল্লেখ্য—১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে হইতে প্রকাশিত G.A. Jacob-কৃত 'A Concordance to the Principal Upanisads and Bhagavadgita'; ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এবং S. P. Pandit-সম্পাদিত শৌনকীয় অথর্ববেদসংহিতার ৩য় খণ্ডের শেষে উপনিবদ্ধ Index এবং Bloomfield-সাহেবের 'A Vedic Concordance' (1906)। আর্যসমাজের স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ এবং স্বামী নিত্যানন্দ সর্বপ্রথম বেদের সমস্ত বিভাগের শব্দাবলী সংগ্রহপূর্বক এক বৈদিক শব্দার্থকোষ রচনার সঙ্কল্প করিয়া, সমগ্র চতুর্বেদের সমস্ত শব্দের যে বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করেন, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪খণ্ডে এই নামে তাহা প্রকাশিত হয়—(১) 'A Complete Alphabetical Index of all the words in the Rgveda,' (২) 'A Complete Alphabetical Index of all the words in the Yajurveda', (৩) 'A Complete Alphabetical Index of all the words in the Sama Veda' এবং (৪) 'A Complete Alphabetical Index of all the words in the Atharvaveda'. ইহার পর উল্লেখ করিতে হয় Simon—সাহেবের

'Index Verborum' to Scroeder's edition of Kathaka Yajurveda Samhita (1912), Macdonell এবং Keith সাহেবের যুগ্ম কর্তৃত্বে রচিত 'Vedic Index of Names and Subjects'(1912), দয়ানন্দ-মহাবিদ্যালয়স্থ অনুসন্ধান বিভাগের পুস্তকাধ্যক্ষ হংসরাজ-কর্তৃক সঙ্কলিত 'বৈদিক কোষ' (১ম খণ্ড, ১৯২৬) এবং মহামহোপাধ্যায় পরশুরাম শাস্ত্রি-কর্তৃক পুণা হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Word Index to Taittiriya-Samhita.' ইহাদের মধ্যে হংসরাজের বৈদিক কোষে ১৫খানি ব্রাহ্মণের অন্তর্গত পদসমূহের অর্থ ও নির্বচনাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

আর্যসমাজের পূর্বোক্ত সন্ন্যাসিদ্বয়ের পরিকল্পনা-রূপায়ণের ভার লাহোর দয়ানন্দ ব্রাহ্ম মহাবিদ্যালয়ের আচার্য বিশ্ববন্ধুশাস্ত্রীর উপর ন্যস্ত হইলে তিনি সার্থক বৈদিক কোষ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ১৯২৯খ্রীষ্টাব্দে 'বৈদিক শব্দার্থ পারিজাত' নামে পূর্বোক্ত শব্দসংগ্রহের কিয়দংশের অর্থাদি প্রকাশ করেন। ইহাতে শব্দের পূর্ণ ব্যাকরণ, নিরুক্তি তথা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। ইহার অন্যান্য অংশের প্রকাশ স্থগিত রাখিয়া শাস্ত্রি-মহাশয় আরও ব্যাপকতর (ব্যাপকতম বলিলেই ঠিক হয়) ভাবে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যেরই শব্দরাশিকে কোষ-বদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। এই কার্যনির্বাহের জন্য সুবিশাল বৈদিক সাহিত্যকে যে চারিভাগে ভাগ করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইতেই এই পরিকল্পনার ব্যাপকতা বুঝা যাইবে। সেই বিভাগগুলি এইরূপ ঃ (১) বৈদিক সংহিতা ও খিলসূত্রসমূহ, (২) ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক সমূহ, (৩) উপনিষদ্, উত্তরমীমাংসা, সাংখ্য, যোগ এবং ভগবদ্গীতা এবং (৪) শ্রৌতসূত্র, আপস্তম্ব মন্ত্রপাঠ ও সুপর্ণাধ্যায়, গৃহ্যসূত্র, পিতৃমেধসূত্র, অথর্বপরিশিষ্টসমূহ, শিক্ষাসমূহ, পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী, ঐ ধাতুপাঠ, বার্ত্তিকপাঠ, ফিট্সূত্র, ইষ্টিসমূহ, গণপাঠ (সূত্র ও বার্ত্তিকস্থ), উণাদিসূত্র, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, মীমাংসাসূত্র ও সমরাঙ্গণসূত্রধার। এই চারি বিভাগের প্রত্যেকটিতেই তত্তদ্বিভাগীয় গ্রন্থসমূহের (ইহাদের মোট সংখ্যা প্রায় ৪২৫) শব্দাবলীকে অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত করিয়া, ইহার এক সাধারণ নাম দেওয়া হইয়াছে 'বৈদিক পদানুক্রমকোষ' ('A Vedic Word-Concordance')। মোট ১৬ খণ্ডে (১৯৩৫–৬৫) এই মহাকোষ V.V. R. Institute, Hoshiarpur হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সর্বশেষ

(অতিরিক্ত) দুই খণ্ডে পূর্বোক্ত চতুর্বিভাগীয় ধাতুপ্রাতিপদিকসমূহ আদ্যাক্ষরানুক্রমে (১ম খণ্ডে) এবং অন্ত্যাক্ষরানুক্রমে (২য় খণ্ডে) সংগৃহীত।

(৮)

বৈদিক নিঘণ্টুর পরেই লৌকিক সংস্কৃত শব্দকোষগুলির উল্লেখ করিতে হয়। অমরকোষকে ইহাদের মধ্যমণিরূপে ধরিয়া, তৎপূর্ববর্তী কোষগুলির কথা প্রথমে বলা দরকার। নিঘণ্টু হইতে ইহাদের পার্থক্য অনেক। নিঘণ্টুসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য, বেদের দুর্জ্ঞেয় অংশের অর্থবোধে সাহায্য করা, অপর পক্ষে পরবর্তী সংস্কৃত কোষগুলির প্রধান উদ্দেশ্য সংস্কৃত ভাষার শব্দসম্ভারের সহিত সাহিত্যিকদের পরিচয় ঘটাইয়া দেওয়া। তাই শ্রীহর্ষ, বাণ, ময়ূর, মুরারি প্রভৃতি কবি ও লেখকদের নামের সহিত অনেক শ্লেষার্থপদসংগ্রহের যোগ দেখা যায়। সে যাহাই হউক, নিঘণ্টুর বিষয় কেবল নামসমূহই নয়, ক্রিয়াও ; কিন্তু এই সব সংস্কৃত শব্দকোষের বিষয়বস্তু কেবল নাম ও অব্যয়সমূহ। নিঘণ্টুর তুলনায় ইহাদের প্রয়োগ-বা ব্যবহার-ক্ষেত্রও ব্যাপকতর, রচনা-শৈলীর তথা শব্দসজ্জাদির পার্থক্য তো আছেই।

সুপ্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত রচিত এইসব কোষ ও তাহাদের টীকা-টিপ্পনীসহ যে বিচিত্র কোষ-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা পরিমাণে বড় কম নয়। অন্য গ্রন্থাদিতে সাধারণতঃ বিখ্যাত কোষগুলিরই উল্লেখ পাওয়া যায়, অবিখ্যাতগুলির নাম থাকে ক্বচিৎকদাচিৎ। বৈদিক নিঘণ্টুর পরবর্তী এবং অমরকোষের পূর্ববর্তী কোনো কোষগ্রন্থই বর্তমানে না পাওয়া গেলেও, ঐরূপ নামমাত্র উল্লেখের মধ্যে এবং স্থলবিশেষে অকিঞ্চিৎকর উদ্ধৃতিতে তাহারা কথঞ্চিৎ টিকিয়া আছে। কোষকারের নামেই এই সবের বেশীর ভাগ পরিচয়।

অমর-পূর্ব শব্দকোষগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ বররুচি (কাত্যায়ন)-কৃত 'ইন্দ্রনিঘণ্টু' বা 'ঐন্দ্রনিঘণ্টু', কাত্য-রচিত 'নামমালা,' ব্যাড়ি-রচিত 'উৎপলিনী,' বাচস্পতি-প্রণীত 'শব্দার্ণব,' ভাগুরিকৃত 'ত্রিকাণ্ড' (কোষ), বাসুকি-রচিত শব্দকোষ এবং অজ্ঞাত-কর্তৃক 'রত্নকোষ'। অমর-কোষের টীকায় (১।১।২, ১।১।৪) সর্বানন্দ (বন্দ্যোপাধ্যায়) ত্রিকাণ্ড এবং উৎপলিনী-কে 'নামমাত্রতন্ত্র' এবং রত্নকোষকে স্ত্রীপুংনপুংসক-

কাণ্ডাত্মক বলিয়াছেন। অমর-টীকাকার ক্ষীরস্বামীর মতে 'মালা' নামক কোষ এবং কোষকার ভাগুরি ও ধন্বন্তরি, অমরসিংহাপেক্ষা প্রাচীন (দ্রঃ অমরকোষোদ্‌ঘাটন ২।৯।৫১, ২।৪।৫০,২।৪।৯৩)।

ধন্বন্তরির গ্রন্থকে 'ধন্বন্তরিনিঘণ্টু' বলা হইয়াছে। ইহা বৈদ্যক শব্দের কোষ। এই জাতীয় কোষ সাধারণতঃ নিঘণ্টু, নিঘণ্ট বা নির্ঘণ্ট নামে প্রচলিত। ঔষধের নাম, ঔষধের উপাদানরূপে ব্যবহার্য বৃক্ষগুল্মাদির নাম, তৎসংক্রান্ত প্রাণীদের নাম, রোগ ও পথ্যাপথ্যের নাম—এক কথায় ব্যাধি ও তাহার চিকিৎসাঘটিত যাবতীয় বিষয়েরই পর্যায়-বদ্ধ বর্ণনা, এইসব নিঘণ্টুর উপজীব্য। খ্রীঃ ২য় শতাব্দীয় (১ম)বাগ্‌ভটের বৈদ্যক নিঘণ্টু, ধন্বন্তরিরও পূর্বে রচিত। ভাগুরি-কোষের 'ত্রিকাণ্ড' নামের মূলে কি কারণ ছিল, ঠিক ঠিক বলা যায় না। তাঁহার নামে উদ্ধৃতাংশগুলির সমস্তই প্রায়শঃ শ্লোকাত্মক এবং পর্যায়জ্ঞাপক। অমরসিংহ স্বীয় কোষ-রচনায় ইহার দ্বারা খুবই প্রভাবিত হইয়াছিলেন মনে হয়। অমরকোষের ত্রিকাণ্ড-বিভাগের মূলেও ভাগুরির ত্রিকাণ্ডের অনুকরণ অসম্ভব নয়। শব্দার্ণবকে 'বাচস্পতিকোষ'ও বলা হইত। ব্যাড়ির যে গ্রন্থকে উপলক্ষ্য করিয়া সর্বানন্দ 'লিঙ্গমাত্রতন্ত্র' বিশেষণের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা আসলে হর্ষবর্ধন এবং বামন-কর্তৃক উল্লিখিত ব্যাড়ির 'লিঙ্গানুশাসন'। লিঙ্গানুশাসন এবং শব্দকোষ ঠিক এক জাতীয় গ্রন্থ নয়। প্রথমটির মুখ্য উদ্দেশ্য, শব্দের লিঙ্গনির্দেশ করা এবং দ্বিতীয়টির প্রধান উদ্দেশ্য, শব্দের অর্থ জানাইয়া দেওয়া। উপচিত শব্দরাশি অবশ্য সর্বত্রই মূলভিত্তি। শব্দকোষে শব্দের লিঙ্গনির্দেশও থাকে বলিয়া, ইহার সহিত লিঙ্গানুশাসনের এতদ্‌বিষয়ক সাদৃশ্য। লিঙ্গানুশাসনে শব্দের অর্থবর্ণনা থাকে না এবং প্রায় প্রত্যেক ব্যাকরণ-সম্প্রদায়েই তদনুসারী অন্ততঃ একখানা করিয়া লিঙ্গানুশাসনের পৃথক্ গ্রন্থ থাকে। শব্দকোষের ক্ষেত্রে এইরূপ কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম না থাকিলেও, কোনো কোনো শব্দকোষে, বিশেষতঃ অমরকোষের কোনো কোনো টীকা-রচনায় ঐ ধরনের সাম্প্রদায়িক প্রভাব লক্ষিত হয়। বররুচি-প্রণীত লিঙ্গবিষয়ক গ্রন্থ 'লিঙ্গবিধি'। অমরটীকায় (২।৬।৩৯) সর্বানন্দ 'বররুচিলিঙ্গসূত্র' হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। কাজেই একই ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজন-বোধে শব্দের লিঙ্গনির্দেশক এবং অর্থনির্দেশক দুই পৃথক্ গ্রন্থরচনাও খুবই স্বাভাবিক এবং কালক্রমে সেই সব গ্রন্থের

অভাব হইলে, তাহাদের স্বরূপ নির্ণয়ের ব্যাপারে, অন্যত্র-প্রাপ্ত অকিঞ্চিৎকর উদ্ধৃতিমাত্রকে সম্বল করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। অমরকোষের 'ত্রিকাণ্ডচিন্তামণি' টীকার (১।১।২) প্রারম্ভে 'তথাচ উৎপলিন্যাদ্যসংক্ষিপ্তং...' বলায়, উৎপলিনী-কোষের বিরাটত্ব সূচিত। এই বিশালতা ছিল ব্যাড়ির রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তৎপ্রণীত লক্ষ শ্লোকাত্মক 'সংগ্রহ' নামক ব্যাকরণ–বিষয়ক গ্রন্থ অত্যধিক বিশাল ছিল বলিয়াই ক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উৎপলিনীর বৃহত্ত্বের মূলে ছিল বোধ হয় পুনরুক্তি দোষ।

খ্রীঃ পূর্ব ৪র্থ শতাব্দীয় বররুচি কাত্যায়ন —যিনি অষ্টাধ্যায়ীর বার্ত্তিক রচনা করেন, প্রথম জীবনে ঐন্দ্র ব্যাকরণের ছাত্র ছিলেন। কাজেই তাঁহার পক্ষে 'ঐন্দ্রনিঘণ্টু' রচনা করা বা ঐ নামে তাঁহার গ্রন্থের প্রচলন হওয়াই স্বাভাবিক। ইহা মৈত্রেয়রক্ষিত-দৃষ্ট 'ইন্দ্রকোষ'ও হইতে পারে। ক্ষীরস্বামী তাঁহার অমরটীকায় কাত্যের নামে বহু উদ্ধৃতি দিয়াছেন। সেই সব হইতে প্রতীয়মান হয়, কাত্যের কোষে পর্যায়বদ্ধ এবং নানার্থ— উভয়বিধ শব্দই বর্ণিত হইয়াছিল। বাচস্পতি বোধহয় ব্যাড়িরও পূর্ববর্তী। খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীয় কেশব তাঁহার কল্পদ্রুকোষের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন ঃ

কাত্যবাচস্পতিব্যাড়িভাগুর্যমরমঙ্গলাঃ।
সাহসাঙ্কমহেশাদ্যা বিজয়ন্তে জিনান্তিমাঃ।।

এখানকার নামোল্লেখ যদি কালানুক্রমিক হয়, তবে কাত্যের পর বাচস্পতি, তাঁহার পর ব্যাড়ি এবং ব্যাড়ির পর ভাগুরি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'হারাবলী'র শেষে (২৭৩নং শ্লোক) পুরুষোত্তমদেবও উৎপলিনীর পূর্বে শব্দার্ণবের উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্ধৃতি হইতে অনুমান হয়, একই শব্দের বিভিন্ন বানান-প্রদর্শন ছিল শব্দার্ণবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৯)

অমরকোষের প্রকৃত নাম নামলিঙ্গানুশাসন হইলেও, রচয়িতার নামানুসারে ইহা 'অমরকোষ' নামেই অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অমর (সিংহ) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া অনুমিত। এই অনুমানের পক্ষে একমাত্র যুক্তি—গ্রন্থের প্রারম্ভে স্বর্গবর্গের প্রথমেই সম্পূর্ণ তিনটি

শ্লোকে বুদ্ধদেবের নামানুকীর্তন। তবে বৌদ্ধ হইয়াও তিনি স্বীয় রচনাকে বৌদ্ধ প্রভাবের দ্বারা অযথা ভারাক্রান্ত করেন নাই। ফলে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলের নিকটই ইহা সমান আদরণীয় হইয়াছে। বৌদ্ধ সুভূতিচন্দ্র, জৈন আশাধর পণ্ডিত ও নাছিরাজ এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নির্দ্বিধায় অমরকোষের টীকা রচনা করিয়াছেন। তা'ছাড়া ইহার সর্বত্র বেদাঙ্গ-ব্যাকরণ পাণিনির অনুসরণ-চিহ্ন বর্তমান। বৌদ্ধ চন্দ্রগোমীর (খ্রীঃ ৫ম শতক) ব্যাকরণের অনুসরণ না করিয়া পাণিনির অনুসরণ করায়, কেহ কেহ অমরসিংহকে চন্দ্রগোমীর পূর্ববর্তী বলিয়া থাকেন।

এক কিংবদন্তী অনুসারে মীমাংসা-ভাষ্যকার শবর স্বামীর পুত্র এই অমর সিংহ। মহাকবি কালিদাসের নামে প্রচারিত 'জ্যোতির্বিদাভরণ' নামক গ্রন্থ (১২।১০) হইতে জানা যায়, রাজা বিক্রমের সভাসদ্-নবরত্নের অন্যতম ছিলেন তিনি।[১৮] নবরত্নের বাকী আট জন—ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটখর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির এবং বররুচি। ইঁহাদের অনেকেরই নাম কোষগ্রন্থাদির সহিত জড়িত দেখা যায়। ধন্বন্তরির বৈদ্যকনিঘণ্টুর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মহাক্ষপণকের নামে এক 'অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী' কোষের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ক্ষপণকের নামে একাধিক ব্যাকরণ-গ্রন্থের উল্লেখও দেখা যায়। কালিদাসও নাকি 'নানার্থশব্দরত্ন' নামে এক শব্দকোষ রচনা করেন। শাশ্বতের 'অনেকার্থ-সমুচ্চয়' নামক কোষ, বরাহের সহিত পরামর্শক্রমে রচিত হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য স্বয়ং 'সংসারাবর্ত' কোষের রচয়িতা। খ্রীঃ ১৩শ শতকে বোপদেব তাঁহার 'কবিকল্পদ্রুম'-গ্রন্থারম্ভে অমরকে অষ্টশাব্দিকের অন্যতমরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। 'অমরসিংহোঽপি পাপীয়ান্ সর্বং ভাষ্যমচূচুরৎ'—এই একদা-প্রচলিত তিরস্কার-বাক্য হইতে মনে হয়, অমর সিংহ মহাভাষ্যের অবলম্বনে এক ব্যাকরণ গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য আভিধানিক অমরকেও শাব্দিক বলিতে বাধা নাই। বোপদেবের পূর্ববর্তী ক্ষীরস্বামী (খ্রীঃ ১১শ শতক) অমরকোষের যে টীকা রচনা করেন তাহা, অমরকোষের এযাবৎ প্রাপ্ত টীকাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। তৎপূর্বে খ্রীঃ ৯ম শতকে রচিত জৈন শাকটায়নের অমোঘ-বৃত্তিতে অমরকোষের উদ্দেশ বর্তমান। তাঁহারও আগে ৮ম শতকের প্রারম্ভে রচিত 'কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা'তে জিনেন্দ্র-বুদ্ধি অমরকোষ হইতে 'তন্ত্রং প্রধানে সিদ্ধান্তে' (৩।৩।১৮৫) উদ্ধৃত

করিয়াছেন। ইহারও প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনী-বাসী গুণরাত চীনা ভাষায় অমরকোষের অনুবাদ করেন। কোনও গ্রন্থকে সেই প্রাচীন যুগে, বিদেশী ভাষায় অনূদিত হওয়ার মতো প্রামাণিকতা ও খ্যাতি অর্জন করিতে, উহার রচনার সময় হইতে অন্ততঃ শতাধিক বৎসর অতিবাহিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। সেই অনুসারে খ্রীঃ ৪র্থ শতকের শেষ ভাগকে ইহার রচনাকাল বলিয়া ধার্য করা যায়। অমরের পৃষ্ঠপোষক (পোষ্টা) বলিয়া অনুমিত, বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী গুপ্তসম্রাট্ ২য় চন্দ্রগুপ্ত এই সময়েই (৩৭৬–৪১৪, মতান্তরে ৩৮০–৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্ব করিয়াছেন। তিনি সাহসাঙ্ক নামেও অভিহিত। মালব হইতে শকদিগকে বিতাড়িত করিয়া তিনি উহার রাজধানী উজ্জয়িনী দখল করেন এবং 'শকারি' বলিয়া কথিত হন। এই উজ্জয়িনীতে যে কাব্যকারদের পরীক্ষার কথা কাব্যমীমাংসায় (১০ম অধ্যায়) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কালিদাসাদির সহিত অমরও আছেন।

তিন কাণ্ডে বিভক্ত বলিয়া অমরকোষকে 'ত্রিকাণ্ড'ও বলা হয়। প্রত্যেক কাণ্ড আবার কয়েকটি বর্গে বিভক্ত। 'বর্গ' অর্থে একজাতীয় বহুর সমাবেশ বা প্রকরণ বুঝায়। কেহ ইহাকে 'সজাতীয়সমূহ' বলিয়াছেন। তিন কাণ্ডে মোট বর্গসংখ্যা ২৪। মোট ২৬ বর্গের কথাও শুনা যায়—যাহা বর্তমানে অপ্রচলিত কোনও সংস্করণে থাকা অসম্ভব নয়। স্বর্গবর্গের (১।১।২৭) টীকায় সর্বানন্দ যে 'বৃদ্ধামরকোষ' এবং অন্যত্র রায়মুকুট ও ভানুজিদীক্ষিত 'বৃহদমরকোষে'র নাম করিয়াছেন, তাহাতে সম্ভবতঃ ২৬ বর্গ ছিল। উদ্ধৃতি হইতে প্রতীয়মান হয়, ইহার সহিত বর্তমান অমরকোষের স্থল-বিশেষে কিছু কিছু পাঠভেদও ছিল।

এই বর্গবিভাগের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, কোষকার কম-বেশী সমস্ত বিষয়েরই সমাবেশ তাঁহার গ্রন্থে ঘটাইয়াছেন। পর্যায়ার্থ ও নানার্থ কোষের সহিত বৈদ্যক নিঘণ্টু ও উদ্ভিদ্ নিঘণ্টু এবং লিঙ্গানুশাসনাদির সমন্বয় ঘটাইয়া তাঁহাকে গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে হইয়াছে। এই সম্পূর্ণতা ('সর্বোৎকর্ষাৎ সম্পূর্ণং গুণৈঃ সম্পন্নং...'—রঘুনাথ চক্রবর্তী) বা পূর্ণাঙ্গতাই তৎপূর্ববর্তী অন্যান্য কোষের সহিত তুলনায় ইহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এবং এই কারণেই ইহা ক্রমে অন্য প্রাচীন কোষগুলিকে পশ্চাতে তথা অবলুপ্তির পথে ঠেলিয়া দিয়া নিজেকে

চিরস্থায়িত্বের অমর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। পাণিনির ব্যাকরণ যেমন পূর্বাচার্যদের ব্যাকরণগুলিকে পশ্চাতে ফেলিয়া এবং পরবর্তী ব্যাকরণগুলিকে প্রভাবিত করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কোষ-সাহিত্যেও অমরকোষের অবস্থা ঠিক সেইরূপ। অমর সিংহের পরবর্তী কোষকারগণও তাঁহার প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের সহিত অমরকোষকে যুক্ত করিয়া উভয়কে যথাক্রমে মাতা-পিতার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে ঃ

অষ্টাধ্যায়ী জগন্মাতাঽমরকোষো জগৎপিতা।

(১০)

সংস্কৃত ভাষায় রচিত অন্য যে কোনো গ্রন্থের তুলনায় অমরকোষের টীকা-টিপ্পনীর সংখ্যা বেশী। আমরা অন্যত্র[১৯] শতাধিক অমরটীকার উল্লেখ করিয়াছি। ইহাদের অধিকাংশেরই রচয়িতা বাঙালী পণ্ডিত। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, বঙ্গদেশেই অপাণিনীয় ব্যাকরণ-সম্প্রদায়গুলির সর্বাধিক প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়েই তদনুসারী অমরটীকাও রচিত হইয়াছিল একাধিক। সম্ভবতঃ অমরকোষের টীকা রচনার দ্বারা পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন এবং গ্রন্থকার হওয়ার লোভ, পণ্ডিত সমাজকে একদা খুব বেশী চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। বাস্তবিক শব্দবিদ্যা-বিলাসের ইহাই ছিল অপেক্ষাকৃত সুগম ক্ষেত্র। দুই/চারিখানি প্রাচীন কোষ এবং টীকা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া, ভাষার একটু হেরফের ঘটাইয়া, অধ্যাপকেরা অনেকেই নূতন নূতন সুন্দর নামে এক একটি অমরটীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। কাজেই ইহাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক গ্রন্থেই মৌলিকতার ছাপ স্পষ্ট। ক্ষীরস্বামীর অমরকোষোদ্‌ঘাটন, সর্বানন্দের 'টীকাসর্বস্ব', রায়মুকুটের 'পদচন্দ্রিকা' এবং ভানুজি দীক্ষিতের 'ব্যাখ্যাসুধা'কে ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা চলে। পরবর্তী স্তরে রমানাথের 'ত্রিকাণ্ডবিবেক,' রঘুনাথ চক্রবর্তীর 'ত্রিকাণ্ড চিন্তামণি' এবং ভরতমল্লিকের 'মুগ্ধবোধিনী' উল্লেখযোগ্য।

ক্ষীরস্বামী খ্রীঃ ১১শ শতকের শেষার্ধের পণ্ডিত। শব্দশাস্ত্রে একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা তিনি । তাঁহার জন্মস্থান লইয়া মতভেদ আছে। পূর্ণনাম ক্ষীরস্বামী ভট্ট। কাশ্মীরী পণ্ডিত ভট্টেন্দুরাজ ছিলেন তাঁহার গুরু। অমরকোষোদ্‌ঘাটনের রচনাশৈলী উৎকৃষ্ট, ভাষা প্রাঞ্জল এবং

বক্তব্য স্পষ্ট। অন্য মতের সমালোচনাও আছে। অনেক স্থলে মূল গ্রন্থকার অমরসিংহেরও ভ্রান্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাকরণের দিক্ দিয়া ক্ষীরস্বামী পাণিনির মতানুবর্তী।

পূর্ববর্তী ১০খানি টীকার অবলম্বনে ১১৫৯।৬০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বানন্দের টীকা রচিত হয়। রাঢ়ের বন্দ্যঘটী কুলে অর্থাৎ বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশে তাঁহার জন্ম। প্রায় ২০০ গ্রন্থ হইতে টীকাসর্বস্বে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আছে প্রায় ২০খানি বৌদ্ধ গ্রন্থ এবং বহু পুরাণ। ভাগবতপুরাণের নাম নাই। এই টীকার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে অনেক সংস্কৃত শব্দের বাঙ্‌লা প্রতিশব্দও প্রদত্ত হইয়াছে।

১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'পদচন্দ্রিকা'র রচনা চলিতেছিল, ইহার প্রমাণ গ্রন্থ-মধ্যেই বিদ্যমান। রচয়িতা রায়মুকুট, 'বৃহস্পতি' প্রভৃতি নানা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। রায়মুকুটও এক উপাধি। প্রকৃত নাম মতিলাল। পশ্চিমবঙ্গের 'মহিন্ত' গ্রামে, বাৎস্যগোত্রে ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম। পণ্ডিত-জীবনে তিনি একাধিক জমিদার এবং রাজপুরুষের পোষকতা লাভ করেন। ইঁহাদের মধ্যে গৌড়ের রাজা গণেশের পুত্র যদু বা জালাল-উদ্দিন মহম্মদ (১৪১৩-৩১খ্রীষ্টাব্দ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পদচন্দ্রিকা সর্বাধিক উদ্ধৃতিবহুল টীকা। উদ্ধৃত গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারদের সংখ্যা এক মতে ২৭০। টীকাকারের উক্তি হইতে জানা যায়, ১৬খানি অমরটীকা-অবলম্বনে তিনি স্বগ্রন্থ রচনা করেন। ব্যাকরণমতের দিক্ দিয়া তিনিও পাণিনির সম্প্রদায়-ভুক্ত। তাঁহার গুরু নারায়ণ সর্বজ্ঞও 'নামনিধান' নামে এক শব্দকোষ রচনা করেন। তাহা হইতেও পদচন্দ্রিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

ব্যাখ্যাসুধার রচনা-কাল খ্রীঃ ১৭শ শতকের প্রথমভাগ। রচয়িতা ভানুজি ছিলেন বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদীর প্রণেতা ভট্টোজি দীক্ষিতের পুত্র এবং ছাত্র। মহীধরের (?) বঘেলবংশীয় রাজা কীর্তি সিংহের আজ্ঞায় ব্যাখ্যাসুধা রচিত হয়। ভানুজি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং রামভদ্রাশ্রম বা রামাশ্রম নাম গ্রহণ করেন। এই নামানুসারে তাঁহার টীকাকে 'রামাশ্রমী'ও বলা হয়। ইহাও পাণিনির ব্যাকরণ-সম্মত ('মুনিত্রয়মতানুগা')। রচনা অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ। রায়মুকুটাদির ভ্রম প্রদর্শনের দ্বারা বিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ভানুজির ভ্রাতা

বীরেশ্বর দীক্ষিতের পুত্র হরি দীক্ষিতও ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে অমরকোষের এক টীকা রচনা করেন।

রমানাথ বিদ্যাবাচস্পতির ত্রিকাণ্ডবিবেকের নামান্তর 'ত্রিকাণ্ডরহস্য'। কোথাও বা 'ত্রিকাণ্ডরহস্যপ্রকাশ'ও লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রথমে, ইহার অবলম্বন-স্বরূপ শব্দশাস্ত্রীয় যেসব গ্রন্থের ও গ্রন্থকারদের নাম দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যায়, তৎকালীন শব্দ-সমুদ্রমন্থন করিয়া এই টীকা রচিত হইয়াছিল। ইহা কাতন্ত্রব্যাকরণ-সম্মত। রমানাথের পিতা রামনাথ, পুত্র রত্নেশ্বর চক্রবর্তী। এই শেষোক্ত দুইজনও যথাক্রমে অমরকোষের লিঙ্গাদিসংগ্রহবর্গের টিপ্পনী এবং 'রত্নমালা' টীকা রচনা করেন। খ্রীঃ ১৫শ শতকের শেষভাগ হইতে ১৭শ শতকের কিয়দংশ পর্যন্ত ইঁহাদের জীবৎকাল।

ত্রিকাণ্ডচিন্তামণি উদ্ধৃতিবহুল টীকা। ইহাতে পাণিনীয় ব্যাকরণ-মত অনুসৃত হইয়াছে। খ্রীঃ ১৭শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইহা রচিত হয়। রচয়িতা রঘুনাথ চক্রবর্তী ছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ইদিলপুর পরগনার সামন্তসার গ্রামের অধিবাসী। পাশ্চাত্ত্য বৈদিকব্রাহ্মণবংশে শাণ্ডিল্য গোত্রে জন্ম। সামন্তসারের দক্ষিণ দিক্‌স্থ শিঙ্গারডাহা গ্রামের জমিদার শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়চৌধুরী তাঁহাকে এই টীকার রচনায় নিয়োগ করেন।

ভরতমল্লিক-রচিত অমরটীকা 'মুগ্ধবোধিনী'—মুগ্ধবোধব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কোষসংক্রান্ত গ্রন্থ। ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রণীত হয়। ভরত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এই ব্যাকরণের আধারে রচিত তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'লিঙ্গাদিসংগ্রহ', 'দ্বিরূপধ্বনিসংগ্রহ' এবং 'একবর্ণার্থসংগ্রহ' বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। দ্বিতীয়খানিকে 'দ্বিরূপকোষ'ও বলা যায়। ইহাতে দুই দুইটি করিয়া এমন সব শব্দ প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহাদের অর্থ এক হইলেও বানান আলাদা, যেমন—চণ্ডী, চণ্ডা ; ঈশ্বরী, ঈশ্বরা ; অবগাহ, বগাহ ; বিশ্রাম, বিশ্রম প্রভৃতি। ভরতমল্লিক 'ভরত সেন' নামেও অভিহিত। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার পিড্যা (পিণ্ডিরা) গ্রামে বৈদ্য বংশে তাঁহার জন্ম।

অমরকোষের পরিশিষ্ট-স্বরূপ 'ত্রিকাণ্ডশেষ' রচনা করেন পুরুষোত্তম দেব। যেসব শব্দ অমরকোষে বাদ পড়িয়াছে অথচ ভাষায় ব্যবহৃত

হয়, এমন 'দৃষ্টপ্রয়োগ' শব্দগুলিই কেবল এই পরিশিষ্ট-গ্রন্থের উপজীব্য। ইহারও তিন কাণ্ড, বর্গ-বিভাগ ও পরিভাষাদি সবই মূল অমরকোষের ন্যায়। শীলস্কন্ধ-রচিত 'সারার্থদীপিকা' এবং বিষ্ণুদত্তের 'নামচন্দ্রিকা'—ত্রিকাণ্ডশেষের-টীকা। বস্তুতঃ অমরকোষেরই নামচন্দ্রিকা-টীকা ত্রিকাণ্ডশেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। পুরুষোত্তম ছিলেন বৌদ্ধ এবং গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেনের (১১১৯-১২০৫) সমকালীন। তাঁহারই আদেশে পুরুষোত্তম অষ্টাধ্যায়ীর (বৈদিকাংশ বাদে) 'ভাষাবৃত্তি' রচনা করেন। ইহা ছাড়া 'হারাবলী' কোষ, 'একাক্ষরকোষ', 'দ্বিরূপকোষ', 'ঊষ্মভেদ' বা 'ঊষ্মবিবেক', 'বর্ণদেশনা' এবং দুঃসাধ্য পদসমূহের ব্যুৎপত্তিপ্রদর্শনমূলক এক 'দুর্ঘট' গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করেন। হারাবলীতে প্রধানতঃ অপ্রচলিত প্রতিশব্দ এবং সমধ্বনি-বিশিষ্ট ভিন্নার্থ শব্দসমূহ দেখানো হইয়াছে।

(১১)

সংস্কৃত শব্দকোষগুলিকে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক এই তিন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করিলে অমরকোষকে প্রথম দুইশ্রেণীর সন্ধিস্থলবর্তী বলা যায়। ভারতে ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যযুগের বিস্তৃতি। খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে শাশ্বত-রচিত 'অনেকার্থসমুচ্চয়' হইতে এই মধ্য-যুগের সূচনা ধরা যায়। অমরসিংহের পরে এবং খ্রীঃ ১০ম শতকের পূর্বে আবির্ভূত কোষকারদের মধ্যে আছেন তারপাল, দুর্গ, ধরণি (এই বানানেই টীকাকারগণ তাঁহার নাম করিয়াছেন), ধর্ম, রন্তিদেব, রভসপাল, ভোগীন্দ্র, সাহসাঙ্ক, মঙ্গল, অমরদত্ত, বোপালিত, রুদ্র, বিশ্বরূপ, শুভাঙ্গ, হুগ্‌গ, দত্তিল, ভুগ্ন, কোহল, নিমি, অরুণদত্ত, মাধব, গঙ্গদেব প্রভৃতি। দুই/একজন ছাড়া ইঁহাদের প্রায় কারুর গ্রন্থই বর্তমানে পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তী গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত উদ্ধৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ইঁহাদের রচনার বৈশিষ্ট্য কতক কতক অনুমান করা চলে।

বোপালিতের শব্দকোষ স্ত্রী-পুং-ক্লীব ইত্যাদি কাণ্ডে বিভক্ত ছিল। অমরদত্তের (ইনি বাঙালী বলিয়া অনুমিত) কোষের নামই সম্ভবতঃ 'অমরমালা' বা সংক্ষেপে 'মালা'। খ্রীঃ ৮ম/৯ম শতাব্দীয় মাধব বা (মাধবকর) 'পর্যায়রত্নমালা' নামে বৈদ্যক নিঘণ্টু রচনা করেন। ইহাকে 'রত্নমালা' বা 'বৈদ্যক রত্নমালা'ও বলা হয়। সায়ণাচার্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাধবাচার্যের নামে 'একাক্ষররত্নমালা' নামে এক শব্দকোষের সন্ধান

পাওয়া গিয়াছে। মাধবকরের গ্রন্থাবলম্বনে পরে 'পর্যায়মুক্তাবলী' নামে বৃহত্তর এবং অধিকতর সুবিন্যস্ত কোষ রচিত হইয়াছে। ইহা সংক্ষেপে 'মুক্তাবলী' নামে প্রসিদ্ধ। রাজবল্লভের নামে এক 'পর্যায় রত্নমালা' দৃষ্ট হয়। শব্দের বিভিন্ন রূপ বা বানান প্রদর্শন করাই ছিল তারপালের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুর্গের কোষে একার্থ ও অনেকার্থ দ্বিবিধ শব্দেরই বর্ণনা ছিল। ইনিই কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহ কিনা বলা কঠিন। ধরণিদাস (বা ধরণীশ?) 'নানার্থসমুচ্চয়' বা 'অনেকার্থসার' নামে যে কোষ রচনা করেন তাহা সাধারণতঃ 'ধরণিকোষ' নামেই বিখ্যাত। ইহাতে শব্দগুলিকে অক্ষরসংখ্যানুযায়ী একাদিক্রমে ছয় শ্রেণীতে আলাদা করিয়া পরে ঐগুলিকে আবার অন্ত্য ব্যঞ্জনানুসারে ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। কোষকার ধর্মই চান্দ্র ব্যাকরণের লঘুবৃত্তির রচয়িতা ধর্মদাস কিনা বলা যায় না। রায়মুকুট এক ধর্মসেনের নাম করিয়াছেন। রন্তিদেবের শব্দকোষ রন্তিকোষ নামেও অভিহিত। ইহাতে একার্থ ও অনেকার্থ উভয়বিধ শব্দই আচরিত হইয়াছিল এবং অনেকার্থ শব্দগুলি অন্ত্যব্যঞ্জনানুসারে সাজানো ছিল। রভসপাল শব্দ বিন্যাসে সুবিধামত আদ্যবর্ণ এবং অন্ত্যবর্ণ, এই দুই-এর প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। রুদ্রকোষেও এই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। রুদ্রকোষকে রুদ্রনিঘণ্টুও বলা হইত। বিশ্বরূপ তাঁহার শ্লোকাত্মক কোষের এক গদ্যাত্মক ব্যাখ্যাও রচনা করিয়াছিলেন। বিশ্বকবির নামে এক 'বিশ্বনিঘণ্টু'র কথাও শুনা যায়। শুভাঙ্গ বা শুভাঙ্কের শব্দকোষের নাম ছিল 'উৎপলমালিনী'। সম্ভবতঃ ইহাকেই সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের (৩।৩১৩) রসবতী বৃত্তিতে 'উৎপলমালা' বলা হইয়াছে। পরমার বংশীয় উৎপলরাজের (খ্রীঃ ৯ম শতক) অথবা এই বংশেরই মালবরাজ উৎপলদেবের (= খ্রীঃ ১০ম শতকের বাক্‌পতিরাজমুঞ্জ) নামানুসারে এই নামকরণ। ভুগ্নের কোষে পর্যায় ও নানার্থশব্দ আলোচিত হইয়াছিল। গঙ্গদেবের কোষের শব্দবিন্যাস ছিল অন্ত্যব্যঞ্জনানুসারী। বিক্রমাদিত্যের নামে এক 'কবিদীপিকা নিঘণ্টু'র উল্লেখ পাওয়া যায়। হারাবলীতে 'সংসারাবর্ত' কোষকে বিক্রমাদিত্যের রচনা বলা হইয়াছে। উজ্জ্বল দত্ত (খ্রীঃ ১৪শ শতক) ইহাকে বলিয়াছেন 'বিক্রমাদিত্যকোষ'। পদচন্দ্রিকায় (স্বর্গবর্গ, ২৮) উদ্ধৃত 'সংসারার্ণব' সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত 'সংসারাবর্ত' হইতে অভিন্ন।

পরবর্তী শব্দকোষগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলায়ুধের 'অভিধানরত্নমালা' (খ্রীঃ ১০ম শতক), মহেশ্বরের 'বিশ্বপ্রকাশ' (খ্রীঃ ১২শ শতক), যাদবপ্রকাশ-কৃত 'বৈজয়ন্তীকোষ' (খ্রীঃ ১১শ শতক), অজয়পালের 'নানার্থসংগ্রহ', ধনঞ্জয়-প্রণীত 'নামমালা' (১২শ শতক), কাশ্মীরী পণ্ডিত মঙ্খ (বা মঙ্খক)-কৃত মঙ্খকোষ (খ্রীঃ ১২শ শতক), জৈনাচার্য হেমচন্দ্র সূরির 'অভিধানচিন্তামণি' (১২শ শতক), কেশবস্বামীর 'নানার্থার্ণবসংক্ষেপ' (ঐ), খ্রীঃ ১৩শ/১৪শ শতকে মেদিনীকর-রচিত 'নানার্থশব্দকোষ' বা 'মেদিনিকোষ' বা 'মেদিনীকোষ' (টীকাকারগণ 'ইতি মেদিনিঃ' বলিয়া উদ্ধৃতি দিয়াছেন), পদ্মনাভদত্তের 'ভূরিপ্রয়োগ' (১৪শ শতক), জটাধর আচার্যের 'অভিধানতন্ত্র', খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীয় ইরুগপদণ্ডাধিনাথ-রচিত 'নানার্থরত্নমালা', গদসিংহের 'নানার্থধ্বনিমঞ্জরী' বা 'অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী', মহীপ-রচিত 'শব্দরত্নাকর' (১৪শ শতক), কেশবকৃত 'কল্পদ্রুকোশ' (১৭শ শতক), বিশ্বনাথের 'কোষকল্পতরু' বা 'কল্পতরুকোষ' (ঐ), সুজনভট্টের 'শব্দলিঙ্গার্থচন্দ্রিকা' এবং 'নানার্থপদপেটিকা' (১৭শ/১৮শ শতক), নীলকণ্ঠের 'পর্যায়ার্ণব', সারস্বতমিশ্রকৃত 'হেমমেদিনী' ও 'বিশ্বমেদিনী' কোষ, শ্রীধরসেনাচার্যের 'বিশ্বলোচনকোষ' বা 'মুক্তাবলীকোষ', কুম্ভীনাথকৃত 'শব্দপ্রদীপিকা' বা 'শব্দদীপিকা', বিট্‌ঠলাচার্যের 'শব্দচিন্তামণি' (১৮শ শতক), মারাঠা-রাজ সাহুজীর 'শব্দরত্নসমন্বয়কোষ' এবং 'শব্দার্থসমন্বয়কোষ' বা 'শব্দার্থ-সংগ্রহ' (১৮শ শতক), রঘুনাথ পণ্ডিতকৃত 'রাজব্যবহারকোষ' বা 'রাজকোষ নিঘণ্টু' (১৭শ শতক), পেরুসূরি-রচিত 'ঔণাদিকপদার্ণব' (১৮শ শতক), ভাবমিশ্রকৃত 'ভাবপ্রকাশ কোষ' (ইহা বৈদ্যক নিঘণ্টু এবং ১৬শ শতকে রচিত বলিয়া অনুমান), রাজা মদনপালের 'মদনবিনোদ নিঘণ্টু' বা 'মদনপালনিঘণ্টু'—ইহাও বৈদ্যক নিঘণ্টু এবং ১৪শ শতকে রচিত ; শিবদত্তমিশ্রকৃত 'নানার্থৌষধকোষ' বা 'শিবকোষ' (১৭শ শতক) প্রভৃতি। এই সবের কথা আমরা অন্যত্র[১৯] বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছি।

(১২)

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কোষসাহিত্যের সহিত তুলনায়, আধুনিক যুগের শব্দকোষ-রচনায় নানা দিকে নানা গুরুতর পার্থক্য লক্ষিত হয়। পূর্বে সমস্ত শব্দকোষই শ্লোকবদ্ধভাবে রচিত হইত। ছন্দের অনুরোধে অনেক

স্থলে লিঙ্গ ও অর্থের নির্দেশনা দুর্বোধ হইয়া উঠিত। শব্দের গঠন-পদ্ধতি অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির নির্দেশ থাকিত না। পর্যায়, নানার্থ, অব্যয় ও উণাদি—এই চারি রকমের ছিল শব্দের শ্রেণী-বিভাগ। আধুনিক কালে শব্দগুলিকে ঐ ছন্দের বেষ্টনী হইতে মুক্ত করিয়া এবং চতুঃ শ্রেণী-বিভাগ তুলিয়া দিয়া, সবাইকে একই সাধারণ পঙ্‌ক্তিতে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শব্দের অক্ষরসংখ্যা বা অন্ত্যব্যঞ্জনাদির গণনা বাদ দিয়া, কেবল আদ্যবর্ণের ক্রমানুসারে উহাদের বিন্যাস-ধারা সুস্থির করা হইয়াছে। প্রত্যেক শব্দকে পৃথক্ ভাবে গ্রহণপূর্বক উহার বিশেষ্য-বিশেষণাদি বিভাগ, লিঙ্গ, ব্যুৎপত্তি, অর্থ এবং স্থলবিশেষে প্রয়োগও দেখাইয়া দেওয়া হয়।

খ্রীঃ ১৮শ শতকের শেষ পাদে Demetrios Galanos নামক এক গ্রীক পণ্ডিত কাশীতে তাঁহার এক ব্রাহ্মণ বন্ধুর দ্বারা স্বীয় পরিচালনায় প্রায় হাজার আড়াই সংস্কৃত শব্দ লইয়া ঐ পদ্ধতিতে শব্দকোষ রচনার সূত্রপাত করেন। ইহার পর এই কাশীতেই ১৭৯০/৯১ খ্রীষ্টাব্দে সাহেবদের আনুকূল্যে অকারাদি ক্ষকারান্ত মোট ৪৯টি তরঙ্গে বিভক্ত যে সংস্কৃতাভিধান রচিত হয়, তাহার নাম 'শব্দসন্দর্ভসিন্ধু'। ইহার রচয়িতা বাঙালী পণ্ডিত কাশীনাথতর্কালঙ্কার। ইহাতে শব্দের ব্যুৎপত্তিপ্রদর্শন ছিল না।

ভারতে সর্বপ্রথম মুদ্রিত (?) পূর্ণাঙ্গ বর্ণানুক্রমিক সংস্কৃত অভিধানের নাম 'শব্দমুক্তামহার্ণব'। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, যে বর্ণানুক্রমিক সংস্কৃত অভিধান রচনার পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তাহারই ফলস্বরূপ কোলব্রূক সাহেবের (১৭৬৫-১৮৩৭) নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে রঘুমণি বিদ্যাভূষণ পাঁচ বৎসরের (১৮০২—০৭) চেষ্টায় এই অভিধান প্রস্তুত করেন। উইলসন সাহেব (H. H. Wilson, 1786-1860) ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইহার ইংরেজী অনুবাদ 'A Dictionary in Sanskrit and English—translated, amended, and enlarged from an original compilation prepared by learned natives for the College of Fort William' by H. H. Wilson—প্রকাশ করেন। এই ইংরেজী অনুবাদ ছাড়া, শব্দমুক্তামহার্ণবের মূল গ্রন্থ কিন্তু মুদ্রিত হয় নাই। রঘুমণির আর এক অভিধান 'প্রাণকৃষ্ণীয় শব্দাব্ধি'—শ্লোকবদ্ধ এবং বর্ণানুক্রমিক।

পশ্চিমবঙ্গপ্রদেশের ২৪পরগণা জেলার অন্তর্গত খড়দহের জমিদার প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের অভিপ্রায়ানুসারে ১৭৩৭ শকাব্দে (১৮১৫/১৬ খ্রীষ্টাব্দে) ইহার রচনা শুরু করা হয়। ১৭১ পত্রে পুঁথির আকারে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৯শ শতকের প্রারম্ভে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ কলেজের পণ্ডিতগণ, বিভিন্ন প্রাচীন কোষ হইতে উপাদান সংগ্রহপূর্বক ৩৫ কাণ্ডাত্মক যে শব্দকোষ রচনা করেন, তাহার নাম 'শব্দার্থকল্পতরু'। ইহার কাণ্ডগুলি বহুবর্গে বিভক্ত। শব্দবিন্যাসে শব্দের অক্ষরসংখ্যা, আদ্যবর্ণ ও অন্ত্যবর্ণের দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। ইহার পরেই উল্লেখযোগ্য রাধাকান্ত দেবের (১৭৮৪-১৮৬৭) 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধান। দীর্ঘ ৪৩ বৎসরের (১৮০৮-৫১) প্রচেষ্টায় ইহা রচিত এবং ৩৬ বৎসর (১৮২২-৫৮) ধরিয়া কলিকাতায় খণ্ডশঃ মুদ্রিত হয়। খানিকটা রচনার পরেই তাহা মুদ্রাযন্ত্রে দেওয়া হইত। ইহাই পূর্বোক্ত আধুনিক সর্বলক্ষণাক্রান্ত কোষরচনার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা। ইহার মোট ৭ কাণ্ড, ২পরিশিষ্ট। ইহার পর ১৮৬৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আগ্রা-উদয়পুর হইতে মুদ্রিত হইয়া ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয় 'শব্দার্থচিন্তামণি' নামক এক বিশাল শব্দকোষ। সঙ্কলয়িতার নাম সুখানন্দনাথ (ব্রহ্মাবধূত)। ইহাদের সকলের অপেক্ষা আকারে বিশাল অভিধান—'বাচস্পত্য'। ইহার প্রণেতা তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮১২-৮৫) ছিলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। ১৮৭৩ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ২২ খণ্ডে কলিকাতায় ইহা প্রথম মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়। তারানাথের প্রথম সংস্কৃতাভিধান 'শব্দস্তোমমহানিধি' অবশ্য ইহার পূর্বেই ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ৫ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রকাশিত 'বৈদ্যকশব্দসিন্ধু' নামক 'আয়ুর্বেদীয় শব্দৌষধনামনির্ণায়ক বৃহৎকোষ-গ্রন্থে'র রচয়িতা উমেশচন্দ্র গুপ্ত। ইহাতে অন্য ভাষায় ব্যবহৃত প্রাসঙ্গিক শব্দসমূহও প্রদর্শিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের (১৮২২-১৯০৩) 'শব্দসারনিঘণ্টু' (কলিকাতা ১৮৬০), পণ্ডিত গণেশ দত্ত শাস্ত্রীর (১৮৬১-১৯২৮) 'পদ্মচন্দ্রকোষ' (ইহা সংস্কৃত-হিন্দী অভিধান) বা 'পদ্মকোষ' (১৮৯৮), দ্বারকাপ্রসাদশর্মার 'সংস্কৃতশব্দার্থকৌস্তভ' (এলাহাবাদ, ১৯২৮)—ইহাতে হিন্দীভাষায় শব্দার্থ প্রদত্ত হইয়াছে, পণ্ডিত জি. ডি. ব্যাস-রচিত 'যুগলকোষ' (সংস্কৃত-হিন্দী) প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

বাঙ্‌লা ভাষায় রচিত হইলেও, নগেন্দ্রনাথ বসু-কর্তৃক প্রকাশিত 'বিশ্বকোষে' (কলিকাতা ১৮৮৬-১৯১১) 'যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা... শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি...' এবং বহু বৈদিক শব্দ অর্থাদিসহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৯১৩-৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই মহাগ্রন্থের এক হিন্দী অনুবাদও প্রকাশিত হয়। কেরলপ্রদেশের এলেপ্পি সহরের বিখ্যাত কবিরাজ কুমারন্ কৃষ্ণন্ (১৮৫৭-১৯১৮) মালয়ালম্ ভাষায় 'আয়ুর্বেদীয় ওষধিনিঘণ্টু' নামে যে বিরাট অভিধান প্রস্তুত করেন, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহার এক সংস্কৃতানুবাদ (The Central Council of Ayurvedic Research, New Delhi-কর্তৃক) প্রকাশিত হইয়াছে।

(১৩)

এই যুগের শব্দকোষ-রচনায় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের অবদানের আভাস পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এই অবদান মুখ্যতঃ পরিকল্পনামূলক। কলিকাতায় পূর্বোক্ত কোলব্রুকের প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়। প্রথমে অমরকোষের তৎকৃত ইংরেজী অনুবাদ, শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পরেই আসে উইলসনের অভিধান এবং শব্দকল্পদ্রুম। ইংরেজ পণ্ডিত রেভারেণ্ড উইলিয়ম ইয়েট্‌স্ (১৭৯২-১৮৪৫)-রচিত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানও এই সময়েই (১৮৪৬) কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। পরে শব্দার্থচিন্তামণি এবং বাচস্পত্য। এই শেষোক্ত দুইখানি এবং শব্দকল্পদ্রুমই স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে ; সাহেবদের রচনা এক্ষেত্রে পথিকৃৎ হইলেও ক্রমে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সাহেবী প্রচেষ্টার স্থায়ী ফল ফলিয়াছে বিদেশে, বিশেষতঃ ইউরোপে। এক্ষেত্রে জার্মান পণ্ডিত Bohtlingk-এর কথা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। R.Roth-এর সহিত একত্রে তিনি যে সংস্কৃত-জার্মান অভিধান সঙ্কলন করেন তাহা ইউরোপে সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রে এক বিশাল স্তম্ভস্বরূপ। ইহার তৎকৃত এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণও বর্তমান। অধ্যাপক ক্যাপেলার ইহার ভিত্তিতে, প্রথম শিক্ষার্থীদের উপযোগী করিয়া ৫৫০ পৃষ্ঠার আর এক ক্ষুদ্র ওয়ারটারবাক্ বাহির করেন—'Sanskrit-Worterbuch—Nachdem Petersburger Worterbuchern bearbeitet' von Carl

Cappeller, Professor des Sanskrit au der Universitat Jena, Strassburg, 1886. কয়েক বৎসর পরে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে ইহার এক পরিবর্ধিত ইংরেজী সংস্করণ ('A Sanskrit-English Dictionary based upon the St. Petersburg Lexicons, by Carl Cappeller') প্রকাশিত হয়। স্যর মনিয়র উইলিয়মস্-কৃত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের ২য় সংস্করণে Bohtlingk-এর অভিধানের প্রচুর প্রভাব বর্তমান। ১৯২৪-২৮ খ্রীষ্টাব্দে রিচার্ডস্মিডট্ ইহার এক অতিরিক্ত সংস্করণ ('Nachtrage zum Sanskrit-Worterbuch in Kurzerer Fassung von Otto Bohtlingk' bearbeitet von Richard Schmidt, Leipzig, 1928) প্রকাশ করেন—যাহা যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় সম্প্রতি পুণাতে যে নূতন পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান ('Dictionary of Sanskrit on Historical Principles'[২০]) সঙ্কলনের আয়োজন করা হইয়াছে তাহা যাবতীয় সংস্কৃত শব্দের সংবাদ বহন করিবে বলিয়া মনে হয়।

জার্মান পণ্ডিত অধ্যাপক গোলডষ্টুকার, থিওডর বেন্‌ফি, ম্যানফ্রেড্ ম্যরহোফার এবং ইংরেজ পণ্ডিত ম্যাক্‌ডোনেল-এর সংস্কৃতাভিধানের কথা আগেই বলিয়াছি। জার্মান পণ্ডিত ব্যুলার সাহেবের Grundriss বা ভারতীয় বিদ্যামহাকোষের কথাও বাদ পড়ে নাই। বিদেশী পণ্ডিতদের রচিত অন্যান্য সংস্কৃতাভিধানের মধ্যে আছে—S. Zehetmayr-রচিত Lexicon etymologicum latino...sanscritum comparativum, Vindob, 1873 ; Theodor Zachariae (1851-1934)-প্রণীত 'Beitrage zur indischen Lexicographie,' Berlin, 1883, Die indischen Worterbucher, Strassburg, 1897 এবং ইহা ছাড়া তিনি সম্পাদনা করেন শাশ্বত-রচিত 'অনেকার্থসমুচ্চয়' বা 'শাশ্বতকোষ' (Berlin, 1882), হেমচন্দ্রের 'অনেকার্থ সংগ্রহ' (Wien, 1893) এবং মঙ্খ-রচিত 'মঙ্খকোষ' (Wien, 1897) ; J.Leumann-রচিত Etymologisches Worterbuch der Sanskrit Sprache, Strassburg, 1893 এবং মিউনিকের Walther Wust-রচিত Schaltsatz im Rgveda, Munich, 1923, Stilgeschiehte und chronologie des Rgveda, Leipzig, 1928, Vergleichendes und Etymologisches Worterbuch des Alt-Indoarischen (Altindischen), Heidelberg, 1935.

বিখ্যাত আপ্তের অভিধান 'The Practical Sanskrit-English Dictionary' ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে পুণায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে পণ্ডিত P.K.Gode এবং C.G.Karve-কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত ও পরিবর্ধিত হইয়া তিন খণ্ডে (১৯৫৭-৫৯) পুণার প্রসাদপ্রকাশন হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী সমস্ত অভিধানের সহায়তায় তাহাদের দোষগুণ পর্যালোচনার পর, বিশেষতঃ পূর্বোক্ত বাচস্পত্যাভিধানে, মনিয়রের গ্রন্থে এবং সেন্টপিটার্সবার্গ অভিধানে যেসব ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহা যথাসম্ভব দূর করিয়া আপ্তের এই অভিধান রচিত। ইহার এক ক্ষুদ্র সংস্করণও আছে।

আপ্তের পূর্ণ নাম বামন শিবরাম আপ্তে (১৮৫৮-৯২)। মহারাষ্ট্র প্রদেশের কোঙ্কনে এক সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাঁহার জন্ম। স্কুলের পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি কীলহর্ন সাহেবের তত্ত্বাবধানে ডেকান কলেজে ভর্তি হন এবং বি. এ. ও এম্. এ. পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করেন এবং পুরস্কার পান। বিদ্যাবত্তার অনুরূপ কোনও উচ্চবেতনের চাকুরিতে প্রবেশ না করিয়া ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সদ্যঃস্থাপিত একটি বিদ্যালয়ের কার্যে যোগ দেন। ক্রমে তিনি ফার্গুসন্ কলেজের অধ্যক্ষপদে বৃত হন এবং ডেকান এডুকেশন সোসাইটিতে সম্পাদকতাও করেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ : 'The Students' Sanskrit-English Dictionary', 'The Students' English-Sanskrit Dictionary' (1884), 'The Students' Guide to Sanskrit Composition' (in four parts, 1885) প্রভৃতি। অকালে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

(১৪)

সংস্কৃত শব্দকোষের ন্যায় প্রাকৃত শব্দাবলীর অবলম্বনেও বিভিন্ন সময়ে অনেক প্রাকৃতশব্দকোষ রচিত হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রাধান্য লোপের ফলে সেই সব কোষেরও সমাদর কমিয়া গিয়াছে। কতকগুলি প্রাচীন প্রাকৃতকোষ এখন কেবল নামমাত্রেই পর্যবসিত, যেমন 'প্রাকৃতকোষ', 'প্রাকৃতনামলিঙ্গানুশাসন', 'প্রাকৃতশব্দসংগ্রহ' প্রভৃতি। প্রাকৃত ব্যাকরণগুলির ন্যায় এই সব প্রাকৃত কোষও মূলতঃ সংস্কৃত কোষের আদর্শেই রচিত। 'প্রাকৃতনাম-

লিঙ্গানুশাসন'-নামেও অমরসিংহের নামলিঙ্গানুশাসনের অনুকরণ স্পষ্ট।

এযাবৎ যেসব প্রাকৃত শব্দকোষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে ধনপাল-রচিত 'পাইঅলচ্ছীনামমালা' বোধ হয় প্রাচীনতম। পাইঅলচ্ছী = প্রাকৃতলক্ষ্মী। ইহাকে ধনপালকোষও বলা হয়। বর্ণিত শব্দসমূহের প্রায় ১/৪ দেশী এবং বাকী অংশ তৎসম ও তদ্ভব শব্দে পূর্ণ। ধনপাল কাশ্যপ-গোত্রজ ব্রাহ্মণ। স্বীয় কনিষ্ঠা ভগিনী সুন্দরীর জন্য তিনি ধারানগরীতে ৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই শব্দকোষ প্রণয়ন করেন। ইহারই আদর্শে খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীতে জৈনাচার্য হেমচন্দ্র রচনা করেন 'দেশীনামমালা'। প্রাকৃতপদ্যে রচিত হইলেও হেমচন্দ্র ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন সংস্কৃতে। সর্বশেষ শ্লোক হইতে জানা যায়, তিনি এই কোষের নাম দিয়াছিলেন 'রয়ণাবলী' অর্থাৎ রত্নাবলী। কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে 'দেশী নামমালা' নাম দৃষ্ট হওয়ায় ইহাই অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া, এই নামেই বর্তমানে এই কোষ প্রচলিত। হেমচন্দ্রের মতে তৎসম ও তদ্ভব শব্দ ভিন্ন অর্থাৎ সংস্কৃতজ শব্দভিন্ন, অন্য শব্দসমূহই কেবল 'দেশী' নামে অভিহিতব্য। ইহার এক পরিশিষ্টও তিনি রচনা করেন। হৈম ব্যাকরণের ৮ম অধ্যায়ে বর্ণিত প্রাকৃত ব্যাকরণে অসাধিত দেশী শব্দাবলীর সংগ্রহই, এই অভিধান-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।২১ স্বোপজ্ঞটীকায় হেমচন্দ্র যেসব পূর্বসূরির উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম ঃ দ্রোণ বা দ্রোণাচার্য (১।১৮, ৫০, ৬।৭, ৮।১৭), অভিমানচিহ্ন (১।১৪৪, ৪।১২, ১৭, ৬।৯৩, ৭।১), অবন্তীসুন্দরী (১।৮১, ১৫৭), দেবরাজ (৬।৫৮, ৭২, ৮।১৭), ধনপাল (১।১৪১, ৩। ২২, ৪।৩০, ৬।১০১, ৮।১৭), গোপাল (১।২৫, ৩১, ৪৫, ২। ৮২...), পাদলিপ্ত (১।২), রাহুলক (৪।৪), শীলাঙ্ক (২।১০, ৬।৯৬, ৮।৪০) এবং সাতবাহন (৩।৪১, ৫।১১...)। ইঁহাদের মধ্যে অভিমানচিহ্ন, দেবরাজ, পাদলিপ্ত এবং সাতবাহন—সত্তসঈ বা গাথাসপ্তশতীতে প্রাকৃত ভাষার কবিরূপে উল্লিখিত। অবন্তীসুন্দরী ছিলেন কাব্যমীমাংসা-কৃৎ রাজশেখরের স্ত্রী। রাহুলক—'সারঙ্গধরপদ্ধতি' এবং 'সুভাষিতাবলী'তে সংস্কৃত ভাষার কবিরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। জার্মান পণ্ডিত R. Pischel ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে 'দেশীনামমালা'কে প্রথম মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করেন। ইহার দুই বৎসর আগে জার্মান

পণ্ডিত Georg Buehler-কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া জার্মেনির গোটিনজেন সহর হইতে প্রথম মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয় 'পাইঅলচ্ছী নামমালা'।

সংস্কৃত- তিব্বতী ভাষায় রচিত বৌদ্ধ কোষ 'মহাব্যুৎপত্তি' এক বিরাট গ্রন্থ। ইহার অধ্যায়-সংখ্যা ২৮৪ এবং শব্দ সংখ্যা ৯০০০। ইহাকে বৌদ্ধ ধর্মকোষ বলা-ই অধিকতর সমীচীন। ইহার রচনাকাল২২ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু বলা না গেলেও, ইহার মূল কাঠামো যে অতি পুরাতন তাহা নিঃসন্দেহ। কালক্রমে তাহাতে বিভিন্ন বিষয়ের সংযোজন এবং পরিবর্ধনাদি হইয়া থাকিবে। বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক বিভিন্ন নাম ও পরিভাষাদিই শুধু নয়, বহু জীব-জন্তু, উদ্ভিদ্ এবং রোগ প্রভৃতির নামও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

পালি-শব্দকোষ 'অভিধানপ্পদীপিকা' রচনা করেন মোগ্গল্লান স্থবির। তিনি জাতবনবিহারে অবস্থান করা-কালীন ১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই অভিধান প্রস্তুত করেন। ইহার প্রণয়নে অমরকোষের পদ্ধতি তো অনুসৃত হইয়াছেই, স্থল-বিশেষে সেই কোষের কিছু কিছু অংশের আক্ষরিক অনুবাদও দেখা যায়। ব্রহ্মদেশে ইহার 'অভিধান-টীকা' নামে এক টীকাও রচিত হইয়াছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বৈয়াকরণ সুভূতিপাদস্থবির 'অভিধানপ্পদীপিকা-সূচী' নামে অপর এক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তাহাতে বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ পালি শব্দাবলীর ব্যুৎপত্তি দেখানো হইয়াছে। তাঁহারই সম্পাদনায় কলম্বো হইতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী ও সিংহলী ব্যাখ্যা সহ অভিধানপ্পদীপিকা প্রথম মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয় ('Abhidhana-ppadipika—or dictionary of the Pali Language, with English and Singhalese interpretations, notes and appendices', edited by Waskaduwe Subhuti, Colombo, 1865)। রামচন্দ্রকৃত 'দেশ্যনিঘণ্টু', পঞ্চানন ভট্টাচার্যের 'দেশীয় রাজশেখরকোষ', 'দেশ্যনিদর্শন' প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া অনুমিত।

শ্বেতাম্বর জৈনাচার্য বিজয়রাজেন্দ্রসূরীশ্বর মহারাজ (১৮২৬-১৯০৬) দীর্ঘ ২২ বৎসরের পরিশ্রমে 'অভিধানরাজেন্দ্র' নামে মাগধীপ্রাকৃতের এক বিশাল (পৃঃ সংখ্যা ৯১২০) শব্দকোষ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মুদ্রণকার্য আরম্ভ হইয়া ১৯২৫ সনে সমাপ্ত হয়। ইহাতে জৈন মার্গীয় মাগধী ভাষার শব্দগুলিকে অকারাদি-ক্রমে সজ্জিত করিয়া সংস্কৃতে উহাদের অনুবাদ, লিঙ্গ, ব্যুৎপত্তি এবং অর্থ

প্রদর্শিত হইয়াছে। পরে জৈন সাহিত্য হইতে উদ্ধৃতি দিয়া সেই সব শব্দের প্রয়োগ-রীতিও দেখানো হইয়াছে। গুলাবচন্দ্রস্বামীর শিষ্য শতাবধানী জৈনমুনি শ্রীরত্নচন্দ্রজী মহারাজ-প্রণীত 'সচিত্র অর্ধমাগধীকোষ' [An illustrated Ardha-Magadhi dictionary, literary, philosophic and scientific, with Sanskrit, Gujarati, Hindi and English equivalents, references to the texts and copious quotations (4 volumes), London...1923-1932.] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে রচিত এবং কলিকাতায় প্রকাশিত আর এক প্রাকৃতশব্দকোষ 'পাইঅসদ্দমহণ্ণবো' অর্থাৎ 'প্রাকৃতশব্দমহার্ণবঃ' ('A Comparative Prakrit-Hindi Dictionary with Sanskrit equivalents, quotations and complete references')। ইহার প্রণেতা পণ্ডিত হরগোবিন্দদাস টি. শেঠ ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতভাষার অধ্যাপক। চারি ভাগে (১৯২৩, ১৯২৪, ১৯২৫ ও ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে) ইহার প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়।

মুসলমান শাসকদের আমলে রচিত কতকগুলি শব্দকোষে বিভিন্ন ভাষার, বিশেষতঃ পারসী ভাষার শব্দসমূহ সংস্কৃতে, এবং বিপরীত ক্রমে সংস্কৃত শব্দাবলীও পারসী ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিহারী কৃষ্ণদাসকৃত 'পারসীকপ্রকাশকোষ', বজ্রভূষণের 'পারসীবিনোদ' এবং অজ্ঞাত-কর্তৃক 'পারসীনামমালা' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ আকবর বাদশাহের সময়ে রচিত পারসী-সংস্কৃতাভিধান। পারসীবিনোদও ঐ সময়েরই রচনা। খ্রীঃ ১৭শ শতকের প্রারম্ভে জাহাঙ্গীরের নির্দেশে কামরূপবাসী করণবংশজ কবিকর্ণপূর এক সংস্কৃত-পারসী অভিধান প্রস্তুত করেন। ইনি সম্রাটের আদেশে সংস্কৃতে এক শ্লোকবদ্ধ পারসী ব্যাকরণও রচনা করিয়াছিলেন। মিশ্রভাষার শব্দকোষের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বোধ হয় 'রামগুলাম শব্দকোষ'। ইহাতে সংস্কৃত, ইংরেজী, পারসী প্রভৃতি ভাষার সদা-ব্যবহৃত শব্দসমূহের ধাতু, ধাত্বর্থ ও অনেকার্থাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

সাহেবদের রচিত কয়েকখানি পালি-ডিক্সনারিঃ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত 'A Dictionary of the Pali Language' by Robert Caesar Childers (1838-70) ; 'Pali-English Dictionary' edited by T. W. Rhys Davids and William Stede, London, 1921-25 ; 'A

Critical Pali Dictionary' begun by Carl William Trenckner (1824-91), revised, continued and edited by Dines Andersen and Helmer Smith, Copenhagen, 1924 ; 'Dictionary of Pali Proper Names' by C. A. F. Rhys Davids... ; 'The English-Pali Dictionary' by Widurupola Piyatissa Maha Nayaka Thera Pandit, Colombo, 1949 ; 'A Concise Pali-English Dictionary' by Buddhadatta Mahathera, Colombo, 1949.

---

১ নিরুক্তের অমরেশ্বরঠাকুর-কৃত বঙ্গানুবাদের অবলম্বনে (দ্রঃ ।। নিরুক্তম্।। Yaska's Nirukta with Bengali Translation and Notes. Edited by Amareswara Thakur, University of Calcutta, 1955.)

২ 'ঋষীণাং দর্শনংযচ্চ তত্ত্বে কিঞ্চিদবস্থিতম্। ন তেন ব্যবহারোঽস্তি ন তচ্ছব্দনিবন্ধনম্।।'—বাক্যপদীয় ২।১৪১ ; উত্তররামচরিতে ঃ 'লৌকিকানাং হি সাধূনামর্থং বাগনুবর্ততে। ঋষীণাংপুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি।।'—১।১০

৩ 'একস্যৈবাত্মনো ভেদৌ শব্দার্থাবপৃথক্স্থিতৌ'—বাক্যপদীয় ২।৩১

৪ 'একস্মিন্নপিদৃশোঽর্থে দর্শনং ভিদ্যতে পৃথক্।
কালান্তরেণ বৈ কোঽপি তংপশ্যত্যন্যথা পুনঃ।।'—ঐ ২।১৬৮

৫ 'স্বপ্রত্যয়ানুকারেণ শব্দার্থঃ প্রবিভজ্যতে'—ঐ ২।১৩৭
'প্রতিনিয়তবাসনাবশেনৈব প্রতিনিয়তাকারোঽর্থঃ। তত্ত্বতস্তু কশ্চিদপি নিয়তো নাভিধীয়তে। নাস্তি কশ্চিন্নিয়ত একঃ শব্দস্যার্থঃ।'
—বাক্যপদীয়ের (২।১৩৬) টীকায় পুণ্যরাজ

৬ গঙ্গেশ উপাধ্যায়-রচিত 'তত্ত্বচিন্তামণি'তে ঃ 'গাবীশব্দোঽপি কয়াচিদ্ ব্যুৎপত্ত্যা ক্বচিৎসাধুরিতি।' ইহার 'তত্ত্বচিন্তামণ্যালোক' টীকায় জয়দেব মিশ্র ঃ '...গাবীতি গাং গণপতিম্ অবিতুং প্রীণয়িতুং শীলমস্যেতি গাবীশব্দেঽপি সাধুতা ক্বচিৎ' অর্থাৎ গণপতির সন্তোষ বিধানের চরিত্র বা সামর্থ্য আরোপ করিয়া গাবী শব্দকেও সাধু করিয়া লওয়া যায়।

৭ 'কোষ' এবং 'কোশ' সমার্থক এবং সমলিঙ্গক।

৮ 'সঙ্কেতো গৃহ্যতে জাতৌ গুণদ্রব্যক্রিয়াসুচ।'—সাহিত্যদর্পণ (২।৫)। 'জাতিদ্রব্যগুণক্রিয়াবিষয়ে অভিধাবৃত্তিবোধিত অর্থবোধনা শক্তিবিশেষ'—'বঙ্গীয়-শব্দকোষ' (দ্রঃ 'সঙ্কেত' শব্দ)।

৯ ইহাতে ১৪৮টি গণ, ৬৯টি খণ্ড। যাস্কীয় নিঘণ্টু হইতে কৌৎসব্যনিঘণ্টুর শব্দসংখ্যা অধিক। ইহা বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

১০ ঋগ্‌বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য পঞ্চাধ্যায়ী নিঘণ্টু এবং উহার ব্যাখ্যারূপ দ্বাদশাধ্যায়ী নিরুক্ত—উভয়কেই 'নিরুক্ত' আখ্যা দিয়াছেন। 'প্রস্থানভেদে' মধুসূদন সরস্বতী নিঘণ্টুকে নিরুক্তের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। আধুনিককালে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীও

তাঁহার 'ঋগ্‌বেদভাষ্যভূমিকা'তে নিঘণ্টুসহ নিরুক্তকে চতুর্থ বেদাঙ্গ বলিতে দ্বিধা করেন নাই।

১১ শতপথব্রাহ্মণের বংশপ্রক্রমে (১৪।৫।৫।২১, ১৪।৭।৩।২৭), পিঙ্গলের ছন্দোবেদাঙ্গে (৩।৩০), বৃহদারণ্যকোপনিষদে $\left(\frac{২।৫।২১}{২।৬।৩}, \frac{৪।৫।২৭}{৪।৬।৩}\right)$, ঋগ্‌বেদপ্রাতিশাখ্যে (১৭।২৫), আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে (২৪।৬।১), হিরণ্যকেশিশ্রৌত সূত্রে (২১।৩।৭), আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রে (১২।১০।১০), বৌধায়নশ্রৌতসূত্রে (১৬। ২৭ ঃ ২২), বাধূলশ্রৌত সূত্রে (৩।১ঃ১০), বৈখানসধর্মসূত্রে (৪।২।৪), সামবেদানুক্রমণিকায় (১।৫৮১) এবং বৃহদ্দেবতায় (১।২৬, ২।১১১, ১৩২, ১৩৭...) যাস্কের নাম আছে।

১২ বেদের যেসব মন্ত্রে বা স্তোত্রে তৎপ্রতিপাদ্য দেবতার উল্লেখ থাকে তাহাকে বলে নিরুক্ত ('দেবতা নিরুচ্যতে')। যে স্তোত্রে প্রতিপাদ্য দেবতার নামোল্লেখ নাই তাহাকে ব্রাহ্মণে অনিরুক্ত বলা হইয়াছে। এই অনুল্লিখিত দেবতার নির্ণয়ই আসলে নিরুক্তের কাজ। দ্রঃ ঐতরেয়ব্রাহ্মণের (৩।৩।৬, ৩।৩।১০) সায়ণভাষ্য— 'নিঃশেষেণোক্তোদেবো নিরুক্তঃ।' তবে প্রথমে ঐ দেবতার অনুসন্ধানে প্রযুক্ত হইলেও, পরে ইহার প্রয়োগের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দেবতার পরিবর্তে শব্দের অর্থানুসন্ধানই ক্রমে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে।

১৩ নিরুক্তে সমাসের দিক্‌টা বড় দুর্বল। বিভিন্ন রকমের সমাসের প্রচলন তখনো হয় নাই। সমাসগুলিকে একপর্বন্ বা অনেকপর্বন্ বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সমাসের ব্যাপারে বৃহদ্দেবতা (২।১০৫) খুব অগ্রসর।

১৪ এই সূত্রের মহাভাষ্যে ঃ 'কানি পৃষোদরাদীনি। পৃষোদরপ্রকারাণি। কানি পুনঃ পৃষোদরপ্রকারাণি। যেষু লোপাগমবর্ণবিকারাঃ শ্রূয়ন্তে...।'

১৫ যুধিষ্ঠির মীমাংসকের সম্পাদনায় এই গ্রন্থ 'ভারতীয় প্রাচ্য বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান' (আজমের) হইতে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৬ যুধিষ্ঠির মীমাংসক তৎসম্পাদিত নিরুক্তসমুচ্চয়ের ভূমিকায় এই গ্রন্থের হস্তলিখিত এক অসম্পূর্ণ পুঁথির সন্ধান দিয়াছেন।

১৭ এই গোপালিকা টীকার প্রণেতা পরমেশ্বর খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীয় এবং খুব সম্ভব কোচিনের অধিবাসী।

১৮ 'ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটখর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতোবরাহমিহিরোনৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য।'
—জ্যোতির্বিদাভরণ ১২।১০

১৯ 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দকোষ বা অভিধানের ইতিহাস' গ্রন্থে (যাহা এখনো পাণ্ডুলিপি-আকারে রহিয়াছে)।

২০ '...designed by the Deccan College Research Institute of Poona to give a complete repertory of all words and the distribution of their meaning-contents in their space time context as far as this is determinable...A basic list of about 2000 texts from the Vedic times to 1800 A. D., including inscriptions, coinlegends, etc., and special-technical

literature, has been taken up as the minimum programme, and the material from these is being collected exhaustively so that no significant item is left. The Dictionary is expected to cover at least twenty volumes, each of approximately 1200 pages in royal quarto.'
১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার কার্যারম্ভ হয় এবং এই কার্যের প্রারম্ভিক অংশস্বরূপ পূর্বোক্ত সংস্থা যে 'Sources of Indo-Aryan Lexicography' শীর্ষক প্রকাশনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা হইতে মহীপ-কৃত 'অনেকার্থতিলক', বিশ্বনাথের 'কোশকল্পতরু', কৃষ্ণসূরির 'অমরমণ্ডন', শিবদত্তের 'শিবকোষ', হর্ষকীর্তির 'শারদীয়াখ্য নামমালা' প্রভৃতি বহু কোষগ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত মূল কর্মযজ্ঞের নাম দেওয়া হইয়াছে 'Sanskrit Dictionary Project', ঠিকানা— Deccan College Postgraduate Research Institute, Poona-6, সঙ্কলিত গ্রন্থের নাম হইয়াছে 'An Encyclopaedic Dictionary of Sanskrit on Historical Principles'. পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক A. M. Ghatage-এর সম্পাদনায় গ্রন্থপ্রকাশের সূচনা। ১৯৭৬ খ্রীঃ হইতে অদ্যাবধি (১৯৯২) ইহার প্রথম তিন খণ্ড এবং ৪র্থ খণ্ডের দুইটি ভাগ (Parts) প্রকাশিত হইয়াছে। প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ হইতে গৃহীত উদ্ধৃতির দ্বারা এক একটি শব্দের অর্থ, এবং সেই সব শব্দযোগে সমাসবদ্ধ বিভিন্ন পদগুলিরও অর্থপ্রদর্শন এই মহাকোষের বিষয়-বৈশিষ্ট্য।

২১ দেশীনামমালার ৩য় শ্লোকের টীকায় হেমচন্দ্র ঃ 'লক্ষণে শব্দশাস্ত্রে...যে ন সিদ্ধাঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবিভাগেন ন নিষ্পন্নাস্তেঽত্র নিবদ্ধাঃ। যে তু...কথ্যাদীনামাদেশত্বেন সাধিতাস্তেঽন্যৈর্দেশীষু পরিগৃহীতাঽপ্যস্মাভির্ন নিবদ্ধাঃ। যে চ সত্যামপি প্রকৃতি-প্রত্যয়বিভাগেন সিদ্ধৌ সংস্কৃতাভিধানকোশেষু ন প্রসিদ্ধাস্তেঽপ্যত্র নিবদ্ধাঃ।'

২২ আনুমানিক খ্রীঃ ৯ম শতকের শেষ দিকে তিব্বতের রাজা Ti Ralpbachjian তিন জন পণ্ডিতের দ্বারা এই অভিধান প্রস্তুত করান। পরে স্থলবিশেষে মঙ্গোলীয় অনুবাদও সংযোজিত হয়। হাঙ্গেরির Alexander Csoma de Koros (1784-1842) তিব্বতে ইহার প্রথম সন্ধান পান। তিনি ইহার যে সানুবাদ সংস্করণ প্রস্তুত করেন তাহা দুর্গাচরণ চ্যাটার্জির সম্পাদনায় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হয় (Mahavyutpatti— Sanskrit-Tibetan-English Vocabulary ; being an edition and translation of the Mahavyutpatti,by A. Csoma de Coros, ed. by Durga Charan Chatterjee, Cal. Royal Asiatic Society of Bengal, 1944)। ইহার আগে ১৮৫৯ খ্রীঃ A. Schiefner-কর্তৃক সেন্টপিটার্সবার্গ হইতে এবং ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে I. P. Minayeff (1840-90) এবং N. D. Mironov-কর্তৃক মহাব্যুৎপত্তির প্রকাশ ঘটিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে 'The Sanskrit-Chinese Dictionary of Buddhist Technical Terms, based on the Mahavyutpatti, by Wogihara' (Unrai, Tokyo, 1959) উল্লেখযোগ্য।

পরিশিষ্ট

অ — অকারো বৈ সর্বা বাক্—ঐতরেয় আরণ্যক ২।৩৬
অকারো ব্রহ্মরূপঃ স্যাৎ—নন্দিকেশ্বরকাশিকা ৩
অকারঃ সর্ববর্ণাগ্র্যঃ প্রকাশঃ পরমেশ্বরঃ। — ঐ ৪
অকাররূপ আদৌ তু স্থিতঃ স প্রথমঃ স্বরঃ।
তস্মাৎত্রিষষ্টিবর্ণা বৈ অকারপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ।।—বায়ুপু. ২৬।২৯

অক্ষর— স্বরোঽক্ষরম্—বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য ১।৯৯
সব্যঞ্জনঃ সানুস্বারঃ শুদ্ধো বাপি স্বরোঽক্ষরম্—ঋক্প্রাতিশাখ্য ১৮।৩২
অক্ষরং বর্ণনির্মাণম্—ছাত্রমিত্র
অক্ষরং ব্রহ্মবর্ণয়োঃ—রুদ্রকোষ
শব্দাক্ষরং পরংব্রহ্ম—শ্রুতি
অক্ষরং ত্বক্ষয়ংজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ। —মনুসংহিতা ২।৮৪
অক্ষরং পরমোনাদঃ শব্দব্রহ্মেতি কথ্যতে।
অঘোষমব্যঞ্জনমস্বরং চাপ্যতালুকণ্ঠৌষ্ঠমনাসিকঞ্চ।
অরেখজাতংপরমূষ্মবর্জিতং তদক্ষরং ন ক্ষরতে কথঞ্চিৎ।।
—উত্তরগীতা ১।৫১, অমৃতনাদোপনিবদ্ ৫।৫

অঘোষ— ঊষ্মবিসর্জনীয় প্রথম দ্বিতীয়া অঘোষাঃ—তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ১।১২
বর্গাণাং প্রথমদ্বিতীয়াঃ শষসাশ্চাঘোষাঃ—কাতন্ত্র ১।১।১১
খযাংযমাঃ খয়ঃ কপৌ বিসর্গঃ শর এব চ।
এতে শ্বাসানুপ্রদানা অঘোষাশ্চ বিবৃণ্বতে।।—

অঙ্গ— অঙ্গ্যতে জ্ঞায়তেঽমীভিরিত্যঙ্গানি উপকারাণি—হেমচন্দ্র। যস্মাৎ প্রত্যয়বিধিস্তদাদি প্রত্যয়েঽঙ্গম্—পাণিনিসূত্র ১।৪।১৩
[আপ্রত্যয়শব্দাংশ]
যঃ প্রত্যয়ো যস্মাৎ ক্রিয়তে তদাদিশব্দস্বরূপং তস্মিন প্রত্যয়ে পরে অঙ্গসংজ্ঞং স্যাৎ।—ঐ (সিদ্ধান্তকৌমুদী)

অতিদেশ— অন্যত্রৈব প্রণীতায়াঃ কৃৎস্নায়া ধর্মসংহতেঃ।
অন্যত্র কার্যতঃ প্রাপ্তিরতিদেশঃ স উচ্যতে।।—জৈমিনীয় ন্যায়াধিকরণমালা (৭।১।১।১) টীকা ;
পঞ্চাতিদেশাঃ —মহাভাষ্য [নিমিত্তাতিদেশ, রূপাতিদেশ, ব্যপদেশাতিদেশ, শাস্ত্রাতিদেশ ও কার্যাতিদেশ।]
শ্রুতাতিদেশ (পা. ১।১।৫৬), অর্থাতিদেশ (পা. ১।২।৫),
সংজ্ঞাতিদেশ (পা. ১।২।৫), স্থান্যাতিদেশ (পা. ১।১।৫৬),

যুক্তাতিদেশ (পা. ১।২।৫১), কার্যাতিদেশ (পা. ১।১।২১, ১।১।৬২),
রূপাতিদেশ (পা. ১।১।৫৯), শাস্ত্রাতিদেশ (পা. ৪। ২। ৩৪), তাদাত্ম্যাতিদেশ (পা. ২।১।২), নিমিত্তাতিদেশ (পা. ১।৩।৬২), ব্যপদেশাতিদেশ (পা. ১।১।২১) [পা. = পাণিনি-সূত্র]

অদ্যতন— শেষো গতায়াঃ প্রহরো নিশায়া আগামিনী যা প্রহরশ্চ তস্যাঃ। দিবস্য চত্বার ইমে চ যামাঃ কালং বুধা হ্যদ্যতনং বদন্তি।।— প্রাচীনাঃ।

অধিকরণ— আধারোঽধিকরণম্ (পা. ১।৪।৪৫), অধিকরণং নাম ত্রিপ্রকারং ব্যাপকমৌপশ্লেষিকং বৈষয়িকমিতি।—মহাভাষ্য ৬।১।৭২, ঔপশ্লেষিকবৈষয়িকাঽভিব্যাপক এব চ। আধারস্ত্রিবিধোজ্ঞেয়ঃ কটাকাশতিলাদিষু।। সামীপ্যকো বৈষয়িক অভিব্যাপক এব চ। ঔপশ্লেষিক ইত্যেবংস্যাদাধারশ্চতুর্বিধঃ।। —গরুড়পুরাণ ; তথাধিকরণং পঞ্চধাভিব্যাপকমীর্যতে। ঔপশ্লেষিকং বৈষয়িকং সামীপ্যঞ্চৌপচারিকম্।।—চাঙ্গুদাস ; ষড়্‌বিধমধিকরণম্। ঔপশ্লেষিকং সামীপ্যকমভিব্যাপকং বৈষয়িকংনৈমিত্তিকমৌপচারিকঞ্চেতি।— সারস্বতে ; একদেশমাত্রসংযোগ উপশ্লেষস্তত্রভবমৌপশ্লেষিকম্— হৃদয়হারিণী [ত্রিত্বপক্ষে সামীপ্যক, নৈমিত্তিক ও ঔপচারিক আধার ঔপশ্লেষিকের অন্তর্ভুক্ত], কর্তৃকর্মব্যবহিতামসাক্ষাদ্ধারয়ৎ ক্রিয়াম্। উপকুর্বৎক্রিয়াসিদ্ধৌ শাস্ত্রেঽধিকরণংস্মৃতম্।।—বাক্যপদীয়ে

অধিকার— 'একত্রোপাত্তস্যান্যত্রব্যাপারোঽধিকারঃ।'
কার্যিকার্যনিমিত্তানাংপদানাংযদুদীরণম্।
বক্ষ্যমাণার্থসংক্ষেপাদধিকারঃ স উচ্যতে।।—কাতন্ত্রে (আখ্যাত ৩।১) বিল্বেশ্বরীটীকাধৃত,
পূর্বসূত্রস্থিতপদস্য পরসূত্রেষূপস্থিতিরধিকারঃ।—মুগ্ধবোধটীকা,
গোযূথং সিংহদৃষ্টিশ্চ মণ্ডূকপ্লুতিরেব চ।
গঙ্গাস্রোতঃ প্রবাহশ্চ হ্যধিকারশ্চতুর্বিধঃ।।—কালাপাঃ

অধ্যয়ন— গুরুমুখাদক্ষরানুপূর্বী গ্রহণমধ্যয়নম্।—বালমনোরমা ৪।২।৫৯

অধ্যায়— তস্মিন্নধীয়তে ইত্যধ্যায়ঃ।—মহাভাষ্য (৩।৩।১ আহ্নিক)
'একার্থাবচ্ছিন্নসূত্রসমূহোঽধ্যায়ঃ।'

অনুদাত্ত— নীচৈরনুদাত্তঃ (পা. ১।২।৩০)।

অনুনাসিক— মুখনাসিকাকরণোঽনুনাসিকঃ।—বাজসনেয়িপ্রা. ১।৭৫
অনুনাসিকা ঙঞণনমাঃ।—কাতন্ত্র ১।১।১৩

অনুবন্ধ— উচ্চরিতপ্রধ্বংসিনো হ্যনুবন্ধাঃ।—কাতন্ত্রপরিভাষাসূত্র ৫৭। অনুবধ্যতে কার্যার্থমুপদিশ্যতে ইত্যনুবন্ধঃ।—হৈম লঘুন্যাস। প্রকৃতিপ্রত্যয়াদে-

যোঽদর্শনীয়ো লোপ্যস্বভাবো বর্ণঃ সোঽনুবন্ধঃ।—টীকাসর্বস্ব ৩।৩।৯৬

অনুবৃত্তি— recurrence.

অনুশাসন— অনুশাসনমসাধুভ্যো বিবেচনম্—বালমনোরমা
অনুশিষ্যন্তে সংক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেনেতি অনুশাসনম্।—ন্যাস, অনুশিষ্যন্তে অসাধুভ্যো বিবিচ্য জ্ঞাপ্যন্তে সাধুশব্দাঃ অনেন।—মহাভাষ্য প্রদীপোদ্দ্যোত্

অনুস্বার— অনুস্বারো ব্যঞ্জনংবা স্বরো বা—ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ১।৫
বিসর্জনীয়ানুস্বারৌ ভজেতে পূর্বমক্ষরম্।—ঐ ১৮।৩
অনুস্বর্যতে সংলীনং শব্দ্যতে ইত্যনুস্বারঃ।-
—দুর্গসিংহ (টীকা ১।১।১৯)
একবিন্দুরনুস্বারস্তিলবদ্ বার্ধচন্দ্রবৎ।—প্রয়োগরত্নমালা ১।২৮

অন্তঃস্থ 'ব'— 'উদ্‌দৃঠৌ যত্র বিদ্যেতে যো বঃ প্রত্যয়সন্ধিজঃ।
অন্তঃস্থং তং বিজানীয়াত্তদন্যো বর্গ্য উচ্যতে।।'

অন্বর্থসংজ্ঞা— অর্থানুগতা সংজ্ঞা।—পদমঞ্জরী
অন্বর্থা অনুগতার্থা নতু শব্দমাত্রম্—পাতঞ্জলরহস্য ১।২,
অন্বর্থত্বং মহাসংজ্ঞা ব্যঞ্জন্ত্যর্থান্তরাণি চ।
পূর্বাচার্যৈরথোতাস্তু সূত্রকারেণ চাশ্রিতাঃ।।—বৈদিকাভরণ ১।২
সৈষা সংসারিণাং সংজ্ঞা বহিরন্তশ্চ বর্ততে।—বাক্যপদীয় ১।১২৭
অন্বর্থসংজ্ঞাত্বংনাম যোগরূঢ়ত্বম্—মহাভাষ্য প্র. উদ্দ্যোত ১।১।২০

অন্বাখ্যান— তাৎপর্যাবধারণার্থং ব্যাখ্যানে তৎপ্রতিপাদনে চ।—বাচস্পত্য

অন্বাচয়— যদাতু একস্য প্রাধান্যাৎ তদনুরোধেন তু ইতরদন্বাচীয়তে তদন্বাচয়ঃ।

অপবর্গ— অভিপ্রায়ানুকর্ষণমপবর্গঃ। —ম. প্র. উদ্দ্যোতের ছায়াটীকা

অপবাদ— 'যেনাপ্রাপ্তে যো বিধিরারভ্যতে স তস্যাপবাদঃ। অন্তরঙ্গাদপ্যপবাদো বলীয়ান্।' 'বিশেষবিধিরপবাদঃ। অপবাদা অল্পবিষয়া বিধয়ঃ। তানুৎসর্গেণ মিশ্রানেকীকৃতান্ জানীয়াৎ।'

অপভ্রংশ— অপভ্রংশোঽপশব্দঃস্যাৎ।—অমর ১।৫।২, শাস্ত্রেষু সংস্কৃতাদন্যদপভ্রংশতয়োদিতম্। —কাব্যাদর্শ ১।৩৬

অপশব্দ— অন্যথোচ্চারিতাঃ পুংভিরপশব্দা ইতীরিতাঃ। —ভর্তৃহরি। লিঙ্গবচনকালকারকাণামন্যথাপ্রয়োগোঽপশব্দঃ-অর্থশাস্ত্র ২।২।১০
কালদুষ্টা এবাপশব্দাঃ –ভাগবৃত্তি (দ্রঃ দুর্ঘটবৃত্তি ২।২।৬) [অপশব্দ শব্দানৃত, অর্থানৃত মিথ্যাবাক্] দ্রঃ ম্লেচ্ছ

অপাদান— ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্ (পা. ১।৪।২৪), যতোঽপৈতি ভয়মাদত্তে বা তদপাদানম্—কাতন্ত্র (চতুষ্টয় ২১৪), অপায়ে যদুদাসীনং চলং বা

যদি বাচলম্। ধ্রুবমেবাতদাবেশাত্তদপাদানমুচ্যতে।। —বাক্যপদীয়, নির্দিষ্টবিষয়ং কিঞ্চিদুপাত্তবিষয়ং তথা। অপেক্ষিত ক্রিয়াঞ্চেতি ত্রিধাপাদানমুচ্যতে।। —ঐ, সংযুক্তস্য হি বিশ্লিষ্ট ক্রিয়ারম্ভো ভবেদ্ যতঃ। তদেবাবধিভাবেন হ্যপাদানমিতিস্মৃতম্।।

—কাতন্ত্র (চ২১৪)-টীকা

অপৃক্ত— অপৃক্তমেকাক্ষরম্ —ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ১১।৩
একবর্ণঃ পদমপৃক্তম্ —বাজসনেয়িপ্রাতি, ১।১৫১
অপৃক্ত একাল্ প্রত্যয়ঃ —পা. ১।২।৪১ [একাল্ = a single sound]

অবসান— বিরামোঽবসানম্ —পা. ১।৪।১১০

অব্যয়— ন ব্যেত্যব্যয়মিতি —মহাভাষ্য ১।১।৩৮
অব্যয়ং ন ব্যেতি না ক্ষয়ং যাতীত্যব্যয়ম্—সারস্বতটীকায় চন্দ্রকীর্তি
[ন ব্যেতি =নানাত্বং ন গচ্ছতি, বিশেষরূপং ন যাতি]
সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্বেষু যন্নব্যেতি তদব্যয়ম্।।—গোপথব্রাহ্মণ ১।১।২৬
স্বরাদিনিপাতমব্যয়ম্, অব্যয়ীভাবশ্চ, প্রাগ্রীশ্বরান্নিপাতাঃ –পা. ১।১।
৩৭, ৪১, ১।৪।৫৬

অব্যয়ীভাব— অনব্যয়মব্যয়ং ভবতীত্যব্যয়ীভাবঃ –মহাভাষ্য ২।১।৫
পূর্বং বাচ্যং ভবেদ্ যস্য সোঽব্যয়ীভাব ইষ্যতে।—কাতন্ত্র (চ. ২৭২)
উত্তরার্থান্বিতস্বার্থাব্যয়পূর্বস্তু যো ভবেৎ। সমাসঃ সোঽব্যয়ীভাবঃ স্ত্রীপুংলিঙ্গবিবর্জিতঃ।। —শব্দশক্তিপ্রকাশিকা
সোঽব্যয়ীভাবো যত্র নানা বিভক্তিম্বেকরূপতা। অয়ং পূর্বোত্তরান্যর্থ-মুখ্যোঽব্যয়ং সমস্যতে।। —প্রয়োগরত্নমালা (১৭৯–৮১)

অভিধা— তত্র সংকেতিতার্থস্য বোধনাদগ্রিমাভিধা —সাহিত্যদর্পণ ২।৭
স মুখ্যোঽর্থস্তত্র মুখ্যো ব্যাপারোঽস্যাভিধোচ্যতে।।
–কাব্যপ্রকাশ ২।১১।৩

অভিধান— ...আহ্বয়ঃ।।আখ্যাহ্বে অভিধানঞ্চ নামধেয়ঞ্চ নাম চ।
—অমরকোষ ১।৬।৮

অভিধানলক্ষণাঃ কৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ। —মহাভাষ্য ৩।৩।১৯
কৃত্তদ্ধিত সমাসানামভিধানং নিয়ামকম্।
লক্ষণন্ত্বনভিজ্ঞানাং তদভিজ্ঞানসূচকম্।। –মুগ্ধবোধ (১১৮৪) বৃত্তি
কৃত্তদ্ধিত সমাসাদিরভিধানানুসারতঃ। —কালাপাঃ
অভিধানঞ্চ শিষ্টানাং ততোঽর্থবোধরূপং তদ্বিপরীতমনভিধানমিতি।
–লঘু শব্দেন্দুশেখর

অভিবিধি— 'বহূনাং ব্যক্তীনাং কিঞ্চিদবয়বাবচ্ছেদেন অন্যথাভাবঃ অভিবিধিঃ।'

অভ্যস্ত— উভে অভ্যস্তম্ –পা. ৬।১।৫ [দ্বিরুক্ত ধাতুর উভয় ভাগ]

অভ্যাস— অভ্যাসঃ পৌনঃপুন্যেনানুষ্ঠানম্—বাচস্পতিমিশ্র (যোগসূত্রভাষ্য-টীকা), পূর্বোঽভ্যাসঃ —পা. ৬।১।৪ [দ্বিরুক্ত ধাতুর পূর্বভাগ]

অযোগবাহ— অনুস্বারো বিসর্গশ্চ কপৌ চাপি পরাশ্রিতৌ। অযোগবাহা বিজ্ঞেয়া আশ্রয়স্থানভাগিনঃ।। —পাণিনীয় শিক্ষা। কে পুনরযোগবাহাঃ। বিসর্জনীয়-জিহ্বামূলীয়-উপধ্মানীয়-অনুস্বার-নাসিক্য-যমাঃ। কথং পুনরযোগবাহাঃ। যদযুক্তা বহন্তি অনুপদিষ্টাশ্চ শ্রূয়ন্তে। —মহাভাষ্য।
অক্ষরসমাম্নায়ে অযুক্তাঃ সন্তো বহন্তি প্রয়োগং নির্বাহয়ন্তীতি
—ম. প্র. উদ্দ্যোত

অর্থ— অর্থনিমিত্তকেন নামশব্দেন ভবিতব্যম্। —মহাভাষ্য ৭।১।৩৩
যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ। —মীমাংসান্যায়
'শব্দেনোচ্চার্যমাণেন যদ্‌বস্তু প্রতিপদ্যতে।
তস্য শব্দস্য তদ্‌বস্তু জ্ঞায়তামর্থসংজ্ঞয়া।।'
একস্যৈবাত্মনো ভেদৌ শব্দার্থাবপৃথক্‌স্থিতৌ।—বাক্যপদীয় ২।৩১
যদেতদ্ বাঙ্ময়ং বিশ্বমর্থমূর্ত্যা বিবর্ততে । —কাব্যমীমাংসা। অর্থো হি বাচঃ শরীরম্ —ম. প্র. উদ্দ্যোত ; অর্থো বাচ্যশ্চ লক্ষ্যশ্চ ব্যঙ্গ্যশ্চেতি ত্রিধা মতঃ। —সাহিত্য দ. ২।৫; স্বার্থো দ্রব্যঞ্চ লিঙ্গঞ্চ সংখ্যা কর্মাদিরেব চ। অমী পঞ্চৈব লিঙ্গার্থাস্ত্রয়ঃ কেষাঞ্চিদগ্রিমাঃ।। একং দ্বিকং ত্রিকং চাথ চতুষ্কং পঞ্চকং তথা। নামার্থা ইতি সর্বেঽমী পক্ষাঃ শাস্ত্রে নিরূপিতাঃ।।—বৈয়াকরণভূষণ।

অর্থবাদ— অর্থস্য লক্ষণয়া স্তুত্যর্থস্য নিন্দার্থস্য বা বাদঃ, বদ করণে ঘঞ্, ষষ্ঠী-তৎপুরুষ। 'স্তুতির্নিন্দাপরকৃতিঃ পুরাকল্প ইত্যর্থবাদঃ' –গৌতম সূত্র ২।৬৩ ; উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতাফলম। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্যনির্ণয়ে।। —বৃহৎসংহিতা

অসাধু— শব্দশাস্ত্রবিরুদ্ধং যত্তদসাধু প্রচক্ষতে। —ভোজদেব
শিষ্টেভ্য আগমাৎ সিদ্ধাঃ সাধবো ধর্মসাধনম্।
অর্থপ্রত্যায়নাভেদে বিপরীতাস্ত্বসাধবঃ।।—বাক্যপদীয় ১।২৭
লৌকিকাঃ কথয়ন্ত্যর্থান্ ম্লেচ্ছৈঃ শব্দৈরসাধুভিঃ। —(বেঙ্কট) মাধবকৃত ঋগ্‌বেদভাষ্য

আকৃতি— আকৃতির্জাতিঃ সংস্থানং চ। আক্রিয়তে ব্যবচ্ছিদ্যতে স্বাশ্রয়োঽনয়েতি ব্যুৎপত্তেরিতি ভাবঃ। —ম. প্রদীপ ১।২।৬৪

আখ্যাত— ক্রিয়াবাচকমাখ্যাতম্ —ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ১২।৮
ক্রিয়াপ্রধানমাখ্যাতম্ —মহাভাষ্য ৫।৩।৬৬
ভাবপ্রধানমাখ্যাতম্ —নিরুক্ত ১।১।৯, বৃহদ্দেবতা ২।১২১

ধাত্বর্থেন বিশিষ্টস্য বিধেয়ত্বেনবোধনে।
সমর্থঃ স্বার্থযত্নস্য শব্দো বাখ্যাতনুচ্যতে।।–শব্দশ. প্র. ৯৭

আগম— 'বর্ণোপস্থিতিরাগমঃ।'—
অন্যত্রবিদ্যমানস্তু যো বর্ণঃ শ্রূয়তেঽধিকঃ।
আগম্যমানতুল্যত্বাৎ স আগম ইতি স্মৃতঃ।।–তৈ. প্রা. (১।২৩)টীকা
আগমোঽনুপঘাতী যঃ প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্য চ। –বোপদেব
প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্যাপি সম্বন্ধো যো ভবন্নপি।
তয়োরনুপঘাতী স্যাদাগমঃ স বুধৈর্মতঃ।। —প্রাচীনাঃ
ন চাগমাদৃতে ধর্মস্তর্কেণ ব্যপতিষ্ঠতে।
ঋষীণামপি যজ্জ্ঞানং তদপ্যাগমপূর্বকম্।।
চৈতন্যমিব যশ্চায়মবিচ্ছেদেন বর্ততে।
আগমস্তমুপাসীনো হেতুবাদৈর্ন বাধ্যতে।। —বাক্যপদীয় ১।৩০, ৪১

আচার্য— পদক্রমবিভাগজ্ঞো বর্ণক্রমবিচক্ষণঃ।
স্বরমাত্রা বিশেষজ্ঞো গচ্ছেদাচার্যসম্পদম্।। —ঋক্ প্রা.
উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্ দ্বিজঃ।
সাঙ্গং চ সরহস্যং চ তমাচার্যং প্রচক্ষতে।। –মনু ২।১৪০
আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্যস্তেন কীর্ত্যতে।।— বায়ুপু.
[প্রাচার্যঃ প্রগত আচার্যঃ]

আচার্যোপসর্জন— আচার্যোপসর্জনশ্চান্তেবাসী— পা. ৬।২।৩৬

আত্মনেপদ— তঙানাবাত্মনেপদম্ —পা. ১।৪।১০০

আদি— সামীপ্যেঽথ ব্যবস্থায়াং প্রকারেঽবয়বে তথা।
চতুর্ষ্বর্থেষু মেধাবী আদি শব্দং তু লক্ষয়েৎ।।—আপিশলীয়াঃ (কাতন্ত্র ১।১।৮ পঞ্জীধৃত বচন)

আদেশ— আদেশ উপঘাতী যঃ প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্য বা —বোপদেব
'রূপান্তরাপ্রাপ্তিরাদেশঃ।'

আধার— সামীপ্যকো বৈষয়িক অভিব্যাপক এব চ।
ঔপশ্লেষিক ইত্যেবং স্যাদাধারশ্চতুর্বিধঃ।। —গরুড়পু.

আপ্ত— রাগদ্বেষবিনির্মুক্ত আপ্ত ইত্যভিধীয়তে। —বিষ্ণুধর্মোত্তর ৩।৫।১৫
প্রকৃতবাক্যার্থগোচর যথার্থজ্ঞানবানাপ্তঃ।—তর্কামৃত
স্বকর্মণ্যভিযুক্তো যো রাগদ্বেষবিবর্জিতঃ।
জ্ঞানবান্ শীল সম্পন্ন আপ্তো জ্ঞেয়ঃ স এব হি।।

আবৃত্তি— 'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।'
স্বস্থানস্থিত শব্দস্য পুনঃপুনরর্থানুসন্ধানমাবৃত্তিঃ। —চ ৪১৬ বৃত্তি

আমন্ত্রিত— সামন্ত্রিতম্—পা. ২।৩।৪৮ [সম্বোধন-বাচক পদ]

আম্নায়— স্যাদাম্নায়োঽন্বয়ে শ্রুতৌ —অমরকোষোদ্‌ঘাটনে ধৃত বচন

আম্রেড়িত— তস্য পরমাম্রেড়িতম্ –পা. ৮।১।২ [দ্বিরুক্তের দ্বিতীয়াংশ]

আর্ত্বিজীন— যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোঽক্ষরশশ্চ বাচং বিদধাতি স আর্ত্বিজীনো ভবতি। —মহাভাষ্য (পস্‌পশাহ্নিক)[পা. ৫।১।৭১ সূত্রানুসারে ঋত্বিজ্ শব্দের উত্তর খঞ্ প্রত্যয়যোগে 'ঋত্বিজমর্হতি' অর্থে 'আর্ত্বিজীন' শব্দের সৃষ্টি।]

আর্ধধাতুক— আর্ধধাতুকং শেষঃ, লিট্ চ, লিঙাশিষি (পা. ৩।৪।১১৪–১৬) [সার্বধাতুক (=তিঙ্‌বিভক্তি এবং শ্-ইৎ প্রত্যয়) ভিন্ন প্রত্যয়, লিট্ এবং আশীর্লিঙ্ =আর্ধধাতুক]

ইৎ— বর্ণো বর্ণসমূহো বা পাঠে সমুপলভ্যতে।
ন দৃশ্যতে প্রয়োগে যঃ স ইৎসংজ্ঞকঃ স্মৃতঃ।।
–হৈমপ্রকাশ ১।১।৩৭

ইতরেতর— 'পরস্পরসাপেক্ষয়োরবয়বপ্রাধান্যেন একক্রিয়ায়ামন্বয় ইতরে-তরযোগঃ।'

ইষ্টি— ইষ্যতে অনয়া ইতি ইষ্টিঃ —মহাভাষ্য (৩।৩।১ আহ্নিক) ; ভাষ্যকারবচনম্, —'ইষ্টয়ো ভাষ্যকারস্য'।

উণাদি— উণাদয়োঽব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকানি—বার্ত্তিক (মহাভাষ্য ১।১।১৬) সংজ্ঞাসু ধাতুরূপাণি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে। কার্যাদ্ বিদ্যাদনুবন্ধমেত-চ্ছাস্ত্রমুণাদিষু।। –মহাভাষ্য ৩।৩।১ ; উণাদয়োঽপরিমিতা যেষু সংখ্যা ন গম্যতে। প্রয়োগমনুসৃত্যৈব প্রযোক্তব্যাস্ততস্ততঃ।। —সারস্বতে ধৃত। লক্ষ্যানুসরণোন্নেয়া অনুবন্ধা উণাদিষু। বহুলোক্ত্যা প্রসাধ্যানি তেষু কার্যান্তরাণি চ।। –রূপমালা ৩।৪।৭৫

উদ্দেশ— সমাসবচনমুদ্দেশঃ— ম. প্র. উ. ছায়াটীকা

উদ্দেশ্য ও বিধেয়— 'যদুদ্দিশ্য ক্রিয়া প্রবর্ততে তদুদ্দেশ্যম্।' 'বিধীয়তে যত্তদ্বিধেয়ম্।' 'উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাবে লিঙ্গাদের্নাস্তি তন্ত্রতা।' 'উদ্দেশ্যে চ বিধেয়ে চ বিভক্তিস্তু সমা ভবেৎ। কদাচিজ্জায়তে তত্র বৈষম্যং লিঙ্গসংখ্যয়োঃ।।

উপজ্ঞা— উপজ্ঞোপক্রমং তদাদ্যাচিখ্যাসায়াম্ –পা. ২।৪।২১
উপজ্ঞা জ্ঞানমাদ্যং স্যাদ্ জ্ঞাত্বারম্ভ উপক্রমঃ –অমর ২।৭।১২
বিনোপদেশেন প্রথমং জ্ঞানমুপজ্ঞা। —পদচন্দ্রিকা ২।৭।১২
উপায় নিরপেক্ষত্বেন স্বাধীনত্বাদ্ উপ সমীপে জ্ঞানমুপজ্ঞা–ঐ

উপদেশ(ন)— উপদেশনং শাস্ত্রম্—মহাভাষ্য ১।৩।২ ; উপদিশ্যতেঽনেনেতি উপদেশঃ শাস্ত্রবাক্যানি সূত্রপাঠঃ খিলপাঠশ্চ।—কাশিকাবৃত্তি ১।৩।২
ধাতুসূত্রগণোণাদি বাক্যলিঙ্গানুশাসনম্।
আগম-প্রত্যয়াদেশা উপদেশাঃ প্রকীর্তিতাঃ।। —প্রাচীনাঃ

উপধা— অলোঽন্ত্যাৎপূর্ব উপধা—পা. ১।১।৬৫
অন্ত্যাৎ পূর্ব উপধা —কাতন্ত্র (চ ১১)

উপধ্মানীয়— উপ সমীপে ধ্মায়তে শব্দ্যতে ইতি (কর্মণ্যনীয় প্রত্যয়ঃ)—কাতন্ত্রপঞ্জী (১।১৮)

উপসংখ্যান— সংখ্যায়তে সংক্ষিপ্য প্রতিপাদ্যতেঽনেনার্থ ইতি সংখ্যানং সূত্রং, তস্যোপোচ্চারিতমুপসংখ্যানং সূত্রং সমীপ ইদমপি সূত্রং পঠিতব্যমিত্যর্থঃ। —পদমঞ্জরী; (Addenda)।

উপসর্গ— 'উপসৃজ্যতে ইত্যুপসর্গঃ।' প্রাদয়ঃ, উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে, গতিশ্চ—পা. ১।৪।৫৮-৬০;
ক্রিয়াবিশেষক উপসর্গঃ —বার্ত্তিক (১।৩।১);
উপসর্গো বিশেষকৃৎ—ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ১২।৮
উপেত্য নামাখ্যাতয়োরর্থস্য বিশেষং সৃজন্ত্যুৎপাদয়ন্তীতি উপসর্গাঃ —নিরুক্ত (১।৩) টীকায় স্কন্দস্বামী।
উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে—চাঙ্গুদাস
ধাত্বর্থং বাধতে কশ্চিৎ কশ্চিৎ তমনুবর্ততে। তমেব বিশিনষ্ট্য-ন্যোঽনর্থকোঽন্যঃ প্রযুজ্যতে।। —বর্ধমান উপাধ্যায় (কাতন্ত্রবিস্তর)
উপসর্গাস্তু বিজ্ঞেয়াঃ ক্রিয়াযোগেন বিংশতিঃ। বিবেচয়ন্তি তে হ্যর্থং নামাখ্যাতবিভক্তিষু।। অছশ্রদন্তরিত্যেতানাচার্যঃ শাকটায়নঃ। উপসর্গান্ ক্রিয়াযোগান্ মেনে তে তু ত্রয়োধিকাঃ।।
—বৃহদ্দেবতা ২।৯৪, ৯৫
প্রপরাপসমন্ববনির্দুরভিব্যধিসূদতিনিপ্রতিপর্যপয়ঃ।
উপ আঙিতি বিংশতিরেষ সখে উপসর্গবিধিঃ কথিতঃ কবিনা।।
—কাতন্ত্র (চ ২১০) পঞ্জীধৃতবচন

উপসর্জন— প্রথমানির্দিষ্টং সমাস উপসর্জনম্, একবিভক্তি চা পূর্বনিপাতে, উপসর্জনং পূর্বম্, রাজদন্তাদিষু পরম্—পা. ১।২।৪৩, ৪৪, ২।২। ৩০, ৩১

উপাঙ্গ— প্রতিপদমনুপদং ছন্দোভাষাসমন্বিতম্।
মীমাংসান্যায়তর্কাংশ্চ উপাঙ্গানি বিদুর্বুধাঃ।।

উপাধ্যায়— উপেত্যাধীয়তে তস্মাদিত্যুপাধ্যায়ঃ। —মহাভাষ্য ৩।৩।১ আ.
একদেশং তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ। যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থ-মুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে।। —মনু ২।১৪১

উপোদ্‌ঘাত— স্থানং নিমিত্তং বক্তা চ শ্রোতা শ্রোতৃপ্রয়োজনম্।
সম্বন্ধাদ্যভিধানঞ্চ হ্যুপোদ্‌ঘাতঃ স উচ্যতে।।—মাঠরাচার্য
চিন্তাং প্রকৃতিসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্‌ঘাতং প্রচক্ষতে।
প্রসক্তানুপ্রসক্তাদি প্রস্তুতাদুপজায়তে।। —তন্ত্রবার্তিক ২।১।১

✓উষ্ম— ঈষদ্ বিবৃতকরণা উষ্মাণঃ —আপিশলশিক্ষা ৩।৬
উষ্মাণঃ শষসহাঃ —কাতন্ত্র ১।১।১৫, উষ্মধর্মযোগাদুষ্মাণঃ—
ঐ পঞ্জী ; উচ্চারণে যো মুখং তপতি স এব উষ্মধর্মঃ—ঐ কবিরাজ

উহ— প্রকৃতৌ আম্নাতস্য মন্ত্রস্য বিকৃতৌ সমবেতার্থত্বায় তদুচিত পদান্তর প্রক্ষেপেণ পাঠ উহঃ। —সায়ণাচার্য (ঋগ্‌বেদভাষ্যোপক্রমণিকা)
সাকাঙ্ক্ষবাক্যস্য পদান্তরেণ আকাঙ্ক্ষাপূরণম্ —শব্দকল্পদ্রুম

ঊহ্য— অনুক্তকরণমূহ্যম্—কৌটিল্য (অর্থশাস্ত্র, ১৫শ অধিকরণ); যদনির্দিষ্টং যুক্তিগম্যং তদূহ্যম্ –ম. প্র. উ. ছায়া ;
যন্নবিশেষপদার্থসমূখং প্রত্যয়তঃ প্রকৃতেশ্চ তদূহ্যম্। প্রকৃতিং দৃষ্ট্বা প্রত্যয় ঊহিতব্যঃ, প্রত্যয়ঞ্চ দৃষ্ট্বা প্রকৃতিরূহিতব্যা।
–মহাভাষ্য ৩।৩।১

ঋষি— ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ—অমর ২।৭।৪২; ঋষিঃ সর্বত্রগত্বেন–কূর্মপু-৪অ. ঋষির্দর্শনাৎ—নিরুক্ত ১।২।১১, সাক্ষাৎকৃতধর্মাণ ঋষয়োবভূবুঃ—ঐ ১।২০।২; ‘শ্রুতর্ষিঃ শ্রবণাৎ।’ ‘কর্তৃত্বং যদৃষীণাং তু তৎ সর্বং মন্ত্রকৃৎসমম্।’ ; ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ —সিদ্ধান্তকৌমুদী ৪।১।১১৪ ;
বিদ্যাগমেষু নিপুণা নরদেবমুখ্যাঃ সর্বাস্ত্রশাস্ত্রপরিখিন্নধিয়োঽপ্যমত্তাঃ।
বিদ্যাবিদগ্ধমতয়োরিষয়প্রবৃদ্ধা বুদ্ধাশ্চ ভূমিপতয়োঽপ্যতিশক্তিমন্তঃ।।
—অমর (২।৭।৪২) টীকা ত্রিকাণ্ডচিন্তামণিধৃতবচন।

একশ্রুতি— একশ্রুতিদূরাৎসম্বুদ্ধৌ—পা.১।২।৩৩
‘উদাত্তাদীনাং স্বরণামবিভাগেনাবস্থানমেকশ্রুতিঃ।’

ওঁ = ওম্ = অ+উ+ম্! প্রণব। ‘তস্য বাচকঃ প্রণবঃ’ –যোগসূত্র ১।২৭;অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ। মকারস্তু স্মৃতো ব্রহ্মা প্রণবস্তু ত্রয়াত্মকঃ।।–বিষ্ণুপু. ; অকারো ভগবান্ ব্রহ্মাপ্যুকারঃ স্যাদ্ধরিঃ স্বয়ম্। মকারো ভগবান্ রুদ্রোঽপ্যর্ধমাত্রা মহেশ্বরী।। —দেবী ভাগবত ৫।১।২২, ২৩ ; ওঙ্কারেণ সর্বা বাক্ সংতৃণ্ণা—ছা. উপনিষদ ২। ২৩।৩; ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম–গীতা ৮।১৩ ;
ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদ্ ৩
ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব—মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ ১ ;
ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথম্ — ছা. উপ. ১।১।১

ক (প্রত্যয়)— অজ্ঞানে কুৎসিতে চৈব সংজ্ঞায়ামনুকম্পনে।
তদ্‌যুক্তনীতা বপ্যল্পে বাচ্যে হ্রস্বে চ কঃ স্মৃতঃ।।—কাতন্ত্র (চ ১৪১)

করণ— সাধকতমং করণম্—পা. ১।৪।৪২; করণং ক্রিয়তে যেন—গরুড়পু; যদুপসংহরতি তৎকরণম্, যেন স্পর্শয়তি তৎকরণম্—তৈ.প্রাতি. ২।৩২,৩৪ ; কারকব্যবধানেন ক্রিয়ানিষ্পত্তিকারণম্। যদ্বৈ বিবক্ষিতং তেষু করণং তৎপ্রকীর্তিতম্।।—কাতন্ত্র (চ ২১৮)টীকা;

ব্যাপারবৎ কারণং করণমিতি। —কারকচক্র; করণং খলু সর্বত্র কর্তৃব্যাপারগোচরঃ। তিরোদধাতি কর্তারং প্রাধান্যং তন্নিবন্ধনম্।। —কলাপচন্দ্র; ক্রিয়তে সাধ্যতে কর্ত্রা যদাশ্রিত্য বদন্তি তৎ। করণং তদ্দ্বিধা বাহ্যমাভ্যন্তরমপিস্মৃতম।।—কারকোল্লাস; ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পাত্তির্যদ্‌ব্যাপারাদনন্তরম্। বিবক্ষ্যতে যদা তত্র করণত্বং তদা স্মৃতম।। স্বাতন্ত্র্যেঽপি প্রযোক্তারমারাদেবোপকুর্বতে। করণেন হি সর্বেষাং ব্যাপারো ব্যবধীয়তে।। —বাক্যপদীয় ৩। . . .

কর্তা— কর্তা যশ্চ করোতি সঃ —গরুড়পুরাণ; স্বতন্ত্রঃ কর্তা, তৎপ্রযোজকো হেতুশ্চ—পা. ১।৪।৫৪, ৫৫; প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ কারকাণাং য ঈশ্বরঃ। অপ্রযুক্তঃ প্রযুক্তো বা স কর্তা নাম কারকম্।।—বাক্যপদীয় ; ক্রিয়ামুখ্যো ভবেৎকর্তা হেতুকর্তা প্রযোজকঃ। অনুমন্তা গ্রহীতা চ কর্তা পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ।। —গোপাল চক্রবর্তী ; ত্রিধৈব জ্ঞায়তে কর্তা বিশেষেণ প্রতিক্রিয়াম্। যোগ্যত্ব প্রতিষিদ্ধত্ব বিশেষণ পদান্বয়ৈঃ।। কর্তা চ ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ কারকাণাং প্রবর্তকঃ। কেবলো হেতুকর্তা চ কর্মকর্তা তথাঽপরঃ।। —মাধবীয় ধাতুবৃত্তি১।২ ; ক্রিয়মাণং তু যৎ কর্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি। সুকরৈঃ স্বৈর্গুণৈঃ কর্তুঃ কর্মকর্তেতি তদ্‌বিদুঃ।। –কাতন্ত্র (আখ্যাত ৭৫) বৃত্তি।

কর্ম— কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম, তথাযুক্তং চানীপ্সিতম্, অকথিতংচ —পা. ১।৪।৪৯–৫১; তৎকর্ম ক্রিয়তে চ যৎ। —গরুড়পুরাণ ; যৎকর্তুঃ ক্রিয়য়া ব্যাপ্যং তৎ কর্ম পরিকীর্তিতম্। —প্রয়োগরত্নমালা; উৎক্ষেপণং ততোঽবক্ষেপণমাকুঞ্চনং তথা। প্রসারণং চ গমনং কর্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ।। –ভাষাপরিচ্ছেদ ৬

কর্মধারয়— তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণঃ কর্মধারয়ঃ —পা. ১।২।৪২
পদে তুল্যাধিকরণে বিজ্ঞেয়ঃ কর্মধারয়ঃ –কাতন্ত্র
বিশেষণং বিশেষ্যেণাঽপ্যেকার্থং যদি তদ্দ্বয়ম্।
স কর্মধারয়স্তস্মিন্ প্রায়ঃ পূর্বং বিশেষণম্।।—চাঙ্গুদাস
ক্রমিকং যন্নামযুগমেকার্থেঽন্যার্থবোধকম্। তাদাত্ম্যেন ভবেদেষ সমাসঃ কর্মধারয়ঃ।। [কর্ম চাসৌ ধারয়শ্চ কর্মধারয়ঃ —যে করে ও ধারণ করে (–সুরভারতী, ১৩৪৬, ১।১২৮)]

কর্মপ্রবচনীয়— যে অপ্রযুজ্যমানস্য ক্রিয়ামাহস্তে কর্মপ্রবচনীয়াঃ–মহাভাষ্য ১।৪। ৮৩ ; ক্রিয়াবিশেষজন্যানাং সম্বন্ধানাং প্রকাশনে। কর্মপ্রবচনীয়াঃ স্যুর্নিমিত্তমবধারিতাঃ।।—শৃঙ্গারপ্রকাশ; ক্রিয়ায়া দ্যোতকা নেমে সম্বন্ধস্য ন বাচকাঃ। নাপি ক্রিয়ান্তরাপেক্ষাঃ সম্বন্ধস্য তু ভেদকাঃ।।—বাক্যপদীয় ২।২০৬ [উপসর্গাঃ ক্রিয়াগতবিশেষদ্যোতকাঃ, কর্মপ্রবচনীয়াস্তু ক্রিয়ানুযোগিকসম্বন্ধবিশেষদ্যোতকা ইতি ভেদঃ।]

লক্ষণবীপ্সেত্থম্ভুতেম্বভির্ভাগে চ পরিপ্রতী। অনুরেষু সহার্থে চ হীনে উপশ্চ কথ্যতে।। —কাতন্ত্র (চ ২২৯) বৃত্তি ।

কল্প— কল্পঃ শাস্ত্রে বিধৌ ন্যায়ে—মেদিনীকোষ; কল্পাঃ শাখান্তরীয়াঙ্গোপসংহারেণ বৈদিকানুষ্ঠানক্রমবিশেষ জ্ঞানায় বোধায়নাপস্তম্বাদিমুনিভিঃ প্রণীতাঃ। বৈজাবাপ্যাশ্বলায়ন দ্রাহ্যায়ণাদিমুনি প্রণীতানাং সূত্রাণামত্রৈবান্তর্ভবিঃ। তদুক্তং বার্ত্তিকে—সিদ্ধরূপঃ প্রয়োগো যৈঃ কর্মণামনুগম্যতে। তে কল্পা লক্ষণার্থানি সূত্রাণীতি প্রচক্ষতে।। ইতি — প্রভাবলী (ভাট্টদীপিকা টীকা)

কার— বর্ণাৎকারঃ –বার্ত্তিক (৩।৩।১০৮।৩); বর্ণঃ কারোত্তরো বর্ণাখ্যা— তৈ.প্রা. ১।১৬ [বর্ণাপেক্ষা 'কার'র ব্যাপকতা বেশী, যেমন 'আবর্ণ' বলা হয়না, কিন্তু 'আকার' বলা হয়।]

কারক— করোতীতি কারকম্—মহাভাষ্য; কারকং ক্রিয়ানিমিত্তম্—গোপীনাথ তর্কাচার্য; ক্রিয়াপ্রকারীভূতোঽর্থঃ কারকং তচ্চ ষড়্বিধম্। কর্তৃকর্মাদিভেদেন শেষঃসম্বন্ধ ইষ্যতে।। অপাদানসম্প্রদানকরণাধারকর্মণাম্। কর্তুশ্চ ভেদতঃ ষোঢ়া কারকং পরিকীর্তিতম্।।

—শব্দশক্তি প্রকাশিকা ৬৭,৬৮

কারিকা— কারিকা তু স্বল্পবৃত্তৌ বহোরর্থস্য সূচনী —হেমচন্দ্র

কার্ৎস্ন্য— একস্যা ব্যক্তেঃ সর্বাবয়বাবচ্ছেদেন অন্যথাভাবঃ কার্ৎস্ন্যম্।

কাল— ক্রিয়াবচকমাখ্যাতং লিঙ্গতো ন বিশিষ্যতে। ত্রীনত্র পুরুষান বিদ্যাৎ কালতস্তু বিশিষ্যতে।।—নিরুক্ত (১।১।৯) বৃত্তি
ক্রিয়ান্তর পরিচ্ছেদ প্রবৃত্তা যা ক্রিয়াং প্রতি। নির্জ্ঞাতপরিমাণা সা কাল ইত্যভিধীয়তে।। যথা তুলায়াং হস্তে বা নানা দ্রব্যং ব্যবস্থিতম্। গুরুত্বং পরিমীয়তে কালাদেবং ক্রিয়াগতিঃ।।

—বাক্যপদীয় ৩। ...

কালাপ (ক)— কালাপকং ব্যাকরণম্, কালাপকমধীতে কালাপকঃ।—কাশিকাবৃত্তি, ৪।৩।১১৫, ৪।২।৬৫ ; কালাপং ব্যাকরণম্—হরিনামামৃত (৩।৫৬২) বৃত্তি, কলাপিনোপজ্ঞাতমিত্যর্থঃ—ঐ টীকা।

কৃৎ— ধাতোঃ কৃদতিঙ্—পা. ৩।১।৯১,৯৩ [ধাতুর উত্তর তিঙ্ ভিন্ন বিহিত প্রত্যয়]

কোশ বা কোষ—কোষঃ শব্দস্য সংগ্রহঃ।—বচস্পতি
কোষঃ শব্দাদিসংগ্রহঃ —ধরণীকোষ
কোষঃ শব্দাদিসংগ্রহে—মেদিনীকোষ

ক্রম— 'ভণনং পরিপাট্যা যৎ স ক্রমঃ পরিকীর্তিতঃ।'

ক্রমপাঠ— দ্রঃ বেদ

ক্রিয়া— ধাত্বর্থঃ ক্রিয়া—পতঞ্জলি; সপরিস্পন্দন-সাধনসাধ্যস্তু ক্রিয়া
—ম.প্র. ৩।১।৮৭
যাবৎসিদ্ধমসিদ্ধং বা সাধ্যত্বেনাভিধীয়তে। আশ্রিতক্রমরূপত্বাৎ সা ক্রিয়েত্যভিধীয়তে।। গুণভূতৈরবয়বৈঃ সমূহঃ ক্রমজন্মনাম্। বুদ্ধ্যা প্রকল্পিতাভেদঃ সাক্রিয়েত্যভিধীয়তে।।—বাক্যপদীয়।
আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতির্ভবেৎ। কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা ক্রিয়া সৈব নিগদ্যতে।।—কাতন্ত্র

ক্রিয়াবিশেষণ—'ক্রিয়াবিশেষণং কর্ম তন্নপুংসকমব্যয়ম্।'
সম্বোধনপদং যচ্চ তৎ ক্রিয়ায়া বিশেষণম্।—বাক্যপদীয়

ক্লীবলিঙ্গ— অস্ত্রীনপুংসকে ক্লীবং বাচ্যলিঙ্গমবিক্রমে। —রুদ্রকোষ

খিল(পাঠ)— খিলপাঠো ধাতুপাঠঃ প্রাতিপদিকপাঠো বাক্যপাঠশ্চ।
—পদমঞ্জরী (১।৩।২)

গণ— গণশব্দঃ সমূহবচনঃ—রামচন্দ্র তর্কবাগীশ। দশসু ধাতুসমুদায়েষু, গণপাঠগ্রন্থেঽপি, পাণিনিরচিতে স্বরাদিস্বরূপপ্রতিপাদনগ্রন্থে—বাচস্পত্য

গতি— প্রাদয়ঃ, উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে, গতিশ্চ—পা. ১।৪।৫৮-৬০

গাথা— বিহিতা মন্ত্রবিশেষা গাথা।

গুণ— 'গুণো বৃদ্ধির্গুণো বৃদ্ধিঃ প্রতিষেধো বিকল্পনম্।
পুনর্বৃদ্ধির্নিষেধোঽতো ষঙ্‌পূর্বাঃ প্রাপ্তয়ো নব।।'
সত্ত্বে নিবিশতেঽপৈতি পৃথগ্‌জাতিষু দৃশ্যতে।
আধেয়শ্চাক্রিয়শ্চযঃ সোঽসত্ত্বপ্রকৃতির্গুণঃ।।—মহাভাষ্য ; অদেঙ্‌গুণঃ
—পা. ১।১।২

গুণবচন— সমাসকৃদন্ততদ্ধিতান্তাব্যয়সর্বনামজাতিসংখ্যাসংজ্ঞাশব্দব্যতিরিক্ত-
মর্থবচ্ছব্দরূপং গুণবচনসংজ্ঞং ভবতি।—মহাভাষ্য ১।৪।১

গুরু— সংযোগে গুরু। দীর্ঘং চ।—পাণিনি ১।৪।১১,১২
'সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা।।'
সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ।
দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ।।—বিষ্ণুধর্মোত্তর
তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়মুত্তমম্।
শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।।—ভাগবত১২।৩।২১

গৌণমুখ্য— 'শ্রুতিমাত্রেণ যত্রাস্য তাদর্থ্যমবসীয়তে।
তং মুখ্যমর্থং মন্যন্তে গৌণং যত্নোপপাদিতম্।।'
'গৌণমুখ্যয়োর্মুখ্যে কার্যসংপ্রত্যয়ঃ।'

'চ'কার— চান্বাচয়ে সমাহারেঽপ্যন্যোন্যার্থে সমুচ্চয়ে। আবশ্যকত্বেনৈকত্রা-নাবশ্যকতয়া পরে। পদানাং যত্র সম্বন্ধঃ সোঽন্বাচয় উদাহৃতঃ।। পদান্তরেণ সম্বন্ধে সংহতের্যত্র মুখ্যতা। সাহিত্যাবৎ পদানাং হি সমাহারঃ স উচ্যতে।। স্বতন্ত্রাণাং পদানাং হি সাপেক্ষাণাংপরস্পরে। যোগঃ ক্রিয়ায়াং কস্যাঞ্চিদিতরেতর উচ্যতে।। সর্বেযান্তু স্বতন্ত্রাণাং পদানামনপেক্ষয়া। ক্বচিৎ ক্রিয়ায়াং সম্বন্ধঃ সমুচ্চয় উদাহৃতঃ।।

—প্রয়োগরত্নমালাসম্প্রদায়

চতুষ্টয়— 'চত্বারোঽবয়বা অস্য চতুষ্টয়ম্।'

শব্দানাং সাধনং যত্র কারকাণাঞ্চ নির্ণয়ঃ।

সমাসস্তদ্ধিতো যত্র স চতুষ্টয় উচ্যতে।।—কাতন্ত্র

বিভক্তিসখিযুষ্মদ্ভিঃ পাদমেকং ত্রিভিঃ সহ।

কারকং চ সমাসশ্চ তদ্ধিতশ্চ চতুষ্টয়ঃ।।—ঐ

প্রবৃত্তিরাসীচ্ছব্দানাং চরিতার্থা চতুষ্টয়ী—কুমারসম্ভব ২।১৭

চরণ— (বৈদিক) 'শাখাবিশেষাধ্যয়নপরৈকতাপন্ন জনসঙ্ঘঃ'—মালতীমাধব-টীকা ; চরণশব্দঃ শাখানিমিত্তকঃ পুরুষেষু বর্ততে।

—কাশিকাবৃত্তি২।৪।৩

চর্করীত— 'চর্করীতাভিধো ধাতুশ্চেক্রীযিতলুকীষ্যতে।'—চর্করীতরহস্য১

চূর্ণি, চূর্ণী— চূর্ণিঃ সূত্রবার্ত্তিকভাষ্যম্—কাতন্ত্র (৩।১৮৩) বৃত্তি

অশেষ প্রতিপক্ষ চূর্ণনাচ্চূর্ণির্মহাভাষ্যম্।—টীকাসর্বস্ব

পাণিনেরাদ্যাবৃত্তিশ্চূর্ণিঃ—কাতন্ত্রপরিশিষ্ট (১।৯৪) টীকা

চূর্ণিঃ স্ত্রিয়াং ভবেদ্ ভাষ্যং সূত্রাভিপ্রায়বর্ণকম্।

—কোশকল্পতরু ১।৫।৯১

চূর্ণীচূর্ণিরুভে তুলে— কল্পদ্রুকোষ ১।৫।৪০

ছন্দঃ— ছন্দাংসি ছাদনাৎ—নিরুক্ত ১।৪।২, 'গতিসৌন্দর্যং ছন্দঃ'।

ছন্দোহীনো ন শব্দোঽস্তি ন ছন্দঃ শব্দবর্জিতম্।—নাট্যশাস্ত্র ১৪।৪৫

'ছন্দোব্যাকরণয়োর্বিরোধে ছন্দো গরীয়ঃ।'—'অপি মাষংমষং কূর্যাচ্ছন্দোভঙ্গে ত্যজেদ্ গিরম্।' [ছন্দোরক্ষার জন্য বিসন্ধিদোষ এবং পুনঃ সন্ধিদোষও নিন্দিত নয়।]

ছত্র, ছাত্র— গুরুশ্ছত্রম্। গুরুণা শিষ্যশ্ছত্রবৎছাদ্যঃ। শিষ্যেণ গুরুশ্ছত্রমিব পরিপাল্যঃ—মহাভাষ্য ৪।৪।৬২

গুরুচ্ছিদ্রাচ্ছাদনং ছত্রম্। তচ্ছীলমস্য ছাত্রঃ। —পদচন্দ্রিকা২।৭।১০

ছত্রং শীলমস্য ছাত্রঃ। ছত্রমাচ্ছাদনং গুরোর্দোষাণামাবরণমিতি।

—শব্দকৌস্তুভ ৪।৪।২

[ছত্রশীলস্তু বিদ্যার্থী ছাত্র ইত্যভিধীয়তে]

জাতি— আকৃতিগ্রহণা জাতিঃ। —মহাভাষ্য ৪।১।৬৩

অনেকব্যক্ত্যভিব্যঙ্গ্যা জাতিঃ স্ফোট ইতি স্মৃতঃ।

কৈশ্চিদ্ব্যক্তয় এবাস্যা ধ্বনিত্বেন প্রকল্পিতাঃ।।
সত্যং যত্তত্র সা জাতিরসত্যা ব্যক্তয়ঃ স্মৃতাঃ।
—বাক্যপদীয় ১।৯৪, ৩।১।৩২
জাত্যাকৃতিব্যক্তয়স্তু পদার্থঃ। আকৃতির্জাতিলিঙ্গাখ্যা।
সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ। —ন্যায়দর্শন ২।২।৬৮,৭০,৭১

টীকা— টীকা নিরন্তরা ব্যাখ্যা। —হেমচন্দ্র [টীকার আংশিক টীকা টিপ্পনী বা টিপ্পণী।]

ঢুণ্টিকা— তাৎপর্যান্বেষী গ্রন্থ। 'ঢুণ্ট অন্বেষণে' —ধাতুসূত্র।
অন্বেষণে ঢুণ্টিরয়ং প্রথিতোঽস্তি ধাতুঃ
সর্বার্থ ঢুণ্টিততয়া ভব ঢুণ্টিনামা।
কাশী প্রবেশমপি কো লভতেঽত্র দেবী
তোষং বিনা তব বিনায়ক ঢুণ্টিরাজ।।—কাশীখণ্ড ৫৭।...
[ঢুণ্টি=গণেশ]

তৎপুরুষসমাস—বিভক্তয়ো দ্বিতীয়াদ্যা নাম্না পরপদেন তু।
সমস্যন্তে সমাসো হি জ্ঞেয়স্তৎপুরুষঃ স চ।।—কাতন্ত্র সূত্র (চ ২৬৬) উত্তরপদপ্রধানস্তৎপুরুষঃ—প্রাচীনাঃ
যদীয়েন সুবর্থেন যৃতযদবোধনক্ষমঃ। যঃ সমাসস্তস্য তত্র স তৎ-পুরুষ উচ্যতে।। দ্বিতীয়াদিসুবর্থস্য ভেদাদেব চ ষড়্বিধঃ।
ক্রিয়ান্বয়ী দ্বিতীয়াদেরর্থঃ প্রায়োঽত্র যোজিতঃ।।—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা
সমস্যন্তে দ্বিতীয়াদ্যা নাম্না পরপদেন যৎ।
স তৎপুরুষ ইত্যুক্তো যৎপরং তৎপরং বহু।।—চাঙ্গুসূত্র।

তদ্ধিত— তস্মৈ হিতমিতিহ্যর্থো যন্মধ্যে তে চ তদ্ধিতাঃ।—প্রক্রিয়াসর্বস্ব
তেভ্যঃ প্রয়োগেভ্যো হিতাস্তদ্ধিতাঃ —প্রক্রিয়াকৌমুদীবিমর্শ
'বিভক্তি ধাত্বংশকৃদভ্যোঽন্যাঃ প্রত্যয়স্তদ্ধিতঃ'
বিভক্ত্যাদি ত্রিকাদন্যঃ প্রত্যয়স্তদ্ধিতো মতঃ। —জগদীশ তর্কালঙ্কার

তন্ত্র— তন্ত্র্যতে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেনেতি তন্ত্রং ব্যাকরণম্—কাশিকা বি. পঞ্জিকা

তর্ক— আগমস্যাবিরোধেন উহনং তর্ক উচ্যতে।—অমৃতনাদোপনিষদ ৩।৬
শব্দানামেব সা শক্তিস্তর্কো যঃ পুরুষাশ্রয়ঃ। —বাক্যপদীয় ১।১২৯
'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।'

তিঙ— তিপ-আদি মহিঙ-অন্ত সমস্ত ধাতুবিভক্তি নির্দেশক প্রত্যাহারসংজ্ঞা: তেমন তঙ =আত্মনেপদী সমস্ত ধাতুবিভক্তির নির্দেশক।

তীর্থকাক— যথা তীর্থে কাকা ন চিরং স্থাতারো ভবন্তি, এবং যো গুরুকুলানি গত্বা ন চিরং তিষ্ঠতি স উচ্যতে তীর্থকাক ইতি।
—মহাভাষ্য ২।১।৪২

ত্রয়ী— ঋগ্‌যজুঃ সামরূপত্বাৎ ত্রয়ীতি পরিকীর্তিতা—সীতোপনিষদ্

ত্রিমুনি— ব্যাকরণস্য ত্রিমুনি। বিদ্যাতদ্বতামভেদবিবক্ষায়াং ত্রিমুনিব্যাকরণম্।
—সিদ্ধান্ত কৌমুদী ২।১।১৯
'ত্রয়োমুনয়ঃ। পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলয় ইতি বিগ্রহঃ।'

দীর্ঘ— 'দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে'—শ্রুতবোধ

দৃষ্টান্ত— 'দৃষ্টান্তস্তু সধর্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম্'

দোষ— বিশ্লিষ্ট সন্ধির্ভিন্নার্থো গুরুর্ব্যাহত এব চ।
পুনরুক্তপদার্থশ্চ পঞ্চ দোষাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।—বররুচি (চৈত্রকূটী বৃত্তি,সন্ধিসূত্র ২)

দ্বন্দ্ব— সর্বপদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ। দ্বৌদ্বাবর্থৌ অতিদধাত্যেকোঽস্মিন্নিতি দ্বন্দ্বঃ।
দ্বন্দ্বঃ সমুচ্চয়ো নাম্নোর্বহূনাং বাপি যো ভবেৎ।—কাতন্ত্র

দ্বিগু— সংখ্যাপূর্বো দ্বিগুরিতি জ্ঞেয়ঃ।—কাতন্ত্র (চ ২৬৪)
তদ্ধিতার্থে সমাহারে স্যাদুত্তরপদে পরে।
স সমাসো দ্বিগুর্যত্র সংখ্যা সংখ্যেয়বাচিভিঃ।।—চাঙ্গুদাস
সংখ্যাশব্দযুক্ত নাম তদলক্ষ্যার্থ বোধকম্।
অভেদেনৈব যৎ স্বার্থে স দ্বিগুস্ত্রিবিধোমতঃ।।
—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা

ধর্ম— যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ। —বৈশেষিক সূত্র ১।১।২
ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ।—মহাভাষ্য

ধাতু— ধাতুর্দধাতেঃ —নিরুক্ত ১।২০ ; অভিদধাত্যর্থং ধাতুঃ—নারায়ণভট্ট ; ধাতুর্হি ক্রিয়াবাচী—প্রাচীনাঃ ; ক্রিয়াবচনো ধাতুঃ।—কাত্যায়ন(মহাভাষ্য ১।৩।১) ; অন্ত্যবর্ণসমুদ্ভূতা ধাতবঃ পরিকীর্তিতাঃ।—ইন্দ্র (কাশিকা-ব্যাখ্যাতত্ত্ববিমর্শিনীধৃত) ; 'ধাতবঃ সর্বমূলানি।' শব্দযোনিঃ—অমর ৩।৩।৬৫; ফলব্যাপারয়োর্ধাতুরাশ্রয়ে তু তিঙঃ স্মৃতাঃ।—বৈয়াকরণভূষণ২; ধাতবঃ পঠিতাঃ পাঠ-সূত্র-লোকাগমস্থিতাঃ—কবিকল্পদ্রুম ৪; মূলধাতুর্গণোঽক্তোঽসৌ সৌত্রঃ সূত্রৈকদর্শিতঃ। যোগলভ্যার্থকো ধাতুঃ প্রত্যয়ান্তঃ প্রকীর্তিতঃ।।—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ৫৮ ; প্রকৃত্যন্তঃ সনন্তশ্চ যঙন্তো যঙ্‌লুগেব চ। ণ্যন্তো ণ্যন্তসনন্তশ্চ ষড়বিধো ধাতুরুচ্যতে।।—নিরুক্ত (১১।২৮) দুর্গবৃত্তি।

ধাতুগণ— ভ্বাদ্যদাদী জুহোত্যাদির্দিবাদিঃ স্বাদিরেব চ। তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তনক্র্যাদি চুরাদয়ঃ।।—রূপাবতার

ধাত্বর্থ— ক্রিয়া ধাত্বর্থরুচ্যতে—শাব্দিকাঃ ; ফলানুকূলো ব্যাপার এব ধাত্বর্থঃ —তত্ত্বচি. ; ফলমাত্রং ধাত্বর্থঃ। ব্যাপারঃ প্রত্যয়ার্থঃ। —নাগেশ ভট্ট ; ব্যাপারসন্তানঃ ক্রিয়া তদ্বাচকো ধাত্বর্থঃ—বৈয়াকরণভূষণ ;
প্রয়োগতোঽনুমন্তব্যা অনেকার্থা হি ধাতবঃ।—ক্ষীরতরঙ্গিণীধৃত বচন;

'সর্বে গত্যর্থধাতবঃ প্রাপ্ত্যর্থা জ্ঞানার্থাশ্চ।' সর্ব এব ধাত্বর্থঃ করোত্যর্থেন ব্যাপ্তঃ—কাতন্ত্র (৮২১৯) টীকা।

ধ্বনি— প্রতীতপদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ ইত্যুচ্যতে।—মহাভাষ্য
স্ফোটস্য গ্রহণে হেতুঃ প্রাকৃতো ধ্বনিরিষ্যতে।
বৃত্তিভেদে নিমিত্তত্বং বৈকৃতঃ প্রতিপদ্যতে।।—বাক্যপদীয় ১।৭৭
শব্দার্থোভয়শক্ত্যুত্থস্ত্রিধা সংকথিতো ধ্বনিঃ।—সৃষ্টিধরাচার্য
[ধ্বনির্বর্ণাশ্রিতঃ কাব্যে সঙ্গীতে চ সুরাশ্রিতঃ।]

ন-কার— নকারৌ দ্বিবিধৌ জ্ঞেয়ৌ পর্যুদাসপ্রসজ্যকৌ।
পর্যুদাসঃ সদৃগ্‌গ্রাহী নিষেধার্থঃ প্রসজ্যকঃ।।—সারস্বতে প্রসাদটীকা

নঞ— 'তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট প্রকীর্তিতাঃ।।' অভাবশ্চ নিষেধশ্চ তদ্বিরোধস্তদন্যথা। ঈষদর্থশ্চ কুৎসা চ নঞর্থাঃ ষটপ্রকীর্তিতাঃ।।

—কাতন্ত্র (১।১।১১) কবিরাজ-ধৃতবচন

নদী— যূস্ত্র্যাখ্যৌ নদী—পা. ১।৪।৩ [নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ ঈ এবং উকারান্ত শব্দ]

নপুংসক— ন স্ত্রীপুংসৌ নপুংসকমিতিস্থিতির্নপুংসকমর্থাল্লক্ষিতম্—বাক্যপদীয়-টীকায় হেলারাজ ; সাম্যং স্থিতিরৌৎসুক্যনিবৃত্তিরপরার্থত্বমঙ্গাঙ্গিভাব-নিবৃত্তিঃ কৈবল্যমিতি নপুংসকত্বম্। —সংগ্রহকার ;
আবির্ভাবতিরোভাবান্তরালাবস্থা স্থিতিরুচ্যতে। সা চ নপুংসকত্বেন ব্যবস্থাপ্যতে। —কৈয়ট

নাদ— সংবৃতে কণ্ঠে নাদঃ ক্রিয়তে।—তৈ. প্রাতি. ২।৪ ;
আহতোঽনাহতশ্চেতি দ্বিধা নাদো নিগদ্যতে।
স নাদস্ত্বাহতো লোকে রঞ্জকো ভবভঞ্জকঃ।।
নাদেন ব্যজ্যতে বর্ণঃ পদং বর্ণাৎ পদাদ্ বচঃ।
বচসো ব্যবহারোঽয়ং নাদাধীনমতো জগৎ।।—সঙ্গীতরত্নাকর ১।২।...
বৈখর্যা হি কৃতো নাদঃ পরশ্রবণগোচরঃ।
মধ্যময়া কৃতো নাদঃ স্ফোটব্যঞ্জক উচ্যতে।।—বাক্যপদীয়

নাম— সত্ত্বাভিধায়কং নাম —ঋক্‌প্রাতি. ১২।৮ ; সত্ত্বপ্রধানানি নামানি-নিরুক্ত ১।১।৯ ; দ্রব্যপ্রধানং নাম—মহাভাষ্য ৫।৩।৬৬ ; বস্তু বাচীনি নামানি—কাতন্ত্র (২।৫।১) বৃত্তি ; যেষামুৎপত্তৌ স্বে প্রয়োগে রূপোপলব্ধিস্তানি নামানি—পূর্বমীমাংসা ২।১।৩ ; শব্দেনো-চ্চারিতেনেহ যেন দ্রব্যং প্রতীয়তে। তদক্ষরবিধৌ যুক্তং নামেত্যাহুর্মনীষিণঃ।। অষ্টৌ যত্র প্রযুজ্যন্তে নানার্থেষু বিভক্তয়ঃ। তন্নাম কবয়ঃ প্রাহুর্ভেদে বচনলিঙ্গয়োঃ।।—বৃহদ্দেবতা ১।৪২,৪৩ ; উণাদ্যন্তং কৃদন্তঞ্চ তদ্ধিতান্তং সমাসজম্। শব্দানুকরণঞ্চৈব নাম পঞ্চবিধং স্মৃতম্।।—গোয়ীচন্দ্র ; নমত্যনেন নাম—হেমচন্দ্র ; নম্যতে

অভিধীয়তে অনেনেতি নাম —সর্বানন্দ ; নামানি নময়ন্ত্যর্থং প্রধানমিতি নামতা—আখ্যাতানুক্রমণী ২।১।৪ ; নামেদং রূপত্বেন বৃত্তরূপং রূপঞ্চেদং নামভাবেন তস্থৌ।—বাক্যপদীয়ে পুণ্যরাজকৃত টীকাধৃত বচন ; নামভেদাদ্ ভবেদ্ ভিন্না ন ভিন্নাঃ পরমার্থতঃ।

—হরতত্ত্বদীধিতি।

নামধাতু— নাম্নো ধাতুর্নামধাতুর্নাম্নো নিষ্পন্ন ইত্যর্থঃ।

—গোয়ীচন্দ্র (সন্ধি১০) টীকা

নামধেয়— বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্—ছা. উপনিষদ ৬।১।৪ (Modification is a matter of wording, a giving of names to things.)

নিঘণ্টু— অর্থান্ নিঘণ্টয়ত্যস্মাদ্ নিঘণ্টুঃ পরিকীর্তিতঃ —ব্যাড়ি ; নিঘণ্টুর্নামসংগ্রহঃ—কল্পদ্রুকোশ

নিত্য— তদপি নিত্যং যস্মিন্ তত্ত্বং ন বিহন্যতে।—মহাভাষ্য ১।১।১

নিত্যানিত্যসমাস—বিভক্তিমাত্র প্রক্ষেপান্নিজান্তর্গতনামসু।

অর্থস্যাবোধবোধাভ্যাং নিত্যানিত্যৌ সমাসকৌ।।—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা;

অবিগ্রহোঽস্বপদবিগ্রহো বা নিত্যসমাসঃ। —ভট্টোজি ;

'নিত্যোঽনিত্যো বিকল্পশ্চ সমাসঃ কর্তুরিচ্ছয়া।'

নিপাত— নিপাতঃ পাদপূরণঃ—ঋক্ প্রাতি. ১২।৮ ;

উচ্চাবচেম্বর্থেষু নিপতন্তীতি নিপাতাঃ—নিরুক্ত ১।৪।২

উচ্চাবচেষু চার্থেষু নিপাতাঃ সমুদাহৃতাঃ। কর্মোপসংগ্রহার্থে চ কচিচ্চৌপম্যকারণাৎ।। ঊনানাং পূরণার্থা বা পাদানামপরে ক্বচিৎ। মিতাক্ষরেষু গ্রন্থেষু পূরণার্থাস্ত্বনর্থকাঃ।। ইয়ন্ত ইতি সংখ্যানং নিপাতানাং ন বিদ্যতে। বশাৎ প্রকরণস্যৈতে নিপাত্যন্তে পদে পদে।।—বৃহদ্দেবতা ২।৮৯...: কেঽপ্যেষাং দ্যোতকাঃ কেঽপি বাচকাঃ কেঽপ্যনর্থকাঃ। আগমা ইব কেঽপি স্যুঃ সম্ভূয়ার্থস্য বাচকাঃ।।

—সুপদ্মমকরন্দে (সংজ্ঞা ২৬) ধৃতবচন ;

নিপাতাশ্চাদয়োঽসত্ত্বে—সুপদ্ম ১।১।২৬

উপসর্গবিভক্তিস্বরপ্রতিরূপকাশ্চ নিপাতাঃ।—কাশিকা ১।৪।৫৭

'নিপাতাশ্চাদয়ো জ্ঞেয়া উপসর্গাশ্চ প্রাদয়ঃ।

দ্যোতকত্বাৎ ক্রিয়াযোগে লোকাদবগতা ইমে।।'—প্রাচীনাঃ

নিপাতন (Ad hoc)—অবাধকান্যপি নিপাতনানি ভবন্তি। —মহাভাষ্য ; 'অপ্রাপ্তেঃ প্রাপণঞ্চাপি প্রাপ্তের্বারণমেব বা। অধিকার্থবিবক্ষা চ ত্রয়মেতন্নিপাতনাৎ।।' ধাতুসাধনকালানাং প্রাপ্ত্যর্থং নিয়মস্য চ। অনুবন্ধবিকারাণাং রূঢ্যর্থে চ নিপাতনম্।।—মহাভাষ্য প্রদীপ ৫।১। ১১৪ ; লক্ষণসূত্রমন্তরেণ লোকপ্রসিদ্ধরূপোচ্চারণং নিপাতনম্—

চন্দ্রকীর্তি সিদ্ধরূপনির্দেশো নিপাতনম্—সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা (১০।৫২)-টীকা সুবোধিনী ; যদিহ লক্ষণেনানুপপন্নং তৎসর্বং নিপাতনাৎ সিদ্ধম্ —কাশিকা ৩।১।১২৩

নিয়ম— সিদ্ধে সত্যারম্ভো বিধির্নিয়মঃ —উপাধ্যায় ;
কৈমর্থক্যান্নিয়মো ভবতি। —মহাভাষ্য ১।৪।৩ ;
সামান্যপ্রাপ্তস্য বিশেষাবধারণং নিয়মঃ— বোপদেব ;
সামান্যপ্রসঙ্গে সাধারণমনুশাসনং নিয়মঃ —পদ্মনাভ

নিরুক্ত— অর্থপ্রধানং নিরুক্তম্ —দুর্গাচার্য;
বর্ণাগমাদিভির্নির্বচনং নিরুক্তিঃ নিরুক্তম্-
—অভিধান চিন্তামণি (২।১৬৪) টীকা ;
একৈকস্য পদস্য সম্ভাবিতা অবয়বার্থা যত্র নিঃশেষেণোচ্যন্তে তন্নিরুক্তম্—সায়ণাচার্য ; অবয়বার্থজ্ঞাপনার্থং তত্তদ্ঘটকপদস্য বিভাগ-করণমেব নিরুক্তম্।—ঐ; বর্ণাগমো বর্ণবিপর্যয়শ্চ দ্বৌচাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ। ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্।।—কাশিকাবৃত্তি ৬।৩।১০৯;

নির্বচন— গুণতঃ শব্দনিষ্পত্তির্নির্বচনম্—অর্থশাস্ত্র ১৫অধি ;
অন্বর্থং খল্বপি নির্বচনম্।—মহাভাষ্য ; লোকে প্রতীত মুদাহরণং নির্বচনম্—উদ্দ্যোতের ছায়া টীকা।

নিষ্ঠা— ক্তক্তবতূ নিষ্ঠা—পা. ১।১।২৬

ন্যাস— 'ন্যাসো বৃত্তের্বিবরণম্', 'ন্যস্যতে স্থাপ্যতে দৃঢ়ীক্রিয়তেঽনেনেতি ন্যাসঃ।'

পঞ্জিকা— 'পঞ্জিকা পদভঞ্জিকা। পঞ্জ্যন্তে ব্যক্তীক্রিয়ন্তে পদার্থা অনয়া পঞ্জিকা...'; বিষমাণ্যেব পদানি ভনক্তি পদভঞ্জিকা—হেমচন্দ্র

পণ্ডিত— প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথ ঊহবান্ প্রতিভানবান্। আশু গ্রন্থস্য বক্তা চ যঃস পণ্ডিত উচ্যতে।।—মহাভারত ৫।৩৩।৩৩; তর্কসাহিত্যসিদ্ধান্ত-বেদবেদান্তগামিনী। বুদ্ধিঃ পণ্ডা সমাখ্যাতা তদ্যোগাৎ পণ্ডিতঃ স্মৃতঃ।। অমর (২।৭।৫) টীকা ত্রিকাণ্ডচিন্তামণিধৃত বচন

পদ— অর্থঃ পদম্—বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য ৩।২, নিরুক্তের (১।১৬) দৌর্গবৃত্তি; অর্থাভিধায়ি পদম্। পদ্যতে গম্যতে জ্ঞায়তেঽ-র্থোঽনেনেতি পদম্। —ঐ ভাষ্য ; -বিভক্ত্যন্তং পদম্—আপিশলি, সুপ্তিঙন্তং পদম্...(পাণিনি ১।৪।১৪-৭) ; বর্ণসমুদায়ঃ পদম্—মহাভাষ্য; বর্ণসঙ্ঘাতঃ পদম্-কৌটিল্য (অর্থশাস্ত্র ২।১০।১৪); পদং স্যাদ্যন্তকম্—হেমচন্দ্র; পূর্বপরয়োরর্থোপলব্ধৌ পদম্—কাতন্ত্র ১।১।২০ ; চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চ—নিরুক্ত ১।১ ; ধাতুজং ধাতুজাজ্জাতং সমস্তার্থজমেব বা। বাক্যজং

ব্যতিকীর্ণঞ্চ নির্বাচ্যং পঞ্চধাপদম্।।—বৃহদ্দেবতা ২।১০৪ ; বর্ণাঃ পদং প্রয়োগার্হানন্বিতৈকার্থবোধকাঃ। —সাহিত্যদর্পণ ২।৪ ; পদং শব্দে চ বাক্যে চ শ্লোকপাদেঽপি চ ক্লীবম্—মেদিনী

পদ-গোত্র— ভারদ্বাজকমাখ্যাতং ভার্গবং নাম ভাষ্যতে। বসিষ্ঠ উপসর্গস্তু নিপাতঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ।। —বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য ৮।৭৪

পদার্থ— ইহ জগতি সংসারে পদার্থো বিদ্যতে দ্বয়ম্। ক্বচিদ্ ব্যক্তিঃ ক্বচিজ্জাতিঃ পাণিনেস্তূভয়ং পদম্।।—প্রাচীনাঃ ; স্বার্থো দ্রব্যং চ লিঙ্গং চ সংখ্যা কর্মাদিরেব চ। অমী পঞ্চৈব লিঙ্গার্থাস্ত্রয়ঃ কেষাঞ্চিদগ্রীমাঃ।।—কালাপাঃ ; শব্দৈরেভিঃ প্রতীয়ন্তে জাতিদ্রব্য-গুণক্রিয়াঃ। চাতুর্বিধ্যাদমূষাং তু শব্দ উক্তশ্চতুর্বিধঃ।।—চান্দ্রাঃ ; একং দ্বিকং ত্রিকং চাথ চতুষ্কং পঞ্চকং তথা। নামার্থা ইতি সর্বেঽমী পক্ষাঃ শাস্ত্রে নিরূপিতাঃ।।—বৈয়াকরণভূষণসার

পদ্ধতি— 'সূত্রবৃত্তিবিবেচনং পদ্ধতিঃ।'

পদ্য-- ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যম্।

পরব্রহ্ম— যস্মিন্ স লীয়তে শব্দস্তৎপরং ব্রহ্ম গীয়তে।—ব্রহ্মবিন্দূপনিষদ্ ১৩

পরিভাষা— অনিয়মে নিয়মকারিণী যা সা পরিভাষা—উপাধ্যায় ; পরিভাষা পুনরেকদেশস্থা সতী কৃৎস্নং শাস্ত্রমভিজ্বলয়তি প্রদীপবৎ–মহাভাষ্য ২।১।১ ; অব্যক্তানুক্তলেশোক্তসন্দিগ্ধার্থপ্রকাশিকাঃ। পরিভাষাঃ প্রবক্ষ্যন্তে দীপীভূতাঃ সুনিশ্চিতাঃ।।—বৈদ্যকশাস্ত্র ; ভাষ্যন্তে পরিতো যস্মাৎ পরিভাষাস্ততঃ স্মৃতাঃ।—ভাবশর্মা ; একদেশস্থিতা শাস্ত্রভবনে যাতি দীপতাম্। পরিতো ব্যাপৃতাং ভাষাং পরিভাষাং প্রচক্ষতে।।—ম.প্র. উদ্দ্যোত ২।১।১ ; গ্রন্থস্য সংক্ষেপনির্বাহার্থং সংকেতবিশেষঃ পরিভাষা—বোপদেব ; সা চ পদার্থবিবেচকাচার্যাণাং যুক্তিযুক্তা বাক্।—পদ্মনাভদত্ত ; তত্রাধুনিকঃ সঙ্কেতঃ পরিভাষা—গদাধর (শক্তিবাদ)

পরিশিষ্ট— শেষাবয়বঃ। পরিশিষ্যতে অবশিষ্যতে যৎ তৎ।

পরিষদ, পর্ষদ্—চাতুর্বৈদ্যং বিকল্পী চ অঙ্গবিদ্ ধর্মপাঠকঃ। আশ্রমস্থাস্ত্রয়ো বিপ্রাঃ পর্ষদেষা দশাবরা।।—বৌধায়ন ধর্মসূত্র ১।১।৮ [বিকল্পী= মীমাংসকঃ]

পর্যায়— একার্থবোধকশব্দক্রমঃ। 'পর্যায়োঽনুক্রমঃ ক্রমঃ'—অভিধানচিন্তামণি ৬।১৩৭ ;
অনুক্রমশ্চ পর্যায়ঃ—অভিধানরত্নমালা ৪।৫৪ ;
ক্রমেণৈকার্থবাচকাঃ শব্দাঃ পর্যায়াঃ—বিজয়রক্ষিত ;
একং ক্রমেণানেকস্মিন্ পর্যায়ঃ—কাব্যপ্রকাশ ১০।১৮০

পর্যুদাস— প্রধানত্বং বিধের্যত্র প্রতিষেধেঽপ্রধানতা।

পর্যুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞ্।।—সাহিত্যদর্পণ ৭।...

পস্পশা— পস্পশঃ শাস্ত্রারম্ভসমর্থক উপোদ্ঘাতসন্দর্ভগ্রন্থঃ—মল্লিনাথ (মাঘ—২।১১২) টীকা; যত্র ব্যাকরণস্য স্যাৎ ফলাফলবিচারণম্। তত্রাহ্নিকে পস্পশা স্ত্রী ...কোশকল্পতরু ১।৫।১০১; 'শাস্ত্রেষ্বাদ্যং ব্যাকরণং মুখ্যং তত্রাপি পাণিনেঃ। রম্যং তত্র মহাভাষ্যং রম্যা তত্রাপি পস্পশা।।' [স্পশ্ + যঙ্লুক্ + অচ্ (কর্তৃবাচ্যে) + স্ত্রিয়াং টাপ্ = পস্পশা = সূক্ষ্মনিরীক্ষণ। মহাভাষ্যের প্রস্তাবনা-আহ্নিকের নাম পস্পশাহ্নিক, যাহাতে সমগ্র ব্যাকরণশাস্ত্রের আভাস স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।]

পঞ্চসূত্রী— পা. ১।২।৫৩-৭ সূত্র।

পাদ— পাদস্ত্বর্থসমাপ্তির্বা জ্ঞেয়ো বৃত্তস্য বা পুনঃ। মাত্রিকস্য চতুর্ভাগঃ পাদ ইত্যভিধীয়তে।।—কাতন্ত্র (চ১৪৩) টীকায় ধৃত আপিশলীয় বচন; পাদো হি একার্থাবচ্ছিন্ন সূত্রসমূহঃ—রামচন্দ্র তর্কবাগীশ।

পারায়ণ— যথাক্রমং সাকল্যবচনং পারায়ণম্—টীকাসর্বস্ব ৩।২।১ ; পারপর্যন্তময়নমাদ্যন্তাধ্যয়নমিত্যর্থঃ।—গূঢ়ার্থপ্রকাশিকা ৭।১১৬২ ; পারং সমাপ্তিম্ অয়তে গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ইতি। 'যত্র ধাতুপ্রক্রিয়া তদ্ধাতুপারায়ণম্। যত্র গণশব্দানাং নির্বচনং তন্নামপারায়ণম্।'—পদমঞ্জরী

পার্ষদ— পর্ষদি ভবং পার্ষদম্। প্রাতিশাখ্যম্। 'পদপ্রকৃতীনি সর্বচরণানাং পার্ষদানি'—নিরুক্ত ১।১৭.; ... স্বচরণপর্ষদ্যেব যৈঃ প্রতিশাখানিয়-তমেব পদাবগ্রহপ্রগৃহ্যাপ্রগৃহ্যক্রমসংহিতা স্বরলক্ষণমুচ্যতে তানীমানি পার্ষদানি প্রাতিশাখ্যানীত্যর্থঃ।—ঐ দুর্গবৃত্তি।

পুংলিঙ্গ— পুংস্ত্বে সভেদানুচরাঃ সপর্যায়াঃ সুরাসুরাঃ। স্বর্গযাগাদ্রি মেঘাব্ধিদ্রুকালা-সিশরারয়ঃ। করগণ্ডৌষ্ঠদোর্দন্তকণ্ঠকেশনখস্তনাঃ।। ইত্যাদি, অমর ৩।৫।২

পুরুষ— নাম্নি প্রযুজ্যমানেঽপি প্রথমঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ। মধ্যমোযুস্মদি প্রোক্তঃ অস্মদ্যুত্তমপুরুষঃ।।—প্রয়োগরত্নমালা ৮।১৩

পূজা— আচার্যস্য পূজাদ্বারেণ শাস্ত্রস্যাপি পারম্পর্যপ্রতিপাদনেন প্রামাণ্যপ্রতি-পাদনাৎ পূজা ভবতি।—পদমঞ্জরী ১।২।২৫।

পৃষোদরাদি— পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টম্—পা. ৬।৩।১০৯, যেষু লোপাগমবর্ণবি-কারাঃ শাস্ত্রেণ ন বিহিতাঃ, দৃশ্যন্তে চ, তানি যথোপদিষ্টানি সাধূনি ভবন্তি।—ঐ কাশিকাবৃত্তি

প্রকরণ— প্রক্রিয়ন্তে অস্মিন্ প্রকরণম্—হেমচন্দ্র (context) ; 'একার্থাবচ্ছিন্নঃ সূত্রসমুদায়ঃ।' শাস্ত্রৈকদেশসম্বদ্ধং শাস্ত্রকার্যান্তরে স্থিতম্। আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদবিচক্ষণাঃ।।—পরাশরপু. (?)

প্রকৃতি— নিরুক্তা প্রকৃতির্দ্বেধা নাম-ধাতুপ্রভেদতঃ। যৎপ্রাতিপদিকং প্রোক্তং তন্নাম্নো নাতিরিচ্যতে।।—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ১৩; প্রত্যয়াৎ প্রথমং ক্রিয়ত ইতি প্রকৃতিঃ। —কাতন্ত্র; প্রকৃতিঃ সা জয়ত্যাদ্যা যয়া ধাত্বাদিরূপয়া। ব্যজ্যন্তে শব্দরূপাণি পরপ্রত্যয়সন্নিধেঃ।।–প্রক্রিয়া-কৌমুদী ; বিকারাপগমে সত্যাং তথাহুঃ প্রকৃতিং পরাম্।— বাক্যপদীয় ৩।২।১৫ ; 'প্রকর্ষবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ। সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা।।'

প্রক্রিয়া— প্রারম্ভাৎ করণং প্রক্রিয়া—অমরকোষোদ্‌ঘাটন ২।৮।৩১

প্রগৃহ্য— ঈদূদেদ্ দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্, ঈদূতৌ চ সপ্তম্যর্থে—পা. ১।১। ১১,১৯ [পা ১।১।১১–১২, ১৪–১৬, ১।১।১৯ সূত্র প্রগৃহ্যবিষয়ক। অন্তিম ঈ ঊ বা একারে পর্যবসিত দ্বিবচন-প্রত্যয়, অদস্ শব্দের অমী ও অমূ-র ঈ এবং ঊ, আঙ্ ভিন্ন একস্বর নিপাত, শাকল্যের ঋগ্‌বেদীয় পদপাঠে সম্বোধনপদের অন্তিম ও–যাহা ইতিদ্বারা অনুসৃত এবং সপ্তম্যর্থে ঈ এবং ঊ প্রগৃহ্য।]

প্রচয়— 'উদাত্তান্নিহতঃ স্বারঃ স্বরিতাৎ প্রচয়ো ভবেৎ।'

প্রতিজ্ঞা— প্রতিজ্ঞা চায়মেবমিতি কথনম্—শব্দেন্দুশেখর।

প্রতিভা— অভ্যাসাৎ প্রতিভাহেতুঃ সর্বঃ শব্দোঽপরৈঃ স্মৃতঃ। বালানাং চ তিরশ্চাং চ যথার্থপ্রতিপাদনে।। বিচ্ছেদগ্রহণেঽর্থানাং প্রতিভানোপ-জায়তে। বাক্যার্থ ইতি তামাহুঃ পদার্থৈরুপপাদিতাম্।। ইদং তদিতি সান্যেষামনাখ্যেয়া কথঞ্চন। প্রত্যাত্মাবৃত্তিসিদ্ধা সা কর্ত্রাঽপি ন নিরূপ্যতে।। উপশ্লেষমিবার্থানাং সা করোত্যবিচারিতা। সার্বরূপ্যমিবাপন্না বিষয়ত্বেন বর্ততে।। স্বভাবচরণাভ্যাস যোগদৃষ্টো-পপাদিতাম্। বিশিষ্টোপহিতাং চেতি প্রতিভাং ষড়্‌বিধং বিদুঃ।।— বাক্যপদীয় ২।১১৭, ১৪৩–৪৫, ১৫২

প্রতিষেধ— 'প্রতিষেধঃ প্রসিদ্ধস্য নিষেধস্যানুকীর্তনম্।'

প্রত্যয়— যস্তমর্থং সংপ্রত্যায়য়তি স প্রত্যয়ঃ—মহাভাষ্য ৩।১।১ ; যঃ প্রত্যায়কঃ স প্রত্যয়ঃ—কৈয়ট ; প্রতিয়ন্ত্যনেনার্থমিতি হি প্রত্যয়ঃ— শব্দকৌস্তুভ ২। . . . ; সাধ্যত্বেন ক্রিয়া তত্র ধাতুরূপনিবন্ধনা। সিদ্ধভাবস্তু যস্তস্যাঃ স ঘঞাদিনিবন্ধনঃ।। —বাক্যপদীয় ; প্রত্যায়য়ন্তীতি সুপ্-তিঙ্-কৃত্তদ্ধিতাঃ প্রত্যয়াঃ—সংক্ষিপ্তসার ; যস্যার্থঃ প্রকৃত্যা প্রত্যায্যতে সোঽপি প্রত্যয়ঃ—পরিভাষেন্দুশেখর ১৯১ ; বিভক্তিশ্চৈব ধাত্বংশস্তদ্ধিতঃ কৃদিতি ক্রমাৎ। চতুর্ধা প্রত্যয়ঃ প্রোক্তঃ কাদিভিঃ পঞ্চধাঽথবা।।—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ১৯১

প্রত্যাহার— প্রত্যাহারো লাঘবেন শাস্ত্রপ্রবৃত্ত্যর্থঃ।—কাশিকাবৃত্তি ;

প্রত্যাহ্রিয়ন্তে সংক্ষিপ্যন্তেঽস্মিন বর্ণা ইতি প্রত্যাহারঃ—ন্যাস, পদমঞ্জরী ; অল্পেন বহূনাং গ্রহণম্ —শব্দকল্পদ্রুম।

প্রমাণ— প্রমাতা যেনার্থং প্রমিণোতি তৎ প্রমাণম্—ন্যায়সূত্র (১।১।১)-ভাষ্য [প্রমাণ ৮প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য।]

প্রয়োগ— মহান্ হি শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ঃ। . . . শাস্ত্রপূর্বকে প্রয়োগেঽভ্যুদয়স্তত্তুল্যং বেদশব্দেন—মহাভাষ্য (পস্পশা) ; যস্মিন্ দেশে প্রসিদ্ধা যে প্রযোক্তব্যাহি তত্র তে। অপ্রসিদ্ধাশ্চ যে শব্দা বোধ্যা গ্রন্থান্তরাত্তু তে।।—সংক্ষিপ্তসারে (উণাদি ২২২)-বৃত্তি; আদিব্যাকরণাদীনাং প্রামাণ্যংযন্নিবন্ধনম্। তস্মৈ বিশ্বাত্মনে বৃদ্ধপ্রয়োগব্রহ্মণে নমঃ।।

—প্রাচীনাঃ

প্রসজ্যপ্রতিষেধ—অপ্রাধান্যং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা।
প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্।।—মীমাংসাবার্ত্তিক

প্রাকৃত— প্রকৃতৌ যথা জাতভাবেভবোঽব্যুৎপন্নঃ প্রাকৃতঃ –টীকাসর্বস্ব ২। ১০।১৬ ; তদ্ভবস্তৎসমো দেশীত্যনেকঃ প্রাকৃতক্রমঃ। মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।।—কাব্যাদর্শ ১। ৩৩,৩৪

প্রাতিপদিক— অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্। কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ।–পা. ১।২। ৪৫, ৪৬ ; অর্থবৎ প্রাতিপদিকং ধাতুপ্রত্যয়বর্জিতম্। —গরুড়পু. (পূর্বখণ্ড ২০৯।৩) ; যৎ প্রাতিপদিকং প্রোক্তং তন্নাম্নো নাতিরিচ্যতে। —শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ১৩ ; নিপাতস্যানর্থকস্য প্রাতিপদিকসংজ্ঞা বক্তব্যা—কাত্যায়নবার্ত্তিক।

প্রাতিশাখ্য— প্রতিশাখং ভবং প্রাতিশাখ্যম্—মাধবীয় ধাতুবৃত্তি ১।৯০ ; তত্র হি তত্তচ্ছাখাগতানামেব শব্দানাং প্রতিপাদনং, তদপি ন কার্ৎস্ন্যেন, প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগানাং স্বরাণাঞ্চ সর্বেষাং তথাঽসংগ্রহাৎ।

—উদ্দ্যোত ৬।৩।১৪

প্লুত— ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ঃ – শ্রুতবোধ ৩
গানাহ্বানক্রন্দনেষু স্বরাস্ত্রিমাত্রকাঃ প্লুতাঃ। —প্রয়োগরত্নমালা ১।১২

ফিট্— ফিড়িতি প্রাতিপদিকস্য পূর্বাচার্যসংজ্ঞা। —লঘুশব্দেন্দুশেখর;
ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ —ফিট্সূত্র ১।১

বচন— উচ্যতেঽনেনেতি বচনম্—সি. চন্দ্রিকাটীকা সুবোধিনী ;
দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে। বহুষু বহুবচনম্ —পা. ১।৪।২২,২১

বর্গ— প্রথমগ্রহণে বর্গম্ –বাজসনেয়িপ্রাতি. ১।৬৪; পঞ্চকোবর্গঃ—হৈমব্যাকরণ ১।১।১২ ; মান্তেষু কাদিবর্ণেষু কচটতপসংজ্ঞকাঃ। পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্বর্ণৈর্বর্গাঃ পঞ্চ প্রকীর্তিতাঃ।। —হৈমপ্রকাশ; জাত্যা

সংস্থানাদিনা বা প্রাণিভিরপ্রাণিভির্বা সমৈস্তল্যৈরুপলক্ষিতং বৃন্দং বর্গঃ। বৃজ্যতে পৃথক্‌ক্রিয়তে বিজাতীয়েভ্য ইতি বর্গঃ।
—পদচন্দ্রিকা ২।(৫)।২৫৬

বর্ণ— অবিভাজ্য একো নাদো বর্ণঃ। —রাজরাজবর্মা (লঘুপাণিনীয়ে);
বর্ণজ্ঞানং বাগ্‌বিষয়ো যত্র চ ব্রহ্ম বর্ত্ততে। —মহাভাষ্য

বর্ণমালা— 'অকারাদিহকারান্তা বর্ণমালা প্রকীর্তিতা'—প্রাচীনাঃ

বর্ণাভেদকল্পনা—'রলয়োর্ডলয়োস্তদ্বজ্‌জয়য়োর্ববয়োরপি।
শসয়োর্মনয়োশ্চান্তে সবিসর্গাবিসর্গয়োঃ।
সবিন্দুকাবিন্দুকয়োঃ স্যাদভেদেন কল্পনম্।।'
রলয়োর্ডলয়শ্চৈব শসয়োর্ববয়োস্তথা।
বদন্ত্যেষাং চ সাবর্ণ্যমলঙ্কারবিদো জনাঃ।।—সারস্বতীপ্রক্রিয়া ১।১৫

বর্ণোচ্চারণস্থান—অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বামূলং চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালু চ।। —পাণিনীয় শিক্ষা

বর্তমান— 'প্রারম্ভাদাসমাপ্তেস্তু যাবন্ন নশ্যতি ক্রিয়া। তাবদ্‌ বর্তত ইত্যস্মাদ বর্তমান উদাহৃতঃ।।' 'প্রবৃত্তোপরতশ্চৈব বৃত্তাবিরত এব চ। নিত্যপ্রবৃত্তঃ সামীপ্যো বর্তমানশ্চতুর্বিধঃ।।'

বহুব্রীহি— 'বহুঃ ব্রীহির্যস্য স বহুব্রীহিঃ।' 'অন্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ।' যত্রানেকং পরস্যার্থে বহুব্রীহিঃ স উচ্যতে। —চান্দ্রদাস;
তদ্‌গুণোঽতদ্‌গুণশ্চেতি বহুব্রীহির্দ্বিধামতঃ। প্রথমো লম্বকর্ণঃ স্যাদ্দ্বিতীয়ো দৃষ্টসাগরঃ।।—ঐ; দ্বন্দ্বোঽস্মি দ্বিগুরস্মি চ গৃহে চ সততমব্যয়ী-ভাবঃ। তৎপুরুষ কর্মধারয় যেনাহং স্যাং বহুব্রীহিঃ।।
—কাব্যমীমাংসা (১০ম অ.)-ধৃত

বহুল— বহূনর্থান্ লাতি বহুলম্—টীকাসর্বস্ব ৩।১।৬০ ;
ক্বচিৎপ্রবৃত্তিঃ ক্বচিদপ্রবৃত্তিঃ ক্বচিদবিভাষা ক্বচিদন্যদেব।
বিধের্বিধানং বহুধা সমীক্ষ্য চতুর্বিধং বাহুলকং বদন্তি।। —বাজস-নেয়িপ্রাতিশাখ্য (৩।১৮)-টীকাধৃত বচন;
প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ বিভাবোক্তবিধেঃ ক্বচিৎ।
অপূর্বস্য বিধানঞ্চ বহুলং স্যাচ্চতুর্বিধম্।। —সুপদ্মমকরন্দ

বাক— বাগেব প্রকৃতিঃ পরা—তৈ.সংহিতা ৬।৪।৭।৩ ; বাগেব বিশ্বাভুবনানি জজ্ঞে বাচঃ এতৎ সর্বমমৃতং যচ্চ মর্ত্যম্—শ্রুতি ; বাগেবার্থং পশ্যতি বাগ্ ব্রবীতি বাগেবার্থং সন্নিহিতং সংতনোতি। বাচৈব বিশ্বং বহুরূপং নিবদ্ধং তদেতদেকং প্রবিভজ্যোপভুঙ্‌ক্তে।।—বাক্যপদীয় (১।১১৯)-টীকায় পুণ্যরাজধৃত বচন ;
সহস্রংযাবদ্ ব্রহ্ম বিষ্টিতং তাবতো বাক—ঋগ্‌বেদ ৮।১০।১১৪ ;
সৈষা বাক সর্বশব্দা—শাঙ্খ্যায়ন আরণ্যক ৭।২৩ ;

যঃ কশ্চ শব্দো বাগেব।—বৃহদা. উপ. ১।৫।৩ ; বাচা সর্বাণি নামানি আপ্নোতি—কৌষীতকী উপ. ৩।৩।৪ ; একৈকবর্ণবর্তিনী বাক্—মহাভাষ্য ৬।৩।৫৯ ; অর্থপরিজ্ঞানফলা হি বাক্—উদ্দ্যোত ; সা সর্ববিদ্যাশিল্পানাং কলানাং চোপবন্ধনী। তদ্বশাদভিনিস্পন্নং সর্বং বস্তু বিভজ্যতে।। সৈষা সংসারিণাং সংজ্ঞা বহিরন্তশ্চ বর্ততে। তন্মাত্রামপ্যতিক্রান্তং চৈতন্যং সর্বজাতিষু।। —বাক্যপদীয় ১। ১২৬,১২৭; ভেদোদগ্রাহবিবর্তেন নন্ধাকারপরিগ্রহা। আম্নাতা সর্ববিদ্যাসু বাগেব প্রকৃতিঃ পরা।।—বাক্যপদীয় (১।১১৮)-বৃত্তিধৃত বচন ; বৈখর্যা মধ্যমায়াশ্চ পশ্যন্ত্যাশ্চৈতদদ্ভুতম্। অনেকতীর্থ ভেদায়াস্ত্রয্যা বাচঃ পরং পদম্।। —বাক্যপদীয় ১।১৪৪ ; ইয়ং স্থানকরণ প্রযত্নক্রমব্যজ্যমান গকারাদিবর্ণসমুদায়াত্মিকা যা বাক্ সা বৈখরী। যা পুনরন্তঃ সংকল্প্যমানক্রমবতী শ্রোত্রগ্রাহ্যবর্ণরূপাঽভিব্যক্তি-রহিতা বাক্ সা মধ্যমা। যা তু গ্রাহ্যভেদক্রমাদিরহিতা স্বপ্রকাশসংবিদ্রূপা বাক্ সা পশ্যন্তী।—ন্যায়মঞ্জরী ; পরা বাক মূলচক্রস্থা পশ্যন্তী নাভিসংস্থিতা। হৃদিস্থা মধ্যমা জ্ঞেয়া বৈখরী কণ্ঠদেশগা।। বৈখরী শব্দনিস্পত্তির্মধ্যমা শ্রুতিগোচরা। আন্তরার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা বাগনপায়িনী।। বৈখরী শব্দনিস্পত্তিধ্বনিরূপা চ মধ্যমা। পশ্যন্তী জ্ঞানরূপা চ বাগ্‌বিশুদ্ধা পরা স্মৃতা।।—তন্ত্রশাস্ত্র। বাক্যপদীয়ে পরা বাক্ নাই। শৈবতন্ত্রে পরা বাক্-এর বহুল চর্চা। বৈয়াকরণ নাগেশ ভট্ট পরা বাক্ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বাক্যপদীয়ের (১।১৪৪) বৃত্তিতে উদ্ধৃত 'স্বরূপজ্যোতিরেবান্তঃ সূক্ষ্মাবাগনপায়িনী'র সূক্ষ্ম-স্থলে 'পরা' ব্যবহার (মঞ্জুষা) করিয়াছেন। পরা স্বীকার করিলে 'ত্রয়ী বাক্' বলা চলে না এবং 'মধ্যমা' নামের প্রয়োগও অসিদ্ধ হয়। বাকের চারিটি ভেদ থাকিলে তাহাদের একটিকে মধ্যমা বলা যায় না। বাকের ত্রিত্বের পক্ষে 'মধ্যমা' শব্দের বিশেষ উপযোগিতা। নিরুক্তে (১০।৪৬।২) 'বাগেষা মাধ্যমিকা' প্রয়োগ লক্ষণীয়। শঙ্করাচার্য প্রপঞ্চসারে পরা প্রভৃতি চারি বিভাগই স্বীকার করিয়াছেন। শারদাতিলক তন্ত্রে (১। ৯) ঃ '. . . পরা ততঃ। পশ্যন্তী মধ্যমা বাচি বৈখরী শব্দজন্মভূঃ।।' সায়ণাচার্য ঃ '...মান্ত্রিকাঃ প্রকারান্তরেণ প্রতিপাদয়ন্তি পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীতি চত্বারীতি' (ঋক ২।৩।২২।৪৫ভাষ্য)।

বাকোবাক্য— বাকোবাক্যানি তু প্রশ্নোত্তররূপাণীতি শঙ্করাচার্যঃ। উহাপোহাদিতর্ক-প্রতিপাদক মীমাংসাশাস্ত্রমূলান্যেবেত্যপি কেচিৎ। —নিরুক্তালোচন (২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৯৫)।

বাক্য— পদসমূহো বাক্যমর্থপরিসমাপ্তৌ—কৌটিল্য (অর্থশাস্ত্র ২।১০) ;

তিঙ্‌সুবন্তচয়ো বাক্যং ক্রিয়া বা কারকান্বিতা—অমর ১।৬।২ ; বাক্যং সবিশেষণমাখ্যাতম্—হেমচন্দ্র ; সমর্থপদসমূহো বাক্যম্—কাতন্ত্র-পরিশিষ্ট (১।১০২)-বৃত্তি ; আখ্যাতপ্রধানং বাক্যম্—কাতন্ত্র (চ১৪৩)-টীকা ; আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসত্তিযুক্তং পদকদম্বকম্—প্রয়োগ-রত্নমালা ৬।৭।২০ ; 'বাক্যং তদপি মন্যন্তে যৎপদং চরিতক্রিয়ম্। আখ্যাতশব্দে নিয়তং সাধনং যত্র গম্যতে। তদপ্যেকং সমাপ্তার্থং বাক্যমিত্যভিধীয়তে।।' বাক্যংস্যাদ্‌যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ। বাক্যোচ্চয়ো মহাবাক্যমিত্থং বাক্যংদ্বিধামতম্।। —সাহিত্য-দর্পণ ২।১ (২।৩?)।।

বাক্যশেষ— যেনার্থঃ পরিসমাপ্যতে পদেনাধ্যাহার্যেণ স বাক্যশেষঃ—উদ্দ্যোত-চ্ছায়াটীকা।

বাক্যার্থ— সম্বন্ধে সতি যত্ত্বন্যদাধিক্যমুপজায়তে। বাক্যার্থমেব তৎপ্রাহুরনেক-পদ সংশ্রয়ম্।।—বাক্যপদীয় ২।৪২

বাগ্‌দেবী— ধ্বনির্বর্ণঃ পদং বাক্যমিত্যস্পদচতুষ্টয়ম্। যস্যাঃ সূক্ষ্মাদিভেদেন বাগ্‌দেবীং তামুপাস্মহে।।

বাগ্‌বজ্র— মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।।
—পাণিনীয় শিক্ষা ৫২

'মন্ত্রোহীনঃ' স্থলে মহাভাষ্যে পাঠান্তর 'দুষ্টঃ শব্দঃ'। স্বর- বা বর্ণ-ঘটিত উচ্চারণদোষে দুষ্ট শব্দ বা মন্ত্র যজ্ঞাদি কর্মে প্রযুক্ত হইলে তাহা যজমানের উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ, বা প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে না, পরন্তু বাগ্‌বজ্ররূপে তাহা যজমানকেই বিনষ্ট করে, যেমন স্বরের উচ্চারণদোষে, ইন্দ্রশত্রুঃ পদ, সেইরূপই করিয়াছিল। ঘটনাটি এই ঃ দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপকে নিহত করিলে তাহার পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রের নিধন-কামনায় এক আভিচারিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, তাহাতে 'ইন্দ্রশত্রুর্বর্ধস্ব' মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দানের সময়, ভ্রান্তি-বশতঃ ইন্দ্রশত্রুঃ পদটি, 'ইন্দ্রের শত্রু' অর্থে (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে) অন্ত্যোদাত্ত উচ্চারণ না করিয়া, 'ইন্দ্র শত্রু যাহার' অর্থে (বহুব্রীহিসমাসে) আদ্যোদাত্ত উচ্চারণ করেন, ফলে যজ্ঞোদ্ভূত বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে নিহত না করিয়া, নিজেই ইন্দ্র-কর্তৃক বজ্রদ্বারা নিহত হন। এখানে যজমান ত্বষ্টার অভীষ্ট পূরণ না হইয়া তদ্‌বিপরীত ফল হওয়ায়, ইহা তাঁহার পক্ষেও মৃত্যুতুল্যই হইয়াছিল। এইরূপ ভ্রান্তিঘটিত 'বাগ্‌বজ্র' হইতে রক্ষা এবং কাম্যফল পাইতে হইলে যে ব্যাকরণ-অধ্যয়ন প্রয়োজন তাহা প্রমাণ করিতে মহাভাষ্যের প্রারম্ভিক পস্‌পশাহ্নিকে 'দুষ্টঃ শব্দঃ

স্বরতো বর্ণতো বা ...' ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, ব্যাকরণ-অধ্যয়নের ১৮টি প্রয়োজনের অন্যতমরূপে।

বাগ্‌যোগবিৎ— যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে শব্দান্ যথাবদ্ ব্যবহারকালে। সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ।। —কাত্যায়ন (মহাভাষ্যধৃত বচন) ;
সর্বেশ্বরঃ সর্বশক্তির্মহান্ শব্দবৃষভঃ। তস্মিন্ খলু বাগ্‌যোগবিদো বিচ্ছিন্নাহংকারগ্রন্থীন্ অত্যন্তবিনির্ভাগেন সংসৃজ্যন্তে। —বাক্যপদীয় (১।১২২)-বৃত্তি ;
বাচো যোগঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগেনার্থবিশেষপরত্বং তদ্বেত্তীতি বাগ্‌যোগবিৎ। —মহাভাষ্য প্রদীপোদ্দ্যোত

বাঙ্‌ময়— তদেতদ্ বাঙ্‌ময়ং ভূয়ঃ সংস্কৃতং প্রাকৃতং তথা। অপভ্রংশশ্চ মিশ্রংচেত্যাহুরাপ্তাশ্চতুর্বিধম্।। —কাব্যাদর্শ ১।৩২

বাচক— সাক্ষাৎসঙ্কেতিতং যোঽর্থমভিধত্তে স বাচকঃ
—কাব্যপ্রকাশ২।৯।২

বাচ্য— কর্তৃবাচ্য-প্রয়োগে তু প্রথমা কর্তৃকারকে। দ্বিতীয়ান্তং ভবেৎ কর্ম কর্ত্রধীনং ক্রিয়াপদম্।।
কর্মবাচ্যপ্রয়োগে তু তৃতীয়া কর্তৃকারকে। প্রথমান্তং ভবেৎ কর্ম কর্মাধীনং ক্রিয়াপদম্।।
ভাববাচ্যে কর্মাভাবস্তৃতীয়া কর্তৃকারকে। প্রথমপুরুষস্যৈকবচনং স্যাৎ ক্রিয়াপদে।।
ক্রিয়মাণন্তু যৎকর্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি। সুকরৈঃ স্বৈগুণৈঃ কর্তুঃ কর্মকর্তেতি তদ্বিদুঃ।।

বাদার্থ— যঃ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধং কঞ্চিদেকমর্থমুপাদায় তদ্বিচারপরো গ্রন্থঃ প্রবর্ততে স বাদার্থপদাভিধেয়ঃ। —বাদরত্নাকর

বার্ত্তিক— বৃত্তৌ সাধু বার্ত্তিকম্—কৈয়ট ; বাক্যশব্দেন বার্ত্তিকম্—লঘুশব্দরত্ন ; উক্তানুক্ত দুরুক্তার্থব্যক্তিকারি তু বার্ত্তিকম্।
—অভিধান চিন্তামণি ২।১৭০ ;
উক্তানুক্ত দুরুক্তানাং চিন্তা যত্র প্রবর্ততে। তং গ্রন্থং বার্ত্তিকং প্রাহ-র্বার্ত্তিকজ্ঞা মনীষিণঃ।। —পরাশরোপপুরাণ

বাহুলক— দ্রঃ বহুল।

বিকল্প— অনেনবানেন বেতি বিকল্পঃ। —কৌটিল্য ; ইদংবেদং বেতি বিকল্পঃ। —উদ্দ্যোতচ্ছায়াটীকা

বিকৃতিপাঠ— জটা মালা শিখা রেখা ধ্বজো দণ্ডো রথো ঘনঃ।
অষ্টৌ বিকৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ ক্রমপূর্বা মনীষিভিঃ।।-বিকৃতবল্লী ৫

বিগ্রহ— 'বৃত্ত্যর্থাববোধকং বাক্যং বিগ্রহঃ।' 'বিশেষেণ গৃহ্যতে জ্ঞায়তে বৃত্ত্যর্থোঽনেনেতি বিগ্রহঃ।' বিগ্রহবাক্যং ব্যাসবাক্যং সমাসবাক্যমিতি চ কথ্যতে।

বিদ্যা— বিদন্তি অনয়া বিদ্যা—সিদ্ধান্তকৌমুদী ৩।৩।৯৯ ; দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চেতি—মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।৪ ; দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে তু শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ। শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।।—ব্রহ্মবিন্দূপনিষদ্ ১৭ ; 'বিদ্যাধনং মনুষ্যাণাং মৃতান্ তাননুগচ্ছতি।' সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে—বিষ্ণুপু. ১।১৯।৪১; অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসান্যায়বিস্তরঃ। পুরাণং ধর্মশাস্ত্রং চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দশ।। আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থং চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ।। —বিষ্ণুপু. ৩।৬। ২৮,২৯ ;
চতুর্ভিশ্চ প্রকারৈর্বিদ্যোপযুক্তা ভবত্যাগমকালেন স্বাধ্যায়কালেন প্রবচনকালেন ব্যবহারকালেনেতি।—মহাভাষ্য(পস্পশা); আগমকা-লোগ্রহণকালঃ। স্বাধ্যায়কালোঽভ্যাসকালঃ। প্রবচনকালোঽধ্যাপনকালঃ। ব্যবহারো যাজ্ঞে কর্মণি। —কৈয়ট (ঐ মহাভাষ্য প্রদীপ)।

বিধি— অপ্রাপ্তপ্রাপকো বিধিঃ।—বোপদেব; বিধানং বিধিঃ। ক্বচিদ্ বর্ণোৎপা-দকরূপঃ ক্বচিদভাবরূপশ্চ। আদেশাদৌ চ বিধিভেদৌ। নিষেধো লোপশ্চাভাবরূপঃ। —পদ্মনাভ; বহবো বিষয়া যস্য স সামান্য বিধির্ভবেৎ। অল্পঃ স্যাদ্ বিষয়ো যস্য স বিশেষবিধির্মতঃ।। —বোপদেব ; তথা সামান্যকার্যেভ্যো বিশেষকবিধির্বলী।—ঐ

বিধেয়— 'বিধীয়তে যৎ তদ্‌বিধেয়ম্'। দ্রঃ উদ্দেশ্য।

বিন্দু— মো বিন্দুরবসানে বা —প্রাচীনাঃ; বিন্দুমাত্র ইতি স চার্ধচন্দ্রাকৃতিঃ। তিলকাকৃতিশ্চেতি বররুচিঃ। ওঁকারাদৌ অর্ধচন্দ্রাকৃতিঃ। পয়াং-সীত্যাদৌ তিলকাকৃতিরিতি। —কলাপচন্দ্র ১।১।১৯; স চ বিন্দুঃ শিবশক্ত্যুভয়াত্মকঃ, ক্ষোভ্যক্ষোভকসম্বন্ধরূপশ্চেতি ত্রিবিধঃ। শিবাত্মতয়া বিন্দুসংজ্ঞঃ, শক্ত্যাত্মতয়া বীজসংজ্ঞঃ, সম্বন্ধরূপেণ নাদসংজ্ঞঃ। —ধ্যানবিন্দূপনিষদ্দীপিকা

বিপ্রতিষেধ— বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্—পা. ১।৪।২ ; বিপ্রতিপূর্বাৎ সিধেঃ কর্মব্যতীহারে ঘঞ্। অন্যোন্য প্রতিষেধো বিপ্রতিষেধঃ।—হৃদয়হা-রিণী ১।২।১১৯ ; দ্বৌপ্রসঙ্গৌ যদান্যার্থৌ ভবত একস্মিংশ্চ যুগপৎ প্রাপ্নুতঃ স বিপ্রতিষেধঃ। —কাত্যায়নবার্ত্তিক ১–১।৪।২; তুল্যবল-বিরোধো বিপ্রতিষেধঃ। যত্র দ্বৌ প্রসঙ্গাবন্যার্থাবেকস্মিন্ যুগপৎ প্রাপ্নুতঃ স তুল্যবলবিরোধো বিপ্রতিষেধঃ। তস্মিন্ বিপ্রতিষেধে পরং কার্যং ভবতি। —কাশিকাবৃত্তি ১।৪।২

বিভক্তি— অর্থস্য বিভজনাদ্ বিভক্ত্যা ইতি—কাতন্ত্রসূত্র (২।১।২)-বৃত্তি ; বিভক্তিশব্দঃ কারকশক্তিবচনঃ। বিভজ্যতে অনয়া প্রাতিপদিকার্থ ইতি—পদমঞ্জরী; 'সংখ্যাকারক বোধয়িত্রী বিভক্তিঃ।' নির্দেশঃ কর্ম করণং প্রদানমপকর্ষণম্। স্বাম্যর্থোঽথাধিকরণং বিভক্ত্যর্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।—(বেঙ্কট) মাধব (ঋগ্‌ভাষ্য), নিরুক্ত (১।১)-বৃত্তিধৃত বচন; বিভক্তিশ্চৈব ধাত্বংশস্তদ্ধিতং কৃদিতি ক্রমাৎ। চতুর্ধা প্রত্যয়াঃ প্রোক্তাঃ কাদিভিঃ পঞ্চধাঽথবা।। সা বিভক্তির্দ্বিধা প্রোক্তা সুপ্তিঙ্‌চেতি বিভেদতঃ।—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ৬০, ৬১

বিভাষা— বিকল্প। 'ন বেতি বিভাষা'—পা. ১।১।৪৪

বিশেষণ— 'বিশিষ্যতে যেন তদ্বিশেষণম্।' 'শাব্দবোধে প্রাক্‌প্রতীয়মানত্বং বিশেষণত্বম্।' 'ক্রিয়াবিশেষাণামেকত্বং কর্মত্বং নপুংসকত্বং চ।'

বিশেষ্য— 'বিশিষ্যতে যৎ তদ্বিশেষ্যম্।' 'শাব্দবোধে চরমপ্রতীয়মানত্বং বিশেষ্যত্বম্।'

বিসর্গ বা বিসর্জনীয়— বিসৃজ্যতে বিরম্যতে ঘঞি বিসর্গঃ—হৈমলঘুন্যাস ১।১।৯ ; বিসর্গো বিসর্জনীয়ঃ বিসৃষ্টোঽভিনিষ্টানশ্চ—হরিনামামৃত (১।১৬)-বৃত্তি ; ঊর্ধ্বাধঃস্থং বিন্দুযুগ্মং বিসর্গ ইতি গীয়তে—প্রয়োগরত্নমালা ১।২৯

বীপ্সা— 'ব্যাপ্তুমিচ্ছা বীপ্সা সুপ্‌সু। নানাবাচিনামধিকরণানাং ক্রিয়াগুণাভ্যাং যুগপৎ প্রযোক্তুর্ব্যাপ্তুমিচ্ছা বীপ্সা, সা চ সুপ্‌সু।'

বৃত্তি— 'বিবরণং বৃত্তিঃ।' সূত্রার্থপ্রধানো গ্রন্থো বৃত্তিঃ—হরদত্ত মিশ্র; পরার্থাভিধানং বৃত্তিঃ—মহাভাষ্য ; বর্ততেঽর্থাবগমোঽত্রেতি বৃত্তিঃ—অভিধানচি. (২।১৭১)-টীকায় হেমচন্দ্র; ঐকার্থ্যং পৃথগর্থানাং বৃত্তিং যুক্তার্থতাং বিদুঃ। শব্দানাং শক্তিবৈচিত্র্যাৎ তৎসমাসাদিষু স্মৃতম্।।—কাতন্ত্রপরিশিষ্ট; 'পাণিন্যাদিভিরাচার্যৈঃ শব্দশাস্ত্রপ্রবক্তৃভিঃ। ভণিতা বৃত্তয়ো যা হি বিশিষ্টৈকার্থবোধিকাঃ।। সমাসা একশেষাশ্চ তদ্ধিতাশ্চ কৃতস্তথা। সনাদ্যন্তা ধাতবশ্চ বৃত্তয়ঃ পঞ্চধা মতাঃ।।' অভ্যাসার্থে দ্রুতাং বৃত্তিং প্রয়োগার্থে তু মধ্যমাম্। শিষ্যাণামুপদেশার্থে কুর্যাদ্বৃত্তিং বিলম্বিতাম্।।—ঋক্ প্রাতিশাখ্য ১৩।১৯

বৃদ্ধ— 'বৃদ্ধির্যস্যাচামাদিস্তদবৃদ্ধম্। ত্যদাদীনি চ'—পা. ১।১।৭৩, ৭৪
[যাহার ১ম স্বর বৃদ্ধিসংজ্ঞক এবং ত্যদপ্রভৃতি অব্যয়]

বৃদ্ধি— 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' (পা. ১।১।১) [আ, ঐ, ঔ]

বেদ— 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্'—আপস্তম্ব ;
'বিদন্ত্যনেন ধর্মমিতি বেদঃ।'—পদচন্দ্রিকা ;
'বেদয়তি ধর্মং ব্রহ্ম চ বেদঃ।'
'মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশির্বেদঃ।'—সায়ণাচার্য ;

'প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।।'
'একবিংশতি শাখাবান্ ঋগ্‌বেদঃ পরিগীয়তে। শতমেকা চ শাখাঃ স্যুর্যজুষামেকবর্ত্মনাম্। সাম্নাং শাখাঃ সহস্রং স্যুঃ পঞ্চশাখা অথর্বণাম্।।'—অহির্বুধ্ন্যসংহিতা ১২।৮,৯ ; '...নবধা আথর্বণো বেদঃ...'—মহাভাষ্য
সংহিতা মন্ত্র-সংকলন গ্রন্থ। ঋগ্‌বেদসংহিতা, সামবেদসংহিতা, যজুর্বেদসংহিতা এবং অথর্ববেদসংহিতা। মন্ত্রাতিরিক্ত বেদভাগের নাম ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মশব্দের এক অর্থ যজ্ঞ। যজ্ঞের প্রতিপাদক বলিয়া ইহার নাম ব্রাহ্মণ। গৃহস্থের যজ্ঞবিবরণ ব্রাহ্মণে এবং বানপ্রস্থাশ্রমীদের যজ্ঞবিবরণ আরণ্যকে বর্ণিত। অরণ্যে ঋষিদের গম্ভীর চিন্তাপূর্ণ বিদ্যাপাঠ আরণ্যক। ব্রহ্মসমীপে পৌঁছানোর জ্ঞান উপনিষদ্। ইহার নামান্তর ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদান্ত বা পরাবিদ্যা। ব্রাহ্মণসমূহের শেষাংশ আরণ্যক, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের সংযোগস্বরূপ। উপনিষদ্‌গুলি আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত। কর্মকাণ্ড = সংহিতা বা মন্ত্রাংশ + ব্রাহ্মণ, জ্ঞানকাণ্ড = আরণ্যকের কতকাংশ + উপনিষদ্। প্রতিবেদেরই ব্রাহ্মণ আছে, সমস্ত বেদের আরণ্যক নাই, যেমন অথর্ববেদের। যজুঃ শব্দের অর্থ পূজা। আর এক অর্থ যজ্ঞ। 'যজ্ঞো বৈ শ্রেষ্ঠতমং কর্ম' (–শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৭।১।৫)। সাম শব্দের অর্থ প্রিয় বা প্রীতিকর বচন। অঙ্গিরো বংশীয় অথর্বা ঋষির দ্বারা আবিষ্কৃত বলিয়া অথর্ববেদ নাম। ইহার নামান্তর, ব্রহ্মবেদ। ঋগ্‌বেদসংহিতাই সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের ভিত্তি। বৈদিক যুগের পর সূত্রযুগ। ষড়্দর্শন সূত্রাত্মক রচনা।
পাদবদ্ধ, ছন্দোবদ্ধ এক পূর্ণ অর্থের প্রকাশক বেদমন্ত্রই ঋক্। একাধিক ঋক লইয়া এক একটি সূক্ত। কতকগুলি সূক্ত লইয়া একটি মণ্ডল। ঋগ্‌বেদে মোট ১০ মণ্ডল, ১০২৮ সূক্ত, ১০৫৫২ ঋক্। অন্যরূপ বিভাগ অনুসারে এই বেদে মোট ৮ অষ্টক, প্রতি অষ্টকে ৮ অধ্যায়, প্রতি অধ্যায়ে কতকগুলি বর্গ, প্রতি বর্গে প্রায় ৫টি করিয়া ঋক্। মোট ২০২৪ বর্গ এবং ৩৯৭২৬৫ অক্ষর লইয়া বর্তমান ঋগ্‌বেদ। পূর্বোক্ত ১০ মণ্ডল আবার ৮৫টি অনুবাকে বিভক্ত।
একই সংহিতা বিভিন্ন গোষ্ঠীগত অধ্যয়নভেদে এবং ব্যাখ্যাতৃসম্প্রদায়ভেদেও যেসব অল্প-বিস্তর পৃথক্ সংস্করণে পরিণত হয়, তাহা হইতেই বিবিধ শাখার উৎপত্তি। বর্তমানে ঋগবেদের কেবল শাকল শাখার গ্রন্থই পাওয়া যায়। এই বেদের আরও যে চারিটি

শাখা ছিল তাহাদের নাম বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাঙ্খায়ন ও মাণ্ডূক্য।

সুরসহযোগে গেয় মন্ত্রগুলিকে বলে সাম (সামন)। সামবেদের এক সহস্র শাখার মধ্যে বর্তমানে কেবল তিনটি শাখা পাওয়া যায়—কৌথুম, রাণায়ণীয় এবং জৈমিনীয় বা তবলকার। কৌথুম শাখায় মোট ১৮১০টি ঋক্ সঙ্কলিত আছে। পুনরুক্তবাদে এই ঋক্-সংখ্যা ১৫৪৯। ইহাদের ৭৫টি বাদে অন্যগুলি ঋগ্‌বেদের শাকল শাখার। পূর্ব আর্চিক, মহানাম্নী আর্চিক এবং উত্তরার্চিক—এই তিন ভাগে বিভক্ত সামবেদ। ইহাদের ২য়টিকে ১মটির মধ্যে গণনা করা হয়। প্রথম ভাগে ৫৮৫টি ঋক্ এবং ২য় ভাগে ৪০০ স্তোত্রের মধ্যে ২৮৭টিতে ৩টি করিয়া ঋক্।

যজুর্বেদের দুই ভাগ—শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ। প্রথমটিকে বাজসনেয়ী সংহিতাও বলা হয়। ইহার প্রধান দুই শাখা—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন। কৃষ্ণ যজুর্বেদের চারি শাখা—কঠসংহিতা, কপিষ্ঠল-কঠ সংহিতা, মৈত্রায়ণী সংহিতা ও তৈত্তিরীয় সংহিতা। সমগ্র যজুর্বেদে মোট ১০১টি শাখা ছিল বলিয়া শুনা যায়। যজুর্বেদের মূল বিষয় যাগযজ্ঞ। শুক্লযজুর্বেদ বিশুদ্ধ যজ্ঞমন্ত্রের সঙ্কলন, কৃষ্ণযজুর্বেদে যজ্ঞ-মন্ত্র ছাড়াও যজ্ঞানুষ্ঠান ও তাহার কিছুটা ব্যাখ্যাজাতীয় আলোচনা পাওয়া যায়। মন্ত্রগুলির কিছু ছন্দোবদ্ধ, কিছু গদ্যাত্মক। ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রগুলি প্রায়শঃ ঋগ্‌বেদ হইতে গৃহীত। গদ্যাংশেই যজুর্বেদের বৈশিষ্ট্য। এই গদ্যমন্ত্রগুলির নামই 'যজুঃ' এবং এই থেকেই যজুর্বেদ। মীমাংসকদের মতে ঋক্, যজুঃ ও সাম যথাক্রমে পদ, গদ্য ও গীতি। যে চারি জন প্রধান ঋত্বিক্ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন তাঁহাদের মধ্যে (১) উদ্‌গাতা সামগান করিতেন, (২) হোতা ঋগ্‌মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, (৩) অধ্বর্যু যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক দিক্ সম্পাদন করিতেন এবং (৪) ব্রহ্মা সাধারণভাবে সমস্ত যজ্ঞকার্য পরিচালনা ও পরিদর্শন করিতেন। অধ্বর্যুকে প্রাসঙ্গিক যজুর্মন্ত্র পাঠ করিতে হইত।

অথর্বন্ ও অঙ্গিরস্‌দের বেদই অথর্ববেদ। ইহার একদা-প্রচলিত নানা শাখার মধ্যে কেবল পৈপ্পলাদ ও শৌনক শাখাই বর্তমানে পাওয়া যায়। শৌনক শাখায় মোট ৫৯৭৭টি মন্ত্র। এদের অধিকাংশই ছন্দোবদ্ধ বা ঋক্। এইগুলি ঋগ্‌বেদের মতোই সূক্তাকারে গ্রথিত। সূক্তসংখ্যা মোট ৭৩১। ২০কাণ্ডে বিভক্ত অথর্ববেদ। ইহার প্রায় এক সপ্তমাংশ ঋগ্‌বেদের মন্ত্র এবং ১৫শ ও ১৬শ কাণ্ডের প্রধান অংশ গদ্যে রচিত। মারণ, উচ্চাটন,

তুক্‌তাক্ ইত্যাদি 'যাদু'—অথর্ববেদের মুখ্য বিষয়। আয়ুঃ, স্বাস্থ্য প্রভৃতির কামনা সফল করাও, এই বেদের কিছু মন্ত্রের উদ্দেশ্য। যজ্ঞ সংক্রান্ত বিবিধ বিচার ও ব্যাখ্যার সূচনা হইতেই পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের জন্ম। উপনিষদের প্রধান বিষয় দার্শনিক জ্ঞান। এই দুই-এর মধ্যবর্তী আরণ্যকে, কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই উপদেশ আছে।

বৈদিক যুগে লিখিবার রীতি ছিল না। কানে শুনিয়া পুরুষানুক্রমে মুখস্থ করিয়া বৈদিক মন্ত্রগুলিকে সুদীর্ঘকাল রক্ষা করা হইতেছিল বলিয়া বেদের নামান্তর শ্রুতি। সম্ভাব্য বিকৃতি হইতে বেদকে রক্ষা করিতে, ইহার যে পাঠঘটিত কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা হইতেছে পদপাঠ, ক্রমপাঠ, জটাপাঠ ইত্যাদি। পদপাঠে মূল সংহিতাকে বিভিন্ন পদে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক পদের সন্ধি, সমাস প্রভৃতি, বিশ্লিষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট স্বরযোগে মুখস্থ করিবার ব্যবস্থা। ক্রমপাঠে প্রথম পদটি ব্যতীত অপর প্রত্যেক পদের পুনরুক্তি করা হইত। জটাপাঠে দুইটি করিয়া পদ প্রথমে যথাক্রমে, পরে বিপরীতক্রমে, তাহার পর আবার যথাক্রমে মুখস্থ করিবার ব্যবস্থা ছিল। সামবেদের ক্রমপাঠ নাই, অথর্ববেদের পদপাঠাদি কোনো পাঠেরই ব্যবস্থা নাই। এই সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে ঃ

> 'ঋগ্‌বেদস্তু ঘনান্তঃস্যাদ্ যজুর্বেদো জটান্তকঃ।
> সামবেদঃ পদান্তঃ স্যাৎ সংহিতান্তস্ত্বথর্বণঃ।'

অর্থাৎ ঋগবেদের সংহিতা, পদ, ক্রম, জটা, মালা, শিখা, রেখা, ধ্বজ, দণ্ড, রথ ও ঘনপাঠের ব্যবস্থা, যজুর্বেদের সংহিতা, পদ, ক্রম ও জটাপাঠের এবং সামবেদের সংহিতা ও পদপাঠের ব্যবস্থা আছে ; অথর্ববেদের কেবল সংহিতাপাঠই আছে, অন্য পাঠ নাই। এই সব পাঠের মধ্যে সংহিতা, পদ ও ক্রম—এই তিন পাঠকে বলা হয় প্রকৃতি-পাঠ এবং জটাদি অষ্টপাঠকে বিকৃতিপাঠ বলা হয়।

বেদপাঠে স্বরের গুরুত্ব খুব। স্বরভেদে অর্থভেদ হয়। ব্রহ্মন্ শব্দের প্রথম অক্ষর উদাত্ত হইলে অর্থ হইবে মন্ত্র, দ্বিতীয় অক্ষর উদাত্ত হইলে অর্থ দাঁড়াইবে যিনি মন্ত্রপাঠ করেন। ধ্বনির মাত্রানুসারে বৈদিক স্বর প্রধানতঃ তিন রকম—উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত। উদাত্তের তীব্রতা বা উচ্চতা সর্বাধিক, অনুদাত্তের সর্বনিম্ন, স্বরিতের মাঝামাঝি। উদাত্তের পূর্ববর্তী স্বর অনুদাত্ত, পরবর্তী স্বর স্বরিত। অক্ষরের নীচে শয়ান দাঁড়ি '—' অনুদাত্তের

চিহ্ন। অক্ষরের মাথায় লম্বা-লম্বি দাঁড়ি '।' স্বরিতের চিহ্ন। উদাত্তের জন্য কোনো চিহ্ন নাই। তবে চিহ্ন না থাকিলেই কিন্তু সর্বত্র উদাত্ত বুঝায় না। স্বরিতের পরবর্তী অনুদাত্তগুলি উদাত্তের ন্যায় চিহ্নবিহীন থাকে। ইহাদিগকে 'প্রচয়' স্বর বলে। নঃ, বঃ, মে, তে, চ প্রভৃতি পদ এবং মূল বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়া ও সম্বোধন-পদ, পাদের মধ্যে বা শেষে থাকিলে সর্বদা অনুদাত্ত।

বেদন— 'শব্দার্থজ্ঞানং বেদনম্'—বালমনোরমা ৪।২।৫৯

বৈখরী— 'স্থানেষু বিবৃতে বায়ৌ কৃতবর্ণপরিগ্রহা। বৈখরী বাক প্রযোক্তৃণাং প্রাণবৃত্তিনিবন্ধনা।।'—বাক্যপদীয় (১।১৩৪) বৃত্তি-ধৃত

বৈদ্য— 'বিদ্যামধীতে বেদ বা'।

বৈয়াকরণ— 'সর্বার্থানাং ব্যাকরণাদ্ বৈয়াকরণ উচ্যতে।
তন্মূলতো ব্যাকরণং ব্যাকরোতীতি তত্তথা।।'
—মহাভারত ৫।৪৩।৬১ ;

'ব্যাকরণে ভবো যোগো বৈয়াকরণ ইতি'—মহাভাষ্য ;
'ব্যাকরণং বেত্ত্যধীতে বৈয়াকরণঃ'—দুর্গসিংহ ; 'শব্দপ্রমাণকা হি বৈয়াকরণাঃ'—ঐ ;
'প্রথমে হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণা ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ববিদ্যানাম্'—আনন্দবর্ধন ;
'ধাতুসূত্রগণোণাদি বাক্যলিঙ্গানুশাসনম্।
বর্ততে যস্য জিহ্বাগ্রে স বৈয়াকরণাগ্রণীঃ।।'—প্রাচীনাঃ ;
'যেনেদং ব্যাকৃতং সর্বং স বৈয়াকরণঃ পরঃ'—গুরুপদ হালদার (বৃদ্ধত্রয়ী)

ব্যক্তি— 'ব্যক্তির্গুণবিশেষাশ্রয়া মূর্তিঃ'—ন্যায়দর্শন ১।১।৬৬ ;
'অর্থক্রিয়াকারিতয়া ভিন্না এব হি ব্যক্তয়ঃ।
তা এব ব্যক্তরন্ত্যক্তভেদা জাতিরুদাহৃতা।।'

ব্যঞ্জন— 'হ্রস্বার্ধকালং ব্যঞ্জনম্'—তৈ. প্রাতিশাখ্য ১।৩৭ ; 'ব্যঞ্জনং চার্ধমাত্রকম্'—শ্রুতবোধ ৩ ; 'ব্যঞ্জনং পরগামি স্যাৎ'—প্রয়োগরত্নমালা ১।৩৮ ; 'ব্যজ্যন্তে এভিরিতি ব্যঞ্জনানি স্বরাণামর্থপ্রতিপাদনে উপকারকাণি'—কাতন্ত্র (১।১।৯)-পঞ্জী

ব্যাকরণ— 'ব্যাক্রিয়ন্তে শব্দা অনেনেতি ব্যাকরণম্—মহাভাষ্য ;
'ব্যাকরণং নামেয়মুত্তরা বিদ্যা'—মহাভাষ্য ;
'প্রধানং ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্'—মহাভাষ্য ;
'শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্'—পাণিনীয় শিক্ষা;
'পদসময়জ্ঞানার্থং ব্যাকরণম্'—বাৎস্যায়ন (ন্যায়ভাষ্য) ;

'বিবিধপ্রকারেণাক্রিয়াতেঽনেনেতি ব্যাকরণম্'—দুর্গগুপ্তসিংহ (চ. ৫১২ টীকা) ;
'প্রকৃতিপ্রত্যয়োপাধিনিপাতাদিবিভাগশঃ।
পদান্বাখ্যানকরণং শাস্ত্রং ব্যাকরণং বিদুঃ।।'—হেমচন্দ্রধৃত বচন ;
'ধাতুসূত্রগণোণাদিবাক্যাত্মকং পঞ্চস্থানং ব্যাকরণম্'—পদমঞ্জরী ৬।৩।৭ ;
'শিষ্টপ্রয়োগানুসারি ব্যাকরণম্'। 'যুগে যুগে ব্যাকরণান্তরমিতি বা'—দুর্গসিংহ (স ৬৮ টীকা) ;
'ব্যাকরণমর্থবিশেষমাশ্রিত্য পদমন্বাচক্ষাণাং পদপদার্থপ্রতিপাদনেন বেদস্যোপকারকং বিদ্যাস্থানম্'—আপস্তম্বধর্মসূত্র(২।৮।১০) টীকা ;
'শাস্ত্রান্তরপরিজ্ঞানে চক্ষুর্ব্যাকরণং পরম্'—অন্তর্ব্যাকরণনাট্যপরিশিষ্ট ১২ ;
'অর্থপ্রবৃত্তিতত্ত্বানাং শব্দা এব নিবন্ধনম্।
তত্ত্বাববোধঃ শব্দানাং নাস্তি ব্যাকরণাদৃতে।।'—বাক্যপদীয় ১।১৩ ;
'পরমেশ্বরস্যেব ত্রিবৃৎকুর্বতঃ কর্ম নামরূপয়োর্ব্যাকরণম্'—শঙ্কর (বেদান্তসূত্রভাষ্য ২।৪।২০) ;
'তদ্ব্যাকরণমাগম্য পরং ব্রহ্মাধিগম্যতে'—বাক্যপদীয় ১।২২ ;
'আপঃ পবিত্রং পরমং পৃথিব্যা অদ্ভ্যঃ পবিত্রং পরমং হি মন্ত্রাঃ।
তেষাং চ সামর্গ্যজুষাং পবিত্রং মহর্ষয়ো ব্যাকরণং নিরাহুঃ।।'
—স্কন্দপুরাণ

ব্যাখ্যা— 'বিবিচ্য আখ্যা ব্যাখ্যা'—দুর্গাচার্য ;
'অবয়বশঃ আখ্যা ব্যাখ্যা'—
'উদাহৃতিঃ পদকৃতিঃ পদার্থানাং বিবেচনম্।
তন্ত্রাণাং ত্রিবিধা ব্যাখ্যা শিশূনাং শীঘ্রবোধিনী।।'—প্রয়োগরত্নমালা ;
'উপোদ্ঘাতঃ পদংচৈব পদার্থঃ পদবিগ্রহঃ।
চালনা প্রত্যবস্থা চ ব্যাখ্যা তন্ত্রস্য ষড়্বিধা।।'

ব্যাখ্যাধর্ম— 'অতিরিক্তং পদং ত্যাজ্যং হীনং বাক্যে নিবেশয়েৎ।
বিপ্রকৃষ্টং তু সংদধ্যাদ্ আনুপূর্ব্যং চ কল্পয়েৎ।।
লিঙ্গং ধাতুং বিভক্তিঞ্চ যোজয়েচ্চানুলোমতঃ।
যদ্ যৎ স্যাচ্ছান্দসং বাক্যে কুর্যাৎ তত্তৎ তু লৌকিকম্।।—
বৃহদ্দেবতা ২।১০০, ১০১

ব্যাখ্যান— 'উদাহরণং প্রত্যুদাহরণং বাক্যাধ্যাহার ইত্যেতৎ সমুদিতং ব্যাখ্যানং ভবতি।' —মহাভাষ্য ;
'পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা।
পূর্বপক্ষসমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্।।—পরাশরপুরাণ ১৮।...;

ব্যুৎপত্তি— 'ব্যুৎপত্তিঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবিভাগপরিকল্পনা।'—সা. দ. (২।৯) টীকা ;

'ছন্দোব্যাকরণ কলা লোকস্থিতি পদপদার্থবিজ্ঞানাৎ।
যুক্তাযুক্তবিবেকো ব্যুৎপত্তিরিয়ং সমাসেন।।'—রুদ্রট ১।১৮

ব্যাসবাক্য— দ্রঃ বিগ্রহ।

ব্রহ্ম— বৃন্হ্+মন্। বৃংহতি (বিস্তৃত হয়), বৃংহয়তি (বিস্তৃত করে) ইতি ব্রহ্ম। ওঙ্কার, বেদ, শব্দ, শব্দতত্ত্ব, শব্দব্রহ্মপ্রকাশ, সত্য, আত্মা, মোক্ষ। 'যদ্‌বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম তদ্ বিদ্ধি...।।' —কেনোপনিষদ্ ১।৪ ; 'অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্বমিদং জগৎ।' —বিষ্ণুপুরাণ ১।২২।৫৩ ; 'একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম'—মনু ২।৮২ ; 'ব্রহ্মেদং শব্দনির্মাণং শব্দশক্তিনিবন্ধনম্।'—বাক্যপদীয় (১।১) টীকায় উদ্ধৃত।

ব্রহ্মরাশি— 'ব্রহ্মপ্রতিপাদকো বর্ণরাশিঃ'—লঘুশব্দেন্দুশেখর ;
'সোঽয়মক্ষর সমাম্নায়ো বাক্‌সমাম্নায়ঃ পুষ্পিতঃ ফলিতশ্চন্দ্রতারকবৎ প্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যো ব্রহ্মরাশিঃ'—মহাভাষ্য ;
'এতে পঞ্চষষ্টি বর্ণা ব্রহ্মরাশিরাত্মবাচঃ'—বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য ৮। ২৫ ;
'য এতে পঞ্চষষ্টিবর্ণাস্তে সমস্তা এব ত্রয়ীলক্ষণো ব্রহ্মরাশিঃ। অতএব কদাচিদানুপূর্ব্যাব্যবস্থিতাঃ সন্ত ঋগ্‌যজুঃ সামাখ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ। লৌকিক্যা অপি বাচোঽয়মেবাত্মা।' —ঐ উবটভাষ্য।

ব্রাহ্মণ— 'মন্ত্রব্যতিরিক্তো বেদভাগো ব্রাহ্মণম্'—পদমঞ্জরী ;
'তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চ এতদ্ ব্রাহ্মণকারকম্'—মহাভাষ্যে (৫।১। ১১৫) ধৃত

ভ— 'যচিভম্', 'তসৌ মত্বর্থে' (পা. ১।৪।১৮,১৯)—সু ঔ জস্ অম্ ঔট্ ভিন্ন সুপ্-বিভক্তি, স্ত্রীপ্রত্যয়, সমাসপ্রত্যয় ও তদ্ধিতপ্রত্যয়ের য ও স্বরবর্ণ পরে থাকিলে তৎপূর্ববর্তী শব্দ এবং মত্বর্থপ্রত্যয় পরে থাকিলে তকারান্ত ও সকারান্ত শব্দ।

ভাব— 'শব্দস্যপ্রবৃত্তিনিমিত্তং ভাবশব্দেনোচ্যতে'—কাশিকা ৫।১।১১৯
'অপরিস্পন্দনসাধনসাধ্যো ধাত্বর্থো ভাবঃ'
—মহাভাষ্য প্রদীপ ৩।১। ৮৭
'ভাব্যতে যঃ স ভাব ইতি। ক্রিয়া চৈবহি ভাব্যতে'—মহাভাষ্য
'ভূসত্তায়াম্'—পা. ধাতুপাঠ ১।১

ভারতী— 'স্বরব্যঞ্জনসংস্কারা ভারতী শব্দলক্ষণা'—অনুগীতা ৪৩।২৩

ভাষা— 'ভাষা লৌকিক বাক্যে'—নানার্থার্ণবসংক্ষেপ

ভাষিতপুংস্ক— 'ভাষিতঃ পুমান্ যস্মিন্নর্থে'...। কাতন্ত্রে (চ.৯১) দৌর্গটীকা ;
'এক এব হি যঃ শব্দস্ত্রিষু লিঙ্গেষু বর্ততে।
এক এবার্থমাচষ্টে ভাষিতপুংস্কমুচ্যতে।।'—কাতন্ত্র (চ. ৯১) ;

'যদ্ বিশেষণতাং প্রাপ্য স্ত্রিয়াং পুংসি চ বর্ততে।
ভবেন্নপুংসকে বৃত্তিরুক্তপুংস্কং তদুচ্যতে।।'

ভাষ্য— 'সূত্রস্থং পদমাদায় বাক্যৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।।'—পরাশরপুরাণ ১৮।১৫;
'আক্ষেপসমাধানপরো গ্রন্থো ভাষ্যম্'—মহাভাষ্য প্রদীপ, পদমঞ্জরী ;
'ভাষ্যং সূত্রপ্রযুক্তার্থকঠিনাংশপ্রকাশকম্'—কল্পদ্রুকোশ (ব্রহ্মপ্রকাণ্ড)

ভাষ্যবিত্তম— 'উত্তানার্থা নিগূঢ়ার্থসংভৃতা ভাষ্যপঙ্‌ক্তয়ঃ।
প্রকৃত্যা যো বিজানাতি স বাচ্যো ভাষ্যবিত্তমঃ।।'

ভ্রম— 'সর্বেষামমতং যৎ স্যাৎ স ভ্রমঃ পরিকীর্তিতঃ। বহূনামমতং যত্তৎ কেষাঞ্চিন্মতমুচ্যতে।।'—কাতন্ত্রবিভ্রমটীকা

মতুবাদি— 'ভূম নিন্দা প্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতিশায়নে।
সংসর্গেঽস্তি বিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ।।
অকারান্তাদ্ মকারান্তাদ্ অবর্ণোপধমোপধাৎ।
পঞ্চমভিন্নবর্গান্তাদ্ মতুপো বতুরিষ্যতে।।'

ময়ূরব্যংসক— 'ময়ূর ইব ব্যংসকঃ ময়ূরব্যংসকঃ। ময়ূরস্যেব বিগতাবংসাবস্যেতি বা বিগ্রহঃ।'—কাতন্ত্রবৃত্তি (চ. ২৬৩)

মস্করী— 'মস্করমস্করিণৌ বেণুপরিব্রাজকয়োঃ'—পা. ৬।১।১৫৪ ;
'মাকৃত কর্মাণি মাকৃত কর্মাণি শান্তির্বঃ শ্রেয়সীত্যাহাঽতো মস্করী পরিব্রাজকঃ'—মহাভাষ্য ৬।১।১৫৪ ;
'মাকরণশীলো মস্করী পরিব্রাজকঃ'—ভাষাবৃত্তি ৬।১।১৫৪ ;
'মা কর্ম কৃষতেত্যেবং মা শব্দকরণাদসৌ।
মস্করীত্যুচ্যতে ভিক্ষুর্নতু মস্করধারণাৎ।।'—প্রক্রিয়াসর্বস্ব ৬।১।১৫৪ ;
'অয়ং মা কৃত অয়ং মা কৃতেত্যুপক্রম্য শান্তিঃ কাম্যকর্মপরিহাণি-র্যুষ্মাকং শ্রেয়সীত্যুপদেষ্টা মস্করীত্যুচ্যতে।'—ম. ভা. প্রদীপ ৬।১।১৫৪ ;

মাতৃকা— 'মাতৃকা বর্ণসংহতিঃ'— কোশকল্পতরু ১।৫।৬২

মাত্রা— মীয়তে ইতি মাত্রা। উচ্চারণকালঃ—সারস্বততত্ত্বদীপিকাটীকা ; মাত্রা বর্ণবিভূষণে। অক্ষরাবয়বে বৃত্তে মানেঽল্পে চ পরিচ্ছদে।।—বিশ্ব ; অর্ধমাত্রা তু কণ্ঠ্যা স্যাদেকারৈকারয়োর্ভবেৎ। ওকারৌকারয়োর্মাত্রা তয়োর্বিবৃত সংবৃতম্।। সংবৃতং মাত্রিকং জ্ঞেয়ং বিবৃতং তু দ্বিমাত্রিকম্। ঘোষা বা সংবৃতাঃ সর্বে অঘোষা বিবৃতাঃ স্মৃতাঃ।। স্বরাণামূষ্মণাঞ্চৈব বিবৃতং করণং স্মৃতম্। তেভ্যোঽপি বিবৃতা বেঙৌ তাভ্যামৈচৌ তথৈব চ।। —পাণিনীয় শিক্ষা ১৯-২১ ;
একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্ধমাত্রকম্।।—শ্রুতবোধ

মীমাংসা— মন্+সন্ (স্বার্থে) + স্ত্রিয়াং টাপ্। 'বেদবিচার গ্রন্থাত্মিকা মীমাংসা। সা চ দ্বিবিধা—কর্মমীমাংসা ব্রহ্মমীমাংসা চেতি। কর্মকাণ্ডবেদবিচার-গ্রন্থঃ কর্মমীমাংসা জৈমিনিপ্রণীতা, সৈব মীমাংসত্বেন প্রসিদ্ধা পূর্বমীমাংসা ইত্যুচ্যতে। ব্রহ্মকাণ্ডবেদবিচারগ্রন্থো ব্রহ্মমীমাংসা বেদব্যাসপ্রণীতা, সা চ বেদান্তত্বেন প্রসিদ্ধা উত্তরমীমাংসা ইত্যুচ্যতে।'—চন্দ্রশেখরসূরি (তত্ত্বসম্বোধিনী)।

মুনি— 'মননান্মুনিরুচ্যতে।' 'মুনিঃ সংলীনমানসঃ।'

মূর্ধাভিষিক্ত— '...যত্তদস্য যোগস্য মূর্ধাভিষিক্তমুদাহরণং তদপি সংগৃহীতং ভবতি।' —মহাভাষ্য ১।১।৫৭ ; মূর্ধাভিষিক্তমিতি সর্ববৃত্তিষু উদাহৃতত্বাৎ—কৈয়ট (ঐ মহাভাষ্যপ্রদীপ)।

ম্লেচ্ছ— 'ম্লেচ্ছ অব্যক্তেশব্দে', 'ম্লেচ্ছ অব্যক্তায়াং বাচি'—পাণিনীয়ধাতুপাঠ ; ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ। —মহাভাষ্য ১।১।১ ;
ম্লেচ্ছ অস্ফুটে অপশব্দে চ।—ভট্টোজি ; যে শব্দা ন প্রসিদ্ধাঃ স্যুরার্যাবর্তনিবাসিনাম্। তেষাং ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধোঽর্থো গ্রাহ্যো নেতি বিচিন্ত্যতে।।—শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিল ;
গোমাংসভক্ষকো যস্তু লোকবাহ্যং চ ভাষতে। সর্বাচারবিহীনোঽসৌ ম্লেচ্ছ-ইত্যভিধীয়তে।।—বৌধায়ন

যতি— যতির্জিহ্বেষ্টবিরামস্থানংকবিভিরুচ্যতে।—ছন্দোমঞ্জরী ১।১৯

যথা— সাদৃশ্যযোগ্যতাবীপ্সাপদার্থানতিবৃত্তয়ঃ। যথার্থা বাচকস্তেষাং সাদৃশ্যে যথাদয়ঃ।।—প্রয়োগরত্নমালা ১৯৫-৯৬

যম— চত্বারশ্চ যমাঃ স্মৃতাঃ।—পাণিনীয়শিক্ষা।

যর্বাণস্তর্বাণঃ— যর্বাণস্তর্বাণো নামর্ষয়ো বভূবুঃ প্রত্যক্ষধর্মাণঃ পরাবরজ্ঞা বিদিতবেদিতব্যা অধিগত যাথাতথ্যাঃ। তে তত্রভবন্তো যদ্বানস্তদ্বান ইতি প্রযোক্তব্যে যর্বাণস্তর্বাণ ইতি প্রযুঞ্জতে। যাজ্ঞেপুনঃ কর্মণি নাপভাষন্তে।—মহাভাষ্য।

যুক্ত— বিশেষস্য বিশেষেণ মিলিতং যুক্তমুচ্যতে। সমাসাখ্যং তদেব স্যাত্তদ্ধিতোৎপত্তিরেব চ।।—বিমলমতি।

যুবন্— 'জীবতি তু বংশ্যেযুবা' (পা. ৪।১।১৬৩) [পিতৃ-পিতৃব্যাদির বর্তমানে গোত্রাপত্য]

যোগবিভাগ— '(একসূত্রপদস্য) অন্বয়ং বিচ্ছিদ্য (অন্যসূত্রপদেন) অন্বয়ং কৃত্বা পৃথক্সূত্রকরণং যোগবিভাগঃ।' 'পদগৌরবাদ্ যোগবিভাগোগরীয়ান্'। 'যোগবিভাগাদিষ্টসিদ্ধিঃ।'

যৌগিক— 'যোগলভ্যার্থমাত্রস্য বোধকং নাম যৌগিকম্। সমাসতদ্ধিতান্তশ্চ কৃদন্তশ্চেতি তৎত্রিধা।।'

রূঢ়— 'ব্যুৎপত্তিরহিতাঃ শব্দা রূঢ়া আখণ্ডলাদয়ঃ।'
লক্ষণৈর্নোপপন্না যে শব্দা রূঢ়া ইহৈব তে।
বিজ্ঞাতব্যা লিঙ্গসংখ্যাদয়ো লোকপ্রসিদ্ধতঃ।।'
—প্রয়োগরত্নমালা ১।১৬২

রূঢ়ি— 'রূঢ়শব্দনিষ্ঠা শক্তিঃ।'
শব্দাত্মিকা সতী রূঢ়ির্ভবেদ্ যোগাপহারিণী—কুমারভট্টারিকা।

রেফ— রাদ্‌রেফঃ—কাত্যায়নবার্ত্তিক ৩।৩।১০৮/৪ ;
এফস্তরস্য—তৈ. প্রাতিশাখ্য ১।১৯ ;
'রিফ্যতে বিপাট্যতে বস্ত্রাদিপাটনধ্বনিবদুচ্চার্যত ইতি রেফঃ'—ঐ বৈদিকাভরণভাষ্য

লকার— আখ্যাতং দশ লঃ স্মৃতাঃ—কোশকল্পতরু ১।৫।৫৯ ;
['কাল'শব্দের লকার লইয়া ধাতুরূপের বর্তমানাদি কালনির্দেশক দশ লকার লট্, লিট্, লুট্, লৃট্, লেট্, লোট্, লঙ্, লিঙ্, লুঙ্, লৃঙ্।]

লক্ষণ— লক্ষ্যতে জ্ঞায়তেঽনেনেতি লক্ষণম্।—বালমনোরমা ;
ঋষয়োঽপ্যুপদেশস্য নান্তং যান্তি পৃথক্‌ত্বশঃ।
লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তংযাতি বিপশ্চিতঃ।।—নিরুক্ত (২।১।৩২) বৃত্তিধৃত

লক্ষ্য— 'লক্ষ্যো লক্ষণয়া বোধ্যঃ'। লক্ষ্য-লক্ষণয়োর্জ্ঞানী তদ্ধিপাত্রংপ্রচক্ষতে।
লক্ষণেন বিনা বাণী নির্মলাপি ন শুদ্ধ্যতি।।—অমোঘনন্দিনীশিক্ষা ১২৫

লঘু— বিনানুস্বারসংযোগং বিসর্গং ব্যঞ্জনোত্তরম্। হ্রস্বং লম্ববসানে বা প্রেঽগ্রে হ্রেঽপি পরে লঘু।।—বাণীভূষণ।

লাঘব— 'লঘোর্ভাবোলাঘবম্। তৎপুনরল্পপ্রয়াসঃ। অল্পপ্রয়াসসাধ্যংহি বস্ত্বল্প-প্রযত্নযোগাল্লঘূচ্যতে।'—কাশিকান্যাস

লিঙ্গ— ব্যাপ্তিবলেন লীনমর্থং গময়তীতি লিঙ্গম্—সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ;
লিঙ্গ্যতে চিহ্ন্যতেঽনেন একদেশেনার্থো গম্যতে ইতি লিঙ্গম্—কাতন্ত্র (২।১।১) পঞ্জী ;
'শুদ্ধং মিশ্রঞ্চ সংকীর্ণমুপসর্জন মেব চ। আবিষ্টং চ তথাব্যক্তং লিঙ্গং ষড়্‌বিধমুচ্যতে।।' স্ত্রীলিঙ্গমপি পুংলিঙ্গং ক্লীব লিঙ্গমিতি ত্রিধা। শব্দসংস্কারসিদ্ধ্যর্থং ভাষয়া নাম ভিদ্যতে।।
—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ৫৩ ;

স্তনকেশবতী স্ত্রীস্যাল্লোমশঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ। উভয়োরন্তরং যচ্চ তদভাবে নপুংসকম্।।—মহাভাষ্য ৪।১।৩ ; 'সত্ত্বরজস্তমোগুণানাং সাম্যাবস্থানপুংসকত্বম্। আধিক্যং পুংস্ত্বম্। অপচয়ঃ স্ত্রীত্বম্।'—

বৈয়াকরণভূষণসার; লিঙ্গমশিষ্যং লোকাশ্রয়ত্বাল্লিঙ্গস্য।—মহাভাষ্য ২।১।৩৬ ; ভাবতত্ত্ববিদঃ শিষ্টাঃ শব্দার্থেষু ব্যবস্থিতাঃ। যদ্‌যদ্ধর্মেঽঙ্গতামেতি লিঙ্গং তত্তৎ প্রচক্ষতে।। —বাক্যপদীয়; স্ত্রীপুংনপুংসকত্বেন ভিন্নং যেন চরাচরম্। লিঙ্গং জয়তি যন্নিত্যমশেষা-গমকারণম্।।—দুর্গসিংহ (ব্যা.দ. ইতিহাস, পৃঃ ৪২৬)।

লিঙ্গানুশাসন— শব্দানাং লিঙ্গনির্দেশকশাস্ত্রম্। 'পুং নাম্নঃ স্ত্রী নাম্নঃ নপুংসকনাম্নঃ'—শতপথ ব্রাহ্মণ ১০।৫।১।২ ; বিবক্ষাতঃ সংস্ত্যানবিবক্ষায়াং স্ত্রী প্রসববিবক্ষায়াং পুমানুভয়বিবক্ষায়াং নপুংসকম্-মহাভাষ্য। শিষ্টের বিবক্ষানুসারে সংস্ত্যানবিবক্ষাতে স্ত্রী, প্রসববিবক্ষাতে পুমান্ এবং উভয় বিবক্ষাতে নপুংসক লিঙ্গের ব্যবহার হয়।
স্ত্যৈ + ড্রট্ + ঙীপ্ = স্ত্রী। সূ + সপ্ = পুমস্, অথবা পা + ডুম্‌সুন্ (ঔণাদিক)= পুমস্। প্রবৃত্তি = আবির্ভাব = পুংলিঙ্গের জ্ঞান, সংস্ত্যান = তিরোভাব—স্ত্রীলিঙ্গ, স্থিতি—নপুংসক লিঙ্গ।

লোক— লোক্যতে যেন শব্দার্থো লোকস্তেন স উচ্যতে। ব্যবহারোঽথবা বৃদ্ধব্যবহৃত্পরম্পরা।।—মহা. প্র. উদ্দ্যোতে ধৃত বচন; লোকো-পচারাদ্ গ্রহণসিদ্ধিঃ। —কাতন্ত্র ১।১।২৩; বাশব্দৈশ্চাপিশব্দৈ-র্বা শব্দানাং চালকৈস্তথা। এভির্যেঽত্র ন সিধ্যন্তি তে সাধ্যা লোকসম্মতাঃ।।—বররুচি (-ঐ বৃত্তি); 'লোকাচ্ছেযস্য সিদ্ধিঃ।' লোকশব্দেন শিষ্টা বিবক্ষিতাঃ। তেষাং বস্তুপরমার্থসাক্ষাৎকারিত্বং লক্ষণম্। —হেলারাজ

লোপ— অদর্শনং লোপঃ—পা. ১।১।৬০; লোপ সর্বাপকর্ষণাৎ—আপিশলীয়াঃ; আদিলোপশ্চান্তলোপো মধ্যলোপস্তথৈব চ। বিভক্তিপদবর্ণানাং ক্রিয়তে শব্দবেদিভিঃ।।—ব্যাঘ্রভূতি ; ত্রয়ো যত্রৈকবর্গীয়া মধ্যমস্তত্র লুপ্যতে। —মৌগ্ধবোধাঃ; 'সকলেভ্যো-বিধিভ্যঃ স্যাদ্ বলী লোপবিধিস্তথা। লোপস্বরাদেশয়োস্তু স্বরাদেশবিধির্বলী।।'

লৌকিক— লোকে ভবো লৌকিকঃ।
'লৌকিকস্তু দ্বিধা প্রাকৃতো ব্যুৎপন্নশ্চ।'—কাব্যমীমাংসা

শক্তি— 'শক্তির্নাম পদপদার্থয়োর্বাচ্যবাচকভাবঃ সম্বন্ধঃ।' অর্থপ্রতীত্য-নুকূলপদপদার্থসম্বন্ধব্যাপারঃ শক্তিঃ'—কাব্যপ্রকাশ ; অর্থস্মৃত্যনুকূল-পদপদার্থসম্বন্ধঃ শক্তিঃ—তর্কদীপিকা ; পদানামন্বয়ানুভব-জনকত্বমেব শক্তিঃ—নাগেশ (স্ফোটবাদ) ;
অস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থো বোদ্ধব্য ইতি ঈশ্বরসঙ্কেতঃ শক্তিঃ—গদাধর (শক্তিবাদ) ; শক্তির্নাম পদানামর্থেষু মুখ্যা বৃত্তিঃ—বেদান্তপরিভাষা ;

শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানকোশাপ্তবাক্যাদ্ব্যবহারতশ্চ। বাক্যস্য শেষাদ্ বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ।।—প্রাচীনাঃ ; 'শব্দেষ্বেবাশ্রিতা শক্তির্বিশ্বস্যাস্য নিবন্ধনী।'—বাক্যপদীয় ১।১১৯

শব্দ— আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ—সাংখ্যসূত্র ১।১০১, ন্যায়সূত্র ১।১।৭ ; শ্রোত্রগ্রহণো যোঽর্থঃ স শব্দঃ—বৈশেষিক সূত্র ২।২।২১ ; শ্রোত্রোপলব্ধির্বুদ্ধি নিগ্রাহ্যঃ প্রয়োগেণাভিজ্বলিত আকাশদেশঃ শব্দঃ —মহাভাষ্য ১।১।২ ;

আকাশস্য গুণঃ শব্দো বর্ণধ্বন্যাত্মকো দ্বিধা—অলঙ্কারকৌস্তুভ ২।১ ; আকাশস্য গুণঃ শব্দো নিঃশব্দং ব্রহ্ম উচ্যতে।—উত্তরগীতা ৪৭ ; যেনোচ্চারিতেনার্থঃ প্রতীয়তে স শব্দঃ—শৃঙ্গারপ্রকাশ ; চতুষ্টয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ। জাতিশব্দা গুণশব্দাঃ ক্রিয়াশব্দা যদৃচ্ছাশব্দাশ্চতুর্থাঃ। —মহাভাষ্য ১।১।২; শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবোধ্বনিঃ। কণ্ঠাদিযোগজন্মানো বর্ণাদ্যাঃ কাদয়োমতাঃ।। —ভাষাপরিচ্ছেদ ; লব্ধক্রিয়ঃপ্রযত্নেন বক্তুরিচ্ছানুবর্তিনা। স্থানেষ্বভিহতো বায়ুঃ শব্দত্বং প্রতিপদ্যতে।।—বাক্যপদীয় ১।১০৯; নাদৈরাহিতবীজায়ামন্ত্যেন ধ্বনিনা সহ। আবৃত্তিপরিপাকায়াং বুদ্ধৌ শব্দোঽবধার্যতে।।—ঐ ১। ৮৫; ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে। অনুবদ্ধমিব জ্ঞানং সর্বং শব্দেন ভাসতে।।—ঐ ১।১২৪; অথায়মান্তরোজ্ঞাতা সূক্ষ্মো বাগাত্মনি স্থিতঃ। ব্যক্তয়ে স্বস্বরূপস্য শব্দত্বেন বিবর্ততে।।—ঐ ১।১১৩; শব্দো বাক্যাত্মা—মহা. প্র. উদ্দ্যোত

শব্দপূর্বযোগ— 'শব্দপূর্বং হি শব্দস্বরূপস্যাভেদতত্ত্বজ্ঞানে ক্রমসংহারেণ যোগং লভতে।...তদভ্যাসাচ্চ শব্দপূর্বকযোগমধিগম্য প্রতিভাং তত্ত্বপ্রভবাং ভাববিকারপ্রকৃতিং সত্তাং সাধ্যসাধনশক্তিযুক্তাং সম্যগববুধ্য নিয়তা ক্ষেমপ্রাপ্তিঃ।'—বাক্যপদীয় (১।১৬,...)বৃত্তি

শব্দব্রহ্ম— শব্দব্রহ্মেতি শব্দার্থং শব্দমিত্যপরে জগুঃ। চৈতন্যং সর্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতিঃ।। তৎপ্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগম্। বর্ণাত্মনাবির্ভবতি গদ্যপদ্যাদিভেদতঃ।।—শারদাতিলক; নাশোৎপাদ সমালীঢ়ং ব্রহ্ম শব্দময়ং পরম্। যৎ তস্য পরিণামোঽয়ং ভাবগ্রামঃ প্রতীয়তে।।—তত্ত্বসংগ্রহ ১২৮; 'স সমস্তবিশ্বব্যাপী চতুর্বর্গৈকহেতুঃ পরো মহাবাক্যার্থঃ, অর্থমূর্ত্যা বিপরিণতমনাদিনিধনমখণ্ডং শব্দব্রহ্মেত্যুচ্যতে'—শৃঙ্গারপ্রকাশ ৮।..., বিন্দোস্তস্মাদ ভিদ্যমানাদ্ রবোঽব্যক্তাত্মকোঽভবৎ। স এব শ্রুতিসম্পন্নৈঃ শব্দব্রহ্মেতি গীয়তে।।—প্রপঞ্চসার ১।৪৩; দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ। শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।।—ব্রহ্মবিন্দূপনিষদ্ ১৭,মৈত্রায়ণী উপ. ৬।২২, ত্রিপুরাতাপিন্যুপনিষদ

৫।১৭,বিষ্ণুপু. ৬।৫।৬৪, অগ্নিপু. ১।৫; শব্দব্রহ্মবিচারেণ পরং ব্রহ্মাবগম্যতে। —কোবিদানন্দ ৪১; শব্দার্থয়োরভেদাৎ সকলার্থ-স্বরূপিণো ব্রহ্মণঃ শব্দরূপত্বম্—কুঞ্জিকা (সি. মঞ্জুষাটীকা)
[ধ্বনি এবং অর্থের সমন্বিত একীভূত অদ্বৈত সত্তাই শব্দ। শব্দের নানারূপ। ব্যাবহারিক রূপে ইহা ভাষা, বিদ্যারূপে ব্যাকরণ, রসরূপে সাহিত্য এবং তত্ত্বরূপে স্ফোট বা শব্দব্রহ্ম। শব্দের অর্থাশ্রয়ী বা পদার্থরূপ এই বিশ্বসংসার।]

শব্দভাবনা— আদ্যঃ করণবিন্যাসঃ প্রাণস্যোর্ধ্বং সমীরণম্। স্থানানামভিঘাতশ্চ ন বিনা শব্দভাবনাম্।।—বাক্যপদীয় ১।১২২; অনাদিশ্চৈষাশব্দভাবনা প্রতিপুরুষমবস্থিতজ্ঞানবীজপরিগ্রহা। ন হি অস্যাঃ কথঞ্চিৎ পৌরুষেয়ত্বং সম্ভবতি। তথা হি অনুপদেশসাধ্যাঃ প্রতিভাগম্যা এব করণবিন্যাসাদয়ঃ।—ঐ বৃত্তি।

শব্দশক্তি— বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ। ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ।।—সাহিত্যদর্পণ ২।৬ ; বিচিত্রাঃ শব্দশক্তয়ঃ—হৈমপরিভাষা ; দ্রঃ শক্তি

শব্দসাধুত্ব— শব্দশাস্ত্রবিরুদ্ধং যত্তদসাধু প্রচক্ষতে।—সরস্বতীকণ্ঠাভরণালংকার ১।৭; অনপভ্রষ্টতাঽনাদির্যদ্বাঽভ্যুদয়যোগ্যতা। ব্যক্তিয়া ব্যঞ্জনীয়া বা জাতিঃ সাপীহ সাধুতা।।—শব্দকৌস্তুভ; সাধুত্বঞ্চ ব্যাকরণব্যঙ্গ্যোঽর্থ-বিশিষ্টশব্দনিষ্ঠঃ পুণ্যজনকতাবচ্ছেদক জাতিবিশেষঃ।—বৈ.সি.ল. মঞ্জুষা।

শব্দাত্মা— ইহ দ্বৌ শব্দাত্মানৌ নিত্যঃ কার্যশ্চ। ধ্রুবং কূটস্থমবিচাল্যনপায়োপজন-বিকার্যনুৎপত্ত্যবৃদ্ধ্যব্যয়যোগিযত্তন্নিত্যমিতি।—মহাভাষ্য [অনিত্য = বৈকৃত = কার্য, নিত্য = প্রাকৃত = ধ্রুব] দ্রঃ নিত্য

শব্দানুশাসন— বিবিক্তাঃ সাধবঃ শব্দাঃ প্রকৃত্যাদিবিভাগতঃ। জ্ঞাপ্য... যেন তচ্ছাস্ত্রমত্র শব্দানুশাসনম্।।—প্রসাদটীকাধৃতবচন

শাব্দিক— 'শাব্দিকাঃ শব্দতৎপরাঃ।' শব্দং করোতি প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবিভাগেন ব্যুৎপাদয়তি শাব্দিকঃ—শব্দকৌস্তুভ ৪।৪।২

শাস্ত্র— শিষ্যন্তেঽসাধুশব্দেভ্যো বিবিচ্য জ্ঞাপ্যন্তেঽনেনেতি শাস্ত্রম্—মহাভাষ্য ; 'অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্রম্।' প্রবৃত্তির্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা। পুংসাং যেনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে।।—শ্লোকবার্ত্তিক (শ.প.৪) আপ্তোপজ্ঞমনুল্লঙ্ঘ্যমদৃষ্টেষ্টাবিরোধকম্। তত্ত্বোপদেশকৃৎ সার্বং শাস্ত্রং কাপথঘট্টনম্।।—ন্যায়াবতার ৯; লঘুনোপায়েন সকলশব্দপ্রতিপত্তৌ চ শাস্ত্রস্যোপযোগো বোধ্যঃ। —নাগেশ (স্ফোটবাদ)

শাস্ত্রপ্রবৃত্তি— 'ত্রয়ী হি শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিঃ, উদ্দেশো লক্ষণং পরীক্ষা চ। তত্র নামধেয়কীর্তনমাত্রমুদ্দেশঃ। উদ্দিষ্টস্য অসাধারণধর্মবিচনং লক্ষণং;

তদ্দ্বেধা সামান্যলক্ষণং বিশেষলক্ষণং চ। লক্ষিতস্য ইদমিত্থং ভবতি নেত্থমিতি ন্যায়তঃ পরীক্ষণং পরীক্ষা'—'প্রমাণমীমাংসা'য় হেমচন্দ্র

শাস্ত্রপূর্বকপ্রয়োগ—'শাস্ত্রপূর্বকে প্রয়োগেঽভ্যুদয়ঃ।তত্তুল্যং বেদশব্দেন।' —কাত্যায়ন-বার্ত্তিক (মহাভাষ্য) ; 'তত্র সাধোর্যঃ সম্বন্ধোঽর্থেন স জ্ঞানে শাস্ত্রপূর্বকে বা প্রয়োগে ধর্মাভিব্যক্তাবঙ্গত্বং প্রতিপদ্যতে।'—বৃত্তি (বাক্যপদীয় ১।২৪–৬)

শিক্ষা— 'শিক্ষা বর্ণবিবেচিকা।' —বাচস্পতি; 'স্বরবর্ণোপদেশক শাস্ত্রম্'—বিষ্ণু মিত্র (ঋক্প্রা. টীকা); 'শিক্ষা শিক্ষয়তি ব্যক্তং বর্ণোচ্চারণলক্ষণম্।' 'স্বরতঃ কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্নানুপ্রদানতঃ সবনাদ্যৈশ্চ সা শিক্ষা বর্ণানাং পাঠশিক্ষণাৎ।।'—শুক্রনীতিসার ৪।৩।৪১ ; 'শিক্ষণং শিক্ষা প্রথমোপদেশঃ। তৎসাহচর্যাদ্ গ্রন্থোঽপি শিক্ষা'—পদচন্দ্রিকা ২।৭।১০

[শিক্ষামধীতে বেত্তি বা শিক্ষকঃ (পা. ৪।২।৬১ সূত্রানুসারে বুন্‌প্রত্যয়যোগে)]

শিষ্ট— 'তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ'—মনু ১২।১০৯ ; 'শিষ্টাঃ খলু বিগতমৎসরা নিরহঙ্কারাঃ কুম্ভীধান্যা অলোলুপা দম্ভদর্পলোভমোহক্রোধবিবর্জিতাঃ'—বৌধায়নধর্মসূত্র ১।১।৫ 'কিঞ্চিদন্তরেণ কস্যাশ্চিদ্‌বিদ্যায়াঃ পারঙ্গতাস্তত্রভবন্তঃ শিষ্টাঃ'—মহাভাষ্য ৬।৩।৩

'রজস্তমোভ্যাং নির্মুক্তা স্তপোজ্ঞান বলেন যে।
যেষাং ত্রৈকালমমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা।।
আপ্তাঃ শিষ্টা বিবুদ্ধাস্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ম্।
সত্যং বক্ষ্যন্তি তে কস্মান্নাসত্যং নীরজস্তমাঃ।।'—চরকসংহিতা (সূত্রস্থান ১১।৬) ;
'আবির্ভূত প্রকাশানামনুপপ্লুত চেতসাম্।
অতীতানাগতজ্ঞানং প্রত্যক্ষান্ন বিশিষ্যতে।।
অতীন্দ্রিয়ানসংবেদ্যান্ পশ্যন্ত্যার্ষেণ চক্ষুষা।
যে ভাবান্ বচনং তেষাং নানুমানেন বাধ্যতে।।
ভাবতত্ত্ববিদঃ শিষ্টাঃ শব্দার্থেষু ব্যবস্থিতাঃ।'—বাক্যপদীয় ১।৩৭, ৩৮, ৩।১৩।২১ ;
'শিষ্টমবাধিতম্'—টীকাসর্বস্ব ৩।৫।২৫

শিষ্য— 'শিষ্যতে উপদিশ্যতে অসৌ'—পদচন্দ্রিকা ২।৭।১০

শেষ— 'অর্থাদুপপদত্বে তু তথা চৈবানুবন্ধতঃ। কারকাচ্চৈব বিজ্ঞেয়ঃ শেষ উক্তশ্চতুর্বিধঃ।।'—বররুচি (কাতন্ত্র আ. ৮১)

শৈলী— 'শীলে স্বভাবে ভবা বৃত্তিঃ শৈলী'—ম. ভা. প্রদীপ২।১।২ আহ্নিক

শ্রুতি— 'প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।' 'পূর্ববিজ্ঞানবিষয়ং বিজ্ঞানং শ্রুতিরুচ্যতে। পূর্বজ্ঞানাদ্ বিনা তস্যাঃ প্রামাণ্যং নাবধার্যতে।।'

সংগ্রহ— 'সংগ্রহস্তু সমাহৃতিঃ'—হেমচন্দ্র, কল্পদ্রুকোশ (ব্রহ্মপ্রকাণ্ড) ;
'বিস্তরেণোপদিষ্টানামর্থানাং সূত্রভাষ্যয়োঃ। নিবন্ধো যঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিদুর্বুধাঃ।।'—অমরটীকায় সর্বানন্দ ও রায়মুকুটধৃত বচন ;
'সংগ্রহো ব্যাড়িকৃতো লক্ষশ্লোকসংখ্যো গ্রন্থ ইতি প্রসিদ্ধিঃ'—ম.ভা.প্র. উদ্দ্যোতে নাগেশ ভট্ট

সংজ্ঞা— 'একদ্রব্যোপনিবেশিনী সংজ্ঞা'—কাত্যায়ন ;
'নামমাত্রকথনং সংজ্ঞা'—উপাধ্যায় ;
'ব্যবহারার্থং শাস্ত্রকৃতঃ সঙ্কেতঃ সংজ্ঞা'—পদ্মনাভদত্ত, সুপ্পবোধটীকা ;
'আধুনিক সঙ্কেতো হি সংজ্ঞা'—তত্ত্ববোধিনী (সি.কৌ. টীকা) ;
'যয়া প্রত্যায্যন্তে সা সংজ্ঞা যে প্রতীয়ন্তে তে সংজ্ঞিন ইতি'—মহাভাষ্য ১।১।১ ; 'লঘ্বর্থং হি সংজ্ঞাকরণম্'—ঐ ঐ ;
'রূঢং সঙ্কেতবন্নাম সৈব সংজ্ঞেতি কীর্ত্যতে।
নৈমিত্তিকী পারিভাষিক্যৌপাধিক্যপি তদ্ভিদা।।
জাত্যাবচ্ছিন্নসঙ্কেতবতী নৈমিত্তিকী মতা।
সঙ্কেতস্য গ্রহঃ পূর্বং বৃদ্ধস্য ব্যবহারতঃ।
উভয়াবৃত্তিধর্মেণ সংজ্ঞা স্যাৎ পারিভাষিকী।।
যদ্বাধুনিকসঙ্কেতশালি স্যাৎ পারিভাষিকম্।'—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ১৭,১৯,২০,২২,২৩ ;
আজানিকশ্চাধুনিকঃ সঙ্কেতো দ্বিবিধোমতঃ।
নিত্য আজানিকস্তত্র যা শক্তিরিতি গীয়তে।।
কাদাচিৎকস্ত্বাধুনিকঃ শাস্ত্রকারাদিভিঃকৃতঃ।।—বাক্যপদীয়
দ্রঃ অন্বর্থসংজ্ঞা। 'সঙ্কেতস্তু পদপদার্থয়োরিতরেতরাধ্যাসরূপঃ স্মৃত্যাত্মকো যোঽয়ং শব্দঃ সোঽয়মর্থো যোঽর্থঃ স শব্দ ইত্যেবমিতরেতরাধ্যাসরূপসঙ্কেতো ভবতি।'—যোগসূত্রভাষ্য

সংজ্ঞাসূত্র— 'সাক্ষাচ্ছক্তি গ্রাহকত্বং সংজ্ঞাসূত্রত্বম্।'

সংজ্ঞী— (Nominatum)

সংযোগ— 'হলোঽনন্তরাঃ সংযোগঃ' (পা. ১।১।৭)—a sequence of consonants, any group of contiguous consonants, a consonant cluster.

সংশয়— উভয়তো হেতুদর্শনং সংশয়ঃ—উদ্দ্যোত-ছায়াটীকা

সংস্কৃত— সংস্কৃতং নাম দৈবী বাক্ অন্বাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ।—কাব্যাদর্শ ১।৩৩ ;
সংস্কৃতং ত্বাহিতোৎকর্ষে কৃত্রিমে নির্মলীকৃতে।—নানার্থার্ণবসংক্ষেপ ;
সংস্কৃতে প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি বিভাগৈঃ সংস্কারমাপাদিতে।—শিক্ষাপ্রকাশ;

পঠন্তি সংস্কৃতং সুষ্ঠু কুণ্ঠাঃ প্রাকৃতবাচি তে। বারাণসীতঃ পূর্বেণ যে কেচিন্মগধাদয়ঃ।।—কাব্যমীমাংসা

সংহিতা— পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা—নিরুক্ত ১।১৭, পা. ১।৪।১০৯; সংহিতা পদপ্রকৃতিঃ —ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ২।১ ; পদানাং সংহিতা যোনিঃ সংহিতা বা পদাশ্রয়া —বাক্যপদীয় ২।৫৯ ; সংহিতৈকপদে নিত্যা নিত্যা ধাতূপসর্গয়োঃ। নিত্যা সমাসে বাক্যে তু সা বিবক্ষামপেক্ষতে।।—বৈ.সি.কৌমুদী (ভ্বাদিগণ), যেন হি বর্ণাঃ সন্ধীয়ন্তে তৎ সংহিতাকার্যম্—ন্যাস ৬।১।১১৩

সঙ্কেত— 'আজানিকশ্চাধুনিকঃ সঙ্কেতো দ্বিবিধোমতঃ। নিত্য আজানিকস্তত্র যা শক্তিরিতি গীয়তে।। কাদাচিৎক আধুনিকঃ শাস্ত্রকারাদিভিঃ কৃতঃ।।'

সৎ— 'তৌ সৎ' (পা. ৩।২।১২৭) [শতৃ এবং শানচ্ প্রত্যয়]

সতীর্থ(র্থ্য)— সতীর্থ্যাস্ত্বেকগুরবঃ—অমর ২।৭।১১

সন্ধি— 'দ্বয়োঃ সুসন্নিকর্ষঃ সন্ধিঃ।'—কালাপাঃ; 'অর্ধমাত্রোচ্চারণকালেনা-ব্যবহিতয়োর্বর্ণয়োর্দ্রুততরোচ্চারণং সন্ধিঃ।'

স্বরসন্ধির্ব্যঞ্জনসন্ধিঃ প্রকৃতিসন্ধিস্তথৈব চ। অনুস্বারো বিসর্গশ্চ সন্ধিঃ স্যাৎ পঞ্চলক্ষণঃ।—কালাপাঃ ;

তুক্‌স্বরঃ প্রকৃতিশ্চৈব ব্যঞ্জনঞ্চ ততঃ পরম্। ততোবিসর্জনীয়শ্চ স্বাদিঃ ষট্‌সন্ধিরুচ্যতে।।—রূপাবতার

সন্নিপাত— যং দৃষ্ট্বা যস্য সম্ভবঃ স তস্য সন্নিপাতঃ—কাতন্ত্র (চ ১৪০) টীকা

সবর্ণ— তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্—পা. ১।১।৯; সমানো বর্ণঃ সবর্ণঃ —কাতন্ত্র (১।১।৪) টীকা ;

সমানস্থান করণাস্যপ্রযত্নঃ সবর্ণঃ—বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য ১।৪৩ ;

আস্যে তুল্যদেশপ্রযত্নং সবর্ণম্—কা. বার্ত্তিক (পা. ১।১।৯/২) ;

'হ্রস্বে হ্রস্বে তথা দীর্ঘে দীর্ঘেহ্রস্বে পরস্পরম্।
সবর্ণত্বং বিজানীয়াৎ তেষাং গ্রহণহেতুনা।।'

সমর্থ— syntactically related

সমানাধিকরণ—ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তস্য শব্দস্যৈকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্—হৃদয়হারিণী (৩।২।৭৫) ; একবিভক্ত্যন্তানামেকার্থনিষ্ঠত্বং সামানাধিকরণ্যম্।—ব্যা. দ. ইতিহাস, পৃঃ ২০৭

সমাম্নায়— সম্যগাম্নায়ন্তে অভ্যস্যন্তেঽস্মিন্নিতি সমাম্নায়ো বর্ণানাং নিয়তো ব্যূহঃ।—কাতন্ত্রটীকা; পাঠক্রমো নিয়তব্যূহঃ—কাতন্ত্রপঞ্জী; [সম্—আ+ম্না+ঘঞ (কর্মবাচ্যে)—যাহা অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছে। ম্নাধাতুর অর্থ অভ্যাস করা]

সমাস— সমসনমেকীকরণং সমাসঃ—গোয়ীচন্দ্র (টীকা ৭।১) ; নাম্নাং সমাসো যুক্তার্থঃ—কাতন্ত্র (চ ২৫৯) ; সমাসশ্চান্বয়েনাম্নাম্—সারস্বত ;

বিভক্তির্লুপ্যতে যত্র তদর্থস্তু প্রতীয়তে। ঐকপদ্যং পদানাঞ্চ স সমাসোঽভিধীয়তে।।—চন্দ্রকীর্তিটীকাধৃত ; নিত্যানিত্যো বিকল্পশ্চ 'সমাসস্য ত্রিধা ক্রমঃ।' দ্বিগুদ্বন্দ্বোঽব্যয়ীভাবঃ কর্মধারয় এব চ। পঞ্চমস্তু বহুব্রীহিঃ ষষ্ঠস্তৎপুরুষঃ স্মৃতঃ।।—বৃহদ্দেবতা ২।১০৫ ; স চায়ং ষড়্বিধঃ কর্মধারয়াদিপ্রভেদতঃ। যশ্চোপপদসংজ্ঞোঽন্যস্তেনাসৌ সপ্তধা মতঃ।। পূর্বমধ্যান্ত্যসর্বান্যপদপ্রাধান্যতঃ পুনঃ। প্রাচ্যৈঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তঃ সমাসো বাভটাদিভিঃ।।—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ৩২, ৩৩ ; সুপাং সুপা তিঙা নাম্না ধাতুনাথ তিঙাং তিঙা। সুবন্তেনেতি বিজ্ঞেয়ঃ সমাসঃ ষড়্বিধো বুধৈঃ।।—বৈয়াকরণভূষণ ২৫;

[সুপাং সুপা=সুবন্তের সহিত সুবন্তের সমাস, যেমন রাজপুরুষঃ,
সুপাং তিঙা=তিঙন্তের " " " " পর্যভূষৎ,
সুপাং নাম্না=নামের " " " " কুম্ভকার,
সুপাং ধাতুনা=ধাতুর " " " " কটপ্রূঃ,
তিঙাং তিঙা=তিঙন্তের " তিঙতের " " পিবতখাদতা,
তিঙাং সুবন্তেন=সুবন্তের " " " " কৃন্তবিচক্ষণা
—ব্যা. দ. ইতিহাস, পৃঃ ১৯৪–৯৫]

যোঢ়া সমাসাঃ সংক্ষেপাদষ্টাবিংশতিধা পুনঃ। নিত্যানিত্যত্বযোগেন লুগলুক্ত্বেন চ দ্বিধা।। তত্রাষ্টধা তৎপুরুষঃ ষড়বিধঃ কর্মধারয়ঃ। ষড়্বিধশ্চ বহুব্রীহির্দ্বিগুরাভাষিতো দ্বিধা।। দ্বন্দ্বশ্চতুর্বিধো জ্ঞেয়োঽব্যয়ীভাবো দ্বিধামতঃ। তেষাংপুনঃ সমাসানাং প্রাধান্যং তচ্চতুর্বিধম্।। চকারবহুলো দ্বন্দ্বঃ স চাসৌ কর্মধারয়ঃ। যস্য যেষাং বহুব্রীহিঃ শেষস্তৎপুরুষঃ স্মৃতঃ।।—বাররুচসংগ্রহ

সমাহার— 'পরস্পরসাপেক্ষাণামেবাবয়বভেদতিরোধানেন সংহতিরূপেণান্বয়ঃ সমাহারঃ।'

সমীক্ষা— 'অন্তর্ভাব্যং সমীক্ষা। অবান্তরার্থবিচ্ছেদশ্চ সা।'

সমুচ্চয়— অনেন চানেন চেতি সমুচ্চয়ঃ—অর্থশাস্ত্র(১৫শ অধিকরণ) ; 'যদা পরস্পরনিরপেক্ষাঃ পদার্থা একস্মিন সম্বন্ধিনি সমুচ্চীয়ন্তে তদা সমুচ্চয়ঃ।'

সম্প্রদান— কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্-পা. ১।৪।৩২; যস্মৈ দিৎসা রোচতে ধারয়তে বা তৎসম্প্রদানম্—কাতন্ত্র (চতুষ্টয় ২১৬); পূজানুগ্রহকাম্যাভিঃ স্বদ্রব্যস্যপরার্পণম্। দানং তস্যার্পণস্থানং সম্প্রদানং প্রকীর্তিতম্।।—মুগ্ধবোধ (২৯৪) প্রমোদজননী টীকা ; অনুমন্ত্রনিরাকর্তৃপ্রেরকং ত্যাগকারণম্। ব্যাপ্যেনাপ্তং দদাতেস্তু সম্প্রদানং প্রকীর্তিতম্।। সম্প্রদানং তদৈব স্যাৎ পূজানুগ্রহকাময়া। দীয়মানেন সংযোগাৎ স্বামিত্বং লভতে যদি।। হেত্বর্থে কর্মসংজ্ঞায়াং

শেষত্বে চাপ্যকারকম্। রুচ্যার্থাদিষু শাস্ত্রেষু সম্প্রদানাখ্যমুচ্যতে।।—কাতন্ত্র(চ২১৬)-টীকাধৃত বচন

সম্প্রদায়— সম্প্রদায়ো নাম শিষ্যোপাধ্যায়সম্বন্ধস্যাবিচ্ছেদেন শাস্ত্রপ্রাপ্তিঃ।—ন্যায়বার্তিক ;

শিষ্টাচারপরম্পরাবতীর্ণোপদেশঃ –ভরত মল্লিক ;
গুরুপরম্পরাগতসদুপদিষ্টব্যক্তিসমূহঃ। —শব্দকল্পদ্রুম

সম্প্রসারণ— ইগ্‌যণঃ সম্প্রসারণম্-পা. ১।১।৪৫ [য্ ব্ র্ ল্ স্থানে যথাক্রমে ই উ ঋ ৯ হওয়া]

সম্বন্ধ— সম্বন্ধঃ কারকেভ্যোঽন্যঃ ক্রিয়াকারকপূর্বকঃ। অশ্রুতায়াং শ্রুতায়াং বা ক্রিয়ায়ামভিধীয়তে।। –বাক্যপদীয়; সংযোগঃ সমবায়শ্চ সম্বন্ধো-দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ।—কারকোল্লাস

সম্বুদ্ধি— 'সম্বোধনং সম্বুদ্ধিঃ।' একবচনং সম্বুদ্ধিঃ—পা. ২।৩।৪৯ [সম্বোধনের একবচন]

সম্বোধন— 'অভিমুখীকরণং সম্বোধনম্।' সিদ্ধস্যাভিমুখী ভাবমাত্রং সম্বোধনং বিদুঃ। প্রাপ্তাভিমুখ্যোহ্যর্থাত্মা ক্রিয়ায়াং বিনিযুজ্যতে।। সম্বোধনং ন বাক্যার্থ ইতি বৃদ্ধেভ্য আগমঃ। ৩।৭...; সম্বোধনপদং যচ্চ তৎ ক্রিয়ায়া বিশেষণম্। ২।৫ (–বাক্যপদীয়)।

সর্বনাম— 'সর্বেষাং নাম সর্বনাম।' সর্বাদীনি সর্বনামানি —পা. ১।১।২৭

সহসুপা বা সুপ্‌সুপা—'নঞর্থস্য ন শব্দস্য সুপ্‌সুপেতি সমাসঃ।'
'যস্য সমাসস্য বিশেষসংজ্ঞা ন কৃতা স সামান্যেন সুপ্‌সুপেতি সমাসঃ।' অব্যয়ীভাব-তৎপুরুষ-বহুব্রীহি-দ্বন্দ্বাধিকার বহির্ভূতানামপি 'সহসুপা' ইতি বিধানাৎ—ভট্টোজি

সাধন— সর্বেষু সাধনেষু সন্নিহিতেষু কর্তা প্রবর্তয়িতা ভবতি।—মহাভাষ্য১।৪।২৩ ; ক্রিয়াণামভিনিষ্পত্তৌ সামর্থ্যং সাধনং বিদুঃ।—বাক্যপদীয়

সাধুত্ব— দ্রঃ শব্দসাধুত্ব।

সার্বধাতুক— তিঙ্‌শিৎ সার্বধাতুকম্-পা. ৩।৪।১১৩ [তিঙ্ বিভক্তি এবং শ-ইৎপ্রত্যয়]

সুপ— 'নামিকী বিভক্তিঃ'—শাবরভাষ্য (২।১।৩) [একবিংশতি শব্দবিভক্তির আদ্য 'সু' এবং অন্ত্য 'সুপ্'-এর 'প', একত্রে সুপ্ প্রত্যাহার সংজ্ঞা]

সূক্ত— সম্পূর্ণমৃষিবাক্যং তু সূক্তমিত্যভিধীয়তে। —বৃহদ্দেবতা

সূত্র— সূত্রং সূচনকৃৎ—হেমচন্দ্র ; সূচ্যতে গ্রথ্যতে ইতি সূত্রম্, সূচনাদ্ বা –ঐ; সূচনাৎ সূত্রণাচ্চৈব...সূত্রস্থানং প্রচক্ষতে। —সুশ্রুত (সূত্রস্থান ৩।১২) ; অল্পাক্ষরমসংদিগ্ধং সারবদ্ গূঢ়নির্ণয়ম্। নির্দোষং হেতুমত্তুল্যং সূত্রমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।।—বররুচি ; অল্পাক্ষরমসংদিগ্ধং

সারবদ্বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যং চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।। —বায়ুপু. ৪৯।১৪২; অর্থান্ সূচয়তি সূতে সূত্রয়তি বা সূত্রম্—দুর্গগুপ্তসিংহ (কাতন্ত্রবৃত্তিটীকা) ; লঘূনিসূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ। সর্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্মনীষিণঃ।।—ভামতী (১।১।১)-ধৃত ; সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এব চ। প্রতিষেধোঽধিকারশ্চ ষড়্‌বিধং সূত্রলক্ষণম্।।—প্রাচীনাঃ

সূত্রাঙ্গ— 'সূত্রং ব্যাসশ্চ তথা তথোদাহরণং নৃপ। প্রত্যুদাহরণঞ্চৈব চতুরঙ্গং প্রকীর্তিতম্।। বাক্যং চৈবাথবাক্যার্থঃ পদার্থঃ পদমেব চ। চতুরঙ্গমিদং বেদ তথৈবান্যৎ প্রকীর্তিতম্।।' প্রতিজ্ঞা হেতুর্দৃষ্টান্তমুপসংহার এব চ। তথা নিগমনং চৈব পঞ্চাবয়ব ইষ্যতে।। —বিষ্ণুধর্মোত্তর ৫।৩

সূরি— সূতে বাচং সূরিঃ—প্রক্রিয়াসর্বস্বে ধৃত উণাদিসূত্র (৪।৬৬)-বৃত্তি ; সূতে বুদ্ধিং সূরিঃ পণ্ডিতঃ।—কাতন্ত্র-উণাদি (৩।৫৩)-বৃত্তি।

স্থান— স্বরাণাং যত্রোপসংহারস্তৎ স্থানম্—তৈ. প্রাতিশাখ্য ২।৩১ ;
অন্যেষাং তু যত্র স্পর্শনং তৎস্থানম্।—ঐ২।৩৩ ;
যস্মিন্ বর্ণা নিষ্পাদ্যন্তে তৎস্থানম্—ন্যাস ১।১।৯

স্নাতক— 'স্নাতাৎ বেদসমাপ্তৌ স্নাত এব স্নাতকঃ।'

স্পর্শ— স্পৃষ্টকরণাঃ স্পর্শাঃ —আপিশল-শিক্ষা ৩।৪

স্ফোট— স্ফুট্যতে ব্যজ্যতে বর্ণৈরিতি স্ফোটো বর্ণাভিব্যঙ্গ্যঃ, স্ফুটতি স্ফুটীভবত্যস্মাদর্থ ইতি স্ফোটোঽর্থপ্রত্যায়ক ইতি স্ফোটশব্দার্থমুভয়থা নিরাহুঃ—সর্বদর্শনসংগ্রহ; বর্ণানাং বাচকত্বানুপপত্তৌ যদ্‌বলা-দর্থপ্রতিপত্তিঃ স স্ফোটঃ —ঐ ; স্ফুটতি প্রকাশতেঽর্থোঽস্মাদিতি স্ফোটো বাচক ইতি যাবৎ—বৈয়াকরণভূষণ, স্ফোটবাদ; স্ফোটঃশব্দঃ। ধ্বনিঃ শব্দগুণঃ। ...ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে।—মহাভাষ্য ১।১।৬৯; স্ফোটঃ শব্দো ধ্বনিস্তস্য ব্যায়ামাদুপজায়তে। ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভেদেন তথৈব স্ফোটনাদয়োঃ।।—বাক্যপদীয় ; ইদমেকং পদমেকং বাক্যমিতি প্রত্যয়ঃ স্ফোটসত্ত্বে তদেকত্বে চ প্রমাণম্।—নাগেশ (ম. প্র. উদ্দ্যোত) ; স চায়ং স্ফোট আন্তরপ্রণবরূপ এব —ঐ (বৈ.সি.লঘু মঞ্জুষা); নিষ্কর্ষে তু ব্রহ্মৈব স্ফোটঃ—বৈয়াকরণভূষণ ৭২

স্বর— স্বর্যতে শব্দ্যতেঽনেনেতি স্বরঃ। 'বিবৃতকরণাঃ স্বরাঃ'—আপিশলশিক্ষা ৩।৭ ; স্বয়ং রাজন্তে ইতি স্বরাঃ—মহাভাষ্য ১।২।১ আহ্নিক ; 'অন্বগ্‌ভবতি ব্যঞ্জনম'—(অর্থাৎ ব্যঞ্জন স্বরের অনুগামী), '...স্বরাঃ। একাকিনোঽপি অর্থপ্রতিপাদনে সমর্থা ইতি।'—কাতন্ত্র (১।১।২) টীকা; উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চস্বরিতঃ প্রচিতস্তথা। চতুর্বিধঃ স্বরো দৃষ্টঃ

স্বরচিন্তাবিশারদৈঃ।।—মাণ্ডূকী শিক্ষা ১৯; উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ ত্রয়ঃ স্বরাঃ। আয়ামবিশ্রম্ভাক্ষেপৈস্ত উচ্যন্তেঽক্ষরাশ্রয়াঃ।।—ঋক-প্রাতিশাখ্য ৩।১ ; অন্তোদাত্তমাদ্যুদাত্তমুদাত্তমনুদাত্তং নীচ স্বরিতম্। মধ্যোদাত্তং স্বরিতং দ্ব্যুদাত্তং ত্র্যুদাত্তমিতি নব পদশয্যা।।—পাণিনীয় শিক্ষা ; উচ্চৈরুস্মার্গণো বায়ুরুদাত্তং কুরুতে স্বরম্। নীচৈর্গতোঽনুদাত্তঞ্চ স্বরিতং তির্যগাগতঃ।। অর্ধৈক দ্বিত্রিসংখ্যাভির্মাত্রাভির্লিপয়ঃ ক্রমাৎ। সব্যঞ্জনহ্রস্বদীর্ঘপ্লুতসংজ্ঞা ভবন্তি তাঃ।।—প্রপঞ্চসার (৩য় পটল)

[হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত। প্রতিটি আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, সুতরাং ৩ x ৩ = ৯; উহাদের প্রতিটি সানুনাসিক ও নিরনুনাসিক, সুতরাং ৯ x ২ = ১৮ ; এই ১৮ প্রকার অ, ই, উ, ঋ। ঌকারের দীর্ঘ (?) এবং এ, ঐ, ও, ঔ-র হ্রস্ব নাই। তাই এই ৫টি বর্ণ প্রত্যেকে ১২ (৩ x ২ x ২) প্রকার। সুতরাং ১৮ প্রকার ও ১২প্রকারে মিলাইয়া মোট স্বর = ৪ x ১৮ + ৫ x ১২ = ৭২ + ৬০ = ১৩২ রকমের।]

স্বরিত— সমাহারঃ স্বরিতঃ —পা. ১।২।৩১ ; তস্যাদিত উদাত্তমর্ধহ্রস্বম্-পা. ১।২।৩২ [উদাত্ত এবং অনুদাত্তের সমাহার স্বরিত]

স্মৃতি— শ্রুতিমূলা স্মৃতিঃ শ্রুতা-জৌমরবৃত্তি ৪।৫১; মহর্ষিভির্বেদার্থস্মরণং স্মৃতিঃ—পদচন্দ্রিকা (ধীবর্গ ১৫৬)।

হেতু ও কারণ—'যদধীনা কর্তুঃ প্রবৃত্তিঃ স হেতুঃ। কর্ত্রধীনং করণমিতি হেতুকরণয়োর্ভেদঃ।' দ্রব্যাদিবিষয়ো হেতুঃ করণং নিয়তক্রিয়ম্। অনাশ্রিতে তু ব্যাপারে নিমিত্তং হেতুরিষ্যতে।।—বাক্যপদীয়

হেত্বর্থ— যদন্যদবৃত্তিমদর্থস্য সাধনং স হেত্বর্থঃ। —ম. প্র. উ. ছায়াটীকা

হ্রস্ব— হ্রস্বং লঘু—পা. ১।৪।১০ ; একমাত্রোভবেদ হ্রস্বঃ —শ্রুতবোধ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

স্ফোটসিদ্ধি—মণ্ডনমিশ্র ; পরমেশ্বরকৃত 'গোপালিকা' টীকা সহ এস্. কে. রামনাথ শাস্ত্রি-সম্পাদিত, মদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩১ খ্রীঃ।

স্বরসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা—শ্রীনিবাস যজ্বা, Ed. by K.A. Sivaramakrishna Sastri, Annamalai University Series, Madras, 1936.

পতঞ্জলি-চরিতম্—রামভদ্র দীক্ষিত-প্রণীতম্ ; Ed. by শিবদত্ত and কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গপরব, Bombay, 1895.

বাক্যপদীয়—ভর্তৃহরি, ১ম খণ্ড, চারুদেবশাস্ত্রিসম্পাদিত, লাহোর, ১৯৩৪ খ্রীঃ।

পরিভাষেন্দুশেখর—নাগোজি ভট্ট, Ed. and explained by F. Kielhorn, Bombay, 1874.

স্ফোটবাদ—নাগেশ ভট্ট, •Ed. by V. Krishnamacharya, Adyar Library,Madras, 1946.

লঘুঋক্তন্ত্রসংগ্রহ+সামসপ্তলক্ষণ—Ed. by সূর্যকান্ত, Lahore, 1940.

বৈদিকসাহিত্য (হিন্দী)—রামগোবিন্দ ত্রিবেদী, কাশী, ১৯৫০।

ভারত-সংস্কৃতি—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

নিরুক্তালোচনম্—সত্যব্রত সামশ্রমী, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৭ খ্রীঃ।

ভবিষ্যপুরাণ—

অগ্নিপুরাণ—

গরুড়পুরাণ—

বায়ুপুরাণ—গুরুমণ্ডল series No xix, Calcutta, 1959.

বৃহদ্দেবতা—শৌনক—ed. by Macdonell, Harvard Oriental Series.

নিরুক্তম্—parts I—IV, with Bengali Translation and Notes, Edited by Amareswara Thakur, University of Calcutta, 1955–1970.

প্রবন্ধচিন্তামণি—মেরুতুঙ্গাচার্য, Singhi Jain Series, Shantiniketan, Bengal,1933.

প্রবন্ধকোশ—রাজশেখর সূরি ।

শব্দার্থতত্ত্ব—রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

প্রভাবকচরিত—প্রভাচন্দ্র সূরি।

ব্যাকরণমহাভাষ্য (৭ম প্রস্তাবনা খণ্ড, মারাঠী)—কাশীনাথ বাসুদেব অভ্যঙ্কর, পুনা, ১৯৫৪ ।

অথর্ববেদপ্রাতিশাখ্য বা শৌনকীয়া চতুরধ্যায়িকা—ed. by W.D.Whitney, The Chowkhamba Sans. Studies...Benares, 2nd Edn., 1962.

বিদ্যাসাগর ও বাঙালীসমাজ—বিনয় ঘোষ, ২য় খণ্ড, ১৩৬৪ এবং ৩য় খণ্ড, ১৩৬৬।

ভাষার ইতিবৃত্ত— সুকুমার সেন, ৮ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬৪।

অথর্বপ্রাতিশাখ্য—শ্রীসূর্যকান্তশাস্ত্রি-সম্পাদিত, লাহোর, ১৯৩৯।

ঋক্‌তন্ত্র (সামবেদের প্রাতিশাখ্য)—ঋক্‌তন্ত্রবিবৃতি এবং সামবেদসর্বানুক্রমণীসহ সূর্যকান্ত শাস্ত্রি-সম্পাদিত, লাহোর, ১৯৩৩।

শব্দকৌস্তুভ—ভট্টোজি দীক্ষিত, ed. by Gopal Shastri Nene and Mukund Shastri Puntamkar, 3 parts, Benares, 1933.

লিঙ্গানুশাসন—হর্ষবর্ধন, পৃথ্বীশ্বরের 'সর্বলক্ষণা' টীকা সহ পণ্ডিত ভি, বেঙ্কটরাম শর্ম-কর্তৃক সম্পাদিত, মাদ্রাজ ইউনিভারসিটি সংস্কৃত গ্রন্থমালা, ১৯৩১ খ্রীঃ।

পদচন্দ্রিকা—a commentary on the নামলিঙ্গানুশাসন of Amara (অমরকোষ) by Rayamukuta, edited by Kalikumar Datta, Sastri, Cal. Sans. College Research Series, Vol. I, Cal. 1966 ; Vol. II, Cal. 1973 ; Vol. III, Calcutta, 1978.

অর্থশাস্ত্র—কৌটিল্য—The Kautiliya Arthasastra, part I ; Ed. by R.P.Kangle, Bombay, 1960.

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য—ed. by K. Rangacharya and R. Sharma Sastri with two commentaries (ত্রিভাষ্যরত্ন, বৈদিকাভরণ), Mysore, 1906.

প্রয়োগরত্নমালা ব্যাকরণ—পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ, সিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশ-কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া কোচবিহার থেকে ১২৯৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

সুপদ্মব্যাকরণ—পদ্মনাভ দত্ত ; ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য সংকলিত, কলিকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণম্—ক্রমদীশ্বরপ্রণীতম্, সটীকানুবাদম্, জুমর...বৃত্তিসহিতম্,...গোয়ীচন্দ্রকৃত বিবরণী...টীকা সহিতম্ শ্রীগুরুনাথ বিদ্যানিধি...সম্পাদিতম্ ; শকাব্দা ১৮৩৩।

মুগ্ধবোধব্যাকরণ—বোপদেব ; রামতর্কবাগীশের 'প্রমোদজননী' ও দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশের 'সুবোধা' টীকা এবং শিবনারায়ণ শিরোমণির টিপ্পনী সহ, কবিরাজদ্বয় দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯১৬ খ্রীঃ প্রকাশিত।

সাহিত্যের নানা কথা—হরপ্রসাদ মিত্র, কলিকাতা, ১৩৬৩।

সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারম্—নারায়ণরাম আচার্য, ৮ম সংস্করণ, ১৯৫২।

লঘুসিদ্ধান্ত কৌমুদী— বরদরাজ, ed. by M.M.V.V. Mirashi, Bombay, 1928.

মধ্যসিদ্ধান্ত কৌমুদী—বরদরাজ, ed. by Sridhar Sarma, Sastri, Lahore, 1936.

ঋক্‌প্রাতিশাখ্য—শৌনক ; উববটকৃত ভাষ্যসহ, যুগলকিশোর ব্যাস ও প্রভুদত্ত শর্মার সম্পাদনায় বারাণসী থেকে ১৯০৩ খ্রীঃ প্রকাশিত।

বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য—কাত্যায়ন, উব্বট ও অনন্ত ভট্টের বৃত্তি সহ ভি. ভেঙ্কটরাম শর্মার সম্পাদনায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৪ খ্রীঃ প্রকাশিত।

পাশ্চাত্যদর্শনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—তারকচন্দ্র রায়, কলিকাতা, ১৯৫২।

কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা—...জিনেন্দ্রবুদ্ধিপাদবিরচিতা, ed. by Srish Chandra Chakravarti, in 3 Vols., Rajshahi (The Varendra Research Society), 1919 (1913 ?) —1925.

কথাসরিৎসাগর—সোমদেব ভট্ট-রচিত।

বৃহৎকথামঞ্জরী—ক্ষেমেন্দ্র-রচিত।

হরচরিতচিন্তামণি—জয়দ্রথ-রচিত।

বৃহদ্ বৈয়াকরণভূষণ, বৈয়াকরণভূষণসার—কৌণ্ডভট্ট, ed. by K.P.Trivedi, Bombay, 1915.

কাশিকা—জয়াদিত্য ও বামন, ed. by S.Mishra, Benares, 1952.

রাজতরঙ্গিণী—কলহণ, ed. by Sri Visvabandhu, 2 Vols., V.V.R.Institute, Hoshiarpur.

ভাষার ইতিহাস—(১ম পর্ব)—শ্রীমুরারিমোহন সেন, কলিকাতা, ৩য় সংস্করণ, জুলাই, ১৯৭৫।

ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—শ্রীগুরুপদ হালদার, কলিকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

নাগরীপ্রচারিণী পত্রিকা (ত্রৈমাসিকা), কাশী নাগরীপ্রচারিণীসভাদ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত, Vols. 2-13, 54, 55, 57, 58, 1-3 (New series) Samvat 1977-79, 19-24, 59 (Samvat 2011, Anka 3-4), 60 (Anka 1-2).

সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রকা ইতিহাস (হিন্দী)—যুধিষ্ঠির মীমাংসক, ১ম ভাগ, ১ম সংস্করণ, ২০০৭ সংবৎ ; শ্রীপণ্ডিত ভগবদ্দত্তজী, বি.এ. (বৈদিকসাধন আশ্রম, দেহরাদূন)-কর্তৃক প্রকাশিত ; প্রাপ্তিস্থান ভারতীয় সাহিত্যভবন, নবাবগঞ্জ, লাইব্রেরী রোড, দিল্লী।

রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা—নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তি-সম্পাদিত, বিশ্বভারতী, ১৩৬৭।

সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের মূলকথা—শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কলিকাতা, ১৯৫৭।

পাণিনীয়নাটকম্—গোপালশাস্ত্রী দর্শনকেসরী, চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ১৯৬৪ খ্রীঃ।

কাশিকা—শ্রীনন্দিকেশ্বরকৃতা.....শ্রীমদুপমন্যুকৃত তত্ত্ববিমর্শিনী ব্যাখ্যাসংবলিতা।

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ব্যাকরণ—ভোজদেব, ed. by T.R.Chintamani.

সর্বদর্শনসংগ্রহ—মাধবাচার্যকৃত।

শব্দশক্তি প্রকাশিকা—জগদীশতর্কালঙ্কার, edited with Bengali Translation and Elaborate Exposition by Madhusudan Bhattacharya Nyayacharya, Sanskrit College, Calcutta, Vol. I, 1980, Vol. II, 1981.

কাব্যাদর্শ –দণ্ডী, edited by Kumud Ranjan Ray with 'মালিন্য প্রোঞ্ছনী' টীকা by প্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশ ভট্টাচার্য and published by K. Ray, 176 Vivekananda Road, Calcutta, in 1956 (pp. 3+423).

Kavyaprakasha of Mammata with Eng. Translation by M.M. Dr. Sir Ganganatha Jha, Bharatiya Vidya Prakashan Varanasi—I (India), Aug. 1967. (pp. 34+504+Lix).

সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা—ডঃ রামেশ্বরশ', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা—৯, ১৯৮৮।

ভাষাবৃত্তিঃ—...পুরুষোত্তম দেব-বিরচিতা...শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তি-ভট্টাচার্য্য, বি.এ.-সম্পাদিতা, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজশাহি, ১৯১৮ খ্রীঃ।

মাধবীয়া ধাতুবৃত্তিঃ—সায়ণাচার্য-বিরচিতা...স্বামী দ্বারিকাদাস-শাস্ত্রি-সম্পাদিতা, প্রাচ্যভারতী প্রকাশন, কমচ্ছা, বারাণসী-১, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৪ খ্রীঃ।

মাধবীয় ধাতুবৃত্তি—সায়ণাচার্য, Ed. by A. Mahadeva Sastri, Mysore, 1900.

মাধবীয় ধাতুবৃত্তিঃ—সায়ণাচার্যকৃতা,...অনন্ত শাস্ত্রী ফড়কে তথা সদাশিব শর্ম-শাস্ত্রি-সম্পাদিতা, চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৩৪ খ্রীঃ।

সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা (সারস্বতে)—রামাশ্রমকৃতা...খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্তৃক প্রকাশিতা, বোম্বাই, ১৮৩০ শকাব্দ।

সারস্বত ব্যাকরণম্—অনুভূতি স্বরূপাচার্যপ্রণীতং চন্দ্রকীর্তি-ব্যাখ্যাসহিতম্, শিবদত্ত কুদাল-সম্পাদিতম্ ; ৩য় সংস্করণ, বোম্বাই, ১৮৩৮ শকাব্দ, ১৯১৬ খ্রীঃ।

প্রক্রিয়া কৌমুদী—রামচন্দ্রাচার্য রচিতা, বিট্ঠলাচার্য কৃত প্রসাদটীকাসহিতা, কমলাশংকর প্রাণশংকর ত্রিবেদী...সম্পাদিতা, বোম্বাই সংস্কৃত....প্রাকৃত সিরিজ, ১ম সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ১৯২৫ খ্রীঃ, ২য় খণ্ড, ১৯৩১ খ্রীঃ।

ঔণাদিকপদার্ণব—পেরু সূরি, টি. আর. চিন্তামণি-সম্পাদিত, মাদ্রাজ ইউনিভারসিটি সংস্কৃত সিরির্জ..., মাদ্রাজ, ১৯৩৯ খ্রীঃ।

উণাদিবৃত্তি—উজ্জ্বলদত্ত, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৮৭৩ খ্রীঃ।

প্রক্রিয়াসর্বস্ব—নারায়ণ ভট্ট, কে. সাম্বশিব শাস্ত্রি-সম্পাদিত, ত্রিবান্দ্রাম সংস্কৃত সিরিজ, ১ম খণ্ড, ১৯৩১ খ্রীঃ।

সংস্কৃত ব্যাকরণ মেং গণপাঠকী পরম্পরা ঔর আচার্য পাণিনি—কপিলদেব শাস্ত্রী, ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, অজমের, ২০১৮ সম্বৎ (১৯৬১।৬২ খ্রীঃ)।

সংস্কৃত ব্যাকরণ-শাস্ত্রকা ইতিহাস—যুধিষ্ঠির মীমাংসক, ৩ খণ্ডে, ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যাভবন, অজমের।

দুর্ঘটবৃত্তি—শরণদেব, টি. গণপতি শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ত্রিবান্দ্রাম সংস্কৃত গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ১৯০৯ খ্রীঃ ত্রিবান্দ্রাম থেকে প্রকাশিত।

দৈব—দেব-রচিত এবং কৃষ্ণ লীলাশুক রচিত টীকা 'পুরুষকার' সহ, টি. গণপতি শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ১৯০৫ খ্রীঃ ত্রিবান্দ্রাম থেকে প্রকাশিত।

বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী—ভট্টোজিদীক্ষিত, ed. by Pt. Shivadatta Shastri, Bombay, 1932.

বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত মঞ্জুষা—নাগেশ ভট্টবিরচিত।

পাতঞ্জল মহাভাষ্যম্—প্রদীপ, উদ্দ্যোত, ছায়াসমন্বিত, ভার্গবশাস্ত্রি-সম্পাদিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বে, ৫ম সংস্করণ, ১৯৫১।

গণরত্ন মহোদধি—বর্ধমান উপাধ্যায়, ed. by Julius Eggeling, London, 1879.

গণরত্ন মহোদধি—বর্ধমান উপাধ্যায়, প্রয়াগ থেকে ১৮৯৪ খ্রীঃ ভীমসেন শর্মকর্তৃক মুদ্রাপিত ও প্রকাশিত।

কাতন্ত্র পরিশিষ্ট— শ্রীপতি দত্তপ্রণীত।

পরিভাষেন্দুশেখর—নাগোজি ভট্ট, ed. by F. Kielhorn, Bombay, 1874.

A Catalogue of Sans. Mss. in the Sanskrit College Library, Beneras, Allahabad.

Operations in search of Sans. Mss. in the Bombay Circle, April 1892-95 by P. Peterson, Bombay, 1896 (Reports 1-5),

Detailed Report of a Tour in search of Sans. Mss. made in Kasmir, Rajputana and Central India, by G. Buehler, 1877.

A Cat. of Sans. Mss. in private Libraries of the North-western Provinces, parts I—X, Allahabad, 1877-86.

A Descriptive Cat. of the Sans. Mss. in the Govt. Oriental Mss. Library, Madras, Vol. III, by M. Rangacharya, Madras, 1906.

The Present state of Sanskrit Learning in Bengal by Vanamali Chakravarti, Dacca, 1910.

Catalogue of Sanskrit and Prakrita Mss. in the Central Provinces and Berar by Hiralal, Nagpur, 1926.

Lists of Sans. Mss. in Private Libraries of Southern India, compiled, arranged and indexed by Gustav Oppert, Vol. I, Madras, 1880, Vol. II, Madras, 1885.

Notices of Sanskrit Manuscripts, vols. I—X (part 1) by R.L.Mitra, Calcutta, 1871—1890, and Vol. X (part 2) and Vol. XI by H.P. Sastri, Calcutta, 1892—1895 and 2nd series Vols. I—IV by H. P. Sastri, Calcutta, 1900—1911.

A Descriptive Catalogue of the Sans. and Prakrta Mss. in the Library of the University of Bombay, compiled by G.V. Devasthali, Book I, part 1, 1944.

Do in the Library of the B.B.R.A.S., compiled by H.D. Velankar, Vol.I, 1926.

Descriptive Cat. of Sans. Mss. (in the Govt. Collection of Mss. deposited in the Deccan [illegible] II part 1—compiled by Dr. [illegible], 1938.

Do [illegible] Library of the Calcutta Sanskrit College, Vols. VII—VIII, prepared by Hrishikesha Sastri and Siva Chandra Gui, 1904.

Do in H.H. the Maharaja's Palace Library, Trivandrum, Vol. III (Grammar) ed. by K. Samba Siva Sastri, 1938.

Do in the Adyar Library, Vol. IV (grammar etc.) by V.Krishnamacharya, 1947.

Do in the Library of the Asiatic Society of Bengal, 1st part (grammar) by R.L. Mitra, Calcutta, 1877.

Do in the Curator's office Library, Trivandrum, Vol. III (gr.) ed. by Mahadev Sastri, 1939.

Do in the বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ by Chintaharana Chakravarti, 1935.

Panini as a Variationist—Paul Kiparsky, Edited by S.D.Joshi, Centre of Advanced Study in Sanskrit, University of Poona,. Cambridge (Massachusetts, U.S.A.) and London (England), 1980. (First Published in India by the Poona University Press, 1979).

Kavyamimamsa—by Rajasekhara, Gaekwad's Oriental Series,Vol.1, 1934.

Report on the Search for Sans. Mss. in the Bombay Presidency, during the year 1883-84, by R.G.Bhandarkar, Bombay, 1887.
The Calcutta Review, 3rd Series, vols. 1-9 (1921—1923).
Studies on Panini's Grammar by Braned Faddegon, Amsterdam, 1936.
A History of Sanskrit Literature...by Max Muller, 1859.
The Sanskrit Indeclinables of the Hindu grammarians and lexicographers by Isidore Dyen, Philadelphia, 1939.
The Study of Sanskrit in relation to Missionary work in India by Monier M. Williams, 1861.
A manual of Sanskrit Phonetics by Dr. C.C. Uhlenbeck, London, 1898.
Magadhan Literature by H.P. Sastri, Calcutta, 1923.
Age of the Nandas and Mauryas—ed.by K.A.Nilkanta Sastri, Banaras, 1952.
An Alphabetical list of Mss. in the Oriental Institute, Baroda, Vols. I-II, 1942 and 1950.
Lists of Mss. Collected for the Govt. Mss. Library, B.O.R.I., Poona, 1925.
A Catalogue of Sans. Mss. acquired for and deposited in the Govt. Sans. College Library, Sarasvati Bhavan, Benares, 1918-30, prepared under the supervision of Gopinath Kaviraj, Vol. I, Allahabad, 1935.
A Triennial Catalogue of Manuscripts collected during the Triennium 1910-11 to 1912-13, for the Govt. Oriental Manuscript Library, Madras, by M.Rangacharya and S. Kuppuswami Sastri, Madras, 1913, Vols. I-X.
Ras Mala—ed. by Alexander K. Forbees, London, 1924.
Life of Hemacandracarya—Georg Buhler, Tr. from German by Manilal Patel, Calcutta, 1937.
A Dictionary of Sanskrit Grammar by Kashinath V. Abhyankar, Baroda, 1961.
The Atharva-veda Prati sakhya, or Saunakiya Caturadhyayika : Text, translation, and notes ; by W.D. Whitney (in the Journal of the American Oriental Society, Vol. 7, 1862).
Bhattoji Diksita : His Contribution to Sanskrit Grammar by Suryakant Bali, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1976.
Systems of Sanskrit Grammar—S.K. Belvalkar, Poona, 1915.
Philosophy of Sanskrit Grammar—P.C.Chakravarti, Calcutta, 1930.
Linguistic Speculations of the Hindus—P.C. Chakravarti, Calcutta, 1933.
Sanskrit Dhatupathas : A Critical Study—G. B. Palsule, Poona, 1961.

Bhartrhari : A Study of the Vakyapadiya in the light of the Ancient Commentaries by K.A. Subramania Iyer, Poona, 1969.

Linguistic Analysis and some Indian Traditions—George Cardona, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1983.

A Reader on the Sanskrit Grammarians ed. by J.F. Staal, First Indian Edition 1985 by Motilal Banarsidass, Delhi 110007.

Lectures on Patanjali's Mahabhasya, Vol. I, by P.S. Subrahmanya, Annamalai nagar, 1944.

The Etymologies of Yaska by Siddheswara Varma, Hoshiarpur, 1953.

Grammars and Dictionaries of the Sanskrit Language by H.H. Wilson, ed. by Dr. Reinhold Rost, Nag Publishers, Delhi-7, (first Indian Edition) 1979.

Pali Literature and Language by W.Geiger, translated into English by B.Ghosh, University of Calcutta, 1956 (2nd edn.) .

Critical Studies in the Phonetic Observations of Indian Grammarians by Siddheshwar Varma, 1st Indian Publication, New Delhi, 1961.

Proceedings of the International Seminar on Studies in the Astadhyayi of Panini (Held in July 1981) Edited by S.D. Joshi and S.D. Laddu, Pune, 1983.

Yaska's Nirukta and the Science of Etymology by Bishnupada Bhattacharya, 1st edition, Calcutta, 1958.

The Astadhyayi of Panini (Vol.I)—by Rama Nath Sharma, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt, Ltd., New Delhi, 1987.

Alberuni's India—by Dr. Edward C. Sachau, London, 1910.

Some Chronological Considerations about Panini's Date by V.S. Agrawala, I.H.Q. December, 1951.

The Text of the Astadhyayi—by K.Madhava Krishna Sarma, Journal of the U.P. Historical Society, July 1940.

Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the India Office, part II (Grammar and Lexicography) by Julius Eggeling, London, 1889 ; Part I (Vedanga), London, 1887.

A Descriptive Catalogue of the Sans. Manuscripts in the collections of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VI (Vyakarana Manuscripts) by Haraprasad Sastri, Calcutta, 1931.

Catalogue of the Sans. and Prakrita Manuscripts in the Library of the India Office, Vol. II, part 1 by A.B. Keith, Oxford, 1935 and Vol. II, Part II...

A Catalogue of Sans. Mss. in the Library of the Maharaja of Bikaner, by R.L. Mitra, Calcutta, 1880.

Puranic Chronology— by D.R. Mankad, Vithalbhai Patel Mahavidyalaya, Vallabh Vidyanagar, Gujarat, 1951.

Sanskrit Grammar— W.D.Whitney, Oxford, 1923, 1st edn. 1879.

A Record of the Buddhist Religion as practised in India and the Malay Archipelago (A.D. 671—695), by I-tsing ; Translated by J.Takakusu, Oxford, 1896.

Si-Yu-Ki (Buddhist Records of the Western World)—Translated from the Chinese of Hiuen Tsiang (A.D. 629) by Samuel Beal, London .

Theory of Sphota—by P.C. Chakravarti, 'Calcutta Review', Jan; 1926.

Paninian studies in Bengal—by D.C. Bhattacharya, Sir Asutosh Mookerjee Silver Jubilee Volume No. III, part 1,Calcutta 1922.

Riktantra Vyakarana—ed. by A.C. Burnell, Mangalore, 1879.

The Atharva Pratisakhya...ed. by Vishva bandhu...Sastri, part 1, Punjab University, 1923.

A Sanskrit grammar for Students by A.A. Macdonell, Oxford, 1927.

Technical terms and technique of Sanskrit grammar, part 1, by Kshitish Chandra Chatterji, Calcutta, 1948.

The Sanskrit Language by T. Burrow, London, 1955.

Upasarga and other technical terms—by Kshitish ch. Chatterji, (Usha Memorial Series, No-8), 'Manjusha', March 1955.

On the Aindra School of Sanskrit grammarians..., by A.C. Burnell, Mangalore, 1875.

Malaviya Commemoration Volume, Benares Hindu University, 1932.

New Indian Antiquary, Vols. 1-8.

Journal of Oriental Research, Madras, Vols. 1 - 14.

Do of the Annamalai University, Vols. 1-14.

Indian Culture, Vols. I-XIV, 1934-1948.

Catalogus Catalogorum—Theodor Aufrecht, Leipzig, 1891.

Ancient Indian Education—Radhakumud Mookerji, 3rd edn. Delhi 1960.

A History of Cooch Behar (in Bengali), part 1, compiled by Khan Chowdhuri Amanatulla Ahmed, 1936.

The Pali Literature of Burma—Mabel Haynes Bode, London, 1909.

Bengal's Contribution to Sanskrit Grammar in the Paninian and Candra Systems, part one, General Introduction, by Kali Charan Shastri, Sanskrit College, Calcutta, 1972.

India as known to Panini—V.S. Agrawala, Lucknow, 1953.

India in the Time of Patanjali—B.N. Puri, Bombay, 1957.

Katyayana and Patanjali, their relation to each other and to Panini—by F. Kielhorn, 1876.

The Nighantu and the Nirukta—critically ed. by L. Sarup, Lahore, 1927.

Panini : his place in Sanskrit literature, by T.Goldstucker, London, Berlin, 1861.

Paniniya siksa—ed. by M. Ghosh, Calcutta University.

The Philosophy of Word and Meaning—by Gaurinath Sastri, Sanskrit College, Calcutta, 1959.

A Study in the dialectics of Sphota by Gaurinath Bhattacharya, Calcutta, 1936.

The Structure of the Astadhyayi—I.S.Pawte, Hubli, 1935.

The Sanskrit Dhatupathas, a critical study by G.B.Palsule, Poona 1961.

Hala's Gatha-saptasati (Prakrit text with Bengali translation and Introduction by Radhagovinda Basak, Calcutta, 1956.

The Fundamentals of Anuvrtti—by S.D.Joshi and Saroja Bhate, University of Poona, Pune, 1984 (pp. VIII + 305).

Panini : A Survey of Research by George Cardona, first Indian Reprint : Delhi, 1980.

New Catalogus Catalogorum : An alphabetical Register of Sanskrit and allied works and authors by Dr. V. Raghavan, University of Madras, 1949.

Bhoja Raja—by Prof. P.T. Srinivasa Ayyangar, Madras Methodist Publishing House, 1931.

নির্দেশিকা*

---

* এক নামের একাধিক গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে প্রায়শঃ একবারই নামটি নির্দেশিত হইয়াছে।

সংক্ষেপীকরণ ঃ—

A. O. S. = American Oriental Society
A. S. B. = Asiatic Society of Bengal
B. B. R. A. S. = Bombay Branch of the Royal Asiatic Society
BR. = Brahmana
BRS. = Brahamanas
COMP. = Comparative, Comparison
DICT. = Dictionary
EDN. = Edition
GEN. = General
G. J. R. I. = Gananath Jha Research Institute
GR. = Grammar, Grammaire, Grammatik, Grammatica
IND. = India
LANG. = Language
LITR. = Literature
MS. = Manuscript
MSS. = Manuscripts
ORD. = Ordinary
SANS. = Sanscrit, Sanskrit, Sanskrita, Sanscrita
SPL. = Special
S. V. O. I. = Sri Venkateswara Oriental Institute
TRAN. = Translation

সমাপ্ত